চিরন্তন নারী

সম্পাদনা বিষ্ণু বসু



চিরন্তন নারী

বাংলা সাহিত্যের নারীকেন্দ্রিক গল্পের সেরা সংকলন

সম্পাদনা

ড. বিষ্ণু বসু

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

CHIRANTAN NARI
A Collection of Bengali Shrot Stories Edited by Dr. Bishnu Basu
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

ISBN - 81-295-0028-0

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-গ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রয়াতা স্নেহলতা ঘোষ
আমার দিদিমাকে

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে এ গল্প সংকলনটি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রন্থিত নয়। আমাদের ভাবনা ও সমাজের প্রতি পরতে জড়িয়ে আছেন যত ধরনের রমণী তাঁদের বিবিধ ভাব ও রূপ কীভাবে ধরা দিয়েছে বাঙালি লেখকদের ধ্যানে ও মননে তারই, একটি প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছে এ সংকলনটি। অবশ্য একথাও এই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে মাত্র ষাটটি গল্পে বিচিত্ররূপিনীদের সমগ্রভাবে কিছুতেই ধরা যায় না, তবু কোনও একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে এবং থামতেও হবে। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প যথার্থই ধনী এবং যেহেতু,সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবেই মানবজাতির প্রায় অর্ধেকই রমণী, বাঙালি জীবনও স্বভাবতই তার বাইরে নয়। তাই মাত্র ষাটটি গল্প তাঁদের স্বরূপ ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ ধরা অসম্ভব। এ অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করেই পাঠকদের কাছে পরিবেশিত হল এ সংকলন।

আরো একটি কথা। বাংলা ছোটগল্প বলতে এখানে শুধু পশ্চিমবাংলার দিকেই দৃষ্টি সীমিত রাখা হয়নি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বাংলা একদিন ভাগ হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান গত ত্রিশ বছর ধরে যার স্বীকৃতি বাংলাদেশ নামে, তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব আলাদা হলেও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মূলত এক, তাই বাংলা সাহিত্যের ভূগোল থেকে বাংলাদেশের সাহিত্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ব্যাপক অর্থে ইংরেজি ভাষায় লেখা হলেও ইংরেজি সাহিত্য আমেরিকার সাহিত্য থেকে আলাদা অস্তিত্ব বহন করে যেমন করে যাতে অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের সাহিত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এ বৈশিষ্ট্যর সামন্যতম সাজুয্য নেই। সে জন্যই বলা হয়েছে 'ইংলন্ড ও আমেরিকা বিভক্ত হয়ে আছে একই ভাষার সাজুয্য।' উভয় বাংলার সাহিত্য বরং বিপরীত সত্যই প্রকাশ বেঁধে রেখেছে। তাই এ সংকলনে স্বভাবতই বাংলাদেশের সাহিত্যকদের বেশ কিছু গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ত্রিপুরার যাঁরা কৃতী গল্পকার তাদের প্রতিও কিছু সন্ধানী আলো ফেলার চেষ্টা হয়েছে।

দুই

বিদেশি পুরাণকথায় বলা হয়েছে নারীর সৃষ্টি হয়েছে নাকি পুরুষের পাঁজারের হাড় থেকে। এ কল্পকথার মধ্য দিয়ে অবশ্য পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান দিয়ে সারা পৃথিবীতে পুরাণে লোককথায়, ইতিহাসে এত বিভিন্ন ধরনের মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে যে তার সালতামামি করা প্রায় অসম্ভব। 'নারী নরকের দ্বার' এ ফতোয়া থেকে শুরু করে 'গৃহিণী সচিব সখী ললিতে কলাবিধৌ' পর্যন্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি তো অভিব্যক্ত হয়েছিল প্রাচীন কালেই। প্রাচীন কালে সমাজে নারীর সমানাধিকার প্রচলিত ছিল কি না তা নিয়ে নানা তত্ত্ব বিভিন্ন সময়ে পরিবেশিত হয়েছে। আদিম কৌম সমাজে নারীর আধিপত্যের স্বরূপ নিয়েও কম কথা বলা হয়নি। ইতিহাসের গোড়াব যুগে মানুষ যখন শিকারজীবী থেকে পরিণত হল কৃষিজীবীতে তখন নারীর ভূমিকা মুখ্য হয়ে দাঁড়াল, তারপর কৃষির জমি ও নারীর শরীর প্রায় সমার্থক হল, সৃষ্টি হল পরিবার তন্ত্র, তখন থেকে সম্ভবত নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা হারাতে লাগল, শুরু হল সমাজের এক অস্পষ্ট শ্রেণীদ্বন্দ্ব যা অবর্তিত হল নাবী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে ঘিরে। বৈদিক সূত্র রচনায় নিযুক্ত কিছু রমণীকে চিহ্নিত করা গেলেও মৈত্রেয়ী ও গার্গীর মর্যাদা শুধুমাত্র নারী হিসেবে স্বীকৃত ছিল তা

নয়। তারই চরমতম অবমাননাকর অভিব্যক্তি ঘটেছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র মতো মনোভাবের মধ্য দিয়ে। ভার্যাকে কেনা যায় তাও ব্যাপক অর্থে সন্তান উৎপাদনের জন্য নয়, শুধুমাত্র 'পুত্রলাভার্থে'। এ 'শ্লোক' একটি বিশেষ ধরেনর মানসিকতা ও সংকীর্ণতাকেই প্রশ্রয় দেয়। এ মনোভাবেরই চরমতম বিবর্তন সতীদাহ প্রথা। আরব্যোপন্যাসে আছে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কবর গুহায় পরিত্যক্ত হত নারীপুরুষ নির্বিশেষে অর্থাৎ স্বামী মৃত হলে তার সহগমন করবে স্ত্রী, আবার স্ত্রী শবানুচর হবে স্বামী। এ প্রথার মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সতীদাহের মতো নির্মম নয়। অন্তত নঞর্থক অর্থে হলেও পুরুষ ও রমণীর অধিকার সমান বলে স্বীকৃতি হচ্ছে এ প্রথায়।

আদিম সমাজ থেকে 'সভ্য' সমাজে রূপান্তরিত হবার সময় থেকেই বোধ হয় নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব বদলে যেতে থাকে। আমরা যদি পৃথিবীর পুরাকাহিনী (মিথলজি)-গুলো বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই, তাহলে দেখা যাবে নারীর গুরুত্ব সমাজ শরীরে ভালভাবেই স্বীকৃত। ব্যাবিলনের পুরাকাহিনীতে দেখা যায় সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে রমণীর সম্পৃক্ততা। পৃথিবীকে পাপমুক্ত করার জন্য তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস। এমন উদাহরণ অন্যসব দেশের মিথলজিতেও মেলে।

কিন্তু মহাকাব্যের যুগে এসে এ মনোভাবের বিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। পৃথিবীতে যে চারটি 'এপিক অব গ্রোথ' রয়েছে মহাভারত, রামায়ণ, ইলিয়ড ও ওডিসি—এদের মধ্যে অন্তত তিনটি মহাকাব্যের মূল সমস্যা আবর্তিত হয়েছে প্রধানত নারীকে কেন্দ্র করে।

রামায়ণ ও ইলিয়াডের মধ্যে অনেক বিশেষজ্ঞই মিল খুঁজে পান। সীতা ও হেলেন হরণই এ দুটো মহাকাব্যের বীজ। সীতা হরণ করে রাবণ সবংশে নির্মূল হয়েছিলেন। হেলেনের জন্য ট্রয়ের সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল। রাবণের রমণীকুলের অবশ্য ট্রয় নারীদের মত মর্মান্তিক হয়নি। যুদ্ধজয়ের পরে গ্রিকবীরের দল ট্রয়ের নারীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন তার তুলনা পৃথিবীতে কমই মেলে। আসলে এ ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে সেই সমাজের পুরুষ জাতির দৃষ্টিভঙ্গিটাই প্রকাশ পেয়েছিল। আগমেমননের নিজ কন্যা হত্যার পশ্চাদতাটেও যত মহত্ত্বই থাক না কেন, ঘটনাটি যে পুরষ শাসিত সমাজের একতরফা বিধান তাতে সন্দেহ থাকে না। তাই ক্লাইতে মনেস্ত্রা স্বামী আগামেমননের নিধন করবার মত মনের জোর পেয়ে যায়। অবশ্য তাঁর পুত্র ওরিয়েস্তেসও এ হত্যার প্রতিশোধ নেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন তাঁরই কোন ইলেকত্রা। আবার ওরিয়েসতেসও 'ফিউরি'দের দ্বারা তাড়িত হতে বাধ্য হন।

হেলেন হরণ ট্রয়রমণীদের প্রতি গ্রিকদের দুর্ব্যবহার, আগামেমনন কাহিনী অথবা তার সমতুল্য কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করেল একথা অস্পষ্ট থাকে না নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন ধরনের দ্বান্দ্বিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। নারীর উপর পুরুষদের আধিপত্যের প্রসার ঐতিহাসিক যুগে এসেও অব্যাহত হতে থাকে। ওলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা — যার জন্য আধুনিক মানুষ এত গর্ব অনুভব করে থাকেন—নারীবর্জিত ছিল শাসকদের অনুশাসনেই। এমনকি দর্শক হিসেবেও নারীরা ওলিম্পিক প্রাঙ্গণে ছিলেন অবাঞ্ছিত। একজন মহিলা তাঁর প্রতিযোগী পুত্রের কৃতিত্ব স্বচক্ষে দেখার ও গর্ব অনুভব করবার জন্য ছদ্মবেশে ওলিম্পিকের আসরে এসে কীভাবে অপমানিত হয়েছিলেন তার বর্ণনা তো ইতিহাসের পাতাতেই পাওয়া যায়। অবশ্য বলা হয়েছিল প্রতিযোগী পুরুষরা বিবস্ত্র অবস্থায় ক্রীড়ায় অংশ নিতেন বলেই এ অনুশাসন চালু ছিল। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

রামায়ণে কাহিনীর গতি আলাদা হলেও নারীর প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেটি কি খুব সম্মানজনক? লক্ষ্মণকে ভালবাসার 'অপরাধে' শূর্পনখার অঙ্গচ্ছেদ খুব একটা বীরত্বব্যঞ্জক কি? 'রাক্ষস সমাজে' নারীদের স্বামী নির্বাচনের অধিকার স্বীকৃত ছিল, তাই শূর্পনখার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনও অন্যায় ছিল না। লক্ষ্মণেরও তাকে প্রত্যাখ্যানে অধিকার ছিল, কিন্তু কোনও রমণীর অঙ্গচ্ছেদ অংশই আর্য পুরুষের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। এ ব্যাপারটি ঘটেছিল বলেই রাবণ সীতাহরণে জড়িয়ে পড়েছিলেন এ সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়।

শুধু শূর্পনখার প্রতিই লক্ষ্মণের আচরণই বা কেন, স্বয়ং রামচন্দ্র পত্নী সীতার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন— তাও একবার নয় একাধিকবার, তার মধ্যেও তো পুরুষের আধিপত্যবাদী মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্ধারের পর সীতার প্রতি রামের পুরুষ বাক্য, অগ্নিপরীক্ষার প্রস্তাব এবং সর্বোপরি অন্তঃসত্ত্বা পত্নীকে পরিত্যাগের মধ্য দিয়ে স্ত্রী-জাতিকে শুধুমাত্র সম্পত্তি হিসেবে দেখার প্রবৃত্তিই অভিব্যক্ত হয়েছিল বলা যায়। মহাভারতে কুরুরাজসভায় পাণ্ডব মহিষীর যে অবমাননা হয়েছিল তার মধ্যেও পুরুষের একই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। নারীকে সম্পত্তি হিসেবে ভাবার মধ্যেই তার বীজ লুকিয়ে ছিল। শুধু কৌরবরাই বা কেন, পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখে হেরে যাবার মধ্য দিয়েও যুধিষ্ঠির ব্যতিক্রমী ভাবনার প্রকাশ করেননি।

এ মনোভাবই উত্তরকালে আরো প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মনু প্রবর্তিত বিবিধ বিধানের মধ্যে। এ মনোভাব যে একমাত্র ভারতের একচেটিয়া ছিল তা নয়, নানা দেশের মনুর দলও একইভাবে সক্রিয় ছিল। তারই সম্প্রসারণ দেখা যায় মধ্যযুগের প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই নারীর প্রতি একপেশে দৃষ্টির প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে। 'শুক সপ্ততি' থেকে শুরু করে নানা খ্রিষ্টীয় কাহিনিতে ঘটেছে তারই বিস্তার।

তিন

নারীর প্রতি পুরুষের তথা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে রেনেসাঁসের কালে। রাষ্ট্রশাসনে স্বৈরতন্ত্রের ক্রমিক অপসারণ ঘটিয়ে বিকশিত হতে লাগল গণতন্ত্র, ধর্মের মধ্যে দেখা দিল পরিবর্তন, অর্থনীতির বিকাশ পৌঁছল ধনতন্ত্রে, সমাজে নারীর অবস্থানও পরিবর্তিত হতে লাগল। ফলে নারীকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষ ও রমণীর পারস্পারিক সম্পর্ক স্বস্থ ও সুস্থ হতে শুরু করল। তার বলিষ্ঠ ও ব্যাপক প্রতিফলন ঘটল সাহিত্যে ও শিল্পে। চসার থেকে বোকচ্চিও পেত্রার্ক থেকে তার অগ্রগমণ ঘটল শেক্সপিয়রের শীর্ষ চূড়ায়, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে বতিচেল্লি পর্যন্ত। বোকাচ্চিওর গল্পসমূহে আবির্ভূত হল বিচিত্র ও আশ্চর্য সব রমণী, শেক্সপীয়রে পাওয়া গেল গনেবিল থেকে কর্ডেলিয়া, দেসদেমোনা থেকে ওফেলিয়া, ক্লিও পেত্রা থেকে মিরান্দা পর্যন্ত বহুধা বিস্তৃত রমণীকুল। এ সমারোহের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রকাশ ঘটল গোয়টের এ বচনে The society of women is the element of good manners. ভিক্তর উগো তো ঘোষণাই করলেন গভীরতম ও ভদ্রতম বচন উচ্চারণে সমর্থ একমাত্র রমণীরাই। তার আগেই অবশ্য শেক্সপিয়র বলেছিলেন Women are the books, the arts, the academics that show. contain and nourish all the world. বাহুল্যের ঝুঁকি নিয়েও শেক্সপিয়রের আরেকটি উপলব্ধি পেশ করা হচ্ছে—'The beamty, that doth oft make women proud:' its virtue that doth make them most admired; its modesty, That makes them seem divine. ইতশ্চেত ভিন্নধর্মী কথন থাকলেও নারীর প্রতি রেনেসাঁসের মনোভাব ছিল এরকমই।

উনিশ শতকে এসে যখন প্রতীচ্য সভ্যতা পৌঁছাল ধনতন্ত্রের চূড়োয় এবং তারই অভিঘাতে বিকশিত হতে লাগল নানা গণতান্ত্রিক ভাবনা তখন নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি একটি নির্দিষ্টতা পেতে লাগল। সমাজ, পরিবার অথবা পুরুষের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রায় সব যুগেই প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখা দিয়েছে কোনো কোনা ব্যতিক্রমী রমণী, কিন্তু সেগুলি মোটামুটি ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের অভিঘাতে যখন উৎপাদনের শ্রমে ক্রমে নিয়োজিত হতে লাগল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, তখন নারীর প্রতিও সমাজ ও রাষ্ট্রের মনোভাব বদলাতে বাধ্য হল। অবশ্য পরিবর্তনের এ প্রক্রিয়া সহজ ছিল না, তখনকার সাহিত্যে তার বিশ্বস্ত প্রতিফলন অলক্ষ নেই। ইবসেনের 'পুতুলের সংসার' (ডলস হাউস) নাটকে নোরা যখন স্বামীর একপার্শ্বিক মনোভাবকে অস্বীকার করে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘর ছেড়ে বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পথে চলে গেল এবং যাবার আগে দরজাটা সজোরে ঠেলে বন্ধ দিল করে তখন এ সংঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল নারী ব্যক্তিত্বের স্বতন্ত্রতার এক আশ্চর্য নমুনা।

আবার আন্তন চেকভের গল্প ও নাটক সমূহে দেখা দেয় যেসব রমণীকুল, তাদের ক্লান্ত বিষণ্ণ

পরিণামহীন জীবনযাপন তা নারী সমাজের অন্যবিধ এক মহাদেশকে যেন আবিষ্কারের আলোয় নিয়ে আসে। ওলেঙ্কা নিনার মত অজস্র রমণী সমাজ নিষ্পেষণের ফসল হিসেবে এক ধূসর মিছিলের প্রতিরূপ হয়ে দাঁড়ায়। কেউ কি ভুলতে পারে চেকভের 'স্তেপস' গল্পের সেই বধূর অসহায় কান্নাকে যে মেয়ে কিছু নির্মম পুরুষের অত্যাচারে বরফজমা শীতের রাতে বিবস্ত্র হয়ে বাড়িতে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল। কুকুরসঙ্গী মহিলা গল্পের সেই নায়িকাকেও কি ভোলা যায়?

আসলে একদিকে অর্থনৈতিক মুক্তির আস্বাদন এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ও সামাজিক বদ্ধতার অনুশাসন, এ দুয়ের দ্বান্দ্বিকতা নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বার বার ব্যাহত করেছে। কিন্তু নারীদের প্রতি নিষ্পেষণের প্রতিবাদে সৃজিত হয়েছে স্মরণীয় সব সাহিত্যিক চরিত্র, নাটকে গল্পে উপন্যাস যাদের বিচিত্র পদসঞ্চার সারা পৃথিবীর পাঠকদের উদ্বেলিত ও উদবেজিত করে রেখেছে। দুয়েকটি দৃষ্টান্তই সম্ভবত এ সত্যতাকে প্রমাণ করবে। ফ্লরেয়ারের মাদাম বোভারী, তলস্তয়ের আনা কারেনিনা, জোলার নানা প্রভৃতি ভিন্নধর্মী রমণীকুল প্রসঙ্গত সকলের মনে পড়তে পারে। কেউ বা ভুলতে পারেন মোপাসাঁর চর্বির গোলা গল্পের নায়িকাকে অথবা সেই ভাগ্যহত অথচ প্রতিবাদী খামার কন্যাটিকে? এভাবেই তো বিশ্ব সাহিত্যে ঘটে চলেছিল অজস্র নারী চরিত্রের অলৌকিক উন্মোচন।

চার

বাংলা সাহিত্যেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। যদিও এখানে এ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত বিলম্বিত হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণেই। প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে বিদগ্ধ যে সব রমণীকুলের সাক্ষাত মেলে, তাদের চরিত্রতরঙ্গ কতটা বাস্তব ও কতটা বানানো তা নির্ণয় করা সম্ভব কি না সন্দেহ আছে। মহাকাব্যের যুগ পেরিয়ে আসার পরেই কঠোরভাবে শাস্ত্রীয় অনুশাসন একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্চবর্গকে প্রায় ছাঁচে ঢেকে রেখেছিল। সমাজশাস্ত্রের বিধিনিষেধ তো বটেই, এমনকী, রসশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যে সকল নারীকে আঁকা হত, তাঁরা হতেন অনেকটাই প্রতিমার ছাঁচের আদলে। কিছু বহিরঙ্গ বৈশিষ্ট্যে তাঁদের আলাদা করা গেলেও মূলত তাঁরা ছিলেন যেন একই অবয়বের প্রকাশ। শকুন্তলা মহাশ্বেতা, বসন্তসেনা কি আন্তঃ-প্রকৃতিতে খুব একটা আলাদা। এমনকী, ধৃতার বিকাশও ঘটেছে অনেকটা লেখকের অভিপ্রায়ের অনুসরণে, তার স্বাতন্ত্র্যেও রসশাস্ত্রের অনুশাসন অলক্ষ থাকে না।

এ মনোভঙ্গিরই সম্প্রসারণ ঘটল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে। ইতিমধ্যে ভারত তথা বাংলায় শুরু হয়ে গেছে মুসলিম আধিপত্য। তাই ইতিহাসে ঘটে গেছে নতুনতর শ্রেণীবিন্যাস, অর্থনীতির ও সমাজনীতির সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে গেছে ধর্ম। তার প্রভাব পড়ল সাহিত্যে বিশেষত নারীচরিত্র পরিবেশনের বৈশিষ্ট্যর মধ্যে। এ পর্বে লক্ষ্য করা যায় মূলত দুধরনের নারীপ্রতিমা। এক বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা; দুই মঙ্গলকাব্যের কিছু দেবী ও মানসী। স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীণ কৃষিসভ্যতার সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির দ্বন্দ্বের বিন্যাসে যে ছাঁচ তৈরি হল, স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে বৈচিত্র্য তেমন এল না। রাধা তো ভক্তহৃদয়ের বানিয়ে তোলা একটি একক, বিভিন্ন কবির প্রতিভা ও মনোভঙ্গির তারতম্যের মধ্যেই তার স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। মঙ্গলকাব্যে সনকা, লহনা, খুল্লনা এমন কী ফুল্লরা ও বেহুলাও ব্যক্তিত্ব স্ফূরণে যেন প্রথাকেই মেনে নিয়েছে। স্মার্ত পণ্ডিতদের অনুশাসন বিধি সমাজকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে এ যুগেই। এ পরিবেশে একমাত্র মনসাই বোধ করি স্বভাবত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য পুরুষচরিত্রগুলি এ সময়ের সাহিত্যের ছিল আরো বৈচিত্র্যহীন। রবীন্দ্রনাথ তাই যখন ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেন যে চণ্ডিমঙ্গলে ফুল্লরাই যা একটু নড়ে চড়ে বেড়ায়, কালকেতু তো একটি বৃহৎ স্থাণু মাত্র তখন তার অন্তর্গত সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

সমাজ পরিবেশের এ বাস্তবতা থেকেই নেমে এসেছিল নানা ধরনের নিষেধের বেড়া। সমুদ্র যাত্রা সহ অন্য সম্প্রসারণ বন্ধ হল। সমাজ কূপমণ্ডুক হয়ে পড়ল। এ মনোভঙ্গির ফলে বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হল নারীকুল। তাদের চেপে ধরল বাল্যবিবাহ পুরুষের বহু বিবাহের চাঁদমারি হল তারা। স্ত্রী শিক্ষা

সম্পূর্ণ বন্ধ হল। প্রচার করা হল লেখাপড়া করলে নারীর বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। সতীদাহ প্রথা চেপে বসল। শুরু হল এক অন্ধকারময় যুগ।

পাঁচ

প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে এল পালাবদলের দিন। পলাশীর যুদ্ধ থেকে যার শুরু, একশো বছর পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব ঘুচিয়ে ভিকটোরিয়ার ক্ষমতাগ্রহণ যার ফলে ব্রিটিশ শাসন পেয়ে গেল আরো এক শতাব্দীব্যাপী অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের বৈধতা। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও সম্ভব হল এক নতুন ধরনের পরিবর্তন ইতিহাসেরই দ্বান্দ্বিক নিয়মে। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের দূরতম আলোকপাত এ দেশের সামাজিক মঞ্চকে বেশ খানিক উজ্জ্বলতা মণ্ডিত করে তুলল। বাংলায় শুরু হল 'নবজাগরণ'।

অবশ্যই এ নবজাগরণ ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমতুল্য ছিল না, কেননা ইউরোপীয় রেনেসাঁস ছিল সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে পরিণত হবার একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। বিদেশি শাসন ও লুণ্ঠনের জন্য আমাদের এখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ তো ঘটলই না, বরং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে এল একটি নতুন ধরনের সামন্ততন্ত্র। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লব তো হলই না, কেননা ভারত হয়ে রইল ব্রিটিশ মালিকদের কাছে কাঁচামালের জোগানদার, বরং আমাদের দেশি শিল্পযন্ত্র বিধ্বস্ত হল। তার ফলে কৃষি অর্থনীতির উপর চাপ বাড়ল, সামাজিক পরিস্থিতির ভারসাম্য ইতিবাচক হতে পারল না। অথচ কলকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী হবার সুবাদে প্রতীচ্য সভ্যতার স্বাদ পেল বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণী মূলত গঠিত ছিল নতুন গড়ে ওঠা ভূস্বামী, মধ্যস্বত্বভাগী কিছু মানুষ, আইনজীবী শিক্ষাবিদ ও অন্যান্য জীবিকাশ্রয়ী ক্ষুদ্র এক ইংরেজিনবিশ শিক্ষিতের দল। তাঁরাই হয়ে উঠলেন নবজাগরণের নির্মাতা। অথচ ইতিহাসের পরিহাসেই তাঁরা মুখোমুখি হলেন এক অবশ্যম্ভাবী বৈপরীত্যের। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আগ্রহ হল সীমাহীন, কিন্তু তাঁদের কাজের পরিসর হল গণ্ডিবদ্ধ। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার শরিক তাঁরা কোনোভাবেই হতে পারলেন না অথচ তাঁদের কর্মোদ্দীপনা হল ব্যাপক। তাই তাঁরা খনন করে নিতে বাধ্য হলেন নিজেদের প্রয়োজনীয় পথ এবং তা হল সমাজ সংস্কারের নিবিড় অনুশীলন। একটু নিবিষ্ট লক্ষ্যই উদ্ভাসিত করবে যে বাংলার নবজাগরণের মূল আলম্বন ছিল ধর্ম নিয়ে নতুন ভাবনা সতীদাহ প্রথা বিলোপ, বহুবিবাহ বন্ধ করা, বিধাবা বিবাহ প্রবর্তন বাল্যবিবাহ রোধ স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি প্রায় সকল মনীষী ছিলেন এ মহাপন্থার অবিস্মরণীয় খননকর্তা।

রামমোহন যখন ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে পাকাপাকিভাবে কলকাতাকে নির্বাচন করলেন, তখনো দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়নি। এমনকী, ইংরেজি শিক্ষার প্রধান প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজও ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। রামমোহন যখন শুরু করেলেন ইংরেজি শিক্ষার সমর্থনে কার্যক্রম, হলেন সতীদাহপ্রথা বিলোপের অগ্রদূত, তখনো নব বিন্যস্ত বাঙালি সমাজ সাধারণভাবে তাঁর অভিপ্রায় সম্যক অনুধারণে সক্ষম হয়নি। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইন চালু হতে অবশ্য তাতে বাধা পায়নি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়েছিল মসৃণভাবে, ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে এসেছিল প্রচলিত হিন্দু ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রক্রিয়া তবুও সমাজ সংস্কারের ব্যাপকতা তখনো ছিল অনায়ত্ত। তার জন্য দরকার ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্মচঞ্চল প্রতিভা। গত শতকের পাঁচের দশকে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব তাই এক যুগান্তকারী সংঘটনা।

রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে, নারীকেন্দ্রিক। আগেই বলা হয়েছে, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, বিধবা বিবাহ প্রর্বতন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরোধিতা, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি ছিল এ সকল যুগন্ধর পুরুষদের প্রধান কর্মপ্রবাহ। এদের মধ্যে কোনটি সার্থক হয়েছিল আবার কোনটি পৌঁছাতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত আভিপ্রায়ে এবং এ

সফলতা বা ব্যর্থতায় ছিল সময়ের কোন্ চাপ সেকথা বিশ্লেষণের অবকাশ এখানে নেই। আমরা শুধু লক্ষ্য করব, উনিশ শতকীয় আন্দোলন ব্যাপকভাবে নারীদের প্রতি সমাজের মনোনিবেশ কি ধরনের ঋজু এক বৈচিত্র্যময় উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিল। সমাজ মনস্তত্ত্বের এ নিষ্কাশিত চেহারার সমর্থ প্রতিফলন ঘটেছিল উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে।

বাংলা সাহিত্যের গুণগত পরিবর্তন এল মূলত মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র ও বিহারীলালের শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে একথা নতুন করে বলবার দরকার নেই। মহাকাব্য ও নাটকে মধুসূদন, উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতিকবিতায় বিহারীলাল আমাদের সাহিত্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন আধুনিকতার প্রশস্ত রাজপথে। প্রসঙ্গত আরো কিছু সাহিত্যিক আসতে পারেন আমাদের আলোচনার এ পরিধিতে। কিন্তু এখানে এত বিস্তৃত ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে শুধু বলতে চাই উল্লিখিত ত্রয়ী রূপদক্ষের সাহিত্য সাধনায় বহুধামুখী বিকাশের পরিচয় পাওয়া গেলেও একটি বিষয়ে সকলেই একটি সাধারণ সত্যকে ব্যক্ত করেছিলেন এবং সে সত্যটি হল তাঁদের ভাবনার বৃত্তের কেন্দ্রে রয়ে গেছে নারী জাতির প্রতি একটি অসামন্য শ্রদ্ধাবোধ। এমনকী, এ শ্রদ্ধাবোধকে হয়তো বা সুমধুর পক্ষপাতিত্ব বলা যায়।

প্রথমেই বলা যাক মধুসূদনের কথা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে নাটক রচনাব মধ্য দিয়ে। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা' লেখা ও মঞ্চস্থ হয় যথাক্রমে ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে। তারপর দু বছরেব মধ্যে তিনি লেখেন আরো দুটি নাটক—'পদ্মাবতী' (১৮৫৯) ও 'কৃষ্ণকুমাবী' (১৮৬১)। তার প্রথম কাব্য হল 'তিলোত্তমা সম্ভব' (১৮৬০)। তারপর 'ব্রজাঙ্গনা' (১৮৬০) 'মেঘনাদবধ' (১৮৬১) ও 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) লেখা হয়েছিল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে তিনটি নাটকেরই কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনজন নারী এবং তাদের নামেই রচনাগুলি চিহ্নিত হয়েছে। কাব্য রচনাতেও একই মানস প্রক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটেছে। 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাদ দিলে তিনটি কাব্যগ্রন্থই নারী নামাঙ্কিত। এ সংঘটনার সংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রেরণা অবশ্যই সেকালীন মনীষীর মননে কাজ করেছিল বলে গৃহীত হতে পারে। গত শতকেব পাঁচের দশক ছিল প্রধানত বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের তরঙ্গে উত্তাল। আগেই বলা হয়েছে, বিদ্যাসাগরে প্রাণিত আন্দোলনের মুখ্য অংশই ছিল নারীকেন্দ্রিক। তিনি যে শুধু সমাজ ভাবনার প্রবর্তক ছিলেন তাই নয়, সাহিত্য কর্মেও তাঁর বিচবণ ছিল নারীকে তার সঠিক অবস্থানে প্রতিষ্ঠার ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁর 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' রচনা দুটির উৎস সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য হলেও তিনি তাঁর বিন্যাসে যে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছিলেন তাতে ব্যাপক অর্থে নারীর প্রতি মমতা ও অনুরাগের প্রমাণ রয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্যকর্মে এভাবনারই মৌলিক ও উন্নতর শিল্পরূপের প্রসারণ ঘটেছে। 'বীরঙ্গনা'তে তো বটেই, এমনকী 'মেঘনাদবধ কাব্য'ও সীতা ও সরমা এবং সর্বোপরি প্রমীলায় উচ্ছাভিত আত্মপ্রকাশে সমকালীন নারীর প্রতিষ্ঠা ও সমর্থতাই প্রমাণিত হয়েছিল।

মধুসূদনকে পেরিয়ে আমরা যখন পৌঁছই বঙ্কিম সমীপে, তখন আরো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ দেখি তাঁর রচনা সমুহে। তাঁর সাহিত্য জীবনের গোড়ার পর্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে গাই মধুসূদনের মতোই তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাস নারী নামাঙ্কিত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পেয়েছিলেন 'দুর্গেশনন্দিনী', তাঁর প্রথম উপন্যাস। এখানে জগৎসিংহ অথবা বীরেন্দ্র সিংহের তুলনায় অনেক বেশি প্রাখর্য দুর্গেশনন্দিনীদ্বয় তিলোত্তমা ও আয়েষায়। 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর, শুধু এক প্রেমিক মহিলার উচ্চকণ্ঠে ব্যক্তিগত ঘোষণা ছিল না, ছিল যুগের প্রাণনা থেকে মন্থন করা নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সামগ্রিক স্বর। বঙ্কিম মননের এ নারীকেন্দ্রিকতা অতঃপর 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' ছুঁয়ে প্রসারিত হয়েছে 'দেবী চৌধুরাণী' পর্যন্ত। বিষবৃক্ষ ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ঘটেছে তারই এক ভিন্নতর বিস্তার। বিহারীলালের কাব্য তো নারীমনস্ক হতে বাধ্য, কেননা রোমান্টিক কবিদের কাছেই ঘটে থাকে নারী সৌন্দর্যের নিষ্কাশিত অনুরাগ প্রকাশ। তাঁর 'সারদা মঙ্গল' চিরন্তন নারীত্বেরই আদর্শায়িত ও অনুভবী অভিব্যক্তি। সমকালীন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার যখন লেখেন 'মহিলা' কাব্য তা অসম্পূর্ণ থেকে গেলেও যুগের অভিপ্রায়কে যেন একটা পূর্ণতা দিয়ে যায়।

ছয়

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সাহিত্যে বারবার নানারূপে দেখা দিয়েছে বিচিত্ররূপিনী নারী। তারই সারাৎসার যেন প্রকাশিত হয়েছিল এ কবিতায়,

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া। (আহ্বান। পূরবী কাব্য)

এ অহংকাব রবীন্দ্রনাথকেই মানায়। 'দেখা না দেখায় মেশায়' যে বিদ্যুৎলতা একজন ধ্যানী কবির মননে অন্তরঙ্গে সঞ্চরণ করলে তার অভিব্যক্তি এমন প্রত্যয়ী হওয়াই সম্ভব। রবি অনুরাগিণীদের মধ্যে একজনের সঙ্গে স্বচ্ছ আলাপচারীতে রবীন্দ্রনাথ স্ফূর্ত স্বীকারোক্তি করে বলেছিলেন তাঁব সারা সাহিত্য জীবনে নারীকে তিনি কত বৈচিত্র্যময় বাস্তব ও কল্পনায় প্রকাশ করেছেন। এ ভাবনারই আশ্চর্য রূপকথা ধ্বনিত হয়েছে এ বাণীতে—

মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারই অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে মনে,
পূ... করেছে আমাকে, আমাব বাণীকে।
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপ শিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে
দেখেছি তাকে বসন্তের পুষ্পপল্লবের প্লাবনে,
শিশুগাছের কাঁপন লাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্রকণা
তার মধ্যে শুনেছি তাঁর সেতারের দ্রুত ঝংকৃত সুর।
দেখেছি ঋতুরঙ্গ ভূমিতে
নানা রঙের ওড়না-বদল করা তার নাচ
ছায়ায় আলোয়।

(১৫ নং কবিতা, পত্রপুট)

আবার এ নারীই বুঝি তাঁর কাছে থেকে যায় 'চির-অচেনা পরদেশী।' রবীন্দ্র ভাবনার এ বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়েছিল নারীর দ্বিবিধ রূপ কল্পনায়—উর্বশী ও লক্ষ্মী। 'রাতে ও প্রভাতে'। কবিতায় যার প্রারম্ভিক প্রস্ফুটন, তাকেই তত্ত্বরূপে বিকশিত হতে দেখা যায় 'দুই বোন' উপন্যাসে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে আছে তারই সমানুপাতিক অভিব্যক্তি এসব বাক্য সমূহের মধ্যে—

নারীর এক বিশ্বরূপ . . . অপবিত্রের কলঙ্কে যে নারী আপনাকে গ্রহণ করিয়াছে পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুরাপাত্র পূর্ণতর করিল।. . .

নারীর আর এক বিশ্বরূপ . . . যে নারী মৃত্যুর কেহ নয় সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর . . . সে কিছুই ফেলিতে চায় না . . . '।

এ ভাবনার যেন ভিন্নতর রস প্রতিমা চিত্রাঙ্গদার সংলাপ,

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্য রমণী।

পূজা করি রাখিবে মাথায় সেও আমি
নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নাই। যদি পার্শ্বে রাখ
ঘোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তব পরিচয়।

ত্রিশ বছর বয়সে লেখা এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে নারী সম্পর্কিত চিন্তার যে নক্ষত্ররূপ প্রকাশ করেছিলেন পরবর্তী জীবনব্যাপী সাহিত্যকর্মে যেন ঘটেছে তারই সম্প্রসারণ। চোখের বালি বাংলা উপন্যাসকে যেন আধুনিকতায় প্রোথিত করেছিল বিনোদিনীর যন্ত্রণা-বিদ্ধ বিশ্লেষণে সুচরিতা, দামিনী, বিমলা, কুমুতে ঘটেছে তারই বৈচিত্র্যময় বিকাশ। নিরুপমার অসহায়হীন আত্মসমর্পণ থেকে মৃণালের তেজোদম্ভ সঞ্চরণ, মহামায়ার বিদ্যুৎগর্ভ প্রতিবাদ থেকে সোহিনীর উচ্চকণ্ঠ প্রচার যেন আমাদের চেনা অচেনা সমাজের সমারোহপূর্ণ এক আশ্চর্য চলচ্চিত্র। উত্তরৈবিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে, তার অসামন্য শৈল্পিক প্রতিফলন তাঁকে বলিষ্ঠ ও প্রীতিময় আন্তর্জাতিকায় ঋদ্ধ করে তুলেছে।

সাত

আগেই বলা হয়েছে এ সংকলনে গ্রথিত হয়েছে ষাটটি গল্প। সংকলন শুরু হয়েছে সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প দিয়ে। তারপর লেখকদের কালক্রম মেনে পরিবেশিত হয়েছে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুজয় রায় পর্যন্ত প্রবীণনবীন, গল্পকারদের প্রতিনিধিত্ব মূলক লেখা। নির্বাচনে লক্ষ্য রাখা হয়েছে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় নারীপ্রকৃতির দিকে। মাধুর্য ও কটুত্বে, প্রেম ও হিংসায়, অনুরাগ ও ঈর্ষার, লোভে ও প্রতিহিংসায়, ভালবাসা ও ছলনায় অভিমানে ও বিরূপতায়, হাসিকান্না আসক্তি ও বিদ্রূপে নারী চরিত্রের যত ধরণের প্রকাশ হতে পারে, তারই একটি সংকলন এ বই। অবশ্য একথাও সত্য যে মাত্র ষাটটি গল্পের সীমাবদ্ধতার নারী প্রকৃতির অজস্রতাকে ধরা অসম্ভব। কেননা কবি নিজেই বলেছেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'

গত একশ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা গল্পের বিবর্তন একটি সরলরেখা অনুসরণ করেনি স্বাভাবিক কারণেই। সমাজ প্রতিষ্ঠান ও অর্থনীতির বাঁক বদল বাঙালি মননের পরতে পরতে হলকর্ষণ করে গেছে, তারই অভিঘাতে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিপ্রায় তরঙ্গিত হয়েছে। 'মহামায়া' লেখা হয়েছিল ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে (ফাল্গুন ১২৯৯)। সংকলনের শেষ গল্প সুজয় রায়ের শরীর জামিন গল্প বিশ শতকের নয়ের দশকে লেখা। সে হিসেব যে একশ বছরের বেশি সময়সীমাকে যথাসম্ভব দুইপ্রান্তে মেলানোর চেষ্টা হয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের শেষ দশক বিস্তৃত সময়ে ঘটেছে নানাধরনের পালা বদল। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৯০৬-এ মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা ১৯১২ তে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে আপসারণ,* ১৯১৪-১৮ র প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লব, ১৯১৫-র পর থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির অলৌকিক উত্থান, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি ক্রান্তিকারী ঘটনা বাংলা সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে ওলটপালট করে দিল। এর পাশাপাশি ছিল ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও সশস্ত্র সংগ্রামীদের বিপ্লবী প্রয়াস। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), ভারত ছাড় আন্দোলন, মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশভাগ বাঙালি জীবনের কাঠামো ও আন্তর সত্তায় গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এল। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও ১৯৫০-এ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির ঘরকে কতটা পূর্ণতা ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন ঘনিয়ে উঠল। তারপর গত অর্ধশতক

ধরে আমাদের জীবনপ্রবাহ যে উচ্চাবচতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে, তার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কিন্তু এ দুর্গতি ও প্রগতির অভিযাত্রা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বাংলা যখন ভাগ হল ১৯৪৭-এ, সৃষ্ট হল একটি নবরাষ্ট্র। একই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও তার রাজনৈতিক সত্তা আলাদা হল। তখন অনেকেই বলেছিলেন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান বেশিদিন টিকবে না। এ ধারণাকে প্রমাণ করেই প্রতিষ্ঠিত হল 'বাংলাদেশ' মাত্র পঁচিশ বছরের মধ্যে। দুই বঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতির মধ্যে এক অদ্ভুত মিল ও অমিল নির্মিত হতে লাগল। ত্রিপুরাও ভারতের এক প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত থেকে দেশের মূল স্রোতের সঙ্গে যুক্ত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে চাইল। এ উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে তিনটি অঞ্চল যে সকল সাংস্কৃতিক আইডেনটিটি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হল তার মূল আলম্বন হল বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এ সংকলনে তারই প্রতিফলন যাতে ঘটে তার প্রয়াস করা হয়েছে।

সংকলিত গল্পগুলোর যে দশক অনুযায়ী অথবা আন্দোলন অনুসারি হিসেবে সাজানো হয়েছে তা নয় তবে সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মানসের বিচিত্রতা কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে তাকে এখানে অনুসরণ করার চেষ্টা যথাসাধ্য হয়েছে। ব্যক্তি ও সমাজের মনস্তত্ত্ব উনিশ শতকের উপান্তে যা ছিল, বিশ শতকের অন্তিম লগ্নে অবশ্যই তা ছিল না। বিশেষ করে স্বাধীনতা ও দেশভাগে বাঙালি জীবনে যে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার নান্দনিক প্রকাশ ঘটেছে বাংলা সাহিত্যে। পঞ্চাশের দশক উঠে এলেন যে একঝাঁক তরুণ লেখক, ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন থেকেও তাঁরা সাহিত্যে আনলেন এক নতুনতর বিন্যাস। তাঁদের অনেকেই দেশভাগের পর পুব বাংলা থেকে এ বাংলায় চলে এসেছিলেন কৈশোরে। পুব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাহিত্যেও নতুন সৃষ্টিশীলতা বৈভব অলক্ষ থাকেনি।

এ আলোচনায় প্রতিটি গল্প ধরে তার অন্তর লক্ষ্মণ বিশ্লেষণ করা হয়নি। পরিণত পাঠককুল এসব গল্পের নানাধর্মী আবেদনকে অক্লেশে অনুধাবনে সক্ষম বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শুধু একটি কথা বলতেই হবে যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে বাঙালির যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্ব তারই একটি মানচিত্র সম্ভবত ফুটে উঠবে সংকলিত গল্পসমূহের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় আংলকারিক সাহিত্য বিচরে নব রসের যে নীতিনির্ধারণ করেছিলেন, আধুনিক কালের সাহিত্যিকদের হাতে তা অভিনব রস হয়ে উঠেছে। ধনী তথা উচ্চবিত্ত সমাজ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত জীবন ছুঁয়ে সাহিত্যিকরা অস্পষ্ট আলোকপাত করেছেন 'পিছড়ে বর্গ' (সাব অলটার্ন) মানুষদের ভালমন্দের উপর। বাংলা সাহিত্যে এ বিবর্তনের রূপরেখাটি যথাসাধ্য প্রতিফলনের প্রয়াস ঘটেছে এ সংকলনে।

বন্ধুবর প্রফুল্ল রায়ের আগ্রহ ও পরামর্শ ছাড়া এ সংকলন সম্ভব হত না। তাছাড়া অশোকুমার মিত্র নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তিস্তা মুখোপাধ্যায় লেখক পরিচিতি লিখে দিয়ে আমার শ্রম কমিয়েছেন। অবশ্য এঁদের প্রতি ধন্যবাদ জানানোর দরকার নেই। কেননা সকলেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রিয়জন।

রবীন্দ্রনাথের 'মহামায়া' গল্পের জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য লেখক ও স্বত্বাধিকারীগণ গল্প প্রকাশে অনুমতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে যাঁদের সঙ্গে গল্প প্রকাশের অনুমতি জন্য যোগাযোগ করতে পারিনি, তাঁদের কাছে আমাদের আন্তরিক ত্রুটি স্বীকার করে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

ড. বিষ্ণু বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহামায়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোনো কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম এই, তুমি কী সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ। আমি এ পর্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে, তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোনো-কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল, "আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালাইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে-কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে-কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে-ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলংকার, এমন-কি অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল—আরও দুটো-পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ-একটু নরম করিয়া আনিবে, তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্বোধ লোকটা সুদ্ধ কেবল বলিল, "চলো আমরা বিবাহ কবিগে!"

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচাসোনার প্রতিমা—সে রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই, বড়ো ভাই আছেন—তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাইবোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মতো নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটি বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড়োসাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণপোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটির কুঠিতে লইয়া আসেন। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইঁহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোলো, সতেরো, আঠারো, এমন-কি উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙালির ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুশি হইলেন ; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারীবয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে-দেবতার কার্য তিনি যদিও এই নরনারীযুগলের প্রতি

এযাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো-চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া তোলে।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙা মন্দিরে আনিতে কৃতকার্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যতকিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে হয় আমরণ সুখ নয় আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সংকটের দিনে রাজীব কেবল কহিল, "চলো, তবে বিবাহ করা যাউক।" এবং তার পরে বিস্মৃতপাঠ ছাত্রের মতো থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দিষ্ট করুণধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্ধসংলগ্ন ভাঙা কবাট এক একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ অতিস্বর সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল ; — মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্ বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুলগাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোকরা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্যে দিয়ে গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্ করিয়া উঠে এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎ ছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এই-সমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া এক-প্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতো নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর-একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত, মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর-কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কত কাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মতো অকুলীন ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে। ভালোবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া বুঝিতে পারিল, তাহার নিজের বিবেচনাহীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্ধা বাড়িয়েছে ; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল, "আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কী আবশ্যক। কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন।"

রাজীব কহিল, "আমার সাহেব এখান হইতে সোনাপুরের কুঠিতে বদলি হইতেছেন. আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।"

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল, দুইজনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দি করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল, "আচ্ছা।" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ গমনোদ্যত হইতেছে, এমনসময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "চাটুয্যেমহাশয়।"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা

করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল—আর, রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন, "এইটে পরিয়া আইস।"

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চলো।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমন-কি সংকেতও কেহ কখনো অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান-অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল ; মহামায়া বুঝিল, এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্র প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যেদিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেইরূপ হইল না। এমন-কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে-ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর-একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একেবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধুম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদলি হইয়া সোনাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে, "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।" সে-কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাতত এক মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস—এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মতো ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমনসময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়ঝড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনোরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তি প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশপাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোমটা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?"

মহামায়া কহিল, "হাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর-সমস্তই তুচ্ছ জ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল, "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিয়ো—আমাকে ছাড়িয়া গেলে, আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল, "তবে এখনি চলো—তোমার সাহেব যেখানে বদলি হইয়াছে, সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা কিছু ছিল, সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমনি ঝড় যে দাঁড়ানো কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মতো গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙিয়া পড়িবার ভয়ে, পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাতপা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি অরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাতদুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া, মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কী ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া অদূরবর্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কী ঘটিল পাঠকের আগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানিমাত্র ঘোমটার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোমটাটুকু মৃত্যুর ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদবেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোমটার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোমটার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোমটাচ্ছন্ন মূর্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষত মহামায়া পুরাণবর্ণিত কর্ণের মতো সহজকবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর-একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরও একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে। অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এতদূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডির বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য

ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল, অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জিত রূপার পাতের মতো ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মানুষ এরকম সময় স্পষ্ট একটা কোনো কথা ভাবে কিনা বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোনো দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মতো একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মতো একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব কী ভাবিল জানি না কিন্তু তাহার মনে হইল, আজ যেন সমস্ত পূর্ব নিয়ম ভাঙিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়। চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল, এইবার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা করো।"

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া, মুহূর্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুরসুন্দরী

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের উপদেশ-মধ্যে পেয়েছিলুম—"তোমার মাথা ধরেছে, এ কথা কাকেও বলতে যেও না ; কারণ, সে বলার কোন সার্থকতা নেই। তোমার মাথা ধরেছে তো অপরের কি? ও-কথা শোনবার তরে কেউ উৎসুকও হয়ে নেই, তাতে কারও সমবেদনা পাবে না ; কারণ, বেদনাটা তোমার মাথার—অপরের মাথার নয়।" ইত্যাদি।

কথাটা বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক হলেও, হিসেবী লোকের কথা,—ফেলে দিতেও পারি নি ; তাই, যে জায়গাটায় মাথা ধরে, সেও তারই এক পাশে বাসা বেঁধেই ছিল।

* * * *

১

তাঁকে আমাদের গ্রামের মেয়েরা রাজার মেয়েই বলত। আমাদের দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁর এক অদূর-সম্পর্কের ভাই থাকতেন ; তাই কখনও কদাচ তিনি এলে গ্রামের মেয়েরা তাঁকে দেখতে পেত।

পুরসুন্দরী ছিলেন—সেকেলে সদরওলার (সব-জজের) মেয়ে। সুন্দরী তো ছিলেনই, তার ওপর হীরের বালা হাতে দিয়ে, মুক্তোর মালা গলায় পরে তিনি আসতেন, সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে দুপুরবেলা মেয়েদের মধ্যে তাঁকে দেখতে যাবার একটা ছুটোছুটি পড়ে যেত। তারপর মাসখানেক ধরে তাদের মুখে তাঁর গয়নার বর্ণনা ফুরুত না। শেষে সেটা জমাট বেঁধে দাঁড়াত—"যেন রাস-গাছ"!

২

তারপর—কোনও বাধা না মেনে, কারুর মুখ না চেয়ে, বারো বছর চলে গেছে। পুরসুন্দরীর সে বারো বছরের ইতিহাস জানবার তরে আমাদের গ্রামের মেয়েদের কোন দরকারই ছিল না। কেবল ইতিপূর্বে তিনি যখন আসতেন,—তাঁর রূপ, অলঙ্কার আর ঐশ্বর্য দেখে কেউ কেউ ভাবত বটে, তাদের জন্মটাই মিছে, এমন জন্ম না হলেই ভাল ছিল,—পোড়ারমুখো দেবতাদের যেন আর কাজ ছিল না!

ইতিমধ্যে স্বর্গের চোরে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—স্বামীকে নিয়ে গেছে। মর্ত্যের চোরে তাঁর হীরা-মুক্তাদি হরণ করেছে ; তাঁর কত আদরের মেয়ে গিরিবালা বিধবা হয়ে থান পরেছে। দুর্দৈব—এই শেষের ঘটনাটির ওপর তাঁর দুর্দিনের আর চরম দুঃখের জয়পতাকা এঁটে দিয়ে জয়ী হলেও, তাঁকে কোন আত্মীয়ের বা জ্ঞাতির দ্বারস্থ করতে পারে নি। তিনি আধপেটা খেয়েও স্বামীর ভিটে ছাড়েন নি।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের তাঁর পূর্বকথিত ভায়ের সন্তানাদি ছিল না ; তাই তাঁর বিশেষ আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে গিরিবালাকে তাঁর সংসারে পাঠাতে পুরসুন্দরী আপত্তি করেন নি বটে, কিন্তু, তার প্রধান কারণ ছিল—তাকে চোখের আড়াল করা। অতিবড় আদরের জিনিসের জীবনব্যাপী যাতনা চোখে দেখার চেয়ে, লোকে তার মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে থাকে,—এটাও সেই হিসাবে।

অবস্থান্তরের পর এই তাঁর প্রথম গ্রামান্তরে আসা। তিন-চার বিঘে জমি যা অবশিষ্ট ছিল, তার খাজনা দিতে হবে। একাদশীতে পেটের চেষ্টা না থাকায়, টাকার চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন। নিমতের উদ্ধব কৈবর্তের কাছে সাত সিকে পেতেন, তাই আমাদের সব-জজের মেয়ে সাত কোশ হেঁটে কাল নিমতেয় গিয়েছিলেন।

আজ সকালে খানকতক শশার কুচি, একটু গুড় আর একপেট পুকুর-জল খেয়ে ফিরছিলেন।

বেলঘর না পেরুতেই ভেদবমি আরম্ভ হয় ; একটা পুকুর-ধারে শুয়ে পড়েন। বেলা তিনটের পর বুঝলেন, এতদিনে স্বামী ডাকলেন। তখন কষ্টে মাথায় দু হাত ঠেকিয়ে, চোখ বুজেই বললেন, "ভগবান, সুখ দিয়েছিলে, ভোগ করেছি ; দুঃখ দিয়েছ, মাথা পেতে নিয়েছি ; তোমা ছাড়া কারুকে কিছু জানাই নি ; তাই আজ তোমাকেই জানাই,—সকল পাওয়াই হয়েছে, যেন গঙ্গা পাওয়াটি থেকে বঞ্চিত না হই! সে উপায় তুমি না করে দিলে আমার আর কে আছে ঠাকুর?" বলতে বলতে সেই তেজস্বিনীর এতদিনের রুদ্ধ-অশ্রু দু চোখ বেয়ে ভূমি স্পর্শ করলে।

বেলঘরের বাদল গাড়োয়ান ঘোড়াকে জল খাওয়াতে পুকুর নাবছিল। সব কথাগুলোই তার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণে পৌঁছল। সে থমকে দাঁড়িয়ে ভিজে গলায় জিজ্ঞেস করলে, "মা, আপনি কোথা যাবে?"

পুরসুন্দরী চোখ চেয়ে দেখলেন, পুরুষমানুষ। মাথায় একটু কাপড় টেনে আর গায়ের কাপড় যথাসম্ভব সামলে বললেন, "বাবা, মা গঙ্গা এখান থেকে কতটা?"

বাদল।—বেশি নয় মা, কোশটাক্। আপনি কোথায় যাবে বল না?

পুরসুন্দরী।—উপায় হলে দক্ষিণেশ্বরের মোড়লদের ঘাটে যাই, কিন্তু আমার তো একপা যাবারও বল নেই বাবা!

বাদল।—এই ওপরেই আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে মা, ঘোড়া দুটোকে জল খাইয়ে নিতে যা দেরি।

এই বলেই সে ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাড়ি জুড়ে ফেললে। কিন্তু পুরসুন্দরী দাঁড়াতে পারলেন না। তখন ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন, বললেন, "তোমার কাছে আর তো কিছু চাইতাম না, এই যে আমার শেষ চাওয়া ছিল গো—"

সেই পুকুর-পাড়েই বাদলের বাড়ি। সে পরিবারকে ডেকে এনে তার সাহায্যে কোন প্রকারে পুরসুন্দরীকে তুলিয়ে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে। পুরসুন্দরী প্রায় অজ্ঞান ভাবেই রইলেন। গাড়ি যখন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এসে থামল, তখন বিকেল পাঁচটা।

বাদল যখন বললে, "মা, ঘাটে এসেছ" তখন তাঁর সংজ্ঞা হল ; গঙ্গাপানে চেয়ে দু হাত জোড় করে মাথায় ঠেকালেন। মনে যেন একটা চরম লাভের আনন্দ আর বল এল,—নাববার তরে চঞ্চল হলেন ; কিন্তু হাতে পায়ে খিল ধরতে লাগল।

এই সময় হিমি-পাগলী গঙ্গা থেকে এক কলসী জল নিয়ে আসছিল, সে হাঁ করে থমকে দাঁড়াল।

হেমাঙ্গিনী আমাদেরই পাড়ার বউ। শোকে আর দুঃখ-দৈন্যে এক-রকম হয়ে গিয়েছিল। চুপ করেই থাকত, আর নিজে নিজেই হাসত, কাঁদত, কথা কইত ;—উগ্রা ছিল না। সবাই তাকে হিমি-পাগলী বলতে শুরু করেছিল।

বাদল তাকে বললে, "মার অসুখ, নামতে পারছেন না, আপনি একটু ধরতে পারবে?"

হিমি হেসে বললে, "ওমা, তা পারব না কেন,—আমাকে কি কেউ কিছু করতে বলে!" এই বলে কলসী নাবিয়ে রেখে "এস মা, এস" বলে, দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেল। দেখে, পুরসুন্দরীর মুমূর্ষু মুখেও হাসি এল। তিনি বললেন, "তুমি দাঁড়াও মা, আমি তোমাকে ধরে নাবি।"

হেমাকে ধরে নাবতে নাবতে, বাদলের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আজ অসহায় না হলে, আমার যে কত ছেলেমেয়ে, তা জানতে পারতুম না। বলতে বলতে চোখ থেকে ঝরঝর করে দুটি ধারা মুখে বুকে নেবে পড়ল।

আর তিনি দাঁড়াতে পারলেন না, পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। গঙ্গাবাসীর ঘরে—মাটির ওপর শুয়ে পড়লেন। বাদল আবিষ্টের মত তখন দাঁড়িয়ে। একটু সামলিয়ে বললেন, "বাবা, তোমার ধার জন্ম নিয়েও শুধতে পারব না, আমার আঁচলে সাত সিকে—"

বাদল আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলে।

হেমা বললে, "ওমা, মাটিতে শোবে নাকি? আমার চেয়েও বড় হলে যে!"

সব কথা তিনি আর শুনতেও পাচ্ছিলেন না, বুঝতেও পারছিলেন না ; বললেন, "চাটুয্যে-পাড়ায় আমার গিরি থাকে, একবার খবর দিবি মা?"

হিমি-পাগলী হাঁ করে তাঁর মুখের ওপর তাকিয়ে বললে, "তুমি গিরির মা? ওমা, কি হবে গো! পোড়ারমুখো দেবতারা কি সব মরেছে!" এই বলেই ছুটল। তার জল-শুদ্ধ কলসী আকাশ-পানে চেয়ে রাস্তায় পড়ে রইল।

৩

আমাদের গঙ্গার ঘাটটি দাতারাম মোড়লের ঘাট বলেই প্রসিদ্ধ। তার প্রবেশ-পথের দু ধারেই—গঙ্গাযাত্রীর বা গঙ্গাবাসীর ঘর। দ্বিতলেও একটি সুন্দর ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত নূতন বা হালের তৈরি। আমরা সেইটি দখল করে রিডিং-ক্লাব ও লাইব্রেরি করেছি। তখন আমাদের তরুণ-দলের সে কি উৎসাহ!

সেটা—এখনকার সার্ (Sir) আর তখনকার বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের যুগ ; সুতরাং বুঝি না-বুঝি বার্ক, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বড় বড় ইংরেজী বই পড়বার বা নাড়াচাড়া করবার ঝোঁক খুবই। আমাদেব মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ইংরেজীতে দু কথা বলতে পারেন, তাঁর পায়া খুবই উঁচু। বাংলা বইয়ের মধ্যে—হেমবাবুর কবিতা, পলাশীর যুদ্ধ, যোগীন বিদ্যাভূষণের গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাজিনি, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি পুস্তকেরই

আদর ও পাঠক বেশি। এসব প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা হলেও, সেইটাই দেশের চিন্তার, স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষের দিন ; তবে ধারাটা পুরো ইংরেজীই ছিল।

আবার ইংরেজী শেখা ভদ্রেরা তখন কেউ গভর্মেণ্টের ছাপাখানায়, কেউ জর্জ-হেণ্ডারসন, মেকিনান্ মেকিঞ্জি প্রভৃতি সওদাগরী আপিসে তাঁবেদারি নিয়েছেন। কাজেই তাঁরা গঙ্গার ঘাট ছেড়ে সন্ধ্যা করেন আপিসে, আর বন্দনা করেন অফিসারের,—গঙ্গাতীরের সে ভিড় ভেঙে গেছে। এখন ঘাটটির পুরো পাট্টা আমাদেরই হাতে পড়ায়,—নিঃসঙ্কোচে বৈকালী-বক্তৃতার বেগ বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। ছেলেরা তখন এক-একটি যেন ইংরেজী 'ইডিওমেটিক ফ্রেজের' ফোয়ারা!

হরিগোপাল সে দিন বক্তৃতা করছিল। বিষয় ছিল—মেকলে ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণ। বক্তৃতার মধ্যে যতই ফ্রেজের ফুলঝুরি কাটছিল, ছেলেদের বদন ততই প্রফুল্ল হয়ে উঠছিল। কার সম্বন্ধে এখন স্মরণ নেই, হরিগোপাল যখন ঘাড় দুলিয়ে বললে—"He was a literary abortion, a huge hyperbolic hypocrite,—and a black horse of Western Civilization"—শুনে স্ফূর্তিতে সকলেরই মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠল,—করতালির করকাপাত হয়ে গেল। সবারই মনে হতে লাগল, কালে হরিগোপাল দেশের একটা দিক্‌পাল দাঁড়াবে।

হরিগোপাল ছাড়া ক্লবের বাইরে দেখবার শোনবার কিছু থাকতে পারে, সেদিন সে হুঁশ কারুরই ছিল না।

এই সময় আমাদের বড় মাঝি মেঘনাদ এসে সংবাদ দিলে, "একটি ভদ্দর-ঘরের মা-ঠাকরুণ নীচে গঙ্গাবাসীর ঘরে মাটির ওপর পড়ে ঝ্যানো কইমাছ কাতরাচ্চে। আমরা তো কিছু করতে পাচ্চি না, তাই হুজুরদের জানাতে এলুম।"

শুনেই যোগীন আর নিবারণ "এস মেঘনাদ" বলেই দ্রুত চলে গেল।

আমরা ছাতে বেরিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে যেন গঙ্গাপার হবার জন্যে জটায়ু ডানা মেলছে—এমনিই মেঘের ঘটা! গঙ্গার ওপর তার ছায়া পড়ে জল ধূসরবর্ণ ধরেছে ; তখনও জোর হাওয়া দেয় নি। পালতোলা পান্‌সিগুলো বকের সারের মত নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটেছে। দৃশ্যটা তখন উপভোগ করবার মত মনও ছিল না, অবকাশও ছিল না। যারা দূরের আসামী তারা বাড়ি ছুটল ; কেবল আমরা দু-তিনটি তাড়াতাড়ি ক্লব-ঘরের দোর-জানালা বন্ধ করতে লেগে গেলুম। একটা যেন প্রলয় আসছে!

বন্ধ করে ছাদে দাঁড়িয়েছি, তখনও সেই মেঘের গম্ভীর ভাব, মন্থর গতি—সাড়াশব্দ নেই।

দেখি, হিমি-পাগলী এক বগলে একটা ছেঁড়া ময়লা বালিশ, আর এক বগলে তারই রাজযোটক—একটা মাদুর, তার খানিকটা ভুঁয়ে লুটুচ্ছে। মূর্তিতে আর বেশে সেও নিজে তাদের উপযুক্ত বাহকরূপে হন্তদন্ত হয়ে ঘাটের দিকে ছুটে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলুম, "এসব নিয়ে কোথায় ছুটেছ গা?"

হিমি হেসে ঘোমটা টেনে বউমানুষের মৃদু গলায় বলছে "ওমা, দেখ নি?—রাজকন্যে যে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্চে! আমার যা ছিল তাই কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্চি,—আর তো কিছু নেই। তখন তো কত লোক দেখতে ছুটত,—আজ তোমরা কেউ দেখবে না গা? আমার কি দাঁড়াবার সময় আছে,—বকতে পারি না বাছা।" এই বলতে বলতে সে দ্রুতবেগে ঘাটে ঢুকল।

নীচে থেকে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ ওপরে এসে পৌঁছল।

তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে দেখি, বামাচরণ একটা কুড়োনো ভাঙা কলসী করে গঙ্গা থেকে জল নিয়ে ছুটে এল। কিছু না পেয়ে, সেই ঘরে কার একটা পরিত্যক্ত নারকোল-মালা দেখতে পেয়ে, সেইটে একটু ধুয়ে তাইতে জল গড়িয়ে রোগীর শুষ্ককণ্ঠে ঢেলে দিলে,—রোগী যেন একটু আরাম বোধ করলেন।

একটি সুন্দরী যুবতী বুক-ভাঙা বেদনায় কেঁদে উঠল, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি,—মাকে মালায় করে জল দিও না গো!"

চেয়ে দেখি, আমাদের পাড়ার গিরিবালা। তবে তো হিমি পাগলী ঠিকই বলেছে—রাজকন্যে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই কি আমাদের বারো বছর পূর্বের সেই হীরের-বালা-পরা পুরসুন্দরী!

বিস্ময়ে বেওকুবের মত হয়ে গেলুম। এই রকমই হয় নাকি! এইটেই জগতের নিয়ম নাকি! প্রাণটা দমে গেল, এতটুকু হয়ে গেল। আমাদের তখন প্রখর যৌবন, অসীম আশা, উদ্দাম বাসনা। মুহূর্তের তরে বিশ্বাসটা যেন কালো হয়ে গেল,—'সবুজ' সরে দাঁড়াল,—পাতায় যার বাস, তার ভিতের ভরসা কতটুকু!

৪

মেঘনাদ একটি পিদ্দিম এনে জ্বেলে দিলে। সেটা মৃত্যু-উৎসবের উপযুক্তই ছিল। তার ঘুমভাঙা চোখের মত নিষ্প্রভ মিটমিটে শিখা,--ঘরটার কোথাও আলোর, কোথাও কালোর ছায়া ফেলে, ঘরের মধ্যিকার মনগুলোতে আড়ষ্ট ভাব আর আতঙ্ক এনে দিলে ;—রাজকন্যের মৃত্যুর ঘটাটাকে ঘনিয়ে তুললে। শিষটা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে গলা বাড়িয়ে দেখছিল—আর দেরি কত!

গিরিবালা মার বুকে মুখ গুঁজে পাষাণদ্রাবী কাতর কণ্ঠ তুলেছে। পুরসুন্দরীর তখন সর্ব শরীরে অসহ্য মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত। দশ বছর মুখ বুজে দারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করার—আজ তিনি শেষ পরীক্ষা দিচ্ছেন। পাছে তাঁর কষ্ট দেখে গিরিবালার কষ্ট হয়, তাই—সে কি বরদাস্ত, সে কি সংযম, মৃত্যুর সঙ্গে সে কি কস্তাকস্তি! সন্তানের মুখ চেয়ে, প্রতি মুহূর্তে এমন করে মরণের বিষদাঁত ভাঙতে এক মা-ই পারেন। বললেন, "ভাবিস নি গিরি, ভগবানের পায়ে রইলি।" বলতে বলতে স্বর বন্ধ হয়ে এল, দু চোখ জলে ভেসে গেল।

গিরিবালা চীৎকার করে কেঁদে উঠতেই, হাতড়ে হাতড়ে তার মাথায় হাত দিয়ে, কপালে মায়ের শেষ স্নেহহস্ত বুলুতে বুলুতে কষ্টে কম্পিত কাতরকণ্ঠে বললেন, "গিরি, কাঁদিস নি মা,—মাথা ধরবে।

শুনে চমকে উঠলুম।

বাতাস স্তব্ধ হয়ে, আকাশ বেদনা-বিষণ্ন মুখে গুম হয়ে এতক্ষণ সব সহ্য করছিল ; তারাও আর পারলে না। একটা দমকা দীর্ঘশ্বাসে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে, বিপুল বেদনায় আকাশটা বিকট একটা চীৎকার করে ফেটে গেল ; আর তা থেকে তীব্র আলো ছুটে এসে ঘরে ঢুকে সকলকে চমকে দিয়ে, আমাদের পুরসুন্দরীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

প্রমথ চৌধুরী

আহুতি

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয় নি ; অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। কাজেই কলকাতা থেকে বাড়ি যেতে অদ্যাবধি কতক পথ আমাদের সেকেলে যানবাহনের সাহায্যেই যেতে হয় ; বর্ষাকালে নৌকা, আর শীত-গ্রীষ্মে পাল্কিই হচ্ছে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই স্থলপথ আর জলপথ ঠিক উল্টো দিকে। আমি বরাবর নৌকাযোগেই বাড়ি যাতায়াত করতুম, তাই এই স্থলপথের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আমার কোনোই পরিচয় ছিল না। তার পর যে বৎসর আমি বি. এ. পাস করি, সে বৎসর জৈষ্ঠ মাসে কোনো বিশেষ কার্যোপলক্ষে আমাকে একবার দেশে যেতে হয় ; অবশ্য স্থলপথে। এই যাত্রায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল, তোমাদের কাছে আজ তারই পরিচয় দেব।

আমি সকাল ছটায় ট্রেন থেকে নেমে দেখি আমার জন্য স্টেশনে পাল্কিবেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল, তা বলতে পারি নে। কেননা চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তার পর বেহারাদের চেহারা দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্মসার মানুষ অন্য কোনো দেশে বোধ হয় হাসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাত-পায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ —উদর—অস্বাভাবিক রকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও অনুমানে বুঝলুম যে তার অভ্যন্তরে পীলে ও যকৃত পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে পড়ে গেল বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের 'যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্বতা' পীলে ও যকৃত নামক মাংসপিণ্ড দুটিকে পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসংগত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষপ্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন শক্তিহীন হতে পারে, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম ; এরকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের হিন্দুর বীরত্ব এই-সব দেহ আশ্রয় করেই টিকে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু—শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেননা শিকার এদের জাতব্যবসা। এরা বর্শা দিয়ে শুয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙিয়ে বাঘ বার করে ; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান পরা আমার দর্শনধারী সঙ্গী ভোজপুরী দরওয়ানটিকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

এই-সব কৃষ্ণের জীবদের কাঁধে চড়ে বিশ মাইল পথ যেতে প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিল। মনে হল, এই-সব জীর্ণশীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্যদের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য হবে। আমি পাল্কিতে চড়তে ইতস্তত করছি দেখে বাড়ি থেকে যে মুসলমান সর্দারটি এসেছিল, সে হেসে বললে, "হুজুর, উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি করলে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ি পৌঁছতে পারবেন না।"

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লাগবে, এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল, অবশ্য তা নয়। তবুও আমি 'দুর্গা' বলে হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাকবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লুম, কেননা তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে নিজের মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে যাত্রা করায় পাপ নেই। আমরা ধনীলোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই তো জীবনযাত্রা নির্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাকবে এবং থাকা উচিত—এই তো 'পলিটিকাল ইকনমির' শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কত-না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চলতে শুরু করল।

সর্দারজি আশা দিয়েছিলেন যে, হুজুরের কোনোই কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে 'দিলাশা' মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। কেননা হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্বে কখনো এতটা ব্যতিব্যস্ত হয় নি। পাল্কির আয়তনের মধ্যে আমার দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিল, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শালগ্রামের শোওয়া-বসা দুই এক হলেও মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের ভিতর যেটি হোক একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে অবিশ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙে বীরাসন ত্যাগ করে পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিল না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্তন করতে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একস্থানে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারতেন না, কেননা পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করবামাত্র পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিল। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মতো আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি করতে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্বে কখনো পাই নি ; কিন্তু অভ্যাসদোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করে নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়ি নি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম তখনো হারিয়ে বসে নি। বরং সত্য কথা বলতে গেলে, নিজ দেহের এই-সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গি দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিল। এই যাত্রার মুখে পূর্ব দিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল ; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নবজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন-মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। চারি দিকে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘর নেই দোর নেই, গাছ নেই পালা নেই, শুধু মাঠ—অফুরন্ত মাঠ—আগাগোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মতো বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগল। আমার মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝরে গিয়ে সে মন ঐ আকাশের মতো নির্বিকার ও প্রসন্ন রূপ ধারণ করলে—তার মধ্যে যা ছিল, সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, কেননা দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মতো বেড়ে উঠতে লাগল, আকাশ-বাতাসের উত্তাপ দেখতে দেখতে একশো পাঁচ ডিগ্রিতে চড়ে গেল। যখন বেলা প্রায় নটা বাজে, তখন দেখি বাইরের দিকে আর চাওয়া যায় না ; আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা-কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে তার অন্বেষণ করে এখানে-ওখানে দুটি-একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, এতে চোখের পিপাসা মিটল না, কেননা এ গাছের আর যে গুণই থাক্, এর গায়ে শ্যামল শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন পত্রহীন ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্তি ফুটে উঠল। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হল না। আমি একখানি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredithএর Egoist এনেছিলুম, তার শেষ চ্যাপ্টার পড়তে বাকি ছিল। একটানা দু-চার পাতা পড়ে দেখি তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চ্যাপ্টার হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। বুঝলুম পাল্কির অবিশ্রাম ঝাঁকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ করে পাল্কি-বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেইসঙ্গে বকশিশের লোভ দেখালুম। এতে ফল হল। অর্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিল, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে, গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বলতে পারি নে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা-সমান উঁচু পাড়ের উপর খান-দশবারো খোড়ো ঘর, আর-এক পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে ভিজে কাপড়েই চিড়ে-দইয়ের ফলার করতে বসল। পাল্কি দেখে গ্রামবধূরা সব পাড়ের উপরে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। এই পল্লীবধূদের সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেননা এদের আর যাই থাক্—রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি-বা কারো রূপ থাকে তো তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি-বা কারো যৌবন থাকে তো তা মলিন বসনে চাপা পড়েছে। এদের পরনের কাপড় এত ময়লা যে তাতে চিমটি কাটলে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রুপোর গহনা। এক জোড়া চুড় আমার চোখে পড়ল, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন এ কালের গহনায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙলার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য না থাক্, সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

ঘণ্টা-আধেক বাদে আমরা আবার রওনা হলুম। পাল্কি অতি ধীরে সুস্থে চলতে লাগল, কেননা ভূরিভোজনের ফলে আমার বাহকদের গতি আপন্নসত্ত্বা স্ত্রীলোকের তুল্য মৃদুমন্থর হয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে আমার শরীর মন ইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি সব এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আমি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করলুম। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদদুরে এবং পাল্কির দোলার প্রসাদে আমার তন্দ্রা এল ; সে তন্দ্রা কিন্তু নিদ্রা নয়। আমার শরীর যেমন শোওয়া বসা এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, আমার মনও তেমনি সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত

হয়েছিল। এই অবস্থায় ঘণ্টা-দুয়েক কেটে গেল। তারপর পাল্কির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি জেগে উঠলুম, সে ধাক্কার বেগ এতই বেশি যে তা আমার দেহের ষট্‌চক্র ভেদ করে একেবারে সহস্রারে গিয়ে উপনীত হয়েছিল। জেগে দেখি ব্যাপার আর কিছুই নয়—বেহারারা একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সোয়ারি সজোরে নিক্ষেপ করে একদম অদৃশ্য হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে সর্দারজি বললেন, "ওরা একটু তামাক খেতে গিয়েছে।"

যাত্রা করে অবধি, এই প্রথম একটি জায়গা আমার চোখে পড়ল যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে বট একাই একশো ; চারি দিকে সারি সারি বোয়া নেমেছে, আর তার উপরে পাতা এত ঘনবিন্যস্ত যে সূর্যরশ্মি তো ভেদ করে আসতে পারছে না। মনে হল, প্রকৃতি তাপক্লিষ্ট পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য একটি হাজার-থামের পান্থশালা সস্নেহে স্বহস্তে রচনা করে রেখেছেন। সেখানে ছায়া এত নিবিড় যে সন্ধে হয়েছে বলে আমার ভুল হল, কিন্তু ঘড়ি খুলে দেখি বেলা তখন সবে একটা।

আমি এই অবসরে বহুকষ্টে পাল্কি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে হাত-পা ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। দেহটিকে সোজা করে খাড়া করতে প্রায় মিনিট-পনেরো লাগল ; কেননা ইতিমধ্যে আমার সর্বাঙ্গে খিল ধরে এসেছিল, তার উপর আবার কোনো অঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল ; কোনো অঙ্গে ঝিনঝিনি ধরেছিল, কোনো অঙ্গে পক্ষাঘাত, কোনো অঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। যখন শরীরটি সহজ অবস্থায় ফিরে এল, তখন মনে ভাবলুম গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করে আসি। খানিকটে দূর এগিয়ে দেখি, বেহারাগুলো সব পাঁড়েজিকে ঘিরে বসে আছে, আর সকলে মিলে একটা মহা-জটলা পাকিয়ে তুলেছে। প্রথমে আমার ভয় হল যে, এরা হয়তো আমার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করবার চক্রান্ত করছে ; কেননা সকলে একসঙ্গে মহা-উৎসাহে বক্তৃতা করছিল। কিন্তু তার পরেই বুঝলুম যে, এই বকাবকি চেঁচামেচির অন্য কারণ আছে। এরা যে-বস্তুর ধূমপান করছিল, তা যে তামাক নয়—'বড়ো তামাক', তার পরিচয় ঘ্রাণেই পাওয়া গেল। এদের স্ফূর্তি, এদের আনন্দ, এদের লম্ফঝম্প দেখে গঞ্জিকার ত্বরিতানন্দ নামের সার্থকতার প্রত্যক্ষপ্রমাণ পেলুম। এক-এক জন কল্কেয় এক-এক টান দিচ্ছে, আর 'ব্যোম কালী কলকাত্তাওয়ালি' বলে হুংকার ছাড়ছে। গাঁজার কল্কের গড়ন যে এত সুডৌল তা আমি পূর্বে জানতুম না। গড়নে কল্কে-ফুলও এর কাছে হার মানে। মাদকতার আধার যে সুন্দর হওয়া দরকার—এ জ্ঞান দেখলুম এদেরও আছে।

প্রথমে এদের এই ধূম্রপানোৎসব দেখতে আমার আমোদ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরতে লাগল। ছিলেমের পর ছিলেম পুড়ে যাচ্ছে, অথচ দেখি কারো ওঠবার অভিপ্রায় নেই। এদের গাঁজা খাওয়া কখন শেষ হবে জিজ্ঞাসা করাতে সর্দারজি উত্তর করলেন, "হুজুর, এদের টেনে না তুললে এরা উঠবে না, সুমুখে ভয় আছে তাই এরা গাঁজায় দম দিয়ে মনে সাহস করে নিচ্ছে।"

আমি বললুম, "কি ভয়?"

সে জবাব দিলে, "হুজুর, সে ভয়ের নাম করতে নেই। একটু পরে সব চোখেই দেখতে পাবেন।"

এ কথা শুনে ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আমার মনে এতটা কৌতূহল জন্মাল যে বেহারাগুলোকে টেনে তোলবার জন্যে স্বয়ং তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি যে-সব চোখ যকৃতের প্রভাবে হলুদেব মতো হলদে ছিল, এখন সে সব গঞ্জিকার প্রসাদে চুন-হলুদের মতো লাল হয়ে উঠেছে। প্রতি লোকটিকে নিজের হাতে টেনে খাড়া করতে হল, তার ফলে বাধ্য হয়ে কতকটা গাঁজার ধোঁয়া আমাকে উদরস্থ করতে হল ; সে ধোঁয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করে আমার মাথায় গিয়ে চড়ে বসল। অমনি আমার গা পাক দিয়ে উঠল, হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, চোখ টেনে আসতে লাগল, আমি তাড়াতাড়ি পাল্কিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। পাল্কি আবার চলতে শুরু করল। এবার আমি পাল্কি চড়বার কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব কবলুম না, কেননা আমার মনে হল যে শরীরটে যেন আমার নয়—অপর কারো।

খানিকক্ষণ পর—কতক্ষণ পর তা বলতে পারি নে—বেহারাগুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি তার প্রমাণ পূর্বেই পেয়েছিলুম, কিন্তু সে জোর যে এত অধিক তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজিটিও বেহারাদের

সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'রামনাম সৎ হ্যয়' রামনাম সৎ হ্যয়' এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে আমার মনে হল যে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেতপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে। এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনো প্রভাব ছিল কি না জানি নে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানবার জন্য আমার মহা কৌতূহল হল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যেরকম হয়, আকাশের চেহারা সেইরকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ—আকাশ-জোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ—শুনতে পেলুম না। চারি দিক এমন নির্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার পর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে, সুমুখে যা পড়ে আছে তা একটি মরুভূমি—বালির নয়, পোড়ামাটির, সে মাটি পাতখোলার মতো, তার গায়ে একটি তৃণ পর্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্বে যে ছিল তার অসংখ্য এবং অপর্যাপ্ত চিহ্ন চারি দিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথায়ও-বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও-বা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে; আর সে ইট এত লাল যে, দেখতে মনে হয় টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে; এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ। কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথায়ও-বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথায়ও-বা দু-একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইট কাঠ মাটি আকাশের সর্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়, কেননা আমরাই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। সে স্বর এত মৃদু এত করুণ এত কাতর যে, মনে হল সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভরে গেল, আমি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বমানবের ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় উঠল, চার দিক থেকে এলোমেলো ভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারি দিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তার পর দেখি সেই অগ্নি-প্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিল্‌বিল্ করছে, ছট্‌ফট্ করছে। এই ব্যাপার দেখে উনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চিৎকার করতে লাগল। ক্রমে এই-সব শব্দ মিলেমিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হল—সে হাসির নির্মম বিকট ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হল। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে আমার মনের ভিতর এই ধ্বংসপুরীর পূর্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুললে—সে স্মৃতি ইহজন্মের কি পূর্বজন্মের তা আমি বলতে পারি নে। আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে বলে দিলে যে, সে গ্রামের ইতিহাস এই—

২

এই ইটকাঠের মরুভূমি হচ্ছে রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষ। রুদ্রপুরের রায়বাবুরা এককালে এ অঞ্চলের সর্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। রায়বংশের আদিপুরুষ রুদ্রনারায়ণ, নবাব-সরকারে চাকরি করে রায়-রাইয়ান খেতাব পান, এবং সেইসঙ্গে তিন পরগনার মালিকী স্বত্ব লাভ করেন। লোকে বলে এঁদের ঘরে দিল্লির বাদশার স্বহস্তে-স্বাক্ষরিত সনদ ছিল, এবং সেই সনদে তাঁদের কোতল-কচ্ছলের ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সনদের বলে হোক আর না হোক, এঁরা যে কোতল-কচ্ছল করতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিম্বদন্তী এই যে, এমন দুর্দান্ত জমিদার এ দেশে পূর্বাপর কখনো হয় নি। এঁদের প্রবল প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খেত। কেননা, যার উপর এঁরা নারাজ হতেন, তাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করতেন। এঁরা কত লোকের ভিটামাটি যে উচ্ছন্নে দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। রায়বাবুদের দোহাই অমান্য করে এত বড়ো বুকের পাটা বিশ ক্রোশের মধ্যে কোনো লোকেরই ছিল না। তাঁদের কড়া শাসনে

পরগনার মধ্যে চুরি-ডাকাতি দাঙ্গা-হাঙ্গামার নামগন্ধও ছিল না, তার একটি কারণ ও অঞ্চলের লাঠিয়াল সড়কিয়াল তীরন্দাজ প্রভৃতি যত ক্রূরকর্মা লোক, সব তাঁদের সরকারে পাইক-সর্দারের দলে ভর্তি হত। এক দিকে যেমন মানুষের প্রতি তাঁদের নিগ্রহের সীমা ছিল না, অপর দিকে তেমনি অনুগ্রহেরও সীমা ছিল না। দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র, আতুরকে ঔষধপথ্য দান এঁদের নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। এঁদের অনুগত আশ্রিত লোকের লেখাজোখা ছিল না। এঁদের প্রদত্ত ব্রাহ্মোত্তরের প্রসাদে দেশের গুরুপুরোহিতের দল সব জোতদার হয়ে উঠেছিলেন। তার পর পূজা-আর্চা দোল-দুর্গোৎসবে তাঁরা অকাতরের অর্থ ব্যয় করতেন। রুদ্রপুরে দোলের সময় আকাশ আবীরে ও পুজোর সময় পৃথিবী রুধিরে লাল হয়ে উঠত। রুদ্রপুরের অতিথিশালায় নিত্য এক শত অতিথি-ভোজনের আয়োজন থাকত। পিতৃদায় মাতৃদায় কন্যাদায়-গ্রস্ত কোনো ব্রাহ্মণ রুদ্রপুরের বাবুদের দ্বারস্থ হয়ে কখনো রিক্তহস্তে ফিরে যায় নি। এঁরা বলতেন—ব্রাহ্মণের ধন বাঁধবার জন্য নয়, সৎকার্যে ব্যয় করবার জন্য। সুতরাং সৎকার্যে ব্যয় করবার টাকার যদি কখনো অভাব হত, তা হলে বাবুরা সে টাকা সা-মহাজনদের ঘর লুঠে নিয়ে আসতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়, এঁরা ভালো কাজ মন্দ কাজ সব নিজের খেয়াল ও মর্জি-অনুসারে করতেন ; কেননা নবাবের আমলে তাঁদের কোনো শাসনকর্তা ছিল না। ফলে, জনসাধারণে তাঁদের যেমন ভয় করত তেমনি ভক্তিও করত, তার কারণ তাঁরা জনসাধারণকে ভক্তিও করতেন না, ভয়ও করতেন না। এই অবাধ যথেচ্ছাচারের ফলে তাঁদের মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর অসাধারণ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তাঁদের মনে যা ছিল, সে হচ্ছে জাতির অহংকার, ধনের অহংকার, বলের অহংকার, রূপের অহংকার। রায়-পরিবারের পুরুষেরা সকলেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁদের ঘরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই-সব কারণে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা এঁদের পক্ষে এক-রকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এ দেশে ইংরেজ আসবার পূর্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল, তার পর কোম্পানির আমলে এঁদের সর্বনাশ হয়। এঁদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার দরুন যে-সকল শরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেতে আরম্ভ হল ; কেননা নিজের চেষ্টায় নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জন করাটা এঁদের মতে অতি হেয় কার্য বলে গণ্য ছিল। তার পর শরিকানা বিবাদ। রায়-পরিবার ছিল শাক্ত—এত ঘোর শাক্ত যে, রুদ্রপুরের ছেলে-বুড়োতে মদ্যপান করত। এমন-কি, এ বংশের মেয়েরাও তাতে কোনো আপত্তি করত না, কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল মদ্যপান করা একটি পুরুষালি কাজ। সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর দর্শনের পর বাবুরা যখন বৈঠকখানায় বসে মদ্যপানে রত হতেন, তখন সেই-সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মতো দুই চোখ—এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষকষায়িত ত্রিনেত্রের মতো দেখাত। এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য নেই যা তাঁদের দ্বারা না হত। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-শরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-শরিকের প্রজার বৌ-ঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন। ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হত। এই জ্ঞাতি-শত্রুতার দরুন তাঁরা উৎসন্নের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তার পর এঁদের বিষয়সম্পত্তি যা অবশিষ্ট ছিল তা দশশালা বন্দোবস্তের প্রসাদে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। কিস্তির শেষ তারিখে সদর খাজনা কোম্পানির মালখানায় দাখিল না করলে লক্ষ্মী যে চিরদিনের মতো গৃহত্যাগ করবেন, এ জ্ঞান এঁদের মনে কখনো জন্মাল না। পূর্ব আমলে নবাব-সরকারে নিয়মিত শালিয়ানা মাল-খাজনা দাখিল করবার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। এই অনভ্যাসবশত কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব এঁরা সময় মতো দিয়ে উঠতে পারতেন না। এঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি খাজনার দায়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে রায়বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিল। যে গ্রামে এঁরা প্রায় একশো ঘর ছিলেন, সেই গ্রামে আজ একশো বৎসর পূর্বে ছ ঘর মাত্র জমিদার ছিল।

এই ছ ঘরের বিষয়সম্পত্তিও ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হল। এর কারণ ধনঞ্জয় সরকার ইংরেজের আইন যেমন জানতেন, তেমনি মানতেন। ইংরেজের আইনের সাহায্যে, এবং সে আইন বাঁচিয়ে, কি করে অর্থোপার্জন করতে হয়, তার অন্ধ-সন্ধি ফিকির-ফন্দি সব তাঁর নখাগ্রে ছিল। তিনি জিলার কাছারিতে মোক্তারি করে দু-চার বৎসরের মধ্যেই অগাধ টাকা রোজগার করেন। তার পর

তেজারতিতে সেই টাকা সুদের সুদ তস্য সুদে হুহু করে বেড়ে যায়। জনরব যে, তিনি বছর-দশেকের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা উপায় করেন। এত না হোক, তিনি যে দু-চার লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই টাকা করবার পর তাঁর জমিদার হবার সাধ গেল, এবং সেই সাধ মেটাবার জন্য তিনি একে একে রায়বাবুদের সম্পত্তি-সকল খরিদ করতে আরম্ভ করলেন ; কেননা এ জমিদারির প্রতি কাটা জমি তাঁর নখদর্পণে ছিল। রায়বংশের চাকরি করেই তাঁর চৌদ্দপুরুষ মানুষ হয়, এবং তিনিও অল্প বয়সে রুদ্রপুরের বড়ো শরিক ত্রিলোকনারায়ণের জমাসেরেস্তায় পাঁচ-সাত বৎসর মুহুরির কাজ করেছিলেন। সকল শরিকের সমস্ত সম্পত্তি মায় বসতবাটী খরিদ করলেও, বহুকাল যাবৎ তাঁর রুদ্রপুরে যাবার সাহস ছিল না, কেননা তাঁর মনিবপুত্র উগ্রনারায়ণ তখনো জীবিত ছিলেন। উগ্রনারায়ণ হাতে পৈতা জড়িয়ে সিংহবাহিনীর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে ধনঞ্জয় যদি রুদ্রপুরের ত্রিসীমানার ভিতর পদার্পণ করে, তা হলে সে সশরীরে আর ফিরে যাবে না। তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, সে বিষয়ে ধনঞ্জয়ের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। কেননা তিনি জানতেন যে, উগ্রনারায়ণের মতো দুর্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ রায়বংশেও কখনো জন্মগ্রহণ করে নি।

উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে এসে রায়বাবুদের পৈতৃক ভিটা দখল করে বসলেন। তখন সে গ্রামে রায়বংশের একটি পুরুষও বর্তমান ছিল না, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে সকল শরিকের বাড়ি নিজ-দখলে আনতে পারতেন, তবুও তিনি উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে তাঁর পৈতৃক বাটী থেকে বহিষ্কৃত করে দেবার কোনো চেষ্টা করেন নি। তার প্রথম কারণ, রুদ্রপুরের সংলগ্ন পাঠানপাড়ার প্রজারা উগ্রনারায়ণের বাটীতে রত্নময়ীর স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এরা গ্রামসুদ্ধ লোক পুরুষানুক্রমে লাঠিয়ালের ব্যবসা করে এসেছে ; সুতরাং ধনঞ্জয় জানতেন যে, রত্নময়ীকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করলে, খুন জখম হওয়া অনিবার্য। তাতে অবশ্য তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন, কেননা তাঁর মতো নিরীহ ব্যক্তি বাঙলা দেশে তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। তার দ্বিতীয় কারণ, যার অন্নে চৌদ্দপুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে, ধনঞ্জয়ের মনে তার প্রতি পূর্বসংস্কারবশত কিঞ্চিৎ ভয় এবং ভক্তিও ছিল। এই-সব কারণে ধনঞ্জয় উগ্রনারায়ণের অংশটি বাদ দিয়ে, রায়বংশের আদবাড়ির বাদবাকি অংশ অধিকার করে বসলেন, সেও নামমাত্র। কেননা, ধনঞ্জয়ের পরিবারের মধ্যে ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা রঙ্গিণী দাসী, আর তাঁর গৃহজামাতা এবং রঙ্গিণীর স্বামী রতিলাল দে। এই বাড়িতে এসে ধনঞ্জয়ের মনের একটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটল। অর্থ উপার্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অর্থলোভ এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর অন্তরে সেই লোভ ব্যতীত অপর কোনো ভাবের স্থান ছিল না। সেই লোভের ঝোঁকেই তিনি এতদিন অন্ধভাবে যেন-তেন-উপায়েন টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিসের জন্য কার জন্য টাকা জমাচ্ছি, এ প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের মনে কখনো উদয় হয় নি।

কিন্তু রুদ্রপুরে এসে জমিদার হয়ে বসবার পর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হল যে, তিনি শুধু টাকা করবার জন্যই টাকা করেছেন, আর কোনো কারণে নয়, আর কারো জন্য নয়। কেননা তাঁর স্মরণ হল যে, যখন তাঁর একটির পর একটি সাতটি ছেলে মারা যায়, তখনো তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হন নি, একদিনের জন্যও অর্থোপার্জনে অবহেলা করেন নি। তাঁর চিরজীবনের অর্থের আত্যন্তিক লোভ এই বৃদ্ধবয়েসে অর্থের আত্যন্তিক মায়ায় পরিণত হল। তাঁর সংগৃহীত ধন কি করে চিরদিনের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে এই ভাবনায় তাঁর রাত্তিরে ঘুম হত না। অতুল ঐশ্বর্যও যে কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, এই রুদ্রপুরই তো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রমে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, মানুষে নিজ চেষ্টায় ধনলাভ করতে পারে, কিন্তু দেবতার সাহায্য ব্যতীত সে ধন রক্ষা করা যায় না। ইংরেজের আইন কণ্ঠস্থ থাকলেও ধনঞ্জয় একজন নিতান্ত অশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বর্বরতা কোনোরূপ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা পরাভূত কিংবা নিয়মিত হয় নি। তাঁর সমস্ত মন সেকালের শূদ্রবুদ্ধিজাত সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ছেলেবেলায় শুনেছিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণশিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তা হলে সেই শিশুটি সেই ঘরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে যক্ষ হয়ে

সেই টাকা চিরকাল রক্ষা করে। ধনঞ্জয়ের মনে এই উপায়ে তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এত অদম্য হয়ে উঠল যে, তিনি যখ্ দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্তব্য, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হলেন। যেখানে ধনঞ্জয়ের কোনো মায়ামমতা ছিল না, সেখানে তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের কার্য উদ্ধার করবার কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক বিষম বাধা উপস্থিত হল। ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণশিশুকে যখ্ দিতে মনস্থ করেছেন শুনে, রঙ্গিণী আহারনিদ্রা ত্যাগ করলে। ফলে, ধনঞ্জয়ের পক্ষে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি ভালোবাসতেন তো সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চুনসুরখির গাঁথনির ভিতর এক-একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোনো একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনি ভাবে শিকড় গেড়েছিল। ধনঞ্জয় এ বিষয়ে উদ্যোগী না হলেও ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হল।

রত্নময়ীর একটি তিন বৎসরের ছেলে ছিল। তার নাম কিরীটচন্দ্র। তিনি সেই ছেলেটি নিয়ে দিবারাত্রে ঐ বাড়িতে একা বাস করতেন, জনমানবের সঙ্গে দেখা করতেন না, তাঁর অন্তঃপুরে কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। রুদ্রপুরে লোকে তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে যেত, যদি না তিনি প্রতিদিন স্নানান্তে ঠিক দুপুরবেলায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। সে সময়ে তাঁর আগে পিছে পাঠানপাড়ার দুজন লাঠিয়াল তাঁর রক্ষক হিসেবে থাকত। রত্নময়ীর বয়েস তখন বিশ কিংবা একুশ। তাঁর মতো অপূর্বসুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে লাখে একটি দেখা যায়। তাঁর মূর্তি সিংহবাহিনীর প্রতিমার মতো ছিল, এবং সেই প্রতিমার মতোই উপরের দিকে কোণতোলা তাঁর চোখ দুটি—দেবতার চোখের মতোই স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনো পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতরে যা জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চার পাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা। রত্নময়ী তাঁর পূর্বপুরুষদের তিন শত বৎসরের সঞ্চিত অহংকার উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর অন্তরে তাঁর রূপেরও অসাধারণ অহংকার ছিল। কেননা তাঁর কাছে সে রূপ ছিল তাঁর আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষণ করা নয়—তিরস্কার করা। তিনি যখন মন্দিরে যেতেন তখন পথের লোকজন সব দূরে সরে দাঁড়াত, কেননা তাঁর সকল অঙ্গ, তাঁর বর্ণ ও রেখার নীরব ভাষায় সকলকে বলত, "দূর হ! ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে।" বলা বাহুল্য, তিনি কোনো দিকে দৃক্‌পাত করতেন না, মাটির দিকে চেয়ে সকল পথ রূপে আলো করে সোজা মন্দিরে যেতেন, আবার ঠিক সেই ভাবে বাড়ি ফিরে আসতেন। রঙ্গিণী জানালার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখত, এবং তার সকল মন, সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠত—যেহেতু রঙ্গিণীর আর যাই থাক্, রূপ ছিল না। আর, তার রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিত, কেননা তার স্বামী রতিলাল ছিল অতি সুপুরুষ।

ধনঞ্জয় যেমন টাকা ভালোবাসতেন, রঙ্গিণী তেমনি তার স্বামীকে ভালোবাসত—অর্থাৎ এ ভালোবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতোই অন্ধ ও নির্মম। এ ভালোবাসার সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক ছিল বলা কঠিন, কেননা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর মতো জীবদের মন, দেহের অতিরিক্ত নয়, অন্তর্ভূত বস্তু। তার পর ধনঞ্জয় যে ভাবে টাকা ভালোবাসতেন, রঙ্গিণী ঠিক সেই ভাবে তার স্বামীকে ভালোবাসত—অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি হিসেবে। যে সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে—এ কথা মনে হলে সে একেবারে মায়ামমতাশূন্য হয়ে পড়ত, এবং সে সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই যা রঙ্গিণী না করতে পারত।

রঙ্গিণীর মনে সম্পূর্ণ অকারণে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে, রতিলাল রত্নময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে; ক্রমে সেই সন্দেহ তার কাছে নিশ্চয়তায় পরিণত হল। রঙ্গিণী হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে, রতিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে উগ্রনারায়ণের বাড়ি যায়, এবং যতক্ষণ পারে ততক্ষণ সেইখানেই কাটায়। এর যথার্থ কারণ এই যে, রতিলাল, রত্নময়ীর বাড়ীতে আশ্রিত যে ব্রাহ্মণটি ছিল তার কাছে ভাঙ খেতে যেত। তার পর রত্নময়ীর ছেলেটির উপর নিঃসন্তান রতিলালের এতদূর মায়া পড়ে গিয়েছিল যে সে কিরীটচন্দ্রকে না দেখে একদিনও থাকতে পারত না। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর সঙ্গে রতিলালের কখনো চার চক্ষুর মিলন হয় নি, কেননা পাঠানপাড়ার প্রজারা তার অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষা করত। কিন্তু রঙ্গিণীর

মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য—তার মজ্জাগত হিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, রঙ্গিণী রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দেবার জন্য কৃতসংকল্প হল। রঙ্গিণী একদিন ধনঞ্জয়কে জানিয়ে দিলে যে যখ্ দেওয়া সম্বন্ধে তার আর কোনো আপত্তি নেই, শুধু তাই নয়, ছেলের সন্ধান সে নিজেই করবে।

এ কাজ অবশ্য অতি গোপনে উদ্ধার করতে হয়। তাই বাপে মেয়েতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, রঙ্গিণীর শোবার পাশের ঘরটিতে যখ্ দেওয়া হবে। দু-চার দিনের ভিতর সে ঘরটির সব দুয়ার জানালা ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হল। তার পর অতি গোপনে ধনঞ্জয়ের সঞ্চিত যত সোনা রুপোর টাকা ছিল সব বড়ো বড়ো তামার ঘড়াতে পুরে সেই ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হল। যখন ধনঞ্জয়ের সকল ধন সেই কুঠরীজাত হল, তখন রঙ্গিণী এক-দিন রতিলালকে বললে যে, রত্নময়ীর ছেলেটি এত সুন্দর যে তার সেই ছেলেটিকে একবার কোলে করতে নিতান্ত ইচ্ছে যায় ; সুতরাং যে উপায়েই হোক তাকে একদিন রঙ্গিণীর কাছে আনতেই হবে। রতিলাল উত্তর করলে, সে অসম্ভব, রত্নময়ীর লাঠিয়ালরা টের পেলে তার মাথা নেবে। কিন্তু রঙ্গিণী এত নাছোড় হয়ে তাকে ধরে বসল যে রতিলাল অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা কিরীটচন্দ্রকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে রঙ্গিণীর কাছে নিয়ে এল। কিরীটচন্দ্র আসবামাত্র রঙ্গিণী ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, চুমো খেলে, কত আদর করলে, কত মিষ্টি কথা বললে। তারপর সে কিরীটচন্দ্রের গায়ে লাল চেলির জোড়, তার গলায় ফুলের মালা, তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আর তার হাতে দু গাছি সোনার বালা পরিয়ে দিলে। কিরীটচন্দ্রের এই সাজ দেখে রতিলালের চোখমুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার পর রঙ্গিণী হঠাৎ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে, সেই ব্রাহ্মণশিশুকে সেই অন্ধকূপের ভিতর পুরে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজার গা-চাবি বন্ধ করে চলে গেল। রতিলাল এ দোর ও দোর ঠেলে দেখে বুঝলে যে, রঙ্গিনী তাকেও তার শোবার ঘরে বন্দী করে চলে গিয়েছে। রতিলাল ঠেলে, ঘুসো মেরে, লাথি মেরে সেই অন্ধকূপের কপাট ভাঙবার চেষ্টা করে দেখলে সে চেষ্টা বৃথা। সে কপাট এত ভারী আর এত শক্ত যে কুড়োল দিয়েও তা কাটা কঠিন। কিরীটচন্দ্র সেই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে প্রথমে ককিয়ে কাঁদতে লাগলে, তারপর রতিলালকে 'দাদা'-'দাদা' বলে ডাকতে লাগলে। দু-তিন ঘণ্টার পর তার কান্নার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া গেল না। রতিলাল বুঝলে সে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পর তিন দিন তিন রাত নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রতিলাল কখনো শোনে যে কিরীটচন্দ্র দুয়োরে মাথা ঠুকছে, কখনো শোনে সে কাঁদছে, আবার কখনো বা চুপচাপ। রতিলাল এই তিন দিন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিনের ভিতর ন'ভার বার পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সেই কপাট ভাঙতে চেষ্টা করেছে অথচ সে দরজা একচুলও ন।ড়াতে পারে নি। যখন কান্নার আওয়াজ তার কানে আসত তখন রতিলাল দুয়োরের কাছে ছুটে গিয়ে বলত, "দাদা দাদা, অমন করে কেঁদো না, কোনো ভয় নেই, আমি এখানে আছি।" রতিলালের গলা শুনে সে ছেলে আরো জোরে কেঁদে উঠত, ঘন ঘন কপাটে মাথা ঠুকত , রতিলাল তখন দুই কানে হাত দিয়ে ঘরের অন্য কোণে পালিয়ে যেত ও চিৎকার করে কখনো রঙ্গিণীকে কখনো ধনঞ্জয়কে ডাকত, এবং যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিত। এই পৈশাচিক ব্যাপারে সে এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, কিরীটচন্দ্রের উদ্ধারের যে অপর কোনো উপায় হতে পারে, এ কথা মুহূর্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি, তার সকল মন ঐ কান্নার টানে সেই অন্ধকূপের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল।

তিন দিনের পর সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হয়ে এসে, পঞ্চম দিনে একেবারে থেমে গেল। রতিলাল বুঝলে, কিরীটচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার ঘরের জানালার লোহার গরাদে দু হাতে ফাঁক ক'রে নীচে লাফিয়ে পড়ে একদৌড়ে রত্নময়ীর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল। সেদিন দেখলে অন্তঃপুরের দরজায় প্রহরী নেই, পাঠানপাড়ার প্রজারা সব ছেলে খোঁজবার জন্য নানা দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে রতিলাল রত্নময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার কাছে এক নিশ্বাসে জানালে। গত তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখে নি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠলে, দেখতে দেখতে মনে হল সে যেন হেসে উঠলে। এ দৃশ্য রতিলালের কাছে এতই অদ্ভুত বোধ হল যে, সে রত্নময়ীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার পর, সেই দিন দুপুর রাত্তিরে যখন সকলে শুতে গিয়েছে—রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। সকল শরিকের বাড়ি সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টা-খানের মধ্যে সে আগুন দেবতার রোষাগ্নির মতো ব্যাপ্ত হয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ি আক্রমণ করলে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, সদর ফটকে এসে দেখে রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠানপাড়ার প্রায় একশো প্রজা ঢাল সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীকে সড়কির পর সড়কির ঘায়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠল। তার সঙ্গীরা বুঝলে যে, সে পাগল হয়ে গিয়েছে।

তার পর সেই পাঠানপাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চড়ে গেল। তারা ধনঞ্জয়ের চাকর দাসী, আমলা ফয়লা, দারোয়ান বরকন্দাজ যাকে সুমুখে পেলে তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায়বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল। তার পর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হতে লাগল। যখন সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল তখন রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।

রুদ্রপুরের সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধু কিরীটচন্দ্রে কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসি আজও তার আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে রেখেছে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রসময়ীর রসিকতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রমোহনবাবুর অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে করিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

ক্ষেত্রমোহনের বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। স্ত্রী রসময়ীর বয়স ত্রিশ। 'রসময়ী'—এ নাম যে রাখিয়াছিল বলিহারি তাহার প্রতিভা! তবে রসও অনেকগুলি আছে কিনা—এ ক্ষেত্রে রৌদ্ররস।

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীস মোক্তার ; হুগলীতে থাকিয়ে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করেন। বাড়ী তাঁহার হুগলীতে নহে—জেলার মধ্যে কোন এক পল্লীগ্রামে। তবে কয়েক বৎসর হইল হুগলীতে নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমোহনের সন্তানাদি কিছুই হয় নাই—স্ত্রীর যেরূপ বয়স আর হইবার ভরসাও নাই। অনেকদিন হইতে তাঁহার মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনের আন্তরিক বাসনাও তাহাই। কিন্তু রসময়ীর ভয়ে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোনরূপ চেষ্টাচরিত্র করিতে সাহস করেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে রসময়ী ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া ক্ষেত্রমোহনকে দুইদিন গৃহছাড়া করিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিসহরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভর করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন রসময়ীর আর মুখদর্শন করিবেন না—অন্যত্র বিবাহ করিবেন। এ বাড়ীতে রসময়ীকে আর ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপর পারে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরীপাড়ায় রসময়ীর পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীর বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়া কারখানায় কর্ম্ম করে ; সুবোধ ইস্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে—এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ স্থলে দুইচারি দিন বা বড় জোর এক সপ্তাহ পরে, দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরিয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এইবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী ব্রাঞ্চ ইস্কুলে পড়িতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল—ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহ ; দিনস্থির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন —"বাবা, শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?"

বালক বলিল —"হ্যাঁ সত্যি বইকি। আমাদের ক্লাসে সুরেশ বলে একটি ছেলে পড়ে, চুঁচড়োয় তার মামার বাড়ী। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান?"

"জানি বইকি। সুরেশই ত আমাকে বলেছে। দিনস্থির পর্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তার মামার নাম কি?"

"নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কর্ম্ম করেন।"

"তাদের বাড়ীটি তুমি চেন বাবা?"

'হ্যাঁ চিনি বইকি। সুরেশের সঙ্গে কতবার গিয়েছি।"

"কত বড় মেয়ে?"

"এই আমাদের বয়সীই হবে।"—বালকটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসর।

"কেমন দেখতে?"

"তা—বেশ সুন্দর।"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন —"আচ্ছা, কাল একবার আমাদের দু বোনকে সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পার বাবা?"

"কেন?"

"তাদের একবার মিনতি করে বলে কয়ে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিরও সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"

"কখন?"

"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে।"

"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?"

"একদিনের জন্যে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন। আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ি, নাটাই এ সব কিনো।"

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সম্মতি জানাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বালকটি চুঁচুড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কী দরজার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল।

রসময়ী বলিল—"এই বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা চট্ করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"—বলিয়া দুইজনেই অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ীর মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল—"তোমরা কারা গা?"

বিনোদিনী বলিল, "আমরা হলিসহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"এস—বস।"

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—"বাড়ীর গিন্নী কোন্‌টি?"

একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল—"ইনি গিন্নী।"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমরা কি মনে করে এসেছ বাছা?"

বিনোদিনী বলিল—"তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে?"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।"

"কবে?"

"এই বিশে মাঘ দিন স্থির হয়েছে।"

"পাত্রটি কে?"

"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারি করেন।"

"সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?"

গৃহিণীর বিস্ময় প্রতি কথায় বাড়িয়ে চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা চেন নাকি?"

বিনোদিনী বলিল—"চিনিনে আবার—খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।"

রসময়ী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল ; তাহার মনের রাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে মাগী নাকি বড় দজ্জাল।"

শ্রবণমাত্র রসময়ী তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল। বারান্দাব কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধরিয়া গৃহিণীর উপর সপাসপ্ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন?—কেন?—আর কি মরবার জায়গা পেলে না?- জায়গা পেলে না?—আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না? জুটলো না?"

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার পর মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিয়া কেহ খাটের নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, সে বাসন ফেলিয়া—"ওরে খুন কল্লে রে—খুন কল্লে রে -সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা"—বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীব অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল

ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই।"

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে সদর দরজায় লোক হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল, "রসময়ী থাম্ থাম্—ক্ষ্যামা দে বোন্—খুব হয়েছে। চল্ বাড়ী চল্।"

ঝি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ওগো যেতে দিওনি—থানায় খবর দিয়ে এসেছি, দারোগা আসছে।"

পুলিশের নাম শুনিয়া রসমতী বলিল, "চলো দিদি, চলো।"

যাবে কোথায়— "দারোগা আসুক তবে যেও।" বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী এক লম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁশবঁটিখানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—"খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব।"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক "মা গোঃ" বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। "পাহারাওয়ালা—এ পাহারাওয়ালা—আসামী পালায়"—বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশ্চন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন—"সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

পরদিন কাছারীতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত নির্ব্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে দৃষ্টিপাত করিল—সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্ব্বে মুনিঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে করে?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—"একটা শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে।" তাহার ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহনবাবু বলিলেন- "শ্রাদ্ধটা কার?"

"হরিশ চাটুয্যের মেয়ের—আর মেয়ের মার।"

"তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ নাকি শুনলাম?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিতভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"করছিই ত। করব না কেন? তোমার ভয়ে নাকি?"

রসময়ী চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল -"কর না, করে একবার মজাটাই দেখ না।"

"কি করবে তুমি?"

"এই এমন কিছু না। আঁশবঁটি দিয়ে সে মেয়ের নাকটা কেটে দেব—আর বুকে একখানা দশমণে পাথর চাপিয়ে দেব।"

"আর তোমার নাকটা কানটা কেউ যদি কেটে দেয়?"

"এস না। কাট না। তুমিই কাট না হয়।"—বলিয়া রসময়ী নিজ কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইয়া আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তি বোধ হইল, রসময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তা হলে আঁশবঁটিতে শাণ দিয়ে রাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকর্ম্মটা সেরে ফেল না।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?"

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আমি মরব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এখনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তর বিলম্ব। তোমার বিয়ে করবার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে—যখন আর কেউ তোমায় মেয়ে দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।"

দাম্পত্য রসালাপ এই পর্যন্ত অগ্রসর হইলে বাহিরে একখানি গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। রসময়ী বলল—"তবে সেই কথাই রইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাড়ায় তার জায়ের বাড়ী গিয়েছিল—ভাবলাম তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কয়ে যাই।" বলিয়া রসময়ী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। রসময়ীর গর্ব্ব সফল হইল না। সে এখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

সংবাদ পাইয়া ক্ষেত্রমোহনবাবু হালিসহরে গেলেন। চিকিৎসাদির কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীর মুখাগ্নি করিলেন। আশ্চর্য্য সংসারের মায়া—যে এত কষ্ট দিয়াছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয় কাটিল। ক্ষেত্রমোহনের পার্শ্বচর বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বয়ং গিয়া দেখিয়া আসিলেন। মেয়েটি ডাগর—দেখিতেও ভাল। বিশেষ মেয়ের পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককার মামলা মোকর্দ্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহনবাবুর করায়ত্ত হইবে। কন্যার পিতা রজনীকান্ত ঘোষাল ইংরাজী লেখাপড়া জানা ব্যক্তি।

বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হইল। বরের খুড়া মহাশয় গ্রাম হইতে আসিয়াছেন—কল্য আশীর্ব্বাদ। প্রভাবে আফিসকক্ষে বসিয়া দুই চারিজন মক্কেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—খুড়া মহাশয় একখানি "বঙ্গবাসী" হস্তে ঘরের কোণে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপিয়ন আসিল, ক্ষেত্রমোহনবাবুর হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

খামের উপর হস্তাক্ষরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষেত্রমোহনেব মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই চারিবার চক্ষু রগড়াইয়া বারম্বার খামখানির শিরোনামা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাছে আনিয়া, দূরে সরাইয়া. নানা প্রকারে দেখিলেন।

অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পড়িয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলগণকে বলিলেন—"আচ্ছা. এখন তোমরা যাও—আজ সকালে সকালেই কাছারি যাব—সেইখানেই বাকি কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জড়িত স্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন— "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাকার চিঠি?"

"তাই ত ভাবছি।"

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিয়া খুড়া মহাশয় উঠিয়া নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে; চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় দ্রুতভাবে বলিলেন—"কি? ব্যাপার কি? কোনও দুঃসংবাদ নয় ত?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইয়া চশমা অনুসন্ধান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুড়া মহাশয় পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠির কাগজে, বেগুনী রঙের ম্যাজেণ্টা কালি দিয়া লেখা—উপরে স্থানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্ন প্রকার লিখিত : —

শ্রীশ্রী দুর্গা

স্বহায়

প্রণামপূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস—

তোমার মোতিশ্চন্য ধরিয়াছে। মোনে করিআছ রসমই মরিআছে আপোদ গিয়াছে এইবার বিবাহ করি। আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিয়া তুমি নিষ্কিতি পাইআছ তাহা মোনেও করিও না। বাড়ির সনমুখে যে বড় বটগাছ আছে তাইতে আমি আজকাল বাস করিতেছি। তুমি কি কর কোতায় যাও সমস্থই আমি সেখানে বসিয়া দেখিথেছি। রাত্তিরে গাচ হইতে নামিয়া মাজে মাজে তোমার সয়ন ঘরে যাই। তোমার খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা করে গলাটা টিপিয়া দিয়া তোমাকেও আমার সঙ্গি করি। আমার একানে বড়ডো একলা বোধ হয়। আমার চেহারা একন ওতিশয় খারাপ হইয়া গিআছে। আমার গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি হাড় আছে তাও সাদা নয়। গংগাত্তিরে আমাকে জে পোড়াইআছিলে তাইতে হাড়গুনো কালো কালো হইয়া গিআছে। যাহা হউক নিজের রূপ বন্ননা নিজের মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগগতি নেকা আছে। রসমই।

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হাতের লেখা কার চিনতে পারছ?"

"খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করেনি ত?"

"ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জয়রাম—সীতারাম—রাম-রাঘব-রাবণারি—রাম—রাম—রাম।"

খুড়া মহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহনের আরও ভয় হইল। বলিলেন— "আচ্ছা খুড়ো মশায়—ভূতে কখন চিঠি লেখে?"

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র।"

দুজনেই নির্ব্বাক। অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"দেখ-- কারুর বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা শুনেছি বটে—কিন্তু—এরকমটা—কখনও ত শোনা যায়নি। আচ্ছা,—বউমার হাতের লেখা অ..কার চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়।"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"পুরানো চিঠি আছে বই কি।"—বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমার কাঁচ দুইখানি কোঁচার কাপড়ে ভাল করিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া, দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন- -"একই হাতের লেখা ত দেখছি।" খামখানা উল্টিয়া

দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সার ছয়খানাওয়ালা সাধারণ শাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পয়সার টিকিট আঁটা আছে। ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন—"কোথাকার ছাপ দেখ ত?"

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গলানবীশ মোক্তার হইলেও ইংরাজি ছাপার অক্ষর পড়িতে পারিতেন। ছাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"হুগলীর ছাপ। কালকের তারিখ।"

খুড়া মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয় রাম—শ্রীরাম—সীতারাম।"

কাছারির বেলা হয় দেখিয়া মোক্তারবাবু স্নান করিয়া আহারে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। রান্নাঘারের বারান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটার অগ্রভাগ দেখা যায়। খান, আর মাঝে মাঝে সেই গাছটার পানে চাহেন। একসময় গাছের একটা ডাল খড় খড় করিয়া নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিরও শব্দ শুনা গেল। ক্ষেত্রমোহনবাবুর আর খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহিরে আসিয়া বটগাছটার পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। দুই তিনটা কাঠবিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চশাখায় বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া-ভাইপো বসিযা কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়া মহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেওয়ালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিবেন। বালিসের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ রক্ষিত হইবে এবং ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তা হলে খুড়ো মহাশয়, কি করা যায়? বিবাহটা বন্ধই করে দেওয়া যাবে?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন—"আমি ত তার দরকার দেখ্‌ছিনে।"

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয়?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন- "ভযের কোনও কারণ দেখিনে।"

"ঐ যে বলেছে ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই?"

"নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে।"

"আর যে বলেছে বিয়ে কোরো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মানে বোধ হয় এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"

ক্ষেত্রমোহনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল; কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনীবাবুরও কানে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি তিনি ইংরাজি জানা ব্যক্তি,—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন "ভূত! এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বিশ্বাস করতে হবে?"

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বিকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্রবাবু জনকয়েক বন্ধুবান্ধব সহ বসিয়া ছিলেন।—ইঁহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকিল—নাম মনোহরবাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোনার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়,—লোকটি থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্রবাবুর ভৌতিক পত্রপ্রাপ্তির

সমাচার অবগত হইয়া অবধি, মনোহরবাবু ইঁহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন।—অপর একজন নব্যযুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল এ ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার। বিস্তর ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ক্ষেত্রবাবু, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন না নৌকাডুবি বা আর কিছু, সকলেই মনে করছে অমুক লোকটা মরে গেছে, মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই,—কিন্তু বইয়ের শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁরই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ন্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে, ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

থিয়জফিষ্ট উকীলবাবুটি ইহা শুনিয়া বলিলেন—"কেন মশাই—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?"

নবীন মোক্তারবাবু বিজ্ঞভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন?"

"না, দেখিনি।"

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন?"

"করি। তার কারণ, আমি না দেখলেও হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ বিশখানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু 'ভূত আমি নিজে দেখেছি' এমন কথা আজ পর্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে, খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।"

মনোহরবাবু তাঁহার সুঘন দাড়ির মধ্যে দীর্ঘনখ অঙ্গুলিগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন—"আপনি বললেন, হাজার হাজার লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমনি হাজার হাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ করেছে। আপনি বললেন যে সম্রাটের দশবিশখানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশ বিশখানা ভূতেরও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পারি। যদি দেখতে চান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমার একখানা বইয়ে কেটি কিং-এর ছবি আছে। প্রথম চার্লসের সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি কিং স্থূলশরীর ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করা হয়েছে, তাঁর শরীরে ছুরি ফুটিয়ে দিয়ে দেখা হয়েছে ঠিক মানুষের মত রক্তপাত হয়, তাঁর ফোটোগ্রাফ পর্যন্ত তোলা হয়েছে; ফোটোগ্রাফ থেকে তৈরী ছবি আমার বইয়ে আছে—আসবেন, দেখাব।"

সুরেন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"আপনারাও যেমন ভালমানুস! ঐ সব বিশ্বাস করেন? ভূতবাদীদের কত জোচ্চুরি ধরা পড়েছে তার সংখ্যা নেই। কেটি কিং-এর দেহে ছুরি ফুটিয়ে রক্তপাত হয়েছে ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতার প্রমাণ বলে উল্লেখ করলেন। আমার ত ঠিক উল্টো মনে হয়। ছুরি ফোটালে রক্ত না পড়ত— অথচ শরীরী মানুষ একটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখছি—তা হলে বরং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয়। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বাড়ীর সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পারেন, তখন অনায়াসেই মূর্তিগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য বলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা না করে খাম, কাগজ, কালি, কলম সংগ্রহ করবার কষ্ট স্বীকার করলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠিখানি টেবিলের উপর রেখে গেলেই হত, তা না করে এক মাইল দূরে পোষ্ট আফিসে গেলেন তাকে পোষ্ট করতে। আবার দুটো পয়সা খরচ করে টিকিট কিনতে হল। মশায়, ভৌতিক জগতে পয়সা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয়, তা হলে না হয় সেইখানে গিয়েই প্র্যাকটিস সুরু করি।"

মনোহরবাবু একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন— "মশায়, জিনিযটা হাসি তামাসার নয়। এসব গভীর বিষয়। অনেক চর্চ্চা, অনেক আলোচনা না করে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা, এই প্রথম নয়। হিমালয় থেকে মহাত্মারাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র

লিখে থাকেন। কুটুম্বিলাল নামক এক মহাৎমা এ রকম অনেক চিঠি আমাদের মাদাম ব্লাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁরাও মনে করলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হয়ে বক্তব্য বলে যেতে পারতেন কিম্বা চিঠি উড়িয়ে টেবিলের উপর ফেলে যেতে পারতেন—কিন্তু ডাকেই তাঁরা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিয়া শিক্ষিক মোক্তারবাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"কুটুম্বিলালের চিঠি ত কোন্ কালে জাল বলে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ডাক্তার হজ্‌সন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভারতবর্ষে এসে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে মাদাম ব্লাভাটস্কি আর দামোদর বলে এক ব্যক্তি সব চিঠি জাল করেছিলেন।"

একথা শুনিয়া থিয়জফিষ্টবাবুটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন—"ওসব ঈর্ষাপরায়ণ লেখকের বই পড়বেন না। আমার কাছে আসবেন, ভাল ভাল বই সব আপনাকে পড়তে দেব। তা পড়লে আপনার সমস্ত অবিশ্বাস দূর হয়ে যাবে। মাদাম ব্লাভাটস্কি যে কতবড় লোক তা তাঁর 'আইসিস্ আন্‌ভেল্ড' বইটে পড়লেই বুঝতে পারবেন।"

সুরেন্দ্রবাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে বইটে পড়িনি বটে, তবে এডমন্ড গ্যারেট প্রণীত 'আইসিস ভেরি মচ্ আনভেল্ড—অব দি ষ্টোরি অব্ দি গ্রেট মাহাৎমা হোক্স' বইটে পড়েছি। লাইব্রেরিতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পারি।"

এ কথায় মনোহরবাবু রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঐ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন! গাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিষই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক মিছামিছি মাদামের অপরাধ রটনা করেছে।"

এমন সময় বাহিরে শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—চিঠি আছে।" পরমুহূর্ত্তে ডাকপিয়ন প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়াই ক্ষেত্রমোহনবাবুর চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বলিলেন—"মশাই—আবার সেই।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিয়া সেখানি সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থিয়জফিষ্টবাবুটি অতি আগ্রহের সহিত সেখানি কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। শেষে নবীর মোক্তারবাবুর হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা স্বহায়

প্রণাম পূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস

এত সাহস তোমার। আসিব্বাদ পজন্ত হইয়া গিআছে। তুমি মোনে করি আছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা ফাকা আওআজ। রসি বামনি তেমন মেয়ে নয়। আমি মানা করা সত্যেও বিবাহ করিবে। একনও সাবধান হও। এ দুরমোতি পরিত্যাগ কর। নহিলে একদিন গভির রাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাছ হইতে নামিয়া তোমার বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইয়া দিব। ঘুম আব ভাঁগিবে না।

রসমই

একে একে সকলে পত্রখানি পড়িলেন। পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। শিক্ষিত মোক্তারবাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি তিনি মন হইতে সংশয় দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু—আর একবার বেশ করে লেখাটা পরীক্ষা করে দেখুন দেখি। আপনার স্ত্রীর হাতের লেখাই বটে ত ; না কোন জায়গায় কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কোন সন্দেহ নেই। শুধু হাতের লেখার মিল হলেও বা সন্দেহ করতাম। তার যেখান সেখানে যে যে বানান ভুল চিরকাল হত, এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এক জায়গায়, দুর্গা একটু তফাতে লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া চিঠিতে এমন সব কথাবার্ত্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্ব্বদা ব্যবহার করত।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎপরে সুরেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাঁর মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"ছিলাম বইকি।"

"সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গিয়েছিলেন?"

"গিয়েছিলাম।"

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন?"

"দেখিনি আবার? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি। ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয়নি।"

নব্য মোক্তারবাবু তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বলিল—

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy"

(হে হোরেশিও—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।

অপর একজন বলিলেন—"তা ত বটেই, তা ত বটেই। ধরুন আমাদের দেশে—শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন—সকল দেশেই, আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ভূত বলে একটা জিনিষ আছে তার কি কিছুই ভিত্তি নেই?"

সরকারী উকীলবাবুটি বলিলেন—"শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এক সময় বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টিন্ডাল পর্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন—'of all the vulgar superstitions of the half educated, none dies harder than the absurd delusion that there are no such things as ghosts.'' (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল)"—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল—সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গা-টা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ ক্ষেত্তর—ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক্। আমার মতে, বৎসর পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশি দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম শেষ করা যাবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তা বেশ—সেই ভাল কথা।"

কন্যার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়ায় শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বি[illegible]হ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকর্দ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদি পক্ষে সাক্ষীদিগকে সমস্ত দিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারি হইতে ফিরিবার সময় "রসময়ী"র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে—

'সুনিলাম না কি গয়ায় আমার পিন্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিন্ডি দিলে আমি উধার হইয়া

যাইব তকন সচন্দে বিবাহ করিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোরের বেস ধরিয়া রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ী যাওয়া হইল না। কাছারির পোষাকেই মনোহরবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহরবাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন—" এ যে বড়ই বিপদ দেখছি। বিবাহ করবার কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মশায়, অশরীরী আত্মা মানুষের বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারে? আপনাদের থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?"

মনোহরবাবু একখানি মোটা বহি আলমারি হইতে পাড়িয়া একস্থান খুলিয়া বলিলেন—"এ সম্বন্ধে থিয়জফি শাস্ত্রের মত এই। মুক্তাত্মাগণ সাধারণতঃ অশরীরী। কিন্তু কখন কখন তাঁরা নিজেকে মেটিরিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহসম্পন্ন করে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,—এমন কি কাছাকাছি মানুষের দেহ থেকে, আবশ্যক পদার্থগুলি সংগ্রহ করে নিজ দেহ ধারণ করেন। সুতরাং সে অবস্থায় বুকে ছুরী বসিয়ে দিতে পারা কিছুই আশ্চর্য নয়। আর এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধরে চিঠি লিখতে সক্ষম সে হস্ত ছুরী ধরতে পারবে না কেন?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখুন, এ পত্রগুলো জাল কি না সেটা একবার ভাল করে তদন্ত করতে হচ্চে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দায়রার মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে আসছেন, তাঁকে দিয়ে এ চিঠিগুলো একবার পরীক্ষা করালে হয় না?"

থিয়জফিষ্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনের এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা—যদি আপনার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করাতে পারেন।"

পরদিন দায়রায় জালের মোকর্দ্দমাটির বিচার আরম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সফ্টমোর-সাহেব সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। দিন-শেষে কাছারির পর, ক্ষেত্রমোহন ডাকবাঙ্গলোয় গিয়া সফ্টমোর সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনার জন্য রসময়ীর কয়েকখানি পুরাতন আসল পত্রও দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কল্য প্রাতে পরীক্ষার ফলাফল জানাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে সরকারী উকীল মনোহরবাবুকে সঙ্গে লইয়া ক্ষেত্রমোহন আবার ডাক-বাঙ্গলোয় উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—"পরীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তের লেখা।"

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। মনোহরবাবু বলিলেন—"সাহেব, অনুগ্রহ করিয়া একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারেন?"

সাহেব মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এ পত্র লইয়া একটা মামলা মোকর্দ্দমা হইবে। আবার সাক্ষী দিতে আসিয়া ফী পাওয়া যাইবে।—সুতরাং আহ্লাদের সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—"এই চিঠিগুলির নকল আর সাহেবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের থিয়জফিক্যাল রিভিউ নামক মাসিকপত্রে ছাপাতে পাঠাই তাতে আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?—আমরা যাকে স্পিরিট-রাইটিং বলি তার সুন্দর অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তাতে আমার আপত্তি নেই।"

পরবর্তী সংখ্যা থিয়োজফিক্যাল রিভিউ পত্রে শার্টিফিকেটসহ চিঠিগুলি ছাপা হইয়া গেল। নানাস্থান হইতে বড় বড় থিয়জফিষ্টগণ ক্ষেত্রমোহনবাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া, পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

থিয়জফিষ্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পসারের আব সীমা নাই--কিন্তু ইহাতে তিনি কিছু মাত্র সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিযা সুখী হইতে পারিতেন। ভয়ে গয়ায় গিয়া পিণ্ডদান করিতেও পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই!

চৈত্র মাস আসিল—বসন্তের বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষ্যে কাছারি বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়ীতে বসিয়া নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে মহাবিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম্ ফাটিয়া তাঁহার ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইযাছে। তাহাকে হুগলীর হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

শুনিয়া ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পারিলেন না—গাড়ী ভাড়া করিযা হাসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানার নীচে মেঝের উপর বসিয়া বিধবা বিনোদিনী রোদন করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ-প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারেরা বলিল আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন-- "ঠাকুরঝি, সন্ধ্যা হল---এইবার বাড়ী চল।"

বিনোদিনী বলিলেন—"আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।"

"সমস্ত দিন অনাহাবে আছ— স্নানাহাব পর্যন্ত হল না!"

"তা না হোক! আমি যেতে পারব না।"

অবস্থা বুঝিয়া হাসপাতালের ডাক্তাবেবা বলিলেন—"আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে পাবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আব কোন ভয় নেই। বিপদ যা তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব---আপনাব কোন চিন্তা নেই - আপনি বাড়ী যান।"

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন— "তুমি তবে আমায় হালিসহরে নিযে চল। রাত্রে সেখানে থাকবে। কাল ভোরে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই কবিলেন। হালিসহবে রাত্রি কাটিল।

ভোরে উঠিযা স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আবম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বাড়ীব বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুঁকা বাখিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, লালপাগড়ীতে বাড়ী ঘেবাও কবিয়া ফেলিযাছে। অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দুয়ারে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কযেকজন দাবোগা ও হেড কনেষ্টবলও আছে।

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন- "হেল্লো মুখটিযাব, টুমি হেখানে খি খডিতেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"হুজুর, এই আমাব শ্বশুববাড়ী।"

"ইঁহা টোমার শ্বশুরবাড়ী আছে? উটম, হামি টোমার শ্বশুরবাড়ী সার্চ্চ খড়িবে। হেখানে বোমা টৈয়াড়ি হয় কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট আছে।"---বলিয়া সাহেব সার্চ্চ-ওয়ারেণ্টখানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিয়া, সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিলেন। বলিলেন—"হুজুর মালেক—যা ইচ্ছা করিতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন---"স্ত্রীলোক ঘনকে লুকাইতে বাখ।"

পুলিস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেবল বিনোদিনী। তিনি পুলিসের ভয়ে কোথাও লুকাইবার প্রয়োজন দেখিলেন না। হরিনামের মালাটি হাতে করিয়া উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া রহিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনামাইট, বোমা, বর্ত্তমান রণনীতি, যুগান্তর, গীতা, দেশের কথা, রিভিউ অব্ রিভিউজ প্রভৃতি কিছুই বাহির হইল না। বাহিল হইল- -হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভারত এবং একখানা বটতলার ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও

দেশনায়কের কোনও ছবি বাহির হইল না—বাহির হইল কেবল খানকতক কালীঘাটের পট এবং একখানা আর্ট ষ্টুডিওর গণেশ মূর্ত্তি। জমিদারের খানকতক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠির ফাইল বাহির হইল। বিনোদিনীর বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিত চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিয়া জমা করা হইল। একজন দারোগা কাগজপত্রগুলির ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিয়া ছিলেন। তিনি দেখিলেন, শাদা খামগুলির প্রত্যেক খানিতে তাঁহারই শিরোনামা লেখা এবং রসময়ীর হস্তাক্ষর! পুলিশ সাহেবের অনুমতি লইয়া খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। খান কুড়ি চিঠি রহিয়াছে—সমস্তই বেগুনী রঙের ম্যাজেণ্টা কালিতে, রসময়ীর হস্তাক্ষরে লিখিত। কয়েকখানি চিঠি খুলিয়া ক্ষেত্রবাবু পাঠও করিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা করিয়া অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছে বাসস্থানেরও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—"গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া আসিয়াছ বলিয়া মনে করিও না আমি আর তোমার অনিষ্ট করিতে পারি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।" একখানাতে রহিয়াছে—"শুনিলাম বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে, এখনও সাবধান।" একখানাতে আছে—"কল্য তোমার বিবাহ। এত মানা করিলাম কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসরঘরে আগুন জ্বালাইয়া তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইয়া মারিব।" ইত্যাদি।

সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত তখন ক্ষেত্রমোহনের নিকট পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"ঠাকুরঝি, এসব কি?"

ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিয়া যাইতে লাগিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আঁধারে আলো

এক

সে অনেকদিনের ঘটনা। সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে ; বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তাহার মা বলিলেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—বাবা, কথা শোন্, একবার দেখে আয়।

সত্যেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, না মা, এখন আমি কোনমতেই পারব না। তা হলে পাস হতে পারব না।

কেন পারবি নে? বৌমা থাকবেন আমার কাছে, তুই লেখাপড়া করবি কলকাতায়, পাস হতে তোর কি বাধা হবে আমি ত ভেবে পাইনে, সতু!

না মা, সে সুবিধে হবে না—এখন আমার সময় নেই, ইত্যাদি বলিতে বলিতে সত্য বাহির হইয়া যাইতেছিল।

মা বলিলেন, যাস্‌নে দাঁড়া, আরও কথা আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, আমি কথা দিয়েচি বাবা, আমার মান রাখবি নে?

সত্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিল, না জিজ্ঞাসা করে কথা দিলে কেন?

ছেলের কথা শুনিয়া মা অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, সে আমার দোষ হয়েছে, কিন্তু তোকে ত মায়ের সম্ভ্রম বজায় রাখতে হবে। তা ছাড়া, বিধবার মেয়ে, বড় দুঃখী—কথা শোন্ সত্য, রাজী হ।

আচ্ছা, পরে বলব, বলিয়া সত্য বাহির হইয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঐটি তাঁহার একমাত্র সন্তান। সাত-আট বৎসর হইল স্বামীর কাল হইয়াছে, তদবধি বিধবা নিজেই নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে মস্ত জমিদারি শাসন করিয়া আসিতেছেন। ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে, বিষয়-আশয়ের কোন সংবাদই তাহাকে রাখিতে হয় না। জননী মনে মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ছেলে ওকালতি পাস করিলে তাহার বিবাহ দিবেন এবং পুত্রবধূর হাতে জমিদারি এবং সংসারের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ইহার পূর্বে তিনি ছেলেকে সংসারী করিয়া তাহার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় হইবেন না। কিন্তু অন্যরূপ ঘটিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাটীতে এতদিন পর্যন্ত কোন কাজকর্ম হয় নাই। সেদিন কি একটা ব্রত উপলক্ষে সমস্ত গ্রাম নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মৃত অতুল মুখুয্যের দরিদ্র বিধবা এগারো বছরের মেয়ে লইয়া নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়াছিলেন। এই মেয়েটিকে তাঁহার বড় মনে ধরিয়াছে। শুধু যে মেয়েটি নিখুঁত সুন্দরী, তাহা নহে, ঐটুকু বয়সেই মেয়েটি যে অশেষ গুণবতী তাহাও তিনি দুই-চারিটি কথাবার্তায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, আচ্ছা, আগে ত মেয়ে দেখাই, তার পর কেমন না পছন্দ হয়, দেখা যাবে।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় সত্য খাবার খাইতে মায়ের ঘরে ঢুকিয়াই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার খাবারের জায়গার ঠিক সুমুখে আসন পাতিয়া বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীঠাকরুনটি কে হীরা-মুক্তায় সাজাইয়া বসাইয়া রাখিয়াছে।

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, খেতে বস্।

সত্যর চমক ভাঙ্গিল। সে থতমত খাইয়া বলিল এখানে কেন, আর কোথাও আমার খাবার দাও।

মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তুই ত আর সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস নে—ঐ একফোঁটা মেয়ের সামনে তোর আর লজ্জা কি।

আমি কারুকে লজ্জা করিনে, বলিয়া সত্য প্যাঁচার মত মুখ করিয়া সুমুখের আসনে বসিয়া পড়িল। মা চলিয়া গেলেন। মিনিট দুয়ের মধ্যে সে খাবারগুলো কোনমতে নাকেমুখে গুঁজিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ইতিমধ্যে বন্ধুরা জুটিয়াছে এবং পাশার ছক পাতা হইয়াছে। সে প্রথমেই দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আমি কিছুতেই বসতে পারব না, আমার ভারী মাথা ধরেচে। বলিয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গিয়া তাকিয়া মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বন্ধুরা মনে মনে কিছু আশ্চর্য হইল এবং লোকাভাবে পাশা তুলিয়া দাবা পাতিয়া বসিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক চেঁচামেচি ঘটিল, কিন্তু সত্য একবার উঠিল না, একবার জিজ্ঞাসা করিল না—কে হারিল, কে জিতিল। আজ এ-সব তাহার ভালই লাগিল না।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া সোজা নিজের ঘরে যাইতেছিল, ভাঁড়ারের বারান্দা হইতে মা জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মধ্যে শুতে যাচ্ছিস যে রে?

শুতে নয়, পড়তে যাচ্ছি। এম. এ.'র পড়া সোজা নয় ত! সময় নষ্ট করলে চলবে কেন? বলিয়া সে গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া দুমদুম শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

আধঘণ্টা কাটিয়াছে, সে একটি ছত্রও পড়ে নাই। টেবিলের উপর বই খোলা, চেয়ারে হেলান দিয়া, উপরের দিকে মুখ করিয়া কড়িকাঠ ধ্যান করিতেছিল, হঠাৎ ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সে কান খাড়া করিয়া শুনিল—ঝুম্। আর একমুহূর্ত—ঝুমঝুম্। সত্য সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, সেই আপাদমস্তক গহনা-পরা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মত মেয়েটি ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্য একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আপনার মত জিজ্ঞেসা করলেন।

সত্য মুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কার মা?

মেয়েটি কহিল, আমার মা।

সত্য তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণেক পরে কহিল, আমার মাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন।

মেয়েটি চলিয়া যাইতেছিল, সত্য সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তোমার নাম কি?

আমার নাম রাধারানী, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দুই

একফোঁটা রাধারানীকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সত্য এম. এ, পাস করিতে কলিকাতায় চলিয়া আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ত কোন মতেই না, খুব সম্ভব, পরেও না। সে বিবাহই করিবে না। কারণ, সংসারে জড়াইয়া গিয়া মানুষের আত্মসম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও রহিয়া রহিয়া তাহার সমস্ত মনটা যেন কি একরকম করিয়া ওঠে, কোথাও কোন নারীমূর্তি দেখিলেই আর একটি অতি ছোট মুখ তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিয়া তাহাকেই আবৃত করিয়া দিয়া একাকী বিরাজ করে ; সত্য কিছুতেই সেই লক্ষ্মীর প্রতিমাটিকে ভুলিতে পারে না। চিরদিনই সে নারীর প্রতি উদাসীন ; আকস্মাৎ এ তাহার কি হইয়াছে যে পথে-ঘাটে কোথাও বিশেষ একটা বয়সের কোন মেয়ে দেখিলেই তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, হাজার চেষ্টা করিয়াও সে যেন কোনমতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ হয়ত অত্যন্ত লজ্জা করিয়া, সমস্ত দেহ বারংবার শিহরিয়া উঠে, সে তৎক্ষণাৎ যে-কোন একটা পথ ধরিয়া দ্রুতপদে সরিয়া যায়।

সত্য সাঁতার কাটিয়া স্নান করিতে ভালবাসিত। তাহার চোরবাগানের বাসা হইতে গঙ্গা দূর নয়, প্রায়ই সে জগন্নাথের ঘাটে স্নান করিতে আসিত।

আজ পূর্ণিমা। ঘাটে একটু ভিড় হইয়াছিল। গঙ্গায় আসিলে সে যে উৎকলী ব্রাহ্মণের কাছে শুষ্ক বস্ত্র জিম্মা রাখিয়া জলে নামিত, তাহারই উদ্দেশে আসিতে গিয়া, একস্থানে বাধা পাইয়া স্থির হইয়া দেখিল, চার-পাঁচজন লোক একদিকে চাহিয়া আছে। সত্য তাহাদের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে গিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

তাহার মনে হইল, একসঙ্গে এত রূপ সে আর কখনও নারীদেহে দেখে নাই। মেয়েটির বয়স আঠার-উনিশের বেশি নয়। পরনে সাদাসিধা কালাপেড়ে ধুতি, দেহ সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিত, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কপালে চন্দনের ছাপ লইতেছে, এবং তাহারই পরিচিত পাণ্ডা একমনে সুন্দরীর কপালে নাকে আঁক কাটিয়া দিতেছে।

সত্য কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পাণ্ডা সত্যর কাছে যথেষ্ট প্রণামী পাইত, তাই রূপসীর চাঁদমুখের খাতির ত্যাগ করিয়া হাতের ছাঁচ ফেলিয়া দিয়া 'বড়বাবু'র শুষ্ক বস্ত্রের জন্য হাত বাড়াইল।

দু'জনের চোখাচোখি হইল। সত্য তাড়াতাড়ি কাপড়খানা পাণ্ডার হাতে দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া জলে গিয়া নামিল। আজ তাহার সাঁতার কাটা হইল না, কোনমতে স্নান সারিয়া লইয়া যখন সে বস্ত্র পরিবর্তনের জন্য উপরে উঠিল, তখন সেই অসামান্যা রূপসী চলিয়া গিয়াছে।

সেদিন সমস্তদিন ধরিয়া তাহার মন গঙ্গা গঙ্গা করিতে লাগিল, এবং পরদিন ভাল করিয়া সকাল না হইতেই মা গঙ্গা এমনি সজোরে টান দিলেন যে, সে বিলম্ব না করিয়া, আলনা হইতে একখানি বস্ত্র টানিয়া লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিল।

ঘাটে আসিয়া দেখিল, অপরিচিতা রূপসী এইমাত্র স্নান সারিয়া উপরে উঠিতেছেন। সত্য নিজেও যখন স্নানান্তে পাণ্ডার কাছে আসিল, তখন পূর্বদিনের মত আজিও তিনি ললাট চিত্রিত করিতেছিলেন। আজিও চারি চক্ষু মিলিল, আজিও তাহার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বহিয়া গেল : সে কোনমতে কাপড় ছাড়িয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তিন

রমণী যে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, সত্য তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন যে উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাহার একমাত্র হেতু—পূর্বে সত্য নিজে কতকটা বেলা করিয়াই স্নানে আসিত।

জাহ্নবীতটে উপর্যুপরি আজ সাতদিন উভয়ের চারি চক্ষু মিলিয়াছে, কিন্তু মুখের কথা হয় নাই। বোধ করি তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যেখানে চাহনিতে কথা হয়, সেখানে মুখের কথাকে মূক হইয়া থাকিতে হয়। এই অপরিচিতা রূপসী যেই হোন, তিনি যে চোখ দিয়া কথা কহিতে শিক্ষা করিয়াছেন, এবং সে বিদ্যায় পারদর্শী, সত্যের অন্তর্যামী তাহা নিভৃত অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছিল।

সেদিন স্নান করিয়া সে কতকটা অন্যমনস্কের মত বাসায় ফিরিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল, 'একবার শুনুন!' মুখ তুলিয়া দেখিল, রেলওয়ে লাইনে ওপারে সেই রমণী দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বাম কক্ষে জলপূর্ণ ক্ষুদ্র পিতলের কলস, দক্ষিণ হস্তে সিক্তবস্ত্র। মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে আহ্বান করিলেন। সত্য এদিক-ওদিক চাহিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তিনি উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার ঝি আজ আসেনি, দয়া করে একটু যদি এগিয়ে দেন ত বড় ভালো হয়।

অন্যদিন তিনি দাসী সঙ্গে করিয়া আসেন, আজ একা। সত্যের মনের মধ্যে দ্বিধা জাগিল, কাজটা ভাল নয় বলিয়া একবার মনেও হইল, কিন্তু সে 'না' বলিতেও পারিল না। রমণী তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া একটু হাসিলেন। এ হাসি যাহারা হাসিতে জানে, সংসারে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। সত্য তৎক্ষণাৎ 'চলুন' বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিল। দুই-চারি পা অগ্রসর হইয়া রমণী আবার কথা কহিলেন, ঝির অসুখ, সে আসতে পারলে না, কিন্তু আমিও গঙ্গাস্নান না করে থাকতে পারিনে - আপনারও দেখচি এ বদ অভ্যাস আছে।

সত্য আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ, আমিও প্রায় গঙ্গাস্নান করি।

এখানে কোথায় আপনি থাকেন?

চোরবাগানে আমার বাসা।

আমাদের বাড়ি জোড়াসাঁকোয়। আপনি আমাকে পাথুরেঘাটার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তা হয়ে যাবেন।

তাই যাব।

বহুক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হইল না। চিৎপুর রাস্তায় আসিয়া রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবার সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন, কাছেই আমাদের বাড়ি—এবার যেতে পারব—নমস্কার।

নমস্কার, বলিয়া সত্য ঘাড় গুঁজিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে যে কি করিতে লাগিল, সে কথা লিখিয়া জানান অসাধ্য। যৌবনে পঞ্চশরের প্রথম পুষ্পবাণের আঘাত যাঁহাকে সহিতে হইয়াছে, শুধু তাঁহারই মনে পড়িবে, শুধু তিনি বুঝিবেন, সেদিন কি হইয়াছিল। সবাই বুঝিবেন না, কি উন্মাদ নেশায় মাতিলে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস—সব রাঙ্গা দেখায়, সমস্ত চৈতন্য কি করিয়া চেতনা হারাইয়া, একখণ্ড প্রাণহীন চুম্বক-শলাকার মত শুধু সেই একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার জন্যই অনুক্ষণ উন্মুক্ত হইয়া থাকে।

পরদিন সকালে সত্য জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, রোদ উঠিয়াছে। একটা ব্যথার তরঙ্গ তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া গড়াইয়া গেল , সে নিশ্চিত বুঝিল, আজিকার দিনটা একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। চাকরটা সুমুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, হারামজাদা, এত বেলা হয়েছে, তুলে দিতে পারিস নি? যা, তোর এক টাকা জরিমানা।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। সত্য দ্বিতীয় বস্ত্র না লইয়াই ক্লষ্ট-মুখে বাসা হইতে বাহির হইয়া গেল।

পথে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিল এবং গাড়োয়ানকে পাথুরেঘাটার ভিতর দিয়া হাঁকাইতে হুকুম করিয়া, রাস্তার দুইদিকেই প্রাণপণে চোখ পাতিয়া রাখিল। কিন্তু গঙ্গায় আসিয়া, ঘাটের দিকে চাহিতেই তাহার সমস্ত ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল, বরঞ্চ মনে হইল, যেন অকস্মাৎ পথের উপরে নিক্ষিপ্ত একটা অমূল্য রত্ন কুড়াইয়া পাইল।

গাড়ি হইতে নামিতেই তিনি মৃদু হাসিয়া নিতান্ত পরিচিতের মত বলিলেন, এত দেরি যে? আমি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছি—শিগগির নেয়ে নিন, আজও আমার ঝি আসেনি।

এক মিনিট সবুর করুন, বলিয়া সত্য দ্রুতপদে জলে গিয়া নামিল। সাঁতার কাটা তাহার কোথায় গেল! সে কোনমতে গোটা দুই-তিন ডুব দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমার গাড়ি গেল কোথায়?

রমণী কহিলেন, আমি তাকে ভাড়া দিয়ে বিদেয় করেচি।

আপনি ভাড়া দিলেন!

দিলামই বা। চলুন। বলিয়া আর একবার ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া অগ্রবর্তিনী হইলেন।

সত্য একেবারেই মরিয়াছিল, না হইলে যত নিরীহ, যত অনভিজ্ঞই হোক, একবারও সন্দেহ হইত—এ-সব কি!

পথ চলিতে চলিতে রমণী কহিলেন, কোথায় বাসা বললেন, চোরবাগানে?

সত্য কহিল, হাঁ।

সেখানে কি কেবল চোরেরাই থাকে?

সত্য আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

আপনি ত চোরের রাজা। বলিয়া রমণী ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া কটাক্ষে হাসিয়া আবার নির্বাক মরাল-গমনে চলিতে লাগিলেন। আজ কক্ষের ঘট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল, ভিতরে গঙ্গাজল ছলাৎ-ছল্ ছলাৎ-ছল্ শব্দে—অর্থাৎ, ওরে মুগ্ধ—ওরে অন্ধ যুবক! সাবধান! এ-সব ছলনা—সব ফাঁকি, উছলিয়া উছলিয়া একবার ব্যঙ্গ, একবার তিরস্কার করিতে লাগিল।

মোড়ের কাছাকছি আসিয়া সত্য সসঙ্কোচে কহিল, গাড়ি-ভাড়াটা—

রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, সে ত আপনার দেওয়াই হয়েচে।

সত্য এই ইঙ্গিত না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, আমার দেওয়া কি করে?

আমার আর আছে কি যে দেব! যাঁ ছিল সমস্তই ত তুমি চুরি-ডাকাতি করে নিয়েচ। বলিয়াই সে চকিতে মুখ ফিরাইয়া; বোধ করি উচ্ছ্বসিত হাসির বেগ জোর করিয়া রোধ করিতে লাগিল।

এ অভিনয় সত্য দেখিতে পায় নাই, তাই এই চুরির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত তীব্র তড়িৎরেখার মত তাহার সংশয়ের জাল আপ্রান্ত বিদীর্ণ করিয়া বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্তে সাধ হইল, এই প্রকাশ্য রাজপথেই ওই দুটি রাঙ্গা পায়ে লুটাইয়া পড়ে, কিন্তু চক্ষের নিমিষে গভীর লজ্জায় তাহার মাথা এমনি হেঁট হইয়া গেল যে, সে মুখ তুলিয়া একবার প্রিয়তমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নিঃশব্দে নতমুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ও-ফুটপাতে তাহার আদেশমত দাসী অপেক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া কহিল, আচ্ছা দিদিমণি, বাবুটিকে এমন করে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চ কেন? বলি, কিছু আছে টাছে? দু'পয়সা টানতে পারবে ত?

রমণী হাসিয়া বলিল, তা জানিনে, কিন্তু হাবাগোবা লোকগুলোকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে আমার বেশ লাগে।

দাসীটিও খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল, এতও পার তুমি! কিন্তু যাই বল দিদিমণি, দেখতে যেন রাজপুত্তুর! যেমন চোখমুখ, তেমনি রঙ। তোমাদের দুটিকে দিব্যি মানায়—দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছিলে, যেন একটি জোড়া-গোলাপ ফুটে ছিল।

রমণী মুখ টিপিয়া বলিল, আচ্ছা চল্। পছন্দ হয়ে থাকে ত না হয় তুই নিস্।

দাসীও হটিবার পাত্রী নয়, সেও জবাব দিল, না দিদিমণি, ও জিনিস প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারবে না, তা বলে দিলুম।

চার

জ্ঞানীরা কহিয়'ছেন, অসম্ভব কাণ্ড চোখে দেখিলেও বলিবে না, কারণ, অজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে না। এই অপরাধেই শ্রীমন্ত বেচারা নাকি মশানে গিয়াছিল। সে যাই হোক, ইহা অতি সত্য কথা, সত্য লোকটা সেদিন বাসায় ফিরিয়া টেনিসন্ পড়িয়াছিল এবং ডন্ জুয়ানের বাঙলা তর্জমা করিতে বসিয়াছিল। অতবড় ছেলে, কিন্তু একবারও এ সংশয়ের কণামাত্রও তাহার মনে উঠে নাই যে, দিনের বেলা শহরের পথেঘাটে এমন অদ্ভুত প্রেমের বান ডাকা সম্ভব কি না, কিংবা সে বানের স্রোতে গা ভাসাইয়া চলা নিরাপদ কি না।

দিন-দুই পরে স্নানান্তে বাটী ফিরিবার পথে অপরিচিতা সহসা কহিল, কাল রাত্রে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম, সরলার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়—না?

সত্য সরলা প্লে দেখে নাই, স্বর্ণলতা বই পড়িয়াছিল ; আস্তে আস্তে বলিল হাঁ, বড় দুঃখ পেয়েই মারা গেল।

রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কি ভয়ানক কষ্ট! আচ্ছা, সরলাই বা তার স্বামীকে এত ভালবাসলে কি করে, আর তার বড়জা-ই বা পারেনি কেন বলতে পার?

সত্য সংক্ষেপে জবাব দিল, স্বভাব।

রমণী কহিল, ঠিক তাই! বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু সব স্ত্রী-পুরুষই কি পরস্পরকে সমান ভালবাসতে পারে? পারে না। কত লোক আছে, মরবার দিনটি পর্যন্ত ভালবাসা কি, জানতেও পায় না। জানবার ক্ষমতাই তাদের থাকে না। দেখনি, কত লোক গান-বাজনা হাজার ভাল হলেও মন দিয়ে শুনতে পারে না, কত লোক কিছুতেই রাগে না—রাগতে পারেই না! লোকে তাদের খুব গুণ গায় বটে, আমার কিন্তু নিন্দে করতে ইচ্ছে করে।

সত্য হাসিয়া বলিল, কেন?

রমণী উদ্দীপ্তকণ্ঠে উত্তর করিল, তারা অক্ষম বলে। অক্ষমতার কিছু কিছু গুণ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু দোষটাই বেশি। এই যেমন সরলার ভাশুর,—স্ত্রীর অতবড় অত্যাচারেও তার রাগ হল না।

সত্য চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনরায় কহিল, আর তার স্ত্রী, ঐ প্রমদাটা কি শয়তান মেয়েমানুষ। আমি থাকতুম ত রাক্ষসীর গলা টিপে দিতুম।

সত্য সহাস্যে কহিল, থাকতে কি করে? প্রমদা বলে সত্যই ত কেউ ছিল না,—কবির কল্পনা—

রমণী বাধা দিয়া কহিল, তবে অমন কল্পনা করা কেন? আচ্ছা, সবাই বলে, সমস্ত মানুষের ভেতরেই ভগবান আছেন, আত্মা আছেন, কিন্তু প্রমদার চরিত্র দেখলে মনে হয় না যে, তার ভেতরেও ভগবান ছিলেন। সত্যি বলচি তোমাকে, কোথায় বড় বড় লোকের বই পড়ে মানুষ ভাল হবে, মানুষকে মানুষ ভালবাসবে, তা না, এমন বই লিখে দিলেন যে, পড়লে মানুষের ওপর মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—বিশ্বাস হয় না যে সত্যিই সব মানুষের অন্তরেই ভগবানের মন্দির আছে।

সত্য বিস্মিত হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, তুমি বুঝি খুব বই পড়?

রমণী কহিল, ইংরেজী জানিনে ত, বাংলা বই যা বেরোয়, সব পড়ি। এক-একদিন সারারাত্রি পড়ি—এই যে বড় রাস্তা—চল না আমাদের বাড়ি যত বই আছে সব দেখাব।

সত্য চমকিয়া উঠিল—তোমাদের বাড়ি?

হাঁ, আমাদের বাড়ি—চল, যেতে হবে তোমাকে।

হঠাৎ সত্যর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, সে সভয়ে বলিয়া উঠিল, না, না, ছি, ছি,—

ছি ছি কিছু নেই—চল।

না না, আজ না—আজ থাক, বলিয়া সত্য কম্পিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ তাহার এই অপরিচিতা প্রেমাস্পদার উদ্দেশে গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার হৃদয় অবনত হইয়া রহিল।

পাঁচ

সকালবেলা স্নান করিয়া সত্য ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি ক্লান্ত, সজল। চোখের পাতা তখনও আর্দ্র। আজ চারদিন গত হইয়াছে, সেই অপরিচিতা প্রিয়তমাকে সে দেখিতে পায় নাই—আর তিনি গঙ্গাস্নানে আসেন না।

আকাশ পাতাল কত কী যে এই কয়দিন সে ভাবিয়াছে, তাহার সীমা নাই। মাঝে মাঝে ও দুশ্চিন্তা মনে উঠিয়াছে, হয় তো তিনি বাঁচিয়া নাই হয় তো বা মৃত্যুশয্যায়! কে জানি!

সে গলাটা জানি বটে, কিন্তু আর কিছু চেনে না। কাহার বাড়ি কোথায় বাড়ি কিছুই জানি না। মনে করিলে অনুশোচনায় আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। কেন সে সেদিন যায় নাই? কেন সেই সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছিল?

সে যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নহে, হৃদয়ের গভীর তৃষ্ণা। ইহাতে ছলনা-কাপট্যের ছায়ামাত্র ছিল না, যাহা ছিল—তাহা সত্যই নিঃস্বার্থ, সত্যই পবিত্র, বুকজোড়া স্নেহ।

বাবু!

সত্য চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই দাসী যে সঙ্গে আসিত, পথের ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া ভারী গলায় কহিল, কি হয়েছে তাঁর? বলিয়াই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল—সামলাইতে পারিল না।

দাসী মুখ নীচু করিয়া হাসি গোপন করিল, বোধ করি হাসিয়া ফেলিবার ভয়েই মুখ নীচু করিয়াই বলিল, দিদিমণির বড় অসুখ—আপনাকে দেখতে চাইচেন।

চল, বলিয়া সত্য তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া চোখ মুছিয়া সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে প্রশ্ন করিল, কি অসুখ? খুব শক্ত দাঁড়িয়েছে কি?

দাসী কহিল, না, তা হয়নি, কিন্তু খুব জ্বর।

সত্য মনে মনে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইল, আর প্রশ্ন করিল না। বাড়ির সুমুখে আসিয়া দেখিল, খুব বড় বাড়ি, দ্বারের কাছে বসিয়া একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান ঝিমাইতেছে। দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি গেলে তোমার দিদিমণির বাবা রাগ করবেন না ত? তিনি ত আমাকে চেনেন না।

দাসী কহিল, দিদিমণির বাপ নেই, শুধু মা আছেন। দিদিমণির মত তিনিও আপনাকে খুব ভালবাসেন।

সত্য আর কিছু না বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

সিঁড়ি বাহিয়া তেতলার বারান্দায় আসিয়া দেখিল, পাশাপাশি তিনটি ঘর, বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায়, মনে হইল, সেগুলি চমৎকার সাজান। কোণের ঘর হইতে উচ্চহাসির সঙ্গে তবলা ও ঘুঙুরের শব্দ আসিতেছিল। দাসী হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ ঘর—চলুন। দ্বারের সুমুখে আসিয়া সে হাত দিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া সু-উচ্চকণ্ঠে বলিল দিদিমণি, এই নাও তোমার নাগর।

তীব্র হাসি ও কোলাহল উঠিল। ভিতরে যাহা দেখিল, তাহাতে সত্যর সমস্ত মস্তিষ্ক ওলট-পালট হইয়া গেল; তাহার মনে হইল, হঠাৎ সে মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছে, কোনমতে দোর ধরিয়া, সে সেখানেই চোখ বুজিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িল।

ঘরের ভিতরে মেঝেয় মোটা গদি-পাতা বিছানার উপর দু-তিনজন ভদ্রবেশি পুরুষ, একজন হারমোনিয়াম, একজন বাঁয়া-তবলা লইয়া বসিয়া আছে,—আর একজন একমনে মদ খাইতেছে। আর তিতি? তিনি বোধ করি, এইমাত্র নৃত্য করিতেছিলেন; দুই পায়ে একরাশ ঘুঙুর বাঁধা নানা অলঙ্কারে সর্বাঙ্গ ভূষিত—সুরারঞ্জিত চোখ দুটি ঢুলুঢুলু করিতেছে; স্খলিতপদে কাছে সরিয়া আসিয়া, সত্যর একটা হাত ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বঁধুর মির্গি ব্যামো আছে নাকি? নে ভাই, ইয়ারকি করিস নে, ওঠ্— ও সবে আমার ভারী ভয় করে।

প্রবল তড়িৎস্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠে, ইহার কর স্পর্শে সত্যর আপাদমস্তক তেমনি করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

রমণী কহিল, আমার নাম শ্রীমতি বিজ্‌লী—তোমার নামটা কি ভাই? হাবু? গাবু?—

সমস্ত লোকগুলা হো হো শব্দে অট্টহাসি জুড়িয়া দিল, দিদিমণির দাসীটি হাসির চোটে একেবারে মেঝের উপর গড়াইয়া শুইয়া পড়িল—কি রঙ্গই জান দিদিমণি!

বিজ্‌লী কৃত্রিম রোষের স্বরে তাহাকে একটা ধমক দিয়া বলিল, থাম্, বাড়াবাড়ি করিস নে—আসুন, উঠে আসুন, বলিয়া জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া, পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল—

আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা।
পাঁচবাণ অব লাখবাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অব সোন যবহু মবি পরিহোয়ত--
তবহুঁ মানব নিজ দেহা--

যে লোকটা মদ খাইতেছিল, উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। তাহার নেশা হইয়াছিল, কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরমশাই, বড় পাতকী আমি—একটু পদরেণু—

অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ সত্য স্নান করিয়া একখানা গরদের কাপড় পরিয়াছিল।

যে লোকটা হারমোনিয়াম বাজাইতেছিল, তাহার কতকটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল, সে সহানুভূতির স্বরে কহিল, কেন বেচারাকে মিছামিছি সঙ্ সাজাচ্চ?

বিজ্‌লী হাসিতে হাসিতে বলিল, বাঃ মিছামিছি কিসে? ও সত্যিকারের সঙ্ বলেই ত এমন আমোদের দিনে ঘরে এনে তোমাদের তামাশা দেখাচ্চি। আচ্ছা, মাথা খাস গাবু, সত্যি বল্ ত ভাই, কি আমাকে তুই ভেবেছিলি? নিত্য গঙ্গাস্নানে যাই, কাজেই ব্রাহ্মও নই মোচলমান খ্রীষ্টানও নই। হিঁদুর ঘরে এতবড় ধাড়ী মেয়ে, হয় সধবা, নয় বিধবা কি মতলবে চুটিয়ে পীরিত করছিলি বল্ ত? বিয়ে করবি বলে, না, ভুলিয়ে নিয়ে লম্বা দিবি বলে?

ভারী একটা হাসি উঠল। তার পর সকলে মিলিয়া কত কথাই বলিতে লাগিল। সত্য একটিবার মুখ তুলিল না, একটা কথার জবাব দিল না। সে মনে মনে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিবই বা কি করিয়া, আর বলিলে বুঝিবেই বা কে? থাক্ সে।

বিজ্‌লী সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাঃ, বেশ ত আমি! যা ক্ষ্যামা, শিগ্‌গির যা —বাবুর খাবার নিয়ে আয়. স্নান করে এসেচেন, বাঃ, আমি কেবল তামাশাই কচ্চি যে! বলিতে বলিতেই তাহার অনতিকাল পূর্বের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বক্র-তপ্ত কণ্ঠস্বর অকৃত্রিম সস্নেহ অনুতাপে যথার্থই জুড়াইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী একথালা খাবার আনিয়া হাজির করিল। বিজ্‌লী নিজের হাতে লইয়া আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, মুখ তোল, খাও।

এতক্ষণ সত্য তাহার সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিজেকে সামলাইতেছিল, এইবার মুখ তুলিয়া শান্তভাবে বলিল, আমি খাব না।

কেন? জাত যাবে? আমি হাড়ী না মুচি?

সত্য তেমনি শান্তকণ্ঠে বলিল, তা হলে খেতুম। আপনি যা তাই।

বিজ্‌লী খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, হাবুবাবুও ছুরি-ছোরা চালাতে জানেন দেখচি। কিন্তু

আবার হাসিল, কিন্তু তাহা শব্দ মাত্র, হাসি নয়, তাই আর কেহ সে হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

সত্য কহিল, আমার নাম সত্য 'হাবু' নয়। আমি ছুরি-ছোরা চালাতে কখন শিখিনি, কিন্তু, নিজের ভুল টের পেলে শোধরাতে শিখেচি।

বিজ্‌লী হঠাৎ কি কথা বলিতে গেল, কিন্তু চাপিয়া লইয়া শেষে কহিল, আমার ছোঁয়া খাবে না?

না।

বিজ্‌লী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিহাসের স্বরে এবার তীব্রতা মিশিল ; জোর দিয়া কহিল, খাবেই। এই বলচি তোমাকে, আজ না হয় কাল, না হয় দু'দিন পরে খাবেই তুমি।

সত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, দেখুন, ভুল সকলেরই হয়। আমার ভুল যে কত বড় তা সবাই টের পেয়েছে ; কিন্তু আপনারও ভুল হচ্চে। আজ নয়, আগামী জন্মে নয়—কোনকালেই আপনার ছোঁয়া খাব না। অনুমতি করুন, আমি যাই—আপনার নিঃশ্বাসে আমার রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে।

তাহার মুখের উপর গভীর ঘৃণার এমনি সুস্পষ্ট ছায়া পড়িল যে, তাহা ঐ মাতালটার চক্ষুও এড়াইল না। সে মাথা নাড়িয়া কহিল, বিজ্‌লীবিবি, অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্! যেতে দাও—যেতে দাও—সকালবেলার আমোদটাই ও মাটি করে দিলে।

বিজ্‌লী জবাব দিল না, স্তম্ভিত হইয়া সত্যর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যথার্থই তাহার ভয়ানক ভুল হইয়াছিল। সে ত কল্পনাও করে নাই এমনি মুখচোরা শান্ত লোক এমন করিয়া বলিতে পারে।

সত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজ্‌লী মৃদুস্বরে কহিল, আর একটু বসো।

মাতাল শুনিতে পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, উঁ হুঁ হুঁ, প্রথম চোটে একটু জোর খেলবে—যেতে দাও—যেতে দাও—সুতো ছাড়ো—সুতো ছাড়ো—

সত্য ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল ; বিজ্‌লী পিছনে আসিয়া পথরোধ করিয়া চুপি চুপি বলিল, ওরা দেখতে পাবে, তাই, নইলে হাতজোড় করে বলতুম, আমার বড় অপরাধ হয়েচে—

সত্য অন্যদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে পুনর্বার কহিল, এই পাশের ঘরটা আমার পড়ার ঘর। একবার দেখবে না? একটি বার এসো, মাপ চাচ্চি।

না, বলিয়া সত্য সিঁড়ির অভিমুখে অগ্রসর হইল। বিজ্‌লী পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে কহিল, কাল দেখা হবে?

না।

আর কি কখনো দেখা হবে না?

না।

কান্নায় বিজ্‌লীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ; ঢোক গিলিয়া জোর করিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, আমার বিশ্বাস হয় না, আর দেখা হবে না। কিন্তু তাও যদি না হয়, বল, এই কথাটা আমার বিশ্বাস করবে?

ভগ্নস্বর শুনিয়া সত্য বিস্মিত হইল, কিন্তু এই পনের-ষোল দিন ধরিয়া যে অভিনয় সে দেখিয়াছে, তাহার কাছে ত ইহা কিছুই নয়। তথাপি সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। সে-মুখের রেখায় রেখায় সুদৃঢ় অপ্রত্যয় পাঠ করিয়া বিজ্‌লীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে করিবে কি? হায়, হায়! প্রত্যয় করাইবার সমস্ত উপায়ই যে সে আবর্জনার মত স্বহস্তে ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে!

সত্য প্রশ্ন করিল, কি বিশ্বাস করব?

বিজ্‌লীর ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু স্বর ফুটিল না। অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ মুহূর্তের জন্য তুলিয়াই অবনত করিল। সত্য তাহাও দেখিল, কিন্তু অশ্রুর কি নকল নাই! বিজ্‌লী মুখ না তুলিয়াই বুঝিল, সত্য অপেক্ষা করিয়া আছে ; কিন্তু সেই কথাটা যে মুখ দিয়া সে কিছুতেই বাহির করিতে পারিতেছে না, যাহা বাহিরে আসিবার জন্য তাহার বুকের পাঁজরগুলো ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে!

সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার একটা কণা সার্থক করিবার লোভে সে এই রূপের ভাণ্ডার

দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মতই ত্যাগ করিতে পারে—কিন্তু কে তাহা বিশ্বাস করিবে! সে যে দাগী আসামী। অপরাধের শতকোটি চিহ্ন সর্বাঙ্গে মাখিয়া বিচারের সুমুখে দাঁড়াইয়া, আজ কি করিয়া সে মুখে আনিবে, অপরাধ করাই তাহার পেশা বটে, কিন্তু এবার সে নির্দোষ! যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সে বুঝিতে লাগিল, বিচারক তাহার ফাঁসির হুকুম দিতে বসিয়াছে, কিন্তু কি করিয়া সে রোধ করিবে?

সত্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল ; সে বলিল, চললুম।

বিজ্‌লী তবুও মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু এবার কথা কহিল। বলিল, যাও কিন্তু যে কথা অপরাধে মগ্ন থেকেও আমি বিশ্বাস করি, সে কথা অবিশ্বাস করে যেন তুমি অপরাধী হয়ো না। বিশ্বাস করো, সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন এবং আমরণ দেহটাকে তিনি ছেড়ে চলে যান না। একটু থামিয়া কহিল, সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, তবুও তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পার, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। বলিয়াই পদশব্দে মুখ তুলিয়া দেখিল, সত্য ধীরে ধীরে নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছে।

স্বভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাকে ত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। নারীদেহের উপর শত অত্যাচার চলিতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না! বিজ্‌লী নর্তকী, তথাপি সে যে নারী! আজীবন সহস্র অপরাধে অপরাধী, তবুও যে এটা তাহার নারীদেহ! ঘণ্টা-খানেক পরে যখন সে এ ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার লাঞ্ছিত অর্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃতস্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে। এই অত্যল্প সময়টুকুর মধ্যে তাহার সমস্ত দেহে যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ঐ মাতালটা পর্যন্ত টের পাইল। সে-ই মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল,—কি বাইজী, চোখের পাতা ভিজে যে! মাইরি, ছোঁড়াটা কি একগুঁয়ে, অমন জিনিসগুলো মুখে দিলে না! দাও দাও, থালাটা এগিয়ে দাও ত হ্যাঁ, বলিয়া নিজেই টানিয়া গিলিতে লাগিল।

তাহার একটি কথাও বিজ্‌লীর কানে গেল না। হঠাৎ তাহার নিজের পায়ে নজর পড়ায় পায়ে বাঁধা ঘুঙুরের তোড়া যেন বিছার মত তাহার দু পা বেড়িয়া দাঁত ফুটাইয়া দিল, সে তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, খুললে যে?

বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর পরব না বলে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আর না। বাইজী মরেছে...

মাতাল সন্দেশ চিবাইতেছিল। কহিল, কি রোগে বাইজী?

বাইজী আবার হাসিল। এ সেই হাসি। হাসিমুখে কহিল, যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে—আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজী চিরদিনের জন্য মরে গেল বন্ধু।

ছয়

চার বৎসর পরের কথা বলিতেছি। কলিকাতার একটা বড় বাড়িতে জমিদারের ছেলের অন্নপ্রাশন। খাওয়ানো-দাওয়ানোর বিরাট ব্যাপার শেষ হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর বহির্বাটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসর করিয়া আমোদ-আহ্লাদ নাচ গানের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে।

একধারে তিন-চারটি নর্তকী—ইহারাই নাচ-গান করিবে। দ্বিতলে বারান্দায় চিকের আড়ালে বসিয়া রাধারানী একাকী নীচের জনসমাগম দেখিতেছিল। নিমন্ত্রিতা মহিলারা এখনও শুভাগমন করেন নাই।

নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া সত্যেন্দ্র কহিলেন, এত মন দিয়ে কি দেখচ বল ত?

রাধারানী স্বামীর দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিল, যা সবাই দেখতে আসচে—বাইজীদের সাজসজ্জা—কিন্তু, হঠাৎ তুমি যে এখানে?

স্বামী হাসিয়া জবাব দিলেন, একলাটি বসে আছ, তাই একটু গল্প করতে এলুম।

ইস্!

সত্যি! আচ্ছা, দেখচ ত, বল দেখি, ওদের মধ্যে সবচেয়ে কোন্‌টিকে তোমার পছন্দ হয়?

ঐটিকে, বলিয়া রাধারানী আঙুল তুলিয়া, যে স্ত্রীলোকটি সকলের পিছনে নিতান্ত সাদাসিধা পোশাকে বসিয়াছিল তাহাকেই দেখাইয়া দিল।

স্বামী বলিলেন, ও যে নেহাত রোগা।

তা হোক, ঐ সবচেয়ে সুন্দরী। কিন্তু বেচারী গরীব—গায়ে গয়না-টয়না এদের মত নেই।

সত্যেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তা হবে। কিন্তু, এদের মজুরি কত জান?

না।

সত্যেন্দ্র হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এদের দু'জনের ত্রিশ টাকা করে, ঐ ওর পঞ্চাশ, আর যেটিকে গরীব বলচ, তার দু শ টাকা।

রাধারানী চমকিয়া উঠিল—দু শ! কেন, ও কি খুব ভাল গান করে?

কানে শুনিনি কখনো। লোকে বলে, চার-পাঁচ বছর আগে খুব ভালই গাইত,—কিন্তু, এখন পারবে কিনা বলা যায় না।

তবে, অত টাকা দিয়ে আনলে কেন?

তার কমে ও আসে না। এতেও আসতে রাজী ছিল না, অনেক সাধাসাধি করে আনা হয়েছে।

রাধারানী অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, টাকা দিয়ে সাধাসাধি কেন?

সত্যেন্দ্র নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন, তার প্রথম কারণ, ও ব্যবসা ছেড়ে দিয়েচে। গুণ ওর যতই হোক, এত টাকা সহজে কেউ দিতেও চায় না, ওকেও আসতে হয় না, এই ওর ফন্দি! দ্বিতীয় কারণ, আমার নিজের গরজ।

কথাটা রাধারানী বিশ্বাস করিল না। তথাপি আগ্রহে ঘেঁষিয়া বসিয়া বলিল, তোমার গরজ ছাই। কিন্তু ব্যবসা ছেড়ে দিলে কেন?

শুনবে?

হাঁ, বল।

সত্যেন্দ্র একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, ওর নাম বিজ্‌লী। এক সময়ে—কিন্তু, এখানে লোক এসে পড়বে যে রানী, ঘরে যাবে?

যাব, চল, বলিয়া রাধারানী উঠিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া রাধারানী আঁচলে চোখ মুছিল। শেষে বলিল, তাই আজ ওকে অপমান করে শোধ নেবে? এ বুদ্ধি কে তোমাকে দিলে?

এদিকে সত্যেন্দ্রর নিজের চোখও শুষ্ক ছিল না, অনেকবার গলাটাও ধরিয়া আসিতেছিল। তিনি বলিলেন, অপমান বটে, কিন্তু সে অপমান আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না। কেউ জানবেও না।

রাধারানী জবাব দিল না। আর একবার আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে আসর ভরিয়া গিয়াছে এবং উপরের বারান্দায় বহু স্ত্রীকণ্ঠের সলজ্জ চীৎকার চিকের আবরণ ভেদ করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য নর্তকীরা প্রস্তুত হইয়াছে, শুধু বিজ্‌লী তখনও মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া আছে। তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে তাহার সঞ্চিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল, তাই অভাবের তাড়নায় বাধ্য হইয়া আবার সেই কাজ অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছে, যাহা সে শপথ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু, সে মুখ তুলিয়া খাড়া হইতে পারিতেছিল না। অপরিচিত পুরুষের সতৃষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দেহ যে এমন পাথরের মত ভারী হইয়া উঠিবে, পা এমন করিয়া দুমড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিবে, তাহা সে ঘণ্টা-দুই পূর্বে কল্পনা করিতেও পারে নাই।

আপনাকে ডাকচেন -। বিজ্‌লী মুখ তুলিয়া দেখিল পাশে দাঁড়াইয়া একটি বার তের বছরের ছেলে। সে উপরের বারান্দা নির্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, মা আপনাকে ডাকচেন।

বিজ্‌লী বিশ্বাস করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কে আমাকে ডাকচেন?

মা ডাকচেন।

তুমি কে?

আমি বাড়ির চাকর।

বিজ্‌লী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমাকে নয়, তুমি আবার জিজ্ঞাসা করে এসো।

বালক খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আপনার নাম বিজ্‌লী ত? আপনাকেই ডাকচেন—আসুন আমার সঙ্গে, মা দাঁড়িয়ে আছেন।

চল, বলিয়া বিজ্‌লী তাড়াতাড়ি পায়ের ঘুঙুর খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া অন্দরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনে করিল, গৃহিণীর বিশেষ কিছু ফরমায়েস আছে, তাই এই আহ্বান।

শোবার ঘরের দরজার কাছে রাধারানী ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এস্ত কুণ্ঠিত পদে বিজ্‌লী সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্রই সে সসম্ভ্রমে হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া আনিল, এবং একটা চৌকির উপর জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া হাসিমুখে কহিল, দিদি, চিনতে পার?

বিজ্‌লী বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। রাধারানী কোলের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল, ছোটবোনকে না হয় নাই চিনলে দিদি, সে দুঃখ করিনে, কিন্তু, এটাকে না চিনতে পারলে সত্যিই ভারী ঝগড়া করব। বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

এমন হাসি দেখিয়াও বিজ্‌লী তথাপি কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু তাহার আঁধার আকাশ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতে লাগিল। সেই অনিন্দ্যসুন্দর মাতৃমুখ হইতে সদ্যবিকশিত গোলাপ-সদৃশ শিশুর মুখের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া রহিল। রাধারানী নিস্তব্ধ। বিজ্‌লী নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া শিশুকে কোলে টানিয়া লইয়া সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাধারানী কহিল, চিনেচ দিদি?

চিনেচি বোন।

রাধারানী কহিল, দিদি, সমুদ্র মন্থন করে বিষটুকু তার নিজে খেয়ে সমস্ত অমৃতটুকু এই ছোটবোনটিকে দিয়েচ। তোমাকে ভালবেসেছিলেন বলেই আমি তাঁকে পেয়েচি।

সত্যেন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ হাতে তুলিয়া বিজ্‌লী একদৃষ্টে দেখিতেছিল, মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, বিয়ের বিষই যে অমৃত বোন। আমি বঞ্চিত হইনি ভাই। সেই বিষই এই ঘোর পাপিষ্ঠাকে অমর করেচে।

রাধারানী সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, দেখা করবে দিদি

বিজ্‌লী একমুহূর্ত চোখ বুজিয়া স্থির থাকিয়া বলিল, না দিদি। চার বছর আগে যেদিন তিনি এই অস্পৃশ্যটাকে চিনতে পেরে, বিষম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সেদিন দর্প করে বলেছিলুম, আবার দেখা হবে, আবার তুমি আসবে। কিন্তু সেই দর্প আমার রইল না, আর তিনি এলেন না। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি, কেন দর্পহারী আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিলেন। তিনি ভেঙ্গে দিয়ে যে কি করে গড়ে দেন, কেড়ে নিয়ে যে কি করে ফিরিয়ে দেন সে কথা আমার চেয়ে আজ কেউ জানে না বোন! বলিয়া সে আর একবার ভাল করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, প্রাণের জ্বালায় ভগবানকে নির্দয় নিষ্ঠুর বলে অনেক দোষ দিয়েচি, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি, এই পাপিষ্ঠাকে তিনি কি দয়া করেচেন। তাঁকে ফিরিয়ে এনে দিলে, আমি যে সবদিকে মাটি হয়ে যেতুম! তাঁকেও পেতুম না, নিজেকেও হারিয়ে ফেলতুম।

কান্নায় রাধারানীর গলা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে কিছুই বলিতে পারিল না। বিজ্‌লী পুনরায় কহিল, ভেবেছিলুম, কখনও দেখা হলে তাঁর পায়ে ধরে আর একটিবার মাপ চেয়ে দেখব। কিন্তু তার আর দরকার নেই। এই ছবিটুকু শুধু দাও দিদি এর বেশি আমি চাইনে। চাইলেও ভগবান তা সহ্য করবেন না—আমি চললুম বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাধারানী গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল আবার কবে দেখা হবে দিদি?

দেখা আর হবে না বোন। আমার একটা ছোট বাড়ি আছে সেইটে বিক্রি করে যত শীঘ্র পারি চলে যাব। ভাল কথা, বলতে পার ভাই, কেন হঠাৎ তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করেছিলেন? যখন তাঁর লোক আমাকে ডাকতে যায়, তখন কেন একটা মিথ্যে নাম বলেছিল?

লজ্জায় রাধারানীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বিজ্‌লী ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল, হয়ত বুঝচি। আমাকে অপমান করবেন বলে, না? তাছাড়া এত চেষ্টা করে আমাকে আনবার ত কোন কারণই দেখিনে।

রাধারানীর মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল। বিজ্‌লী হাসিয়া বলিল, তোমার লজ্জা কি বোন? তবে তাঁরও ভুল হয়েচে। তাঁর পায়ে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বোলো, সে হবার নয়। আমার নিজের বলে আর কিছু নেই! অপমান করলে, সমস্ত অপমান তাঁর গায়েই লাগবে।

নমস্কার দিদি!

নমস্কার বোন! বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার ত আমার নেই—আমি কায়মনে প্রার্থনা করি বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।

পরশুরাম

দাঁড়কাগ

কাঞ্চন মজুমদার অনেক কাল পরে তার বন্ধু যতীশ মিত্রের আড্ডায় এসেছে। তাকে দেখে সকলে উৎসুক হয়ে নানারকম সম্ভাষণ করতে লাগল।—আরে এস এস, এত দিন কোথায় ডুব মেরে ছিলে? বিদেশে বেড়াতে গিয়েছিলে নাকি? ব্যারিস্টারিতে খুব রোজগার হচ্ছে বুঝি, তাই গরীবদের আর মনে পড়ে না?

প্রবীণ পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, বে-থা করলে, না এখনও আইবুড় কার্তিক হয়ে আছ?

কাঞ্চন বলল, কই আর বিয়ে হল সর্বজ্ঞ মশাই, পাত্রীই জুটছে না।

উপেন দত্ত বলল, আমাদের মতন চুনো পুঁটি সকলেরই কোন্ কাজে জুটে গেছে, শুধু তোমারই জোটে না কেন? অমন মদনমোহন চেহারা, উদীয়মান ব্যারিস্টার, দেদার পৈতৃক টাকা, তবু বিয়ে হয় না? ধনুকভাঙা পণ কিছু আছে বুঝি? এদিকে বয়স তো হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, চুল উঠে ডিউক অভ এডিনবরোর মতন প্রশস্ত ললাট দেখা দিচ্ছে, খুঁজলে দু-চারটে পাকা চুলও বেরুবে। পাত্রীরা তোমাকে বয়কট করেছে নাকি?

—বয়কট করলে তো বেঁচে যেতুম। ষোল থেকে বত্রিশ যেখানে যিনি আছেন সবাই ছেঁকে ধরেছেন। গণ্ডা গণ্ডা রূপসী যদি আমার প্রেমে পড়তে চান তবে বেছে নেব কাকে?

উপেন বলল, উঃ দেমাকের ঘটাখানা দেখ! তুমি কি বলতে চাও গণ্ডা গণ্ডা রূপসীর মধ্যে তোমার উপযুক্ত কেউ নেই? আসল কথা, তুমি ভীষণ খুঁতখুঁতে মানুষ। নিশ্চয় তোমার মনের মধ্যে কোনও গণ্ডগোল আছে, নিজেকে অদ্বিতীয় রূপবান গুণনিধি মনে কর তাই পছন্দ মত মেয়ে কিছুতেই খুঁজে পাও না। হয়তো মেয়েরাই তোমার কথা শুনে ভড়কে যায়।

—মিছিমিছি দোষ দিও না উপেন। বিয়ের জন্য আমি সত্যিই চেষ্টা করছি, কিন্তু যাকে তাকে তো চিরকালের সঙ্গিনী করতে পারি না। হঠাৎ প্রেমে পড়ার লোক আমি নই, আমার একটা আদর্শ একটা মিনিমম স্ট্যাণ্ডার্ড আছে। রূপ অবশ্যই চাই, কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধি কলচারও বাদ দিতে পারি না। সুশিক্ষিত অথচ শান্ত নম্র মেয়ে হবে, বিলাসিনী উড়নচণ্ডী বা উগ্রচণ্ডা খাণ্ডারনী হলে চলবে না। একটু আধটু নাচুক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু হরদম নাচিয়ে মেয়ে আমার পছন্দ নয়। মনের মতন স্ত্রী আবিষ্কার করা কি সোজা কথা? এ পর্যন্ত তো খুঁজে পাই নি।

—পাবার কোনও আশা আছে কি?

—তা আছে, সেই জন্যই তো যতীশের কাছে এসেছি। আচ্ছা যতীশ, গণেশমুণ্ডা জায়গাটা কেমন?

তুমি তো মাঝে মাঝে সেখানে যেতে। শুনেছি এখন আর নিতান্ত দেহাতী পল্লী নয়, অনেকটা শহরের মতন হয়েছে।

যতীশ বলল, তোমার নির্বাচিতা প্রিয়া ওখানেই আছেন নাকি?

—নির্বাচন এখনও করি নি। শম্পা সেন ওখানকার নতুন গার্ল স্কুলের নতুন হেডমিস্ট্রেস। মাস চার-পাঁচ আগে নিউ আলীপুরে আমার ভাগনীর বিয়ের প্রীতিভোজে একটু পরিচয় হয়েছিল। খুব লাইকলি পার্টি মনে হয়, তাই আলাপ করে বাজিয়ে দেখতে চাই।

পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, শম্পা সেনও তো তোমাকে বাজিয়ে দেখবেন। তিনি তোমাকে পছন্দ করবেন এমন আশা আছে?

—কি বলছেন সর্বজ্ঞ মশাই! আমি প্রোপোজ করলে রাজী হবে না এমন মেয়ে এদেশে নেই।

উপেন বলল, তবে অবিলম্বে যাত্রা কর বন্ধু, তোমার পদার্পণে তুচ্ছ গণেশমুণ্ডা ধন্য হবে। গিয়ে হয়তো দেখবে তোমাকে পাবার জন্যে শম্পা দেবী পার্বতীর মতন কৃচ্ছ্রসাধনা করছেন।

—ঠাট্টা রাখ, কাজের কথা হক। ওখানে শুনেছি হোটেল নেই, ডাকবাঙলাও নেই। যতীশ, তুমি নিশ্চয় ওখানকার খবর রাখ। একটা বাসা যোগাড় করে দিতে পার?

যতীশ বলল, তা বোধ হয় পারি, তবে তোমার পছন্দ হবে কিনা জানি না। আমার দূর সম্পর্কের এক খুড়শাশুড়ী তাঁর মেয়েকে নিয়ে ওখানে থাকেন, মেয়ে কি একটা সরকারী নারী-উদ্যোগশালা না সর্বাত্মক শিল্পাশ্রমের ইনচার্জ। নিজের বাড়ি আছে, মা আর মেয়ে দোতলায় থাকেন, একতলাটা যদি খালি থাকে তো তোমাকে ভাড়া দিতে পারেন।

—তবে আজই একটা প্রিপেড টেলিগ্রাম কর, আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যেতে চাই। একটা চাকর সঙ্গে নেব, সেই রান্না আর সব কাজ করবে। উত্তর এলেই আমাকে টেলিফোনে জানিও। আচ্ছা, সর্বজ্ঞ মশাই, আজ উঠলুম, যাবার আগে আবার দেখা করব।

উপেন বলল, তার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না, তবে ফিরে এসে অবশ্যই ফলাফল জানিও, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলুম। কিন্তু শুধু হাতে যদি এস তো দণ্ড দেব।

কাঞ্চন মজুমদার চলে যাবার পর পিনাকী সর্বজ্ঞ বললেন, ওর মতন দাম্ভিক লোকের বিয়ে কোনও কালে হবে না, হলেও ভেঙে যাবে। কাঞ্চনের জোড়া ভুরু সুলক্ষণ নয়। বিষবৃক্ষের হীরা, চোখের বালির বিনোদ বোঠান, ঘরে বাইরের সন্দীপ, গৃহদাহের সুরেশ, সব জোড়া ভুরু। তারা কেউ সংসারী হতে পারে নি।

উপেন বলল, সন্দীপ আর সুরেশের জোড়া ভুরু কোথায় পেলেন?

—বই খুঁজলেই পাবে, না যদি পাও তো ধরে নিতে হবে। শম্পা সেনের যদি বুদ্ধি থাকে নিশ্চয় কাঞ্চনকে হাঁকিয়ে দেবে।

যতীশ বলল, শম্পা সেনকে চিনি না, সে কি করবে তাও জানি না। তবে অনুমান করছি, গণেশমুণ্ডায় দাঁড়কাগের ঠোকর খেয়ে কাঞ্চন নাজেহাল হবে।

উপেন প্রশ্ন করল, দাঁড়কাগটি কে?

সম্পর্কে আমার শালী, যে খুড়শাশুড়ীর বাড়িতে কাঞ্চন উঠতে চায় তাঁরই কন্যা। তারও জোড়া ভুরু। আগে নাম ছিল শ্যামা, ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে। কালো আর শ্রীহীন সেজন্যে লোকে আড়ালে তাকে দাঁড়কাগ বলে।

উপেন বলল, তা হলে কাঞ্চন নাজেহাল হবে কেন? কোনও সুন্দরী মেয়েই এ পর্যন্ত তাকে বাঁধতে পারে নি, তোমার কুৎসিত শালীকে সে গ্রাহ্যই করবে না। এই দাঁড়কাগ তমিস্রার হিস্টরি একটু শুনতে পাই না? অবশ্য তোমার যদি বলতে আপত্তি না থাকে।

—আপত্তি কিছুই নেই। ছেলেবেলায় বাপ মারা যান। অবস্থা ভাল, বীডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি আছে। মায়ের সঙ্গে সেখানে থাকত আর স্কটিশ চার্চে পড়ত। স্কুল কলেজের আর পাড়ার বজ্জাত ছোকরারা তাকে দাঁড়কাগ বলে খেপাত, কেউ কেউ সংস্কৃত ভাষায় বলত, দণ্ডবায়স হুশ। এখানে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, আই. এস সি. পাস করেই মায়ের সঙ্গে মাদ্রাজে চলে যায়। সেখানে ওর চেহারা কেউ লক্ষ্য

করত না, খেপাতও না। মাদ্রাজ থেকে বি এস.সি. পাস করে, তার পর তার পিতৃবন্ধু এক বিহারী মন্ত্রীর অনুগ্রহে গণেশমুণ্ডায় নারী উদ্যোগশালায় চাকরি পায়। খুব কাজের মেয়ে, তমিস্রা নাগের বেশ খ্যাতি হয়েছে। মিষ্টি গলা, চমৎকার গান গায়, সুন্দর বক্তৃতা দেয়, কথাবার্তায় অতি ব্রিলিয়াণ্ট। ওর দাঁড়কাগ উপাধিটা ওখানেও পৌঁছেছে, হিন্দীতে হয়েছে কৌআদিদি। গুণগ্রাহী অ্যাডমায়ারারও দু-চারজন আছে, কিন্তু কেউ বেশী দূর এগুতে পারে নি। নিজের রূপ নেই বলে পুরুষ জাতটার ওপর একটা আক্রোশ আছে, খোঁচা দিতে ভালবাসে।

কাঞ্চনকে স্বাগত জানিয়ে তমিস্রা বলল, কোনও ভাল জায়গায় না গিয়ে এই তুচ্ছ গণেশমুণ্ডায় হাওয়া বদলাতে এলেন কেন? আমাদের এই বাড়ি অতি ছোট, আসবাবও সামান্য, অনেক অসুবিধা আপনাকে সইতে হবে।

কাঞ্চন বলল, ঠিক হাওয়া বদলাতে নয়, একটু কাজে এসেছি। আমার অসুবিধা কিছুই হবে না। একটা রান্নার জায়গা আমার চাকরকে দেখিয়ে দেবেন, আর দয়া করে কিছু বাসন দেবেন। যতীশকে যে টেলিগ্রাম করেছিলেন তাতে তো ভাড়ার রেট জানান নি।

—যতীশবাবু আমাদের কুটুম্ব, আপনি তাঁর বন্ধু, অতএব আপনিও কুটুম্ব। ভাড়া নেব কেন? রান্নার ব্যবস্থাও আপনাকে করতে হবে না, আমাদের হেঁসেলেই খাবেন। অবশ্য বিলাতের রিৎসকার্লটন বা দিল্লির অশোকা হোটেলের মতন সার্ভিস পাবেন না। সামান্য ভাত ডাল তরকারিতেই তুষ্ট হতে হবে। মাছ এখানে দুর্লভ, তবে চিকেন পাওয়া যায়।

না-না এ বড়ই অন্যায় হবে মিস নাগ। বাড়ি ভাড়া নেবেন না, আবার বিনা খরচে খাওয়াবেন, এ হতেই পারে না।

তমিস্রা স্মিতমুখে বলল, ও, বিনামূল্যে অতিথি হলে আপনার মর্যাদার হানি হবে? বেশ তো, থাকা আর খাওয়ার জন্যে রোজ তিন টাকা দেবেন।

—তিন টাকায় থাকা আর খাওয়ার খরচ কুলোয় না, আমার চাকরও তো আছে।

— আচ্ছা আচ্ছা, পাঁচ সাত দশ যাতে আপনার সংকোচ দূর হয় তাই দেবেন। টাকা খরচ করে যদি তৃপ্তি পান তাতে আমি বাধা দেব কেন? দেখুন, আমার মায়ের কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে, নীচে নামতে পারবেন না। আপনি চা খেয়ে বিশ্রাম করে একবার ওপরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কেমন?

—অবশ্যই করব। আচ্ছা, আপনাদের এই গণেশমুণ্ডায় দেখবার জিনিস কি কি আছে?

—লাল কেল্লা নেই, তাজমহল নেই, কাঞ্চনজঙ্ঘাও নেই। মাইল দেড়েক দূরে একটা ঝরনা আছে, ঝম্পাঝোরা। কাছাকাছি একটা পাহাড় আছে, পঞ্চাশ বছর আগে বিপ্লবীরা সেখানে বোমার ট্রায়াল দিত। তাদের দলের একটি ছেলে তাতেই মারা যায়, তার কঙ্কাল নাকি এখনও একটা গভীর খাদের নীচে দেখা যায়। ওই যে মাঠ দেখছেন ওখানে প্রতি সোমবারে একটা হাট বসে, তাতে ময়ূর হরিণ ভালুকের বাচ্চা থেকে মধু মোম ধামা চুবড়ি পর্যন্ত কিনতে পারেন।

—আর আপনার নিজের কীর্তি, মহিলা উদ্যোগশালা না কি, তাও তো দেখতে হবে। গাড়িটা আনতে পারি নি, হেঁটেই সব দেখব। আপনি সঙ্গে থেকে দেখাবেন তো?

—দেখাব বইকি। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত পর্যটক এখানে ক'জন আসে। বিকাল বেলায় আমার সুবিধে, সকালে দুপুরে কাজ থাকে। যেদিন বলবেন সঙ্গে যাব।

তিন রকম লোক ডায়ারি — কর্মবীর, ভাবুক আর হামবড়া। কাঞ্চনেরও সে অভ্যাস আছে। রাত্রে শোবার আগে সে ডায়ারিতে লিখল — প্রিয়বর তমিস্রা নাগ, তোমার জন্য আমি রিয়ালি সরি। যেরকম সতৃষ্ণ নয়নে আমাকে দেখছিলে তাতে বুঝেছি তুমি শরাহত হয়েছ। কথা-বার্তায় মনে হয় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। দেখতে বিশ্রী হলেও তোমার একটা চার্ম আছে তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার কাছে তোমার কোনও চান্সই নেই, এই সোজা কথাটা তোমার অবিলম্বে বোঝা দরকার, নয়তো বৃথা কষ্ট পাবে। কালই আমি তোমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেব।

পরদিন সকালে কাঞ্চন বলল, আপনাকে এখনই বুঝি কাজে যেতে হবে? যদি সুবিধা হয় তো বিকেলে আমার সঙ্গে বেরুবেন। এখন আমি একটু একাই ঘুরে আসি। আচ্ছা, শম্পা সেনকে চেনেন, গার্ল স্কুলের হেডমিস্ট্রেস?

তমিস্রা বলল, খুব চিনি, চমৎকার মেয়ে। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—কিছু আছে। যখন এসেছি তখন একবার দেখা করে আসা যাক। বেশ সুন্দরী, নয়? অথচ চার্মিং। শুনেছি এখনও হার্টহোল আছে, জড়িয়ে পড়ে নি।

হাঁ, রূপে গুণে খাসা মেয়ে। ভাল করে আলাপ করে ফেলুন, ঠকবেন না।

স্কুলের কাছেই একটা ছোট বাড়িতে শম্পা বাস করে। কাঞ্চন সেখানে গিয়ে তাকে বলল, গুডমর্নিং মিস সেন, চিনতে পারেন? আমি কাঞ্চন মজুমদার, সেই যে নিউ আলীপুরে আমার ভগিনীপতি রাঘব দত্তের বাড়িতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মনে আছে তো?

শম্পা বলল, মনে আছে বইকি। আপনি হঠাৎ এদেশে এলেন যে? এখন তো চেঞ্জের সময় নয়।

— এখানে একটু দরকারে এসেছি। ভাবলুম, যখন এসে পড়েছি তখন আপনার সঙ্গে দেখা না করাটা অন্যায় হবে। মনে আছে, সেদিন আমাদের তর্ক হচ্ছিল, গেটে বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়? আমি বলেছিলুম, গেটের কাছে রবীন্দ্রনাথ দাঁড়াতে পারেন না. আপনি তা মানেন নি। ডিনারের ঘণ্টা পড়ায় আমাদের তর্ক সেদিন শেষ হয় নি।

—এখনো তার জের টানতে চান নাকি? তর্ক আমি ভালবাসি না, আপনার বিশ্বাস আপনার থাকুক, আমারটা আমার থাকুক. তাতে গেটে কি রবীন্দ্রনাথের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

-আচ্ছা, তর্ক থাকুক। আমি এখানে নতুন এসেছি, দ্রষ্টব্য যা আছে সব দেখতে চাই। আপনি আমার গাউড হবেন?

—এখানে দেখবার বিশেষ কিছু নেই। আপনি উঠেছেন কোথায়?

—তমিস্রা নাগকে চেনেন? তাঁদেরই বাড়িতে আছি।

- তমিস্রাকে খুব চিনি। সেই তো আপনাকে দেখাতে পারবে, আমার চাইতে ঢের বেশি দিন এখানে বাস করছে, সব খবরও রাখে। আমার সময়ও কম, বেলা দশটার সময় স্কুলে যেতে হয়।

- সকালে ঘণ্টা খানিক সময় হবে না?

—আচ্ছা, চেষ্টা করব, কিন্তু সব দিন আপনার সঙ্গে যেতে পারব না। কাল সকালে আসতে পারেন।

আরও কিছুক্ষণ থেকে কাঞ্চন চলে গেল। দুপুর বেলা ডায়ারিতে লিখল— মিস শম্পা সেন, তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। এখানে আসবার আগে ভাল করেই খোঁজ নিয়েছিলুম, সবাই বলেছে এখনও তুমি কারও সঙ্গে প্রেমে পড় নি। আমি এখানে এসে দেরি না করে তোমার কাছে গিয়েছি, এতে তোমার খুব ফ্ল্যাটার্ড আর রীতিমত উৎফুল্ল হবার কথা। তুমি সুন্দরী, বিদুষীও বটে, কিন্তু আমার চাইতে তোমার মূল্য ঢের কম। রূপে গুণে বিত্তে আমার মতন পাত্র তুমি কটা পাবে? মনে হচ্ছে তুমি একটু অহংকেরে, মানুষ চেনবার শক্তিও তোমার কম।

কাঞ্চন প্রায় প্রতিদিন সকালে শম্পার সঙ্গে আর বিকালে তমিস্রার সঙ্গে বেড়াতে লাগল। গণেশমুণ্ডায় একটি মাত্র বড় রাস্তা তারই ওপর তমিস্রাদের বাড়ি। একটু এগিয়ে গেলেই গোটাকতক দোকান পড়ে, তার মধ্যে বড় হচ্ছে রামসেবক পাঁড়ের মুদীখানা আর কহেলিরাম বজাজের কাপড়ের দোকান। এইসব দোকানের সামনে দিয়েই কাঞ্চন আর তার সঙ্গিনী শম্পা বা তমিস্রার যাতায়াতের পথ। দোকানদাররা খুব নিরীক্ষণ করে ওদের দেখে।

একদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এসে বলল, পাঁড়েজী, এই ফর্দটা নাও, সব জিনিস কাল পাঠিয়ে দিও। চিনিতে যেন পিঁপড়ে না থাকে।

রামসেবক বলল, আপনি কিছু ভাববেন না দিদিমণি, সব খাঁটী মাল দিব। এই বাবুসাহেবকে তো চিনছি না, আপনাদের মেহমান (অতিথি)।

—হাঁ, উনি এখানে বেড়াতে এসেছেন।

—রাম রাম বাবুজী। আমার কাছে সব ভাল ভাল জিনিস পাবেন, মহীন বাসমতী চাউল, খাঁটী ঘিউ, পোলাও-এর সব মশলা, কাশ্মীরী জাফরান, পিস্তা বাদাম কিশমিশ। আসেটিলীন বাত্তি ভি আমি রাখি।

কাঞ্চন বলল, ও সবের দরকার আমার নেই।

—না হুজুর, ভোজের দরকার তো হতে পারে, তখন আমার বাত ইয়াদ রাখবেন।

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন বলল, লোকটা আমাকে ভোজনবিলাসী ঠাউরেছে।

তমিস্রা হেসে বলল, তা নয়। ডিকেন্স-এর সারা গ্যাম্প-কে মনে আছে? তার পেশা ধাইগিরি আর রোগী আগলানো। সদ্য বিবাহিত বর-কনে গির্জা থেকে বেরুচ্ছে দেখলেই সারা গ্যাম্প তাদের হাতে নিজের একটা কার্ড দিত। তার মানে, প্রসবের সময় আমাকে খবর দেবেন। গণেশমুণ্ডার দোকানদাররাও সেই রকম। কুমারী মেয়ে কোনও জোয়ান পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্ছে দেখলেই মনে করে বিবাহ আসন্ন, তাই নিজের আর্জি আগে থাকতেই জানিয়ে রাখে।

—এদের আক্কেল কিছুমাত্র নেই। আমার সঙ্গে আপনাকে দেখে—

—অমন ভুল বোঝা ওদের উচিত হয় নি, তাই না? কি জানেন, এরা হচ্ছে ব্যবসাদার, সুরূপ কুরূপ গ্রাহ্য করে না, শুধু লাভ-লোকসান বোঝে। আপনি যে মস্ত ধনী লোক তা এরা জানে না। ভেবেছে, আমার মায়ের বাড়ি আছে, অন্য সম্পত্তিও আছে, আমি একমাত্র সন্তান, রোজগারও করি, অতএব বিশ্রী হলেও আমি সুপাত্রী।

—এরা অতি অসভ্য, এদের ভুল ভেঙে দেওয়া দরকার।

—আপনি শম্পাকে নিয়ে ওদের দোকানে গেলেই ভুল ভাঙবে।

পরদিন সকালে শম্পার সঙ্গে যেতে যেতে কাঞ্চন বলল, আমার এক জোড়া সক্‌স দরকার।

শম্পা বলল, চলুন কহেলিরামের দোকানে।

কহেলিরাম সসম্ভ্রমে বলল, নমস্তে বাবুসাহেব্, আসেন সেন মিসিবাবা। মোজা চাহি? নাইলন, সিল্ক, পশমী, সুতী—

কাঞ্চন বলল, দশ ইঞ্চ গ্রে উল্‌ন একজোড়া দাও।

মোজা দিয়ে কহেলিরাম বলল, যা দরকার হবে সব এখানে পাবেন হুজুর। হাওআই বুশশার্ট আছে, লিবার্টি আছে, ট্রাউজার ভি·আছে। জর্জেট ভয়েল নাইলন শাড়ি আছে, বনারসী ভি আমি রাখি, ভেলভেট সাটিন কিংখাব ভি। ভাল ভাল বিলাতী এসেন্স ভি রাখি। দেখবেন হুজুর?

দোকান থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন সহাস্যে বলল, বর-কনের পোশাক সবই আছে, এরা একবারে স্থির করে ফেলেছে দেখছি।

বিকালে কাঞ্চনের সঙ্গে তমিস্রা রামসেবকের দোকানে এক বাণ্ডিল বাতি কিনল। রামসেবক বলল, দিদিমণি, একঠো ছোকরা চাকর রাখবেন? খুব কাজের লোক, আপনার বাজার করবে, চা বানাবে, বিছানা করবে, বাবুসাহেবের জুতি ভি বুরুশ করবে। দারমাহা বহুত কম, দশ টাকা দিবেন। আমি ওর জামিন থাকব। এ মুন্নালাল, ইঁধর আ।

তমিস্রার একটা চাকরের দরকার ছিল, মুন্নালালকে পেয়ে খুশী হল। বয়স আন্দাজ ষোল, খুব চালাক আর কাজের লোক।

রাত্রে কাঞ্চন তার ডায়ারিতে লিখল, শম্পা, তোমার কি উচ্চাশা নেই, নিজের ভালমন্দ বোঝবার শক্তি নেই? আমাকে তো কদিন ধরে দেখলে, কিন্তু তোমার তরফ থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি না কেন? তমিস্রা তো আমাকে খুশী করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যাই হক, আর দুদিন দেখে তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করব।

তিন দিন পরে বিকালে তমিস্রা চায়ের ট্রে আনল দেখে কাঞ্চন বলল, আপনি আনলেন কেন, মুন্নালাল কোথায়?

তমিস্রা সহাস্যে বলল, সে শম্পার বাড়ি বদলী হয়েছে।

—আপনিই তাকে পাঠিয়েছেন?

—আমি নয়, তার অসল মনিব রামসেবক পাঁড়ে, সেই মুন্নাকে ট্রান্সফার করেছে, এখানে তাকে রেখে আর লাভ নেই।

—কিছুই বুঝলুম না।

—আপনি একেবারে চক্ষুকর্ণহীন। শম্পা, আমি আর আপনি—এই তিনজনকে নিয়ে গণেশমুণ্ডার বাজারে কি তুমুল কাণ্ড হচ্ছে তার কোনও খবরই রাখেন না। শুনুন।—মুন্নালাল হচ্ছে রামসেবকের স্পাই, গুপ্তচর। ওর ডিউটি ছিল আপনার আর আমার প্রেম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার দৈনিক রিপোর্ট দেওয়া। যখন সে জানাল যে কুছ ভি নহি, নাথিং ডুইং, তখন তার মনিব তাকে শম্পার বাড়ি পাঠাল, শম্পা আর আপনার ওপর নজর রাখবার জন্যে।

—কিন্তু তাতে ওদের লাভ কি?

—আপনি হচ্ছেন রেসের গোল-পোস্ট, শম্পা আর আমি দুই ঘোড়া। কে আপনাকে দখল করে তাই নিয়ে বাজি চলছে। রামসেবক বুক-মেকার হয়েছে। প্রথম কদিন আমারই দর বেশি ছিল, থ্রী-টু-ওআন কৌআদিদি। কিন্তু কাল থেকে শম্পা এগিয়ে চলছে, ফাইভ-টু-ওয়ান সেন-মিসিবাবা। আমার এখন কোনও দরই নেই।

—উঃ, এখানকার লোকেরা একেবারে হার্টলেস, মানুষের হৃদয় নিয়ে জুয়া খেলে! নাঃ, চটপট এর প্রতিকার করা দরকার।

—সে তো আপনারই হাতে, কালই শম্পার কাছে আপনার হৃদয় উদঘাটন করুন আর তাকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান।

কাঞ্চন বলল, বেশ তো, চলুন না, সেখানেই যাওয়া যাক।

শম্পার ওপর কহেলিরাম অনেক টাকার বাজি ধরেছিল। দুজনকে দেখে মহাসমাদরে বলল, আসেন আসেন বাবুসাহেব, আসেন সেন-মিসিবাবা। হুকুম করুন কি দিব।

শম্পা বলল, একটা তঞ্জোর শাড়ি চাই, কিন্তু দাম বেশি হলে চলবে না, কুড়ি টাকার মধ্যে।

—আরে দামের কথা ছোড়িয়ে দিন, আপনার কাছে আবাব দাম! এই দেখুন, আচ্ছা জরিপাড়, পঁয়ত্রিশ টাকা। আর এই দেখুন, নয়া আমদানি চিদম্বরম সিল্ক শাড়ি, আসমানী রঙ, নকশাদার জরিপাড়, চওড়া আঁচল, বহুত উমদা। এর অসলী দাম তো দো শও রুপেয়া লেকিন আপনার কাছে দেড় শও লিব।

শম্পা মাথা নেড়ে বলল, কোনওটাই চলবে না, অত টাকা খরচ করতে পারব না। থাক, এখন শাড়ি চাই না, আসছে মাসে দেখা যাবে।

কাঞ্চন বলল, এই চিদম্বরম শাড়িটা কেমন মনে করেন?

শম্পা বলল, ভালই, তবে দাম বেশী বলছে।

—আচ্ছা, আপনি যখন কিনলেন না তখন আমিই নিই।

কহেলিরাম দন্তবিকাশ করে শাড়িটা সযত্নে প্যাক করে দিল।

শম্পা বলল, কাকেও উপহার দেবেন বুঝি? তা কলকাতায় কিনলেন না কেন?

শম্পার বাসায় এসে কাঞ্চন বলল, শম্পা, এই শাড়িটা তোমার জন্যেই কিনেছি, তুমি পরলে আমি কৃতার্থ হব।

ভ্রূ কুঁচকে শম্পা বলল, আপনার দেওয়া শাড়ি আমি নেব কেন, আপনার সঙ্গে তো কোন আত্মীয় সম্পর্ক নেই।

—শম্পা, তুমি মত দিলেই চূড়ান্ত সম্পর্ক হবে, আমার সর্বস্ব নেবার অধিকার তুমি পাবে। বল, আমাকে বিবাহ করবে? আমি ফেলনা পাত্র নই, আমার রূপ আছে, বিদ্যা আছে, বাড়ি গাড়ি টাকাও আছে। তোমাকে সুখে রাখতে পারব।

—থামুন, ওসব কথা বলবেন না।

—কেন, অন্যায় তো কিছু বলছি না। আমার প্রস্তাবটা বেশ করে ভেবে উত্তর দাও।

—ভাববার কিছু নেই, উত্তর যা দেবার দিয়েছি। ক্ষমা করবেন, আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পারব না।

অত্যন্ত রেগে গিয়ে কাঞ্চন বলল, একবারে সরাসরি প্রত্যাখ্যান? মিস সেন, আপনি ঠকলেন, কি হারালেন তা এর পর বুঝতে পারবেন।

সমস্ত পথ আপন মনে গজ গজ করতে করতে কাঞ্চন ফিরে এল। ডায়াবিতে লেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু তার সোনালী শার্পার কলম থেকে এক লাইনও বেরুল না। সমস্ত দুপুর সে অস্থির হয়ে ভাবতে লাগল।

বিকাল বেলা তমিস্রা তার কর্মস্থান থেকে ফিরে এসে কাঞ্চনকে দেখে বলল, একি মিস্টার মজুমদার, চুল উস্কখুস্ক, চোখ লাল, মুখ শুখনো, অসুখ করেছে নাকি?

কাঞ্চন বলল, না অসুখ করেনি। তমিস্রা, এই শাড়িটা তুমি নাও, আর বল যে আমাকে বিয়ে করতে রাজী আছ।

তমিস্রা খিলখিল করে হাসল, যেন শূন্য বালতির ওপর কেউ কল খুলে দিল। তার পর বলল, এই ফিকে নীল শাড়িটা নিশ্চয় আমার জন্যে কেনেন নি, শম্পাকে দিতে গিয়েছিলেন, সে হাঁকিয়ে দিয়েছে তাই আমাকে দিচ্ছেন। মাথা ঠাণ্ডা করুন, রাগের মাথায় বোকামি করবেন না।

—তমিস্রা, আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে, বন্ধুদের কি বলব? তারা যে সবাই দুও দেবে। তুমি আমাকে বাঁচাও, বিয়েতে মত দাও। আমি যেন সবাইকে বলতে পারি, রূপ আমি গ্রাহ্য করি না, শুধু গুণ দেখেই বিয়ে করেছি।

—আপনি যদি অন্ধ হতেন তা হলে না হয় রাজি হতুম। কিন্তু চোখ থাকতে কত দিন দাঁড়কাগকে সইতে পারবেন? শম্পা আর আমি ছাড়া কি মেয়ে নেই? যা বলছি শুনুন। —কাল সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যান। আপনি হিসেবী লোক, প্রেমে পড়ে বিয়ে করা আপনার কাজ নয়, সেকেলে পদ্ধতিই আপনার পক্ষে ভাল। ঘটক লাগিয়ে পাত্রী স্থির করুন। বেশি যাচাই করবেন না, তবে একটু বোকা-সোকা মেয়ে হলেই ভাল হয়, অন্তত আপনার চাইতে একটু বেশি বোকা, তবেই আপনাকে বরদাস্ত করা তার পক্ষে সহজ হবে।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেরণা

প্রমীলা সেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। পরিবার অর্থে তিনটি প্রাণী · বিধবা জননী বিজনবাসিনী, এগার বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই সমর ওরফে ভোলা, এবং বাইশ বৎসর বয়সের অনূঢ়া কন্যা সে নিজে।

বাইশ বৎসর বয়সে প্রমীলার বিবাহের বয়স হয় নি, তা বলা চলে না। আর এ কথা একেবারেই বলা চলে না যে, তার বিবাহের এ পর্যন্ত কোনও চেষ্টা চরিত্র হয় নি। উপস্থিত সপ্তম পাত্রের পালা চলছে; তৎপূর্বে যে ছয়টি পাত্র পর্যায়ক্রমে আসরে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা-চরিত্রের সীমান্তরেখা পর্যন্ত লড়ালড়ি করে অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়েছে। যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে তাদের প্রত্যেকেরই ওজন দেখে বিজনবাসিনী সন্তুষ্ট হয়েছিল, কিন্তু প্রমীলা কাউকেই গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয় নি। প্রত্যেককেই সে একই কথা বলে ভাগিয়েছে,—'বিয়ে করবে প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

এই পাষণ্ড প্রেরণা বস্তুটি প্রমীলার হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রদেশে জমাট বেঁধে ঘুমিয়ে আছে, এবং কী উপায়ে তাকে জাগ্রত করা যায়, তা আবিষ্কার করবার জন্য পাত্রগণের উৎসাহ এবং তৎপরতার

অন্ত ছিল না। ব্যারিস্টার বেসুরো কণ্ঠে গান গেয়েছে, এঞ্জিনিয়ার খণ্ডিত ছন্দে কবিতা লিখেছে, ব্যবসাদার গ্যালন-গ্যালন পেট্রোল পুড়িয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে একই উত্তর লাভ করেছে, 'প্রেরণা পাচ্ছি নে।'

দুই

ছুটির দিন, বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। স্নানের জন্য উঠি-উঠি মন সত্ত্বেও একটা বই ছেড়ে প্রমীলা উঠতে পারছে না, এমন সময়ে বিজনবাসিনী কক্ষে প্রবেশ করল। প্রমীলার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে বললে, "হ্যাঁ রে মীলা, আট-দশ দিন ধরে প্রদোষ আর আসছে না কেন শুনি?"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার চেয়ে তুমি কম দিতে পারবে না মা। কেন তিনি আসছেন না, সে কথা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন। আমরা যা বলব, তা হবে অনুমান।"

"তাকেও তুই জবাব দিয়েছিস তা হলে?"

দুইটি কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু বিজনবাসিনীর প্রতি স্থাপিত করে প্রমীলা বললে, "জবাব বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও তা আগে বল?"

মনটা পূর্ব হতেই তিক্ত হয়ে ছিল, তদুপরি কন্যার এই ন্যাকামি-মিশ্রিত বাক্য শুনে একেবারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল; ঝঙ্কার দিয়ে বিজনবাসিনী বললে, "বোঝাতে চাই তোমার মুণ্ডু আর আমার পিণ্ডি। কী হতভাগা মেয়েই না গর্ভে ধরেছিলাম!"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "গর্ভে ধরে ভালো করেছিলে তা বলছি নে, কিন্তু হতভাগা বলে গাল যদি দাও, নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করব। তোমার মতো যার মা আছে সে হতভাগা, একথা ভগবান এসে বললেও বিশ্বাস করব না।"

একটা কোনও উচিত মতো সহসা খুঁজে না পেয়ে বিজনবাসিনী বললে, "তা কেন করবে!" তারপর হতাশামিশ্রিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, তোকে নিয়ে আমি কী করি, বল্ দেখি মীলা?"

মৃদু হেসে প্রমীলা বললে, "পালিয়ে যাও মা। আমাকে নিয়ে এমন কোনও দেশে পালিয়ে যাও, যেখানে তোমাকে দুঃখ দিতে আর আমাকে জ্বালাতন করতে বিয়ে-পাগলার দল নেই।"

বিরক্তি-বিস্ময়মিশ্রিত কণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "তুই ওদের বিয়ে-পাগলার দল বলছিস?"

বিজনবাসিনীর কথার ভঙ্গি দেখে প্রমীলার মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য দেখা দিল; বললে, "বলব না কেন, মা? তুমি তো স্বচক্ষে পড়েছ অজয় দত্তের কবিতা, আর স্বকর্ণে শুনেছ তারক মিত্তিরের গান। আচ্ছা, তুমিই বল, ওদের পাগল বললে খুব অন্যায় করা হয় কি?"

কবিতা এবং গানের উল্লেখে বিজনবাসিনীরও মুখে হাসি দেখা দেবার উপক্রম করেছিল, কিন্তু পাছে হাসি দেখে অবাধ্য কন্যা আস্কারা পায় সেই ভয়ে হাসি দমন করে গম্ভীর মুখে বললে, "প্রদোষও গান গায়?—কবিতা লেখে?"

মাথা নেড়ে প্রমীলা বললে, "না, ও দুটি গুণ ওঁর আছে, তা স্বীকার করতেই হবে।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ও! ঐ দুটি গুণই ওর আছে আর কোনও গুণ নেই! তোর মতলব কী বল্ দেখি মীলা?"

হাসিমুখে প্রমীলা বললে, "আমার মতলব অ ধু নয় মা। আমার মতলব তোমার সেবায় আর ভোলাকে মানুষ করে তোলবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করা।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বিজনবাসিনী বললে, "ওঃ! ঢং দেখে বাঁচি নে! আমার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন! প্রদোষের সেবায় জীবন উৎসর্গ করলে তোর জীবন ধন্য হতো তা ভালো করে জেনে রাখিস। তুই তার কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নোস্।"

"হাতের, না, পায়ের?

ভ্রূকুঞ্চিত করে ঔৎসুক্যের সহিত বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "কী হাতের, না, পায়ের?"

"ক'ড়ে আঙুল?"

"পায়ের, পায়ের, পায়ের!" বিজনবাসিনী তর্জন করে উঠল।

ভালোমানুষের মতো মুখ করে শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আমি তো তোমারও পায়ের ক'ড়ে আঙুলের যোগ্য নই, তাই বলে কি মা, তোমাকে বিয়ে করতে হবে?"

"আমি কি তোমাকে বিয়ে করবার জন্য গান গাচ্ছি, না, কবিতা লিখছি?" ব'লে রণে ভঙ্গ দিয়ে বিজনবাসিনী দুদ্দাড় করে প্রস্থান করলে।

কৌতুকমিশ্রিত সুমিষ্ট হাসির দ্বারা মুখমণ্ডলকে অপূর্ব করে প্রমীলা ক্ষণকাল নিঃশব্দে বসে রইল, তারপর ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে পূর্বোক্ত বইখানাকে শেল্‌ফের মধ্যে তুলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

প্রদোষের বিষয়ে এত কথার পর এ কথা বোধ করি বলা বাহুল্য যে, সে প্রমীলার পাণিপ্রার্থী সপ্তম পাত্র। বিজনবাসিনীর যোগ্যতার দাঁড়িপাল্লায় পূর্বতন ছয়টি পাত্রের মধ্যে কারও অপেক্ষা সে লঘু নয়।

তিন

ঘটনাক্রমে সেই দিনই সন্ধ্যার পর প্রদোষ এসে উপস্থিত।

পরীক্ষা নিকটবর্তী বলে সন্ধ্যা থেকে ভোলা পাঠে মনোনিবেশ করেছিল ; এবং প্রদোষ ও প্রমীলা একান্ত আলাপের সুযোগ পেলে তা থেকে সুবিধাজনক কিছু প্রত্যাশা করা যেতে পারে মনে করে বিজনবাসিনী প্রদোষকে চা-খাবার খাইয়ে নিজ শয়নকক্ষে 'অমিয়-নিমাইচরিত' খুলে আত্মগোপন করেছিল।

দু চারটে সাধারণ কথার পর আসল কথা উঠল। প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "এত দিন আসেন নি কেন প্রদোষবাবু?"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "বোধ হয় আসবার প্রেরণা পাই নি বলে।"

প্রমীলার বুঝতে বিলম্ব হলো না, তারই কড়িতে প্রদোষ তার দেনা পরিশোধ করলে। পাল্টা আঘাতটুকু বিনা প্রতিবাদে পরিপাক করে সে বললে, "আজ তবে কিসের প্রেরণায় এলেন?"

"তোমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়।"

প্রদোষের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে ধন্যবাদ দেবার প্রেরণায়? কেন, ধন্যবাদের কী করেছি আমি?"

স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "আমার প্রতি সদয় হয়েছ।"

ততোধিক বিস্ময়ে প্রমীলা বললে, "সদয় হয়েছি? কিন্তু কোনও দিন তো আপনার প্রতি অসদয় ছিলাম না।"

"সর্বনাশ! যা ছিলে তাকে যদি সদয় থাকা বলে তা হলে তোমার সদয় থাকা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষে করুন!" বলে হো-হো করে প্রদোষ হেসে উঠল। তারপর অভয়-দানের মিষ্টি সুরে বললে, "কিন্তু ঘাবড়াবার কারণ নেই। সদয় হয়েছ জাগ্রত জীবনে নয়, স্বপ্নে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করে প্রমীলা বললে, "ও হরি! স্বপ্নে?" তারপরই মুখ ঈষৎ গম্ভীর করে নিয়ে বললে, "ও কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নে, প্রদোষবাবু।"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "কী বিশ্বাস কর না? স্বপ্ন? না, স্বপ্ন দেখা?"

এ প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে প্রমীলা টেবিলের উপরকার একটা কাগজ-চাপা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

প্রদোষ বললে, "বুঝেছি। তোমার পেপার-ওয়েটের নাড়াচাড়া দেখে বুঝতে বাকি নেই যে, তুমি বোঝাতে চাও, আমি স্বপ্ন দেখেছি সে কথাও তুমি বিশ্বাস কর না। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়াই যায় যে, বস্তুত আমি স্বপ্ন দেখি নি, কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির মতলবে মিথ্যা স্বপ্নের ওজুহাত তুলেছি, তা হলেও এ মিথ্যার মূল্য আছে।"

একটু চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "থাকলেও, সে মিথ্যার মূল্য এত অল্প যে, তার দ্বারা বিশেষ কিছু মূল্যবান বস্তু কেনা যায় না"

মৃদু হেসে প্রদোষ বললে, "তুমি যে শুধু মূল্যবান নও, অক্রেয়ও,—তা আমি জানি প্রমীলা। It is better to have tried and failed, than never to have tried at all—তোমার সঙ্গে আমি সেই খেলা খেলছি। অপরকে চেষ্টা করে পাওয়ার চেয়ে তোমাকে চেষ্টা করে না-পাওয়া আমি শ্রেয় মনে করি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "ভুল মনে করেন, প্রদোষবাবু। অপাত্রে এত মূল্য আরোপ করবেন না।"

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে হাসিমুখে প্রদোষ বললে, "ভুল মনে করি, কি ঠিক মনে করি, সে কথা না হয় বাড়ি গিয়ে একবার ভালো করে ভেবে দেখা যাবে,—আপাতত চললাম।"

"কোথায়?"

"বন্ধুবান্ধবের সন্ধানে। এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরে কোনও লাভ নেই।"

"তা হলে এখানেই তো আর কিছুক্ষণ থাকতে পাবতেন?"

"যে গাছের ফুল অধিকারে আসবার সম্ভাবনা নেই, সে গাছের তলায় বিলম্ব করে কোনও লাভ আছে কি?" বলে প্রদোষ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল ; তারপর সহসা মুখ গম্ভীর করে বললে, "মনস্তত্ত্বের একটা ছোট্ট কথা বলব?"

স্মিতমুখে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী কথা?"

"তোমা. .মনে প্রেরণা জাগবার যদিই বা ছায়ার মতো কোনও ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে তো এ তোমাকে নিশ্চয় বলছি, নিজেকে অযথা সস্তা করলে একেবারেই তা লুপ্ত হবে।" বলে প্রদোষ আর এক দফা উচ্চহাসি হাসলে।

প্রমীলা এ কথার কোনও উত্তর দিলে না ; শুধু তার ওষ্ঠাধারে কৌতুকেব অতি ক্ষীণ নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। সে জিজ্ঞাস করলে, "আবার কবে আসবেন?" কিন্তু প্রদোষ কোনও উত্তর দেবার পূর্বেই ব্যস্ত হয়ে বললে, "না না, উত্তর দিতে হবে না আপনাকে,—আমি আমার প্রশ্ন তুলে নিচ্ছি। 'যে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়ে কোনও লাভ নেই, সে গাছতলায় আবার একদিন এসে কী লাভ?'—এই ধরনের একটা উত্তর দেবেন তো?"

প্রমীলার কথা শুনে প্রদোষ পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। বললে, "আমাব মন তোমার কাছে স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছে, প্রমীলা। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।"

প্রদোষ প্রস্থান করবার পর বিজনবাসিনী জিজ্ঞাসা করলে, "প্রদো· .ত হাসছিল কেন রে, মীলা?"

প্রমীলা বললে, "জোরে জোরে?"

"জোরে জোরে না তো কি মুচকি হাসির কথা জিজ্ঞসা করছি? কথা শুনে গা জ্বলে!"

শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "অল্প কারণে প্রদোষবাবু জোরে জোরে হাসেন।"

"তাই তো! প্রদোষবাবুর আর কাজ নেই, অল্প কারণে জোরে জোরে হাসেন! এত শীগগির চলে গেল যে?"

"ভোলা রইল পড়ায় ব্যস্ত, তুমি দিলে ঘরে ঢুকে গা-ঢাকা,—একা আর আমার সঙ্গে কত গল্প করবেন?"

"অত ঢঙের কথা শোনবার আমার সময় নেই।" বলে বিজনবাসিনী বিরক্তিবিরূপ মুখে প্রস্থান করলে।

চার

মাসে দুই পরে আবার একদিন প্রদোষ এসে দেখা দিলে। ভদ্রতা রক্ষার্থে প্রমীলাকে বলতেই হলো, "এতদিন আসেন নি কেন, প্রদোষবাবু?"

স্মিতমুখে প্রদোষ উত্তর দিলে, "স্বপ্ন দেখি নি বলে।"

"কী আশ্চর্য? স্বপ্ন দেখলে তবে আপনি আসবেন?"

"সব স্বপ্ন দেখলেই নয়,—যে স্বপ্নে আমার প্রতি তুমি সদয় হবে, সেই স্বপ্ন দেখলে আসব।"

"দেখেছেন না-কি স্বপ্ন?"

"দেখেছি,—কাল ভোর রাত্রে।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "আপনার ঘুম হয় প্রদোষবাবু?"

উৎসাহভরে প্রদোষ বললে, "গভীর ঘুম হয়। পড়ি আর ঘুমুই।"

"তবে বোধ হয় আপনার ঠিক হজম হয় না।"

"ক্ষেপেছ! সকালে উঠে ক্ষিদের চোটে কী খাই, টেবিল খাই, না চেয়ার খাই, করি।"

"তবে এত স্বপ্ন দেখেন কেন?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কী চিন্তা করে প্রদোষ বললে, "কিন্তু দেখি বলে তো তুমি বিশ্বাস কর না প্রমীলা?"

প্রদোষের কথা শুনে প্রমীলার মুখে অপ্রতিভতার ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে। কতকটা যেন নিজেকে সংশোধিত করার ছলেই বললে, "তাও বটে।" তারপর প্রদোষের প্রতি মুখ তুলে সহজভাবে দৃষ্টিপাত করে বললে, "আচ্ছা, তর্কের খাতিরে ধরাই যদি যায় যে, দেখেন,—তা হলে সে কথাটুকু কোন্ লাভের জন্যে আমাকে জানাতে আসেন?"

শান্তকণ্ঠে স্মিতমুখে প্রদোষ বললে, "লাভের জন্যে আসি নে প্রমীলা, লোভে পড়ে আসি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "লোভে পড়ে?—কিসের লোভ?"

"এইটুকু সুসংবাদ তোমাকে জানাবার লোভে যে, আমারও ভাগ্যে পড়ে নি পড়ে নি কেবলই ফাঁকি।" স্বপ্নে-পাওয়া অবশ্য ষোল আনা পাওয়া নয় ; কিন্তু ষোল আনা না পাওয়া, তাও আমি মনে করি নে।" বলে প্রদোষ উঠে দাঁড়াল।

প্রমীলাও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "চললেন?"

প্রদোষ বললে, "নিঃসন্দেহ।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "এত শীগগির কেন চললেন, সে কথাও তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার উপায় নেই।"

"কেন বল দেখি?"

"বলবেন, বেশিক্ষণ থেকে নিজেকে সস্তা করতে নেই।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে প্রদোষ বললে, "সে কথা মনে আছে তোমার?—আর সে কথা মনে নেই?"

"সুদূর সম্ভাবনার কথা?"

প্রমীলার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিলে ; মৃদুস্বরে বললে, "হ্যাঁ, তা-ও আছে।"

পাঁচ

মাত্র দিন-ছয়েক পরে প্রদোষকে পুনরায় আসতে দেখে প্রমীলা ঈষৎ বিস্মিত হলো। কিন্তু এমন কোন কথা সে বললে না, যাতে তার বিস্ময় প্রকাশ পায়।

কথাটা তুললে প্রদোষ নিজেই ; বললে, "এবার এত শীগগির এলাম বলে মনে করো না বিনা-স্বপ্নে এসেছি।"

স্মিতমুখে প্রমীলা বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসবার তো কথা নেই আপনার।"

"না, তা নেই। একটা কথা তুমি কিন্তু নিশ্চয় স্বীকার করবে প্রমীলা।"

"কী কথা?"

"গত দুবারের স্বপ্ন দেখার আমি শুধু জানান্-ই দিয়ে গেছি ; স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে তোমাকে বিব্রত করবার চেষ্টা করি নি।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রমীলা বললে, "আপনার সে রুচিবোধের জন্য আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ প্রদোষবাবু।"

প্রদোষ বললে, "ধন্যবাদ। কিন্তু এবারকার স্বপ্ন এমন যে, এবারকাব স্বপ্নের বিবরণ দিলেই তুমি

আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। তবে স্বপ্নের কাহিনী শুনে তোমার মুখে কৌতুক-রসের যে সুমিষ্ট হাসিটুকু ফুটে উঠবে, তা-ই হবে আমার-দেখা তোমার মুখের শেষ হাসি।"

পরম কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে প্রমীলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"কারণ, এর পর স্বপ্ন দেখে তোমাকে জানাতে এলে তা হবে ভূতের স্বপ্ন দিয়ে তোমাকে ভয় দেখানো।"

"তার মানে?"

"স্বপ্নের কাহিনী শুনলে তার মানে আপনিই বোঝা যাবে। বলব?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে প্রমীলা বললে, "বলুন।"

মনে মনে একটু কী ভেবে নিয়ে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন রোগশয্যায় শুয়ে আছি; একজন ডাক্তার পাশে দাঁড়িয়ে স্টেথোসকোপ নাড়তে নাড়তে বললে, আর আশা নেই।..আত্মীয়রা চোখে কাপড় দিয়ে কাঁদছে। এমন সময়ে তুমি এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'শুনছেন? আপনি মরে যাচ্ছেন।' ....আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনছি।' তার উত্তরে তুমি বললে, 'আপনি মরছেন, কিন্তু আমি বাঁচলাম'।...ঘুম ভেঙে দেখি, কাক-কোকিল ডাকছে। ভারি মজার স্বপ্ন, নয় প্রমীলা? —এ কাহিনীতে কিন্তু তোমার বিব্রত হবার মতো কোনও ঘটনা নেই।"

প্রমীলা কোনও উত্তর দিলে না।

একটু চুপ করে থেকে প্রদোষ বললে, "স্বপ্ন অবশ্য স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়,—কিন্তু তাই বলে স্বপ্নকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। একজনের নিশ্চেতন মনের গভীর চিন্তা অথবা বাসনা অপর একজনের নিশ্চেতন মনে প্রতিফলিত হয়ে হয়তো স্বপ্ন দেখায়।"

এ কথারও প্রমীলা উত্তর দিলে না।

ছয়

পরদিন সকালে প্রদোষ চা পানান্তে খবরের কাগজ খুলে বসেছে, এমন সময়ে প্রমীলার ভাই ভোলা এসে পাশে দাঁড়াল।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ভোলাকে দেখে সহাস্যমুখে প্রদোষ বললে, "কী ভোলা, কী খবর?"

ভোলা বললে, "আজ সন্ধ্যার সময়ে দিদি আপনাকে একবার যেতে বলেছেন।"

"আমাকে যেতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনাকে।"

"ঠিক শুনেছ?"

"ঠিক শুনেছি।"

"কী নাম বল দেখি আমার?"

নিঃশব্দে হাসির দ্বারা এই পরিহাসমূলক উত্তর দিয়ে গমনোদ্যত হয়ে ভোলা ফিরে তাকিয়ে বললে, "নিশ্চয় যাবেন, নইলে দিদি রাগ করবেন।"

যথাকালে প্রমীলার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রদোষ বললে, "বিনা-স্বপ্নে আসার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কারণ তোমার তলব পেয়ে এসেছি।"

প্রমীলা বললে, "বিনা স্বপ্নে আপনি আসেন নি।"

গভীর বিস্ময়ে প্রদোষ বললে, "আসি নি? কেন বল দেখি?"

"বসুন, বলছি।"

একটা চেয়ার টেনে বসে সকৌতূহলে প্রমীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে প্রদোষ বললে, "বল।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রমীলা বললে, "কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ? কী স্বপ্ন দেখেছ?"

প্রমীলার মুখমণ্ডল টকটকে হয়ে উঠল। একবার প্রদোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নতমুখে সে বলতে লাগল, "স্বপ্ন দেখেছি, যেন বিয়ে-বাড়ি, হৈ-চৈ হচ্ছে, বাজনা-বাদ্যি বাজছে...আমি কনে সেজে আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে বসে আছি। এমন সময়ে শাঁখ বাজল,...বর এলেন আপনি। আর...আর...আমি উঠে দাঁড়িয়ে আপনার গলায়..."

"মালা দিলে?"

"দিলাম।"

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে প্রদোষ বললে, "কিন্তু স্বপ্নের প্রসঙ্গকে আমরা তো মিথ্যা বলে সন্দেহ করি প্রমীলা?"

আরক্তমুখে প্রমীলা বললে, "মিথ্যা হলেও সে মিথ্যার মূল্য আছে।"

উত্তেজনার বশে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রদোষ বললে, "আছে।...আছে প্রমীলা? —তা হলে কি শেষ পর্যন্ত তোমার মনে প্রেরণা জাগল?"

প্রদোষের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে নতনেত্রে মৃদুস্বরে প্রমীলা বললে, "বোধ হয়।"

জগদীশ গুপ্ত

শঙ্কিতা অভয়া

মেয়ে শান্তিময়ীর জন্য জননী অভয়ার মানসিক চাঞ্চল্যের এক মুহূর্ত বিরাম নাই, আর, চাঞ্চল্য এতো যে তার অন্ত নাই—তার সেই উদ্বেগ আর ভীতি এতো প্রবল আর অসহ্য যে সময়-সময় বিভ্রান্ত অস্থির চিত্তে সে আত্মহত্যায় নিষ্কৃতি লাভের কল্পনা করে—দিবারাত্র মেয়ের অশুভ পরিণাম চিন্তা করিয়া করিয়া তারই বিষে তার শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে—

শান্তির বয়স সতেরো, অতিশয় সুশ্রী মেয়ে ; শরীরের গঠন-নিবিড়তা এমন পূর্ণাঙ্গ চমৎকার সুস্থ যে, অভয়ার মনে হয়, তার তুলনা নাই ; কিন্তু মনে হয় না যে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে তাকে নিরীক্ষণ কি আশীর্বাদ করা যায়—তার রূপ আর দোষের কথা মনে হইয়া অভয়ার শরীর আতঙ্কে শিহরিত হইতে থাকে—

সর্বাপেক্ষা মুগ্ধকর তার চক্ষুদুটি—মেয়ের চক্ষু ঠিক মায়ের অতীত দিনের চক্ষুর মতো—গাঢ়তম বর্ণে তা গভীর, কিন্তু গম্ভীর নয়, হাসিতে ভরা, ভারী অস্থির ; মনে হয়, গভীরতার ভিতরে এমন চঞ্চল একটা স্রোত বহিতেছে যার লক্ষ্য নাই, ইষ্টকর গন্তব্য ক্ষেত্র নাই, প্রতি মুহূর্তে যার গতি পরিবর্তিত হইতেছে—

অভয়ার অত্যন্ত ভয় এখানেই—

তার মনে হয়, মেয়ে কেবলই ভাবে, কাজের বেলায় লঘু-গুরু ন্যায়-অন্যায় বলিয়া বাধা কিছু নাই ; দেখিতে হইবে, কাজে দুঃসাহস চাই কতোটা, আর, তাতে নূতনত্ব আর কৌতুক কতোটা।

অভয়ার ভয়ের আরো কারণ শান্তির মনের লীলাপ্রিয়তা, যাকে বৈজাত্য বলা যাইতে পারে—উদ্ভট আর উৎকট যা তারই দিকে তার অন্ধ আগ্রহ—আর, যতো উদ্ভট আর উৎকট আলাপ তার আর কার সঙ্গে তা জানা নাই, কিন্তু বাপের সঙ্গেও।

অভয়ার আরো মনে হয়, মেয়েটির প্রকৃতি আর রুচি এমনি তরল আর স্খলিত আর নিম্নগামী যাতে তাহাকে কেবল গৌণ আনন্দের হেতু মনে হইয়া মুখ্য উল্লাসের দু-দিনের সহচরী হিশাবে লাভ করিতে পুরুষ লালায়িত হইয়া ওঠে—বিবাহের পাত্রী হিসাবে সে বিচার্য নহে।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের গুরুতর কথা বিশেষ হয় না। কোন্ ঔপন্যাসিক দুঃসহ করিয়াছেন ; কোন নর্তকীর নৃত্যনিপুণতা ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়ার, কোন্ অভিনেতার কণ্ঠস্বর চমৎকার মাদকতাপূর্ণ আর স্বরগ্রামের প্রত্যেকটিতেই সমান খেলে, ইত্যাদি বিষয়ে অভয়া কী জানে! কিন্তু শান্তি তা জানে, বাপের সঙ্গে তর্ক করে ; জিতিতে চায়...

ফুটবল, ক্রিকেট, চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, এমন কি প্রেমের প্রসঙ্গ পর্যন্ত বাদ যায় না—

এমনও কি, 'প্লেটোনিক লাভ'-ও তাদের অবাধ চর্চার অন্তর্ভুক্ত—

গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত শান্তি জানিতে চায়, বাবা, 'তা কি সম্ভব?'

—'কী?'

--'তুমি শুনছো কী তবে! ঐ 'প্লেটোনিক লাভ'! স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক হবে, অথচ স্ত্রী-পুরুষের নিবিড়তম সম্পর্ক স্থাপিত হবে যাতে তা আদৌ ঘটবে না—তা কি হয়?'

—'কোথায় পেলে এ কথা?'

—'একখানা ইংরেজি বইয়ে পড়লাম। একটি যুবক আর একটি যুবতী ঐ শর্তে বিয়ে করেছিল ; স্ত্রীটি ছিলো নর্তকী। নৃত্যকলায় চরমোৎকর্ষ দেখানোই ছিলো তার একমাত্র আকাঙক্ষা, সব-কিছুকে বলি দিয়ে , কিন্তু জয়মাল্য পেতে হলে সবুর সয়ে থাকতে হয়...ছেলেটি তাকে ততোদিন প্রতিপালন করতে রাজি হলো—দু-জনাই ঐ কলা নিয়ে উন্মত্ত...'

—'তারপর'?

—'খেয়ালের ঝোঁকে কিছুদিন বেশ চললো ; ছেলেটি কাছে ঘেঁষে না—চুম্বন পর্যন্ত নিষিদ্ধ...কিন্তু ক্রমশ ছেলেটির সম্বন্ধে দেখা গেলো, রক্ত বিশ্বাসঘাতকতা করছে—হৃৎপিণ্ডে আঘাত করছে—বললে, 'আমরা ভুল করেছি ; তুমি এসো...'

মেয়েটি বললে, 'উঁহু—আমি আর্টের উপাসিকা ; তোমাকে আমি ভালবাসি ; কিন্তু সাবধান, তুমি আমার সম্মুখে এসো না—তুমি অত্যন্ত দুর্বল—দুর্বল পুরুষকে আমি ঘৃণা করি—তুমি যাও...'

ছেলেটি ক্ষমা চেয়ে পেলে—

কিন্তু একদিন হলো কী...

—'কী হ'লো?' অতুল সাগ্রহে জানিতে চাহিলো।

—'সেদিন জ্যেৎস্না রাত। স্বামী বাগানে বসে ছিলো ; অন্ধকাব একটা জায়গায়। স্ত্রী হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো ব্যালকনিতে—মিহি ঢিলে একটা আঙরাখায় দেহ আবৃত—বাহু তুলে সে চাঁদের দিকে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে রইলো...বাহু আন্দোলিত করে কাকে যেন সে আহ্বান করলো...'

সে-আহ্বান যাকেই করা হোক্ ছেলেটির মনে হলো, যেন তাকেই—বাহু-সঙ্কেতে সে অন্তরঙ্গ পুরুষকেই আশ্লেষে আহ্বান করেছে—এতোদিনে স্ত্রীর নারীত্ব দুর্দমনীয় হয়ে জেগেছে ; সে-আহ্বান আন্তরিকতায় এমনি গভীর আর উষ্ণ যে, ছেলেটি হঠাৎ উল্লাসে দুর্বার হয়ে ছুটে এলো জ্যোৎস্নামণ্ডিত সেই অপরূপ মূর্তির কাছে আত্মার প্রথম বরণ সার্থক করতে.

কিন্তু তার আশা অমূলক—স্ত্রী তার কথা শুনে অবাক হয়ে বললে, সে তাকে ডাকে নাই—জ্যোৎস্নালোকে স্ফুট স্ফূর্ত জীবনকে সে · াদি অনন্ত অমর জীবন-স্রোতে ঢেলে দিয়েছিল। শুনে ছেলেটি শাদা হয়ে কাঁপতে লাগলো...'

বলিয়া শান্তি যেন ক্লান্ত হইয়া থামিলো, বলিলো, 'আরো ঢের আছে—অতো বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বাবা।'

অতুল একটু হতাশ হইলো ; কিন্তু হাসিয়া বলিলো, 'শেষটার কী হলো?'

—'যাকে দেখে, অর্থাৎ যার আকর্ষণে আর স্পর্শে মেয়েটির যৌবন উদ্বেল আর পূর্ণ সত্তা উন্মুখ হলো সেই পুরুষকেই সে আত্মসমর্পণ করলো...'

—'স্বামী?'

—'সে বেশ্যাসক্ত হলো।...আচ্ছা, বাবা, যৌন-আকর্ষণ কি এমনি দুর্বার?'

অতুল শান্তির চোখে চোখে চাহিয়া বলিলো, 'তা-ই তো মনে হয়।'

—'কিন্তু আমি তো বোধ করিনে!'

—'সেই অর্থে উগ্র স্পর্শ তুমি পাও নাই।' বলিয়া অতুল নিজের কথার তাৎপর্য ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিলো ; বলিলো,—'নারীর উপর পুরুষের অশেষ অক্ষয় আর তীব্রতম আধিপত্য ঐখানেই : পুরুষ জাগায় তবে নারী তার জীবনের পাত্র সুখের মধুতে পূর্ণ করে আর নিজেকে দান করে নিঃশেষ করে। এটা হবেই ; সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করে রেখেছে ঐ নিয়মটি...'

অভয়া নিঃশব্দে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা শুনিতেছিল—তার স্নায়ু আর মন পুনঃপুনঃ কেমন করিয়া মোচড় খাইতেছিল তা সে-ই জানে। সৃষ্টির ধারাকে সচল আর শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছে যে-নিয়মটি তাহাকে পৌরাণিক কি আধুনিক উপাখ্যানের সাহায্যে অধিকতর গুণোপেত করিয়া উপলব্ধি করানো যাইতে পারে। মনে হইতেই অভয়া পর্দা ঠেলিয়া একটু বেগের সঙ্গেই প্রবেশ করিলো ; নিয়মের ব্যাখ্যানকারীকেই সে বলিলো,—'তোমার কি একেবারেই মতিচ্ছন্ন ঘটেছে? এতদূর খেপেছো তুমি?'

শান্তির মুখের দিকে চাহিয়া অতুল ঈষৎ হাস্য করিলো, অর্থাৎ দেখো তামাশা! তা-ই বটে। শান্তি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলো, বলিলো, 'মা একেবারে ষোলো আনা সেকেলে ; পাঁজির মতো কেবল নিষেধে পরিপূর্ণ, আটঘাট বেঁধে দেওয়া।'

—'শাসন করে, সংযত রাখার উপায় ঐ। অতো অশুভ-অন্যায় কথা আমি এখানে হতে দেবো না।...তোমরা সম্পর্ক ভুলেছো এমন একটা মোহের বশে যাকে ঘৃণা করতেও যেটুকু গায়ে মাখতে হয় তাও যেন পারিনে।'

শান্তি মায়ের উক্তির প্রতিবাদ করিলো, সুন্দর ভাষায় আর সুন্দরতর ভঙ্গিসহকারে বলিলো,—'মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিষ্কার স্বচ্ছ থাকে ; যতো গ্লানি, অপরাধ আর দুষ্টামি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুন। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করবো কেন? শিক্ষা নেবো না?'

'নেও।' বলিয়া অতুলের দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অভয়া চলিয়া গেলো—ওদের নিষ্কৃতি দিলো।

অতুলের বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি নয় ; শরীর সুস্থ এবং পুষ্ট, কিন্তু শরীরকে অতিক্রম করিয়াই বিবেচ্য যে-কথাটা তা এই যে, পিতৃসঞ্চিত দেড় লক্ষ টাকার তিন ভাগের এক ভাগ পাইয়া সে বড়োলোক হইয়াছে। শিক্ষিতও সে খুব—বি-এ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, এম-এ পড়িবার সময় একটি ঘটনায় সে কলেজ এবং দেশ এক সঙ্গেই ত্যাগ করে।

শান্তিকে সে কেতাবি বিদ্যা শিক্ষা দেয় ; আবার শান্তিও তাকে শেখায়—এস্‌রাজ বাজানো শিখাইয়া লইয়াছে, এবং আরো শেখায়...

বলে, 'বাবা, তোমার হাত অতি চমৎকার, আমার চাইতেও ভালো, ভারি মিষ্টি। আমার কাছে শিখে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে ছাড়িয়ে যাও। মাস্টার মশায় সেদিন তোমার বাজনা শুনে গেলেন তো! আমাকে বললেন, শান্তি, তোমার বাবা একটি অদ্ভুত প্রতিভা ; শিক্ষকের শিক্ষাকে এমন দ্রুত আয়ত্ত আর উন্নত করতে আর কাউকে দেখিনি।'

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অতুল যথেষ্ট পুলকিত হইলো ; বলিলো, 'কিন্তু তার একটা মানে আছে...'

—'মানেটা কী?'

প্রচ্ছন্ন যে-জিনিশটা উদ্‌ঘাটিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তাহাকে নবজাতকের মরমি মর্যাদা দিতে শান্তি খুব প্রস্তুত ; মানে জিজ্ঞাসা করিয়া সে উৎসুক হইয়া রহিলো।

অতুল বলিলো, 'তোর কাছে শিখতেই আমার কতো আনন্দ! সেই মুখর আনন্দের আলাপ শুনে

মনে হয়, মধুর জিনিশকে মধুরতর করা হচ্ছে।'...বলিয়া সে যেন চুরি করিয়া হাসিতে লাগিলো। তারপর বলিলো 'তোর গুরুর কাছে শিখলে ওটা হতো না।'

শান্তি জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেন?'

অতুল তখনই কোনো জবাব দিলো না, একটু পরে, যেন একটা কিছু সহিয়া লইয়া, বলিলো, 'সে অন্য কথা।'

—'অন্য কথা থাক্। কেমন সুন্দর মেঘ করেছে দেখো, বাবা! অকালের মেঘ দেখে আমার খুব নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটু বাজাবে, বাবা?

অতুলও মেঘ দেখিলো; অপরাহ্নের সূর্যকে আবৃত করিয়া অত্যন্ত গাঢ় নীল পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—মেঘের সেই গতিটুকু যেন তার কান্তিরই বিলসিত হিল্লোল—চক্রবালে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে...

বলিলো, 'বাজাবো যন্তরটা দে।'

শান্তি এসরাজ আনিয়া দিলো; বলিলো, 'তুমি ততোক্ষণ সুর বাঁধো, আমি সেজে আসি।' বলিয়া সে এখনকার, অর্থাৎ মেঘলোকের সঙ্গে ভূলোকের মিলনবার্তা বহন করে যে-নাচ সেই নাচের উপযুক্ত পোশাক পরিতে গেলো, অবশ্য নাচের ভঙ্গিতেই গেলো।

অতুল যন্ত্র বাঁধিলো—

শান্তি সাজিয়া আসিলো— অতি উজ্জ্বল চওড়া লাল পেড়ে মেঘবর্ণের শাড়ি ঘাগরার মতো করিয়া সে পরিয়াছে, আর সর্বাঙ্গে জড়াইয়াছে ঐ রঙের ওড়না; ওড়নার জরির পাড় ঝক্‌মক্ করিতেছে; গভীর কালোচুলের রাশি বিস্তৃত করিয়া এলাইয়া দিয়াছে...সমগ্র কৃষ্ণ-পরিবেষ্টনীর মাঝে তার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে ফুটিয়া আছে—

দেখিয়া অতুল মুগ্ধ হইয়া গেলো; বলিলো, 'বাঃ...'

—'মেঘ বিদ্যুৎ ঝড়।' বলিয়া শান্তি হাসিলো।

তার হাসিটাও হঠাৎ চমৎকার হইয়া দেখা দিলো। পাদপীঠ রক্তাধারে প্রজাত হইয়া তার হাসি নিমিষেই উৎফুল্ল হইয়া ওঠে—সুসজ্জিত শুভ্র দন্তপংক্তি যেন তার যৌবনবাহিত অন্তরের অপরূপ উদয়-জটায় আলোকিত হইতে থাকে,—সমগ্র মুখমণ্ডল হাসিতে ভরিয়া যায়...

কিন্তু এখন তা দেখা দিলো আরো সুন্দর হইয়া—গৃহের অভ্যন্তরের এই শ্যামসুন্দর মেঘম্লানিমা উত্তীর্ণ হইয়া মেঘের নীলাঞ্জন-অঙ্গে যেন তার হাসির ঝলক লাগিলো!—

অতুল মনে-মনে তার তারিফ করিলো; বলিলো, 'সেজে তো এলে চমৎকার। কী বাজাবো?'

শান্তি ভ্রূভঙ্গি করিলো; বলিলো,—'তুমি যেন দিন-দিন নাবালক হচ্ছো, বাবা!'

এই ভর্ৎসনায় অতুলের আনন্দ দেখা দিলো; যেন কৃতার্থ হইয়া বলিলো, 'তা আমি জানি, কিন্তু নাচবে যে তুমি! তোমার মন এখন কী বলছে আর কী চাইছে তা আমি কী জানি!'

—'জানো।'

—'আচ্ছা।' বলিয়াই অতুলের যেন সেই মুহূর্তেই মনে-মনে প্রতীক্ষার আর আয়োজনের শেষ হইয়া গেলো—শান্তির উদ্দীপ্ত দেহ-ভঙ্গির মাঝেই সে একটা ছন্দ খুঁজিয়া পাইলো...যন্ত্রের তারে তারে একটিমাত্র আঘাতে শব্দ যেন আত্মার আবেগে কল্লোলিত হইয়া উঠিলো—

তারপর তার বাজনা শুরু হইলো...

শান্তি সর্বাঙ্গ অপরূপ একটা প্রযত্নের সহিত • ১ত নিশ্চল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—ধীরে-ধীরে তার দেহ চঞ্চল হইয়া উঠিলো...

নৃত্য শুরু হইলো—বাঙ দেহ চরণের গতি-মর্মময় রূপ গ্রহণ করিলো...

কুমারী সে—কেহ তাহাকে স্পর্শ করে নাই—সে কিছুই জানে না, কিছুই সে গ্রহণ করে না—প্রেম তার অজ্ঞাত...

তারপর, পুরুষ তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছে—তার দেখা পাইয়াছে, কিন্তু পরিচয় পায় নাই—কুমারীর গহন অন্তর রহস্যে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ. তারপর সে প্রেমাভিলাষিনী, কিন্তু ছলনাময়ী..

অতুলের হাতে যন্ত্র যেন সজীব হইয়া ধ্বনিত করিতে লাগিলো...

শান্তি এইবার দেখাইবে, কুমারীর কল্পনার লাস্য আর কেলিপ্রবণতা তিরোহিত হইয়াছে—সে এখন মহিমময়ী—জাগ্রতা নারীর দুর্নিবার প্রেমে সে এমন প্রদীপ্ত—সে তার আত্মার সহচরের সাক্ষাৎ পাইয়াছে—সে এখন রাজ্ঞী অথচ পরিচারিকা বিজয়িনী অথচ কোমলা। পূজারিনী অথচ উপাস্য—রঙ্গিনী অথচ পরম পবিত্রা—পরবশার মতো চায় সবই, কিন্তু কাঁপিয়া সারা হয় ; মন চায় আর না চাহিবার ভান করে আর ভয় পায়—তারপরই সহসা একসময় কুলভাঙা উদ্বেল প্রেমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্বস্ব সমর্পণ করে—পুরুষের আপন হয়...

তারপর আসিলো স্থিতি, গতি, গণ্ডির ভিতর—শান্তিময় পরিমণ্ডলে নিজের গভীরতম সত্তার পূর্ণ অনুভূতি আর পূর্ণাতি...

ঐ ব্যাঞ্জনাময় নৃত্য শেষ হইলো—শান্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—

মেঘ কাটিয়া অস্তমান সূর্যের আভায় পশ্চিমের আকাশ তখন লাল—ঘরেও তা প্রতিফলিত হইয়াছে...

কোলের উপর যন্ত্র নামাইয়া অতুল ধীরে ধীরে চোখ তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে তাকাইল...নূতন কিছু দেখিবে বলিয়া সে তাকায় নাই, কিন্তু দেখিলো যা তা প্রায় নূতনই—শ্রমে-উত্তেজনায় শান্তির মুখমণ্ডলে একটা রক্ত আভা ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে শিশিরকণার সঙ্গে তুলনীয় বিন্দু-বিন্দু স্বচ্ছতম ঘর্ম—

আর, নাচ শেষ হইলেও, অতুলের মনে হইতে লাগিলো, প্রেমের এই ব্যাখ্যা, ব্যঞ্জনা আর মূর্তি একটা উজ্জ্বল কলেবর ধারণ করিয়া সেই চিরন্তন মানুষের অন্তর বৃন্দাবনাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, যে মানব প্রেমাকাঙক্ষী, মেঘ ঘনাইলে যার বুকে পিপাসা আর নিশ্বাস সঞ্চিত হয় ; বিদ্যুৎস্ফুরণে যার মনে হয়, মিলনাকুলা অভিসারিকা কেকাকূজিত বনভূমিতে পথরেখার সন্ধান করিতেছে—

অতুলের চোখের সামনে খেলিতে লাগিলো, তখনকার সেই রক্তপ্রান্ত অশেষ মেঘপুঞ্জের অপরূপ বর্ণ, আর, নিশ্চলতার সঙ্গে তার অপরূপ দ্যুতি আর গতি...

শান্তির নৃত্যে তা অব্যর্থ আকারে ব্যক্ত হইয়াছে। ঈষৎ অন্ধকার কক্ষটি ছিলো যেন মেঘের স্পর্শানুভূতির আবেশে মধুময়, আর মোহময়,—ঐ নীল শাড়ির প্রান্ত হইতে শুরু করিয়া সঞ্চালিত উড্ডীয়মান ওড়নায় মেঘের গতি তরঙ্গায়িত হইয়া দেখা দিয়াছিল—ওড়নার সোনালি পাড়ে ঝলকিত হইয়াছিল বিদ্যুতের সর্পিল তীক্ষ্ণ স্ফুরণ...

পূর্বরাগ, অনুরাগ, মিলন, অভিমান, সম্ভোগ প্রভৃতি নৃত্যে ব্যঞ্জিত করিয়া, অর্থাৎ আপনারই আবহস্বরূপটিকে রসে-প্রেমে রঞ্জিত আর প্রেমের রসে-রভসে নিমজ্জিত করিয়া শান্তি ঘনঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলো—

তার মুখের রক্তাভার সঙ্গে ঘর্মবিন্দু এবং ঐ দুটির সঙ্গে তার সঘন নিঃশ্বাস-পতনও অতুল দেখিলো, এবং দেখিয়া অতুলের অকস্মাৎ যা মনে হইলো, এমনি দৃশ্যের সমগ্র পরিবেশের অভ্যন্তরে তা অস্বাভাবিক নয়, অন্তত তার পক্ষে—এবং তারও পূর্বে নৃত্যভঙ্গিতে প্রেমের যে-ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছিল তাহাও ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলো, আর, সকলে মিলিয়া অতুলের মনে পড়াইয়া দিলো, নারীর সঙ্গে পুরুষের নিকটতম যে-সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে দেহ একবার হয় অগ্নিগর্ভ, একবার হয় রোমাঞ্চিত সেই সম্বন্ধটি...

শান্তি তখন নিজেকেই অধ্যয়ন করিয়া মুখভরে মৃদু-মৃদু হাসিতেছে—

জিজ্ঞাসা করিলো, 'কেমন নাচলাম, বাবা?'

—'চমৎকার, কিন্তু প্রেমের তুই কী জানিস যে এমন সুন্দর করে ফুটিয়ে তুললি?'—অতুল ঐ সংবাদটি জানিতে চাহিলো ..

শান্তি বলিলো, 'স্বপ্নে পেয়েছি। যাই, পোশাক বদলে আসি!'

অভয়া এতক্ষণে ভূমিশয্যায় পড়িয়া প্রাণান্তকর বিক্ষোভে কেবলই ছটফট করিয়াছে ; উহাদের, যারা বাজাইতেছে আর নাচিতেছে তাদের, কি ইহকাল-পরকাল ধর্মাধর্মজ্ঞান কিছুই নাই! উৎসন্নে যাইবার

পথে কি উহাদের এক মুহূর্তের জন্য একটুও চৈতন্যের উদয় হয় না যে তারা ভদ্রলোক! নরকের ভয় নাই!...অভয়ার মনে হইতে লাগিলো, সে বড়ো অসহায়, আর বড়ো দুঃখিনী। প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিয়া দুষ্কার্যের প্রতিবাদ করিবার মতো মনই তার নয়—সে তা পারে না! তার এই অক্ষমতা হয় তার আরো কষ্টের কারণ—সেই কষ্টেই সে আরো অবসন্ন হইয়া ওঠে। মনে হয় পাগল হইয়া যাইবে।

যন্ত্র সঙ্গীত এবং তার আনুষঙ্গিক নৃত্য, অথবা নৃত্য, এবং তাব আনুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত, সমাপ্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পরে অভয়া ধীরে ধীরে উঠিলো...দ্বিতলে গেলো—পর্দা সরাইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলো—দেখিলো যন্ত্রসঙ্গীতে যিনি নিপুণ, তিনি কৌচে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন, আর যিনি নৃত্যনিপুণা তিনি বসিয়া আছেন পালঙ্কে—

উভয়ে কথাবার্তা হইতেছে; মেয়ে বলিতেছে, 'বাংলা তিরিশে গগন খাস্তগীরের বাড়িতে যে নৃত্য প্রতিযোগিতা হবে তাতে আমি এই নাচটা দেখাবো বাবা। আরো বারকতক রিহার্সেল দিতে হবে। তুমি বাজাবে, বাবা। তুমি বাজালে মেডেল আমি অনিবার্য পাবোই—ওস্তাদজিও খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। মা এসে দাঁড়িয়ে আছে।' বলিয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া শান্তি হাসিলো।

অভয়া বলিলো, 'ঠাট্টা হচ্ছে!'—অতুলকে বলিলো, 'তোমার সঙ্গে আমার গোপনে একটা কথা ছিলো...'

শান্তি বলিয়া উঠিলো, 'তোমার গোপনীয় কথা কিছুই নেই। আমি রসাতলে যাচ্ছি, বাবা তার সহায়— এই নিয়ে বাবাকে তুমি বকবে। এই তোমার কথা! আমার সামনেই বলো।'

মেয়েকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া অতুলকেই অত্যন্ত বিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অভয়া রাগের সহিত বলিলো, 'আমি এখনও তোমার অন্ন খাচ্ছি, এ-ই আমার সব দুঃখের বড়ো দুঃখ।' বলিয়া সে ক্ষিপ্র হস্তে পর্দা সরাইয়া ক্ষিপ্র পদে চলিয়া গেলো—

কিন্তু অতুল কিছুমাত্র বিদ্ধ হইলো না—

অভয়ার রোষ অকারণ এবং অসংবদ্ধ মনে হইয়া সে উল্‌টোভাবে হাসিতে লাগিলো।

রাত তখন আটটা—

পর্দার উপর ছায়া পড়িতেই চেঁচাইয়া উঠিলো, 'কে ওখানে?'

—'আমি।' বলিয়া অভয়া মনে-মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া গত্যন্তব অভাবে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলো। তার মনে ছিলো না যে, চাঁদ উঠিয়াছে, আর অতুলের পড়িবার ঘর পূর্বদ্বারী।

শান্তি নাচে, এবং বড়ো বড়ো বইও পড়ে, অতুল যথাসাধ্য মর্ম ''হণ করায়, কিন্তু ভারি বাছ-বিচাব; কারণ, কোনো একটা জিনিশকে বস্তুব ভিতব হইতে বাছিয়া লইয়া তাব অনমনীয় দুরন্ত গোঁড়া হওয়া আধুনিক সভ্যতাব একটা সুলক্ষণ বলিযা সে মনে করে...

মেকলে, থ্যাকারে আর এ্যাডিসনের ইংরেজি ভালো নয়, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ; শেক্‌সপিয়ারের এতো পাঠান্তর আর এতো নিজস্বতা যে, বাঙালির পক্ষে তা বুঝিয়া ওঠা অসম্ভব, ইহাও সে বলে; ইংরেজিতে অনুবাদ করা অন্যান্য দেশের বই পড়া কঠিন, কারণ, পুস্তকান্তর্গত নামগুলি দুরুচ্চার্য—কোনো প্রকারে কায়দা করিয়া বাগাইতে পারিলেও বেশিক্ষণ মনে থাকে না; আধুনিক লেখকগণ বেশি প্রগল্‌ভ আর ধড়িবাজ, মাঝে মাঝে অত্যন্ত নগ্ন—এতোটা প্রায়ই ভালো লাগে না; প্রবন্ধ কি ভ্রমণবৃত্তান্তও ভালো লাগে না—মনে হয়, কুষ্টন বড়ো বেশি...

—'তবে তুই চাস কী? প্লেটোনিক লাভে: বই?'

—'আমি চাই সরল আনন্দ। ডিকেন্স আমি খুব পাড়ি।'

অভয়া এতোক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সরল আনন্দের কথা শুনিয়া সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলো না—ভর্ৎসনা নির্গত হইলো; বলিলো, —'তোমাকে দেয়া হবে গরল—সেই আয়োজনই বুঝি হচ্ছে।' বলিয়া সে অতুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলো—তার চোখের উপর চোখ পড়িলো; বলিলো– 'মেয়েটাকে তুমি নষ্ট করতে চাও কেন বলো তো?'

—'নষ্ট করতে চাই তা তুমি জানলে কী করে?'

—'তবে লাভের কথা ওঠে কেন? তুমি সরে থাকো না কেন? ইচ্ছা করে সরে থাকো না দেখে তাই মনে হয়। তুমি গুরুজন ; গুরুজনের সম্মান নষ্ট হচ্ছে, তা না বোঝার ভান করো কেন!...আমার অদৃষ্টে যা ছিলো তা ঘটেছে:..'

অত্যন্ত শান্ত স্বরে অতুল বলিলো,—'তুমি যাও এখন।'

—'যাই। আমি কিন্তু আর যন্ত্রণা সইতে পারছিনে, নিজেকে বইতে পারছিনে—এতো ভয় আমি কোনো দিন পাইন।'

—'ভয়ের কোনো কারণ নেই—'

—'আছে ; তোমাকে আমি চিনি।' বলিয়া অভয়া চলিয়া যাইতেছিল, শান্তি তাহাকে ডাকিয়া ফিরাইল ; বলিলো—'তোমাদের কথা আমি বুঝলাম না কিছুই ; কিন্তু মনে হচ্ছে, কথাটা দুঃখের—তোমাদের ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বাবাকে নিয়ে তোমার কোথায় যেন বিপদ ঘটেছে, কি ঘটবে বলে ভয় করছো। সেটা কী মা? বাবার কি চরিত্রদোষ ছিলো?'

অভয়া বলিলো, 'বলবো একদিন।'

অতুল এ-কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলো না, নির্বিকার ভাবে বলিলো 'তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।'

—'তা জানিনে।' বলিয়া অভয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলো—

এবং শান্তি হঠাৎ জানিতে চাহিলো—'মা, আমরা কি এখানে নির্বাসিত?'

এই প্রশ্নে অতুল একটু যেন কৌতূহলী হইলো ; মুক তুলিয়া শান্তির মুখের দিকে চাহিলো।

অভয়া কথা কহিলো না।

অতুল বলিলো, 'কেন বলো তো?'

—'আমি দেখি তা-ই। কোনোদিন তোমাদের মুখে অপর কারো কথা শুনিনে—কারো চিঠি আসে না। আমার কি মামা মাসি পিসি খুড়ো জ্যাঠা কেউ নেই?'

—'আছে .'

--'তবে?'

—'তারা আমাদের খোঁজ নেয় না, আমরাও তাদের খোঁজ নিইনে।'

—'কখনো না?'

—'না।'

—'অপবাধ?'

অভয়া বলিলো, 'অপরাধ ওঁরই--উনি তা অস্বীকার করুন দেখি...'

মুখ-চোখ দেখিয়াই মনে হইলো, অতুল যেন বিপন্ন হইয়াছে—মনে মনে ভারি ছটফট করিতেছে ; নিষ্পলক চোখে সে কয়েক মুহূর্ত অভয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলো, যেন, করুণা প্রার্থনা করিতেছে...

কিন্তু মুখে সে বলিলো, 'তুমি এখন কী পড়ছিলে?'

জিজ্ঞাসা করা হইলো অবশ্য শান্তিকেই ; এবং শান্তিই বলিলো, 'তুমি কথাচাপা দিচ্ছো বাবা ; আচ্ছা তাই হোক—অতীতকে আর কথা কইয়ে কাজ নেই।' বলিযা হাসিয়া উঠিলো ; বলিলো,—'পড়ছিলাম ডিকেন্স। ডিকেন্সের লেখায় আমি যেমন সরল আনন্দ পাই, অপর কারো লেখায় তা পাইনে। কিন্তু মা এসে রসভঙ্গ করে দিলো। তুমি যাও, মা।'

উভয়েরই কাছে অপ্রস্তুত হইয়া অতুল কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া রহিলো—অভয়া বাহির হইয়া আসিলো, এবং বাহিরে আসিয়াই সে অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলো না—অসহ্য অতীত উত্তরোত্তর অতিশয় উচ্চকণ্ঠ আর যন্ত্রণাকর হইয়া উঠিয়াছে।

—তাহাকে উদগীরণ না করিলেই নয়।

অভয়াকে যেন কণ্টকবনে বিচরণ করিতে হইতেছে—তাহাকে সেখানে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—অষ্টপ্রহর এমনি তার শশব্যস্ত হইয়া নিষ্কৃতির উপায় অন্বেষণ আর যন্ত্রণা। মেয়েটিকে কোন পথে লওয়া হইতেছে তা সে নিঃসংশয়ে জানে না, কিন্তু লক্ষণ আর অসম্ভব যা তা ভয়ঙ্কর ভাবিতে গেলে আকণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিতে হয়—হুঁশ থাকে না—বুকের স্পন্দন অচল হইয়া আসে।

শান্তি একদিন গল্প করিয়াছিল যে, সে আর তার বাবা রাস্তায় বেড়াইতেছে, এমন সময় হঠাৎ তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া গেলো একটি ভদ্রলোক, কিন্তু নিরীহ সেই লোকটিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া তার বাবার পলায়ন করিবার সে কী চেষ্টা! তার বাবা যেন চোর—ধরা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে...

অভয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'সে-লোকটা কী করলো?'

—'চোখ বড়ো করে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলো। অনেকক্ষণ পরে যেতে যেতে পিছনে তাকিয়ে দেখি দাঁড়িয়েই আছে, ঠিক সেখানেই, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।'

-'মুখখানা কেমন?' ওঁর মতো দেখতে?'

—'না, বাবার মতো নয়, তোমার মতো তো নয়ই। কে, মা? চেনা মানুষ নিশ্চয়ই; আর, তার কাছে বাবা লজ্জাকর গুরুতর অপরাধে অপরাধী, এ-ও নিশ্চয়। ব্যাপারটা কী? তুমি নিশ্চয়ই জানো...'

শান্তি রাগ করে নাই, ভয় পায় নাই, ব্যথিত হইয়াছিল।

কিন্তু অভয়া সে-কথার জবাব না দিয়া প্রাণপণে অনুমান করিতে গিয়াছিল, লোকটা কে, কোন বাড়ির। তার শ্বশুর বাড়ির না বাপের বাড়ির।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'খুব বুড়ো নাকি লোকটা?'

বিরক্ত হইয়া শান্তি বলিয়াছিল,—'বুড়ো বই কি; বয়স ঢের হয়েছে মনে হলো। আরো যদি বর্ণনা চাও, দিতে পারি। খুব ফরশা রং, লম্বা, মোটা নয় বেশি, তবে পাতলাও নয়। পেলে? ভালো কথা, গোঁফ আছে, দাড়ি নেই—টাকার মানুষ বলে মনে হলো—টাক পড়ে আসছে। তোমরা দিন-দিন আমাকে বিষম করে তুলছো, তা জানো।'

অত্যন্ত ক্লান্ত ম্লান চক্ষে মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অভয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু সঠিক ঠাহর করিতে পারে নাই, লোকটা কে!

অতুল দিয়াছিল সদুত্তর—

শান্তির প্রশ্নের জবাবে সে বলিয়াছিল, ঐ লোকটা তাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া-

—কখন?

—যখন আমরা পৃথক হই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার ভিতরে তার আসার দরকারই ছিলো না। আমরা কেউ তাকে ডাকিওনি; দাদাকে ওকালতি কুপরামর্শ দিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করতেই একদিন দিলাম কষে প্রহার। সেই থেকে লোকটা পরম শত্রু হয়ে আছে...

বলিয়া অতুল এমন উন্মুক্ত একটি উচ্চহাস্য ধ্বনিত করিয়াছিল যে, প্রহারের অপমান আর যন্ত্রণা লোকটা আজও যে ভুলিতে পারে নাই তাহা প্রচণ্ড নির্মল একটি কৌতুকের বিষয়।

শান্তির মনে হইয়াছিল, ঘটনা সত্যিই বুঝি তা-ই; কিন্তু অভয়া এই জাজ্বল্যমান মিথ্যা উক্তির দরুন নয়, যথার্থ ব্যাপার সন্দেহ করিয়া বিবেকদংশনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

•

অতুল শান্তিকে লইয়া সিনেমায় গিয়াছে। কিন্তু ফিরিতে বড়ো বিলম্ব করিতেছে। শো শেষ হয় সাড়ে ন-টায়; কিন্তু এখনো তারা ফেরে নাই—রাত দশটা বাজে। এই বিলম্বেই অভয়া উৎকণ্ঠায় অস্থির হইয়া বেড়াইতেছে; নিজেদের কারে গিয়াছে, তাতেই ফিরিতে এতো বিলম্ব হইতেছে কেন? সিনেমায় যাইতেছি বলিয়া অন্য কোথাও যায় নাই তো!...ত্রাসে অভয়ার মাথায় ঠিক আসিতেছে না—একটা অগ্নিদাহে পড়িয়া তার চৈতন্য যেন ক্রমশই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে...ছটফট করিতে-করিতে অভয়া যাইয়া দাঁড়াইল দরজায় কিন্তু সেখান হইতে বড়ো রাস্তায় যে উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছে

একটি বাড়ির গায়ে তারই খানিকটা আলো ছাড়া আর কিছুই দেখা গেলো না। গলির দুটি বাড়ি পার হইয়া গেলে তবেই সোজা রাস্তা পাওয়া যায়, এবং সেখানেই চলে যানবাহন প্রভৃতি।

অভয়া ফিরিয়া আসিলো—জানালায় যাইয়া দাঁড়াইল, সেখান হইতেও দেখা গেলো উর্ধ্বগামী আলোকপুঞ্জের আভায় উজ্জ্বল শূন্য খানিকটা তার উপরে অন্ধকার—তার উপরে নক্ষত্র—অতুলের গাড়ি সে-পথে আসিবে না—

সরিয়া আসিয়া সে দরজায় চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলো—দূরে একটা উচ্চ শব্দ হইতেছিল, যন্ত্রের গর্জনের মতো সেই শব্দের দিকেই যেন সে চোখ মেলিয়া রহিলো...

তারপর যাইয়া সে শুইয়া পড়িলো মাটিতেই।

রাত তখন সওয়া দশটা ; ওরা এখনো ফেরে নাই...

শুইয়া থাকিতে-থাকিতে তার সর্বাঙ্গ একবার নড়িয়া উঠিলো—একটা অনুচ্চ আর্তনাদ তার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেলো। তারপরেই সে উঠিলো, অকারণেই রান্নাঘরে গেলো—সেখান হইতে ফিরিয়া ছাদে উঠিলো—কোনোদিকেই না তাকাইয়া নামিয়া আসিলো—শান্তির পড়িবার ঘরে গেলো—সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ গেলো নিজের শোবার ঘরে—পাতা বিছানা টান মারিয়া উল্টাইয়া দিলো—বসিয়া পড়িলো...

তার মনে হইতে লাগিলো, পাপের প্রায়শ্চিত্ত শুরু হইয়াছে ; তার অজ্ঞানতা, তার অন্ধতা, তার উত্তেজনা, ভ্রম, দুর্বুদ্ধি সবই তার পাপ ; কিন্তু যথার্থ যে পাপী, যে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া নানা ছলে তাহার সংবিৎকে উত্তাপ দিয়া দিয়া বক্র বিকৃত বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, সে আজও পরম আনন্দে আছে...

তখনই পাওয়া গেলো সিঁড়িতে ওদের পায়ের শব্দ...

অভয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলো, যেন অনিবার্য আর অপরিহার্য একটা শোচনীয় দৃশ্য তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, আর বুক পাতিয়া দুর্জয় শোকের ঝঞ্ঝা গ্রহণ করিতে হইবে...

শান্তি হাসিতে-হাসিতে আসিয়া মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইল ; তার পশ্চাতে অতুল, তাহারও হাসিমুখ। শান্তি বলিলো, 'মা হয়তো ভাবছিল, মটোর অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়ে আমরা হাসপাতালে চালান গেছি। তা-ই ভাবছিলে না, মা?'

অভয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলো, 'না, আমি তা ভাবি নাই। এতো দেরি হলো যে?'

কৌতুকে-পুলকে ছিটকাইয়া উঠিয়া শান্তি বলিতে লাগিলো, 'বাবার কী কাণ্ড। মটোর ফেরৎ দিয়া বললে, চলো হেঁটে যাই। তারপর রাস্তায় আসতে-আসতে বাবার বারবারই দাঁড়ানো শুরু হলো ; ভিখিরিটা কেমন ভঙ্গি করে বেঁকে-চুরে শুয়ে আছে, তা দেখলো দাঁড়িয়ে ; চানাচুরওয়ালার সুর ভাঁজা আর বুলি শুনলো দাঁড়িয়ে ; রেলিং-এ লট্‌কানো ছবি দেখলো দাঁড়িয়ে ; একটা শতছিন্ন কাপড়-পরা মেয়েমানুষ বসে আছে পা ছড়িয়ে একটা উলঙ্গ ছেলে আছে তার পিঠের উপর উপুড় হয়ে, তা দেখলো দাঁড়িয়ে। ইত্যাদি। ঈশ, এগারোটা বাজে যে!'

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিনে ; শেখানো কথা উনি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন বলতে। তুমি পাষণ, পাষণ্ড।'

অত্যন্ত ঝাঁজালো সুরে শান্তিকে অবিশ্বাস করিয়া আর অতুলকে গালি দিয়া অভয়া প্রস্থান করিলো।

'মা বলতে চায় কী! হঠাৎ খেপে গেলো নাকি! বাবা তোমাকে কেন মা গাল দিয়ে গেলো?' শান্তি বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলো।

'ঈশ্বর জানেন। চিরকালই দেখে আসছি, মাঝে-মাঝে অমনি আবোল-তাবোল বকে।' বলিয়া অতুল নির্লিপ্তের মতো ধীরে-ধীরে বস্ত্র পরিবর্তন করিতে গেলো।

খাইতে বসিয়া 'মাধুকরী' ফিল্‌মের উপাখ্যানভাগের আলোচনাই চলিতে লাগিলো ; শান্তি বলিলো, 'বাবা মা যদি দেখে তবে মা কী বলবে! মূর্ছা যাবে হয়তো। সন্তানের উদরান্নের জন্য নানা পুরুষের পরিচর্যা করা অথচ কায়মনে যথার্থ সতী। উঃ, মা তা ভাবতেই পারে না।' বলিয়া হাসিয়া উঠিলো।

অতুল কেবল বলিলো, 'হুঁ।'

'কিন্তু ধন্য নরেন্দ্র সেই মেয়েটিকেই ভালোবেসে বিয়ে করলে! ঐ জায়গাটায় কী রকম হাততালি পড়লো। তুমিও তো হাততালি দিয়েছিলে বাবা।'

'না, আমি দিইনি।'

'দিয়েছিলে।'

অতুল আবারও অস্বীকার করিলো, 'না, আমি দিইনি।'

ক্ষিপ্র একটা মেজাজের উপর অভয়া বলিয়া উঠিলো, 'তুমি নিশ্চয় দিয়েছিলে—তাইতেই তো এতো রাত হলো।'

'তোমার চরিত্র চিরকাল কু।'

শান্তি বুঝিলো, মা উত্তেজনাবশতই অসংলগ্ন কথা বলিয়াছে, সে বিহ্বলের মতো একবার তার বাপের মুখে দিকে, একবার তার মায়ের মুখের দিকে তাকাইল ; দেখিলো, তার বাবা নির্বিকার চিত্তে আহারে ব্যাপৃত ; মায়েব চোখে প্রচুর জল আসিয়াছে। বলিলো, 'ব্যাপার কী তোমাদের! মা, তোমাকেই আমি দোষ দিই। বাবার চরিত্র কু হলেও সে-ইঙ্গিত বারবার কেন করছো, আর আমার সামনে কেন করছো! আমাকে জানানো উচিত নয়।'

'তোকে ও কুসংসর্গ দিচ্ছে—কেন বলবো না! পড়ায় তোকে কদর্য বই, নাচায়, কথা কয় খারাপ-খারাপ—আমি চুপ করে থাকবো?'

কিন্তু তারপরই তিনজনই চুপ করিয়া রহিলো। আনন্দের আকাশ যেন দূষিত বাষ্পে ঘোলা হইয়া গেলো—এই নিরানন্দ আবহাওয়া শান্তিকেই আঘাত আর বিব্রত করিলো বেশি।

রাত্রি তখন অনেক—

অভয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিলো—মেয়েব ঘরের দরজায় গেলো—চৌকাটে দাঁড়াইয়া কী ভাবিলো—

তিনটি শয়ন কক্ষ পাশাপাশি—ভিতরের দরজা খোলাই থাকে, অর্থাৎ অর্গলে আবদ্ধ থাকে না। অভয়া দরজা ঠেলিয়া খুলিলো, শান্তির অগভীর ঘুম ভাঙিয়া গেলো ; বলিলো, 'কে?'

'আমি তোর মা। উঠে আয়, কথা আছে।'

কথা যে তাহা শান্তি বুঝিয়াছে—শুইয়া-শুইয়া সে আজ অনেক কথাই ভাবিয়াছে। তার বাবাকে তাহারই সমক্ষে চরিত্রহীনতার অপরাধে পুনঃপুনঃ লাঞ্ছিত করার কারণ গভীরই ; নিরীহ ভদ্রলোককে পথে দেখিয়া তার বাবার চোরের মতোন দ্রুতগতি পলায়ন করিবার কারণও গভীর—কেবল পারিবারিক কারণে বিবাদ নয়।

বাপের কুশিক্ষায় আর প্রশ্রয়ে সে অধঃপাতে যাইতেছে, মায়ের এই ধারণা—মায়ের উদ্বেগ স্বাভাবিক, কিন্তু মা গোপনে লক্ষ রাখিতে সচেষ্ট কেন!— তার বাবা অবশ্য তাহাকে কুশিক্ষা দিতেছেন না—যে-সব কথাবার্তা তাঁর সঙ্গে হয় তা এখন সর্বদেশেই সর্বজনীন ভাবে আলোচিত হইতেছে—মায়ের সেকেলে মনে আর শ্লীলতাবোধে তা আঘাত করিলেও মা খুব প্রকাশ্যে তাহাকেই শাসন কি সাবধান করে না—মায়ের যতো আক্রোশ বাবার প্রতি —যতো ভর্ৎসনা তাঁকেই—আর, এমন কী হইয়াছে যে কাঁদিতে হইবে! মা খুব কাঁদেও।

শান্তি ইহাও মনে হইলো, আত্মীয়-স্বজন যারা আছে তারা জীবনে কেউ একবারও দেখা করিতে আসিলো না কেন! সে দুষ্কৃতিটা কী, যাহার দরুন সবাই দূরে সরিয়া আছে একেবারে চিরদিনের মতো!

ইত্যাদি বিষয়ে এবং বিষয়ান্তরও পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া শান্তি ব্যাপারের হেতু এবং পরিণাম অনুমান করিতে পারে নাই—অপরাধ কোন্ জাতীয় তাহাও সে কল্পনা করিতে পারে নাই ; এবং ইহাও তাহার স্মরণ হইয়াছে, যে তার বাবার মুখে কোনোদিন পাপের কুণ্ঠা সে লক্ষ করে নাই—

না ঘুমাইয়া শান্তি ঐ সব যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছে, এবং বিস্মিত হইয়াছে--

তার মা একটা বেদনার দুর্গতির ভিতর দিয়া দিনাতিপাত করিতেছে ইহা যেমন সত্য, তাহাদের জীবন রহস্যাবৃত তাহাও তেমনি সত্য—

মা ডাকিতেই তাড়াতাড়ি সে উঠিলো—বলিলো, 'চলো শুনিগে।'

উভয়ে নিঃশব্দে ছাদে উঠিলো, এবং উঠিয়াই অভয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো—চরম ব্যাকুলতার সহিত মেয়েকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিয়া যে-কথা সে জানিতে চাহিলো সে-কথা কেহ-যে উচ্চারণ করিতে পারে তাহা বিশ্বাস হয় না—

অভয়া বলিলো, 'আমি পাগল হয়ে গেছি; আমার বুক পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। বল্ সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করেনি তো?'

এ-প্রশ্ন মানুষকে কেবল অবাক নয়, পাণ্ডুর করিয়া তুলিবার পক্ষে যথেষ্ট, শান্তি পাণ্ডুর হইয়া উঠিলো, প্রশ্নের মর্ম সে বুঝিলো ; মায়ের স্পর্শ ত্যাগ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিলো, 'নষ্ট করার মানে কী? আর 'ও' বলে তুমি কার কথা বলছো?'

'বেটাছেলে মেয়েছেলেকে নষ্ট করার মানে বুঝিসনে?'

'বুঝলাম। কিন্তু 'ও' মানে কী?

'অতুল।'

শুনিয়া শান্তি যেন বুকে ঘা খাইয়া নড়িয়া উঠিলো আর সরিয়া দাঁড়াইল ; বলিলো, 'বাবার কথা বলছো?'

'হ্যাঁ। ও ইচ্ছে করলে যে যে-কোনো স্ত্রীলোককে বশীভূত করতে পারে।'

'তুমি সত্যিই খেপে গেছো মা,—একেবারে উন্মাদ হয়েছো। নইলে এমন অশ্রাব্য কথা তোমার মুখে বেরলো কী করে? বাবা চরিত্রহীন, এ-কথা তুমি অনেকবার বলেছো, কিন্তু এ-কি কথা তোমার মুখে! বাবা—'

বাধা দিয়া অভয়া বলিলো, 'ও তোর বাবা নয়, কেউ নয় ; তোকে নিয়ে ওর সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলাম...'

বলিতে-বলিতে হঠাৎ সে নিঃশব্দ হইয়া গেলো—

শান্তির একটা নিশ্বাস পতনের শব্দ হইলো—তারপর চরম নিঃশব্দে একটি-একটি করিয়া গভীর রাত্রির মন্থর মুহূর্ত কাটিতে লাগিলো।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পথে

একদিন স্কুলের ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি নামল মুষলধারায়—

স্কুল থেকে বেরুতেই পারলাম না। পেটে দুর্দম ক্ষুধা এবং আকাশের কর্ণভিদ্ গর্জন ফাঁকা ক্লাসে [illegible] বারবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

ঘণ্টাদেড়েক দারুণ বর্ষণের পর প্রকৃতি শান্ত হলেন। বেরিয়ে পড়লুম দুই ভাইয়ে—স্কুল থেকে বাড়ী অনেক দূরে, পড়ি ডফ্ সাহেবের স্কুলে।

সেকালে কলকাতায় ঘণ্টাখানের ঝেড়ে বৃষ্টি হলে—যিনি যেখানে তাঁকে সেইখানেই থাকতে হোতো দু-তিন ঘণ্টার জন্য। প্রায় সব রাস্তাতেই জল দাঁড়াত। স্কুলের ছোট ছেলেদের ডুব-জল, বুক-জল,—হাঁটু-জল, ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। খাটা-পায়খানার যত ময়লা ভাসত সেই জলে, আর তারই ওপরে দাপাদাপি ও লাফালাফি করতে করতে ছাত্রদল বাড়ী ফিরত। এমন দিনে বাড়ীতে ফিরে আমাদের সাবান দিয়ে স্নান করতে হোতো।

যে সব রাস্তায় জল দাঁড়ায় না অথবা বেশি দাঁড়াত না, সে সব রাস্তায় হোত কাদা—সে এক রকম চটচটে ঘন এবং সাংঘাতিক রকমের পেছল কাদা, শতকরা পঁচিশ জন পথিককে আছাড় খেতেই হোতো। এই পা পিছলে পড়ে গিয়ে কর্দমাক্ত হওয়াটাকে ছেলেদের ভাষায় বলা হোতো—আলুর দম হওয়া। কতদিন যে আলুর দম হয়ে বাড়ী ফিরেছি তার আর ঠিকানা নেই।

বর্ষাকালে জলও দাঁড়ায় না, কাদাও হয় না এমন রাস্তা সে সময়ের শহর-রক্ষকেরা দেশী পাড়ায় রাখা বোধহয় পছন্দ করতেন না। এ যুগেও এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না।

যাই হোক, বই, ছাতা, জুতো, কাছা-কোঁচা সামলাতে-সামলাতে অর্থাৎ দু-হাতে দশ হাতের কেরামতি করতে-করতে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় দেখতে পেলুম ফুটপাতের ওপরে খানিকটা ভাঙা জায়গায় বেশ একটা ভিড় গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র-বস্তুটিও যে নেহাত মামুলী নয়, তা ভিড়ের হালচাল দেখে বাইরে থেকেই বুঝতে পারা যায়।

সেদিন ক্ষুধার টান ছিল প্রবল, তাই মজা দেখবার প্রলোভন উপেক্ষা ক'রেই এগিয়ে চললুম ; এমন সময় ভিড় থেকে হো-হো হাসির হররা শুনতে পাওয়া গেল—ছুটলুম সেদিকে। জুতো, ছাতা, বই সমেত কোনো রকমে এঁকে-বেঁকে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে গিয়ে দেখতে পেলুম—পাগলিনী!

রাস্তার পাগলী বলতে লোকের মনে যে ছবি জাগে, এ সে-রকম নয়। প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পারা যায়, রাস্তার সঙ্গে তার পরিচয় সবে-মাত্র শুরু হয়েছে। পাগলিনীর মাথা রুক্ষ নয়, দিব্যি পরিপাটি করে আচড়ানো, তেল-চকচকে এলানো চুল—সীঁথেয় ঝকঝক করছে সিঁদুর, কানে ও হাতে সোনার গয়না। অঙ্গে চওড়া কালোপেড়ে পাতলা শাড়ী, একেবারে ধোপদোস্ত, বেশ বাগিয়ে পরা। স্থূলকায়া হলেও দেখতে খারাপ নয়। চেহারার মধ্যে একটি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে, বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি হবে না।

দেখলুম পাগলিনী নিঃশব্দে কাঁদছে আর ভিড়ের লোকেরা উচ্চরবে হাসছে।

ভিড় থেকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করলে—শ্যামবাবুকে এত ভালবাসিস্ তো তাকে ছাড়লি কেন?

পাগলিনী কাঁদতে-কাঁদতে বললে—তাড়িয়ে দিলে যে!

ইতিমধ্যে আর একজন বললে—তোর শ্যামবাবু আগেকার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

—কোথায় গিয়েছে? কত নম্বরের বাড়ী?

লোকটা যা-তা একটা ঠিকানা বলে দিলে। পাগলী বার দু-তিন তা আওড়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—কত দূর, কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে পৌছতে পারব সেই ঠিকানায়?

একজন রসিকতা করে বললেন—তোকে সেখানে যেতে হবে কেন? শ্যামবাবু বলেছে, সে নিজে এসে তোকে নিয়ে যাবে এখান থেকে।

পাগলিনীর মুখে হাসি ফুটল। খুশিতে ভরপুর হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যি বলেছে! তোকে বলেছে! তাকে নিয়ে এলি না কেন?

লোকটা বললে—চতুর্দোলা ভাড়া করবে, ব্যাণ্ড ভাড়া করবে, তবে তো আসবে। তোকে তো আর এমনি নিয়ে যেতে পারে না?

চারিদিকের সবাই হেসে উঠল—পাগলিনী আবার কাঁদতে শুরু করে দিলে।

ভিড়ের লোকেরা পাগলিনী সম্বন্ধে নানারকম কথা বলতে লাগল। কেউ বললে,—ও ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, শ্যামবাবু বলে একটা লোক ওকে বের করে নিয়ে এসে কিছুদিন বাদে ফেলে পালিয়েছে, তাইতে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

আর একজন বললে—ভদ্রঘরের মেয়ে নয় —তবে শ্যামবাবুর জন্যই ও পাগল হয়েছে।

পাগলিনীকে দেখে মনে করুণার উদয় হয়েছিল, কিন্তু তার জীবন-কাহিনী করুণতর মনে হোলো।

সেই রাত্রে খাবার সময় সবার সামনে পাগলিনীর গল্প করলুম। দেখলুম আসরের সবাই গম্ভীর

হয়ে পড়লেন—দু-একজন সহানুভূতিসূচক একটু শব্দ উচ্চারণ করলেন মাত্র।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতে সকলেই মুখ খুলল। একজন লোক রায় দিয়ে দিলেন—ও মেয়েগুলোর শেষকালে এ-ই হয়ে থাকে।

ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার তো এতক্ষণ মনে হচ্ছিল শ্যামবাবু লোকটাই খারাপ। নেই বা হোল সে ভদ্র গৃহস্থঘরের কন্যা। কিন্তু ভালো সে বেসেছিল একজনকে, যার জন্য আজ পাগলিনী হয়ে রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে—এত বড় সত্যটাকে এরা দু'টো চুকচুক আওয়াজ করে রায় দিয়ে দিলে, যত দোষ ঐ মেয়েটার!

কিন্তু মানুষের চিত্তলোক, যেখানে নিয়ত সৃষ্টি ও ধ্বংসের কাজ চলেছে, সেই আমার চিত্তলোকে পাগলিনীর জন্য নতুন মহল তৈরী হতে শুরু হোলো।

পাগলিনীকে স্কুল-যাতায়াতের পথে রোজই দেখি। প্রায় রোজই তাকে একই জায়গায় দেখতে পাওয়া যেত। দেখতুম, রাজ্যের ছোট ছেলে এবং সকল স্ত্রী-পুরুষ তাকে সর্বদাই ঘিরে রয়েছে, তার আকুলতা দেখে হাসাহাসি করছে। ছেলেরা বলছে—ঐ দেখ, ঐ দূরে তোর শ্যামবাবু পালিয়ে যাচ্ছে।

পাগলী উঠে, থপ-থপ করে দৌড়ল সেই কাল্পনিক শ্যামবাবুর উদ্দেশ্যে—কিছু দূর গিয়ে শ্যামবাবুকে দেখতে না পেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে এল! তার ব্যর্থতা দেখে সবাই হেসে উঠল।

একদিন স্কুলে যাবার সময় দেখি পাগলিনীকে ঘিরে অনেক লোক দাঁড়িয়েছে। দু-একজন ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে চেঁচামেচি করছেন, একজন বললেন—ও সব লোককে পুলিশে দেওয়া উচিত।

তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে দেখি, পাগলিনী ফুটপাতের ধারে বসে নিঃশব্দে কাঁদছে। তার কপালের খানিকটা বেশ কেটে গিয়েছে, দু-তিন জন লোক মিলে দমকল থেকে আঁজলা করে জল এনে তার ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছে।

শুনলুম, সেদিন সকাল থেকেই পাগলিনী শ্যামবাবু, শ্যামবাবু করে চেঁচিয়ে পাড়া একেবারে মাথায় করে তুলেছিল। একটা লোক তাকে বলে যে, শ্যামবাবু বলে এখানে চেঁচালে কি হবে, সে তো ঐ পাড়ায় থাকে।

আর যায় কোথায়! সংবাদটি শুনেই পাগলী উঠে দৌড় মেরেছিল সেই ও-পাড়ার দিকে। স্থূল শরীর, কয়েক পা যেতে না যেতে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে গেছে। নিঃস্বার্থভাবে সকলে যখন সেই নিষ্ঠুর আনন্দ উপভোগে আত্মহারা, তখন জনকয়েক সহৃদয় লোক এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেন।

কিছুদিনের মধ্যেই পাগলিনীর নামকরণ হয়ে গেল। শ্যামবাবু-পাগলী বললেই ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো সকলেই বুঝতে পারত কার নাম করা হচ্ছে।

বছর-দেড়েক পরে আমরা ও-পাড়ার স্কুল ছেড়ে দিলুম। শ্যামবাবু-পাগলীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, এমন সময় একদিন দেখি, পাগলিনী হেদোর ধারে বেশ একটি জনতার মধ্যে বসে তার সেই সনাতন শ্যামবাবু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

পাগলিনী সেই থেকে হেদোর ধারেই রয়ে গেল।

হেদোর গায়ে ফুটপাতের ধারেই সে বসে থাকে। কখনো বা ভিক্ষা করে। কিন্তু 'একটি পয়সা দে বাবা'র চাইতে 'ওরে, শ্যামবাবু কোথায় বলতে পারিস' কথাটা বলে বেশি। ক্রমে তার দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে গিয়ে পথেরই মতন সে মলিন হয়ে উঠতে লাগল। বস্ত্র ছিঁড়ে গেলে দু-এক দিনের মধ্যেই দেখতুম কোথা থেকে নতুন একখানা কোরা ধুতি কিংবা শাড়ী সে যোগাড় করছে। কোথায় খেত জানি না, মধ্যে মধ্যে তেলে-ভাজা খেতে দেখতুম—সে সময়ে হেদোর ধারের মুখরোচক তেলে-ভাজা অনেকেরই নরকযাত্রার পথ সুগম করেছিল।

কখনো ফুটপাতের ধারে, কখনো বাগানের মধ্যে, বৃষ্টি-বাদলের সময় কাছাকাছি কোনো গাড়ী-বারান্দার তলায়—লুকিয়ে-চুকিয়ে সিগারেটে একটা-আধটা টান মারার বয়সে পৌঁছে গেলুম। কিন্তু পাগলিনীর সেই এক ভাব—শীত-তাপ-বর্ষণ মাথায় নিয়ে সে পথচারীদের জিজ্ঞাসা করে চলেছে শ্যামবাবুর ঠিকানা, কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে তার বাড়ীতে পৌঁছতে পারা যাবে।

ক্রমে পথচারী বা পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের সেই একঘেয়ে আমোদে অরুচি ধরে গেল, তাই তারা তাকে ত্যক্ত করা ছেড়ে দিলে। পথে যারা নিত্য যাওয়া-আসা করে তাদেরও কৌতূহল মিটে গিয়েছে, সবাই নিজের মনের মতন তার একটা ইতিহাস তৈরি করে নিয়েছে, সকলেই তাকে মেনে নিয়েছে। শ্যামবাবু-পাগলীর মধ্যে নূতনত্ব আর কিছুই নেই—তার সম্বন্ধে জগৎ ক্রমেই নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে যদি কোন কৌতূহলী পথিক তার কথার জবাব দিত, তো পাগলী তার সঙ্গে ইনিয়ে-বিনিয়ে শ্যামবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকত। অশ্রুজল আর তার চোখে দেখিনি তবে কণ্ঠে তখনো অশ্রু জমাট ছিল।

দিন যেতে লাগল, আমরা লায়েক হয়ে উঠতে লাগলুম। 'স্বদেশী'র পূত স্পর্শে 'বিড়ি' দ্রব্যটি জাতে উঠে গেল এবং আধুনিক যুগের খদ্দরের মতন সকলেই সেই দেশজাত শিল্পটির প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠতে লাগল। লুকিয়ে ঝোপঝাড়ের পাশে বসে বিড়ি ফোঁকবার জন্য প্রায় রোজই বিকেলে আমরা হেদোয় যেতুম—পাগলিনীর সে রূপ আর নেই, যা দেখে একদিন চমকে উঠেছিলুম। সে ছিল বলে বেশ স্থূলকায়া। ক্রমে তার অঙ্গের মেদ ও পেশীগুলো শুকিয়ে গিয়ে চামড়া ঝুলে পড়তে লাগল, সুন্দর চোখ দু-দুটো নিষ্প্রভ হয়ে গেল। চুলগুলো কিছু উঠে গিয়ে ও জট পড়ে বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একদিন দেখলুম কে তার মাথা কামিয়ে দিয়েছে। দু-পাশ থেকে গাল দুটো ঝুলে চিবুক ছেড়ে নেমে পড়ল—হঠাৎ কোনো অজানা লোকের সামনে পড়লে সে ব্যক্তি ঠিকরে পালিয়ে যেত।

পাগলিনী এখন আর পথের লোককে শ্যামবাবুর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে না। যে কোনো সুবেশ পুরুষ, [illegible] ছেলেই হোক কি বুড়োই হোক—আলিঙ্গনে উদ্যতা হয়ে তার দিকে ধাওয়া করে। বেচারী পথচারী ধোপদোস্ত জামা-কাপড় পরে চলেছে আনমনে, হঠাৎ সম্মুখে আলিঙ্গনোদ্যতা সেই তাড়কা রাক্ষসীকে দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, মুহূর্ত পরেই প্রাণভয়ে সেই পলায়ন-দৃশ্য, পথিকমাত্রেই উপভোগ করত।

কিছুদিন আমোদ উপভোগ করে লোকে এলে গেল। এ ব্যাপারটাও তাদের সয়ে গেল, আর কিছু মজা পায় না তারা। কিন্তু পাগলিনীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে সমানে একে-ওকে-তাকে ধরে বেড়াতে লাগল—শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্তে কোনো বিকার নেই, সেই এক ভাব।

তারপর আমাকেও একদিন পথ ডেকে নিল যাত্রার তপস্যায়। সাত বৎসর ধরে মাতৃভূমির রাজপথে ঘুরে-ঘুরে কত ঘটনাই দেখলুম, কত কাহিনীই শুনলুম। কত পাগলের পাশে শুয়ে-বসে রাস্তায় রাত কাটিয়ে পথের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছুটে গেল—আবার ঘরের ছেলে ফিরে এলুম ঘরে।

কলকাতায় ফিরে আত্মস্থ হয়ে দেখতে পেলুম এখানেও পরিবর্তনের ঝড় ছুটেছে হু-হু করে। পরিবর্তন ঘটছে তার সামাজিকতায়, তার আধ্যাত্মিকতায়, পরিবর্তন ঘটছে তার মিত্রতায় তার ব্যস্ততায়। অঙ্গের পরিবর্তন তার এমন ঘটেছে যে চমকে উঠতে হয়। কত খোলার বাড়ি হয়েছে বাগানবাড়ী, কত বস্তিতে বসেছে বাজার, কত বাজার হয়েছে উজাড়, কত এঁদো পাঁদাড় হয়েছে গুলজার। এরই মধ্যে, একদিন দেখলুম, এই তরঙ্গসঙ্কুল পরিবর্তন-পারাবারের মধ্যে পাগলিনী ঠিক হেদোর ধারে বসে আছে, সাত বছর আগে যেমনটি তাকে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

পাগলিনীর চেহারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিন তাকে যে রকম দেখে গিয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক কৃশ হয়ে পড়েছে কিন্তু কৃশ হলেও সেদিনকার সেই বীভৎসতার ছাপ তার চেহারায় আর নেই। কয়েকদিন বাদেই বুঝতে পারলুম, তার সেই শ্যামবাবু-শিকার করার ভাবটাও একেবারে কেটে গিয়েছে। কথাবার্তা একেবারেই বলে না বললেই হয়, কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে চুপ করে থাকে, নয় ত বিশ্রী গালাগাল দেয়। রাস্তা দিয়ে হাজার লোক চলেছে, সেদিকে তার দৃকপাতও নেই, হঠাৎ, মুখ তুলে যার দিকে চোখ পড়ল, তার দিকে হাত বাড়িয়ে বলে—একটা পয়সা দাও না।

সকলকে সমান ভাবে সম্বোধনও করে না। কারুকে তুমি, কারুকে বা তুই, শহরসুদ্ধ লোকের টনক নড়ে গেল—হেদোর ধারের শ্যামবাবু-পাগলী আর শ্যামবাবুর খোঁজ করে না।

আরও কয়েকটা বছর কেটে গেল। একদিন, তখন আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজা হয়ে গিয়েছে, সামনেই কালীপূজা। সন্ধ্যে থেকে ঘণ্টা দু-তিন মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড় উঠে আশ্বিনের বুকে অগ্রহায়ণের আমেজ লাগিয়ে দিলে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার তেজ যেন বেড়ে গেল।

রাত্রি একটা বেজে গিয়েছে। নিঃশব্দ জনহীন পথ বেয়ে জল-কাদা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরছিলুম—দেখলুম, হেদোর সামনের ফুটপাতে পাগলিনী বসে আছে। আঁচলের খানিকটা ফুটপাতের ওপরে পাতা, তার উপরে চারটি মুড়ি। আমাকে দেখেই বললে—একটা পয়সা দে না রে!

আশ্চর্য! তার কণ্ঠস্বর তেমনিই রয়েছে—সেই অশ্রু-সজল তীক্ষ্ণ অথচ করুণ কণ্ঠস্বর।

একটা পয়সা বের করে তার কাছে যেতেই সে হাত তুলে পয়সাটা নিয়ে আবার খেতে আরম্ভ করলে। তাকে দেখতে দেখতে কি জানি আমার কেমন একটা কৌতূহল হোলো, আমি তাকে একটা প্রশ্ন করে ফেললুম।

বিশ বছর ধরে দেখলেও তার সঙ্গে মুখোমুখি কখনো কথা বলিনি। প্রশ্ন করলুম—হ্যাঁ রে, তোর শ্যামবাবু এখন কোথায় থাকে?

পাগলী একবার আমার মুখের দিকে চাইলে, তারপরে তার অর্ধাবৃত বুকের আবরণ সরিয়ে বুকের মাঝখানটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

একেবারে চমকে উঠলুম! তবে! তবে কি এতদিন ধরে তাকে যা দেখে এলুম তা কি তার আসল রূপ নয়। এই দীর্ঘ দিন ধরে তার সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে কত ভাঙা-গড়া চলেছে, সে কি সব বৃথাই গিয়েছে! হোতেও পারে। বিচিত্র নয় যে, পাগলিনীর শ্যামবাবু—রাম-শ্যাম-যদুর শ্যাম নয়। তার শ্যাম অন্তরে থেকেও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে—তারই আহ্বানে সে কূল ছেড়ে অকূল ভেসেছে। একে-তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, কোথায় গেলে পাব তাকে? যার-তার কথায় ছুটেছে দিগ্বিদিকে—কোনো বাধা মানে নি, সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে অঙ্গে, রক্তাক্ত দেহ বিছিয়ে দিয়েছে পথের ওপর—যে পথে একদিন শ্যামের পদপাত হবেই। নয় ত বা পথের এক পাশে বসে কাতর কণ্ঠে কেঁদেছে—কোথায় গেলে শ্যামের দেখা পাব।

তারপরে একদিন শ্যাম এসে তাকে দেখা দিলেন সুন্দর বেশে, পথচারীর রূপ ধরে। শ্যাম এলেন কখনো যুবক, কখনো কিশোর, কখনো বা বালকের রূপ ধরে। পাগলিনী আহ্লাদে আটখানা—ছুটেছে আলিঙ্গন করতে কিন্তু শ্যাম তবু ধরা দেয় না। বিগতযৌবনা লোলচর্মা কুৎসিতা পাগলিনী শবরীর মত প্রতীক্ষায় ছিল, এমন সময় শ্যাম সাড়া দিলেন অন্তরে—চাপল্য তার স্তব্ধ হয়ে গেল। বাইরের জগৎ রইল পড়ে বাইরে, তার শ্যামের সঙ্গে প্রেমালাপ চলতে লাগল অন্তরে।

কিছুই বিচিত্র নয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেণীগীর ফুলবাড়ি

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে রোজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ললিতবাবুর দেখা হইত।

আমি পিসিমার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পশ্চিমের শহরে তাহার পূর্বে কখনো বেড়াইবার অভিজ্ঞতা ছিল না, আমার এক বন্ধু আসিবার সময় বলিয়াছিল—ওখানে জুতার কালি দেওয়ার কোন দরকার হবে না দেখ।

দেখিলাম, ব্যাপার তাই বটে। লাল ধূলা মাখিয়া জুতার যে দশা হয় পনের মিনিট রাস্তা চলিবার পরেই, তাহাতে জুতার কালি দিবার উৎসাহ ক্রমে কমিয়া গেল। শহরের মধ্যে বা বাহিরে যে-কোন জায়গাতেই যান সর্বত্রই ধূলা। ক্রমে বেড়াইবার উৎসাহও কমিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধারেই দেখিলাম বেড়াইবার প্রকৃষ্ট স্থান। এদিক ওদিক বেড়াইয়া কষ্টহারিণীর ঘাটের সিঁড়ির উপর অনেক রাত পর্যন্ত একা বসিয়া থাকিতাম।

একদিন পাশে এক প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় আলাপ হইলে জানিলাম, তাঁহার নাম ললিতমোহন ঘোষাল, বাড়ি হুগলী জেলায়—ভবঘুরে লোক, আগে ছিলেন বর্ধমান টাউনে, ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় পশ্চিমে আজ প্রায় দশ-বার বৎসর আসিয়া বাস করিতেছেন। ক্রমে ললিতবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা হইত। ঘাটে বসিয়া গল্প করিতাম অনেক রাত পর্যন্ত।

একদিন তিনি আসিয়া আমায় বলিলেন—আপনি একজন সাহিত্যিক, এ কথা তো এতদিন আমায় বলেন নি?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কার মুখে শুনলেন আবার এ কথা?

—সবাই বলছে। আপনি সোমবার বেথুনবাজার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুনলাম। আমার বাড়িওয়ালার ছেলে ছিল সভায়—

—হ্যাঁ, ও!...তা বটে।

—বড় আনন্দ হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমিও নিজে একটু-আধটু লিখতুম কিনা একসময়ে, তাই সাহিত্যিকদের বড় শ্রদ্ধা করি মশায় আপনি বয়সে অনেক ছোট হলেও আমার নমস্য—

আমি বিনয়সূচক হাস্যসহকারে বলিলাম—কি যে বলেন!

—একদিন আসুন না গরীবের বাসায়। লেখাটেখাগুলো আপনাকে দেখাব। এককালে যথেষ্ট—দেশের লোকে জানত। আমার উপন্যাসের দু-তিনটে এডিশান হয়েছে মশাই—

শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বাল্যে আমি তখনকার সময়ের হেন উপন্যাস ছিল না যাহা পড়ি নাই। কিন্তু ললিত ঘোষালের নাম ঔপন্যাসিক হিসাবে কোথাও পাই নাই, কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়া তো মনে হইল না।

কৌতূহলবশতঃ একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গেলাম। স্টেশনের কাছে লাইনের ধারে একটা ছোট পুরান বাড়ির বাহিরের ঘরে তাঁর বাসা। অতি অপরিষ্কার ঘর, কত কাল যেন ঝাঁট পড়ে নাই, বিছানাপত্র ততোধিক ময়লা, ছেঁড়া তুলো-বেরুনো ওয়াড়-বিহীন বালিশ, ময়লা গামছা ও ঘরে পরিবার ধুতি দেখিয়া মনে হইল ললিতবাবুর বর্তমান অবস্থা আদৌ সচ্ছল নয়। ললিতবাবু আমায় যত্ন করিয়া বসাইলেন। বলিলেন—একটু চা খান দয়া করে এসেছেন যখন।

আতিথ্যের কোনো ক্রটি হইল না। নিজেই চা করিয়া দুখানা আটার রুটিতে গুড় মাখাইয়া আমায় খাইতে দিলেন। হুঁকায় তামাক সাজিয়া আমায় দিতে গেলেন, আমার ওসব চলে না শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

নিজে তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি একখানা পুরান বাঁধান খাতা আমার কাছে আনিয়া খুলিলেন। আমার দিকে সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—এই দেখুন, মানে—যত কাগজে আমার সমালোচনা বার হয়েছিল আপনাকে দেখাচ্ছি। সাগ্রহে খাতাখানি দেখিতে লাগিলাম। এখন হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১০ কি ১২ সালের দিকে যেসব খবরের কাগজ ও মাসিক পত্রিকা সুনাম অর্জন করিয়াছিল, যেমন 'বঙ্গবাসী', 'ইংলিশম্যান', 'হিতবাদী', 'ভারত মহিলা', প্রভৃতি—সেইসব পত্রিকা হইতে তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকের সমালোচনাগুলি কাটিয়া আঠা দিয়া খাতাখানিতে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক টুকরাতে কাগজের নাম ও মাস তারিখ কাল কালি দিয়া হাতে লেখা। টুকরাগুলি বিবর্ণ, হলদে ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খুব বেশি ধূলাবালি পড়িয়া নাই তাহাদের উপর—দেখিয়া মনে হয় খাতাখানির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় ও মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করা হয়। ললিতবাবু প্রত্যেকটি আমায় পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—তাঁহার বইয়ের এককালে ভাল সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে গর্বে ও আনন্দে তাঁহার মুখ-চোখের ভাবই যেন বদলাইয়া গেল। একখানি ইংরাজী কাগজে তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ বলা হইয়াছে, তবে ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজী কাগজ—বলা বাহুল্য, তাহাদের যেমন জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তেমনি জ্ঞান ললিত ঘোষাল সম্বন্ধে। উঠিব উঠিব করিতেছি এমন সময় ললিতবাবু বলিলেন—দুখানা বই লিখে রেখেছি, অনেক দিন হল।

মশায় তো কলকাতায় থাকেন, পাবলিশারদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ, বই-দুখানার কিনারা করতে পারেন?

প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহে পড়িয়া সে দিন দুখানা ভারি মোটা খাতা আমাকে বাসায় বহন করিয়া আনিতে হইল।

আসিবার সময় ললিতবাবু বার বার বলিলেন—আমি যেন পাণ্ডুলিপি দুখানা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি। কিন্তু বাড়িতে আসিয়া খাতা-দুখানা পড়িয়া ললিতবাবুর জন্য আমার কষ্ট হইল। অত্যন্ত সেকেলে ধরনের লেখা, জবড়জ; ভাষা, সেণ্টেন্সগুলি কাঠের পুতুলের ন্যায় নড়নচড়ন-বিরহিত, প্রাণহীন। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে পুণ্যের জয় ও পাপের শাস্তি পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান হইয়াছে। এ যুগে এ বই অচল। ললিত ঘোষালকে কথাটা খোলাখুলিভাবে বলিতে পারি না। কষ্টহারিণীর ঘাটে ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়েছেন? কেমন লাগল?

বলিলাম—চমৎকার। একালে অমন লেখা আর দেখা যায় না।

কথাটার মধ্যে মিথ্যা ছিল না।

ললিতবাবু অত্যধিক খুশি হইয়া বলিলেন—হেঁ হেঁ, আপনি হলেন গিয়ে নিজে একজন লেখক—সমঝদার লোক। আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে এসব? আজকাল লেখা বদলে গিয়েছে মশাই—লিখতে জানেই না। বঙ্কিম, হেমবাবু, নবীন সেন—কি সব মহা-মহারথী বলুন দিকি একবার? তা নয় রবিঠাকুর, রবিঠাকুর—হেঁ—

ললিতবাবু তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

আমি সমর্থনসূচক মাথা নাড়িলাম। ললিতবাবুর উপন্যাস দুখানির প্রশংসা করিয়া যে ভাল কাজ করি নাই, পরে তাহা বুঝিয়াছিলাম। দিন নাই রাত নাই ললিতবাবু তাগিদ দিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন যে, উপন্যাস-দুখানির কি কিনারা করিলাম। এমনকি, সন্ধ্যাবেলায় কষ্টহারিণীর ঘাটে বেড়ান প্রায় ছাড়িয়া দিতে হইল।

পাঁচ ছয় দিন ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। একদিন আমার বাসার চাকর বলিল—আপনাকে এক আওরৎ খুঁজছে বাহিরে—

আওরৎ কে খুঁজিবে? বাহির হইয়া দেখি একটি সুন্দরী যুবতী সলজ্জ সংকোচের সহিত বাসার উঠানের পেঁপে-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—কে?

মেয়েটি চোখ নিচু করিয়া দেহাতি হিন্দিতে বলিল—লোলিতবাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন বাবুজী—

—ললিতবাবু? বেশ, যাব ও-বেলা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, মেয়েটি কে! ললিতবাবুর ঝি নাকি? কখনো সেখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। বেশ দেখিতে মেয়েটি। এ দেশের হিন্দুস্থানী মেয়েরা সচরাচর যেমন আঁটসাট গড়নের হয়, তেমন তো বটেই, ফর্সা, ধপ্‌ধপে রং, মুখশ্রীও বেশ লালিত্যপূর্ণ।

সন্ধ্যাবেলায় ললিতবাবুর বাসায় গেলাম। ললিতবাবু উনুনে কড়া চাপাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিলেন। জল নামাইয়া দুধ ও ভেলিগুড় মিশাইয়া চা তৈরি করিয়া আমায় খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম—একটি মেয়ে গিয়া আমায় আপনার এখানে আসতে বললে। ক দিন ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারি নি—

ললিতবাবু বলিলেন—ও, মণিয়া গিয়েছিল বুঝি? তা এসেছেন ভালই করেছেন। আমি ভাবছিলাম, কেন আর আসেন না।

স্বল্পমাত্র ভূমিকার পর ললিতবাবু আবার বইয়ের কথা পাড়িলেন —জানেন ব্যাপারটা, হাতে একটু টাকার ইয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম বই-দুখানার একখানাও যদি লাগিয়ে দিতে পারেন তবে এ সময়ে কিছু পেলে বড় উপকার হত। তাই মণিয়াকে ও বেলা আপনার ঠিকানা দিয়ে--তা করেছেন কিছু?

বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। ও বইয়ের আমি কি করিয়া কি করিব বুঝিলাম না। সে কথা ললিতবাবুকে বলিতে কিন্তু আমার, মন সরিল না, কেন কি জানি।

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। দু-তিন জন পাবলিশারকে লিখেছি, এখনও উত্তর পাই নি—পেলেই জানাব আপনাকে।

ললিতবাবু বলিলেন—আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। মণিয়া যখন বাড়ি চিনে গেছে, ওই পরশু নাগাৎ আর-একবার যাবে এখন—

—মণিয়া বুঝি আপনার এখানে কাজ করে?

ললিতবাবু যেন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—ইয়ে মণিয়া?...হ্যাঁ—

আমি সে দিন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। তৃতীয় দিন মণিয়া আমার বাসায় গিয়া হাজির। এ দিন আমার কৌতূহল হওয়াতে মণিয়াকে বলিলাম—ললিতবাবুর ওখানে কত দিন আছিস?

মণিয়া বেশি কথা বলে না, মুখ না তুলিয়া কি একটা বলিল ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—ললিতবাবুকে গিয়ে বলো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—

মণিয়া টাকাকয়টি লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পর দিনকতক ললিতবাবু আমাকে বড় উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। কোন্ পাবলিশার তার বই লইতেছে—কি কথা হইতেছে তাহাদের সঙ্গে, ইত্যাদি। বই পড়িয়া রহিয়াছে আমার বাসায়। কলিকাতার বইওয়ালারা এত বোকা নয় যে, ওই বইয়ের জন্য অগ্রিম টাকা দিতে যাইবে। মুখে বলিলাম—বই নেবে কিনা তার ঠিক নেই—তবে যদি নেয় তার বায়নাস্বরূপ টাকাটা দিয়েছে।

ললিতবাবু বুঝিলেন না যে, আমার কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বায়না করা ইহাকে বলে না, বা এ অবস্থায় কেহ বায়নার টাকাও দেয় না। অভাবের দিনে টাকা আসিয়াছে তাই যথেষ্ট, কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল অত বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেই হইতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দু-এক টাকা পাঠাইয়া দিতাম মণিয়ার হাতে, কারণ মণিয়াকে ললিতবাবু বাঁধা নিয়মে প্রতি সপ্তাহে আমার বাসায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

কষ্টই হইত তাঁহার কথা ভাবিয়া। প্রৌঢ় হইলেও ললিতবাবু দেখিতে সুপুরুষ, ভাল হক মন্দ হক তিনিও একজন লেখক ছিলেন, আজ অবস্থা খাবাপ হইয়া গিয়াছে, তিন কুলেও এ দিকে কেহ নাই। এই দূর বিদেশে এই বয়সে কে তাঁহাকে দেখে, কে মুখের দিকে চায়? টাকা কোন্ প্রকাশক পাঠাইতেছে এ কথা তিনি আমায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি কাল্পনিক পুস্তক-প্রকাশকের নাম করিতাম, তাহাদের কাল্পনিক চিঠির কথা বলিতাম, কোনো রকমে সে কথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িতাম।

শীতের শেষে সেবার মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম।

আসিবার পূর্বে ললিতবাবুর খাতা-দুখানি তাঁহাকে ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বলিলেন—কি হল মশায়?

—বড্ড গোলমাল হয়ে গেল সব। ওদেব সে দোকানখানা উঠে গেল। ভাইতে ভাইতে গোলাযোগ, কেস্ রুজু হয়েছে, এ অবস্থায় আর ওরা—তাই পরশু আমায় খাতা ফেরত পাঠিয়েছে।

পুনরায় ঘটনাচক্রে মুঙ্গেরে গেলাম তিন বৎসর পরে।

গিয়াই সর্বপ্রথমে ললিতবাবুর কথা মনে হইল, কষ্টহারিণীর ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিলাম, ললিতবাবু মুঙ্গেরে আছেন না অন্যত্র চলিয়া গেছেন; কিন্তু বিশেষ কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন শহবের বাহিরে টমটম ভাড়া করিয়া বেডাইতে গিয়াছি। পথে শহব হইতে অন্ততঃ ছ-সাত মাইল দূরে একটা বড় বাগানবাড়ি দেখিয়া টমটমওয়ালাকে বলিলাম—এ কার বাগানবাড়ি রে?

টমটমওয়ালা ভাল বাংলা বলে। আমার কথার উত্তরে সে বলিল—ই বেণীগীর ফুলবাড়ি আছে। শুনিয়াই বাগানটা দেখিবার শখ হইল।

—দেখতে দেয়?

—হাঁ বাবুজি, ইঁহা এক বাংগালী বাবু আছে—দেখনে কাহে নেহি দেবে?

আমার আগ্রহ আরও বাড়িল বাঙ্গালী বাবুর নাম শুনিয়া। টমটম গেটের সামনে দাঁড় করাইয়া বাগানের ভিতর গেলাম। অদ্ভুত বাগান। দেখিয়াই বুঝিলাম—এককালে খুব বড় শৌখিন বাগানবাড়ি ছিল, বর্তমানে সে অবস্থা নাই, কিন্তু বনে জঙ্গলে সমাকীর্ণ এই পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির বন্য সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

গেট হইতে কাঁকর-বিছান পথটি বাঁকিয়া চলিয়াছে—গাছ-পালার আড়ালে যে ভাঙ্গা পুরাতন বাড়ির চুন-বালি-খসা, শ্রীহীন, জীর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে সে দিকে। বাগানের সর্বত্র খুব বড় বড় বৃদ্ধ গাছ—প্রধানতঃ বট, অশ্বত্থ, নিম, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম ইত্যাদি। গাছগুলির তলায় ঘন ফার্ন ও কাঁটাজঙ্গল, এখানে ওখানে জংলী গোলাপের ঝোপ, কাল পাথরের হাতির মুখ, মকর মুখের পয়োনালী, হাতল ভাঙ্গা লোহার বেঞ্চি, চটা-ওঠা ঠেস্-গাঁথা চাতাল, জঙ্গলের নিচে লতায় পাতায় কাঠবেড়ালীর লঘুপদে ত্রস্ত যাওয়া-আসা, বনটিয়ার ডাক, বড় বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়া সূর্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে, একটা পাথরের গাঁথা শুকন ফোয়ারার ধারে ঘন চামেলির ঝোপ, চামেলি ফুলের মিষ্ট সুবাস, প্রাচীন বটগাছে ডাহুক পাখির ডাক, আর পায়ের নিচের আধ-শুকন লম্বা লম্বা উলুঘাসের মধ্যে বহুরূপীর গতিবিধির খড়মড় শব্দ...সবটা মিলিয়ে একটা নিবিড় শান্তি ও নীরবতা।

কোনো বড়লোকের বাগান ছিল একসময়, বোধহয় অবস্থা খারাপ হইবার জন্য আর বাগান দেখাশোনা করিবার শখ নাই। ফোয়ারার কাছে দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতে দেখিতে ঐশ্বর্যের নশ্বরতা লইয়া বেশ একটা গম্ভীর ধরনের প্রবন্ধ (যাহাতে মানুষের ও সমাজের সত্যকার উপকার হয়, হালকা গল্প বা উপন্যাস লিখিয়া লাভ কি?) রচনা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

আমার সামনের কাঁকরের পথ দিয়া আসিতেছেন কষ্টহারিণী ঘাটের সেই লেখক ললিত ঘোষাল!

আমি বলিলাম—ললিতবাবু যে! এখানে কি রকম? চিনতে পারেন?

ললিতবাবু চিনিতে পারিলেন। আমায় দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। আমায় জোর করিয়া বাড়ির দিকে লইয়া চলিলেন। আজ এখানে থাকিতে হইবে, কোনো অসুবিধা নাই। কতকালের পর দেখা, অনেক কথা আছে, ইত্যাদি।

বাড়িটা খুবই পুরান, সামনে খুব বড় রোয়াক বা চাতাল, সেখানে আমরা পাথরের বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। ললিতবাবুকে বলিলাম—তারপর? আপনাকে কত খুঁজেছি—মুঙ্গের শহরে আজ দিন পনের এসেছি। এখানে এই গড়ফরসেকন জায়গায় কি করে এসে পড়লেন? কিনেছেন না কি? এখানে আর থাকে কে?

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আরে, ব্যস্ত হবেন না। সবই দেখতে পাবেন। আপাততঃ একটু চা খান—দাঁড়ান বলে আসি—

ললিতবাবু কাহাকে চায়ের জন্য বলিয়া আসিলেন তখন বুঝি নাই, কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা পরে যে ব্রীড়াবনতা সুন্দরী হিন্দুস্থানী মেয়েটি চা ও পাঁপড় ভাজা আনিয়া আমাদের সামনে রাখিল, তাহাকে দেখিয়া চিনিলাম। ললিতবাবু বলিলেন—চিনেছেন একে?

—হ্যাঁ, ও তো সেই মণিয়া। ও তাহলে এখনো আপনার কাছেই কাজ করে? কথাটা শুনিয়া ললিতবাবু হাসিলেন, মণিয়ার মুখেও সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। ব্যাপার কি? আমার কথার মধ্যে হাসিবার কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, যাও, আর-একটু চা দাও আমাদের—

মণিয়া চলিয়া গেলে ললিতবাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কে কার কাজ করে মশাই? মণিয়াকে আপনি ভাল করে কোনো দিন জানেন না। এই ফুলবাড়ি ওর নিজের। আমি ওর আশ্রয়ে আছি। এটা ওর বাপের বাড়ি।

মণিয়াকে ললিতবাবুর ঝি বলিয়াই জানিতাম, কখনো আমার মনে আসে নাই যে, সে ছদ্মবেশিনী

রাজকুমারী, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তো দস্তরমত আশ্চর্য হইলাম! বলিলাম—মুঙ্গেরে যখন থাকতেন আপনি, তখন মণিয়া তো আপনার বাসায় কাজ করত—

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—কখনো আমার বাসায় কাজ করতে ওকে দেখেছিলেন? আন্দাজ করেছিলেন আপনাকে ডেকে আনত বলে। আসল কথা জানতেন না।

—আসল কথাটা কি তাড়াতাড়ি বলুন, রহস্যটা কোথায়?

—মণিয়ার বাবার সঙ্গে ওর মায়ের বিয়ে হয় নি। ওর বাবা মস্ত ধনী জমিদার ছিলেন, ওর মা মজঃফরপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের মেয়ে—এই বাগানবাড়িতে এনে ওর বাবা তাকে তাঁর কাছে রাখেন। মণিয়া ওদের একমাত্র সন্তান—এখন দুজনেই পরলোকগত, মণিয়া এই বাগানবাড়ির মালিক। বুঝলেন কিছু? খুব সোজা কথা।

—খুব সোজা কথা নয়। মণিয়ার সঙ্গে আপনার কিভাবে আলাপ, আপনিই বা এখানে থাকেন কেন, মণিয়ার অভিভাবকই বা কে ছিল—এসব কথা খুব সোজা আর কই?

ললিতবাবু বলিলেন—সে আরও সোজা কথা। আমি মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম, তাঁর মৃত্যুর পর আমিই এখন মণিয়ার অভিভাবক। আর-একজন অছি আছেন মুঙ্গেরের উকিলবাবু কমলেশ্বরী সহায়। মধ্যে আমাকে ওরা সবাই ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই মুঙ্গেরে গিয়ে বছরখানেক ছিলুম। মণিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। আপনার কাছে ওকে পাঠাতুম বইয়ের দরুন টাকা আনতে। ও নিজেও অনেক সাহায্য করেছে—

বলিলাম—ওর বিয়ে হয় নি?

ললিতবাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওর এই ইতিহাস শুনে কে ওকে বিয়ে করবে বলুন। বিশেষতঃ, এ দেশ তো জানেন?

ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বেলা আর বেশি নাই, চামেলি বনের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে বসিয়া আমাদের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে মণিয়া আবার চা আনিল।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, এ বাবুকে চিনতে পেরেছ?

মণিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

—কোথায় দেখেছিলে বল তো?

—মুঙ্গেরে। ওঁর বাসায়।

পরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ওর অভ্যস্ত দেহাতি হিন্দিতে বলিল—ভাল আছেন বাবুজী?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল আছ মণিয়া?

এই সময় ললিতবাবু বলিলেন—রাত্রে কিন্তু থাকতে হবে আপনাকে। আমি দুটো কথা বলবার লোক পাই নে, এসেছেন যদি থাকুন। মণিয়া, তুমিও থাকতে বল।

—আমিও তো বলছি, থাকুন বাবুজী। ভারী খুশি হব থাকলে।

অগত্যা রাজী হইতে হইল।

দেখিলাম মণিয়া সত্যই খুশি হইল; বলিল—রাত্রে আপনি কি খান বাবুজী? উনি পুরী খান—আপনিও তাই খাবেন তো?

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মণিয়া সত্যই সুন্দরী মেয়ে। হিন্দুস্থানী মেয়ের দেহের গড়ন ও বাঙ্গালী মেয়ের মুখের লাবণ্য এ দুটির অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে মণিয়াতে। দেহবর্ণ চম্পক-গৌর, কাশ্মীরী মেয়ের মত ঈষৎ গোলাপী। মাথায় ঘন কালো এক ঢাল চুল। বড় বড় চোখ। আমার আশ্বাস পাইয়া মণিয়া উৎসাহের সহিত বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল—সম্ভবতঃ রান্নাবান্না করিতে গেল।

ললিতবাবু বলিলেন—বড্ড সেবা যত্ন করে আমাকে—মানে খুব। তা মানবে না? আমাদের সঙ্গে ওদের কথা? কত কান্নাকাটি করে আমায় আবার আনল।

রাত্রে চমৎকার চাঁদ উঠিল। জোৎস্নার আলো বেণীগীর ফুলবাড়ির প্রাচীন বট, মেহগ্নি ও পাইন গাছের ডালে পড়িয়া সমস্ত উদ্যানটিকে যেন এক রহস্যময় পুরান দিনের জগতে পরিণত করিল। আমার মনে পড়িল দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—মণিয়ার বাবা ও মা—তাঁরা সমাজ সংসারকে তুচ্ছ

করিয়া এই নিভৃত নিরালা বাগানে পরস্পরের প্রণয়কে মাত্র সম্বল করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

মণিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল খাইবার জন্য। তখন রাত দশটার কম নয়। এই এত বড় বাড়ির নিভৃত রান্নাঘরটিতে বসিয়া মেয়েটি এতগুলি রান্না রাঁধিয়াছে, এক চুপড়ি আটার পুরী ভাজিয়াছে—আগুনের তাতে সুন্দর মুখখানি রাঙ্গা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—দীর্ঘকাল কেশপাশ অবিন্যস্ত—দেখিয়া তাহার উপর কেমন মমতা হইল।

মণিয়া কাছে বসিয়া আমাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইল, নিজের হাতে ললিতবাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, মশলা সুপারী দিয়া গেল—হিন্দুস্থানীর দেশে পান খাওয়ার তেমন রেওয়াজ নাই।

ললিতবাবুর উপহিংসা হইল—লোকটা তোফা আছে। মণিয়ার মতো মেয়ের দেখা যে দিনরাত পায়। তাহার উপর হিংসা হয় বইকি। লোকটার বরাত ভাল।

এইভাবে ললিতবাবুর সঙ্গে যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্র পুনরায় স্থাপিত হইল, আমার এক বৎসরব্যাপী মুঙ্গের প্রবাসের মধ্যে সেই সূত্র ধরিয়া অনেক দিন বেণীগীর ফুলবাড়িতে গিয়াছি।

বার-দুই যাইবার পরে আমার কৌতূহল বড় বাড়িল। হয়তো আমার সে কৌতূহল অযথা ধরনের, তবুও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৌতূহল শুধু এই বিষয়ে যে, মণিয়া ও ললিতবাবুর মধ্যে সম্পর্কটি কি! ললিতবাবুর বয়স বাহান্ন হইতে পারে, সাতান্ন হইতে পারে, ষাট বলিলেও দোষ ধরিতে পারা যায় না। মণিয়ার বয়স খুব বেশি হইলেও চব্বিশের বেশি কখনো নয়।

পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক? ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক? অভাবওক্ষে ভাই-বোনের সম্পর্ক? বয়স হিসাবে তাই হওয়া উচিত এবং হইলে দেখাইত খুব ভাল, মানিয়া লইলাম। কিন্তু জগতে যাহা ভাল দেখায়, যাহা হওয়া উচিত, তাহা সব সময় ঘটে না ইহাই দুঃখ।

একদিনের কথা বলি, কি করিয়া আমার প্রথম সন্দেহ হইল।

সেদিন ভয়ানক গরম, দারুণ রোদের তাত, তিনটার সময় আমি গিয়াছি ওখানে, গিয়া দেখি মণিয়া ছাড়া আর কেহ নাই বাড়িতে।

সে আমায় দেখিয়া প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন দুপুরের পরে, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবার কথা—এখনো ফিরলেন না, কি হবে?

জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ললিতবাবু বালিশের জন্য শিমুল তুলা কিনিতে গিয়াছেন নিকটবর্তী কি একটা বস্তিতে। আমি যত মণিয়াকে বোঝাই, তাহার সে কি ব্যাকুলতা, কি উদ্বেগ, বার বার ঘর-বাহির করার সে কি চঞ্চল ভঙ্গী! আমি সে দিন মণিয়াকে নতুন দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম যেন। সেই একদিন দেখিয়াই আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, মণিয়া ললিতবাবুকে ভালবাসে। পিতা-পুত্রী নয়, ভাইবোন নয়, নায়িকার মত ভাল না বাসিলে ঠিক সে জিনিসটা হয় না—চোখে না দেখিলে কি করিয়া তাহা বুঝাইব।

তাহার পর ললিতবাবু একদিন আমাকে সামান্য একটু বলিলেন। কথায় কথায় মণিয়ার কথা উঠিলে আমায় বলিলেন—ও আমার মুখের দিকে চেয়ে ওর যৌবনের দিনগুলো কাটাল—কতবার ভাবি, আমার অবর্তমানে ওর কি যে হবে? সমাজে ওর স্থান কোনো দিনই নেই। আমায় ছাড়া ও কাউকে জানেও না। ভেবে কষ্ট হয় এক এক সময়।

একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী যে একজন পঞ্চান্ন বছরের (কমপক্ষে) বৃদ্ধকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারে, নিজের চক্ষে দেখার পূর্বে সে কথা কেহ যদি বলিত, তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

জীবনের কি রহস্যই বা আমরা জানি! মণিয়ার ভালবাসা দেখিয়া জীবনের একটি অজ্ঞাত তথ্য জানিয়া বিস্মৃত হইলাম।

আরও একটি ব্যাপার দেখিলাম।

ললিতবাবু সম্পূর্ণ বেকার, একটি কানাকড়ি দিয়াও তিনি মণিয়াকে সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ তাঁহার যাহা কিছু খরচ সব যোগাইতে হয় মণিয়াকেই এবং সে অম্লান-বদনে তাহা এ যাবৎ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ললিতবাবু তাহার স্বগ্রামস্থ এক বেকার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাসিক অর্থ সাহায্য করেন

(চার-পাঁচ বার ললিতবাবু আমাকেই টাকাটা দিয়াছিলেন মনিঅর্ডার করিবার জন্য, কারণ তাঁহাদের এখানে নিকটে ডাকঘর নাই) তাহাও মণিয়ার পয়সায়। ললিতবাবু যখন একা মুঙ্গেরের বাসায় থাকিতেন, তখনকার অপেক্ষায় এখন তাঁহার চাল-চলন বাড়িয়াছে। পরের পয়সায় আমাদেরও বাড়িত। কথাবার্তার মধ্যে একদিন ললিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন কত দিন? কিভাবে আলাপ হয়?

—শুনবেন? কলকাতায় যখন বইটই আর কেউ নিতে চায় না, পাবলিশার খুঁজে পাই নে, তখন তো এলাম মুঙ্গেরে, আজ থেকে বছর বার আগে। বাবু কমলেশ্বরী সহায় এখানকার বড় উকিল। তিনি বললেন—একজন বড়লোক মক্কেল বাঙ্গালী সেক্রেটারী খুঁজছে, ইংরিজি চিঠিপত্র লেখার জন্য—তাই এখানে এসে মণিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করি ; চাকুরীও হয়ে গেল—সাত বছর ছিলাম। মণিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে গিয়ে মুঙ্গেরে বাসা করে থাকতাম, সে অবস্থায় আপনি আমায় দেখেছিলেন সেবার। মণিয়া জোর করে আবার নিয়ে এল এখানে। কি করি বলুন?

সত্যিই তো। বেচারী ললিতবাবু! কি করিবার ছিল তাঁর? মণিয়াকেও দেখিয়াছি, ললিতবাবুকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে। তাঁহার এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা—বাস্তব বা কাল্পনিক, দূর করিতে তাহার কি ব্যাকুলতা! নিজের চোখে যাহা দেখিতে পাই তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি কই? মাসকয়েক যাতায়াতের ফলে ক্রমে আমার মনে হইল যে, মণিয়া যতটা করে, ললিতবাবুর দিক হইতে তাহার অর্ধেকও নাই বরং আরও কম। ললিতবাবু এখানে আছেন যে, তাহার কারণ মণিয়ার উপর তাঁহার দরদ নয়, তিনি বর্তমানে বেকার, মণিয়া তাঁহার সব খরচ চালাইয়া থাকে—এইজন্য।

ললিতবাবু মণিয়াকে তাঁহার ঝি বা পাচিকার মত ভাবেন যেন, হুকুমের উপর তাকে সর্বদা রাখিয়াছেন। অনেক সময় ভাবটা এই রকম দেখান যে, তিনি অতি বড় বাঙ্গালী লোক, এখানে যে অবস্থান করিতেছেন সে নিতান্তই মণিয়ার উপর কৃপা করিয়া।

বেণীগীর ফুলবাড়ির প্রাচীন বনস্পতিদের ছায়ায় চামেলি ঝোপের ধারের হাতল-ভাঙা বেঞ্চিতে বা পুকুরের ভাঙা ঘাটে বসিয়া কতদিন তরুণী মণিয়ার জীবনের এ অদ্ভুত ট্র্যাজেডির কথা চিন্তা করিয়াছি।

জগতে কেন এমন ঘটে, অমন সুন্দরী মেয়ে—কত তরুণ প্রেমিক যাহার এককণা অনুগ্রহ পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে রাজী হইতে পারিত—তাহার অদৃষ্টে একি দুর্ভোগ!

একদিন এ অবস্থায় একা বসিয়া আছি, মণিয়াকে দূরে দেখিতে প'ইয়া ডাকিলাম। এ সময়টা সে খানিকক্ষণ আপন মনে বাগানে বেড়ায় জানি।

মণিয়া কাছে আসিয়া বলিল—এখানে বসে কেন বাবুজী?

—বেশ বসে আছি। ললিতবাবু উঠেছেন?

—এখনও ওঠেন নি। উনি ঠিক চার বাজলে ওঠেন—তারপর চা করব। ললিতবাবুর বৈকালিক নিদ্রা ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা পথ ধরিয়া চলে, নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিতে দেখিলাম না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।...

মণিয়ার পরনে একখানা চাঁপা রঙের শাড়ি, গায়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত কোর্তা, সুগঠিত গৌরবর্ণ বাহুদুটিতে বাজু, কানে বড় বড় কানবালা, কপালে কাল টিপ। রূপকথার রাজকুমারীর মত সম্পূর্ণ সেকেলে ধরনের বেশভূষা ওর, হালফ্যাসনের বড় একটা ধার ধারে না, দেহাতী মেয়ে, সম্ভবতঃ জানেও না।

বলিলাম, বস মণিয়া—

—না বাবুজী, দাঁড়িয়ে আছি বেশ, সারাদিন তো বসে থাকি—

—তুমি আপন মনে বেড়াও এ সময়টা, না?

—হ্যাঁ বাবুজী, উনি ঘুমোন, আমার কাজকর্ম থাকে না—একটু বেড়িয়ে বেড়াই—

—ঘুমোও না বুঝি?

—না, দুপুরে আমার ঘুম ভাল লাগে না। অভ্যেস নেই বাবুজী।

—আচ্ছা, এ বাগানে কত দিন আছ?

—ছেলেবেলা থেকেই। এই তো আমাদের বাড়ি-ঘর। বাবা মা ছিলেন যখন, তখন খুব ভাল ছিল—বাবর বাগানের শখ ছিল খুব। নিজের হাতে গাছ পুঁতেছিলেন কত। একটা বটগাছ আছে বাবার হাতে পোঁতা, তার পাতাগুলো জুড়ে ঠোঙার মত হয়ে যায়—নাকি কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে বৃন্দাবনে যমুনার ধারে অমনি হত, বংশীবট বলে এ দেশে। আসুন দেখবেন—

আমাকে সে পুকুরের ওপারে বাগানের দক্ষিণ কোণে লইয়া গেল। বনের মধ্যে একটা ছোট বটগাছ, তাহার কচি পাতা পরস্পর জোড়া লাগিয়া ঠিক যেন ঠোঙার মত। মণিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখলেন? কি তাজ্জব বাবুজী? না?

বিস্মিত হইবার মত মুখ করিয়া বলিলাম—তাজ্জবই বটে, সত্যি—

মণিয়া হাত নাড়িয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল—দেখুন, কতকাল আগে কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে এখনও পাতাগুলো ওর জোড়া লেগে যায়! এতেও লোকের অবিশ্বাস ঘোচে না—বলুন বাবুজী?

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—ঠিক বলেছ মণিয়া—খুব ঠিক—উহার সরল বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবার আমি কে?

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাবা কত দিন মারা গিয়েছেন?

—ছ বছর বাবুজী।

—উনি মারা যাওয়ার পর কোথায় ছিলে?

—কোথাও না বাবুজী, এখানেই। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই সঙ্গে থাকত।

—তা ওরা এখন কোথায়?

—উনি আসাতে চলে গিয়েছে। কি করি বাবু, মুঙ্গেরে বড় কষ্ট পেতেন উনি, বাবা এমন কিছু রেখে যান নি যে সেখানকার সব খরচ দিই। তবে এখানে থাকলে চলে যায় একরকমে। ওঁর কষ্ট চোখে দেখে থাকতে পারলাম না, তাই নিয়ে এলাম।

—তোমার ভাই তাতে চটল বুঝি?

—উঃ, ভারি রাগ তাতে, বলে বাংগালি বাবুকে কেন নিয়ে এলি তুই? আমিও বলেছি—ওর আসা পছন্দ না কর চলে যাও ; আমার বাড়ি আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই চলে গেল। এখন উনি ছাড়া আর আমার কে আছে বাবুজী!

মণিয়ার চোখদুইটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল। মেয়েটি সত্যবাদিনী, তাহার স্পষ্ট সত্য কথা বলিবার সাহস দেখিয়া প্রীত হইলাম। অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিলাম—গান গাইতে পার মণিয়া?

মণিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল—বেশি কিছু না বাবুজী, বহুৎ একটু—

—গাইবে! গাও না?

মণিয়া কি বুঝিল জানি না, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—বাবুজী—

আমি মণিয়ার সহিত প্রেম করিতে চাহি নাই। মণিয়া আমাকে ভুল বুঝিয়া বসিল। সেভাবে কথাটা বলি নাই আমি। বলিলাম—এখন না হয় সন্ধ্যের সময় করো। ললিতবাবু যদি বলেন—তাহলে গাইবে?

অতিথির প্রতি উদাব কর্তব্যবোধ ও ভদ্রতা বড়ঘরেব ঘরানার উপযুক্ত বটে। কি সুন্দর দেখাইতেছে মণিয়াকে। উহাকে দেখিলেই আমার মনে হয় ও সে কালের মেয়ে, সে কালের বেশভূষায়, প্রাচীন উদ্যানের বনস্পতিদের পটভূমিতেই ওকে মানায়, অনাত্র ও নিতান্ত খাপছাড়া।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, প্রাচীন বটের ডালে ডাহুক ডাকিতেছে, ললিতবাবুর ঘুম ভাঙ্গিবার সময় হইল। বলিলাম—চলো মণিযা, চারটে বাজে---

সন্ধ্যার পর ললিতবাবুকে বলিয়া মণিয়াকে গান গাওয়াইলাম। ওর এমনি খুব সুরেলী গলা, তবে বিহার দেশওয়ালী গ্রাম্য সুরেব গানই বেশি জানে। বেণীগীর ফুলবাড়িতে বড় বড় গাছপালা, মেহগ্নি,

কৃষ্ণচূড়া, চামেলির বন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল গান শুনিতে শুনিতে—আমি যেন অতীত যুগের ভারতে ফিরিয়া গিয়াছি। বাণভট্ট কি শূদ্রক বা ওই ধরনের কোন কবির নায়িকা জীবন্ত হইয়া যেন আমার সামনে বসিয়া সুন্দর হাতটি নাড়িয়া বীণা বাজাইয়া অর্ধ-মাগধী ভাষায় সঙ্গীত গাহিতেছে...

সে দিন জ্যোৎস্নারাত্রের আলোছায়ার মধ্যে মণিয়াকে দেখিয়া আমার মনে হইল, কবি বাণভট্ট সে যুগের ঠিক এমনি একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাঁহার কাব্যের মহাশ্বেতার কল্পনা করিয়া থাকিবেন—সমগ্র বৃদ্ধ পৃথিবীকে নবযৌবনের সাজে সাজাইবার মায়ামন্ত্র যে ইহাদের সুন্দর মুখের স্মিত হাস্য, ইহাদেরই পদ্মপলাশ-লোচনের অশ্রুজল। হয়তো তখন আমার বয়স কম ছিল বলিয়াই মণিয়াকে আমার অত ভাল লাগিয়াছিল। এখনও বিহার বা পশ্চিমের কথা মনে হইলেই আমার মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে বেণীগীর ফুলবাড়ি, তার প্রাচীন গাছপালা, চামেলি বন ও রূপসী মণিয়া।

মাসখানেক পরে।

একদিন ললিতবাবু মুঙ্গেরে আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুশি হইয়া বলিলাম—আসুন, আসুন ললিতবাবু, কখন এলেন?

ললিতবাবু কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—এই এলাম মশায়। দেশে যাচ্ছি।

একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম—দেশে?

—হ্যাঁ দেশে। ওখান থেকে চলে এলাম—

—চলে এলেন? তার মানে? মণিয়া কেমন আছে?

ললিতবাবু ঝাঁজের সহিত বলিলেন —ভালই আছে। আমার পোষালো না, চলে যাচ্ছি।

—ব্যাপার কি? হল কি?

—হবে আবার কি? আমি কারো হাততোলা খেয়ে থাকতে পারব না। হয়েছে কি, আমার বাড়িতে একটা সাড়ে এগারো টাকার রেভিনিউ মণিঅর্ডার পাঠাতে হবে, আজ ক দিন ধরে চাচ্ছি টাকাটা। ক বার চাইব? আমার মান বলে একটা জিনিষ আছে তো? আজ দেব, কাল দেব, আজ ও বেলা নিয়ে এসেছে পাঁচটি টাকা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরে, আমার বইয়ের এককালে তিন-তিনটে এডিশন হয়েছে, আমায় টাকা চেনাতে হবে না। ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাঁদীর দল?

ললিতবাবুর মুখের এ কথার কিছুদূর পর্যন্ত আমি প্রণয়ীর অভিমান বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম হয়তো, কিন্তু তাঁহার উক্তির সবটা এভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার চরিত্র ও মেজাজের উপর আমার অশ্রদ্ধা হইয়া গেল। টাকার জন্য আমাকে পূর্বে তিনি কি রকম উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, (কারণ তাঁহার পুস্তক প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য সাহিত্য-প্রীতি নয়—টাকা, তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছি) সে কথা মনে পড়িল।

আমি বলিলাম—হয়তো মণিয়ার কাছে নেই, এ হতে পারে।

—নেই তো কি মশাই, সাতটা টাকা আর নেই? এর আগেও বাড়িতে টাকা পাঠাবার বেলা এরকম করেছে। তাছাড়া ঠিক সে কথাও নয়, আমার আর ভাল লাগছে না এ ছাতুখোরের দেশ। দেশে গিয়ে মানকচু আর নলিনগুড়ের পায়েস খেয়ে বাঁচি দিনকত। রাঁধতে পারে কেউ এ দেশে? যা রাঁধবে এক তরকারী, বেগুন বেগুনই এক তরকারী, পটল পটলই এক তরকারী—এ দেশে মানুষ আছে? রামোঃ—

বলিলাম—দেশে কে আছে আপনার?

—ভাইপো আছে, ভাইপোর স্ত্রী আছে, তাদের ছেলেমেয়েরা আছে, নেই কে? তাদের ফেলে বিদেশে থাকা কি পোষায় এই বয়েসে, বলুন তো? দেশে থাকলে অভাব কি আমার? এ ছাতুর দেশে আর না, ঢের হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

মনে ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, দেশে থাকিলে যদি চলিবার ভাবনা নাই, তবে ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে প্রতি মাসে টাকা পাঠানর কি দরকার হইত ছাতুর দেশ হইতে? এবং তাও একটি ছাতুর দেশের সরলা মেয়ের নিকট হইতে ভুলাইয়া লওয়া টাকা?

নাঃ, লোকটা অকৃতজ্ঞের একশেষ। চলিয়া গেল দুপুরের ট্রেনে। আমি তুলিয়া দিতে পর্যন্ত গেলাম না। ঘৃণা হইল লোকটার প্রতি।

ললিতবাবু চলিয়া যাইবার দু দিন পরে আমার বাসায় জানলার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি মণিয়া বাসার সামনে টমটম হইতে নামিতেছে। আমি গিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইলাম। মণিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় জানেন? আপনার এখানে এসেছিলেন? ওখান থেকে বেরিয়েছেন আজ দু দিন হল, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে, উনি তো আপন-ভোলা মানুষ—আমার বড্ড ভয় হয়েছে—মুঙ্গের বড় খারাপ জায়গা বাবুজী—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—টাকাকড়ি কিসের?

—আমার হার ছড়াটা ভেঙ্গে গড়াতে দেবেন বলে সঙ্গে আনলেন, আর পঞ্চাশ টাকা—ওঁর নিজের কি দরকার আছে বললেন; আর বাগানের বড় চাতালটা—যেখানে বসে আপনারা চা খান, ওটা মেরামত করবার জন্যে চুন আর সিমেন্ট কিনবার দরকার—তাই। কালই ফিরবার কথা ছিল, কিন্তু আজ সকালেও যখন এলেন না তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না—আপনার এখানে আসেন নি বাবুজী?

ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

কেন জানি না, মণিয়াকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে পারি নাই।

অর্থনষ্টের দুঃখ হইতেও বড় দুঃখ আছে—এই সরলা দেহাতি তরুণীর মনে সে দুঃখ বড় বিষম বাজিত। হয়তো মণিয়ার প্রতি কোনো ধরনের দুর্বলতা ছিল আমার, তাই সে দুঃখের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইলাম।

বলিলাম, ললিতবাবু ভাইপোর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ দেশে গিয়েছেন, আমার ঠিকানায় তার এসেছিল। টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গেছেন, খরচপত্রের দরকার আছে বললেন। হারগাছটা তাড়াতাড়িতে দিতে পারেন নি, দেশের সেকরাকে দেবেন ভেঙ্গে গড়াতে।

ইহার পর আমি বেশী দিন মুঙ্গেরে ছিলাম না; যে ক দিন ছিলাম মণিয়া ছয়-সাত দিন আসিয়া ললিতবাবুর কোনো চিঠি আসিল কি না খবর লইত! বলা বাহুল্য, ললিতবাবু কোনো চিঠি দেন নাই।

সেই মাঘ মাসে আমি মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম এবং তাহার পর প্রায় পাঁচ বছর ও দিকে যাই নাই। বিগত ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর পিসিমাদের দেখিতে আমি আবার মুঙ্গের যাই।

মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই শহরের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে মুঙ্গের নাই—চারিদিকে ধ্বংসদেবের প্রলয় তাণ্ডবের পদচিহ্ন। অবশ্য ভূমিকম্পের পর তখন তিন-চার মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন কি মনে করিয়া একখানি টমটম ভাড়া করিয়া বেণীগীর ফুলবাড়ির দিকে রওনা হইলাম।

বেণীগীর ফুলবাড়িতে মণিয়াদের সে জরাজীর্ণ বাড়িটা ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মণিয়াও বাঁচিয়া নাই, বাড়ি চাপা পড়িয়া হতভাগিনীর মৃত্যু ঘটিয়াছে, বেণীগীর ফুলবাড়ির প্রাচীন বট, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় মহাশ্বেতার বীণার ক্লান্ত সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে—ইহাই সেখানে নিশ্চয় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম।

কিন্তু তাহার বদলে যাহা দেখিলাম তাহার জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না।

ফুলবাড়ির সামনে টমটম হইতে নামিলাম। ফটক দিয়া ঢুকিতেই গাছপালার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল, বাড়িটা যেন মাটির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। বাগানের ও বাড়ির অবস্থা দেখিয়া জনশূন্য বলিয়াও বোধ হইল না। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া শুকন ফোয়ারাটার ধারে চামেলি বনের কাছে

যাইতেই কাছে একটি মেয়েকে গাছের ডালে বাঁধা তারের আলনায় কাপড় মেলিয়া দিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সেই পায়ের শব্দে মেয়েটিও চমকিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম সেই মণিয়া।

মণিয়ার চেহারার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রী বদলাইয়াছে, তবুও সে এখনো সুন্দরী।

বলিলাম—চিনতে পার মণিয়া?

মণিয়ার ডাগর চোখদুটিতে বিস্ময়ের দৃষ্টি তখনো কাটে নাই। আমার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বল মুখে বলিল—বাবুজী? আসুন, আসুন, এত দিন কোথায় ছিলেন? সেই চলে গেলেন—আর খোঁজ নেই, খবর নেই, কত ভেবেছি আপনার জন্যে।

—এখানে ছিলামই না—দিনকয়েক হল আবার এসেছি। যে কাণ্ড হয়েছে দেখলুম তোমাদের দেশে। তারপর তুমি ভাল আছ?

মণিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার আশীর্বাদে বাবুজী প্রাণে বেঁচে গিয়েছি সব। বাড়িটার বিশেষ কিছু হয় নি—অসুন না, চলুন বাড়িতে—

বলিলাম—বাড়িতে তুমি, এখন—মানে আর কে আছে?

মণিয়া বলিল—আমার দাই-মা, আর চাচেরা ভাই আছে; পরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আর উনি আছেন।

পরম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কে, ললিতবাবু?

মণিয়া পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া চোখ নিচু করিয়া বলিল—আবার কে বাবুজী? সেই তো চলে গেলেন, দু বছর ছিলেন দেশে। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই আবার এল। তিন বছরের মাথায় উনি ফিরলেন। মাগো, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছেন! বাঙ্গলা মুলুকের জল-হাওয়া একদম নরম, ওঁর এতকাল পশ্চিমে বাস, সহ্য হবে কেন? হাতে পয়সা যা নিয়ে গিয়েছিলেন, কবে উড়িয়ে বসে আছেন, আমার হারছড়াটা পর্যন্ত—সে যাক গে বাবুজী—ওঁর এই দাড়ি, চুল, ময়লা কাপড়, দশা দেখে তো কেঁদে বাঁচি নে। সেই থেকে আছেন। এখন বেশ শরীর সেরেছে। আর দেশে যাওয়ার নামটি মুখে আনতে দিই নে—

অবস্থা শুনিয়া মনে হইল, ললিতবাবুও বর্তমানে সে কথা মুখে আনিবেন এমন কাঁচা লোক তিনি কখনই নহেন। বলিলাম—কোথায় উনি?

মণিয়া হাসিমুখে বলিল—চলুন, আসুন বাড়িতে বাবুজী, ভারি ভাগ্যি আপনি এলেন। উনি খুব খুশি হবেন আপনাকে দেখলে—এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি—চার বাজলেই উঠবেন—তারপর চা করা —আসুন।

প্রাচীন বটের ডালে পুরান দিনের মত ডাহুক ডাকিতেছিল। বেণীগীর ফুলবাড়ি ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী যেন, মণিয়া ঘুমন্ত রাজকুমারী, ঘুম ভাঙ্গিয়া সদ্য উঠিয়াছে, সময় এখানে অচল।

ললিতবাবু লোকটার উপর পুনরায় ভয়ানক হিংসা হইল।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মন্তর

স্বরূপ মণ্ডল বলিল —"মন্তর যে আজকাল আর ফলচেনি একথা একবার কেন একশবার মানব, দা'ঠাকুর, কিন্তু মন্তর নেই বা কখনও ফলেনি, একথা কি করে মেনে নিই, বলুন না।...সেই তক্ক করতে এসেছিল আমার সেথে, ঐ অখিল গুঁইয়ের ছেলে, দু' কলম ইঞ্জিরি পড়েছে...আপনাকে এসতে দেখে ন্যাজ মুখে করে ঐ সটকালো।...কেন, মন্তর নেই তো গ্যাঁট হয়ে বসে রইলিনি কেন?"

ছেলেটি এবার স্কুল থেকে পাস করিয়া কলেজে গেছে, দুষ্টুবুদ্ধি বাড়িয়াছে, একাল সেকাল লইয়া মাঝে মাঝে স্বরূপকে ঘাঁটাইয়া যায়।

একটা বাঁখারি চাঁচিতেছিল, দা'য়ের একটা লম্বা টান দিয়া মুখটা হাঁ করিয়া আমার দিকে একটু বাড়াইয়া দিল স্বরূপ, তাহার পর বলিল—"এই দেখুন, একটু গুড়ুকের ধোঁয়া গিলতে মনে হয় কি কঠিন বস্তুই না মুখের মধ্যে ঢুকল, অথচ এমন দিনও তো ছিল দা'ঠাকুর, য্যাখন আধমুনি কাৎলার মুড়োগুলো ছাতু হয়ে গলে গেছে এই মুখে?...বলুন?"

—মন্ত্রশক্তির বড়াই নয় ; স্বরূপের একটা নিজস্ব উপমা, দন্তশক্তির নজির দিয়া মন্ত্রশক্তির কথাটা পরিষ্কার করা। আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, ভাষার যতই খুঁৎ থাক্, উদ্দেশ্যটা নিখুঁতভাবে বুঝিতে আর আটকায় না। অখিল গুঁইয়ের ছেলের উদ্দেশে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলাম—"সত্যিই তো, আজ নেই বলে কি বলতে হবে, দাঁতগুলো ছিল না মুখে কোন কালে?"

বুঝিবার এবং বিশ্বাস করিবার লোকের পৃথিবীতে একেবারে অভাব পড়িয়া যায় নাই দেখিয়া স্বরূপের মুখটা ধীরে ধীরে প্রসন্ন হইয়া আসিল। বাঁখারিটা একবার চোখের কাছে ধরিয়া এমুড়ো ওমুড়ো দেখিয়া লইয়া পাশে রাখিয়া দিল, একটু হাসিয়া বলিল—"উই সুমুন্দিরই গুল্‌তি হচ্ছে, ইদিকে যে আবার লাতি হয় সম্পক্কে, বুঝলেন না?... র'ন, একটু তামুকের ব্যবস্থা করি আপনার।"

উঠিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম—"এরা সব গেল কোথায়?"

"বলছি সে কথা, এসি আগে।"

একটু পরে কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হুঁকাটা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—"উই থেকেই তো কথাটা উঠল। বিলাস বাউরির পরিবারের উপর ভূতের ভর হয়েচে। সবাই জানে ওর শাশুড়ি-মাগির সঙ্গে বনত না, সে মরে মাঝে মাঝে নামে এখন ওর দেহে ; সেপাই দারোগা হয়ে উঠলে গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেয় না দা'ঠাকুর? সেই রকম আর কি। কিন্তু বিলাসের এখন ট্যাকা হয়েছে, একটা পাস দেওয়া জামাই করেছে, ওসব সেকেলে কথা মানলে তো ময্যেদা থাকে না আর, ডাক্তার ডাকিয়ে বোয়ের চিকিচ্ছে হচ্ছে। এরা সব তাই দেখতে গেছে ঝেঁটিয়ে।...মাগি ঝড়ের মতন বক্তার করে যাচ্ছে কিনা, হোমরা-চোমরা একটা স্বদেশীবাবু সামনে দাঁড়াতে পারবে নি দা'ঠাকুর।"

স্বরূপ মণ্ডল হাঁটু মুড়িয়া বসিয়া আমার মুখেব পানে চাহিল, দৃষ্টিতে কিছু মন্তব্যের প্রত্যাশা দেখিয়া বলিলাম—"তা না হয় একটা বোজাই ডাকুক।"

একেবারে মনের মত অভিমত পাইয়া স্বরূপ আরও একটু উল্লসিত হইয়া উঠিল অন্তরে অন্তরে, জমির উপর একটা আঁক কাটিতে কাটিতে বলিল—"আমি তাও বলিনে দা'ঠাকুর। আমি বলি—কাজ নেই তোর ওসব সেকেলে পাঠ পড়ে, কিন্তু তোর বোয়ের যদি ইষ্টিরিয়াই হয়েচে তো তোর ডাক্তার বোগের ইষ্টি করুক,—হালে পানি পায়না কেন? চেরা-ফোঁড়া শুনচি কিছু বাদ যাচ্চেনি, কদিন থেকে, বউ কিন্তু তার এখনও বক্তারের চোটে এমন বাড়ি খালি করে লোক একাট্টা করচে কেন যে, অতিথি ব্রাহ্মণকে মানষে এক চিলিম তামুক দেবে তার ব্যবস্থা নেই? কথাটা অন্যায় বলে থাকি, আমায় যা সাজা দেন দা'ঠাকুর।.. দেন একটু পেসাদটা পেয়ে নিই!"

খানিকটা বকার পর মনটা খোলসা হইয়াছে, তার উপর একটু ধোঁয়াও গেল পেটে, স্বরূপ আমার হুঁকার মাথায় কল্কেটা বসাইয়া দিয়া বাঁখারিটা আবার একবার সেইভাবে দেখিয়া লইয়া ভূমিতে নামাইয়া একটু কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে বলিল—"কিন্তু তা তো ব্যাপার নয় দা'ঠাকুর, ব্যাপার হচ্চে অন্যরকম। ও-বাড়িতে রোজা তো আর ঢুকতে দেবেনি, তা সে ভূত ঝাড়াবার জন্যেই হোক, চাই, সাপের বিষ ঝাড়াবার জন্যেই হোক। রোজা আর ও-বাড়িতে ঢুকতে পারে নি।"

আবার মাথা নিচু করিয়া বাঁখারি চাঁচা আরম্ভ করিয়া দিল এবং তাহারই মধ্যে সূক্ষ্ম তির্যক দৃষ্টির সঙ্গে ঠোঁটে খুব ক্ষীণ একটু হাসি লইয়া আমাব পানে এমনভাবে কয়েকবার চাহিল যে, বোঝা গেল বেশ একটি গল্প জমিবার উপক্রম হইতেছে। প্রশ্ন করিলাম—"বলতে বাধা আছে নাকি মণ্ডলের পো'র? তাহলে না হয় থাক্।"

স্বরূপ বলিল—"বাধা আর তেমন কি দা'ঠাকুর? গেরস্ত-বউয়ের কেচ্ছা একটা, পাঁচ কানে তো তোলা যায় না, তাই—আপনারা ভদ্দরলোকেরা যাকে বলেন—একটু কুকণ্ঠা হচ্ছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"বাধাটা নিতান্ত কম বলে বোধ হচ্ছে না আমার স্বরূপ, ও থাক্‌ই তা'হলে, তুমি বরং...

স্বরূপ নিজের কথার জের টানিয়াই বলিল—"আবার তাও ভাবি—আপনকার হোল বামুনের কান, গঙ্গাজলের মতন শুদ্ধ, দোষ থাকে দুধের ছ্যানার মতন কেটে যাবে। গল্পটা আরম্ভ করলাম, শেষ করব নি, আধ-কপালের হাঁড়ক কে সামলাতে এস্‌বে? ও বলেই থুই।"

দা-বাঁখারি রাখিয়া হাঁটু দুইটা জড়াইয়া বসিয়া স্বরূপ আরম্ভ করিল—"সে আজকের কথা নয় দা'ঠাকুর, নেহাৎ কম করে ধরলেও দেড়কুড়ি বছরের কম হবেনি। বিলাসের মায়ের ত্যাখন বয়েস হয়ে এসেচে—আমার চেয়ে বছর দশেকের বড়ই ছেল—চাটুজ্যে পাড়ায় ত্যাখনও অরাতি ঠাকুরের পিসি সজ্ঞানে বেঁচে। তিনি আবার ঝগড়ার মধ্যে মাথার বেহ্মাতল কেটে মহাপ্রাণী বেইরে গিয়ে মারা যায়। পুণ্যবতী মানুষ ছেল, তানাদের যুগই গেচে চলে। তাহলেও দক্ষিণপাড়াতেও সবার ওপর টেক্কা দেওয়া ত্যাখন চাড্ডিখেনি কথা নয় দা'ঠাকুর—ত্যাখনও যদুপালের খুড়ি বেঁচে, পাড়ায় অষ্টপহর বাজসূয় যজ্ঞির হট্টগোল লেগে থাকত।

"কুঁদুলে মেয়েমানুষকে বিধেতাপুরুষ তিনভাগে বেঁটে দিয়েছেন দা'ঠাকুর,—নৈলে একঘেয়ে হয়ে পড়ে কিনা. এক—যাকে মেয়েলি কথায় বলে ঘর জ্বালানি-পাড়া ভালানি ; মানে পাড়া-পড়শীদের অষ্টপ্রহর ভালো করে বেড়াচ্ছে—কার মেয়ে পর্শ হবে, কার কচিছেলের সান্নিপাতিক, মুখে রা নেই ; বাড়ি এলেই কিন্তু সেই মানুষ অগ্নিশম্মা, কাক-চিল বসবার জো নেই। দু'নম্বরের মধ্যে হোল উরই উল্ট—ঘরভালানি-পাড়াজ্বালানি ; নিজের গুনিকে পাখির মতন বুকে করে সামলে আচে, দরজার বাইরে পা দিয়েচে কি একেবারে অন্য মানুষ। বিলাসের মা ছেল তিন নম্বরের মধ্যে—য্যাতক্ষণ বাড়িতে থাকতো, বিলাসের বাবা সাধনখুড়ো থেকে বাড়ির কুকুর-বেড়ালটা পজ্জন্ত তটস্ত হয়ে থাকত। অষ্টপহরই মুখ চলচে—এই সোয়ামীকে নিয়ে, তারপরেই হয়তো ছেলেমেয়েদের কাউকে নিয়ে, তার জের টেনেই হয়তো বউকে নিয়ে ; সেই সাত-সকালে উঠোনে গোবরজল ছড়া দেওয়া থেকে এতটুকু কামাই নেই। সাধনখুড়ো বছরে বার তিনচার করে বিবাগী হয়ে যেত ; তবে অনবরত কাঁসর-ঘণ্টার মধ্যে থেকে কেমন একটা অব্যেস হয়ে গেছ্‌ল, টেঁকতে পারত নি ; বাবাব স্যাঙাৎ ছেল—দুঃখু করে বলত, কি করি, বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। অদেষ্টের নেকন আর কাকে বলে দা'ঠাকুর।

"এই ছেলে ঘরের অবস্তা, সাটে বললুম আপনাকে। ওদিকে, চৌকাটের বাইরে পা দিলে তো, পাড়ায় কুরুক্ষেত্র কাণ্ড পড়ে গেল। রাঙাখুড়ির (আমরা ভয়ে ভক্তিতে তাই বলে ডাকতুম)– রাঙাখুড়ির পদ্ধতি ছিল অনেক রকম। এমনি বাড়ির ঝগড়াটা মুখে করেই বেরুত বাইরে, কেউ যদি একটু টুকলে তো তার সঙ্গে লেগে গেল ; কেউ যদি শুনেও না শুনলে—সেই চেষ্টাই সবাই করত দা'ঠাকুর—তো তার সঙ্গে আরও তাড়াতাড়ি নেগে যেত —এমন পাড়া শ্মশান হয়ে যাক—কেউ একটা দুঃখের কথা ডেকে জিজ্ঞেস করে না এ পাড়ায়, শুনলে কালা সেজে বসে— প'চে গলে যাক

এমন কান ; কারুর নাম করতনি দা'ঠাকুব, ভুলেও নয় ; কিন্তু এমন আঁতে ঘা দিয়ে মোক্ষম কথা বলত, আর এমন তাক করে যে, কার সাদ্যি ঘুরে একটা জবাব না দেয়? তারপরেই ব্যস ; একটার সঙ্গে জড়িয়ে আর একটা, তারপর আর একটা, তারপর দেখতে দেখতে সমস্ত পাড়াটা গমগম করে উঠত। এর সঙ্গে যদি যদুপালের খুড়ি, কি জগা বাউরির সৎমা, কি লক্ষ্মণের জেঠাই সরিক হয়ে পড়ল, তো শুনুন না কত শুনবেন বসে বসে।...হুঁকোটা একবার কাৎ করুন দা'ঠাকুর, সে সব কাহিনী বলতে গেলেও দম ফুরিয়ে এসে।"

বেশ ভালো করিয়া গোটাকতক টান দিয়া স্বরূপ কল্কেটা আবার আমার হুঁকার মাথায় বসাইয়া দিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"কেউ ফেরেনি এখনও।...তা, এখুনি ছেড়ে যাবে সে বুড়ি? শেষ পজ্জন্ত নেশানা নিয়ে কেটেছেল, ভুলতে পারে কখনও সেকথা দা'ঠাকুর?"

প্রশ্ন করিলাম—"সেটা আবার কি?"

"সেই কথাই তো বলছি দা'ঠাকুর, কিন্তু একটু গোড়া বেঁধে না বললে তো বুঝবেন নি। বিলাসের পেরথম বউটি ছেল বড় ভালোমানুষ, গোড়া থেকেই ঐরকম পাড়া কুঁদুলি বউকাঁট্‌কি শাশুড়ির পাল্লায় পড়ে আর ফণা ধরতে পারলেনি কখনও, চেরকালটা চাপাই রয়ে গেল। অবশেষে ঢ্যাখন বড় হোল, জ্ঞানগম্যি হোল, ভালোমন্দ বুঝতে শিখলে, একদিন আপ্তহত্যে করে শাশুড়ির হাত থেকে এড়িয়ে গেল। বিলাসের ত্যাখন বয়েস হয়েচে, দুঃখে ঘেন্নায় আর বিয়ে করতে চাইলে নি। বছরখানেক কাটালে—একবার বিবাগী হয়ে বাপের মতন ঘুরেও এল, তারপর অতিষ্ট হয়ে এর-ওর মুখ দিয়ে বাপকে জানিয়ে দিলে—আর এক দণ্ড বাড়িতে টেঁকতে পারচে না, বিয়ে দিক্ তো দিক্, নইলে সেও বোয়ের মতন আপ্তহত্যে করে সব জ্বালা জুড়োবে। কথাটা বুঝবেন না দা'ঠাকুর? এতদিন বাপে-বেটায় আর বোয়ে মিলে মায়ের ধকলটা কোনরকমে সামলাচ্ছেল, ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছেল তো? বরং বোয়ের উপর দিয়েই যাচ্ছেল বেশির ভাগটা, এখন সে সেয়ানার মতন পাত্তারি গুটিয়ে নিতে দুজনকেই সবটা ঘাড় পেতে নিতে হচ্ছে। খ্যামতার বাইরে হয়ে পড়েছিল। তার ওপর বাবা আবার মাঝে মাঝে বেইরে যেত, তখন সমস্তটা ওর একার ঘাড়েই পড়তো তো?...বাপ একবার বিবাগী হয়ে ফিরে এসতে একে-ওকে দিয়ে জান্যে দিলে, বিয়ে দেবে তো দাও, নইলে আম্মো বোয়ের পথ দেখব।

"মাগি তো খুঁজছেলই, আজ হলে কাল্ চায় না, বউ দাঁতে পেষা—তার তো এক আলাদা স্বাদই? তার ওপর ছেলের শ্বশুর বাড়ির গোটাকতক লোকও পাওয়া যায়, একটা উপরি-পাওনা,—একদিন ঘটা করে বিলাসের বিয়ে হয়ে গেল।

"বউ এল এই নারানী, পঞ্চানন তলার সাধু বাউরির মেয়ে। দিব্যি ডাগর-ডোগর বউ, হাড়কাট গুণো মোটা, পা দু'খানা ভারী, হাঁটার মধ্যেও একটা পুরুষালি ভাব, যেন যাত্রা দলের বিশাখা-সখী। নানান লোকে নানান কথা বলতে লাগল ; কেউ বললে, এইবার মাগির বিষদাঁত ভাঙ্গল, এই বোয়ের সঙ্গে কচালি করতে গেলে কোন্‌দিন দেবে সাবড়ে ; কেউ বললে, আর যাই হোক, পাড়া এবার ঠাণ্ডা হবে, বউ একটু তোয়ের হয়ে নিক, বাড়ি ছেড়ে আর মাগির বাইরে বেরুবার দরকার হবে নি ; কেউ বললে, তাই কি? মাগির বয়েস হয়ে এসেছে, চোখ বুজলে তবু পাড়াটা ঠাণ্ডা হবার আশা ছেল, এখন এই বউ ঐ শাশুড়ির হাতে টেনিং পেয়ে যা দাঁড়াবে তাতে সে আশায় চিরকালের জন্যে আকা'র ছাই পড়ল।

"সবচেয়ে ভ্যাবাগঙ্গারাম মেরে গেল রাঙাখুড়ি। অবিশ্যি পেরথোম শ্বশুরবাড়ি এসে বউ যে দু-পাঁচ দিন ছেল, ত্যাখন আর মুখ খোলে নি, তারপর ঘর করতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আশ মিটিয়ে নেগে গেল ; বছরখানেক উপোসী রয়েচে, বুঝতে পারলেন নি কথাটা? বোয়ের কিন্তু কোন ভাবান্তর নেই—একগলা ঘোমটা টেনে, কাজ নিয়ে বাড়িময় ঢ্যাং ঢ্যাং করে ঘুরে বেড়াচ্চে—একটা মনিষ্যি যে উদয়াস্ত বকে মরচে—তোকেই ঘা দিয়ে—কিছু একটা কর, একটু চোখের জল ফেল্, না হয় গিয়ে খানিকটা শুয়ে থাক্, না হয় খাওয়া বন্ধ কর্ ; ওদিকে না যাস্ উত্তুরই দে মুখ তুলে দুটো! কিছু না। কে কাকে যেন বললে! আগেকার বউটা অত ভাল মানুষ ছেল, আর অত ক্ষীণজীবী, সে পজ্জন্ত মাঝে মাঝে দু'একটা কথা ঘুরিয়ে বলত, এ যেন ঠোঁট দুটো সেলাই করে বসে আছে। মাগি যেতে নাগল

আরও ক্ষেপে, বাড়িতে কাক-চিল বসা বন্ধ হল ; উহুঁ, কার বয়েটি গেচে কথা কইতে। রাঙাখুড়ি যেন সমিস্যেয় পড়ে গেল। উদিকে বোয়ের সুখ্যেতি হু হু করে বেড়ে চলেচে পাড়ায়, কি যে করবে মাগি যেন ভেবে উঠতে পারলে নি। সমিস্যের ওপর সমিস্যে, এই সময় মাগি হঠাৎ অসুখে পড়ে গেল। দিব্যি ভোগের শরীল, মাথা ব্যথাটা পজ্জন্ত হয় না কখনও, হঠাৎ এ কি কাণ্ড! খুড়ির মুখ শুকিয়ে গেল, ডাইনি নয়তো বউ? মুখে কথা নেই, এদিক ভেতরে ভেতরে কিছু তুকতাক করে দিলে নি তো? হঠাৎ বকুন-ঝকুনি সব বন্ধ করে দিলে। পাড়াও ইদিকে ঠাণ্ডা হোল।

"অসুখ কিন্তু বেড়ে যেতেই নাগল দা'ঠাকুর। কথাটা বুঝলেন নি? একে ভয় পেয়ে গেচে ভেতরে ভেতরে, তায় কোঁদলের নাড়িগুলো বেশ হাত পা ছড়িয়ে খেলতে পারচে নি, সব ধকলটা তো যেয়ে পড়চে নিজের দেহের ওপর, অসুখ না বেড়ে যেয়ে উপায় কি? একটি মাস গেল, বাঁচবেই নি বলে সবাই জানে,—এমন সময় আবার ড্যাং ডেঙিয়ে সেরে উঠল। কথাটা খুব সোজা দা'ঠাকুর,—এই শেষ হ্যাপা, এই রকম আশা করে ছেলে প্রাণপণে সেবা কবেচে, সোয়ামীও এই শেষ চিকিচ্ছে আশা করে কিছুর আর কসুর করে নি, ফল হল উল্ট, মাগি ড্যাং ডেঙিয়ে বেঁচে উঠল। পাড়ার সবাইয়ের মুখ আবার শুকিয়ে উঠল।

"শুধু বেঁচে ওঠা নয় দা'ঠাকুর, দেহ-মনের একেবাবে লব-কলেবব নিয়ে বেঁচে উঠল। কথাটা হচ্চে, ডাইনি বউ বলে যে একটা ভয় সেঁদ্যে গেছল, সেটা একেবাবে কেটে গেল কিনা, মনটা দিব্বি ঝরঝরে হয়ে উঠল। অবিশ্যি খুব দুব্বল হয়ে গেল, মাসখানেকের ভোগাণ্ডি তো! কিন্তু বাঁশের কোঁড়ার মতন সাঁ-সাঁ করে আবার পুরন্ত হয়ে উঠল। বেশ মনে আচে- ডাক্তারে পত্যি দিলে শুক্কুরবার দিন ; শনি নয়, রবি নয়, সোম নয়, মঙ্গল নয়, বুধবার দিন দুপুরে বাঙাখুড়ি আবার গলা খুলে দিলে। অবিশ্যি জোর আব ত্যাতটা কোত্থেকে থাকবে—পোরের ভাত চলছে ত্যাখনও, তবে ছাঁদ ঠিক আগেকার মতন। বামুনের কাচ মুকুব না,—কাঁচিয়ে যেতে পারে আশা করে খোঁজ নিতে গেছলাম দা'ঠাকুর, আর কষ্ট কবে মুখের কথা খরচ করতে হোলনি, ঘাড়টি হেঁট করে আস্তে আস্তে ফিরে এলুম।

"তাবপব আজ একরকম তো কাল একরকম। এবার সব ঝোঁকটা যেয়ে পড়ল বোয়ের উপর। তার দুটো হেতু ছেল, পেরথোম তো বাইরে বেরুতে পাবে না, ঐ এক বউই ভরসা, তার উপর বউ যে ডাইনি নয় সেটা পাকা হয়ে যেতে সাহস গেল বেড়ে, সাহস বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশটাও, উঠতে-বসতে দাঁতে পিষতে লাগল। জিজ্ঞেস করবেন বোয়ের ভাবটা কি? না, একটি কথা নয়, সেই আগেকার মতন ঢ্যাং ঢ্যাং করে মুখ বুজে নিজের পাট সরে যাওয়া, না রাম, না গঙ্গা, কিচ্ছু নয়। তবে কি জানেন দা'ঠাকুর—মানুষেরই মন তো? ওই যে চাঙ্গা হয়ে উঠল মাগি, তাতে নেগেছিল প্রাণে। একে শবীলে অসুরের মতন শক্তি থাকতেও ক'-বউ বলে কিছু বলতে পারচে নি, তায় মাগির দাপটটা আরও গেছে বেড়ে, একটু অধৈয্য না হয়ে পড়লে এমনটা আর হোল কেন?

"বারটা বেশ মনে আচে, শনিবার। জীবনকাকার মায়ের শেরাদ্দ ছেলো, আমরা সবাই জুটেচি। দুপুর গাইড়ে গেছে। দুটো বাড়ি বাদ দিয়েই বিলাসের বাড়িটা, সেখানে রাঙ্গাখুড়ি একাই এমন আসর জমিয়ে ফেলেছে যে, কাজের বাড়ির হট্টগোলও ফিকে মেরে গেচে।...সেই বউকে নিয়ে—'আমি কবে ঘটা করে শেরাদ্দের নেমতন্ন খাওয়াব সবাইকে রে!...কবে এই পোড়াকপালীর হাত থেকে নিস্কিতি পাব রে!...কবে আবার ঘটা করে লতুন বৌ ঘরে নেস্‌বো রে! ও ডাইনি আমায় গুণ করে মেরে ফেলতে বসেছেল, আবার কি মন্তর ঝেড়ে কি অপঘাত ঘটাবে রে!'...মাঝে মাঝে কান যাচ্চে, মাঝে মাঝে আবার ইদিককার গোলমালে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছি সবাই, এমন সময় 'বাপরে-গেনু!' বলে এক পাড়াফাটানো চীৎকার, আর তারপরেই সব ঠাণ্ডা একেবারে। সবাই বাক্‌রুদ্ধ হয়ে এ-ওর মুখের পানে চেয়ে রইনু, তারপর উরই মধ্যে কে একজন বলে উঠল- -'বউটাকে বোধহয় সাবড়ে দিলে—এ গলা তো মাগির ছেল না!'

"এদানি নাকি মারধোরও শুরু করেছেল—উঠতে পারত নি—ঘটিটা, বাটিটা, জাঁতিটা, শিশি বোতলটা, যা হাতের কাছে পেলে তাই মারল ছুঁড়ে—পিটে নাগল, কি কপালে নাগল, কি হেঁটুতে, তোয়াক্কা নেই। কথাটা শুনে সবাই মুক চাওয়া-চাওয়ি করে উঠতে যাব, মিনিটখানেকও হায়নি দা'ঠাকুর,

এমন সময় গোবর্দ্ধন বাউরির ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বল্লে—'শীগগির করে এসো, রাঙ্গাদিকে সাপে খেয়েচে।'...'সাপে খেয়েচে কিরে!...কাকে?'—বলে সবাই দুদ্দুড়িয়ে ছুটলুম, গিয়ে দেখি একবর্ণও মিথ্যে নয়, মাগি শুয়ে একটা গোঁ গোঁ করে শব্দ করতে করতে বালিসে আস্তে আস্তে মাতা চালাচ্চে। ইদিকে ঠিক কব্জির নিচেটায় এতখানি একটা ছোবলের দাগ, কালো রক্তে বিছানার এতখানিটে গেছে ভিজে, ত্যাখনো ঝরচে রক্ত একটু একটু করে।

"ছোবল দেখে সবার চক্ষুস্থির। সাপ যে হেঁজিপেঁজি সাপ নয়, এটা বুঝতে কারুব বাকি রইলনি। ত্যাখুনি মাগির হাতে গোটা তিনেক শক্ত বাধন দেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক ছুটল দাশু হাজরার ওখানে। দাশু হাজরার বাড়ি মসনের পাশেই রূপুলিতে ; এ-তল্লাটে ত্যাখন তার মতন রোজা নেই। ইদিকে কটা ছোঁড়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হোল বিলাস আর তার বাপকে ডেকে আনতে, বাড়িতে বড় একটা থাকতনি কিনা ওরা, এদানি আবার আরও কম থাকত।

স্বরূপ আবার কল্কেটা চাহিয়া লইয়া গোটাকতক দীর্ঘ টান দিল, তারপর সেটা হুঁকার মাথায় পুনরায় বসাইয়া দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—"কি কথা থেকে যে উঠল কথাটা?...হাঁ, আমায় বলে কিনা, তুমি নিজের চোখে মন্তরের খেলা দেখেচ?...চ্যাংরা ছোঁড়া দু'কলম ইঞ্জিরি পড়ে মনে করে...তবে একথা অবিশ্যি মানব দা'ঠাকুর, সেদিন যা দেখলুম তার তুল্যি পূব্বে দেখিও নি, আর এ জন্মে দেখতেও হবে নি।"

"দাশু ছেল না ঘরে, ভিন্‌গাঁয়ে কোথায় গেছ্‌ল। তার ছেলে নিবারণ এসে রুগী ধরলে। পিঠে থালা বসিয়ে মন্তর বলে ইঁদুরের মাটি ছুঁড়ে মারে, থালা বসে না। অথচ রুগী ইদিকে নেতিয়ে পড়চে, গ্যাঁগানি গেচে বেড়ে। নতুন শিখচে বাপের কাছে, ভেবড়ে গেল। এর মধ্যে এরা বাপ-বেটাতেও এসে পড়েচে, বিলাস আবাব ছুটে যাবে রূপুলিতে, এমন সময় দাশু বুড়ো স্বয়ং এসে হাজির, কানে গেলে যেখেনেই থাক্ ছুটে এসতে হবে কিনা। ঢুকেই বললে—"কৈ, আমার বিজিট কোছায়?..." দাশু হাজরার কাছে লোক পাট্যেই ভালো করে গাঁজার ব্যবস্থা করে রাখতে হোত, বিলাসের বাপ কলকেটি হাতে তুলে দিলে। বেশ নিশ্চিন্দি হয়ে দম চড়িয়ে নিয়ে আর অন্য কিছু না করে একেবারেই কড়ি চালা।

"কড়ি তো চালাবে, কিন্তু কড়ি চলে কৈ দা'ঠাকুর? মন্তর আউড়ে হাতের মধ্যে কড়ি নেড়ে দেয় ছেড়ে, সীসের ভাঁটার মতন মাটি কামড়ে যে পড়ে—আর নড়ন-চড়ন নেই। একবার, দুবার, তিনবার হেরে দাশু-বুড়োর মুখ একেবারে রাঙ্গা হয়ে উঠল, দাঁড়িয়ে উঠে সবার ওপর একবার দিষ্টি বুলিয়ে গর্জে উঠল—'কি, দাশু হাজরার সঙ্গে তঞ্চকতা! সাপ মেরে ফেলে আমায় দিয়ে কড়ি চালানো! তামাসা! তামাসা আমি দেখিয়ে দিতে পারি এক্ষুণি—জানে না সব, চেনে না দেশো হাজরাকে?' মন্তরে-তন্তরে ভয়ানক পারদস্যি, রাগের মাথায় কি করে বসবে, বিলাসের বাবা, আরও কয়েকজন হাত জোড় করে বললে—'দোহাই সদ্দার, কেউ সাপকে আমরা চক্ষেই দেখিনি, মারা তো দূরের কথা। ছোবলের বহর দেখে সাপকে খোঁজবার হেস্মৎও হয়নি আমাদের কারুর।' অনেক করে কাকুতি-মিনুতি করে বলতে, বুড়ো ঠাণ্ডা হোল, বললে—'আর এক ছিলিম বড় তামাক।'

'বেশ ভালো করে গাঁজা টেনে, সমস্ত উঠোনটা ঘুরে ঘুরে কি সব তুকতাক করে এসে আবার কড়ি নিয়ে বসল ; চোখ দুটো জ্বলছে সমস্ত শরীল দিয়ে মন্তর যেন ফুটে বেরুচ্চে, বিড় বিড় করে মন্তর বলে, হাতের কড়ি উঠোনে আছড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'চল'!...কড়ি এবার চলল, কিন্তু বিগোৎ খানেক গিয়ে আবার গেল গেমে। দাশু হাজরা একেবারে উঠে দাঁড়ালো, আর একটা পাড়া ফাটানো হুঙ্কার দিয়ে কড়ির ওপর ইঁদুর মাটি আছড়ে' মন্তর আউড়ে বললে,—'চল!' সাপ হোক, দেবদানো-যক্ষী যেই হোক, হাজির কর্ সামনে!'...সঙ্গে সঙ্গে কড়ি একেবারে জীয়ন্ত হয়ে উঠল দা'ঠাকুর সে কি চাল! বার দুয়েক একটু ডাইনে বাঁয়ে করলে, যেন ঠাহর করতে পারচে না, তারপর ধরলে সোজা রাস্তা. যেন চোর ধরে আনতে পেয়াদা চলেছে। দাওয়ার গা বেয়ে উঠোনে নামল, উঠোন পেইরে গোয়ালে ঢুকল, তারপরই সে যা দিশ্য দা'ঠাকুর!—কপালের মাজখানে কড়িটা চেপে বসেচে, চোখ দুটো রাগে জ্বলচে যেন আগুনেব ভাঁটা, মাথাটা সিদে করে ধরেচে ঠিক যেন ফণা-ধরা একটা খরিস গোক্‌রো...গোয়ালের মধ্যে থেকে হেলতে দুলতে গণগনিয়ে বেইরে এস্‌চে...।"

তদ্‌গত হইয়া শুনিতেছিলাম, বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"যেন ফণা-ধরা কি বলচ স্বরূপ, সাপ নয়?'

স্বরূপও কম বিস্ময়ে আমার পানে চাহিল না, একটু সেইভাবে থাকিয়া উত্তর করিল—"আপনি যে অবাক করলেন দা'ঠাকুর, সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনে সীতে কার ভাযো! ঐরকম গলাবাজির মধ্যে সাপ কোথায় পাবে?—মসনের ও-তল্লাটের মধ্যে কেউ কখনও সাপ দেখেনি ; ভিটের সাপ বনে পালায়, বনের সাপ পাঁদাড়ে পালায়—রাঙাখুড়ির এমনি দাপট।...দা'ঠাকুর আবার জিজ্ঞেস করে—'সাপ নয় নাকি স্বরূপ?—সাপ কোথা থেকে এসবে? সাপ এত সস্তা নাকি?'

"বউটো মন্তরের টানে হনহন করে নেমে এসে সামনে দাঁড়ালে, ঠিক যেন কার ভর হয়েছে...।"

"কার বউ স্বরূপ?"

"নেও! কার বউ তাই এখন বুঝিয়ে বলো দা'ঠাকুরকে।...ঐ বিলাসের বউ ; নিজের ছেলের বউ যার বাড়িতে টেঁকতে নারে, অপর কার বউ এসবে তার বাড়িতে? অত নজ্জা তো? শাশুড়ির সামনেও অষ্টপহর ঘোমটা, এক বাড়ি নোকের সামনে সিদে দাঁড়িয়ে বললে—'কামড়াব নি? এগুলে জামবাটিটা ছুঁড়ে...!"

প্রশ্ন করিলাম—"বউই কামড়ালে?".

"না কামড়ে' কি করে ক'ন দা'ঠাকুর? বললে কিনা—রাগের মাথায় পয়লা একটা জামবাটি ছুঁড়ে মারলে মাগি, সেটা ব্যথ হতে সেই দুব্বল শরীলে বিছানা ছেড়ে নাপ্যে উঠে ধরলে কষে চুলের মুঠি! ব্যস, সেই ছাঁদনা তলা থেকে সুরু করে আজ পজ্জন্ত যত বাগ ছেল জমে, সব একাট্টা করে কব্জির নিচে এক রাম-কামড়! দুব্বল শরীল, তায় আচমকা তেড়ে ন্যাপ্যে উঠেচে, তার ওপক ফিনিক-দেওয়া রক্ত দেখে মাগি তো ভিরমি গিয়ে পড়ল দাঁতকপাটি নেগে ; জ্ঞান হবে কি, ওই অবস্থার ওপর আরও তিনটে উৎকট বাঁধন—তেমনি নাকি দজ্জাল তাই নাড়ী ছেড়ে যায়নি।...দেখি একবার, পেসাদের যদি থাকে একটু।"

"একপাতা এ-বি-সি-ডি প'ড়ে আমায় বলে কিনা মণ্ডর মন্তর করচ, মন্তরের খেলা তুমি দেখেচ নিজের চোকে?...নাঃ, কৈ দেখিনি তো? কোত্থেকে আর দেখব?"

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদেনী

শম্ভু বাজিকর এ মেলায় প্রতি বৎসর আসে। তাহার বসিবার স্থানটা মা-কঙ্কালীর এষ্টেটের খাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত কায়েমী হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে, বাজি ; কিন্তু শম্ভু বলে, ভোজবাজি—'ছারকাছ'। ছোট তাঁবুটার প্রবেশপথের মাথার উপরেই কাপড়ে-আঁকা একটা সাইনবোর্ডেও লেখা আছে 'ভোজবাজি—সার্কাস।' লেখাটার এক পাশে একটা বাঘের ছবি, অন্য পাশে একটা মানুষ, তাহার হাতে এক রক্তাক্ত তলোয়ার, অপর হাতে একটা ছিন্ন মুণ্ড। প্রবেশমূল্য মাত্র দুই পয়সা। ভোজবাজি অর্থে 'গোলক-ধামের' খেলা। ভিতরে পট টাঙাইয়া কাপড়ের পর্দায় শম্ভু মোটা লেন্স লাগাইয়া দেয়, পল্লীবাসীরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে সেই লেন্সের মধ্য দিয়া দেখে 'আংরেজ লোকের যুদ্ধ', 'দিল্লীকা বাদশা', 'কাবুলকে পাহাড়', 'তাজবিবিকা কবর'। তারপর শম্ভু লোহার রিং লইয়া খেলা দেখায়, সর্বশেষে একটা পর্দা ঠেলিয়া দেখায় খাঁচায় বন্দী একটা চিতাবাঘ। বাঘটাকে বাহিরে আনিয়া তাহার উপরে শম্ভুব স্ত্রী রাধিকা বেদেনী চাপিয়া বসে, বাঘের সম্মুখের থাবা দুইটা ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া আপন ঘাড়ের উপর চাপাইয়া মুখামুখি দাঁড়াইয়া বাঘটাকে চুমা খায়, সর্বশেষে বাঘটার মুখের ভিতর আপনার প্রকাণ্ড চুলের খোঁপাটা পুরিয়া দেয়, মনে হয়, মাথাটাই বাঘের মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল।

সরল পল্লীবাসীরা স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেখিতে দেখিতে করতালি দিয়া উঠে। তাহার পরেই খেলা শেষ হয়, দর্শকের দল বাহির হইয়া যায়। সর্বশেষ দর্শকটির সঙ্গে শম্ভুও বাহির হইয়া আসিয়া আবার তাঁবুর দুয়ারে জয়ঢাকটা পিটিতে থাকে—দুম, দুম, দুম। জয়ঢাকের সঙ্গে স্ত্রী রাধিকা বেদেনী একজোড়া প্রকাণ্ড করতাল বাজায়-ঝন-ঝন-ঝন।

মধ্যে মধ্যে শম্ভু হাঁকে, বাঘ! ঐ বড়-বা-ঘ!

বেদেনী প্রশ্ন করে, বড় বাঘ কি করে?

পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের চুমা খায়, জ্যান্ত মানুষের মাথা মুখের মধ্যে পোরে, কিন্তু খায় না।

কথাগুলো শেষ করিয়াই সে ভিতরে গিয়া বাঘটাকে একটা তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুশ দিয়া খোঁচা মারে, সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা বার বার গর্জন করিতে থাকে। তাঁবুর দুয়ারের সম্মুখে সমবেত জনতা ভীতিপূর্ণ কৌতূহল-কম্পিত বক্ষে তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়।

দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া বেদেনী দুইটি করিয়া পয়সা লইয়া প্রবেশ করিতে দেয়।

এ ছাড়াও বেদেনীর নিজের খেলা আছে। তাহার আছে একটা ছাগল, দুইটা বাঁদর আর গোটাকতক সাপ। সকাল হইতেই সে আপনার ঝুলি ঝাঁপি লইয়া গ্রামে বাহির হয়, গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি খেলা দেখাইয়া, গান গাহিয়া উপার্জন করিয়া আনে।

এবার শম্ভু কঙ্কালীর মেলায় আসিয়া ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কোথা হইতে আর-একটি বাজির তাঁবু আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা অবশ্য খালিই পড়িয়া আছে, কিন্তু এ বাজির তাঁবুটা অনেক বড় এবং কায়দাকবণেও অনেক অভিনবত্ব আছে। বাহিরে দুইটি ঘোড়া, একটা গরুর গাড়ির উপর একটা খাঁচা রহিয়াছে, নিশ্চয় উহাতে বাঘ আছে।

গরুর গাড়ি তিনখানা নামাইয়া শম্ভু নূতন তাঁবুর দিকে মর্মান্তিক ঘৃণায় হিংস্র দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর আক্রোশ-ভরা নিম্নকণ্ঠে বলিল, শালা!

তাহার মুখ ভীষণ হইয়া উঠিল। শম্ভুর সমগ্র আকৃতির মধ্যে একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ছাপ যেন মাখান আছে। ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুরতা-পরিব্যঞ্জক একধারার উগ্র তামাটে রং আছে—শম্ভুর দেহবর্ণ সেই উগ্র তামাটে ; আকৃতি দীর্ঘ, সর্বাঙ্গে একটা শ্রীহীন কঠোরতা, মুখে কপালের নিচেই একটা খাঁজ, সাপের মত ছোট ছোট গোল চোখ, তাহার উপর সে দস্তুর, সম্মুখের দুইটা দাঁত যেন বাঁকা হিংস্র ভঙ্গিতে অহরহ বাহিরে জাগিয়া থাকে। হিংসায় ক্রোধে সে আরো ভয়াবহ হইয়া উঠিল।

রাধিকাও হিংসায় ক্রোধে, ধারালো ছুরি যেমন আলোকের স্পর্শে চমকম করিয়া উঠে তেমনই ঝকমক করিয়া উঠিল ; সে বলিল, দাঁড়া, বাঘের খাঁচায় দিব গোক্ষুরার ডেঁকা ছেড়্যা!

রাধিকার উত্তেজনার স্পর্শে শম্ভু আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে ক্রুদ্ধ দীর্ঘ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নূতন তাঁবুটার ভিতর ঢুকিয়া বলিল, কে বেটে, মালিক কে বেটে?

কি চাই?—তাঁবুর ভিতরের আর-একটা ঘরের পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল একটা জোয়ান পুরুষ, ছয় ফিটের অধিক লম্বা, শরীরের প্রতি অবয়বটি সবল এবং দৃঢ় কিন্তু তবুও দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায় ; লম্বা হালকা দেহ,—'তেজী ঘোড়ার' যেমন মনোরম লাবণ্য ঝকমক করে—লোকটির হালকা অথচ সবল দৃঢ় শরীরে তেমনই একটি লাবণ্য আছে। রং কালই, নাকটি লম্বা টিকাল, চোখ দুটি সাধারণ, পাতলা ঠোঁটদুটির উপর তুলি দিয়া আঁকা গোঁফের মত একজোড়া গোঁফ সূচ্যগ্র করিয়া পাক দেওয়া, মাথায় বাবরি চুল, গলায় কারে-ঝুলানো একটি সোনার ছোট চাকা তক্তি,—সে আসিয়া শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। দুইজনেই দুইজনকে দেখিতেছিল।

কি চাই?—নূতন বাজিকর আবার প্রশ্ন করিল, কথার সঙ্গে সঙ্গে মদের গন্ধে শম্ভুর নাকের নীচে বায়ুস্তর ভুরভুর করিয়া উঠিল।

শম্ভু খপ করিয়া ডান হাত দিয়া তাহার বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল, এ জায়গাটা আমার। আমি আজ পাঁচ বৎসর এইখানে বসছি।

ছোকরাটিও খপ করিয়া আপন ডান হাতে শম্ভুর বাঁ হাত চাপিয়া ধরিল, মাতালের হাসি হাসিল, বলিল, সে হবে, আগে মদ টুক্‌চা—

শম্ভুর পিছনে জলতরঙ্গ বাদ্যযন্ত্রে দ্রুততম গতিতে যেন গৎ বাজিয়া উঠিল, রাধিকা কখন আসিয়া শম্ভুর পিছনে দাঁড়াইয়াছিল, সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, কটি বোতল আছে তুমার নাগর—মদ খাওয়াইবা?

ছোকরাটি শম্ভুর মুখ হইতে পিছনের দিকে চাহিয়া রাধিকাকে দেখিয়া বিস্ময়ে মোহে কথা হারাইয়া নির্বাক হইয়া গেল।—কাল সাপিনীর মত ক্ষীণতনু দীর্ঘাঙ্গিনী বেদেনীর সর্বাঙ্গে যেন মাদকতা মাখা; তাহার ঘন কুঞ্চিত কাল চুলে, চুলের মাঝখানে সাদা সূতার মত সিঁথিতে, তাহার ঈষৎ বঙ্কিম নাকে, টানা অর্ধ-নিমীলিত ভঙ্গির মদিরদৃষ্টি দুইটি চোখে, সূচালো চিবুকটিতে সর্বাঙ্গে মদকতা। সে যেন মদিরার সমুদ্রে সদ্য স্নান করিয়া উঠিল; মাদকতা তাহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। মহুয়াফুলের গন্ধ যেমন নিশ্বাসে ভরিয়া দেয় মাদকতা, বেদেনীর কাল রূপও তেমনই চোখে ধরাইয়া দেয় একটা নেশা। শুধু রাধিকাই নয়, এই বেদে জাতের মেয়েদের এটা একটা জাতিগত রূপবৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য রাধিকার রূপের একটা প্রতীকের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু মোহময় মাদকতার মধ্যে আছে ক্ষুরের মত ধারের ইঙ্গিত, চারিত্রিক হিংস্র তীক্ষ্ণ উগ্রতার আভাস, মোহমত্ত পুরুষকেও থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়, ভয়ের চেতনা জাগাইয়া তোলে, বুকে ধরিলে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

রাধিকার খিলখিল হাসি থামে নাই, সে নূতন বাজিকরের বিস্ময় বিহ্বল নীরব অবস্থা দেখিয়া আবার বলিল, বাক্ হর্‍্যা গেল যে নাগরের?

বাজিকর এবার হাসিয়া বলিল, বেদের বাচ্চা গো আমি। বেদের ঘরে মদের অভাব! এস।

কথা সত্য, এই জাতিটি মদ কখনো কিনিয়া খায় না। উহারা লুকাইয়া চোলাই করে, ধরাও পড়ে, জেলেও যায়; কিন্তু তা বলিয়া স্বভাব কখনো ছাড়ে না। শাসন-বিভাগের নিকট পর্যন্ত ইহাদের এই অপরাধটা অতি সাধারণ হিসাবে লঘু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শম্ভুর বুকখানা নিশ্বাসে ভরিয়া এতখানি হইয়া উঠিল। আহ্বানকারীও তাহার স্বজাতি, নতুবা—। সে রাধিকার দিকে ফিরিয়া কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, তুই আইলি কেন এখেনে?

রাধিকা এবারও খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরণ তুমার! আমি মদ খাব নাই?

তাঁবুর ভিতরে ছোট একটা প্রকোষ্ঠের মধ্যে মদের আড্ডা বসিল। চারিদিকে পাখির মাংসের টুকরা টুকরা হাড়ের কুচি ও একরাশি মুড়ি ছড়াইয়া পড়িয়া আছে; একটা পাতায় এখনো খানিকটা মাংস, আর একটায় কতকগুলা মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কা, খানিকটা নুন, দুইটি খালি বোতল গড়াইতেছে, একটা বোতল অর্ধসমাপ্ত। বিস্রস্তবাসা একটি বেদের মেয়ে পাশেই নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে, মাথার চুল ধূলায় রুক্ষ, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়ে ঊর্ধ্ববাহুর ভঙ্গিতে মাটির উপর লুণ্ঠিত, মুখে তখনো মদের ফেনা বুদবুদের মত লাগিয়া রহিয়াছে। হৃষ্টপুষ্ট শান্তশিষ্ট চেহারার মেয়েটি।

রাধিকা তাহাকে দেখিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার বেদেনী? ই যি কাটা কলাগাছের পারা পড়েছে গো!

নূতন বাজিকর হাসিল, তারপর সে স্খলিতপদে খানিকটা অগ্রসর হইয়া একটা স্থানের আলগা মাটি সরাইয়া দুইটা বোতল বাহির করিয়া আনিল।

মদ খাইতে খাইতে কথা যাহা বলিবার বলিতেছিল নূতন বাজিকর আর রাধিকা।

শম্ভু মত্ততার মধ্যেও গম্ভীর হইয়া বসিয়া ছিল। প্রথম পাত্র পান করিয়াই রাধিকা বলিল, কি নাম গো তোমার বাজিকর?

নূতন বাজিকর কাঁচা লঙ্কা খানিকটা দাঁতে কাটিয়া বলিল, নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী।

কেনে?

নাম বটে কিষ্টো বেদে।

তা গালি দিব কেনে?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী, তাই বুলছি।

রাধিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, পরক্ষণেই সে আপনার কাপড়ের ভিতর হইতে ক্ষিপ্রহস্তে কি বাহির করিয়া নূতন বাজিকরের গায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, কই, কালিয়াদমন কর দেখি কিষ্টো, দেখি!

শম্ভু চঞ্চল হইয়া পড়িল ; কিন্তু কিষ্টো বেদে ক্ষিপ্রহাতে আঘাত করিয়া সেটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। একটা কাল কেউটের বাচ্চা। আহত সর্প-শিশু হিস্-হিস্ গর্জনে মুহূর্তে ফণা তুলিয়া দংশনোদ্যত হইয়া উঠিল ; শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, 'আ-কামা', অর্থাৎ বিষ দাঁত এখনো ভাঙা হয় নাই। কিষ্টো কিন্তু ততক্ষণে তাহার মাথাটা বাঁ হাতে চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হাসিতে হাসিতে সে ডান হাতে ট্যাক হইতে ছোট একটা ছুরি বাহির করিয়া দাঁত দিয়া খুলিয়া ফেলিল ; এবং সাপটার বিষদাঁত ও বিষের থলি দুই-ই কাটিয়া ফেলিয়া রাধিকার গায়ে আবার ছুঁড়িয়া দিল। রাধিকাও বাঁ হাতে সাপটাকে ধরিয়া ফেলিল ; কিন্তু রাগে সে মুহূর্তপূর্বের ওই সাপটার মত ফুলিয়া উঠিল, বলিল, আমার সাপ তুমি কামাইলা কেনে?

কিষ্টো বলিল, তুমি যে বল্ল্যা গো দমন করতে।—বলিয়া সে এবার হা-হা করিয়া উঠিল।

রাধয়া মুহূর্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বেই।

নূতন তাঁবুতে আজ হইতে খেলা দেখানো হইবে, সেখানে খুব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরে মাচা বাঁধিয়া সেটার উপর বাজনা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, একটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালিবার উদ্যোগ হইতেছে। রাধিকা আপনাদের ছোট তাঁবুটির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের খেলার তাঁবু এখনো খাটানো হয় নাই। রাধিকার চোখ দুইটি হিংস্রভাবে যেন জ্বলিতেছিল।

শম্ভু নিকটেই একটা গাছতলায় নামাজ পড়িতেছিল, আরো একটু দূরে একটা গাছের পাশে নামাজ পড়িতেছে কিষ্টো। বিচিত্র জাত বেদেরা। জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বেদে। তবে ধর্মে ইসলাম। আচারে পুরা হিন্দু, মনসাপূজা করে, মঙ্গলচণ্ডী-ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী-দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে, নাম রাখে শম্ভু শিব কৃষ্ণ হরি, কালী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী। হিন্দু পুরাণ কথা ইহাদের কণ্ঠস্থ। এমনই আর-একটি সম্প্রদায় পট দেখাইয়া হিন্দুপুরাণ গান করে, তাহারা নিজেদের বলে—পটুয়া, বিপুল চিত্রকরের জাতি। বিবাহ-আদান-প্রদান সমগ্রভাবে ইসলাম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে হয় না, নিজেদের এই বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। বিবাহ হয় মোল্লার নিকট ইসলামী পদ্ধতিতে, মরিলে পোড়ায় না, কবর দেয়। জীবিকায় বাজিকরেরা সাপ ধরে, সাপ নাচাইয়া গান করে, বাঁদর ছাগল লইয়া খেলা দেখায়। অতি সাহসী কেহ কেহ এমনই তাঁবু খাটাইয়া বাঘ লইয়া খেলা দেখায়, কিন্তু এই নূতন তাঁবুর মত সমারোহ করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ের কেহ কখনো খেলা দেখায় নাই। রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। তাহার মনশ্চক্ষে কেবল ভাসিয়া উঠিতেছিল উহাদের সবল তরুণ বাঘটির কথা। ইহারই মধ্যে লুকাইয়া সে বাঘটাকে কাঠের ফাঁক দিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। সবল দৃঢ় ক্ষিপ্রতাব্যঞ্জক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চকচকে চিকন লোম, মুখে হাসির মত ভঙ্গি যেন অহরহই লাগিয়া আছে। আর তাহাদের বাঘটা স্থবির শিথিলদেহ, অতি কর্কশ, খসখসে লোমগুলি দেখিলে রাধিকার শরীর ঘিন ঘিন করিয়া উঠে। কতবার সে শম্ভুকে বলিয়াছে একটা নূতন বাঘ কিনিবার জন্য, কিন্তু শম্ভুর কি যে মমতা ঐ বাঘটার প্রতি, তাহার হেতু সে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় না।

নামাজ সারিয়া শম্ভু ফিরিয়া আসিতেই সে গভীর ঘৃণা ও বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তুর ওই বুড়া বাঘের খেলা কেউ দেখতে আসবে নাই।

ক্রুদ্ধ শম্ভু বলিল, তু জানিস সব!

রাধিকা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, জেনে না আমি! তু-ই জানিস সব!

শম্ভু চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু রাধিকা থামিল না, কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, ওরে, মড়া বুড়ার নাচন দেখতে কার কবে ভাল লাগে রে? আমারে বলে তুই জানিস সব!

শম্ভু মুহূর্তে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, পরিপূর্ণভাবে তাহার হিংস্র দুই পাটি দাঁত ওই বাঘের মত ভঙ্গিতেই বাহির করিয়া সে বলিল, ছোকরার উপর বড় যে টান দেখি তুর!

রাধিকা সর্পিণীর মত গর্জন করিয়া উঠিল, কি বললি বেইমান?

শম্ভু আর কোনো কথা বলিল না, অঙ্কুশভীত বাঘের মত ভঙ্গিতেই সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ক্রোধে অভিমানে রাধিকার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। বেইমান তাহাকে এতবড় কথাটা বলিয়া গেল? সব ভুলিয়া গিয়াছে সে? নিজের বয়েসটাও তাহার মনে নাই? চল্লিশ বৎসরের পুরুষ, তুই তো বুড়া! রাধিকার বয়সের তুলনায় তুই বুড়া ছাড়া আর কি? রাধিকা এই সবে বাইশে পা দিয়াছে। সে কি দায়ে পড়িয়া শম্ভুকে বরণ করিয়াছে? রাধিকা তাড়াতাড়ি আপনাদের তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়া গেল।

সত্য কথা। সে আজ পাঁচ বৎসর আগের ঘটনা। রাধিকার বয়স তখন সতেরো। তাহারও তিন বৎসর পূর্বে শিবপদ বেদের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। শিবপদ ছিল রাধিকার চেয়ে বৎসর তিনেকের বড়। আজো তাহার কথা মনে করিয়া রাধিকার দুঃখ হয়। শান্ত প্রকৃতির মানুষ, কোমল মুখশ্রী, বড় বড় চোখ, সে চোখের দৃষ্টি যেন মায়াবীর দৃষ্টি। সাপ, বাঁদর, ছাগল এসবে তাহার আসক্তি ছিল না। সে করিত বেতের কাজ,—ধামা বুনিত, চেয়ার পাল্কির ছাউনি করিত, ফুলের শৌখিন সাজি তৈয়ারি করিত ; তাহাতে তাহার উপার্জন ছিল গ্রামের সকলের চেয়ে বেশি। তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে বাহির হইত ; সে কাঁধে ভার লইয়া যাইত তাহার বেতের জিনিস, রাধিকা লইয়া যাইত তাহার সাপের ঝাঁপি, বাঁদর, ছাগল। শিবপদর সঙ্গে আরো একটি যন্ত্র থাকিত, তাহার কোমরে গোঁজা থাকিত বাঁশের বাঁশী। রাধিকা যখন সাপ নাচাইয়া গান গাহিত, শিবপদ রাধিকার স্বরের সহিত মিলাইয়া বাঁশী বাজাইত।

ইহা ছাড়াও শিবপদর আর-একটা কত বড় গুণ ছিল! তাহাদের সামাজিক মজলিসে বৃদ্ধদের আসরেও তাহার ডাক পড়িত। অতি ধীর প্রকৃতির লোক শিবপদ, এবং লেখাপড়াও কিছু কিছু নিজের চেষ্টায় সে শিখিয়াছিল, এইজন্য তাহার পরামর্শ প্রধানেরাও গ্রহণ করিত। গ্রামের মধ্যে সম্মান কত তাহার! আর সেই শিবপদ ছিল রাধিকার ক্রীতদাসের মত। টাকাকড়ি সব থাকিত রাধিকার কাছে। তাঁতে বোনা কাল রঙের জমির উপর সাদা সূতার ঘন ঘন ঘরকাটা শাড়ি পরিতে রাধিকা খুব ভালবাসিত, শিবপদ বার মাস সেই কাপড়ই তাহাকে পরাইয়াছে।

এই সময় কোথা হইতে দশ বৎসর নিরুদ্দেশ থাকার পর আসিল এই শম্ভু, সঙ্গে এই বাঘটা, একটা ছেঁড়া তাঁবু, আর-এক বিগতযৌবনা বেদেনী। বাঘ ও তাঁবু দেখিয়া সকলের তাক লাগিয়া গেল। রাধিকা প্রথম যেদিন শম্ভুকে দেখিল, সেদিনের কথা তাহার আজো মনে আছে। সে এই উগ্র পিঙ্গলবর্ণ, উদ্ধতদৃষ্টি কঠোর বলিষ্ঠদেহ মানুষটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল।

শম্ভুও তাহাকে দেখিতেছিল মুগ্ধ বিস্ময়ের সহিত, সে-ই প্রথম ডাকিয়া বলিল, এ-ই বেদেনী, দেখি তুর সাপ কেমন?

রাধিকার কি যে হইয়াছিল, সে ফিক করিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, পয়সা দেখি যে খুব। পয়সা দিবা?

বেশ মনে আছে, শম্ভু বলিয়াছিল, পয়সা দিব না ; তু সাপ দেখালে আমি বাঘ দেখাব।

বাঘ! রাধিকা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। কে লোকটা? যেমন অদ্ভুত চেহারা, তেমনই কি অদ্ভুত কথা ; বলে—বাঘ দেখাইবে! সে তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিয়াছিল, সত্যি বুলছ?

বেশ, দেখ, আগে আমার বাঘ দেখ! সে তাহাকে তাঁবুর ভিতর লইয়া গিয়া সত্যই বাঘ দেখাইয়াছিল। রাধিকা সবিস্ময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, ই বাঘ নিয়া তুমি কি কর?

লড়াই করি, খেলা দেখাই।

হাঁ?

হাঁ, দেখবি তু?—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে খাঁচা খুলিয়া বাঘটাকে বাহির করিয়া তাহার সামনের দুই থাবা দুই হাতে ধরিয়া তুলিয়া বাঘের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছিল। বেশ মনে আছে, রাধিকা বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গিয়াছিল। শম্ভু বাঘটাকে খাঁচায় ভরিয়া রাধিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিল, তু এইবার সাপ দেখা আমাকে।

রাধিকা সে কথার উত্তর দেয় না, বলিয়াছিল, ওটা তুমার পোষ মেনেছে?

হি হি করিয়া হাসিয়া শম্ভু সবলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, হি, বাঘিনী পোষ মানাতে আমি ওস্তাদ আছি। কি যে হইয়াছিল রাধিকার, একবিন্দু আপত্তি পর্যন্ত করে নাই। দিন কয়েক পরেই সে শিবপদর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ লইয়া শম্ভুর তাঁবুতে আসিয়া উঠিয়াছিল। চোখের জলে শিবপদর বুক

ভাসিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে রাধিকার মমতা হওয়া দূরে থাক, লজ্জা হওয়া দূরে থাক, ঘৃণায় বীতরাগে তাহার অন্তর রি-রি করিয়া উঠিয়াছিল। রাধিকার মা-বাপ, গ্রামের সকলে তাহাকে ছি-ছি করিয়াছিল, কিন্তু রাধিকা সে গ্রাহ্যই করে নাই।

সেই রাধিকার আনিত শিবপদর অর্থেই শম্ভুর এই তাঁবু ও খেলার জন্য সরঞ্জাম কেনা হইয়াছিল। সে অর্থ আজ নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, দুঃখেই দিন চলে আজকাল ; শম্ভু যাহা রোজগার করে, সবই নেশায় উড়াইয়া দেয়, কিন্তু রাধিকা একটি দিনের জন্য দুঃখ করে নাই। আর বেইমান কিনা এই কথা বলিল? সে একটা মদের বোতল বাহির করিয়া বসিল।

ও দিকে নূতন তাঁবুতে আবার বাজনা বাজিতেছে। দোসরা দফার খেলা আরম্ভ হইবে। মদ খাইয়া রাধিকা হিংস্র হইয়া উঠিয়াছিল, ওই বাজনার শব্দে তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন জ্বালা করিয়া উঠিল। উহাদের তাঁবুতে নিশীথ রাত্রে আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়?

সহসা তাহাদের তাঁবুর বাহিরে শম্ভুর ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে মত্ততার উপর উত্তেজিত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল শম্ভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিষ্টো। তাহার পরনে ঝকঝকে সাজ-পোশাক, চোখ রাঙা, সে-ই তখন কথা বলিতেছিল, কেনে, ইথে দোষটা কি হল? তুমরা বসে রইছ, আমাগোর খেলা হচ্ছে! খেলা দেখবার নেওতা দিলাম, তা দোষটা কি হল?

শম্ভু চীৎকার করিয়া উঠিল, খেল দেখাবেন খেলোয়াড়ী আমার! অপমান করতে আসছিস তু আমায়!

কিষ্টো কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই উত্তেজিত রাধিকা একটা ইট কুড়াইয়া লইয়া সজোরে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া বসিল। অব্যর্থ লক্ষ্য, কিন্তু কিষ্টো অদ্ভুত, সে বলের মত লুফিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর ইটটাকে লুফিতে লুফিতে চলিয়া গেল। বিস্ময়ে রাধিকা সামান্য কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল, সে ঘোর কাটিতেই সে বর্ধিত উত্তেজনায় আবার একটা ইট কুড়াইয়া লইল ; শম্ভু তাহাকে নিবৃত্ত করিল। সে সাদরে তাহার হাত ধরিয়া তাঁবুর মধ্যে লইয়া গেল। রাধিকা বিপুল আবেগে শম্ভুর গলা জড়াইয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

শম্ভু বলিল, এই মেলার বাদেই বাঘ কিনে লিয়ে আসব।

ওদিকের তাঁবু হইতে কিষ্টোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, খোল কানাত, ফেলে দে খুল্যে।

তাঁবুর একটা ছোঁড়া ফাঁক দিয়া রাধিকা দেখিল, তাঁবুর কানাত খুলিয়া দিতেছে, অর্থাৎ ভিতরে না গেলেও তাহারা যেন দেখিতে বাধ্য হয়। সে ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিল, দিব আগুন ধরাইয়া তাঁবুতে।

শম্ভু গম্ভীর হইয়া ভাবিতেছিল। কিষ্টো চলন্ত ঘোড়ার পিঠে দাঁড়াইয়া কসরত দেখাইতেছে। রাধিকা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নতুন খেলা কিছু বার কর তুমি, নইলে বদনামী হবে, কেউ দেখবে না খেলা আমাগোর!

শম্ভু দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, পুলিসে ধরাইয়া দিব শালাকে। মদের সন্ধান দিয়া দিব।

ওদিকে টিয়া পাখীতে কামান দাগিল, সেই মেয়েটা তারের ওপর ছাতা মাথায় দিয়া নাচিল, বাঘটার সহিত কিষ্টো লড়াই করিল, ইঃ—একটা থাবা বসাইয়া দিল বাঘটা!

রাধিকা আপনাদের খেলার দৈন্যের কথা ভাবিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্রোশেও ফুলিতেছিল। তাঁবুটা আগুন ধরিয়া ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া যায়! কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে কেমন হয়? পরদিন সকালে উঠিতে রাধিকার একটু দেরী হইয়া গিয়াছিল ; উঠিয়া দেখিল, শম্ভু নাই ; সে বোধ হয় দুই-চারি জন মজুরের সন্ধানে গ্রামে গিয়াছে। বাহিরে আসিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। কিষ্টোর তাঁবুর চারিপাশে পুলিস দাঁড়াইয়া আছে। দুয়ারে একজন দারোগা বসিয়া আছেন। এ কি? সে সটান গিয়া দারোগার সামনে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন, ডাক সব, আমরা তাঁবু দেখব।

আবার সেলাম করিয়া বেদেনী বলিল, কি কসুর করলাম হুজুর?

মদ আছে কি-না দেখব আমরা। ডাক বেটাছেলেদের। এইখান থেকেই ডাক।

রাধিকা বুঝিল, দারোগা তাহাকে এই তাঁবুরই লোক ভাবিয়াছেন ; কিন্তু সে আর তাহার ভুল ভাঙ্গাইল না। সে বলিল, ভিতরে আমার কচি ছেলে রইছে হুজুর—।

আচ্ছা, ছেলে নিয়ে আসতে পার তুমি। আর ডেকে দাও পুরুষদের।

রাধিকা দ্রুত তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই দেখা জায়গাটার আলগা মাটি সরাইয়া দেখিল, তিনটা বোতল তখনো মজুত রহিয়াছে। সে একখানা কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বোতল তিনটাকে পুরিয়া ফেলিল এবং সুকৌশলে এমন করিয়া বুকে ধরিল যে, শীতের দিনে সযত্নে বস্ত্রাবৃত অত্যন্ত কচি শিশু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। তাঁবুর মধ্যেই কিষ্টো অঘোরে ঘুমাইতেছিল, পায়ের ঠেলা দিয়া রাধিকা বলিল, পুলিস আইছে, বসে রইছে দুয়ারে, উঠ্যা যাও।

সে অকম্পিত সংযত পদক্ষেপে স্তন্যদানরত মাতার মত শিশুকে যেন বুকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল! তাহার পিছনে পিছনেই কিষ্টো আসিয়া দারোগার সম্মুখে দাঁড়াইল।

দারোগা প্রশ্ন করিলেন, এ তাঁবু তোমার?

সেলাম করিয়া কিষ্টো বলিল, জী, হুজুর।

দেখব তাঁবু আমরা, মদ আছে কিনা দেখব।

মেলার ভিড়ের মধ্যে শিশুকে বুকে করিয়া বেদেনী ৩তক্ষণে জলরাশির মধ্যে জলবিন্দুর মত মিশিয়া গিয়াছে।

শম্ভু গুম হইয়া বসিয়া ছিল, রাধিকা উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। শম্ভু তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শম্ভু ফিরিয়া আসিতে বিপুল কৌতুকে সে হাসিয়া পুলিসকে ঠকানোর বৃত্তান্ত বলি[illegible] [illegible] গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল, ভেল্কি লাগায়ে দিছি দারোগার চোখে।

শম্ভু কঠিন আক্রোশ-ভরা দৃষ্টিতে রাধিকার দিকে চাহিয়া রহিল। রাধিকার সে দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না, সে হাসিয়া বলিল, খাবা, ছেলে খাবা?

শম্ভু অতর্কিতে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া নির্মমভাবে প্রহার করিয়া বলিল, সব মাটি করে দিছিস তু; উয়াকে আমি জেহেলে দিবার লাগি পুলিসে বলে এলাম, আর তু করে এলি এই কাণ্ড!

রাধিকা প্রথমটায় ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শম্ভুর কথা সমস্তটা শুনিয়াই তাহার মনে পড়িয়া গেল গত রাত্রির কথা। সত্যই, এ কথা তো বলিয়াছিল! সে আর প্রতিবাদ করিল না, নীরবে শম্ভুর সমস্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

•

আজ অপরাহ্ণ হইতে এই তাঁবুতে খেলা আরম্ভ হইবে।

শম্ভু আপনার জীর্ণ পোশাকটি বাহির করিয়া পরিয়াছে, একটা [illegible] রঙের চোঙের মত সরু প্যাণ্টালুন, আর-একটা কাল রঙেরই খাটো হাতা কোট। রাধিকার পরনে পুরানো রঙিন ঘাঘরা আর অত্যন্ত পুরানো একটা ফুল-হাতা বডিস। অন্য সময় মাথার চুল সে বেণী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দিত, কিন্তু আজ সে বেণীই বাঁধিল না, আপনাদের সকল প্রকার দীনতা ও জীর্ণতার প্রতি অবজ্ঞার ক্ষোভে তাহার যেন লজ্জায় মরিতে ইচ্ছা হইতেছিল। উহাদের তাঁবুতে কিষ্টোর সেই বিড়ালীর মত গাল-মোটা, স্থবিরার মত স্থূলাঙ্গী মেয়েটা পরিয়াছে গেঞ্জির মত টাইট পাজামা, জামা, তাহার উপর জরিদার সবুজ সাটিনের একটি জাঙ্গিয়া ও কাঁচুলি ঢঙের বডিস। কুৎসিত মেয়েটাকে যেন সুন্দর দেখাইতেছে। উহাদের জয়ঢাকটার বাজনার মধ্যে কাঁসাপিতলের বাসনের আওয়াজের মত একটা রেশ শেষকালে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। আর এই কতকালের পুরানো একটা ড্যাবডেবে জয়ঢাক, ছি!

কিন্তু তবুও সে প্রাণপণে চেষ্টা করে, জোরে করতাল পেটে।

শম্ভু বাজনা থামাইয়া হাঁকিল, ও—ই ব—ড় বা—ঘ!

রাধিকা রুদ্ধস্বর কোনোমতে সাফ করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বড় বাঘ কি করে?

শম্ভু খুব উৎসাহ ভরেই বলিল, পক্ষীরাজ ঘোড়া হয়, মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মানুষের মাথা মুখে ভরে, চিবায় না।

সে এবার লাফ দিয়া নামিয়া ভিতরে গিয়া বাঘটাকে খোঁচা দিল, জীর্ণ বৃদ্ধ বনচারী হিংস্রক আর্তনাদের মত গর্জন করিল। সঙ্গে সঙ্গে ও-তাঁবুর ভিতর হইতে সবল পশুর তরুণ হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জন ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মাচার উপরে রাধিকা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার শরীর যেন ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল।

ক্রূর হিংসা-ভরা দৃষ্টিতে সে ওই তাঁবুর মাচানের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিষ্টো হাসিতেছে। রাধিকার সহিত চোখাচোখি হইতেই সে হাঁকিল, ফিন একবার।

ও-তাঁবুর ভিতর হইতে দ্বিতীয়বার খোঁচা খাইয়া উহাদের বাঘটা এবার প্রবল গর্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। রাধিকার চোখে জ্বলিয়া উঠিল আগুন। জনতা স্রোতের মত কিষ্টোর তাঁবুতে ঢুকিল।

শম্ভুর তাঁবুতে অল্প কয়েকটি লোক সস্তায় আমোদ দেখিবার জন্য ঢুকিল। খেলা শেষ করিয়া মাত্র কয়েক আনা পয়সা হাতে শম্ভু হিংস্র মুখ ভীষণ করিয়া বসিয়া রহিল। রাধিকা দ্রুত পদে মেলার মধ্যে বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে ফিরিল একটা কিসের টিন লইয়া।

শম্ভু বিরক্তি সত্ত্বেও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কি উটা?

কেরাচিনি। আগুন লাগায়ে দিব উহাদের তাঁবুতে। পুরা পেলুম নাই, দুসের কম রইছে। তাহার চোখ জ্বলিতেছে। শম্ভুর চোখও হিংস্র দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, নিয়ে আয় মদ।

মদ খাইতে খাইতে রাধিকা বলিল, দাউ-দাউ করে জ্বলবেক যখন!

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে অন্ধকারের মধ্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, ওই তাঁবুতে তখনো খেলা চলিতেছে। তাঁবুর ছেঁড়া মাথা দিয়া দেখা যাইতেছিল, কিষ্টো দড়িতে ঝুলানো কাঠের লাঠিতে দোল খাইতে খাইতে কসরত দেখাইতেছে, উঃ, একটা ছাড়িয়া আর-একটা ধরিয়া দুলিতে লাগিল। দর্শকেরা করতালি দিতেছে।

শম্ভু তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিল, এখুন লয়, সেই সেই—নিষুত রাতে!

তাহারা আবার মদ লইয়া বসিল।

সমস্ত মেলাটা শান্ত স্তব্ধ; অন্ধকারে সব ভরিয়া উঠিয়াছে; বেদেনী ধীরে ধীরে উঠিল, এক মুহূর্তের জন্য তাহার চোখে ঘুম আসে নাই।

বুকের মধ্যে একটা অস্থিরতায়, মনের একটা দুর্দান্ত জ্বালায় সে অহরহ যেন পীড়িত হইতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। গাঢ় অন্ধকার থমথম করিতেছে। সমস্ত নিস্তব্ধ। সে খানিকটা এ দিক হইতে ও দিক পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিল, কেহ কোথাও জাগিয়া নাই। সে আসিয়া তাঁবুতে ঢুকিল, ফস করিয়া একটা দেশলাই জ্বালিল, ওই কেরোসিনের টিনটা রহিয়াছে। তারপর শম্ভুকে ডাকিতে গিয়া দেখিল, সে শীতে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। তাহার উপর ক্রোধে ঘৃণায় রাধিকার মন ছি-ছি করিয়া উঠিল। অপমান ভুলিয়া গিয়াছে, ঘুম আসিয়াছে। সে শম্ভুকে ডাকিল না, দেশলাইটা চুলের খোঁপায় গুঁজিয়া, টিনটা হাতে লইয়া একাই বাহির হইয়া গেল।

ওই পিছন দিক হইতে দিতে হইবে। ও দিকটা সমস্ত পুড়িয়া তবে এ দিকে মেলাটার লোকে আলোর শিখা দেখিতে পাইবে। ক্রূর হিংস্র সাপিনীর মতই সে অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া শনশন করিয়া চলিয়াছিল। পিছনে আসিয়া টিনটা নামাইয়া সে হাঁপাইতে আরম্ভ করিল। চুপ করিয়া বসিয়া সে খানিকটা বিশ্রাম করিয়া লইল। বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাঁবুর ভিতরটা একবার দেখিয়া লইবার জন্য সে কানাতটা সন্তর্পণে ঠেলিয়া বুক পাতিয়া মাথাটা গলাইয়া দিল। সমস্ত তাঁবুটা অন্ধকার। সরীসৃপের মত বুকে হাঁটিয়া বেদেনী ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। খোঁপার ভিতর হইতে দেশলাইটা বাহির করিয়া ফস করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিল।

তাহার কাছেই এই যে কিষ্টো একটা অসুরের মত পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। রাধিকার হাতের কাঠিটা জ্বলিতে লাগিল, কিষ্টোর কঠিন সুশ্রী মুখে কি সাহস! উঃ, বুকখানা কি চওড়া, হাতের পেশীগুলো কি নিটোল! তাহার আশেপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ—ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কিষ্টো নাচিয়া ফেরে। ওই যে কাঁধে সদ্য ক্ষতচিহ্নটা—ওই দুর্দান্ত সবল বাঘটার নখের চিহ্ন! দেশলাইটা নিবিয়া গেল।

রাধিকার বুকের মধ্যটা তোলপাড় করিয়া উঠিল, যেমন করিয়াছিল শম্ভুকে প্রথম দিন দেখিয়া। না, আজিকার আলোড়ন তাহার চেয়েও প্রবল। উন্মত্ত বেদেনী মুহূর্তে যাহা কবিয়া বসিল, তাহা স্বপ্নের অতীত। সে উন্মত্ত আবেগে কিষ্টোর সবল বুকের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

কিষ্টো জাগিয়া উঠিল, কিন্তু চমকাইল না, ক্ষীণ নারীতনুখানি সবল আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিল, কে? রাধি—

তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া রাধিকা বলিল, হাঁ, চুপ।

কিষ্টো চুমোয় চুমোয় মুখ ভরিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়াও, মদ আনি।

না। চল, উঠ, এখুনি ইখান থেক্যে পালাই চল।

রাধিকা অন্ধকারের মধ্যে হাঁপাইতেছিল। কিষ্টো বলিল, কুথা?

হু-ই, দেশান্তরে।

দেশান্তরে? ই তাঁবু-টাবু—?

—থাক পর‍্যা। উ ওই শম্ভু লিবে। তুমি উহার রাধিকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না?

সে নিম্নস্বরে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উন্মত্ত বেদিয়া—তাহার উপর দুরন্ত যৌবন—কিষ্টো দ্বিধা করিল না, বলিল, চল।

চলিতে গিয়া রাধিকা থামিল, বলিল, দাঁড়াও।

সে কেরোসিনের টিনটা শম্ভুর তাঁবুর উপর ঢালিয়া দিয়া মাঠের ঘাসের উপর ছড়া দিয়া চলিতে চলিতে বলিল, চল।

টিনটা শেষ হইতেই সে দেশলাই জ্বালিয়া কেরোসিনসিক্ত ঘাসে আগুন ধরাইয়া দিল। খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, মরুক বুড়া পুড়্যা।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

উল্কার আলো

এ গল্পের নামকরণ ভুল হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত পড়িবার ধৈর্য যাঁহার আছে, তিনিই এ কথা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার সে ধৈর্য নাই, তাঁহাকে গোড়াতেই জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে ইহার নাম হওয়া উচিত—'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং'; কিংবা 'পুরুষস্য ভাগ্যং'; অথবা 'দেবা ন জানন্তি'—। বম্বে ফিল্মের মত শুনাইতেছে, কি করিব, আমি নাচার।

গল্পের শীর্ষদেশে একটা নাম জুড়িয়া দিবার প্রথা কোন্ অর্বাচীন আবিষ্কার করিয়াছিল? গল্পের আখ্যানবস্তুর সহিত ঐ শিরোনামার একটি অর্থগত সংযোগ থাকিবারই বা আবশ্যকতা কি? 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনী'র পরিবর্তে বইখানার নাম 'বিরূপাক্ষের বীরত্ব' হইলেই বা পৃথিবীর কি অনিষ্ট হইত? 'যোগাযোগ' যদি 'তিন পুরুষ'ই থাকিত, তাহা হইলে কি সৃষ্টি রসাতলে যাইত? বর্তমান লেখকের একটা নাম আছে কিন্তু নামের সঙ্গে মানুষটার একটুও সাদৃশ্য নাই। তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? What's in a name?

এ সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর আপনারা দিতে পারিবেন না, অতএব সেজন্য অপেক্ষা করিয়া আপনাদের অপ্রতিভ করিব না। তৎপরিবর্তে যে নিদারুণ সংবাদটি দিয়া আপনাদিগকে সচকিত করিয়া তুলিবার অভিলাষ করিয়াছি, তাহা এই—সুনীলা ওরফে বিল্লুর বয়স এখন সতেরো বৎসর; এবং তাহার মত ফাজিল, চপল ও হৃদয়হীনা যুবতী আমি আজ পর্যন্ত দেখি নাই। অনুরূপকে সে—

কিন্তু সব কথাই শুরু হইতে বলা কর্তব্য। কবিবর বলিয়াছেন, আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো—বাবারও বাবা আছে; অন্তত: থাকিলে ভাল হয়।

এই বিল্লুর বয়স যখন আট বৎসর ছিল তখন তাহার কাঁচা রকম একটা বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। নিতান্তই হাসিঠাট্টার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সম্বন্ধ ভ্রূণ অবস্থাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল। বিল্লুর বাবা প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বেহারীবাবু সদরে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পঞ্চদশ বর্ষীয় বিজয়লালের সহিত স্থানীয় বড় উকিল নিমাইবাবুর পুত্র অনুরূপচন্দ্রের বেজায় বন্ধুত্ব

জন্মিয়া গিয়াছিল। এইসূত্রে অনুরূপ প্রায়ই বিল্লুদের বাড়ি যাইত। এমন কি শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব এমনই গাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে স্কুলে এবং স্কুলের বাহিরে এই দুটিকে কদাপি পৃথক অবস্থায় দেখা যাইত না। বিজয়কে বাড়িতে না পাইলে সকলে বুঝিত, সে অনুরূপের বাড়িতে আছে এবং অনুরূপকে বাড়িতে না পাওয়া গেলেও—তথৈবচ।

হুঁ। পাঠক ভাবিতেছেন—কিন্তু তাহা ভুল। বরঞ্চ ঠিক তাহার উল্টা। বন্ধু-ভগিনীর অত্যাচারে অনুরূপের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছিল। পাতলা মুখের উপর বড় বড় বিস্ফারিত দুইটি চোখ, লাল টুকটুকে দুইখানি ঠোঁট—বিল্লুকে দেখিয়া সহসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না যে, তাহার ঐ আটবছরের ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে এতপ্রকার দুষ্ট বুদ্ধি সঞ্চিত হইয়া আছে, বয়োজ্যেষ্ঠদেরও তাহাকে আঁটিয়া উঠিবার জো নাই। অনুরূপ এক সময় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভাবিত, জ্বালাতন করিবার এমন অপরিসীম শক্তি এই ক্ষুদে মেয়েটা কোথা হইতে লাভ করিল? নেহাৎ বন্ধু-ভগিনী বলিয়াই সে নীরবে সহ্য করিয়া যাইত, নচেৎ—

কাল্পনিক প্রতিহিংসা-বিলাসে দাঁত কড়মড় করিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হইত।

প্রথম দিন বন্ধুর গৃহে পদার্পণ করিবামাত্রই বিল্লু কর্তৃক অনুরূপের নির্যাতন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। বড় বড় চোখে কিছুক্ষণ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বিল্লু গম্ভীর-ভাবে তাহার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি বুঝি দাদার একটা বন্ধু? দাদা সব জায়গায় তোমার মত একটা বন্ধু করে। তোমার নাম কি?'

অনুরূপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজের ডাকনামটা বলিয়া ফেলিয়াছিল।

নাম শুনিয়া বিল্লু নাক সিঁটকাইয়া বলিয়াছিল, 'নাকু? এ রাম! বিচ্ছিরি নাম। আমার নাম বিল্লু—ভাল নাম সুনীলা। তোমার চুল অমন খোঁচা-খোঁচা কেন?'

প্রশ্নের উত্তর দিকে দেরি হইতেছে দেখিয়া বিল্লু অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল, 'তুমি কান নাড়তে পারো—না? হাঁ পারো। অত বড় বড় কান নাড়তে পারো না? নিশ্চয় পারো। একটু নাড়ো না দেখি।' বলিয়া ঘাড় হেলাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে তাহার কানের দিকে তাকাইয়াছিল।

অনুরূপ কান নাড়িতে পারে নাই, কেবল উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় দুটা অতিরিক্ত মাত্রায় লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

এইভাবে আরম্ভ হইয়া চক্রবৃদ্ধি হারে বিল্লুর অমানুষিক উৎপীড়ন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহার আনুপূর্বিক ইতিহাস লিখিয়া পৃথিবীর দুঃখভার আর বাড়াইব না, দুই একটা ছোটখাটো উদাহরণ দিয়া এই নৃশংসতার চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিব।

বিজয় ও অনুরূপ দুই বন্ধুতে মিলিয়া একত্র একটা ফটোগ্রাফ তোলাইয়াছিল। ছবিটি বিজয়ের পড়িবার টেবিলের উপর সযত্নে সাজানো ছিল। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া বিজয় দেখিল, ছবি হইতে অনুরূপের মুণ্ডটি কে সাবধানে কাঁচি দিয়া কাটিয়া লইয়াছে এবং তৎপরিবর্তে সচিত্র রামায়ণ হইতে হনুমানের মাথাটি কর্তিত করিয়া সেই স্থানে জুড়িয়া দিয়াছে। এ কাহার কার্য, তাহা বুঝিতে বিজয়ের বিলম্ব হইল না। বন্ধুর প্রতি এই অপমানে সে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বিল্লুর চুলের বিনুনি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া সগর্জনে কহিল, 'এ কি করেছিস?'

বিল্লু ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'আমি জানি না!'

'জানি না? রাক্ষুসী কোথাকার! শীগ্‌গির আসল মুণ্ডটা দে।'

'আমি জানি না! আসল মুণ্ডুটা তো রয়েছে—' বলিয়া বিল্লু খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, এই আট বৎসর বয়সেই বিল্লু মেয়েটি কিরূপ পরিপক্ক ও ফাজিল হইয়া উঠিয়াছে।

বিজয় তর্জন করিয়া বলিল, 'দিবিনে আসল মুণ্ড? দে বল্‌ছি—'

'দেব না, যাও।'

এমন সময় অনুরূপ আসিয়া উপস্থিত হইল। ছবিতে নিজের মুখাবয়বের শোচনীয় পরিবর্তন দেখিয়া সেও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হইল; কিন্তু অনেক ধস্তাধস্তি করিয়াও দুই বন্ধুতে বিল্লুর

নিকট হইতে অনুরূপের আসল মুণ্ড আদায় করিতে পারিল না। শেষ পর্যন্ত অত আদরের ছবিটা ফেলিয়া দিতে হইল।

বলা বাহুল্য, সে মুণ্ড আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিল্লু সে মুণ্ড লইয়া কি করিল? এ প্রশ্নের উত্তর আছে—পাঠক খুঁজিয়া দেখুন।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল আর একদিন সকালবেলা। অনুরূপ বিজয়ের পড়িবার ঘরে একাকী বসিয়া অঙ্ক কষিতেছিল এমন সময় বিল্লু আসিয়া পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদরের সুরে বলিল, 'নাকুদা—'

নিরুৎসুকভাবে নিজের কণ্ঠ বাহুমুক্ত করিয়া লইয়া অনুরূপ বলিল, 'কি?'

বিল্লু ভাসা ভাসা ডাগর চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, 'আমায় দুটো ফুল পেড়ে দেবে, ভাই?'

সন্দিগ্ধভাবে অনুরূপ বলিল, 'কি ফুল?'

'চাঁপা ফুল। ফটকের পাশে ঐ বড় গাছটায় অনেক ফুটেছে। পেড়ে দাও না—খেলাঘরের শিবপূজা করব।'

'আমি এখন পারব না—অঙ্ক কষছি। মালীকে বলগে যাও।'

'মালী দিচ্ছে না।—তুমি চল না, নাকুদা, লক্ষ্মীটি। তুমি খুব গাছে চড়তে পার—তোমার মত কেউ পাবে না।'

অনুরূপের সন্দেহ দূর হইল না; কিন্তু এতখানি কৈতববাদ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না। সে বলিল, 'আচ্ছা, চল।'

গাছের কাছে উপস্থিত হইয়া সে একবার ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইল, কোনও বিপদের আশঙ্কা আছে কিনা। তারপর গাছে চড়িতে প্রবৃত্ত হইল।

বিল্লু গাছের শীর্ষদেশ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিল, 'ঐখানে অনেক ফুল আছে, নাকুদা—একেবারে আগায়।'

গাছের ডগা পর্যন্ত অসন্দিগ্ধ-চিত্তে উঠিয়া হঠাৎ অনুরূপ বুঝিতে পারিল কি সাংঘাতিক ফাঁদে সে পা দিয়াছে। সে একটি চীৎকার ছাড়িয়া যথাসম্ভব দ্রুত নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল, 'পোড়ারমুখী বাঁদরী, দাঁড়া, আজ তোকে মজা দেখাচ্ছি।' গাছের অর্ধেক নামিয়া সেখান হইতেই সে মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু বিল্লু তখন উচ্চকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে গ্রীবাভঙ্গে পিছু ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে হরিণশিশুর মত ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

অনুরূপ সেখানেই বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে সর্বাঙ্গ চুলকাইতে লাগিল। কিন্তু তখন শত শত মধুপিঙ্গলবর্ণ বিষধর কাঠ-পিঁপড়া তাহার সারাদেহে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অনুরূপ তাহার গায়ের জামাটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু কেবল জামা খুলিলে কি হইবে? একটু ইতস্ততঃ করিয়া, শেষে গায়ের জ্বালায় অস্থির হইয়া সে একটা যুঁই ফুলের ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং সেখানে বসিয়া নগ্নদেহে বিষাক্ত অন্তঃকরণে প্রাণপণে গা চুলকাইতে লাগিল।

বন্ধু বিজয় আসিয়া যখন তাহাকে উদ্ধার করিল, তখন তাহার সর্বাঙ্গ ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। নূতন কাপড় পরিতে পরিতে অনুরূপ হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আর কখ্‌খনো তোদের বাড়ি আসব না, বিজয়। ঐ বিল্লুটা যতদিন—' বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে হনহন করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

বিল্লুর দুষ্কৃতির কথা জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। সে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিল, 'গাছে পিঁপড়ে ছিল, আমি কি করে জান্‌ব?' কিন্তু তাহার এ কৈফিয়ত ধোপে টিকিল না, মালীর নিকট হইতে প্রকাশ পাইল যে, বিল্লু দিদি তাহাকেই প্রথমে গাছে চড়িয়া ফুল পাড়িতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু গাছে ভয়ানক কাঠ-পিঁপড়ে আছে বলিয়া মালী রাজী হয় নাই। ইহার পর—

ফলে বিল্লু মা বাবার কাছে বিস্তর তিরস্কার ও বিজয়ের কাছে একটা কিল ও দুইটা চড় খাইল। বিল্লু রাত্রিতে তাহার বিবাহিতা দিদি অনিলার কাছে শয়ন করিত। অনিলা শুইতে গিয়া বিল্লুকে বলিল, 'তুই যে নাকুর ওপর অত উৎপাত করিস, ওর সঙ্গে আমরা তোর বিয়ের সম্বন্ধ করেছি, তা জানিস? ও যখন উল্টে তোর ওপর শোধ তুলবে, তখন কি করবি?'

বিল্লু ঘৃণাভরে দুই আঙ্গুল দিয়া নাক টিপিয়া ধরিয়া বলিল, 'এ রাম—ওকে আমি বিয়ে করব না। খরগোসের মত কান, চুল খোঁচা-খোঁচা—ওরকম বর আমি চাই না।'

'চাই না বললেই তো আর হবে না—ওকেই বিয়ে করতে হবে। নইলে তুই জব্দ হবি না—ও প্রত্যেকবার ক্লাসে ফার্স্ট হয় জানিস?'

'হোগ্‌গে। ঐটুকু ছেলেকে আমি বিয়ে করব না।'

'আ গেল। তোর কি এক্ষুণি বিয়ে হচ্ছে নাকি? তোরা বড় হবি, তখন বিয়ে হবে।'

বিল্লু দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'ওকে আমি বড় হয়েও বিয়ে করব না। ও-রকম বর আমার একটুও পছন্দ হয় না।'

বিল্লুর পাকা কথায় সকলেই অভ্যস্ত ছিল, অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে তোমার কি রকম পছন্দ শুনি?'

বিল্লু তৎক্ষণাৎ বলিল, 'কেন জামাইবাবুর মত—ঐ রকম লম্বা ফর্সা—চোখে চশমা।'

তাহার পিঠে একটা চড় মারিয়া অনিলা বলিল, 'ও! লোকটিকে বড্ডই মনে ধরেছে দেখছি! আচ্ছা দাঁড়াও, তাঁকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, তিনি এসে তোমাকে নিয়ে যান—তুমিই গিয়ে তাঁর কাছে থাকো। আমি না হয় এখানে পড়ে থাকব। সতীনের ঘর করা আমার পোষাবে না। তাও যেমন তেমন সতীন নয়—তোমার মত সতীন—'

পরিহাসচ্ছলে উক্ত হইলেও আসলে অনিলার কথাটা সত্য। সুন্দরী কন্যা দেখিলেই পুত্রবতী বাঙ্গালী-গৃহিণীর তাহাকে পুত্রবধূ করিবার ইচ্ছা হয়—অনুরূপের মাতারও তাহা হইয়াছিল। দুই পরিবারে বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া যাইবার পর অনুরূপের মা বিল্লুদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, 'বিল্লুর মত একটি মেয়ে পাই—আমার বৌ করি।'

বিল্লুর মা উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'বিল্লুর মত দরকার কি ভাই,—বিল্লুকেই নাও না!'

সেই অবধি দুই গৃহিণীর মধ্যে বেয়ান সম্পর্ক পাতানো হইয়া গিয়াছিল; যদিও কর্তারা এই মেয়েলি ব্যাপার শুনিয়া নিজের মধ্যে হাসাহাসি করিয়া বলিয়াছিলেন, 'একেই বলে গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল! মেয়ের বয়স আট বছর, ছেলের পনেরো—এরি মধ্যে বিয়ের কথা! আরে, বড় হোক, বেঁচে থাক, তার পর দেখা যাবে। সাধে কি আর মেয়েদের দশহাত কাপড়ে—'

অনুরূপও হাসিঠাট্টার সূত্রে বৌদিদিদের কাছে কথাটা শুনিয়াছিল। উত্তরে সে মনে মনে প্রকাণ্ড একটা 'হু' বলিয়াছিল। বিল্লুকে বিবাহ করার চেয়ে এক লক্ষ মাছি, মশা, বোলতা ও কাঠ-পিঁপড়াকে বিবাহ করা যে ঢের বেশি বুদ্ধিমানের কাজ এ কথা সে প্রকাশ করিয়া না বলিলেও তাহার মনের ভাব কাহারও নিকটে অগোচর ছিল না।

তারপর একদিন হঠাৎ কি কারণে বেহারীবাবু বদলী হইয়া অন্য জেলায় চলিয়া গেলেন। বিজয় ও অনুরূপ কিছুদিন সজোরে পত্রবিনিময় চালাইল। কিন্তু দূরত্বের প্রভাবে ক্রমশ অনুরাগের বন্ধন শিথিল হইয়া গেল। উভয় পরিবারও ক্রমে পরস্পরকে প্রায় ভুলিয়া গেলেন। সে আজ প্রায় নয়-দশ বৎসরের কথা।

এই নয়-দশ বৎসরে বহু পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এই প্রাচীনা পৃথিবীর বয়স আরও নয়-দশ বৎসর বাড়িয়াছে। যাহারা কিশোর ছিল তাহারা যুবক হইয়া পড়িয়াছে, অনেক বৃদ্ধ বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছে; ততোধিক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে,—এবং আরও অনেক প্রকার বিচিত্র দার্শনিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে।

বেহারীবাবু জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া পুরাতন শহরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অনুরূপ এখানকার পড়া শেষ করিয়া বিলাত গিয়াছিল, সেখান হইতে কি একটা পাস করিয়া রেলের কভেনাণ্টেড চাকরি লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। উপস্থিত বাড়িতেই আছে, মাস-খানেকের মধ্যে টুণ্ডলার অফিসে যোগ দিতে হইবে। তাহার চুল এখনও খোঁচা-খোঁচাই আজ বটে, কিন্তু ততটা নহে; কান দুইটিও বোধ করি শরীবের অনুপাতে বাড়ে নাই বলিয়া এখন আর তত বড় দেখায় না। ওদিকে সুনীলা ওরফে বিল্লুর বয়স এখন সতেরো বৎসর এবং তাহার মত ফাজিল, চপল, হৃদয়হীনা যুবতী—

সর্বাপেক্ষা বেশি পরিবর্তন ঘটিয়াছে কিন্তু বেহারীবাবুর পারিবারিক জীবনে। যত দিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ততদিন তিনি সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মতই পুরাতন প্রথায় জীবন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই হঠাৎ পুরাদস্তুর সাহেব বনিয়া গিয়াছেন। আগে কেবল তাঁহার অফিস-রুম ছিল, এখন উপরন্তু ড্রয়িং-রুম হইয়াছে। মৈথিলী পাচক নির্বাসিত হইয়া বাবুর্চি নিযুক্ত হইয়াছে—টেবিলে বসিয়া সপরিবারে খানা ভোজন করেন। ম্যাজিস্ট্রেট-গৃহিণী বেড়াইতে বাহির হইলে কোঁচানো শাড়ি ও হাই-হিল জুতা পরেন। পর্দা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। কন্যা বিল্লু ম্যাট্রিক পাস করিয়া উপস্থিত টেনিস ও বৃজ্ খেলিতেছে। বিজয় একটি ব্রাহ্ম মেয়েকে বিবাহ করিয়া বাপের সহিত পৃথক হইয়া স্বাধীনভাবে পুরুলিয়ায় ওকালতি করিতেছে। ছুটি-ছাটায় সস্ত্রীক বাপের কাছে আসে, দুই-চার দিন থাকিয়া আবার সস্ত্রীক চলিয়া যায়।

অনুরূপ বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিবার দিন পাঁচ-ছয় পরে তাহার মা বলিলেন, ওরে, বেহারীবাবুকে মনে আছে তো?—তোর বন্ধু বিজয়ের বাবা? তিনি যে জেলার কর্তা হয়ে বসেছেন।'

তিন বৎসর পড়ে বাড়ি ফিরিয়া এ কয়দিন অনুরূপ পারিবারিক চক্রের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবকাশ পায় নাই, কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তাই নাকি? কদ্দিন এসেছেন?'

'এই তো মাস দুই হবে।'

'তোমাদের সঙ্গে দেখাশুনা হয়েছে?'

'হাঁ, আমরা একদিন গিয়েছিলুম। যদিও এখন ওঁরা পুরোপুরি সাহেব হয়ে গেছেন, তবু আমাদের খুব আদর-যত্ন করলেন। এখনও আগেকার কথা ভোলেননি—তোর একবার যাওয়া উচিত।'

'বেশ তো, যাব। বিজয় কোথায়? এখানেই আছে নাকি?'

'না, সে তো পুরুলিয়ায় ওকালতি করছে।'

অনুরূপ হঠাৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'আর বিল্লু? তার বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে—না?'

'কই আর হয়েছে। এখন কি আর তাঁরা আর বিয়ে দেবেন? মেয়ের যে মোটে সতেরো বছর বয়স।' বলিয়া মা-ও মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সেই দিনই বৈকালে অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাংলায় দেখা করিতে গেল। বাংলার সামনে একটা শান্-বাঁধানো চাতাল ছিল, সেখানে বসিয়া বেহারীবাবু সস্ত্রীক সকন্যা চা-পান করিতেছিলেন। অনুরূপ সেখানে গিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইল।

বেহারীবাবু আরাম-কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া শুইয়াছিলেন, বিস্মিতভাবে ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। গৃহিণী অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া কাপড়টা মাথায় তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন; বিল্লু বিস্ফারিত-দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, 'নাকুদা! মা, চিনতে পারছ না? দাদার বন্ধু, নাকুদা—মনে নেই?' বলিয়া আবার সেই নিতান্ত পরিচিত, কৈশোরের বহু নির্যাতনের স্মৃতি অনুবিদ্ধ হাসি হাসিল।

'ওমা, তাই তো! চিনতে পারিনি—কতদিন পরে দেখলুম! এস বাবা। এই সেদিন বিজয় তোমার কথা বলছিল।—'

'By Jove! Young man, you have grown out of all recognition! Well Well! Very gald to see you! Sit down! Sit down!

অনুরূপ একটি চেয়ার টানিয়া বসিল। বিল্লু এক পেয়ালা চা ঢালিয়া তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'নাকুদা, চা খাও।' তাহার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি। অনুরূপ সচকিত হইয়া ভাবিল, সে কি এখানে আসিয়াই হাস্যকর কিছু করিয়া ফেলিয়াছে? নিজের কথাবার্তার উপর একটা কড়া পাহারা বসিয়া গেল।

নানা রকম কথা হইতে লাগিল; অনুরূপ বিলাতে গিয়া কোথায় ছিল, কি পাস করিয়াছে, কোথায় চাকরি পাইল; বেহারীবাবু কতদিন ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছেন, কোন্ কোন্ জেলা ঘুরিয়াছেন, কমিশনার সাহেব তাঁহার নামে সরকারের কাছে কি কি প্রশংসাসূচক ডি. ও. দিয়াছেন,—এই সব আলোচনার মধ্যে অনুরূপের মনটা কিন্তু বিল্লুর দিকেই সতর্ক হইয়া রহিল। দুই একবার বিল্লুর মুখের উপর চোখ পড়াতে দেখিল, সে তাহারি দিকে তাকাইয়া আছে ও পূর্ববৎ মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। যেন সে

একটা ভারী হাস্যোদ্দীপক জীব,—তাহাকে দেখিলে কিছুতেই না হাসিয়া থাকা যায় না।

অনুরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ এক সময় অন্য কথার মাঝখানে বিল্লু বলিয়া উঠিল, 'মা, দেখেছ, নাকুদার চুল আর আগেকার মত খাড়া-খাড়া নেই—একটু নরম হয়েছে। আচ্ছা, নাকুদা, তুমি ছেলেবেলার মত এখনও তেমনিই বোকা আছ? না বুদ্ধি বেড়েছে?'

অনুরূপ হাসিবার মত মুখ করিয়া বলিল, 'কি জানি। তোমার কি মনে হয়?'

'এখনই কি বলা যায়? আরও দুদিন দেখি।'

'তুই চুপ কর, বিল্লু। আমাদের কি কথা হচ্ছিল।' এইভাবে কন্যাকে মৃদু তিরস্কার করিয়া গৃহিণী আবার ব্যাহত প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

ঘণ্টা দেড়েক পরে অনুরূপ যখন বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন বিল্লু ঠোঁটের একটা সহাস্য ভঙ্গিমা করিয়া বলিল, 'নাকুদা, কাল আবার আসবে তো?'

অনুরূপ তাহার দিকে ফিরিয়া কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসুভাবে তাকাইয়া রহিল, কথাটার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন পরিহাস আছে কিনা, তাহাই যেন নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিল ; তারপর বলিল, 'আসব বৈ কি! যে ক'দিন আছি, রোজই আসব।'

অনুরূপ বাড়ি ফিরিবার পথে ভাবিতে লাগিল, তাহার প্রতি বিল্লুর মনের ভাবটা কি?—বিদ্রূপ? উপহাস? তাচ্ছিল্য?

কিন্তু কেন? ছেলেবেলায় বিল্লু তাহাকেই বিশেষ করিয়া নিজের উৎপাত ও নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যবস্তু করিয়া লইয়াছিল,—এখনও কি তাহার সে ভাব যায় নাই? কিম্বা সকলের সঙ্গেই সে এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে?

সবচেয়ে অনুরূপকে বিঁধিয়াছিল বারবার ঐ 'নাকুদা' সম্বোধনটা ; যেন ঐ নামটা কিরূপ হাস্যকর তাহাই বিল্লু পুনঃ পুনঃ খোঁচা দিয়া দেখাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সত্য বটে, নামটি শ্রুতিসুখকর নয়, কিন্তু তাই বলিয়া সেও কি উপহাসের পাত্র?

অনুরূপ ঈষৎ তিক্ত-মনে ভাবিল, আমাদের মেয়েরা একটু লেখাপড়া শিখিলেই মনে করে, কেহ তাহাদের সহিত কথা কহিবার সমকক্ষ নহে।

কিন্তু—বিল্লু কি অপরূপ সুন্দরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দিকে বেশিক্ষণ তাকাইতে যেন ভয় করে!—অথচ ইহাকেই সে একদিন কিল মারিয়াছে, চড় মারিয়াছে, কান ধরিয়া টানিয়া দিয়াছে, বাঁদরী, পোড়ারমুখী বলিয়াছে—

পাঠক নিশ্চয় এইখানে বিল্লুর একটি রূপ বর্ণনার জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। আমি ধর্মভীরু লোক, রূপ বর্ণনা দিব না, পরের ভাল জিনিসের প্রতি লুব্ধতা সঞ্চার করিয়া নরকে যাইতে পারিব না। আমি শুধু দু'ছত্রে তাহার আজিকার বেশভূষার একটি অসম্পূর্ণ তালিকা দিব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। গায়ে তাহার ছিল গাঢ় সবুজ রঙের হাতকাটা ব্লাউজ, পরিধানে ছিল ঐ রঙেরই সিল্কের শাড়ি, পায়ে ছিল লাল বনাতের স্লিপার, চুলগুলি কি ভাবে জড়ানো ছিল তাহার শিল্পরহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই ; সুতরাং বলিতে পারিলাম না। অলঙ্কার তাহার গায়ে ছিল না বলিলেই হয়—কেবল দু'গাছি সরু সোনার রুলি সুগোল হাতে কেন চাপিয়া বসিয়া গিয়াছিল, আর গলায় ক্ষীণ একটি হার—,তাহার নিম্নপ্রান্তে একটি হীরার লকেট—

আর এই সব বেশভূষা সে তরুণ তনুটিকে আশ্রয় করিয়া ছিল—

ঐ রে! আর একটু হইলেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলাম আর কি!

সে-রাত্রিতে বেহারীবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে কথা হইল। গৃহিণী বলিলেন, অনুরূপের সঙ্গে বিল্লুর বিয়ে হলে মন্দ হয় না। আগেও তো একবার সম্বন্ধ হয়েছিল।'

কর্তা বলিলেন, 'বেশ তো, ওরা আসুক না আমার কাছে, প্রস্তাব করুক—'

'কিন্তু তা কি ওরা করবে! হাজার হোক, ওরা বর পক্ষ। আমাদের দেশে যে উল্‌টো নিয়ম, মেয়ের বাপকেই ছুটোছুটি করতে হয়।'

'কিন্তু তাই বলে আমি তো আর উপযাচক হয়ে যেতে পারি না। বুঝলে না?'

গৃহিণী বুঝিলেন, হাকিমি মর্যাদায় বাধে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'দেখা যাক, আরও দু'দিন আসা যাওয়া করুক। শেষ পর্যন্ত হয়তো নিজেই—বিলেত ফেরত তো।'

কর্তা বলিলেন, 'সে হলে তো কোনও গোলই থাকে না। তার উপর আর একটা কথা আছে। বিল্লুর পছন্দ অপছন্দ জানা দরকার। ও আমার যে রকম মেয়ে! মনে আছে তো, হাজারিবাগের সেই মনুসেফ ছোকরা! তাকে তো হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন সে মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। The heartles little minx!' বলিয়া সস্নেহে হাসিতে লাগিলেন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা অনুরূপ ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে উপস্থিত হইয়া শুনিল—সাহেব ও মেমসাহেব একটা পার্টিতে গিয়াছেন,—কেবল মিসিবাবা বাড়িতে আছেন, উপস্থিত বাগানে বেড়াইতেছেন। অনুরূপ মিসিবাবার সন্ধানে প্রবেশ করিল।

একটা লোহার বেঞ্চির উপর বিল্লু পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিল, তাহার বসিবার ভঙ্গী দেখিয়া অনুরূপের মনে হইল, সে কোলের উপর বই রাখিয়া পড়িতেছে। ছাঁটা ঘাসে ঢাকা লনের উপর দিয়া অনুরূপ নিঃশব্দে তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

বেঞ্চির কাছে পৌঁছিতে যখন আর হাত ছয়-সাত বাকী আছে, তখন বিল্লু হস্তস্থিত জিনিসটা মুখের কাছে তুলিয়া চুম্বন করিল, তারপর সচকিতে কিছুক্ষণ ফিরিয়া চাহিয়াই অনুরূপকে দেখিয়া তড়িদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইরূপ অবস্থায় যে ধরা পড়ে, তাহার যেমন লজ্জার অবধি থাকে না, যে ধরিয়া ফেলে, সেও কম লজ্জা পায় না। অনুরূপ আরক্ত-মুখে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যে লকেটে বিল্লু চুম্বন করিয়াছিল, তাহা তখনও তাহার হাতে ধরা ছিল, সেটা বন্ধ করিয়া বুকের কাপড়ের তলায় চাপা দিয়া বিল্লু শুষ্ক হাসিল, বলিল, 'চুপি চুপি একেবারে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছো যে।' তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসন্তোষ সুস্পষ্ট।

অনুরূপ চুপি চুপি আসে নাই, পায়ের তলায় ঘাস ছিল বলিয়াই বিল্লু তাহার পদশব্দ শুনিতে পায় নাই। কিন্তু সে কৈফিয়ত দিতে যাওয়া বৃথা। হয়তো তাহার গলা-ঝাড়া দিয়া আগমন-বার্তা ঘোষণা করা উচিত ছিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

বিল্লু বলিল, 'এখানেই বসবে, না, ভেতরে যাবে? মা-বাবা পার্টিতে গেছেন।'

অনুরূপ চেষ্টা করিয়া বলিল, 'যেখানে হয়—এখানেই বোসো।'

দুইজনে বেঞ্চিতে বসিল।

কিছুক্ষণ অস্বচ্ছন্দভাবে দুই একটা কথা হইল, তাহার পর বিল্লুর মুখের অপ্রসন্নতা কাটিয়া গেল। সে হাসিয়া বলিল, 'আচ্ছা নাকুদা, বিলেতে থাকতে তুমি ইংরেজ মেয়েদের সঙ্গে মিশতে?'

অনুরূপ সাবধানে বলিল, 'কিছু কিছু মিশেছি।'

বিল্লু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা তোমায় দেখে হাসত না?'

অধর দংশন করিয়া অনুরূপ বলিল, 'না। হাসবে কেন?'

'অমনি' বলিয়া বিল্লু নিজেই জোরে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষুব্ধভাবে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অনুরূপ বলিল, 'আমাকে দেখলেই তোমার হাসি পায়—না?'

'হ্যাঁ— বড্ড।'—বলিয়া হাসির বেগ রোধ করিতে না পারিয়া বিল্লু মুখে রুমাল চাপিয়া ধরিল।

ধীরভাবে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন বলতো?'

'কি জানি—তোমাকে দেখলেই—' কথাটা বিল্লু শেষ করিতে পারিল না।

মিনিট দুই শক্তভাবে বসিয়া থাকিয়া অনুরূপ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আচ্ছা চললুম।'

রুমাল হইতে মুখ তুলিয়া বিল্লু বলিল, 'রাগ হল নাকি?'

'না।'

কয়েক পা যাইবার পর বিল্লু তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল, 'নাকুদা, তুমি বৃজ্ খেলতে জান?'

'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে দাঁড়াইয়া অনুরূপ বলিল, 'জানি সামান্য।'

বিল্লু বলিল, 'গোড়ায় সবাই ঐ কথাই বলে ; তোমারও আবার বিনয় হচ্ছে নাকি?—কাল সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়িতে একটা বৃজ্ পার্টি বসবার কথা আছে। খেলতে জানে এমন দু'জন লোক পাওয়া গেছে—কেবল একজনের অভাব হচ্ছে। তুমি আসতে পারবে?'

উদাসভাবে অনুরূপ বলিল, 'যদি অভাব হয়—আসতে পারি। কিন্তু আমি ভাল খেলতে জানি না—'

হাসি গোপন করিয়া বিল্লু বলিল, 'এসো তাহলে। ঠিক সাতটার সময়!'

রাত্রিতে ঘুমাইয়া অনুরূপ স্বপ্ন দেখিল,—বিল্লু পিছন হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিতেছে, 'নাকুদা, আমায় দুটো ফুল তুলে দেবে ভাই?'

অনুরূপ ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—আট বছরের বিল্লু নহে, সতেরো বছরের বিল্লু। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই—ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

এমন বিশ্রীভাবে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় কেন, কেহ বলিতে পারেন?

পরদিন সন্ধ্যায় অনুরূপ যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দুইজন ভদ্রলোক হাজির আছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইল, দুইজনেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বয়সে তরুণ, বেশ সুপুরুষ। একজনের নাম সমরেশ, অন্যের নাম সুধাংশু। বিল্লু পরিচয় করিয়া দিতে গিয়া বলিল, 'ইনি আমার দাদার ছেলেবেলার বন্ধু—অনুরূপবাবু,—ওঁর একটা ডাকনাম আছে, কিন্তু সে নামটা আর শুনে কাজ নেই।' বলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অনুরূপ লক্ষ্য করিল, এই দুইজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিল্লুর ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তাহাদের দেখিয়া সে হাসিতেছে না, কথার মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচা নাই। বেশ সহজ সম্ভ্রমপূর্ণ বন্ধুত্বের ভাব।

তাস খেলিতে বসিয়া বিল্লু অনুরূপের খেঁড়ী হইল। কিন্তু তবু খেলা জমিল না। খেলিতে খেলিতে অনুরূপ কেবলই ভাবিতে লাগিল, এই দুইজনের মধ্যে কাহার ছবি বিল্লুর বুকের মধ্যে লকেটের ভিতর লুকানো আছে? কে তিনি? সুধাংশু না সমরেশ?

এইরূপ প্রশ্নসঙ্কুল মন লইয়া ভাল বৃজ্ খেলা চলে না। আধ ঘণ্টা পরে বিল্লু তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল, 'নাঃ নাকুদা, তুমি একেবারে কিছু খেলতে জান না।—আসুন তার চেয়ে অন্য কিছু করা যাক।'

অনুরূপ আরক্ত-কর্ণমূলে বলিল, 'আমি তো বলেছিলুম, আমি ভাল জানি না—'

তাহার কথার উত্তর না দিয়া বিল্লু বলিল, 'সুধাংশুবাবু, আপনি তো চমৎকার গাইতে পারেন। চলুন, ও ঘরে অর্গান আছে।'

রসশাস্ত্রের বড় বড় পণ্ডিতরা বলিয়াছেন, করুণ রস বেশি ফেনাইতে নাই ; নিতান্তই যদি জবাই করিবার দরকার হয়, তবে চটপট সে কাজ সারিয়া ফেলাই বিধি। সুতরাং এই পতঙ্গ ও দীপশিখার উপাখ্যান টানিয়া দীর্ঘ করিয়া আর শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিব না।

মোট কথা, অগ্নিশিখার সংস্পর্শে পতঙ্গের পাখা পুড়িয়া গেল, গায়েও সর্বত্র ফোস্কা পড়িল। কিন্তু তবু সে পলাইতে পারিল না এবং মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না—'ওগো দীপ্তিময়ী শিখা, আমি তোমাকে চাই, তুমি আমাকে নিঃশেষে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দাও।' সে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নিয়মিত শিখার কাছে আসিতে লাগিল এবং নীরবে পাখার খানিকটা পুড়াইয়া দহনক্লিষ্ট-দেহে ফিরিয়া যাইতে লাগিল।

এইভাবে একমাস কাটিয়া গেল। অনুরূপের টুণ্ডলায় গিয়া অফিসে যোগ দিবার সময় উপস্থিত হইল।

বিদেশে যাত্রার আগের রাত্রিতে বেহারীবাবুর বাংলায় অনুরূপের নিমন্ত্রণ হইল—বিদায় ভোজ। নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার—আর কেহ নিমন্ত্রিত হয় না, শুধু অনুরূপ!

সন্ধ্যার পর হইতে ড্রয়িং-রুমে বসিয়া চারিজনে অলসভাবে গল্প করিয়া শেষে আহার করিতে গেলেন। তারপর প্রায় নীরবে ডিনার শেষ করিয়া ড্রয়িং-রুমে আসিয়া বসিলেন। অনুষ্ঠানটার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কেমন যেন প্রাণসঞ্চার হইল না, কোন্ অজ্ঞাত কারণে উহা কুণ্ঠিত ও কৃত্রিম হইয়া রহিল।

আহারাদি শেষ হইবার পরই বিল্লু উঠিয়া গিয়াছিল, অনুরূপকে একটা বিদায়সম্ভাষণ করিয়া যাওয়াও প্রয়োজন মনে করে নাই। তাহার এই অবহেলা তাহার মা বাবাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই রাত্রি দশটার সময় অনুরূপ যখন তাঁহাদের পদধূলি লইয়া বিদায় চাহিল, তখন তাহাকে যথারীতি আশীর্বাদ করিয়া গৃহিণী একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন, 'বিল্লুর আজ শরীরটা ভাল নেই, সকাল থেকেই বলছিল। বোধ হয় শুয়ে পড়েছে।'

'থাক্, তাকে বিরক্ত করে কাজ নেই।'

অনুরূপ বাহির হইয়া পড়িল। চন্দ্রহীন রাত্রি—বোধ হয় অমাবস্যা। বাড়ির সদর হইতে কম্পাউণ্ডের ফটক প্রায় একশ' গজ দূরে। অন্ধকারে পরিচিত পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে অনুরূপ ভাবিতে লাগিল—এই একমাস ধরিয়া কি উৎকট পাগলামিই না সে করিয়াছে! বিল্লু আর কাহাকেও ভালবাসে (বোধ হয় তিনি সুধাংশুবাবু), তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াও নিজেকে এমন ভাবে খেলো করিবার কি দরকার ছিল? উঠিতে বসিতে বিল্লু তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, অন্যের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে, সে যে অতিশয় কৃপার পাত্র, তাহা বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করে নাই। তবু সে নির্লজ্জ মূঢ়ের মত লাগিয়াছিল কোন্ দুর্দৈবের প্ররোচনায়? ভাগ্যে তাহার মনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই, নহিলে আরও কত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত, কে জানে? কিন্তু যাক, আজ এই হাস্যকর অভিনয়ের সমাপ্তি হইয়াছে, প্রহসনের শেষ দৃশ্যে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। অভিনয়কালে দর্শকরা আসিয়াছিল বটে, কিন্তু অভিনেতার মনে সুখ ছিল না। এখন সুখ না হোক অন্ততঃ সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে।

ফটক খুলিবার জন্য হাত বাড়াইতেই কাহার হাত হাতে ঠেকিয়া গেল, অনুরূপ চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'কে?'

'নাকুদা নাকি? যাচ্ছ?'—বিল্লুর কণ্ঠস্বর।

অনুরূপ হঠাৎ হাসিয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। এতটা স্বচ্ছন্দ বেপরোয়া ভাব সে অনেক দিন অনুভব করে নাই, যেন মস্ত একটা সংশয়ের বোঝা বুক হইতে নামিয়া গিয়াছে, এমনি ভাবে বলিল, 'হ্যাঁ ভাই, চললুম। কাল বিকেলেই রওনা হতে হবে, কাজেই এ যাত্রা আর বোধ হয় তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে না। ভালই হল, আমি তো ভেবেছিলুম তুমি শুয়ে পড়েছ -'

'না – আমি রোজ এই সময় একটু বেড়াই।'

এতক্ষণে অনুরূপের ঠাহর হইল যে বিল্লু ফটকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে,—অন্ধকারে কৃষ্ণতর একটা ছায়ামাত্র, মুখ চোখ কিছুই দেখা গেল না।

সে বলিল, 'কিন্তু আর বাইরে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। রাত কম হয়নি। এ সময় একটু হিমও পড়ে!'

সে কথায় উত্তর না দিয়া বিল্লু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কর্মস্থল কোথায় বলছিলে? কানপুরে?'

অন্ধকারে অনুরূপ হাসিল, না— তবে কাছাকাছি বটে। টুণ্ডলায়।'

'ও'— কিয়ৎকাল দুইজনেই নীরব।

সহসা অনুরূপ তরল কণ্ঠে বলিল, 'আমি চলে গেলে কিছুদিন তোমার ভারী কষ্ট হবে— না?'

'কষ্ট হবে? কেন?'—তাহার উত্থিত ভ্রূ ঈষৎ বিস্ময়ের ভঙ্গী দেখা না গেলেও বুঝা গেল।

'এমন একটা target— একটা সঙ—আর কি সহজে খুঁজে পাবে? যাকে দেখলেই হাসি পায় এমন লোক তো পৃথিবীতে বেশি নেই কি না, তাই ভাবছি প্রথম প্রথম হয়তো একটু কষ্ট হবে।' তাহার কণ্ঠস্বরে গ্লানির লেশমাত্র নাই।

কিছুক্ষণ বিল্লু জবাব দিল না, তারপর বলিল, 'তোমাকে আজ ভারী খুশি মনে হচ্ছে।'

'খুশী?' অনুরূপ অল্পকাল আত্মানুসন্ধান করিয়া বলিল, 'না, ঠিক খুশি নয়—তবে মনটা একটু হালকা বোধ হচ্ছে- কাজকর্ম নেই চুপ করে বসে থাকতে আর ভাল লাগছিল না -- সেই জন্যই বোধ হয় - '

বিল্লুর হাসি শুনা গেল, 'তুমি আজকাল ভারী কাজের লোক হয়ে উঠেছ - না?'

'হইনি এখনও তবে পাকে চক্রে পড়ে হয়তো শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়তে পারি।'

'তুমি কোনও কালে কাজের লোক হতে পারবে না।'

'পারব না? কেন বল দেখি?'

'তুমি একেবারে—একেবারে অপদার্থ।'—সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসির শব্দ।

কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ,—যেন অন্ধকারে দুইজন মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নাই। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

অন্ধকারে একটা গভীর নিশ্বাস পড়িল। অনুরূপ বলিল, 'তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে, কে জানে! হয়তো আর কখনও—আচ্ছা বিল্লু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? কিছু মনে করো না, আমি রাগ বা অভিমান করে বলছি না, শুধু একটা কৌতূহল হচ্ছে। তুমি যে আমাকে কথায় কথায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে, লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করতে—আমার কি সত্যিই কোনও দোষ ছিল? আমি নিজে অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারিনি, তাই জান্‌তে চাইছি। কি জানি, হয়তো না জেনে প্রতিপদেই এমন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসভ্যতা করে ফেলেছি—'

বিল্লু আবার হাসিয়া উঠিল, তাহার চাপা অথচ দুর্নিবার হাসির ঢেউ অনুরূপের কথাগুলি ভাসাইয়া লইয়া গেল।

অত্যন্ত আহতস্বরে অনুরূপ বলিল, 'বিল্লু! হাসি নয়। সত্যি বল আমি কী অন্যায় করেছিলুম—'

'চুপ কর। আমি আর পারছি না—তোমার মত বোকা—'

'বোকা! তাই হবে বোধ হয়।'—আর একটা নিশ্বাস পড়িল, 'আচ্ছা চললুম।'

অনুরূপ ফটক খুলিল।

'যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ—অনুরূপ ফটকের বাহির হইল।

'—আচ্ছা—এস'—আবার সেই হাসি।

ঠিক এই সময়—উল্কার আলো!

অন্ধকার আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আলোর দাগ কাটিয়া একটা উল্কাপিণ্ড ফাটিয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহারই উজ্জ্বল নীল প্রভায় অনরূপ দেখিল, বিল্লুর চোখের জলে মুখ ভিজিয়া গিয়াছে এবং সে দুহাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া—

যাহা অনুরূপ চাপা হাসি বলিয়া ভুল করিয়াছিল, তাহার অদম্য রোদনের উচ্ছ্বাস!

আবার অন্ধকার।

'বিল্লু।'

'কি?'—স্বর ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ।

'আমি বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলুম—তুমি আর কাউকে—' বিল্লুর নিকট হইতে কোন জবাব আসিল না।

'তোমার লকেটে—' অনুরূপের এ কথাটাও অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

কিয়ৎকাল পরে বিল্লুর হাত অনুরূপের হাতে ঠেকিল, বিল্লু একটু ঈষদুষ্ণ ক্ষুদ্র বস্তু তাহার করতলে রাখিয়া হাত টানিয়া লইল। অনুরূপ অনুভব করিয়া বুঝিল—লকেট।

বলিল, 'এ কি হবে?'

'নাও। ওর মধ্যে একটা মুণ্ডু আছে, চিন্‌তে পার কি না দেখো।'

'বিল্লু।'

উত্তর নাই। অনুরূপ আবার ডাকিল, 'বিল্লু।'

বিল্লুর সাড়া পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় পা টিপিয়া টিপিয়া চলিযা গিযাছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, বিল্লুর মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে এমন ব্যবহার করিল কেন? ইহার উত্তর বোধ করি বিল্লু নিজেও দিতে পারিবে না। তাই গোড়ায় বলিয়াছিলাম, এ গল্পের নাম হওয়া উচিত ছিল—স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং—কিম্বা—

বনফুল

কাত্যায়নী

প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রভাতিক গীতি-বন্দনা সমাপনান্তে আশ্রমিকগণ স্ব-স্ব কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ পাঠে মগ্ন, কেহ গোচারণে গিয়াছেন, কেহ সমিধ আহরণে ব্যস্ত। আশ্রম-অঙ্গন-প্রান্তে যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী কাত্যায়নী উদূখলে মুষল প্রহার করতঃ নীবার কণ্ডন করিতেছেন এবং কৌতুক সহকারে লক্ষ্য করিতেছেন অদূরে ইঙ্গুদীবৃক্ষ-সন্নিহিত গুল্ম-ছায়ায় সাবধান-সঞ্চরণে তিত্তির-দম্পতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অতিশয় চতুর সঙ্গোপনশীল প্রাণী ইহারা, আশ্রম শান্ত না হইলে আত্ম-প্রকাশ করে না। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলে প্রত্যহই কাত্যায়নীর যে-কাহিনীটি মনে পড়ে অদ্যও তাহা পড়িল। কথিত আছে, যাজ্ঞবল্ক্য-গুরু বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া গুরুর নিকট শিক্ষিত বেদ বমন করিয়া দেন এবং সে সমস্তই তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া নাকি বহির্গত হয়। এই তিত্তির-দম্পতিকে দেখিলেই কাত্যায়নী উক্ত অলৌকিক কাহিনীটি স্মরণ করেন। একদা স্বামীকে এ বিষয়ে প্রশ্নও করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেন নাই মৃদুহাস্য করিয়াছিলেন মাত্র। জ্ঞান-গম্ভীর তপস্বী স্বামীকে প্রগল্ভ প্রশ্ন করিতে কাত্যায়নীর শঙ্কা হয়। বস্তুতঃ স্ত্রী-প্রজ্ঞা কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্ক্য-সমীপে চিরকালই সঙ্কুচিতা, গৃহ-কর্মের মধ্যে তিনি আজীবন আপনাকে অবলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন, মৈত্রেয়ীর মত তো তাহার বাক্‌পটুতা অথবা বিদ্যাবত্তা নাই যে স্বচ্ছন্দে তিনি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত দীর্ঘ কথোপকথনে নিরত হইতে পারেন। ভাবতপূজা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত তিনি কি আলাপ করিবেন!

সহসা তিনি শুনিতে পাইলেন কুটীর-অভ্যন্তরে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, "অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, পুত্রগণের প্রতি প্রীতিবশতঃ পুত্রগণ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পুত্রগণ প্রিয় হয়—"

কাত্যায়নীর ওষ্ঠপ্রান্ত ঈষৎ বক্র হইল। তিনি অনুমান করিলেন অদ্যও সপত্নী মৈত্রেয়ী স্বামী-সহ ব্রহ্ম-বিষয়ক বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়াছেন। কাত্যায়নীর মনে প্রশ্ন জাগিল, ইহা না করিয়া অরণি-সহযোগে অগ্নি উৎপাদন করতঃ ভর্তার নিমিত্ত পিষ্টক প্রস্তুত করিলে কি পত্নী-কর্তব্য চারুতর রূপে নিষ্পন্ন হইত না? কাত্যায়নী বুঝিতে পারেন না মৈত্রেয়ীর মনোভাব কি। মৈত্রেয়ী কোন দিনই গৃহকর্ম বিষয়ে তাবৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন না, গৃহকর্মে সাতিশয় নিপুণাও নহেন, ব্রাহ্ম-বিদ্যা-অনুশীলনেই তাঁহার যত কুশলতা! ব্রাহ্ম, আত্মা, অমৃত! কাত্যায়নীর ওষ্ঠ প্রান্ত বক্রতর হইল। তিনি অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ করতঃ উদূখলে মুষলচালনা করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষোভে তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুনরায় তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল স্বামী বলিতেছে, 'যেমন বাদ্যমান বীণা হইতে বিনির্গত শব্দসমূহকে গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণাকে গ্রহণ করিলে অথবা বীণাবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দসমূহ গৃহীত হয়, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে পৃথক পৃথক ধূম নির্গত হয় তেমনি অয়ি মৈত্রেয়ী, ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ—"

ধূম শব্দটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিবামাত্র কাত্যায়নীর স্মরণ হইল গত সন্ধ্যায় ধূমানাম্নী আশ্রম-ধেনুটি কিঞ্চিৎ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল. অবিলম্বে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কর্তব্য, হয়ত অচিরে তাহার শুশ্রূষারও প্রয়োজন হইবে। উদূখল-গাত্রে মুষলটি তির্যকভাবে স্থাপনকরতঃ কাত্যায়নী গোশালা অভিমুখে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া তাঁহার চিন্তা দূরীভূত হইল, দেখিলেন, ধূমা সুস্থ হইয়াছে, তৃণ-চর্বণে আর অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না। কাত্যায়নীকে দেখিয়া ধূম্রবর্ণা স্নিগ্ধ-নেত্রা ধূমা হর্ষভরে মৃদু হাম্বারব করিল, কাত্যায়নী তাহার সুচিক্কণ পৃষ্ঠদেশে স্নেহভরে হস্তার্পণকরতঃ তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

অদূরে বৃদ্ধ আশ্রয়-মৃগ চিত্রক ভূমিনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া নব-দূর্বাদল-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল, কাত্যায়নীর পদশব্দে সে-ও তাহার শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত-শৃঙ্গ-শোভিত মস্তক তুলিয়া স্নেহ-প্রত্যাশী একাগ্র দৃষ্টিতে কাত্যায়নীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদু হাসিয়া কাত্যায়নী তাহার নিকটেও গেলেন এবং ঈষৎ ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তোমাকে লইয়া খেলা করিবার মতো সময় এখন আমার নাই, আমার অনেক কাজ," চিত্রক শৃঙ্গ-শোভিত মস্তকটি একবার সঞ্চালিত করিয়া পুচ্ছটি ঈষৎ আন্দোলিত করিল এবং ভর্ৎসিত হইয়া অমনোযোগী বালক যেমন পাঠে মনঃসংযোগ করে তেমনি নবদূর্বাদলে মনঃসংযোগ করিল।

কাত্যায়নী পুনরায় অঙ্গন-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল হয়ত এতক্ষণ বায়সকুল আসিয়া নীবার ভোজন করিতেছে। এবম্বিধ আশঙ্কা সত্ত্বেও কিন্তু কিছু দূর গিয়া তাঁহার থামিতে হইল। তিনি দেখিতে পাইলেন, নবাগত আশ্রম-বালক আরুণির পীতবর্ণ উত্তরীয়টি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে। আরুণি কিছুক্ষণ পূর্বে গোচারণে গিয়াছে। প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে বিধৌত আর্দ্র উত্তরীয় শুষ্ক করিবার মানসে আরুণি প্রত্যহ সেটি আমলকি-শাখায় প্রলম্বিত করিয়া দেয়, কিন্তু গ্রন্থি শিথিল থাকে বলিয়া প্রায়শই তাহা বায়ুতাড়িত হইয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রায় প্রত্যহই কাত্যায়নী আরুণির উত্তরীয়টি ধূলি হইতে উদ্ধার করেন। উত্তরীয় হইতে ধূলি অপসারণ করিতে করিতে তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করতঃ অন্য দিনের মতো আজিও স্থির করিলেন যে আরুণির ঈদৃশ অনবধানতার জন্য অদ্য তাহাকে ভর্ৎসনাই করিতে হইবে। একাধিকবার তিনি এ সঙ্কল্প করিয়াছেন। আরুণিকে এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে তিনি সচেতন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কণ্ঠে ভর্ৎসনার সুর এ যাবৎ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। দুষ্টমতি এই চঞ্চল বালকটির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ভর্ৎসনা-বাক্য রসনা হইতে নির্গত হইতে চাহে না, পরন্তু স্নেহ-রসে সমস্ত অন্তর আপ্লুত হইয়া যায়। ইহা আশ্চর্যের বিষয় হইলেও সত্য যে আরুণির ভোজনপটুতা, ক্রীড়া-প্রবণতা, ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ-অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগ প্রভৃতি অসদগুণাবলীই তাহাকে কাত্যায়নীর নিকট প্রিয়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রবাসী বটুর উপর কিছুতেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।

অঙ্গনে প্রত্যাগত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার আশঙ্কা অমূলক ছিল না, একাধিক বাঁয়স আসিয়া নীবার-অপহরণে রত হইয়াছে। করতালি-শব্দে তিনি তাহাদের বিতাড়িত করিলেন, ইঙ্গুদী-বৃক্ষ-তলস্থ তিত্তির-দম্পতিও এই শব্দে সচকিত হইয়া গুল্মান্তরালে আত্মগোপন করিল। কাত্যায়নী উদূখল-সমীপবর্তিনী হইয়া পুনরায় নীবার-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন।

পুনরায় তাঁহার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল স্বামী আবেগভরে বলিতেছেন, "যেমন সৈন্ধব-খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলেই বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক করিয়া গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু জলের যে-কোন অংশ হইতে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়, তেমনি অয়ি, এই মহাভূত অনন্ত, অপারও বিজ্ঞানঘন। এই মহান আত্মা এই সমুদয় ভূত হইতে উত্থিত ইহাতেই আবার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।"

এই সকল আধ্যাত্মিক বাক্যাবলী কাত্যায়নীর কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল না। অদ্য কিন্তু তাঁহার অন্তরকে উদ্বেলিত করিল স্বামীর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর। সপত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া এমন আবেগ-কম্পিত-স্বরে স্বামী কি বলিতেছেন। কই, এমন আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে স্বামী তাঁহাকে কোন দিন কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না তো।

সহসা মৈত্রেয়ীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষা হইল। ক্ষোভ-সহকারে তিনি স্মরণ করিলেন মৈত্রেয়ী কেবল শাস্ত্র-চর্চাই করে, আর কিছু করে না। এই যে বৃহৎ আশ্রম, যে-আশ্রমে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে মানী গুণী অতিথি-বৃন্দ সততই আগমন করেন, যে-আশ্রম পূর্ণ করিয়া বিদ্যার্থীর দল সর্বদাই বিরাজমান, যেখানে যাগ-যজ্ঞ নিত্য মহোৎসব লাগিয়াই আছে, সে-আশ্রমের যাবতীয় পরিশ্রম-সাধ্য কর্মভার তিনি একাই তো এত কাল বহন করিলেন। মৈত্রেয়ী তাঁহার শ্রমভার লাঘবে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে? সে তো অহরহ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা লইয়াই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কাত্যায়নীর স্মরণপথে উদিত হইল কিছু কাল পূর্বে আশ্রমে যখন যজ্ঞ-কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখনও মৈত্রেয়ী আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্মে নিজেকে নিয়োজিত না করিয়া সামগত জনৈক মুনির সহিত শাস্ত্র-বিষয়ক বচনার সময়ক্ষেপ করিয়াছেন। একা কাত্যায়নীই একেক জন আশ্রম বালকের সহায়তায় উদুম্বর বৃক্ষ হইতে স্রব, চমস, ইন্ধন, অরণি

সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে একাই ব্রীহি, যব, তিল, মাস, প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, মসুর, খল্ব, খলকুল প্রভৃতি গ্রাম্য শস্য একত্র করিয়া দধি, মধু ও ঘৃত দ্বারা সিক্ত করিতে হইয়াছিল। তিনিই রাত্রি জাগরণ করিয়া সমাগত অতিথিবর্গের জন্য পুরোডাশ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী কিছুই করে নাই। তাঁহার আরও মনে পড়িল গত বৎসর ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য অংসল বৃষ-মাংস ভক্ষণেচ্ছু হইয়াছিলেন, তাহারও সমস্ত আয়োজন কাত্যায়নীকেই একা করিতে হইয়াছিল। তিনিই যজ্ঞাগ্নি-কুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া মাংস-শূল্য প্রস্তুত করতঃ স্বামীর সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন, মৈত্রেয়ী কিছুই করেন নাই। অথচ স্বামীর আবেগ-কম্পিত যত আলাপ সব মৈত্রেয়ীর সঙ্গে! কাত্যায়নী একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মনে হইল, না, না, ইহা মিথ্যা। মৈত্রেয়ী যতই না কেন ব্রহ্ম-বিষয়ক আলোচনা করুক স্বামীর নিভৃত অন্তর-দেশে কাত্যায়নীরই আসন অবিচলিত আছে।

সহসা কুটীরাভ্যন্তরে আলোচনা বন্ধ হইল। দ্বারপ্রান্তে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য দেখা দিলেন।

প্রতীভাদীপ্ত প্রশস্ত ললাটে, পিঙ্গল জটাভারে বার্ধক্যের রজতচ্ছটা, জ্যোতির্ময় নয়ন-যুগল আনন্দ-সমুজ্জ্বল। কাত্যায়নীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'অয়ি কাত্যায়নী, আমি অদ্য বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। মৈত্রেয়ী সত্যই আনন্দদায়িনী, তাহার আগ্রহ-বিশুদ্ধ অমৃত-পিপাসা প্রকৃতই অনন্তমুখিনী, সত্যই ব্রহ্মবাদিনী সে। অয়ি কাত্যায়নী, গৃহস্থাশ্রমে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া আমি জীবনের শেষ-প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এইবার আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব। সেজন্য তোমার ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে আমার সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার মানসে আমি মৈত্রেয়ীকে আজ আহ্বান করিয়াছিলাম। মৈত্রেয়ী কি বলিল, জান? সে বলিল, আমি বিত্ত চাহি না, আমি অমৃতত্ব চাই, সমুদয়ের একায়ন যে আত্মা আমি তাহাকেই উপলব্ধি করিতে চাই। বিত্ত লইয়া আমি কি করিব। অয়ি কাত্যায়নী, আনন্দে, বিস্ময়ে, গর্বে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এত দিন মৈত্রেয়ী আমার প্রিয় ছিল আজ সে আমার প্রিয়তমা হইয়াছে—"

আবেগের আতিশয্যে বাকরুদ্ধ হইল, যাজ্ঞবল্ক্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না। ব্রীড়াবনতমুখী মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া এক অপরূপ শোভা বিকীরিত হইতে লাগিল।

ব্রহ্ম-অনভিজ্ঞা কাত্যায়নী পাংশু বিবর্ণমুখে উদূখল সমীপে বজ্রাহতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মনোজ বসু

অশ্বত্থামার দিদি

গুরুপুত্র অশ্বত্থামার গোরু-চুরি মকদ্দমায় এক বৎসর জেল হইয়া গেল।

অধিকারী একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিল। কারণ, তিলসোনার মজুমদাররা লোক ভালো নয়। বাড়ি আসিয়া পাঁচ টাকা বায়না দিয়া গিয়াছে এবং পাঁচবার বলিয়া গিয়াছে কালীপুজো মঙ্গলবারে, তার পরের দিন বুধবার তেরোই তারিখে গান। বেলাবেলি হাজির হয়ো হে, সাতাশ গ্রাম নেমন্তন্ন—। অতএব গাফিলি হইলে তাহারা সহজে ছাড়িবে না নিশ্চয়। সেই তেরোই-ও তো আসিয়া পড়িল।

অধিকারী চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, মা কালীর খাঁড়ার লক্ষ্য এবার তাহারই মাথাটা।

কিন্তু মাথায় হাত দিয়া তো খাঁড়ার কোপ ঠেকানো চলে না। কাজেই আর একবার সৃষ্টিধরের হাতে-পায়ে ধরিয়া দেখা ছাড়া উপায় কি? তিলসোনার আসরে অশ্বত্থামা সাজিয়া যদি সে এবারকার মতো ইজ্জত বাঁচাইয়া দেয়!

সৃষ্টিধর বিদ্বান ব্যক্তি, ইংরাজী ফার্স্টবুকও পড়িয়াছে কিন্তু তাহার মোটে বিবেচনা নাই। গত

বৎসর যাত্রাদলের সূচনার সময় সৃষ্টিধরকে অনেক বলাকওয়া হইয়াছিল, এমন কি দশ টাকা করিয়া মাহিনা দিবার কথাও উঠিয়াছিল। কিছুতে সে দলে আসিল না, সাফ জবাব দিল—দশ টাকায় ষাঁড় কিনে কাজ চালাও গে—

কিন্তু সৃষ্টিধরের গোঁফ উঠে নাই, নধর চেহারা, রাণী, সখী বা নিতান্তপক্ষে রাজপুত্র বেশেই মানায় ; তাহাকে তো সেনাপতি সাজিতে ডাকা হয় নাই। অতএব ষাঁড় দিয়া তাহার কাজ চলে কি করিয়া?

যাহা হউক সে সব আবশ্যক হয় নাই, বলাই তেলিকে পাওয়া গিয়াছিল এবং বড় সুবিধামতই পাওয়া গিয়াছিল। খুব স্ফূর্তিবাজ লোক, টাকাকড়িতে খাঁই মোটেই নাই। খুলনার দিকে কোথায় তাহার মামার বাড়ি, মামারা বড়লোক। যে মরসুমে দলের গাওনা থাকিত না, মামার বাড়ি ডুব মারিত। ফিরিয়া আসিয়া দিনকতক হরদম খরচ করিত। অশ্বত্থামার পার্টও বলিত খাসা।

কিন্তু তিলসোনার বায়না লইবার কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ একদিন থানার দারোগা আসিয়া বলাইকে ধরিয়া লইয়া গেল, উহারা কয়েকজনে মিলিয়া নাকি কোন গ্রাম হইতে গোরু সরাইয়া ঝিকরগাছির হাটে বেচিয়া আসিয়াছে। তারপর জেল।

অধিকারী মনে মনে সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছিল—একটা রাতের গাওনা মোটে, টাকা তিনেকের মধ্যেই সৃষ্টিধর রাজি হইয়া যাইবে। তাহারও কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া প্রথমে সে প্রস্তাব করিল দু টাকা—

কিন্তু সৃষ্টিধর গরজ বুঝিয়া হাঁকিল একেবারে সৃষ্টিছাড়া দর—পাঁচ টাকার কম হবে না।

লোকটার সত্যই বিবেচনা নাই। পঁচিশ টাকা বায়না, জুড়ি বেহালাদার প্রভৃতিকে ধরিয়া মানুষও জন পঁচিশেকের কম হইবে না। তাহার মধ্যে একা অশ্বত্থামাকে যদি পাঁচ টাকা বখরা দিতে হয়, তাহা হইলে তস্য পিতা দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, মধ্যম-পাণ্ডব ভীম প্রভৃতি মহা মহা বীরগণের ভাগে কি পড়িবে?

তিন, সাড়ে তিন, পৌনে চার করিয়া অবশেষে পুরাপুরি চারই স্বীকার করিতে হইল। না করিয়া উপায় নাই। এই কয়দিনের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করিয়া একরকম চালাইয়া দিতে পারে, এ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র ঐ সৃষ্টিধর।

গীতাভিনয় শুরু হইয়া গিয়াছে।

দ্রোণাচার্যের প্রায় আজানুলম্বিত দাড়ি—রাজবাড়িতে মাস্টারি করিবার মানানসই দাড়ি হইয়াছে বটে। আসরের দক্ষিণ কোণে অশ্বত্থামা চিঁ-চিঁ করিয়া বলিতেছে—দুধ, দুধ খাব বাবা—আর দ্রোণাচার্য দুই হাতে সেই দাড়িসমুদ্র অনবরত আলোড়িত করিয়া একবার ঝাড়-লণ্ঠনের মধ্যে, একবার বেহালাদারদের পশ্চাদ্দেশে, একবার বা ছেঁড়া সামিয়ানার ফাঁকে আকাশমুখো তাকাইয়া দুধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু এত সব অত্যুৎকৃষ্ট স্থান হইতেও দুধ মিলিল না। শেষে একজন ছোকরা হারমোনিয়ামের বাক্সের এক কোণ হইতে একটা ছোট অ্যালুমিনিয়মের তেলের বাটি বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। দ্রোণাচার্য কোন প্রকার উপকরণ ব্যতীত বোধ করি কেবলমাত্র তপঃ প্রভাবেই সেই বাটিতে পিটালি গুলিয়া দুধ বলিয়া ফাঁকি দিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়া দিলেন। আর সেই নিরাকর পিটালিগোলার শক্তিই বা কি অসামান্য! মুহূর্তমধ্যে অশ্বত্থামার মিহি গলা দস্তুরমত সবল হইয়া উঠিল এবং আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সহিত বিশ হাত আসরের আগাগোড়া প্রদক্ষিণ করিয়া দুধ খাওয়ার আনন্দে একটো করিয়া সে লাফাইতে লাগিল।

চারিদিকে বাহবা বাহবা পড়িয়া গেল।

চিকের আড়ালে একটি বধূ কেবলি চোখ মুছিতেছিল—মজুমদার-স্টেটের রকম সাত আনা শরিক স্বর্গীয় যদুনাথ মজুমদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ উমাশশী। তার যেন কেমন মনে হইল, ঐ অশ্বত্থামা তাহার ভাই, সে তাহার দিদি।

উমার কাঁচা বয়স, তবু একটু বুঝিবার বুদ্ধি আছে যে ইহার কিছু সত্য নহে, অভিনয় মাত্র। কিন্তু সত্য হউক, মিথ্যা হউক, অমন সুন্দর ছেলেটি আসরের পাশে পড়িয়া একটুখানি দুধ খাইবার জন্য অত

করিয়া কাঁদিতে লাগিল তো! আর যখন দুধ বলিয়া খানিক পিটালির গোলা খাওয়াইয়া দিল, অশ্বত্থামা রাগ করিয়া ঐ বাটিসুদ্ধ আসর ডিঙাইয়া কলাবনের মধ্যে ফেলিয়া দিল না কেন? তাহা না করিয়া অবোধ বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল!...

যাত্রা দেখিতেছে আর কত কি ভাবিতেছে এমনি সময়ে উমার মনে পড়িয়া গেল, তাহার খোকামণি এতক্ষণ হয়তো জাগিয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাহাকে খাটের উপর ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া মোক্ষদাকে সেখানে বসাইয়া তবে গান শুনিতে আসিয়া বসিয়াছে। যে আদুরে ঝি মোক্ষদা—এতক্ষণ কি করিতেছে তার ঠিক কি! হয় ঘুম মারিতেছে, নয়তো এই ভিড়ের মধ্যে কোনোখানে চুরি করিয়া বসিয়া সে-ও গান শুনিতেছে। মোটে এক বছরের একরত্তি ছেলে, দুধ খাইবার সময় হইয়াছে, বাড়িতে কেহ নাই, জাগিয়া থাকে তো কাঁদিয়া কাঁদিয়া খুন হইতেছে। ব্যস্ত উমাশশী উঠিয়া পড়িল।

ছয় শরিকের এজমালি কালীপূজা। সম্পত্তির অংশক্রমে যাত্রাদলের লোকজন খাওয়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। যদুনাথের তরফে খাইবে বরোজন।

অনেক রাত্রে গান ভাঙিয়া গেলে পুরুষমানুষদের খাওয়া শেষ হইয়া গেল। তারপর উমা খাইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—যাত্রার লোকেরা খেয়ে গেছে?

বামুন-ঠাকুরণ উত্তর করিলেন—না বৌমা, এমন কি নবাবপুত্তুরবা এয়েছেন যে সন্ধ্যা না লাগতে বাবুদের আগে ভাগে খাইয়ে দেব। আমাব সব হয়ে গেছে, আর দেবি নেই। মোক্ষদা এবার ডাকতে যাক। মোক্ষদা—ও মোক্ষদা—

উমার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল। অবশিষ্ট ভাতগুলির কতক খাইয়া তাড়াতাড়ি আঁচাইতে গেল।

মোক্ষদা তখন উপর হইতে নিচে নামিতেছে।

উমা কহিল—কেমন গান শুনলি মোক্ষদা?

মোক্ষদা বিস্ময়ে খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। শেষে কহিল—অ পোড়াকপাল, আমি গেনু কখন? আমি বলে মাজার ব্যথায় ছটফটিয়ে মরি।

উমা হাসিয়া ফেলিল।

—তুই যে আঁধারে আঁধারে কচুবনের পাশ দিয়ে.. আমি নিজের চোখে দেখলাম। তা বেশ তো, কি হয়েছে তাতে, তুই খোকাকে একলা ফেলে চলে গেছিস, আমি কি তা কাউকে বলতে যাচ্ছি?

অতঃপর মোক্ষদাব আর মনে না পড়িবার কথা নয়—এখনও স্মবণ না হইলে আরও যে কি বাহির হইয়া পড়িবে তার ঠিক কি?

বলিল—আস্তে কথা কও বউদি, শুনতে পেলে গিন্নিমা আস্ত রাখবে না। বামুন-ঠাকরুণকে বলে দিইছিনু—যখন যুদ্ধ হবে আমায় ডেকো। তিনি এসে বললেন, মোক্ষদা, দেখসে এসে ভীম সাঁই-সাঁই করে কী গদাই ঘুরুচ্ছে। গিইছি আর এসেছি—দাঁড়াইনি মোটে।

উমা বলিল—আর অশ্বত্থামা কেমন এক্‌টো করলে বল দিকিনি। দেখতেও যেন রাজপুত্তুর, না?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া সংক্ষেপে বলিল—হুঁ। তাহার মাথার মধ্যে তখনও সাঁই-সাঁই করিয়া ভীমের গদা ঘুরিতেছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় বলিল—কিন্তু দুর্যোধন কি পালোয়ান রে বাপু! আমি গুনে দেখনু, একটা নয়, দুটো নয়—ভীম ছয়-ছয়টা গদার বাড়ি মারল, তবু লাফাতে লাফাতে চলে গেল। সোজা কথা? ভীমের ঐ গদা বিশ-পঁচিশ মণ হবে, না বউদি?

কিন্তু গদাতত্ত্বের আলোচনা আর অধিক চলিল না, বামুন-ঠাকরুণ ডাকিতেছিলেন—ও মোক্ষদা, ডাকতে গেলি নে? যা দিদি, আমি আর কত রাত অবধি ভাত চৌকি দেব?

উমাও বলিল—যাচ্ছিস ডাকতে? যা—কেন মিছিমিছি রাত করিস? আর ঐ যে অশ্বত্থামা—চিনতে পারবি নে?—সে দুধ দুধ করে কাঁদছিল গো, তাকেও ডেকে আনবি। বারোজন খাবে আমাদের বাড়িতে—ঐ ছেলেটাও খাবে। যদি না আসতে চায়, ছাড়বি নে, বুঝলি?

মোক্ষদা ডাকিতে চলিয়া গেল।

এবারে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিয়া উমা দেখিল আয়োজন প্রচুর। ভীমরুলের ডিমের মতো মোটা মোটা আউশচালের ভাত, পুঁইডাঁটার চচ্চড়ি এবং খেসারির ডাল রান্না হইয়া গিয়াছে, এখন নিবন্ত উনানে পাঁচ-সাতটি বেগুন পোড়াইয়া দিলেই হইয়া যায়। কহিল, ও বামুন-মা, করেছ কি? এই দিয়ে লোকগুলো কি করে খাবে?

বমুন-ঠাকুরণ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—বল কি বউমা, বেগুন-পোড়া দিয়ে তিন-তিনটে তরকারি হল—আরো খাবে কি দিয়ে? বাড়িতে ওরা কি সোনাসুবর্ণ খেয়ে থাকে? তুমি ছেলেমানুষ, জানো না তো!

কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও উমা জানে। এই সব লোক—যাহারা যাত্রার দলে রাজা সাজিয়া বেড়ায়, আবার বাড়িতেও ভাঙামণ্ডপে সাবেকি চালে একরকম নিশ্চিন্তভাবে হুঁকা টানিয়া থাকে এবং ধান-ভরা সবুজ বিলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আগামী পৌষে নূতন গোলা বাঁধিবার স্বপ্ন দেখে, তাহারা সদাসর্বদা যে—অপরূপ সোনা-সুবর্ণ খাইয়া থাকে তাহা উমা ভালো করিয়াই জানে.... সেই যে রূপকথার কোন কাঠকুড়ানি ছেলে-মেয়ে বনের মধ্যে দিয়া যাইতেছিল, রাজবাড়ির শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিল—উমারও হইল তাই।

উমার বাপের বাড়ি উজ্জ্বলপুরে, এখান হইতে পুরা তিনটি ভাঁটির পথ, একেবারে মধুমতীর উপর। পাঁচ বৎসর আগে সেখানে প্রতি রাত্রে দিদি ও ভাইটি মায়ের কোলে জড়াজড়ি করিয়া শুইয়া থাকিত। বোকা ভাইটি—তার নাম হারাণ। এমনি অবোধ যে আর সকলের মতো তাহাদেরও বাবা বাঁচিয়া ছিল—এ রকম অসম্ভব কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিত না, ইহা লইয়া উমার সঙ্গে ঘোরতর তর্ক করিত।

একবার হইয়াছে কি, চৌধুরিবাড়ি অমিয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে কলিকাতা হইতে নানান রকম জিনিস আসিয়াছে। সেদিন হারাণের আর টিকি দেখিবার জো নাই, বেলা দুপুর অবধি আগামী উৎসবের আয়োজন দেখিতেছে। অমিয়ার কাকা ট্রাঙ্ক খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া অমিয়ার মাকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, উবু হইয়া বসিয়া হারাণ একমনে তাহা দেখিতেছিল।

বাড়ি ফিরিয়া হারাণ উমাকে চুপি চুপি কহিল—আজ এক তা পেয়েছি, কাউকে বলিস নে দিদি। ভুলে ওরা রোয়াকের পরে ফেলে চলে গেল, কেউ নেই তুলে নিলাম। কি বল্ দিকি? কলকাতার মিঠাই —না? বলিয়া চারিদিক তাকাইয়া কোঁচার খুঁট হইতে অতি সন্তর্পণে সেই দুষ্প্রাপ্য কলিকাতার মিঠাই বাহির করিল।

দেখিয়া খানিকক্ষণ তো হাসির চোটে উমা কথাই কহিতে পারিল না—একটা টকটকে রাঙা মোমবাতি। বলিল—ও হারাণ, ওরে বোকা, তুই যেন কি—বাতি চিনিস নে? বাতি—বাতি.....জ্বেলে দিলে ঠিক পিদ্দিমের মতো আলো হয়।

দিদির অত হাসি দেখিয়া হারাণ অপ্রস্তুত হইয়া প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু একটু সামলাইয়া শেষে পুরাদস্তুর তর্ক করিতে লাগিল : উহা কখনো বাতি নয়— সে বুঝি বাতি চেনে না? চৌধুরিদের মানিক নন্দ প্রভৃতিকে স্বপক্ষে ওই স্তে খাইতে দেখিয়াছে যে!

উজ্জ্বলপুর গ্রামখানি পরগণা সৈদাবাদের মধ্যে, অতএব তিলসোনা মজুমদার-এস্টেটের অন্তর্গত।

যদুনাথ মজুমদার মহাশয় তখন বাঁচিয়া। একবার কিস্তির মুখে তিনি স্বয়ং আদায়-পত্র তদারক করিতে গিয়াছিলেন। কাছারিবাড়ির সামনে দিয়া কাঁচারাস্তা সোজা দক্ষিণমুখো একেবারে খেয়াঘাট অবধি চলিয়া গিয়াছে। সকাল বেলা মজুমদার মহাশয়ের অনেক কাজ—রোকড় সেহা খতিয়ান প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে হইত। তাহারই মধ্যে একবার রাস্তার দিকে তাকাইয়া চশমার ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইতেন, পাততাড়ি বগলে একটি ছেলে একেবারে দিদির আঁচলের মধ্যে গা ঢাকিয়া পাঠশালায় যাইতেছে। দিদি আর ভাই হরদম বকিতে বকিতে যাইত, কি যে বকিত উহারাই জানে।

মজুমদার মহাশয় রোজই দেখিতেন। একদিন তিনি উমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাবেলা ভাইকে লইয়া ফিরিতেছিল, যদুনাথ রাস্তার পাশে পায়চারি করিতেছিলেন, ডাকিলেন —শোনো মা লক্ষ্মী!

উমা সসঙ্কোচে কাছে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

যদুনাথ কি যে শোনাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন—আমার তিলসোনার বাড়িতে যাবে? আমার ঘরদোর আলো হয়ে যাবে—লক্ষ্মী-মা, যাবে তো? বলিয়া পরম স্নেহে উমার মুখের উপর যে ক-গাছি চুল উড়িতেছিল তাহা সরাইয়া দিলেন।

উমা কিছু কিছু বুঝিল, কিন্তু হারাণের কাছে যদুনাথের কথাগুলি বড় দুর্বোধ্য ঠেকিল। পথে যাইতে যাইতে পরম উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, ওদের বাড়ি তোকে যেতে বলে কেন? আবার যদি জিজ্ঞাসা করে তুই বলে দিস—যাব না। যদি না যাস ওদের লেঠেল-পাইক দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে না তো?

পরদিন যদুনাথ স্বয়ং উমাদের বাড়ি আসিয়া সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, উমার সহিত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথের বিবাহ দিতে চান। দেনাপাওনার কোনো কথা নাই, স্বয়ং মা-লক্ষ্মী ঘরে গিয়া উঠিবেন, টাকা দিয়া আর কি হইবে?

বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন উমারা রওনা হইয়া যাইবে তার আগের দিন সন্ধ্যায় হারাণ বলিল—দিদি, রাজরাণী হলি, তা মাথায় মুকুট কই?

উমা বলিল—যাঃ—রাজরাণী না হাতি! কে বলেছে রে?

কিন্তু হারাণ বুঝি কিছু বোঝে না। বলিল—রাণী নয় তো কি? মা বললে, তবেগে সুশীল মাণিক সবাই বলছিল—আর তুই লুকুচ্ছিস? ও দিদি, তোদের রাজবাড়িতে যেতে দিবি আমায়? সেপাইরা মারবে না?

উমা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কেউ কোথাও নাই তো? শ্বশুরবাড়ির কথা বলিতে বড় লজ্জা করে, কিন্তু অবুঝ ভাইটিকে আবার লজ্জা। বলিল ইঃ মারলেই হল! আমার ভাইটিকে মারে কে? তুই আর একটু বড় হলি নে কেন হারাণ, তা হলে কালই সঙ্গে নিয়ে যেতাম। খানিক বড় হয়ে যাস – গেলে তোকে এত বড় রুইমাছের মাথা দিয়ে ভাত বেড়ে দেব, এই এত বড়। খাবি তো?

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল—হ্যাঁ, আর মেঠাই – কলকেতার মেঠাই দিস? দিবি নে দিদি?

বামুন-ঠাকরুণের চাকরি অল্পদিনের, তিনি উমার বাপের বাড়ির কোনো খবর রাখেন না। বলিতেছিলেন—তুমি মা ছেলেমানুষ, ভাব পিরথিমের সব্বাই বুঝি তোমাদের মতো খায়-দায়। তিন-তিনটে তরকারি বেঁধেছি, তবু বলছ যাত্রার লোকেরা কি দিয়ে খাবে? আর বড়বাবুর ঘরে দেখে এসগে, সেখানকার ব্যবস্থা শুধু ফ্যানসা ভাত আর নুন—তেঁতুলটুকুও নয়—।

উমা বলিল—তা হোক বামুন-মা, বাড়িতে কত মিঠাই-মোণ্ডা ভিয়েন হল—তার কি কিছু নেই? থাকে তো, ওদের একটা একটা যাহোক কিছু দাও। আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়ো, আমি দেখছি—

উপরে আসিয়া ভাঁড়ার খুঁজিয়া দেখিল, কিছুই নাই। অনেক বড় বড় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তাঁহারাই শেষ করিয়া গিয়াছেন। সে কথা বামুন-ঠাকরুণকে গিয়া বলিতে লজ্জা করিতে লাগিল। যা হয় করুন গিয়া তিনি—উমা ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

দেখিল, সারাদিন খাটিয়া-খুটিয়া রমানাথ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মাথার কাছে আলো জ্বালা। শিয়রে এমনি আলো জ্বালিয়া কখনো ঘুমায়? এমন মানুষ, যদি কোনো কিছুর খেয়াল থাকে।

উমা আলোটা সরাইয়া জোর কমাইয়া দিল। তারপর খোকার চাঁদের মতো মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল। সে-ও অঘোরে ঘুমাইতেছে। আজ আর জাগে নাই, দুধও খায় নাই। খোকার সেই দুধের বাটি হাতে করিয়া উমা ফের নিচে নামিয়া গেল।

তখনও বামুন-ঠাকরুণ একলা ভাত লইয়া বসিয়া আছেন। বলিলেন— দেখ তো মা মোক্ষদার কাণ্ড! এখনও এল না। হতভাগী কোথায় গল্প গিলতে বসেছে।

উমা বলিল—ওর ঐ রকম, কিছু বোঝে না। আচ্ছা—তুমিও তো যাত্রা শুনেছ বামুন মা, সব চাইতে ভালো একটো করলে কে? অশ্বত্থামা, না?

বামুন-ঠাকরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ছাই! এক্‌টোর কথা যদি বল ভীমের উপরে কেউ নেই। প্রথমে মোহড়ায় গোটা দুই লাফ দিয়েছে কি, সামনে যে ছেলেগুলো বসেছিল তারা ছুটে একেবারে নাটমণ্ডপের নিচে। হবে না, কত বড় বীর! মহাভারত পড় নি বৌমা?

উমা কহিল—তা ঠিক। কিন্তু অশ্বত্থামাকে দেখে আমার বড্ড কষ্ট হয়। গরিব বামুনের অবোধ ছেলে, একটুখানি দুধের জন্য কি কান্নাটাই কাঁদলে! তারপর দুধের বাটিটা আগাইয়া দিয়া বলিল—ঐ অশ্বত্থামা ছোকরা এখানেই খেতে আসবে, তুমি তাকে এই দুধটুকু দিও বামুন-মা।

বিড়ালের বড় উপদ্রব। বামুন-ঠাকরুণ দুধের বাটি তাকের উপর তুলিয়া ঢাকা দিয়া রাখিলেন। উমা চুপ করিয়া রহিল, তারপর উনানের কাছে সরিয়া গিয়া বসিয়া বলিল—এবার শীত যা পড়বে—এরি মধ্যে কেমন শীত-শীত লাগছে, দেখ না। আর আমার বাপের বাড়ি এদ্দিন ঠিক লেপ গায়ে দিতে হচ্ছে—একেবারে মধুমতীর উপর কিনা! হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—মজার কথা শোনো বামুন-মা, আজকে প্রথমে যখন অশ্বত্থামা আসরে এল, আমি ভাবলাম আমার ভাই হারাণ এল বুঝি। অমন পেটুক তুমি ভূ-ভারতে দেখ নি কখনো। অশ্বত্থামা যখন দুধ দুধ করে কাঁদছিল, আমার মনে হল হারাণ কাঁদছে।

বামুন-ঠাকরুণ কহিলেন—তোমার ভাই বুঝি ঐ রকম দেখতে—

উমা কহিল—দূর! ওর চেয়ে ঢের ছোট আর ধবধবে ফরসা—যেন কড়ির পুতুল। সেবারে যখন এখানে আসি খুব ভোরবেলা—পানসিতে উঠে দেখলাম, হারাণ কখন এসে ঘাটকিনারে বাবলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে। পানসিতে ডেকে তার কড়ে আঙুলে একটু কামড় দিয়ে এলাম। আঙুল কামড়ালে নাকি মায়া-মমতা ছেড়ে যায়—ও সব ছাই কথা!

বামুন-ঠাকরুণ উমার দিকে চাহিয়া শুনিতেছিলেন...সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি অনেকদিন বাপের বাড়ি যাও নি, না বউমা?

উমা মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল—হ্যাঁ—আজ তিন বছর। শ্বশুরঠাকুর মারা যাবার পরে আর যেতে পারি নি। হারাণ বলেছিল—দিদি, তোমার বাড়ি গিয়ে কলকাতার মেঠাই খেয়ে আসব—সে-ও এল না।

বামুন-ঠাকরুণ সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—আহা! আসে না কেন?

উমা বলিল—আসে কার সঙ্গে? মোটে এগারো বছর বয়স। আর ক-টা বছর বাদে বড় হয়ে আসবে ঠিক। এসে সে আমাকে ফি বছর উজ্জ্বলপুরে নিয়ে যাবে। তখন বছর বছর যাব, কাউকে খোশামোদ করছি নে, আর ক-টা বছর যাক না।

এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া উঠিল, কান্না তো নয় যেন উপরে ডাকাত পড়িয়াছে। উমার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, যাত্রার লোকদের খাওয়া হইয়া গেলে তবে যাইবে, কিন্তু আর দাঁড়ানো চলে না। যাইবার সময় বলিয়া গেল—বামুন-মা, ঐ ছোকরাকে মনে করে দুধটুকু দিও—ভুলো না যেন। তোমার যে ভোলা-মন!

এমনি বেশ শান্ত—কিন্তু উমার খোকা একবার কান্না যদি আরম্ভ করিয়াছে, অবাক হইয়া যাইতে হয় অতটুকু গলায় ঐ প্রকার আওয়াজ উঠে কি করিয়া?

ইতিমধ্যে রমানাথেরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, উমাকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ? জ্বালাতন করলে! যাও, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

উমা ছেলে কোলে করিয়া বাহিরে ছাদের উপরে আসিল।

অন্ধকার রাত্রির মাথার উপর লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র জ্বলিতেছে। উমা ছাদের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলে শান্ত করিতে লাগিল। ছেলেকে বুকের উপর চাপিয়া বারংবার বলিতেছিল—কাঁদিস নি মানিক আমার, ধন আমার, আর কাঁদে না। আজকে আর দুধ পাবি নে—তোর সে দুধ দিয়ে দিইছি—একদিন দুধ না খেলে কি হয়? ওরে হিংসুটে, তবু কাঁদিস? তুই রোজ খাস, ওরা যে জন্মে কোনো দিন দুধ খেতে পায় না—। চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিল—আ--মরে যাই,

মরে যাই, খোকনমণির কি হয়েছে? ও খোকা, মামার বাড়ি যাবি? মামা দেখবি? তুই ঘুমিয়েছিস, দেখলি নে খোকা, তোর মামা এসেছিল। কেমন সুন্দর টুকটুকে মামা। দুধ-টুধ যা ছিল সব সে খেয়ে গেছে, এক ফোঁটাও নেই। কান্না কেন ও আমার গোপাল, তুমি এখন ঘুমোও। আয় চাঁদ আয়—আয়—খোকার কপালে চিক দিয়ে যায়।

উমা আবার যখন ঘরে ফিরিয়া আসিল, রমানাথ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আলো ধরিয়া ছারপোকা মারিতেছে। কহিল—নতুন হিম পড়ছে, অমনি করে এখন বাইরে বাইরে ঘোরে?

যেন কে কাহাকে কহিতেছে, উমা যেন ঘরে নাই। ঘুমন্ত ছেলে কোল হইতে নামাইয়া সে আস্তে আস্তে শোয়াইয়া দিল।

রমানাথ কাছে আসিয়া উমার একখানি হাত ধরিয়া বলিল—রাগ করেছ উমা? ঘুমের ঘোরে আমি কি বকেছি, আমার কিছু মনে নেই।

আর উমা চোখের জল ঠেকাইতে পারিল না, বর্ষার মধুমতী উমার চোখের কূলে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। রমানাথের কোলের উপর মাথা রাখিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল, আর রমানাথ বিব্রত হইয়া তাহার চোখ মুছাইতে মুছাইতে বলিতে লাগিল—আমায় মাপ করো, মাপ করো উমা। অত কাঁদছ কেন? না, একেবারে পাগল তুমি!

কতক্ষণ পরে কাঁদিতে কাঁদিতে উমা বলিল—আমি উজ্জ্বলপুরে যাব, কতদিন যাই নি বলো তো। আমার বুঝি হারাণকে মাকে দেখতে ইচ্ছা করে না।

রমানাথ বলিল—এই কথা? দাঁড়াও, কিস্তির মুখটা কেটে যাক, তারপর ছয় দাঁড়ের পানসি নিয়ে যাব। তুমি যাবে, আমি যাব, খোকা যাবে, আর মোক্ষদাও যাবে, আর কেঁদো না লক্ষ্মীটি।

যাত্রাওয়ালাদের ডাকিয়া আনিতে সত্যসত্যই অনেক রাত্রি হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে মোক্ষদার অপরাধ নাই। মোক্ষদা গিয়া দেখিল, অশ্বত্থামা ইতিমধ্যে পোশাক ছাড়িয়া ফেলিয়া বেঞ্চে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি রথিবৃন্দ দাড়ি-গোঁফ-সমন্বিত অবস্থাতেই বায়নার টাকার বখরা করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। অবশেষে অনেক কষ্টে হিসাব মিটিয়া প্রতিজনের ভাগে সাড়ে দশ আনা করিয়া পড়িল। দ্রোণাচার্য পয়সা গনিয়া ট্যাকে বাঁধিলেন, তারপর ছোঁ মারিয়া অশ্বত্থামার মুখ হইতে বিড়িটি কাড়িয়া লইয়া টানিতে লাগিলেন। অধিকারী অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল, অমন দাড়ি-পরা অবস্থায় বিড়ি খায় কখনো? পাঁচসিকা দামের দাড়িটার আগুন লাগিলে একেবারে সর্বনাশ হইয়া যাইবে যে!

বারোজনকে একত্র করিয়া গোছাইয়া বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল।

আর সকলের খেসারি-ডাল পৌঁছিয়া ইতি, কেবলমাত্র সৃষ্টিধরের পাতের কোলে দুধের বাটি আসিল। সে যে আজিকার আসরে অত্যুৎকৃষ্ট এক্টো করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছে এবং তজ্জন্য অন্তঃপুরে আহারের এই বিশেষ ব্যবস্থা, তাহাতে সৃষ্টিধরের সন্দেহমাত্র রহিল না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

ভক্ত

এও কি হয়? না হয় তো যা হয়।

যেটুকু হয় তাই হতেই বা দোষ কী! আর কেনই বা হবে না সবটুকু? যদি এ:টুকু হয় সবটুকুরই বা বাকি কী?

'ও গো বাবা গো, ও গো মা গো—' হঠাৎ একটা চিৎকার ছুটে এল মাঠের ওধার থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কালীপদ।

আবার চিৎকার : 'ওগো বাবাগো, ওগো মাগো, ধরগো শিগবি—'

তাকাতে লাগল চারজনে। হৈ-হজ্জুত বাধল নাকি আবার কোথাও?

না, এ তো জামিলার গলা। কী হলো কে জানে।

শুকনো মাঠ, ডেলা-পাকানো। তারই উপর দিয়ে পায়ের পাতা ফেলে-ফেলে এঁকে-বেঁকে ছুটে আসছে জামিলা। আর ছুটে আসছে কিনা কালীপদরই দিকে।

"ধরগো ধর—সব খেয়ে ফেললে গো—কি হবে গো—' আঁচলে-কষিতে ঝটাপটি করতে-করতে আরও এগিয়ে এল জামিলা। পথের কোন রাহী লোকের দিকে মুখ করে বললে, 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না গা—তুমি কি কাণা?"

পথের কোন লোককে জিগগেস করছে ঠিক কি।

'বাছুর বাঁট চুষে সব দুধ খেয়ে নিলে দেখতে পাচ্ছ না? গাই-বাছুবকে ঠাঁইনাড়া করে দিতে শেখনি? গরিবের ক্ষেতি করিয়ে সুখ কি?

ওমা! তুমি? একি পোশাক? একি চেহারা?

লটাপটি করে চুল বাঁধল জামিলা। শরীরের আনন্দটুকুকে কোথায় রাখবে কোথায ঢাকবে বুঝতে পারে না।

'আমি বৎ করছি যে এ বছর।' কালীপদ লম্বা চোখে তাকিয়ে থাকে · 'ভক্ত হয়েছি।'

সে আবার কি? বাছুবটাকে এক ঠেলায় সরিয়ে দিল জামিলা। কই শুনিনি তো কোনো দিন। বৎ আবাব কোন দিশি?

বাবা-ভোলার বৎ করি। বৎ জান না? বর্ত্ত। মায়ে-ঝিয়ে বর্ত্ত করে, যার যার বর সেই-সেই মাগে—শোননি?

থাক্ আর শোনাশুনিতে কাজ নেই। কিন্তু বেটাছেলের আবার বর্ত্ত কিগো?

বা, বেটাছেলেব বুঝি সাধ নেই? কিছু অপূরণ নেই তার হিয়ের মধ্যে? ভগমানের কাছে মাঙবার নেই কিছু দুনিয়ায়?

কে জানে। কিন্তু তোমার হাতে ওটা কি?

'বেত। একে বলে দ্বাদশ। দেখতে পাচ্ছ না, বারোটা চোখ। তার মানে বাবো সুজ্জির তেজ। বড় জাগ্রত দেবতা।'

'আর গলায় কি ওটা?

'ওমা, তাও জান না? উত্তুরে। এক ছুটে কাজ করতে নেই, তাই দু ছুট।'

'কদিন চলবে এমনি সং সেজে?'

'এগারো দিনেব ভক্ত আমরা। আমরা কেওটা, ভল্লা, রাজবংশী—'

'বা, বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু তোমাকে—' দুই চোখে এক ঝলক খুশি উথলাল জামিলার।

'আর তোমাকে?'

'তা তুমি জান। আর তোমার ঐ বাবা জানে।'

'কালান্তি রুদ্দুর।' কপালে জোড় হস্ত ঠেকাল কালীপদ : 'বাবা যদি একবার মুখ তোলেন তা হলে পাথর ফেটেও দুব পড়ে।'

'খাও কি?'

'এক পাকে সিদ্ধ পাক যা হয়, তাই—একবার। আর বার ফল জল।'

'দুধ খাবে? ঘরুটে গরুর দুধ?'

'পাই কই?'

'দাঁড়াও—' চারপাশে তাকাতে লাগল জামিলা : 'একটা ভাঁড় জোগাড় করতে পার? একটু দুধ দুয়ে দিতাম তোমাকে।'

'বল কি? জোগানে যে কম হবে তোমাদেব।'

'হলে হত। বলতাম, বাছুরে খেয়ে নিয়েছে।'

'না গরিবের ক্ষেতি করিয়ে লাভ নেই।' এগুলো কালীপদ।

'যাচ্ছ কুথা?'

'গাজন খাটতে যাচ্ছি।'

ঘাটে যাচ্ছি। আমরা দেয়াশিন পাতা। তার মানে, অশন-বসন জোগাই আমরা—আমরা ভাণ্ডারী। তুমি ও-সব বুঝবে না কিছু।

না, বুঝব। কেন বুঝব না? তোমার বুঝের জিনিসে আমার কেন অবোধ হবে?

সুয্যি অস্ত গেলে স্নান করি সবাই। ঘাটের পাহাড়ে বেতের ছড়িগুলো গাদা দিয়ে রেখে দিই। ঢাক বাজে, টিকিরি বাজে। নাচ করি তখন। মাথা নেড়ে তালে-তালে ঠিক ভরন দিয়ে একবারে লাঠির গাদার দিকে এগুই। আর একবাব পিছুই। কখনো দেখনি বুঝি তুমি? গেলেই পারো একদিন।

'আমাকে দেখতে দেবে?'

'কেন দেবে না? তুমি তো দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে। ছোঁবে না তো কাউকে।'

'তোমাকে যদি এখন ছুঁই?'

'ছোঁও না। এখনো তো চান হয়নি আমাব।'

'চান করার পব?'

'তখনকার কথা আলাদা—তখন তো আব—' প্রশ্নটা কালীপদর ভাল লাগল না।

'তারপর বুঝি মদ খাবে?'

মুহূর্তে কালীপদর মুখের মরা-মবা ভাবটা কেটে গেল। বললে 'মদ খেলে মন খুব সরল হয়। উতলা উল্লাস হয়। জাত-বেজাত থাকে না। সবাই আপনার হয়ে যায়। ছোঁয়াছুয়ি চলে যায়। তুমি খাওনি কোনোদিন মদ?'

'ধোৎ।'

পাশাপাশি পাড়া—নিকিরি শেখের পো-রা আব ওই ধীবব-কেওটরা। মাঝখানে একটা কাঁদর। ঝগড়া মারামারি আছে আবার সুখও আছে।

কিন্তু মঞ্জুর খাঁর সঙ্গে নাথু কেওটের বড় বিতণ্ডা। প্রায় দা-কুমড়ো সম্পর্ক। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। নাম শুনলে চিড়বিড় করে ওঠে।

বরাবর কিন্তু এমনটি ছিল না। এককালে গলায় গলায় ভাব ছিল দুজনের। এ কাশী যায় তো ও-ও কাশী যায়। ও মক্কা যায় তো এ-ও মক্কায় চলল। এত দোস্তালি। তখন জামিলা-কালীপদব ছোট। সেবার জামিলার বিয়ের সময়ও কত মাছ জুগিয়েছিল নাথু। কালীপদর জ্যাঠার শ্রাদ্ধের সময় মঞ্জুর খাঁ। যেমন একই নদীতে জেলাই করত তারি, তেমনি তাদেব মন প্রাণও হয়ে গিয়েছিল এক নদী, এক খেয়া। জালও এক, জলও এক।

কিন্তু জমিদারের দল বিরোধ বাধিয়ে দিলে। তাদের সরিকে সরিকে ঝগড়া, তাই তারা প্রজায় প্রজায়ও মিলমিশ রাখতে দেবে না। এক সরিক বিলি করল মঞ্জুর খাঁকে, আবেক সরিক নাথুরামকে। তাদের অংশের গোলমাল মীমাংসা করতে চাইল নাথু মঞ্জুরের মধ্য দিয়ে। একটা পুকুরের জেলাই-

স্বত্ব নিয়ে মামলা। কিন্তু বাড়ির উঠোনে দু-দুটো পুকুর কেটে ফললে তারা। আগে তরল রক্তে, পরে ভরল চোখের জল দিয়ে।

সোয়ামীর গাঁয়ে থাকতেই খবর পেত জামিলা। যমযন্ত্রণা পেয়ে বেধবা-বেওয়া হয়ে দেশে-গাঁয়ে ফিরে এসে দেখে এই অবস্থা। আগুন নিভেছে বটে কিন্তু হলকা যায়নি। বাতাস পায় তো আবার মেতে ওঠে।

উঠুক—ওতো শুধু তাদের বাপদের কাণ্ড। তারা ছেলে-মেয়েরা, মা-বোনেরা ও সবের ধার ধারে না। তাদের খালে-বিলে যেমন সোঁত ছিল তেমনি থাকবে। দু-দুটো পুকুর কাটা যায় কিন্তু জল কখনো ভাগ করা যায় না। মাটির তলে তলে চলাচল করে।

ওদিকে পা বাড়িয়েছিল জামিলা—মঞ্জুর খাঁ হুমকে উঠেছিল : ও বাগে কি? ওরা আমার দুষমন। খবরদার—

বুঝেছিল জামিলা। এ শুধু মামলায় হেরে যাবার জন্যে নয়। এ নয় যে তার নতুন বয়স হয়েছে। এ নয় যে সে বেওয়া। এ যেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি নয়, এ একেবারে এ-মুলুক ও-মুলুক। এ-দেশ ও-দেশ। দুটো আলাদা জাতজন্ম। আগুন আর বাতাস নয়, আগুন আর জল। দুজন দুজনের দুষমন। ওর গরু এর হারাম।

কিন্তু সব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষে মানুষে শুধু একটুখানি মিল-মিশ সৃষ্টি করতে পারেন না?

কতটুকু কুটুম্বিতেই বা সম্ভব? তবু যতটুকু হয়। যতটুকু বা ছিল! তাই বা কম কি!

জামিলা মনে মনে হাসে। বম-ভোলা না হাতি! এত মুরোদ অথচ এক ঠেলায় পৃথিবীটা উলটে দিতে পারে না? উলটে দিতে পারে না সমস্ত বিধি-বেপার, সমস্ত আইন-কানুন? পশু-পাখির মতই তো মানুষ তার সৃষ্টি, মানুষের বেলায় কেন এত গোনা-গাঁথা, কেন এত গরমিল? এত ভাগাভাগি, এত বাঁটোয়ারা?

'মাঠের দিকে গিয়েছিলি কেন?' মঞ্জুর খাঁ ধমকে ওঠে।

'গরু দিয়ে কালীপদদের কলাইয়ের ক্ষেত তছরূপ করেছি বাজান।'

'বেশ করেছিস।'

মা জিগগেস করে : 'কোথায় যেছিল?'

'কান্দরে বান এসেছে দেখতে যেছলাম।'

'ভিজেছিস কেনে?'

'কালীপদদের সেই সরফুলি বাটিটা চুরি করেছিলাম না? সেটা কাদায় পুঁতে রেখে এলাম।'

'বেশ করেছিস।'

কাঁদরে দাঁড়িয়ে গাজন-খাটার নাচ দেখছিল জামিলা। কি মাতন রে বাবা! হটতে হটতে পা হড়কে পড়ে গিয়েছিল জলের মধ্যে। ধর-ধর তোল-তোল, সবাই হৈ হৈ করে উঠল, কিন্তু সবার আগে ছুটে এল কালীপদ।

চারপাশে ভিড় দেখে ঝাঁজিয়ে উঠল জামিলা : 'আমি বেওয়া মানুষ, আমাকে ধর তোমার সাহস কি?'

'যে সাহসে তুমি পড় সেই সাহস।'

'আজ বাদে কাল আমার নিকে হবে—দেশান্তরে চলে যাব। ছাড় ছাড়—'

'এখন চোত মাসের নদী। জল নাই ধারা নাই। যদি থাকত তো ভেসে যেতাম। ফিরতাম না। মনান্তর না হলে আবার দেশান্তর কি?'

'পাগল! যেখানেই যেতে সেখানেই সেই দুই মানুষের বাসা। এক দিকে ঈশ্বর আরেক দিকে আল্লা। রফা নাই রেয়াৎ নাই, মিট নাই আপোস নাই। কি বলো তো!'

কোথায় পাব সেই নির্মানুষের দেশ! কোথায় পাব সেই হাওয়া-খাওয়া মাঠ!

পাবে না যখন ভালো মানুষের মত ছেড়ে দাও। ঘরের মেয়ে ঘরে গিয়ে বন্ধ হই। তুমিও জাত বাঁচাও। বাবা ভোলার মান রাখ। বাবা ভোলা না বোবা ভোলা!

তোরা কিসের ভক্ত রে ছিরু?

আমরা মালার ভক্ত। বাবাকে গোড়ের মালা জোগাই। টগর আর রক্তকরবীর। আমরা বৈরাগী। আমাদের সাত দিনের উপবাস।

আর তোরা?

আমরা স্যাকরা। আমরা সিদ্ধির ভক্ত। সিদ্ধির গোটা গাছ—একবারে জঙ্গল নিয়ে এসেছি। বাবাকে ঢেকে দেব গাছ দিয়ে। বাবা যে সিদ্ধিপ্রদ।

'বলিস কি? সব সাধ মেটাতে পাবে বাবাব সাধ্য আছে?' কালীপদ তাচ্ছিল্যের ভাব করে।

'পারে বৈ কি।'

'যে গাছে শাদা ফুল ধরে সে গাছে লাল ফুল ফোটাতে পারে? রাতারাতি জাত বদলিয়ে দিতে পারে গাছের?'

'গাছের পারে না, মানুষের পারে।' বললে যুগলমির্ধাদেব একজন।

বলে কি সর্বনাশের কথা! মানুষের জাত-জন্ম সব একাকার করে দিতে পারে?

নতুন ভক্ত হলি এই বছর। তুই বাবা ভোলাব সামর্থের খবর জানিস কি? কণা-কণা সিদ্ধির পাতা বিলোনো হবে জনে-জনে, তাই নিয়ে যাস এক রেণু।

রেণু কেন, গোটা গাছ খেতে পারি শিলে বেটে।

ওবে অপ্লেয়ে খেতে হয় না, কাপড়ের গিঁটে বেঁধে বাখতে হয।

যুগল-মির্ধারা কুলের কাঁটা বুকে নিয়ে গড়াচ্ছে মাটিতে। অফলা কুলের গাছ। জীবনে বোধ হয় ফল পায় নি কিছুতে, তাই কাঁটার দাগ নিতে বুক চিরে-চিরে দিচ্ছে। যদি এবার কিছু সুফল ফলে।

কালীপদর মনে হল এমন কিছু করলে যদি হয়! বুক চিরে রক্ত না দিলে শুনবে কেন? শুধু একটা ইচ্ছে হলেই বাবারো ইচ্ছে হবে? তা কখনো হয়?

কুলের কাঁটা কেন, ইচ্ছে হল পাথরে মাথা ঠোকে। মুখ ঘসে, ঘাস-মাটি আঁচড়ায়-কামড়ায়। তবে যদি কালারুদ্দুরের দয়া হয়।

বাজে কথা। জাত বদলানো অসম্ভব। যে দেযাশিন, সেই যুগল মির্ধা হতে পারে না। জামিলা তো কোন ছার!

এত মানুষ, দুটো করে হাত পা, চোখ-কান, জাত জিনিসটা কেথায় লেখা আছে জিগগেস করি? একই তো রক্ত, একই তো কান্না। জাত যদি আলাদা, হাত দুটো তবে আলাদা হয না কেন? কেন এক হাত আবেক হাতের মধ্যে ধরা দিতে হা-পিত্যেশ করে? তার চেয়ে কালীপদ শাদা ফুলের গাছে লাল ফুল চাক! তা ঢের সরল। গোল নাচ নাচছে গয়লারা :

রাত পোহালে বাবা ভোলা
করবে আলা হোম-তলা
লোকে দেবে পূজো-পালা
(বাবা) নদীর জলে করবে খেলা।

লোক সরিয়ে দিচ্ছে সীমানাদার। এক দলের জায়গা আরেক দল না চেপে বসে। মারামারির রাত। ব্রতভঙ্গের রাত। যত রকম ভক্ত সব জড় হয়েছে মন্দিরে। সারিবোলান হচ্ছে, হচ্ছে পাঁচালি-কীর্তন, চলছে ঢোল-তবলা-হার্মোনিয়ম। ধুমুল পড়েছে চারদিকে। অগ্রদানী হাঁক পেড়ে ডাকছে ভক্তদের। তার হাতে আবিরের ফোঁটা নেবার জন্যে কাড়াকাড়ি লেগে গেছে।

কত জনের কত সাধ। কত মানৎ। কালীপদের মত সৃষ্টিছাড়া বুঝি কেউ নয়।

লাউসেনরা কুমড়ো-লাউ নিয়ে এসেছে। ধুপসেনেরা ধুলো বিলোচ্ছে চারধারে। যারা মায়ের পাতা তারা কালীর মুখোস পরে ডাকিনী-যোগিনী সেজে নাচছে। দাঁত বার-করা শোলার গয়না পরেছে সর্বাঙ্গে। এলানো চুল ফাঁপানো ঘাগরা—মুখ কটা আবির-মাথা। সব শুদ্ধ ষোল জন বোধ হয়। ষোড়শমাতৃকা। ওরা কি চায়? পুষ্টিতুষ্টি? না, জয়বিজয়?

ওরে বাবা, ওরা চামুণ্ডার পাতা! শকুনি-গৃধিনী খেলছে। মাঠে বা গোপথে-ভাগাড়ে মরা পশু-পাখি

নিয়ে শকুনী-গৃধিনীরা যেমন কাড়াকাড়ি করে তেমনি ঝটাপটি করছে ওরা। ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করছে পর্যন্ত। উবু হয়ে বসে কখনো বা মাটির উপরে বুক দিয়ে পড়ে দুই হাত-পায়ের শব্দে পাখসাট দিচ্ছে। একবার এগুচ্ছে আর বার পেছুচ্ছে, কখনো বা ঘাড় তুলে লম্বা করে হেলাচ্ছে-দোলাচ্ছে।

'ওমা, তুমি এখানে!'

ভিড়ের মধ্যে জামিলা। ভয়েতে ভর-ভর মুখ, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

'তুমি এখানে কেন? ভারি ভয়ের খেলা এখন। বাড়ি যাও।'

'আমার সে ভয় নয়।' জামিলা একটু হাসে।

জামিলার ধরা-পড়ার ভয়। কিন্তু কালীপদ ছাড়া তাকে আর এখানে চেনে কে! কে বা বুঝবে কেন এসেছে! কিন্তু অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে কোনো লাভ আছে? মাঝখান থেকে লোক-জানাজানি হয়ে গেলে অপমান করবে সবাই।

করুক। অপমানের আর বাকি কি। তোমার বাবা চোখ বুজে আছেন, থাকুন তেমনি। তাঁর দিকে আর তাকাচ্ছি না। মড়া নিয়ে আসবে যারা তাদের খেলা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আসবে না তারা?

কী সর্বনাশ! ঐ খেলা সইতে পারবে তুমি? ভয়ে চোয়ালের খিল আটকে যাবে না?

আমার চেয়ে তোমারই তো বেশি ভয়। রাজ্য-সিংহাসন কিছুই ছাড়তে পার না। ছাড়তে পাব না তোমার ঐ কালারুদ্দুরকে।

কে কি ছাড়ে বলো? কেউ কিছু ছাড়ে না। যদি একজন না জোর করে ছাড়ায়।

জোর করে বোলো না। দয়া করে ছাড়ায় বলো।

রোল উঠেছে ভিড়ের মধ্যে। কি ব্যাপার রে বাবা? জামিলাকে চিনে ফেলল নাকি?

না, না, তা নয়। কালকে-পাতারা মড়া নিয়ে আসতে পারবে না এ বছর। পাখমারার ডোবে মড়া খুঁজে পাওয়া যায়নি নাকি। তাগ বুঝে কেউ মরেওনি এই সময়টায় যে কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। শ্মশান পর্যন্ত শূন্য।

তারি জন্যে নৈরাশ্যের চাঞ্চল্য উঠেছে চার দিকে। মড়া নাচাবেনা এ বছর—বাবা ভোলা হল কি! এত নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে! এত বিমুখ!

'তবে এবার ফিরে যাও।'

'তোমার হাতের লতুন কাপড়খানা আমায় দাও না।' হাত বাড়াল জামিলা : 'বাবাকে দিয়ে আর কি হবে?'

'ও তো শাড়ি নয়, তুমি করবে কি?'

'গলায় বেঁধে ঐ সামনের গাছটায় ঝুলে পড়ব। মড়া পাচ্ছে না নাকি, আমার দেহটা নিয়ে দিব্যি খেলা দেখাতে পারবে।'

কথাটার যেন কত কষ্ট। কালীপদ দিয়ে দিল কাপড়খানা। বাবার জন্যে এনেছিল, তাকে দিয়ে আর কি হবে? সংসার ভরা যার এত ঐশ্বর্য তার ঐ একখানা কাপড়ে কি আসে যায়? তার চেয়ে মনের মানুষের গায়ে এই কাপড়খানা গায়ের পরশের মতন লেগে থাক।

'কোথা গিয়েছিলি পোড়ামুখি?' জামিলার মা হুমকে উঠল।

'কালীপদর বাড়ির সবাই 'জাগরণে' গেছে। সেই ফাঁকে ওদের বাড়ি ঢুকে এই কাপড়খানা চুরি করে এনেছি।'

'বেশ করেছিস।' মঞ্জুর খাঁ আর তার স্ত্রী এক সঙ্গে হেসে ওঠে।

না, মড়া জোগাড় হয়েছে। বাঁশের খুঁটোর সঙ্গে খাড়া করে বেঁধে এনেছে তাকে। দু' হাত দু'দিকে মেলে ঠিক সোজাভাবে দাঁড়িয়ে আছে মড়াটা। মুখে সিঁদুর-আবির মাখা। গলায়-মাথায় করবী আর আকন্দফুলের মালা। কোমরে মালকোঁচা বাঁধা। ধূপধুনো পুড়ছে, ঢাক বাজছে, আর সেই বাজনার তালে-তালে বাঁশবাঁধা সেই মড়া নাচছে। সঙ্গে সঙ্গে নাচছে সব ভক্তেরা। আর থেকে-থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে।

সমস্ত সংসারক্ষেত্রে এবার শ্মশান হয়ে গেছে। এবার, বটুকনাথ ভৈরব, হে বিভূতিভূষণ, তুমি জাগো।

আর কেউ নেই, শুধু শিব আর শক্তি। পুরুষ আর প্রকৃতি। কলীপদ আর জামিলা।

ভয়ে সবাই ছুটে পালাচ্ছে, আবাব ফিরে তাকাচ্ছে। ফিরে তাকাচ্ছে তো আবার চিৎকার করছে। বাড়ি পৌছেও বুকের ধড়ফড়ানি যাচ্ছে না। কিন্তু কালীপদ নিশ্চল-নিষ্ক্রিয়। শক্তিশূন্য।

মড়া নিয়ে চলে গেল ভগুরা। আবার লোকজন জড় হতে লাগল আস্তে-আস্তে। কিন্তু জামিলার আর দেখা নেই।

'ও কে, ও কে ঢোকে রুদ্রদেবের মন্দিরে?' হাঁ হাঁ করে উঠল সবাই।

কী সর্বনাশ! ও যে চণ্ডাল। ও মন্দিরে ঢোকে কোন সাহসে?

ও জলকুমুরী। জটাধারী। এক পুরুষের বংশ ওদের। ব্রত করলেই ওদের জটা হয়। মন্দিরে ঢোকবার আজ ওদের নির্বিঘ্ন অধিকার।

তেমনি আজ বীরপঞ্চানন বাগদি। হাড়ি মশালদার।

সমস্ত অভাজনের দেবতা তুমি। সমস্ত জনগণের দেবতা। কিন্তু ভগবান, বলো, কেবল একজন কেন বাদ পড়ে? কেন তুমি সকলের হয়েও কালীপদর নও?

ওরা কারা নাচতে এসেছে আগুন নিয়ে?

ওরা ব্রহ্মার পাতা, অশ্বত্থ যজ্ঞিডুমুর আব বেলকাঠের আগুন করেছে। শুধু তাই নয়, সেই আগুনের উপর গড়াগাড় দিচ্ছে।

ব্রহ্মপদ কি আর অমনিতে মেলে?

বলা-কওয়া-নেই, কালীপদ হঠাৎ ঝাঁপিযে পডল আগুনের মধ্যে। গড়াগড়ি খেতে লাগল।

এ আবার কোন ভক্ত?

আমি ভক্ত নই। ভক্তরা তো বাইবে দগ্ধ হয়, আমি অন্তবে দগ্ধ হচ্ছি। অন্তর্দাহ মেটাবার জন্য বহির্দাহেব শরণ নিলাম। তাই যদি এবার দেখেন বাবা রুদ্রদেব। আমি ভক্ত নই। আমি জ্ঞানপাপী।

ভোরবেলা জনগণের দেবতা রুদ্রদেব বেরুলেন শোভাযাত্রায়। ময়ূরাক্ষীর তীবে হোমতলায় বিশ্রাম করে ফিরবেন আবার মন্দিরে—নিজ-নিকেতনে।

পথে তিনি পথিকের দেবতা। সমস্ত পথহীনের।

বারের বামুন বাবাকে কোলে করে এনে পালকিতে বসিয়ে দিলে। খোলা পালকি। জানলা-কপাট নেই, খিল-শিকল নেই। যেই হাত বাড়াও ছুঁতে পারো দেবতাকে। ঠেলা দিয়ে ভেঙে দিতে পারো তার কালনিদ্রা।

বাবার বিছানা-বালিশ এল। চামরববদাব চামর নিলে। বালিশে হেলান দিয়ে বিছানায় আলস্য রাখলেন গণদেব। সুরু হলো চামর খাওযা। আবার কি ঝিমকিনি এল নাকি, না কি বাবা সব সময়েই ঘুমে?

পালকির আগে ঢাক, ঢাকের আগে নিশান, নিশানের আগে দগড়। কাঁধের ভক্তরা পালকি বইছে। এগুচ্ছে দু-পা দু-পা করে।

কাঁটাঝোপে আর ঝোড়জঙ্গলের মধ্যে বাবার রাস্তা। পুকুরের গাবা বা আঁস্তাকুড়ের পাশ দিয়ে। সাধারণের যিনি দেবতা তাঁর পথ এমনি অগম্য। ধুলো-কাঁটায় ভরা। তাই দিকে-দিকে ধুলো ওড়াও। সব বাবার পদরেণু। বাবার জয়-বিজয়!

হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে ইত্তিলোকেব। বাবাকে দেখবে, বাবাকে ধরবে, বাবাব বাহনে কাঁধ দেবে। সব এলাকা ভাগ-ভাগ করা আছে। কার ক চেন, কার ক রাশি! কার কি পূজো-প্রণামী, তাও ঠিক হয়ে আছে। কার চাল-চিনি, কার ফল-জল, কার বা ফুল-দুধ।

আগে চল কুকর পাড়া, পরে শাঁখারি পাডা, স্যাকরা পাড়া, কায়েৎ পাড়া। তল্পিদার কই হে? মাথার ধামা নামিয়ে নাও যা কিছু দেয় তারা মুঠো ভরে।

সারা পথ ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল। আরো-আরো ধুলো ওড়াও। আমাদেরই মত আমাদের

দেবতা আজ পথ দেখেছেন, পথ নিয়েছেন। বোলো—বাবা ভোলার নাম প্রীতিপূর্ণ করে হরি হরি বোলো—বোলো শিবো—বোম্—

সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্তদের বেতে-বেতে ঠকাঠকি—কাঠিতে-কাঠিতে কটকটকট। বলো কোন গাছে ফল হয় না, ঠেকিয়ে দিই। কার শক্ত অসুখ, লাঠির আচ্ছাদনের নিয়ে এসে দাঁড়াও।

এবার মুচিপাড়ার হিসসা। ভাগাড়ের মুচিরা এসে ঠাকুরের গায়ে হাত বুলুতে লাগল। কত বঞ্চনার পর অঞ্চলে এল বলো তো!

তারপর মেথরেরা। নরক ফেলে তারা ঠাকুরকে তুলে নিলে কাঁধে। তাদের চৌহদ্দিটুকু পার করে দিলে।

এবারে এই পুকুড়গাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদীতে ঠাকুর একটু বিশ্রাম করবেন। জানো না বুঝি? এই জায়গার নাম বিশ্রামতলা।

বিশ্রামের পর আবার রওনা হলেন। এবার নবগ্রামদের কাঁধে।

তারপর এলাকাটুকু? ওই ঢিপিটার থেকে ঐ কাঁদরের পাড় পর্যন্ত?

হঠাৎ নিকিরিয়া ছুটে এল। মঞ্জুর খাঁ, সাহাদাৎ শেখ, জুব্বারি মুন্সির দল। কি ব্যাপার? মারপিট করবে নাকি? ঠেকাবে নাকি ঠাকুরকে?

না, আমরা কাঁধ দেব। কোলে নেব বাবাকে। এটুকু আমাদের ইলাকা। আমাদের সীমানা। মুসলমানদের।

বাবা ভোলার নামে প্রীতিপূর্ণ করে—রব উঠল, জয় উঠল চারদিকে।

তিরিশ-চল্লিশ গজ রাস্তা মুসলমানরা পালকি বইলে। ঠাকুরকে পারে করে দিলে বুক করে। যুগ্যি ছেলে যেমন বুড়ো বাপকে পার করে দেয়।

বেরিয়ে এল জেনানাবা। দাঁড়াও, বাবা এখন আমাদের বাড়িতে। হাতের যত্নে তার সেবা করি, আঁচলে বাতাস করি তাকে। গরিব মেয়ের বাড়িতে এসে বাবার না কোনো ত্রুটি হয়।

হঠাৎ কালো কষ্টির গায়ে তীক্ষ্ণ একটা সোনার দাগ পড়ল যেন। কালীপদ চোখ ফিরিয়ে দেখল, জামিলার হাসি, জামিলার আনন্দ।

কত বড় জীবন্ত ঠাকুর দেখ। আমাদের তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর আর আল্লা এক—আমরা এক বাবার সন্তান। কোনো ভেদ নেই. বাধা নেই। তুমি এক পুরুষ আমি এক মেয়ে। সারা সংসারে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, কিছু নেই। আমি ছাড়া তুমি মিথ্যে, তুমি ছাড়া আমি শূন্য।

কালীপদ তাকাল একবার ঠাকুরের দিকে। ঠাকুরের চোখ কই! আশ্চর্য, জামিলার চোখের মধ্যে দিয়ে তিনি চেয়ে আছেন। দুটি বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ। আকাশ ভরা টলটলে নীলের ঢেউ।

হোমতলায় গিয়ে নিচের আসনে বসেছেন রুদ্রদেব। সবাই জল ঢালছে তার মাথার উপর, স্নান করাচ্ছে। জামিলা কালীপদও জল দিল। সবার-স্পর্শে-পবিত্র-করা জলে দেবতা পবিত্র হলেন।

শুধু জল নয়, দুজনে বাটা দিলে ঠাকুরকে। বটের পাতার ছোট ঠোঙাতে করে ফুল আর কলা আর আমের টুকরো। হোমাগ্নিতে আস্ত কলা আহুতি দিলে দুজনে। যদি দেয়াল-আড়াল ভেঙে দিলে বাবা, আবরণ-আচ্ছাদনও মুছে ফেল। জীবন পুরন্ত কর, ফলন্ত কর। অফুরন্ত কর।

কি মোহে আছে দুজনে, সন্ধ্যায় ঠাকুরের শীতল দেখলে, আরতিও দেখলে। রাতে শোল মাছ পোড়া দিয়ে খিচুড়ি ভোগ হল, তার প্রসাদ নিলে। আর ভয় কি! আর আপশোষ কি। বাবা আসন বাসন, শয়ন-ভোজন সব এক করে দিয়েছেন। আর কোনো ফাঁক-ফাবাক নেই। তোমরা-আমরা নেই।

এক রাত্রি থেকে বাবা ফের ফিরে গেলেন ভোর বেলা। জামিলা-কালীপদ বললে, আমাদের আর ফেরা নেই। আমরা চললাম পালিয়ে। চললাম এগিয়ে। মিলিয়ে দেবার কর্তা তুমি, এগিয়ে দেবারও মালিক হয়ো। আকাশে বাতাসে না দেখি, দেখব তোমাকে আমরা আমাদের চার চক্ষুর মাঝখানে।

চলো, যাবার আগে বাবাকে একবার দেখে যাই, ছুঁয়ে যাই। সোনার অলংকার পরে সিংহাসনে বসেছেন বাবা, মাথায় চুড়ো, কাঁধে সাপ, হাতে ধুতরো আর কঙ্কন, গলায় হার আর পায়ে খড়ম, চলো দেখে আসি। পথের ঠাকুর সিংহাসনে বসেছেন। আমাদের প্রত্যহের চাওয়া চিরকেলে পাওয়া পেয়েছে! এ কি কম কথা!

কে রে ওঠে মন্দিরে চাতালে? বারের বামুন গর্জে উঠল।

'আমরা।'

'কে তোরা?'

'আমরা আবার কে! আমি আর ও! মন্দিরে ঢুকে বাবাকে স্পর্শ করতে এসেছি।'

বারের বামুন আর তার শিষ্য-সাকরেদরা ঘাড়ে রদ্দা মেরে আগুন থেকে বের করে দিলে কালীপদকে। জামিলাকে দূর-দূর করে কুকুর তাড়ানোর মত করে খেদিয়ে দিলে।

কালীপদ বললে, 'কাল যে বাবাকে দেখেছিলাম, ছুঁয়েছিলাম, ধরেছিলাম—'

'ঐ এক দিন।'

শুধু ঐ এক দিনের স্বপ্ন। বাবা আবার অভিষেক করে উপরে উঠেছেন। শুধু এক দিনের জন্যে নেমেছিলেন নীচকুলে। মন্ত্রে শুদ্ধ হয়ে আবার সম্ভ্রান্ত হয়েছেন। বসেছেন তাঁর পাকা স্বত্বের জমিদারিতে।

'তিনি আর আমাদের নন?' শূন্যকে জিগগেস করলে কালীপদ।

'কোনোকালেই আমাদের ছিলেন না।' জামিলা চলতে চলতে সরে গেল অজান্তে: যখন ফিরে গেছেন শুনলাম তখনই বুঝেছিলাম আমাদের ফিরতে হবে।'

'বুঝেছিলে?' জামিলার মুখটা হাত দিয়ে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল কালীপদ।

জামিলা চোখ বজল। কালীপদর মনে পড়ল ঠাকুরের চোখ নেই। শুধু নিষ্ঠুর পাথরে নিষ্পলক অন্ধতা।

শিবরাম চক্রবর্তী

ঘোড়দৌড়ের গোপন খবর

আমার জ্যেঠতুত বোন সুশীলার মেয়ে—যার অন্নপ্রাশনের সময়ে তক্ষশীলা থেকে প্রেতশীলা পর্যন্ত সমস্ত শিলালিপির তন্ন তন্ন খোঁজাখুঁজি পড়েছিল—অবশেষে সবে ফার্স্টক্লাসে ওঠা আমি আমার সামান্য ইংরেজিবিদ্যার জোরে পাঠ্য বই থেকে নামকরণ করে' দিয়ে সবদিক বজায় রাখি—সেই আমাদের প্রিসিলার চিঠি!

লিখেছে সে—"মেজমামা, তোমার হাতের লেখা চমৎকার, আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু এরপর থেকে তোমার চিঠি লেখায় তোমাকে যদি বাংলা টাইপ-রাইটার ব্যাভার করতে বলি, তুমি রাগ করবে না তো?

'এই ঘৃত খাওয়ার ফলে পক্ষাঘাত অনিবার্য্য।' তোমার এই লেখার থেকে 'দেওঘরে তোমরা সকলে কেমন আছো জানিও' এই কথাই তুমি বলতে চেয়েছো যদি ধরে' থাকি, তাহলে ঠিক হয়েছে কিনা? ঠিক হলে তার জবাব হচ্ছে, আমরা এখানে বেশ আরামেই আছি।

আসল দেওঘর থেকে এ-জায়গাটা একটু দূরে, পাহাড়-ঘেঁসা দেহাতের মধ্যে। শহরের মেয়ে হয়ে আস্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে কিভাবে আমি লালিত হচ্ছি, যদি স্বচক্ষে দেখার কৌতূহল থাকে, দিনকতকের জন্য আমাদের এখানে এসে থেকে যাও না কো! তাহলে কিন্তু বেশ হয়। তুমি এলে মজা হয় খুব।..."

প্রিসিলা আমার সকল ভাগ্নীর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়...সেই প্রিসিলার চিঠি! জানালার বাইরে আমি তাকাই। গাছে গাছে বসন্তের পাতা পড়েছে। আমের মুকুলে প্রচুর পরিবেশনের গন্ধ। বাতাসে দক্ষিণ সমুদ্রের আমেজ।

প্রিসিলা আধমাইল এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছিল। সরল পথ ছেড়ে বাঁকাচোরা মেঠো রাস্তা দিয়ে আমাকে সে নিয়ে চলল। যেতে যেতে আশেপাশের, দূরের এবং নিকটের, বনজঙ্গল পাহাড়-পর্ব্বতের নামধাম বৃত্তান্ত মুখে মুখে পেতে লাগলাম।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছানো গেল। বাংলো প্যাটার্নের বাড়ী। পাহাড়ের কোলঘেঁসেই বলা চলে।

কয়েকটি ভ্যাড়া চরছিল। ওদের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট একজনের সঙ্গে প্রিসিলা আমায় পরিচয় করিয়ে দিল।

'ও হচ্ছে মঙ্গল!' বলল ও, "ওকে আমি আগে রবি বলে ডাকতুম, কিন্তু এখন মঙ্গলে বদলেছি।"

"কেন?" আমি প্রশ্ন করলাম। ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি পাল্টে যাবার মূলে প্রায়শঃই একটা হেতু থাকে। কুরুক্ষেত্রের মতই একটা কারণ না থেকে যায় না।

"তার কারণ অর্থাৎ কি না—"

ওইটুকুই বলেই প্রিসিলা থামল। ওর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

"জায়গাটা খুব নিরিবিলি, তাই না?" অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি আমার, "তরুণ সঙ্গী—কিশোর বন্ধু—সে ধরনের কিছু এধারে নেই টেই বোধ হয়?"

"নির্জনই ছিল বটে গোড়ায়," বলল প্রিসিলা, "কিন্তু এখন রবি আসায়—"

"ওর নাম মঙ্গল বলছিলি বলে মনে হচ্ছে যেন।" ভেড়াটার প্রতি আমি কটাক্ষ করি।

"মঙ্গলই ওর নাম, কিন্তু আমি ওর কথা বলছিনে। আমি রবির কথা বলছি—রবি রায়।"

"তাই বল!" আমি মন্তব্য করি। "তা—এই রবি রায় ব্যক্তিটি কে?"

"ও একটা ছেলে, এমন কিছু না।" উড়ু উড়ুভাবে প্রিসিলা উত্তর দিল, "কোনোরকমে আমার সঙ্গে ভাব করেছে। আর ঐ যে দেখছ ওখানে দাঁড়িয়ে, ওই হচ্ছে বব্‌লু। বব্‌লুকে আমি ভয়ঙ্কর ভালোবাসি। ভারি মিষ্টি ও।"

বব্‌লুকে দেখে ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়া বলে' আমার ধাবণা হোলো। স্বাস্থ্যের খাতিরে একলাই, কিম্বা কারো সাথে হাওয়া বদ্‌লাতে পশ্চিমে এসেছে। মাটন্ চপের মত ওর মুখখানা।

"এম্‌নি ও চরে বেড়াত। আমরা ওটাকে ভাড়া করেছি। এখন আমি ওতে চড়ে বেড়াই। আস্তে আস্তে চলে, পড়ে যাবার কোন ভয় নেই। তবে খুব বুদ্ধিমান ঘোড়া, কথা বললে বোঝে। ওর বুদ্ধির কথা কি বলব মেজমামা, একদিন হয়েছে কি—" বলতে বলতে প্রিসিলা থেমে গেল।—"আমরা হাঁস পুষেছি, দেখবে এসো"—আদেশ করলে আমায়।

"কিছুতেই না : যতক্ষণ না আমি এই রবির সমস্ত কাহিনী ধারাবাহিক শুনছি—" দৃঢ়স্বরে আমি জানালাম, "হাঁসের দিকে আমি ফিরেও তাকাব না।"

"বৃথা হাঁসফাঁস করছ মেজমামা, রবির সম্বন্ধে বলার কিছু নেই। নিতান্ত সাধারণ একটা ছেলে,—" ঠোঁট দুমড়ালো প্রিসিলা, "ওইখেনে থাকে, ওই পাহাড়ের ওপবটায়। ওই যে বাড়ীর ফুট্‌কিটা দেখছ, ওইটেতে। সবে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে—এই সেদিন তো—মাসীর বাড়ী বেড়াতে এসেছে। পরীক্ষার ফল বাহির হওয়ার অপেক্ষায় এখানে আছে।"

"অপেক্ষা করতে করতে বোধ হয় খুব কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা—তাই না?"

"হুঁ, তাই হয়েছিল বটে, কিন্তু—" প্রিসিলা তাড়াতাড়ি কথার পিঠে অন্য কথা পাড়ে, "চলো—হাঁসদের দেখবে চলো। দেখলেই তুমি ভালোবাসবে। এমন সুন্দর হাঁস প্রায় দেখা যায় না।"

"আমার মনে হচ্ছে ছেলেটা ভারী ক্যাব্‌লা।" আমি বলি, "তাই বুঝি তুই ওর নামে ভ্যাড়াটার নামকরণ করেছিলি?"

"হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক।" প্রিসিলা জানায়, "প্রথম দর্শনে ওদের দুজনকে অভিন্নাত্মা বলেই আমার বোধ হয়েছিল। একরকম হাবভাব—এক ধরনের চালচলন দুজনেব। প্রথম যেদিন রবিকে দেখি একদিন বিকেলে, শান্তশিষ্ট মেষের সব লক্ষণ বেশ স্পষ্ট ওর মধ্যে দেখতে পেলাম। এবং তারপরে যতবার দেখা হয়েছে, মত বদলানোর কোন কারণ দেখিনি। এই মাঠেব মধ্য দিয়ে শর্টকাট কবে' ও বাড়ি যায়—এক একবার তো আমি ওর পথেই পড়ি—শান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো ও আসে আর পাশ দিয়ে চলে যায়। চুপ্ করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, চোখ তুলে অনেক সময় তাকায় না, এমন কি।"

"ও যদি এতই লাজুক আর বোকা," না বলে' আমি পারি না, "তুই কেন বেচারীকে কাছে ডেকে একটু উৎসাহিত করিস্ নে? একটু সাহায্য করলেই তো হয়!"

"আর ওর মনে ধারণা জন্মিয়ে দিই যে আমি—আমি ওর—কক্ষণো না!" প্রিসিলা ঘোরতর প্রতিবাদ করে, "অতো সহজে কারো প্রেমে পড়বার মেয়ে আমি নই!" ওর আত্মমর্যাদায় যেন আঘাত লাগে।

"নিজে না পড়লেও, ওকে ফেলতে তো কোনো বাধা ছিল না?" কথাটা আমি একটু ঘুরিয়ে দিই, "মেষকে একটু উন্মেষিত করলেই বা কি হয়!"

"বাইরে মেষের মত দেখতে, কিন্তু আসলে ছেলেটি খুব ভালো—সত্যি ভালো খুব। বুঝেছ মেজমামা, একেক সময়ে ওর জন্যে আমার ভারী দুঃখ হয়, ও এত হাবা কেন? অত ভালোমানুষ হওয়াটা কি ভালো—এই যুগে? আমার মুখোমুখি এলে এমন ও আরক্ত হয়ে ওঠে, বেচারীর দম বন্ধ হবার মত হয়। সত্যি, আমার বড্ড মায়া হয়।...ওই, ওই আমাদের সেই হাঁসগুলো। কি রকম, খুব সুন্দর না?"

সত্যি বলতে, হাঁসগুলির সৌন্দর্য মোটেই আমাকে বিমুগ্ধ করে না. বরং ওরা আমাকে কেমন যেন অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখছে বলে বোধ হতে থাকে। ওদের উপহাসে বিচলিত হয়ে, সে স্থান পরিত্যাগ করে' প্রিসিলাকে নিয়ে আরো আমি এগিয়ে যাই—"হ্যাঁ, কি বলছিলি, অবশেষে এমন একদিন এল যেদিন—" ওর বক্তব্যের ছিন্নসূত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করে' দিতে আমি চাই।

অবিশ্যি, প্রিসিলার আগের কথার সঙ্গে এই নতুন বার্তার বস্তুতঃ কোনো সংযোগ ছিল না, কিন্তু হাজার হোক, প্রিসিলা ছেলেমানুষ তো আমাদের—আমার মত মামাদের—কথাশিল্পের সাথে পেরে উঠবে কেন? অচিরে নিজের অজ্ঞাতসারেই, সেই দিনটিতে সে এসে পড়ে।

"হ্যাঁ, সেইদিন—সেই বিকেলে—বব্‌লুকে নিয়ে আমি কামারের বাড়ি যাচ্ছিলাম—পায়ের একটা আল খুলে গেছ্‌ল বেচারার—মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি—দেখি রবি সেই পথেই আসছে—দূরে দেখতে পেলাম। আমি রবির পথ পরিষ্কার করার জন্যে রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে বব্‌লুকে চালালাম। রবিও এসে পড়েছে, এমন সময়ে বব্‌লু করলে কি, কথা নেই বার্তা নেই, ছুট লাগাল হঠাৎ। এমন ও কক্ষণো করে না, দৌড়ানো ওর স্বভাববিরুদ্ধ, তাছাড়া রবিকে দেখে ভয় পাবারও ওর কোনো কারণ ছিল না—"

"ঈর্ষার বশেই কি না কে জানে?" আমার ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিভঙ্গি। কথাশিল্পীরা সাধারণতঃ মনস্তাত্ত্বিক হয়ে থাকে। না হয়ে পারে না।

"ঈর্ষা? মোটেই না। বব্‌লু জানে যে ওকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। এ ছাড়া আর কারো পিঠে আমি চড়ি না তো। ব্যাপারটাকে অঘটনই বলা যায়। যাই হোক, দৌড়ান ওর পক্ষে সহজ নয় তবুও যথাসাধ্য ও ছুটতে লাগল, আর আমি দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে ঝুলতে চললাম। মাঠ পার হয়ে একেবারে পাহাড়ের কিনারে গিয়ে থামল নির্জন একটা জায়গায়। আর অমনি আমি ওর ঘাড় থেকে খসে টুপ করে মাটিতে পড়ে গেলাম। বেশ কায়দার ওপর পড়তে হয়েছিল। বলতে কি! পড়েই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। এবং সেই অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে শুয়ে রবি দৌড়াতে দৌড়াতে আসছে লক্ষ্য করলাম।"

"সেই অচৈতন্য অবস্থায়—?" আমি হাঁ হয়ে যাই। কার্যশিল্পীরা কথাশিল্পীদের কোথায় না ছাড়িয়ে যায়?

"অচৈতন্য বই কি! ও যখন এসে জানতে চাইলে আমার কোথাও লেগেছে কি না, তখন আমি একটা কথাও বলতে পারলাম না। যখন ও আমাকে কোলে তুলে নিল তখনো আমি অচৈতন্য। কিন্তু অত জোরে আমাকে জাপটে ধরার কোনো দরকার ছিল না, একথা আমি বলব। তথাপি আমার জ্ঞান ফেরার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। অবশেষে আমি যখন স্থির করলাম এবার আমার সজ্ঞানে আসা উচিত, আস্তে আস্তে চোখ খুলে ক্ষীণ স্বরে আমার প্রশ্ন হলো, 'আমি কোথায়?' এবং যখন আমি

দেখলাম আমি যথাস্থানে নেই বরং যার-পর-নাই অযথা স্থান আমাকে দেওয়া হয়েছে, এই তথ্য ক্রমশঃ আমার হৃদয়ঙ্গম হলো, তখন রবিবাবু, এটা আপনার উচিত হয়নি' একথা আমি বলতে বাধ্য হলাম—"

নারীরা মাতুলক্রম হয় না বলেই, প্রিসিলা আমার ভাগনী হয়েও আমার বোকামির ভাগ পায়নি। এ কথা আমি বুঝতে পারি। এবং রবি ছেলেটি আমার ভাগনে নয় বলেই ভাগ্যবান, তা বুঝতেও আমার বিলম্ব হয় না।

"আমার কথায় ও থতমত খেয়ে বলল, 'তুমি যে বললে তোমাকে শক্ত করে' ধরে' রাখতে যাতে ফের না পড়ে যাও।" ছেলেটা কী বোকা এতেই তুমি বুঝবে। আমি তো অজ্ঞান ছিলাম, অজ্ঞান হয়ে আমি কখনো এ কথা বলতে পারি? ভাবো তো! একটা কথার জবাব দিতে পারে না—কি বলতে কি বলে' বসে—এমন অপদার্থ দেখেছ? আমি বললাম, "আমি এ কথা কখন বললাম? আমি তো অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।" তার উত্তরে ও বলল "সেইজন্যই তুমি বলেছ কিনা তোমার মনে নেই।"

"যতো বোকা ওকে তুই ভাবছিস বা যে রকম হাঁদা ওকে দেখায়, ততটা নয় বোধ হয়।" আমি অনুযোগ করি।

"তারপর এমন মুস্কিলে পড়লাম, কী বলব মেজমামা। ছেলেটা আর আমাকে কোল থেকে নামাতেই চায় না। এই অবস্থাতেই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে চায়। বোকাদের নিয়ে যে কী বিপদ! ও বললে, 'তোমাকে আর ঘোড়ায় চাপতে দেওয়া হবে না।' দেখছ, একটু সুযোগ পেলেই ছেলেরা কি রকম মুরুব্বি হয়ে ওঠে? তক্ষুণি আমার অভিভাবক হতে চায়, দেখেছ। কি করি, বলতে হোলো, 'ঘোড়ায় আমি চাপব না, তবে হেঁটে হেঁটে যেতে পারব।' নিজের পায়ে ভর দিলে পুনশ্চ পড়ে যাবার ভয় নেই, এ কথা ওকে আমি বোঝালুম। সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান হয়ে, অবিশ্বাসভরে ও যেন খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেই আমাকে নামতে দিলে।"

"ইস্!" রবির স্বার্থত্যাগ আমাকে গভীর বিস্মিত করে।

"বব্লুর লাগাম ধরে আমি চলতে লাগলাম। আমার একপাশে রবি, আর একপাশে বব্লু। রবির ব্যবহারে আমি অবাক হয়ে গেছলাম, এ যেন সে-ছেলেই নয়, একেবারে আলাদা। সে লাজুকপনাও নেই আর। একটু ভাব হয়ে গেলেই কি ছেলেরা এইরকম বেয়াড়া হয়ে যায়? বলব কি মামা, চলতে চলতেই, সে আমার একহাতে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করল—পাছে আমি ফের মাথা ঘুরে পড়ে যাই তার থেকে সামলাবার জন্য। কিন্তু অতখানি হঠকারিতা বরদাস্ত করা কি কোনো ভালো মেয়ের উচিত? তুমিই বলো? 'অতটা ভালো নয়।' একটু গরম হয়েই আমি ওকে বললাম। না বলে' পারলাম না। সত্যি, ওসব আমি পছন্দ করিনে।'

"বঙ্কিমবাবুর ভাষাতেও বলতে পারতিস্," আমি বাতলাই, "ধীরে, রজনী, ধীরে।"

"যাই হোক, তারপরই আমি ভ্যাড়াটার নাম পালটে দিয়েছি।" বলল প্রিসিলা, "রবি থেকে মঙ্গল করে' দিলাম। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই।"

"মোটে একবার বদলেছিস—সোমবারটা।" আমি বলি, "কিন্তু সাবধান, আরেকবার না বদলাতে হয়। তাহলেই বুধ ডিঙিয়ে বৃহস্পতি হয়ে দাঁড়াবে। আর, একবার গতিক পেলেই, যতই বৃহৎ হোক, আবার ভ্যাড়া হয়ে যেতে কতক্ষণ? কি বলে গিয়ে—ফের আবার রবি হয়ে যেতে দেরি কি?"

"কী যে বলো, মেজমামা?" প্রিসিলার গালে লালিমার ছোপ লাগে।

চক্করটা ঘুরে আসতেই, বব্লুর কাছাকাছি আমরা পৌঁছই। বব্লু ঘাস খেতে খেতে মাঝে মাঝে মুখ তুলে নির্লিপ্ত নেত্রে বিশ্বজগতের দিকে চাইছিল।

প্রিসিলা বব্লুর কাছে দাঁড়িয়ে ওর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

"সত্যি, বব্লুকে আমি বড্ড ভালবাসি," বব্লুর কানের কাছে ও গুনগুন্ করল, "কিন্তু সেদিন তোমায় সেই ঘোড়দৌড় করাতে কী বেগই না পেতে হয়েছিল আমায়! বাব্বাঃ। সে আমার মনেই আছে।"

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ভস্মশেষ

বারান্দার এদিকটা সরু। নিচে নামবার সিঁড়িও খানিকটা ভেঙে পড়েছে। তবু সন্ধের আগে এই দিকেই চেয়ারগুলো ও টেবিল পাতা হয়--এদিক থেকে দূরে পাহাড় আর নদীর খানিকটা দেখা যায় বলে।

কৈফিয়তটা নিরর্থক। পাহাড় ও নদী অবশ্য কেউ দেখে না আজকাল। একদিন হয়তো সত্যিই সেই দেখাটা ছিল বড় কথা, এখন আর তার কোনো অর্থ নেই। যা ছিল আনন্দ তা আজ অর্থহীন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

বারান্দায় এই চেয়ার পাতাটুকু থেকে এ বাড়ির অনেক কিছুর, আরো গভীর কিছুর পরিচয় হয়তো পাওয়া যেতে পারে! এই কাহিনী সেইজন্যেই লেখা।

সবার আগে জগদীশবাবু এসে বসেন। নিচু ইজি চেয়ারটি তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট! চেয়ারের দুধারের হাতলে সুপুষ্ট হাত দুটি ও সামনের টুলে পা দুটি রেখে নিশ্চিন্ত আরামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকা তাঁর পরম বিলাস। স্বেচ্ছায় পারতপক্ষে কথা তিনি বড় বলেন না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুরমা একটু পরে আসেন। শাড়িতে প্রসাধনে আলুথালু ভাব। আলুথালু ভাব বুঝি প্রকৃতিতেও। এসেই তিনি জিজ্ঞেস করেন 'এর মধ্যেই ঘুমোলে নাকি?'

ইজি চেয়ারে জগদীশবাবু একটু নড়েচড়ে জানান তিনি ঘুমোননি।

সে প্রশ্নের জবাবের জন্যে সুরমার অবশ্য কোনো আগ্রহ নেই। অভ্যাস মতোই প্রশ্নটা করেন, তারপর বেতের মোড়াটিতে বসতে গিয়ে উঠে পড়ে হয়তো বলেন 'ওই যা দোক্তার কৌটোটা ভুলে এলাম।'

জগদীশবাবু চক্ষু মুদ্রিত অবস্থাতেই বলেন, 'ডাকো না চাকরটাকে।'

সুরমা আবার বসে পড়ে বলেন, 'তাকে যে আবার বাজারে পাঠালাম। যাও না গো তুমি একটু।'

ইজি চেয়ারে জগদীশবাবুর নড়াচড়ায় কোনো লক্ষণ না দেখে মনে হয় তিনি বোধ হয় শুনতে পাননি: অন্তত ওঠবার আগ্রহ তাঁর নেই।

কিন্তু সত্যি জগদীশবাবু খানিক বাদে বিশেষ পরিশ্রমে ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন দেখা যায়। জগদীশবাবুর আরামপ্রিয়তা ও আলস্য যত বেশিই হোক স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্ন ও দৃষ্টি তার চেয়ে প্রখর।

জগদীশবাবুকে কিন্তু কষ্ট করে আর যেতে হয় না। বারান্দার সিঁড়িতে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুরমা বলেন, 'থাক থাক, তোমার আর যেতে হবে না। ডাক্তার, আমার দোক্তার কৌটোটা নিয়ে এসে একেবারে বোসো। বিছানার ওপরই বোধ হয় ফেলে এলাম। আর ঘরের আলোটা বোধ হয় নিবিয়ে আসিনি। সেটা নিবিয়ে দিয়ে এসো।'

আদেশ নয় অনুরোধেরই মিষ্টতা আছে কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সে মিষ্টতা খানিকটা যেন যান্ত্রিক।

মিষ্টতা সুরমার সব-কিছুতেই এখনো বুঝি অনেকটা আছে, চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, প্রকৃতিতে। বয়সের সঙ্গে শরীরের সে তীক্ষ্ণ রেখাগুলি দুর্বল হয়ে এলেও তাদের আভাস আলুথালু বেশ ও প্রসাধনের মধ্য দিয়েও পাওয়া যায়। সুরমার সৌন্দর্য এখনো একেবারে ইতিহাস হয়ে ওঠেনি। অবশ্য ইতিহাস তার আর একদিক দিয়ে আছে কিন্তু সেকথা এখন নয়।

ডাক্তারবাবু ঘরের আলো নিবিয়ে, দোক্তার কৌটো নিয়ে এসে, টেবিলের ওধারে সুরমার সামনা-সামনি বসেন—নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে। নদী ও পাহাড়ের দিকে কোনোদিনই তাঁর চাইবার আগ্রহ ছিল না। বরাবর তিনি এই আসনটিতে এইভাবেই বসে আছেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টতাতেও ডাক্তারবাবুকে কেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হয়, শুধু পোশাকে ও চেহারায় নয়, তাঁর মনেও যেন একটা ক্লান্ত ঔদাসীন্য আছে সব ব্যাপারে। পোশাকের ত্রুটিটাই অবশ্য সকলের আগে চোখে পড়ে ; ঢিলে রঙচটা পেণ্টুলুনের ওপর গলাবন্ধ একটা কোট পরা। গলাটা কিন্তু বন্ধ হয়নি বোতামের অভাবে। এই কোট পরেই সম্ভবত তিনি সারাদিন রুগী দেখে ফেরেন। একধারের পকেট স্টেথিস্কোপের ভারেই বোধ হয় একটু ছিঁড়ে গেছে। গোটাকতক আলগা কাগজপত্র সেখান দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। মাথার চুলের কিছু পারিপাট্যের চেষ্টা বোধ হয় সম্প্রতি হয়েছিল, কিন্তু সে নেহাত অবহেলার।

ডাক্তারবাবুর মুখের ক্লান্ত ঔদাসীন্যের রেখাগুলি শুধু তাঁর চোখের উজ্জ্বলতার দরুনই বুঝি খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। সমস্ত ঘুমন্ত নিস্প্রাণ মানুষটির মধ্যে এই চোখ দুটিই যেন এখানে জেগে আছে পাহারায়। কে জানে কী তাদের আছে পাহারা দেবার।

অনেকক্ষণ কোনো কথাই শোনা যায় না। সুরমার পানের বাটা সঙ্গে আছে এবং থাকে। তিনি সযত্নে পান সাজায় ব্যস্ত। জগদীশবাবু ইজিচেয়ারে নিশ্চলভাবে পড়ে আছেন। ডাক্তারবাবু নিজের হাতের নখগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সুরমার পান সাজা শেষ হবার জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করেন।

সুরমার পান সাজা শেষ হয়। সেটি মুখে দিয়েও তিনি কিন্তু খানিকক্ষণ নীরবে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। তারপরে হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার সে ফুলের চারা এল ডাক্তার?'

জগদীশবাবু চোখ বুজে বলেন, 'সে চারা আর এসেছে! তার চেয়ে আকাশ-কুসুম চাইলে সহজে পেতে!'

সুরমা হেসে ওঠেন। বলেন, 'তুমি ডাক্তারকে অমন অকেজো মনে কর কেন বলো দিকি! সেবার আমাদের জলের পাম্পটা ডাক্তার না ব্যবস্থা করলে হত?'

ইজি চেযারের ভেতর থেকে ঘুমন্ত স্বরে শোনা যায়, 'তা হত না বটে। অন্য কেউ ব্যবস্থা করলে হয়তো পাম্পে সত্যিই জল উঠত।'

তিনজনেই এ রসিকতায় হাসেন। এ বাড়ির এটি একটি পুরাতন পরিহাস।

সুরমা বলেন, 'সত্যি, তুমি কী করে ডাক্তারী-কর তাই ভাবি! লোকে বিশ্বাস করে তোমার ওষুধ খায়?'

'খাবে না কেন, একবার খেলে আর অবিশ্বাসের সময় পায় না তো।'

সুরমা হাসতে হাসতে পানের বাটা খুলে জিভে একটু চুন লাগিয়ে বলেন, 'তোমার বাপু ডাক্তারের ওপর একটু গায়ের জ্বালা আছে। তুমি ওর কিচ্ছু ভালো দেখতে পাও না?'

'সেটা ওঁর চোখের দোষ, অনেক ভালো জিনিসই উনি দেখতে পান না', ডাক্তারের মুখে এতক্ষণে কথা শোনা যায়।

সুরমা হেসে বলেন, 'তা সত্যি! চোখ বুজে থাকলে আর দেখবে কী করে।'

'চোখ বুজে থাকি কি সাধে! চোখ খুলে থাকলে কবে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত!'

সুরমা ও জগদীশবাবুর উচ্চ হাসির মাঝে ডাক্তারবাবুর নিস্তব্ধতাটা যেন একটি বিসদৃশ ঠেকে। সুরমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারের চোখে একটু বেদনার ছায়া এখনো দেখা যায় কি?

সুরমা হাসি থামিয়ে বলেন, 'ওই যাঃ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমায় এখন কিন্তু একবার উঠতে হবে ডাক্তার!'

'এখনি? কেন?'

'এখনি না উঠলে হবে না। দাদা কী সব পার্সেল করেছেন। স্টেশনে কাল থেকে এসে পড়ে আছে, উনি একবার তবু সারাদিনে সময় করে যেতে পারলেন না। তোমায় এখন গিয়ে ছাড়িয়ে আনতেই হয়!'

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন, 'কাল সকালে গেলে হয় না!'

'হয় না আবার! একমাস পরে গেলেও হয়! জিনিসগুলো খোয়া যাবার পর গেলে আরো ভালো হয়।' সুরমার কণ্ঠে মিষ্টতার চেয়ে এবার ঝাঁঝটাই বেশ স্পষ্ট।

'এক রাত্তিরেই খোয়া যাবে কেন?' ডাক্তারবাবু একটু সংকুচিতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

সুরমা বেশ একটু উচ্চ স্বরেই বলেন, 'তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না বাপু! সোজাসুজি বলোই না তার চেয়ে যে, পারবে না! তোমায় বলাই ঝকমারি হয়েছে আমার।'

ডাক্তারবাবু এবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠে পড়েন, 'আমি কি যাব না বলেছি। ভাবছিলুম একটা রাত্তির বই-তো না।'

'রাতটা কাটিয়ে গেলেই বা তোমার কী এমন সুবিধে! এমন কিছু কাজ তো আর হাতে নেই, চুপ করে বসেই তো থাকতে।'

সে কথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার শুধু চুপ করে বসে থাকতেই এখানে আসেন। চুপ করে বসে আছেন আজ বহু বৎসর ধরে।

ডাক্তার টুপিটা তুলে নিয়ে একবার তবু বলেন, 'আসুন না জগদীশবাবু আপনিও! গাড়ীটা তো রয়েছে, একটু ঘুরে আসা হবে।'

জগদীশবাবুর আগে সুরমাই আপত্তি করেন, 'বেশ কথা! আমি একলা বসে থাকি এখানে তা হলে।'

ডাক্তার একটু হেসে বলেন, 'আরে! তুমিও এসো না।'

'তার চেয়ে বাড়ি-শুদ্ধ পাড়া-শুদ্ধ সবাই একটা পার্সেল আনতে গেলেই হয়! সত্যি তুমি দিন দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছ!'

ডাক্তার আর কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

'দিন দিন কী যেন হয়ে যাচ্ছ!' মোটরে চড়ে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার সে কথা ভাবেন কি? না বোধ হয়। ভাবনা ও আবেগের উদ্বেগসাগর বহুদিন শান্ত নিথর হয়ে গেছে। সেসব দিন এখন আর বোধ হয় মনেও পড়ে না। স্মৃতির সে সমস্ত পাতাও বুঝি অনেক তলায় চাপা পড়ে আছে। জীবনের একটা বাঁধা ছকে তিনি খাপ খেয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে। আগুন কবে ভস্মশেষ রেখে একেবারে নিবে গেছে তা তিনি জানতেই পারেননি।

আগুন একদিন সত্যিই জ্বলে উঠেছিল বই-কি! কিন্তু সে যেন আর এক জনের কাহিনী, সে অমরেশকে তিনি শুধু দূর থেকে অস্পষ্টভাবে এখন চিনতে পারেন। তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ তাঁর নেই।

একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পরম দুঃসাহস ভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি।

মেয়েটি ভীতস্বরে বুঝি একবার বলেছিল, সুযোগ পেয়ে, 'তুমি এখানে চলে এলে!'

'আরো অনেক দূর যেতে পারতাম!'

'কিন্তু—?'

'কিন্তু এঁরা কী ভাববেন মনে করছ? তার চেয়ে তুমি কী ভাবছ সেইটেই আমার কাছে বড় কথা।'

'আমি তো....' মেয়েটি নীরবে মাথা নিচু করেছিল।

অমরেশ তার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলেছিল, 'তোমার ভাববার সাহস পর্যন্ত নেই সুরমা!'

সুরমা মুখ তুলে মৃদুস্বরে বলেছিল, 'না।'

'সেই সাহস সৃষ্টি করতেই আমি এসেছি সুরমা। সেই সাহসের জন্যে আমি অপেক্ষা করব।'

সুরমা চুপ করেছিল। অমরেশ আবার বলেছিল, 'ভাবছ কতদিন, এমন কতদিন অপেক্ষা করতে পারব? দরকার হলে চিরকাল। কিন্তু তা বোধ হয় হবে না।'

জগদীশবাবু বুঝি সেই সময়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁর চেহারার এখনকার সঙ্গে তখনো বুঝি বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বেঁটে গোলগাল মানুষটি। শান্ত নিরীহ চেহারা। একেবারে নিচের ধাপ থেকে সংগ্রাম করে তিনি যে সাংসারিক সিদ্ধি বলতে লোকে যা বোঝে তাই লাভ করেছেন তাঁর চেহারায় তার কোনো আভাস নেই। দেখলে মনে হয় ভাগ্য তাঁকে চিরদিন বুঝি অযাচিত অনুগ্রহ করেই এসেছে। সুরমা সম্পর্কে সে কথা হয়তো মিথ্যাও নয়।

তিনি ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'এখনো ট্রেনের জামা-কাপড় ছাড়েন নি? না না, এখন ছেড়ে দাও সুরমা। সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে। স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন আগে।'

অমরেশ হেসে বলেছিল, 'ছেড়ে না দেওয়ার অপরাধটা আমার—ওঁর নয়।'

জগদীশবাবু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। হাসলে তাঁকে এত কুৎসিত দেখায় অমরেশও ভাবতে পারেনি। সুরমার পেছনে তাঁর এই হাস্য-বিকৃত মুখটা সে উপভোগ করেছিল বেদনাময় আনন্দে—

তারপর উঠে পড়ে বলেছিল, 'আচ্ছা এখন ওঠাই যাক!'

জগদীশবাবু সঙ্গে যেতে যেতে বলেছিলেন, 'বড় অসময়ে এলেন অমরেশবাবু! এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে কিছু দেখতে পাবেন না। বাইরে বেরুনোই দায়।'

'সেটা দুর্ভাগ্য নাও হতে পারে!' জগদীশবাবুর বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে আবার বলেছিল, 'তাছাড়া গ্রীষ্ম তো একদিন শেষ হবে।'

'তখন আপনাকে পাচ্ছি কোথায়?' জগদীশবাবুর স্বরে বুঝি একটু সন্দেহের রেশ ছিল।

'পাবেন বই-কি! হয়তো বড় বেশি পাবেন।'

অমরেশ ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। সত্যই একদিন এই ধূলিমলিন দারিদ্র শহরের একটি রাস্তার ধারে অমরেশ ডাক্তারের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল।

জগদীশবাবু বলেছিলেন, 'বিলিতি ডিগ্রির খরচ উঠবে না যে ডাক্তার! এ জঙ্গলের দেশে আমাদের মতো কাঠুরের পোষায় বলে কি তোমার পোষাবে?'

অমরেশ ডাক্তার হেসে বলেছিল, 'কাঠের কারবার আর ডাক্তারি ছাড়া আর কি পোষাবার কিছুই নেই!'

অমরেশ ডাক্তারকে রোগীর ঘরে দেখতে পাওয়া যাক বা না-যাক জগদীশবাবুর বাড়ির সরু বারান্দাটিতে প্রতিদিন তারপর দেখা গেছে।

'চেয়ারটা ঘুরিয়ে বোসো ডাক্তার।' জগদীশবাবু বলেছেন।

'কেন? আপনার এই নদী আর পাহাড় দেখবার জন্যে? আপনার ট্রেডমার্ক পড়ে ওর সব দাম নষ্ট হয়ে গেছে!'

'মড়া কেটে কেটে মনটাও তোমার মরে গেছে ডাক্তার!'

জগদীশবাবু তারপরেই আবার জিজ্ঞেস করেছেন অবাক হয়ে, 'উঠলে কেন সুরমা?'

'আসছি!' বলে সুরমা মুখ নিচু করে ভেতরে চলে গেছে।

অমরেশ ডাক্তার অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছে, 'মেয়েরা কাটা-কাটির কথা সইতে পারে না, না জগদীশবাবু?'

জগদীশবাবু কোনো উত্তর দেননি। গম্ভীর মুখে কী যেন তিনি ভাবছেন মনে হয়েছে।

অমরেশ ডাক্তার আবার বলেছে, 'ওইটুকু ওদের করুণা!'

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছেন, 'সেটুকু পাবারও সবাই যোগ্য নয়।'

ডাক্তারের আসা-যাওয়া গোড়ায় হয়তো এ বাড়ির উৎসাহ পায়নি। কিন্তু ক্রমে তা সয়ে গিয়েছে—সহজ হয়ে এসেছে জগদীশবাবুর কাছেও বুঝি।

'কদিন আমায় জঙ্গলেই থাকতে হবে ডাক্তার। গুনতির সময়ে না থাকলে চলে না। দেখাশুনা কোরো। তোমায় অবশ্য বলতে হবে না।'

ডাক্তার হেসে বলেছে, 'না, তা হবে না। আসতে বারণ করেও দেখতে পারেন!'

জগদীশবাবু হেসেছেন। সুরমাও হেসেছে, হাসলেই হয়তো তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। লাল হবার আর কোনো কারণ নেই বোধ হয়।

কিন্তু সুরমাই একদিন তীব্র স্বরে বলেছে, 'আমি কিন্তু আর সইতে পারছি না!'

'পারবে না-ই তো আশা করি।'

'না না, তুমি এখান থেকে যাও। এমন করে নিজেকে ও আমাকে মেরে কী লাভ?'

'বাঁচবার পথ তো খোলা আছে এখনো!'

'সে পথ যখন আগে নেওয়া হয়নি...'

'সে অপরাধ তো আমার নয় সুরমা। তুমি তোমার নিজের মন জানতে না, আমি জানতাম না সুযোগের মূল্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর রসিকতাকে তাই বলে মেনে নিতে হবে কেন!'

'তুমি কী বলছ জান না! তা হয় না! তা হয় না!' সুরমার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আবেগে।

'অপরাধের কথা ভাবছ? অপরাধ করার চরম দামও যার জন্যে দেওয়া যায় এমন বড় জিনিস কি নেই?'

'আমি বুঝতে পারি না তোমার কথা! আমার ভয় হয়!'

'বুঝতে পারবে, সেই প্রতীক্ষাতেই তো আছি।'

প্রতীক্ষা একদিন বুঝি সার্থক হল বলে মনে হয়েছে। জগদীশবাবুর কাঠের কারবারের জন্যে জমা নেওয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল সেদিন তারা দেখতে গেছল। অরণ্যের রহস্যঘন আবেষ্টনে সারাদিন রাজসূয় 'চড়িভাতি'র উত্তেজনাতেই কেটেছে। বিকেলের দিকে সবাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিল।

অমরেশ ও সুরমা পথহীন অরণ্যে সকলের থেকে কেমন করে আলাদা হয়ে গেছে। আলাদা হওয়াটা হয়তো সম্পূর্ণ দৈবাৎ নয়, অমরেশেরও তাতে হয়তো হাত ছিল।

সুরমা খানিকক্ষণ বাদে বলেছে, 'এ জঙ্গলে কিন্তু পথ হারাতে পারে!'

'পথ জঙ্গলে ছাড়াও হারানো যায়!'

সুরমা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেছে, 'সব সময়ে তোমার এ ধরনের কথা ভালো লাগে না!'

'কোথাও তোমার ব্যথা আছে বলেই ভালো লাগে না। নিজের কাছে তুমি ধরা দিতে চাও না বলেই এসব কথা তোমার অসহ্য।'

সুরমা নীরবে খানিক দূর এগিয়ে গেছে। অরণ্যের পশ্চাৎপটে তার দীর্ঘ সুঠাম দেহের গতিভঙ্গিতে বুঝি বনদেবীরই মহিমা ও মাধুর্য। সেটুকু উপভোগ করবার জন্যেই বুঝি খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অমরেশ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর কাছে গিয়ে বলেছে, 'এ জঙ্গলে হারাবার বদলে পথ আমরা পেতেও পারি।'

সুরমা তবু নীরব।

হঠাৎ তার একটা হাত ধরে অমরেশ বলছে, 'চুপ করে থেকো না সুরমা। বলো, আজ তোমার অটলতার গৌরব আর নেই—আছে শুধু দুর্বলতার লজ্জা। এ সম্বল নিয়ে চিরদিন বাঁচা যায় না, বাঁচা উচিত নয় সুরমা।'

সুরমা প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলেছে, 'আমি কী করতে পারি বলো!'

একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর পা দিয়ে অমরেশ বলেছে, 'এই কাটা গাছটা দেখছ সুরমা। কাঠের কারবারে এর একটা দাম মিলেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে আসল দাম এর ছিল! তুমিও কারবারের কাঠ নও সুরমা, তুমি অরণ্যের।'

সুরমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমরেশ আবার বলেছে, 'সহজ করে কথা আজ বলতে পারছি না বলে ক্ষমা কোরো সুরমা। মনের ভেতরেই আজ আমার সব জড়িয়ে গেছে।'

সুরমা অমরেশের আরো কাছে সরে এসেছে, বুকের ওপর মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে ধরা গলায় বলেছে, 'তুমি আমায় সাহস দাও।'

কিন্তু চলে যাওয়া তাদের তখন হয়ে ওঠেনি। বাধা এসেছে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জগদীশবাবু হঠাৎ অসুখে পড়েছেন—গুরুতর অসুখ। সুরমা ও অমরেশ দিন-রাত্রি বিনিদ্র হয়ে রোগশয্যার পাশে জেগেছে, আর শান্তভাবে প্রতীক্ষা করেছে মুক্তিক্ষণের। আর বেশি দিন নয়। এই তাদের শেষ পরীক্ষা, নূতন জীবনের এই প্রথম মূল্যদান।

জগদীশবাবু ভালো হয়ে উঠেছেন, তবু অপেক্ষা করতে হয়েছে, আর কিছুদিন, আর কয়েকটা দিন! ছোটখাটো বাধা, বাঁধা-ঘাটের নোঙর একেবারে তুলে ফেলতে সুরমার সামান্য একটু বিহ্বলতা। একটু সময় তাকে দেওয়া যেতে পারে,—নিজের ভেতর থেকে বল পাওয়ার সময়। অমরেশ কোথাও এতটুকু জোর খাটাতে চায় না, সব শিকড় আপনা থেকে আলগা হয়ে আসুক, সব বন্ধন খুলে যাক। অসীম তার ধৈর্য!

অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে—কিছু দিন- অনেক দিন, অপেক্ষা করেছে।

—বড় বেশী দিন অপেক্ষা করেছে।

ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিবে। কখন আর বছরের পাপড়ির মত সে ম্লান শুকনো বিবর্ণ হয়ে গেছে, তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে, জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধূলায়।

সব চেয়ে মলিন বুঝি ডাক্তার, সব চেয়ে মলিন আর ক্লান্ত। আগুন তার মধ্যে অমন লেলিহান হয়ে জ্বলেছিল বলেই সবার আগে তার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। ডাক্তার তার নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে এখনো রোজ বসে, নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে! কিন্তু সে শুধু অভ্যাস। ডাক্তার স্টেশনে পার্সেল খালাস করতে ছোটে, সে শুধু দুর্বল আজ্ঞাবাহক।

সৈয়দ মুজতবা আলি

বিষের বিষ

আগা আহমদের প্রাণ অতিষ্ঠ। এক ফোঁটা মেয়ে তার বউ মালিকা খানমটা, ফুঁ দিলে উড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু সেই যে সাতসকাল ভোরবেলা থেকে ক্যাটক্যাট্ আরম্ভ করে তার থেকে আগা আহমদের নিষ্কৃতি নেই। 'মিনষে', 'হাড়-হাভাতে,' 'ড্যাকরা—হেন গাল নেই যেটা আগা আহমদকে দিনে নিদেন পঞ্চাশবার শুনতে হয় না। আর গয়নাগাঁটি নিয়ে গঞ্জনা—সে তো নিত্যিকার রুটি পনীর। এবং সেই সামান্য রুটি পনীরটুকুও যদি ভালো করে আগা আহমদের সামনে ধরতো তবুও না হয়, সে সব-কিছু চাঁদপানা মুখ করে সয়ে নিত, কিন্তু সে রুটিও অধিকাংশ দিন পোড়া, এবং পনীরের উপরে যে মসনে পড়েছে সেটা চেঁচে দেবার গরজও বীবীজানের নেই। আগা আহমদ দিনমজুর ; খিদে পায় বড্ডই।

ব্যাপারটা চরমে পৌঁছল বিয়ের দশ বছর পর একদিন যখন আগা আহমদ কি একটা খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করলো, মালিকা খানম নিজের খাবার জন্য লুকিয়ে রেখেছে মুরমুরে রুটি, ভেজা-ভেজা কাবাব, টনটনে সেদ্ধ ডিম এবং তেল-তেলে আচার!

সে রাত্রে আগা আহমদ খেল না। বউ ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ও আমার লবাব-পুত্তুর রে—রুটি পনীর ওঁয়ার রোচে না। কোথায় পাব আমি আণ্ডা আমার আগাজানের জন্যে—'

সেই কাবাব আণ্ডা! যা বউ নিজে খেয়েছে!

স্থির করলো ওকে খুন করবে। নূতন করে তালাক দিয়ে লাভ নেই। অন্তত একশ' বার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মালিকা খানম মুখ বেঁকিয়ে আপন কাজে চলে যায়। ওরা থাকে বনের পাশে—পাড়া-প্রতিবেশীও কেউ নেই যে মালিকা খানমকে এসে বলবে, 'তোমার স্বামী যখন তোমাকে তালাক দিয়েছে তখন তার পর ওর সঙ্গে সহবাস ব্যভিচার।' আর থাকলেই বা কি হত? কেউ কি আর সাহস করে আসত? আগা আহমদের মনে পড়ল গত পনেরো বছরের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে আসেনি।

শুয়ে শুয়ে সমস্ত রাত ধরে আগা আহমদ প্ল্যান করলো, খুন করা যায় কি প্রকারে।

সকালবেলা বনে গিয়ে খুঁড়লো গভীর একটা গর্ত। তার উপর কঞ্চি কাঠ ফেলে উপরটা সাজিয়ে দিল লতা পাতা দিয়ে।

বিকেলের ঝোঁকে বউকে বললে, 'গা-ম্যাজম্যাজ করছে। একটু বেড়াতে যাবে?'

বউ তো খল খল করে হাসলে চোচা দশটি মিনিট। তারপর চেঁচিয়ে উঠলো 'কোজ্জাবো মা—মিনষের পেরাণে আবার সোয়াগ জেগেছে!'

আগা আহমদ নাছোড়বান্দা। বহু মেহন্নত করে গা-গতর পানি করে গর্তটা তৈরি করেছে।

বউ রাজী হল। বেড়াতে নিয়ে গেল বনে। কৌশলে বউকে স্টিয়ার করে করে গর্তের কাছে নিয়ে গিয়ে দিল এক মোক্ষম ধাক্কা। তার পর ফের বাঁশ-কঞ্চি লতাপাতা সহযোগে গর্তটা উত্তমরূপে ঢেকে দিয়ে আগা আহ্‌মদ তার পীরমুরশীদকে 'শুক্‌রিয়া' জানাতে জানাতে বাড়ি ফিরল।

রান্না করতে গিয়ে বাড়িতে অনেক-কিছুই আবিষ্কৃত হল। হালুয়া, মোরব্বা, তিন রকমের আচার, ইস্তেক উত্তম হরিণের মাংসের শুঁটকি। পরমানন্দে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আগা রান্নাবান্না সেরে আহারাদি সমাপন করলে। ক্যাটক্যাটানি না শুনে না শুনে আজ তার চোখে নিদ্রা আসবে—এ-কথাটা যত বার ভাবে ততই তার চিত্তাকাশে পুলকের হিল্লোল জেগে ওঠে।

পরদিন কিন্তু আগা আহমদের শান্ত মনের এক কোণে কালো মেঘ দেখা দিল। হাজার হোক্—তার বউ তো বটে। তাকে ওরকম মেরে ফেলাটা—? বিয়ের সময় হজরৎ মুহম্মদের নামে সে কি শপথ নেয়নি যে তাকে আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করবে? কিন্তু ওদিকে আবার সেই দুশমনটাকে ফের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে তো মন চায় না।

এ অবস্থায় আর পাঁচজন যা করে আগা আহমদও তাই করলে। 'যাক্ গে ছাই, গিয়ে দেখেই আসি না, বেটী গর্তের ভিতর আছে কি রকম। সেই দেখে মনস্থির করা যাবে।'

গর্তের মুখের পাতা সরাতেই ভিতর থেকে পরিত্রাহি চিৎকার! 'আল্লার ওয়াস্তে রসুলের ওয়াস্তে আমাকে বাঁচাও।' কিন্তু কী আশ্চর্য! এ তো মালিকা খানমের গলা নয়। আরো পাতা সরিয়ে ভালো করে তাকিয়ে আগা আহমদ দেখে—বাপ রে বাপ, এ্যাব্বড়া কালো-নাগ, কুলোপানা-চক্কর গোখরো সাপ! সে তখনো চেঁচাচ্ছে, 'বাঁচাও বাঁচাও, আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, লক্ষ টাকা দেব, আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি, আমি তোমাকে রাজা করে দেব।'

সম্বিতে ফিরে আগা আহমদের হাসিও পেল। সাপকে বললে, 'তা তুমি তো কত লোকের প্রাণ নির্ভয়ে হরণ করো—নিজের প্রাণটা দিতে এত ভয় কিসেব?'

ঘেন্নার সঙ্গে সাপ বললে, 'ধাত্তর তোর প্রাণ! প্রাণ বাঁচাতে কে কাকে সাধছে! আমাকে বাঁচাও এই দুশমন শয়তানের হাত থেকে। এই রমণীর হাত থেকে।' তারপর ডুকরে কেঁদে উঠে বললে, 'মা গো মা, সমস্ত রাত কী ক্যাটক্যাট কী বকাটাই না দিয়েছে। আমি ড্যাকরা, আমি মন্দা মিনষে হয়ে একটা অবলা—হ্যাঁ অবলাই বটে—নারীকে কোনো সাহায্য করছি নে, গর্ত থেকে বেরোবার কোনো পথ খুঁজছি নে, আমি একটা অপদার্থ, ষাঁড়ের গোবর। আমি—'

আগা আহমদ বললে, 'তা ওকে ছোবল দিয়ে খতম করে দিলে না কেন?'

চিল-চ্যাঁচানি ছেড়ে সাপ বললে, 'আমি ছোবল মারব ওকে! ওর গায়ে যা বিষ তা দিয়ে সাত লক্ষ কালনাগিনী তৈরী হতে পারে। ছোবল মারলে সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়তুম না? সারাতো কোন্ ওঝা? ওসব পাগলামি রাখ। আমাকে তুমি গর্ত থেকে তোলো। তোমাকে অনেক ধনদৌলত দেব। পশুপক্ষী সাপ-বিচ্ছুর বাদশা সুলেমানের কসম।'

রূপকথা নয়, সত্য ঘটনা বলে দেখা গেল মালিকা খানমেরও অনেকখানি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে—এক রাত্রি সর্পের সঙ্গে সহবাস করার ফলে। কারণ এতক্ষণ ধরে একটিবারও স্বামীকে কোনো কড়া কথা বলেনি। এটা একটা রেকর্ড, কারণ ফুলশয্যার রাত্রেও নাকি সে মাত্র তিনটি মিনিট চুপ করে থেকেই ক্যাটক্যাটানি আরম্ভ করে দিয়েছিল।

মালিকা খানম মাথা নিচু করে বললে, 'ওরা গুপ্তধনের সন্ধান জানে।'

আমাদের আগা আহমদের টাকার লোভ ছিল মারাত্মক। সাপকে সুলেমানেব তিন কসম খাইয়ে গর্ত থেকে তুলে নিল। বউকেও তুলতে হল—সেও শুধরে গেছে জানিয়ে অনেক কিরে কসম কেটেছিল।

সাপ বললে, গুপ্তধন আছে উত্তর মেরুতে—বহু দূরের পথ। তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তোমাকে বাৎলে দিচ্ছি। শহর কোতয়ালের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরবো আমি। কেউ আমাকে ছাড়াবার জন্য কাছে আসতে গেলেই মেয়েকে মারতে যাবো ছোবল। তুমি আসা মাত্রই আমি সুড়সুড় করে সরে পড়বো—তোমাকে দেবে বিস্তব এনাম, এন্তের ধন-দৌলত। কিন্তু খবরদার, ঐ একবার। অতি লোভ করতে যেয়ো না।'

ভূতের মুখে রাম নাম?
সাপের দ্বারা ভালো কাম?

শহরে এমনই তুল-কালাম কাণ্ড যে তিন দিন যেতে-না-যেতে সেই বনের প্রান্তে আগা আহমদের কানে পর্যন্ত এসে পৌঁছল কোতয়াল-নন্দিনীর জীবন-মরণ সমস্যার কথা। তিন দিন ধরে তিনি অচৈতন্য। গলা জড়িয়ে কাল-নাগ ফোঁস ফোঁস করছে। কোতয়াল লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবু সাপুড়েরাও নাকি কাছে ঘেঁষছে না, বলছে উনি মা-মনসার বাপ।

প্রথমটা তো আগা আহমদকে কেউ পাত্তাই দেয় না। আরে, ওঝা-বদ্যি হন্দ হল এখন ফার্সী পড়ে আগা! কী বা বেশ, কী বা ছিরি!

কোতয়ালের কানে কিন্তু খবর গেল,

বন থেকে এসেছে ওঝা
পেটে এলেম বোঝা বোঝা।

ছবি-চেহারা দেখে তিনিও বিশেষ ভরসা পেলেন না। কিন্তু তখন তিনি শ্মশান-চিকিৎসার জন্য তৈরি—সে চিকিৎসা ডোমই করু, চাঁড়ালও সই।

তারপর যা হওয়ার কথা ছিল তাই হল। 'ওঝা' আগা আহমদ ঘরে ঢোকামাত্রই সেই কাল-নাগ কোথা দিয়ে বেরিয়ে গেল কেউ টেরটি পর্যন্ত পেল না। কোতয়াল-নন্দিনী উঠে বসেছেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটেছে। ভীষণ-দর্শন কোতয়াল সাহেবের চেহারা প্রসন্ন বদান্যতায় মোলায়েম হয়ে গিয়েছে। আগাকে লক্ষ টাকা তো দিলেনই, সঙ্গে সঙ্গে তাকে করে দিলেন তাঁর বাড়ির পাশের বনের ফরেস্ট্ অফিসার। এইবার আগা দু'বেলা প্রাণ ভরে বাচ্চা হরিণের মাংস খেতে পারবে।

আগা সুখে আছে। সোনাদানা পরে মালিকা খানমও অন্য ভুবনে চরছেন—ক্যাটক্যাট করে কে? তা ছাড়া এখন তার বিস্তর দাসীবাঁদী। ওদের তম্বি-তম্বা করতে করতেই দিন কেটে যায়। কর্তাও বৈঠকখানায় ইয়ার-বক্সী নিয়ে।

ওমা! এক মাস যেতে না যেতে খবর রটলো, উজীর সাহেবের মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে একটা সাপ। কোন্ সাপ?—সেই সাপটাই হবে, আর কোনটা?

এবারে দশ লাখ টাকার এনাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ পেয়াদা-নফর ছুটেছে আগা আহমদের বাড়ির দিকে,

হাতের কাছে ওঝা,
সহজ হল খোঁজা।

কিন্তু আগা আহমদের বিলক্ষণ স্মরণে ছিল, কাল-নাগ খবরদার করে দিয়েছে অতি লোভ ভালো না,—সাপ সরাতে একবারের বেশি না যায়। সে যতই অমত জানায়, ইয়ার-বক্সী ততই বলে, হুজুরের কী কপাল! বাপ-মার আশীর্বাদ না থাকলে এমন ধারা কখনো হয়!'

আগাকে জোর করে পাল্কিতে তুলে দেওয়া হল।

এবারে সাপ জুলজুল করে তার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার খাঁই বড্ড বেড়েছে—না? তোমাকে না পই পই করে বারণ করেছিলুম, একবারের বেশি আসবে না। তবু যে এসেছ? তা যে যাক্ গে—তুমি আমার উপকার করেছ বলে তোমাকে এবারের মত ছেড়ে দিলুম। কিন্তু এই শেষ বার। আর যদি আসো, তবে, তোমাকে মারবো ছোবল। তিন সত্যি।'

দশ লাখ টাকা এবং তার সঙ্গে পাঁচশ' ঘোড়ার মনসব পেয়েও নওয়াব আগা আহমদের দিল-জান সাহারার মত শুকিয়ে গিয়েছে। মুখ দিয়ে জল নামে না, পেটে রুটি সয় না। কাল-নাগ আবার কখন কোথায় কি করে বসে আর সে ছোবল খেয়ে মরে! স্থির করলো, ভিন্ দেশে পালাবে।

ঠিক সেই দিনই স্বয়ং কোতায়ল সাহেব এসে উপস্থিত। বিস্তর আদর-আপ্যায়ন, হস্তচুম্বন-কণ্ঠালিঙ্গন। কোতয়াল সাহেব গদগদ কণ্ঠে বললেন, 'ভাই নওয়াব সাহেব, তোমার কী কপাল! তামাম দেশের চোখের মণি, দিলের রোশনী, রাজকুমারীর প্রাণ উদ্ধার করে তুমি হয়ে যাবে দেশের মাথার ম্টট। চলো শিগ্গির! সেই হারামজাদা কাল-নাগ এবার জড়িয়ে ধরেছে শাহাজাদীর গলা।'

নওয়াব আগা আহমদ জড়িয়ে ধরলেন কোতয়ালের পা। হাউহাউ করে কেঁদে নিবেদন করলে সে কোন্ ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে পড়েছে।

কোতয়ালদের হৃদয় মাখন দিয়ে গড়া থাকে না। ব্যাপারটা বুঝে নিতেই শহরদারোগাকে হুকুম দিলেন, 'চিড়িয়া বন্ধ করো পিঞ্জরামে।'

পাল্কিতে নওয়াব আগা আহমদ। দু পাশের লোক তার জয়ধ্বনি জিন্দাবাদ করছে। এক ঝরোকা থেকে কোতয়াল-নন্দিনী অন্য ঝরোকা থেকে উজীর-জাদী তাঞ্জামের উপর পুষ্পমাল্য বর্ষণ করলেন।

আগা আহমদ মুদ্রিত নয়নে মুর্শীদমৌলার নাম আর ইষ্টমন্ত্র জপছে।

স্বয়ং বাদশা তাকে হাতে ধরে রাজকুমারীর দোরের কাছে নিয়ে এলেন।

আগা আহমদ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাল-নাগ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, 'আবার এসেছিল, হতভাগা? এবারে আর আমার কথার নড়চড় হবে না। তোর দুই চোখে দুই ছোবল মেরে ঢেলে দেব আমার কুম্ভে বিষ!'

আগা আহমদ অতি বিনীত কণ্ঠে বললে, 'আমি টাকার লোভে আসিনি। তুমি আমাকে অগুনতি দৌলত দিয়েছো। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তাই তোমাব একটা উপকার করতে এলুম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, শুনলুম তুমি এখানে। ওদিকে সকালবেলা বিবী মালিকা খানম আমাকে বলেছিলেন তিনি রাজকন্যাকে সেলাম করতে আসছেন। বোধ হয় এক্ষুণি এসে পড়বেন। তুমি তো ওঁকে চেনো — হেঁ, হেঁ —তাই ভাবলুম, তোমাকে খবরটা দিয়ে উপকারটাই না কেন করি। তুমি আমার—'

'বাপ রে, মা রে' চিৎকার শোনা গেল। কোন্ দিক দিয়ে যে কাল-নাগ অদৃশ্য হল আগা আহমদ পর্যন্ত বুঝতে পারলো না।

এর পর আগা আহমদ শান্তিতেই জীবনযাপন করেছিল।

গল্পটি নানা দেশে, নানা ছলে, নানা রূপে প্রচলিত আছে। আমি শুনেছিলুম এক ইরানী সদাগরের কাছ থেকে, সরাইয়ের চারপাইতে শুয়ে শুয়ে।

কাহিনী শেষ করে সদাগর শুধোলেন, 'গল্পটাব 'মরাল' কি, বলো তো?'

আমি বললুম, 'সে তো সোজা। রমণী যে কি রকম খাণ্ডারনী হতে পারে তারই উদাহরণ। এ-দুনিয়ার নানা ঋষি নানা মুনি তো এই কীর্তনই গেয়ে গেছে!'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সদাগর বললেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু জানো, ইরানী গল্পে অনেক সময় দুটো করে 'মরাল' থাকে। এই যে রকম হাতীর দুজোড়া দাঁত থাকে। একটা দেখাবাব, একটা চিবোবার। দেখাবার 'মরাল'-টা তুমি ঠিকই দেখেছো। অন্য 'মরাল'-টা গভীর : —খল যদি বাধ্য হয়ে, কিংবা যে-কোনো কারণেই হোক, তোমার উপকার করে তবে সে উপকার কদাচ গ্রহণ করবে না। কারণ খল তারপরই চেষ্টায় লেগে যাবে, তোমাকে ধনেপ্রাণে বিনাশ করবার জন্য, যাতে করে তুমি সেই উপকারটি উপভোগ না করতে পারো।'

অবশ্য তোমার বাড়িতে যদি মালিকা খানমের মত বিষ থাকে অন্য কথা।

কিন্তু প্রশ্ন, 'ক'জনের আছে ও-রকম বউ?

প্রবোধকুমার সান্যাল

তৃতীয় রিপু

বাড়ীর কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছি, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি এলো। এই বিঘা দুই ফাঁকা জমিটুকুর ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারলেই বড় রাস্তায় পড়তুম। কিন্তু বৃষ্টি নামলো।

ছোট মেয়েটার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলুম ডাক্তারখানায় ; ফিরে গিয়ে আবার আপিস বেরোতে হবে। কিন্তু এ জামা কাপড় ভিজলে আজকে আপিস যাওয়া আর চলবে না। দ্বিতীয় ধোবদস্ত কাপড় পেতে গেলে ধোবার বাড়ি ছুটতে হবে।

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি,—দিন চারেক রোদের পর আবার আকাশ ভেঙ্গেছে। একি থামবে সহজে? বেলা ন'টা বাজতে চললো। একটু মুশকিলে পড়েই মাঠের এই নড়বড়ে চালাটার তলায় ঢুকে আশ্রয় নিলুম।

এই মাঠটুকু নিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় কত রকমের কথা ঘুরে বেড়ায়। কেউ বলে, নাবালকের সম্পত্তি ; কেউ বলে, এর জমিদার থাকে খিদিরপুরের ওদিকে—তাদের বংশে বাতি দেবার নাকি কেউ নেই। কেউ বা বলে, এখানে আজ বিশ বছর ধরে বারোয়ারী পুজো আর যাত্রা থিয়েটার হচ্ছে—এ এখন জনসাধারণের সম্পত্তি, এর ওপর এখন পাড়ার সকলেরই অধিকার। আসল কথা, এই জমিটুকুর ওপর লোভ আছে বহু লোকের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের সস্তা টাকা আছে অনেকের হাতে,—কোনমতে এই দুই বিঘা দখল ক'রে নিতে পারলেই বাজিমাৎ। সেই কারণে জমিটুকু নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চক্রান্তের আর অবধি নেই। যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে গ্রাস করবে তারই পোয়াবারো!

বৃষ্টির ঝাপটা আসছে প্রবল বেগে ; দু'পা পিছিয়ে চালা ঘরখানার দরজায় উঠে দাঁড়াতেই হল। কিন্তু হঠাৎ আশপাশের বিশ্রী দুর্গন্ধে সজাগ হয়ে এদিকে ওদিকে তাকালুম। পাশেই কাজ করছে একজন ছুতোর মিস্ত্রি। দুটো গরু এসে কখন যেন আশ্রয় নিয়েছে ওধারে। এপাশে একটি হাঁড়ি-কলসীর দোকানের পিছন দিক। বুঝতে পারা যাচ্ছে এ ঘরখানা ভেঙ্গে চুরে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে থাকে এক ঝাড়ুদার পরিবার ; তারই গায়ে-গায়ে বসবাস করে বাজারের এক ফড়ে,—ছাগলের মাংস বিক্রি করে। অনেককাল ধরেই দেখে আসছি এই চালাঘর এমনি ভাবেই কাৎ হয়ে আছে,—মাঝে মাঝে বদলায় শুধু এর বারান্দা।

ছুতোর মিস্ত্রি আমার জড়োসড়ো অবস্থা লক্ষ্য করে ওধার থেকে বলে উঠল, ভেতরে উঠে এসে দাঁড়ান না বাবু, বড্ড ছাট আসছে!

উঠে এসে হাসিমুখে বললুম, তুমিই না আমাদের বাড়িতে গিয়ে সেবার তক্তাখানা মেরামত করেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম সন্তোষ। দেখবেন, বুড়ি শুয়ে আছে আপনার পায়ের কাছে। হোঁচট খাবেন না।

এমনি বেঁহুস আমি, লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ। মনে করেছিলুম জঞ্জালের স্তূপ! ছেঁড়া কাঁথা, খড়ের আটি, ভাঙ্গা টিনের কানেস্তারা, ইঁট কাঠ আর ঝুরো মাটির রাশীকৃত জটলা, এ ছাড়া এ ঘরে বুঝি আর কিছু নেই। সহসা ঠাহর ক'রে দেখি, সত্যি প্রায় পায়ের কাছে আপাদমস্তক নোংরা কাঁথা আর খড় চাপা দিয়ে পড়ে আছে একজন, তার সাড়াশব্দ নেই। একটু আড়ষ্ট হয়ে দরজা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। মুষলধারে বৃষ্টি চলছে।

জল নামছে গোলপাতার বড় বড় ছিদ্র দিয়ে। কোথায় যেন বিড়ালের বাচ্চারা ডাকছে। গরু দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। বৃষ্টির অত ছাট সত্ত্বেও সন্তোষ তার র্যাঁদা চালাচ্ছে।

এমন সময় আবার এক নেড়িকুকুর উঠে সোজা ভিতরে ঢুকে কান ও গান-ঝাড়া দিল। বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই, এত বৃষ্টি। ভিতরে দুনিয়াব নোংরা, তাদের সঙ্গে বীভৎস দুর্গন্ধ জড়ানো। অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় কেবলমাত্র জামা কাপড় বাঁচাবাব জন্যই ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলুম।

ছাতা নিয়ে বেরোতে হয়, বাবু—বর্ষা বাদলের দিন!—সন্তোষ আবার নিজের মনেই কাজ করতে লাগল।

কুকুরটা একটু বদ-খেয়ালী। কাঁথার উপর শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ একবার নাক ঝাড়া দিল। কিন্তু সেই শব্দে কাঁথার স্তূপ এবার নড়ে উঠলো। ভিতর থেকে কি যেন একটা গালমন্দ দিয়ে বুড়ি এবার মুখের উপর থেকে কাঁথা সরালো। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমারই দিকে তার নজর পড়লো বটে, তবে কুকুরটা সেখান থেকে সরে গিয়ে অদূরে বসল। আমি নিজে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেঝের উপর পুঁটলী পাকিয়ে ওই নোংরা কাঁথার মধ্যে বুড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। বসয় সত্তর বছরের কম নয়।

সন্তোষ আবার ওধার থেকে বলল, দেখবেন বাবু, ওর কাঁথা যেন ছোঁবেন না, বড্ড নোংরা!

আরেকটু সরেই আমি দাঁড়ালুম। রুমাল চাপা দিলুম নাকে।

বুড়ি এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, দবজাটা বন্ধ করো না বাছা, জল আসছে যে। ইঁটের ঠেকোটা দিয়ে দাও।

দেখতে পাচ্ছি দরজা বন্ধ করলে দম আটকে আসবে। কিন্তু বুড়ির অনুরোধ আধাআধি পালন করতে হ'ল। আকাশ আজ ভেঙ্গে পড়েছে, পা বাড়াবার কোনও উপায় নেই।

সন্তোষ বললে, ওই দেখুন, অমনি ক'রে পড়ে আছে এক হপ্তা। কাল আবার আমানি খেলে। বারণ করলুম, শুনলো না, আজ আবার বাড়াবাড়ি।

বললুম, কি হয়েছে ওর?

সন্তোষ কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, কাঁথার ভিতর থেকে ফোঁস করে উঠলো বুড়ি,—থাম তুই, হারামজাদা—তোর আর তর সইছে না! ছাই দেবো তোর মুখে। নচ্ছার!

সন্তোষ একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিয়ে বললে, দেখছেন বাবু,—জাত সাপের ছোবল্, বিষ একবার দেখুন। প্রায় সত্তর বছর হতে চললো ওই ছোবল মারছে সবাইকে।

ভিতরে একটা বিসদৃশ কাণ্ড না বেধে ওঠে,—আমি যেন সন্তোষের কথায় একটু আড়ষ্টই বোধ করলুম। কিন্তু বুড়ি গ্রাহ্যও কবলো না,—চুপ ক'রে রইলো নিজের মনে। সম্ভবত বুড়ি এখানে-ওখানে ভিক্ষে করে খায় সেজন্য সে কারোকে বেশি রকম চটাতে চায় না। কিন্তু বুড়ির মুখের চেহারা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জীবনে ধিক্কার সয়েছে সে অনেক। সমস্ত ধিক্কার এবং অসম্মানকে শুধু যে সে গায়ে মাখেনি তাই নয়, সন্তোষের মতো ব্যক্তিকে সে মানুষ ব'লেও মনে করেনি।

বৃষ্টি যেন আবার নতুন ক'রে ঝাঁপিয়ে এলো। গোল-পাতার ভিতর দিয়ে জল নামছে চালার মধ্যে। গরু দাঁড়িয়ে কি যেন অশ্রান্ত চিবোচ্ছে, কুকুরটা গিয়ে এক পাশে গা এলিয়েছে—কিন্তু মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছে বিড়াল বাচ্চাগুলোর দিকে। র‍্যাঁদা চালাচ্ছে সন্তোষ অবিশ্রান্ত। হাঁড়ি কলসীর দোকানের ভিতরে ব'সে কে যেন বর্ষা উপলক্ষে বোম্বাই সিনেমার বিরহ সঙ্গীত ধরেছে। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম কাঠ হয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে। এমন বিব্রত কোনদিন বোধ করিনি।

এমন সময় বুড়ি ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে ডাকলো। কাছে সরে এলুম। একটুখানি ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে বললুম, কি বলছ?

এই কলায়ের বাটিটায় একটু জল ধ'রে দাও দিকি বাবা!

বললুম, খাবার জল চাও বুঝি?

হ্যাঁ হ্যাঁ খাবার জল, দাওনা একটু।

এদিক ওদিকে তাকিয়ে বললুম, খাবার জল ত' এখানে কোথাও দেখছিনে, বাছা?

ওমা, কি বুদ্ধি তোমার! চারদিকে এত জল, আর একটু খাবার জল দিতে পারছ না? আক্কেল নেই ঘটে? তুলে নে যাওনা বাটিটা চালার নীচে ধরো,—ওই তো হুড় হুড় করে জল পড়ছে।

বুড়ি যে এই নোংরা চাল ধোওয়া বৃষ্টির জলই খেতে চায়, এটা ঠিক আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু নিজের হাতে করে এ জল কেমন করে দেবো, এ কথাটা তলিয়ে ভাববার আগেই বাটিটা নিয়ে দরজার

বাইরে ধরলাম। পাঁচ সেকেণ্ডে বাটি ভরে গেল। বাটি নিয়ে বুড়ির সামনে দিলুম। বুড়ি পরিতুষ্ট হয়ে, শুয়ে শুয়েই সেই জল পান করল। অবাক হয়ে গেলুম।

বুড়ি বললে, এ ভগবানের জল বাবা,—পেটের ব্যামোর এমন ওষুধ আর নেই।—হ্যাঁ বাবা, শোনো এক কথা বলি। চারটে পয়সা দাও দেখি,—এই চেয়ে নিচ্ছি বাবা, —না হয় ভিক্ষেই দিলে! সামান্য চারটে পয়সা!

আজকাল দুটো পয়সা পর্যন্ত কায়ক্লেশে ভিখারীকে দেওয়া যায়, চারটে পয়সা এক থোকে দিতে গেলে গায়ে একটু লাগে। কিন্তু পয়সাটা বার করার আগে বুড়ি খরতর দৃষ্টিতে আমাকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, ওই আবাগের ব্যাটা যেন দেখেনা, চোখ টাটাবে। একটু লুকিয়ে দাও।

ঠিক তাই হ'ল। রাঁদা থামিয়ে ঘাড় উঁচু ক'রে ওধার থেকে সন্তোষ বললে, ও ভদ্দর লোকটাকে এবার বাগে পেয়েছ, না? পয়সা চাওয়া হচ্ছে চোখ টিপে? দেবেন না বাবু, একটি আদলাও দেবেন না, ওই শুক্‌নির হাতে। মাগি বড় শয়তান!

বুড়ি চুপ।

সন্তোষের এবম্বিধ মন্তব্যে আমি একটু আহতই হলুম। সর্বপরিত্যক্তা বৃদ্ধা ভিখারিণী কাদামাটিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে,—এবং চেহারা দেখে মনে হচ্ছে হতভাগী তার অন্তিম শয্যাই পেতেছে। এর ওপর এই অপমান বর্বরতারই পরিচয়। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললুম, সন্তোষ, এটা কি তোমার ভালো হচ্ছে, ভাই? যার বাঁচবার কোন আশা নেই, তাকে এমন ক'রে মারছো কেন?

কথাটা শুনে সন্তোষ হঠাৎ হেসে উঠলো কিন্তু আমার এই সমবেদনার কথা শুনে জবাব দিলে বুড়ি। একটু নড়ে উঠে রুগ্নকণ্ঠে বললে, তুমি কেমন মানুষ, বাছা? চারটে পয়সা চাইছি ব'লে গায়ে প'ড়ে আমার মরণ টাকতে এসেছ? এতক্ষণ ঘরে দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাচ্ছ, ঘরেব ভাড়াও ত' আছে!

আমি একেবারে হতবুদ্ধি।

বুড়ি কিন্তু থামলো না। ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল, দয়া চাইনি কারো। নিজের গায়-গতরের ওপরেই আছি। যাওনা বাছা বেরিয়ে, না-হয় বৃষ্টিতেই ভিজলে খানিকটে।

এবার ছুটতে ছুটতে দুটো ছাগল কোথা থেকে যেন চালার মধ্যে উঠে এলো। গরুটা নির্বিকার, তেমনি জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুড়ি আমাকে বেরিয়ে যেতে বললেও নড়তে পাচ্ছিনে, এমনি সাপটে বৃষ্টি চলছে। নিছক সহানুভূতি জানাতে গিয়ে এমন চপেটাঘাত খাওয়া কৌতুকজনক বৈকি।

কথাটা সন্তোষের কানে গিয়েছিল। হাসিমুখে সে বললে, দেখলেন ত' বাবু কুলোপানা চক্কর? আপনি ত' এ পাড়ায় এসেছেন দশ পনেরো বছর। ও মাগির দাপটে এ তল্লাট চিরকাল থরহরি, ওকি আজকের শয়তান? এ পাড়ার তিন পুরুষকে ও মাগি জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওর বয়সকালে বাঘেগরুতে একসঙ্গে জল খেতো!

বুড়ি কাঁথার ভিতর থেকে খিঁচিয়ে উঠলো, —আ মর, হারামজাদা, দুটি চখেব মাথা খা। চাল নেই, চুলো নেই। —আমি না থাকলে যেতিস কোথা? চুক্‌লি কাটছিস যে নতুন লোক পেয়ে?

সন্তোষ আবার চুপ। গজকাঠি দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সে একখানা তক্তা মাপতে লাগলো, কোনও গালাগালির জবাব দিল না। আমার কিন্তু একটু খটকা লেগে রইলো। তাহলে ব্যাপারটা কি? চারটি পয়সা ভিক্ষে চাইলো, কিন্তু পরে বললে—ঘরভাড়া! তবে কি ঘরখানা এরই? কিন্তু সন্তোষের প্রতি যে-মন্তব্যটা বুড়ি ক'রে বসলো—কই সন্তোষ তার কোন জবাব দিল না ত'?

গজকাঠি রেখে সন্তোষ এবার বললে, চোখ রাঙ্গাবার চেহারাটা দেখলেন? অথচ দেখুন, আমার ঘরে পান্তা রাখার জো নেই,—মাগির এমনি হাতটান। ওই দেখুন, সকাল থেকে দাঁত লেগে পড়েছিল, আপনার কাছে পয়সার গন্ধ পেয়েই চিতিয়ে উঠেছে।

বললাম, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বুঝি?

অসুস্থ!—সন্তোষ এবার দু'পা এগিয়ে এল, আজ ছ'দিন হতে চললো ওলাউঠোয় ভুগছে। বছরে তিনবার চারবার ওর ওলাউঠো হয়! গেল বছর বাঁশ বেঁধে ওকে সবাই মিলে কাঁধে তুলবে, অমনি বেঁচে উঠলো। বজ্জাতের হাড়, ওকি সহজে শ্মশানে যাবে' আশী বছর পেরিয়ে গেছে ওর।

আমি আর এদের কথার ফাঁদে পা দিচ্ছিনে, উচিত মতো শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। হাসিমুখে বললুম, না না, এসব কথা বলতে নেই। প্রাচীন কালের মানুষ, যতদিন বাঁচে ততদিনই ভালো। সুখেরই কথা।

বুড়ি আমার কণ্ঠস্বর শুনে সন্দেহ করলো কিনা বুঝলাম না। কিন্তু এবার বিরক্ত হয়ে সে বললে, খুব ত' তখন থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুক্‌লি কাটছো,—চারটে পয়সা ফেলতে বুঝি হাত উঠলো না?

তাড়াতাড়ি চারটে পয়সা বার করে বুড়ির হাতের কাছে হেঁট হয়ে দিয়ে বললুম, যে যাই বলুক, বুড়ো মানুষের দুঃখ সবাই বোঝে না! এ পয়সায় তুমি খাবার খেয়ো।

বিদ্যুৎ ঝলসিয়ে আকাশ পথে কোথায় যেন একটা সশব্দে বাজ পড়লো। দেখতে দেখতে নতুন ঝাপ্টা নিয়ে আবার প্রবল বর্ষণ নেমে এলো। সামনের জমি পেরিয়ে রাস্তার চারদিকে জল দাঁড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে আমার বাড়ি পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই জলপ্লাবনের মধ্যে যানবাহনাদির চলাচল যে বন্ধ হতে বাধ্য, এতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

পয়সা দিয়েও আমি ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়ি কিন্তু না দিলে ধন্যবাদ, না জানালো কৃতজ্ঞতা, এটা যেন নিজের প্রাপ্য হিসেবেই সে নিল। এ না দিয়ে যেন আমার নিস্তার ছিল না।

পরম স্ফূর্তিতে পুনরায় র‍্যাঁদা টানতে টানতে সন্তোষ বললে, পয়সা দিয়ে বুড়ি কি করবে জানেন? আর দু'ঘণ্টা পরেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে, তারপর গড়িয়ে-গড়িয়ে যাবে তেলে ভাজা ফুলুরির দোকানে। এই ওলাউঠো তার ওপর ওই ফুলুরি! বাবু, দুঃখের কথা বলবো কি, যা খেলে সবাই মরে, ও মাগি তাই খেয়ে বেঁচে ওঠে।

শোনো গুয়োটার কথা! বুড়ি খিটখিটিয়ে উঠলো আবার,—যাওনা বাছা নিজের কাজে, খামোকা দাঁড়িয়ে কেন চুক্‌লি শুনছো? ও ড্যাকরার তিনপুরুষে কি জাতজন্মের ঠিক আছে? ও হল বাঁদর বাচ্চা!

ঘাড় তুলে সন্তোষ এবার হাসিমুখে জবাব দিল, বলি জাতজন্ম খেলে কে? তুই খাসনি?

বুড়ি বললে, ওই নাও! বলি বাপকে মানুষ করলে কে? বল্ না তোর ঠাকুমা পালিয়েছিল কার সঙ্গে? বলবো তোর মায়ের কথা লোকসমাজে?

এত বড় কলঙ্কের কাহিনী শুনেও সন্তোষ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলো না। বোধকরি তার ছুতোরের কাজটা ছিল চুক্তিবদ্ধ, অন্যদিকে মনোযোগ দেবার সময় ছিল কম। সুতরাং তেমনি হাসিমুখেই ক্ষিপ্রহস্তে তার কাজ চলতে লাগল। কাজ করতে করতেই এক সময় সে বললে, বাবু, ওর কথায় চটবেন না। ভদ্দর লোকের সামনে ও মাগি মান, খাতির রাখতে জানে না।

বুড়ি গজগজিয়ে বললে, মান-খাতির! জবাব দে না কি দিবি?

সন্তোষ এবার একটা বিড়ি ধরালো। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, বুঝলেন বাবু, আমার ঠাকুরদাদাকে নিয়ে ওর মোট সাতটা মরদ ছিল ; সব মিলিয়ে ওর যোলটা ছেলেপুলে। আমার বাপ কিন্তু ওর পেটে হয়নি। সেই জন্যে আমি ওর দু'চোখের বিষ।

সে সব ছেলেপুলেরা কোথায় এখন? ওর এই দুঃসময়ে তারা দেখেনা কেন?—আমার কণ্ঠে আবার সহানুভূতি ফুটল।

সন্তোষ বললে, তবেই হয়েছে? তাদের বেশি অর্ধেক মারাই গেছে বুড়ো হয়ে। নাতি-নাতনিরা ওর ভয়ে যে যার পালিয়েছে। কেউ কারো খোঁজ রাখে না।—বড় ঘর কিনা!

বড় ঘর,—সন্দেহ কি? এবার বললুম, কিন্তু নাতি-নাতনিরা যদি যে-যার কাজ হাসিল করে ওকে ফেলে পালায়, তাহলে তাদের কেমন করে ভালো ব' সন্তোষ?

বুড়ি যেন চিতিয়ে উঠল একেবারে। বললে, এতক্ষণে কথার মতো কথা বলেছ, বাছা। একেই বলি মরদের ব্যাটা। ওই মাদির বাচ্চাটা যা বলছে, একটু বিশ্বাস করোনা, বাছা। শূয়োরে কি মানুষের কথা কইতে জানে?

কি ভাগ্য, বৃষ্টির শব্দে সবগুলি গালাগালের ভাষা সন্তোষের কানে পৌঁছলেও সে যে মারমুখী হয়ে ছুটে আসতো এমন মনে হয় না।

বিড়িতে টান দিয়ে সন্তোষ এবার হি হি ক'রে হাসল। বললে, ওকে সবাই ঠকিয়ে পালাতে চায়, একথা শুনলে বুড়ি ভারি খুশী।

বুড়ি চুপ ক'রে রইল।

সন্তোষ পুনরায় বললে, জিজ্ঞেস করুন দিকি, আমার বাপকে মিথ্যে ফৌজদুরি মামলায় ফেলে দেড় বচ্ছর জেল খাটিয়েছিল কেন? বাপের পা ভেঙ্গে দিয়েছিল গুণ্ডো লাগিয়ে ওই মাগি, বুঝলেন বাবু?

বললুম, ছি সন্তোষ, ইনি তোমার গুরুজন, বারবার তুমি এভাবে গাল দিয়ো না।

গুরুজন!—বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে সন্তোষ বললে, তা সেকথা একশোবার। গুরুজন বৈকি। তবে কি জানেন বাবু, মন-মেজাজ ও মাগি ঠিক রাখতে দেয় না সব সময়ে। নৈলে দেখুন না কেন, পাঁচটা মরদকে ধরে ও বুড়ি কারবার করতো বটে, তবে আমার ঠাকুরদাকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত ঘরে উঠল। বয়েস কালে ওর মনটা উঁচুদরের ছিল বৈকি। সেই জন্যেই ত' ঠাকুমা বলে আজও ডাকি।

বুড়ি আবার তার কাঁথার তলায় চুপ করে রইলো।

প্রবল বর্ষণের ভিতর দিয়ে ছুটে মেয়ে-পুরুষ এবার ওদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে উঠে এলো। বৌটাকে দেখেই চিনলুম, এ-পাড়ার মেথরানি, দুজনেরই হাতে দুটো সেই মার্কামারা বালতি! বালতি ধুয়ে এনেছে নর্দমার জলে।

ভিতরটা আমার পক্ষে এবার যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। আন্দাজে বুঝতে পারি বেলা দশটা বাজে। বাড়ি ফিরবার জন্য ছটফট করছিলুম! গরুটা, ছাগল দুটো, কুকুরটা বাইরে বৃষ্টির জন্য সবাই নির্বিকার। শুধু ভিতর এক আধটা ইঁদুরের আনাগোনার জন্য কুকুরটা মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে আবার যেন গভীর নৈরাশ্যে ডুব দিচ্ছে।

আমার চাহনিতে বোধ করি নানাবিধ কৌতূহল ছিল ; একসময় ওধার থেকে সন্তোষ বললে, গরু ছাগল কুকুর যা দেখছেন সবই ওই বুড়ির পোষা। কুকুরটা পাহারা দেয় রাত্তিরে। গরুটা দুধ দেয় দেড় সের, দুটো ছাগলেও প্রায় তিন পো। মেথর বৌ ভাড়া দেয় মাসে তিন টাকা, জিজ্ঞেস করুন দিকি এত টাকা যায় কোথায়?

কথাটা শুনে একটু অবাক হলুন বৈকি। সমস্ত ধারণা এবং কল্পনা যেন ওলট-পালট হতে লাগলো! সন্তোষের মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলুম। না, এতটা বিশ্বাস করা বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সন্তোষ খুব এক চোট হেসে উঠলো! তারপর বললে, বুড়ি বাঁচবে না দেখছেন, কিন্তু আর পাঁচটাকে নিয়েই ও মরবে।

কেন!

আটটা ন'টা মামলা ঝুলছে ওর খতে। পাঁচ সাতটা উকীল মোক্তার ওর তাঁবেদার। —সন্তোষ মহাখুশি হয়ে বলতে লাগল, সাধে কি ওর পা ধ'রে পড়ে থাকি, বাবু? যদি মাগির একটু মন ফেরে, তাহ'লে আমাকে আর বাটালি করাত চালিয়ে মজুরি খাটতে হয় না,—পায়ের ওপর পা রেখে বসে খাবো চিরকাল!

কি রকম?

সন্তোষ বললে, কিছু জানেন না দেখছি আপনি। নয় ত' কি! পাড়ার লোক হয়েও কোন খোঁজ-খবর রাখেন না! ওই হাঁড়ি-কলসীর দোকানখানা দেখছেন ত?

হ্যাঁ—

ওর পাশে চৌধুরী কোম্পানির মনোহারীর দোকান?

রয়েছে ত'!

পানের দোকান ওর গায়ে?—এই তিনখানা দোকানের ভাড়া প্রায় একশো দশ টাকা! জিজ্ঞেস করুন দেখি বুড়ি অত টাকা কি করে? কোথায় জমিয়ে রাখে?

বলো কি সন্তোষ?

সন্তোষ একবার আড়চোখে বুড়ির কাঁথা-কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু একটা পয়সা গলান দেখি মাগির হাতের ফাঁক দিয়ে? পারবেন না। ওর হাতের মধ্যে ভেল্কি! আমি অনেক তালাস করেছি বাবু, কিন্তু টাকা কোথায় রাখে কোন সন্ধান পাই নি।

বললুম, ওর যখন এত ভালো অবস্থা, অসুখের সময় ওকে হাসপাতালে দাওনা কেন?

হাসপাতাল! তবেই হয়েচে! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সেকথা তুলবে?

বুড়ি আবার ন'ড়ে উঠেছে। আমি চুপ ক'রে গেলুম। কিন্তু সন্তোষের যেন কোনদিকেই ভ্রূপেক্ষ নেই। সে আবার বলতে লাগল, খরচা করবে না, শুধু পুঁজি করবে—এই ওর চিরটা কাল! পাঁচটা গরীব দুঃখীকেও ত' ডেকে-ডুকে খাওয়াতে পারে, তাও না। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া আর মামলবাজি।

বুড়ি এবার আর থাকতে পারলো না। বললে, সে ছিল ভদ্দরলোক, তোর মতো নচ্ছার নয়। তুই কি ছেড়েছিলি তাকে? তুইও ত' ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়েছিলি!

বললুম, কে সে লোকটা হে?

সন্তোষ বললে, সে ওই মান্নাপাড়ার সেজবাবু—খাঁটি ভদ্দরলোক। বুকের ছাতি ছিল এই, বাবু। দু'হাতে খরচ করত!

তোমাদের কে হয়?

আমাদের কেউ নয়, তবে আমার মাযের খুব আলাপী ছিল। এই ত' গেল বছর মারা গেছে। তার টাকাতেই আমরা মানুষ।

চুপ ক'রে গেলুম। সন্তোষ বলতে লাগলো, তোর গুণ কে না জানে, চিরকাল একজনের পেছনে আরেকজনকে লেলিয়ে দিয়েছিস। দুজনে ঝগড়া বেধেছে, আব তুই ভেতরে ভেতরে কাজ গুছিয়েছিস! আমি বলছি বাবু আপনাকে, ওর ওই কাঁথার মধ্যে নোংরাও যত আছে, নোটের তাড়াও তত আছে!

বুড়ি বললে, মুখপোড়া আয না—নোংবা ঘেঁটে টাকা বার কর? বুঝবো তুই কত বড় মাদির বাচ্চা!

সন্তোষ অদূরে দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে হাসছিল। বললে, ওই দেখুন বাবু, পুঁজির কথা ধরিয়ে দিলেই আগুন হয়ে ওঠে। ওইজন্য দুনিয়ায় ওর বন্ধু নেই, সবাই ওর নামে ভয় পায়। ও না পারে হেন নোংরা কাজ নেই। টাকার গরম কিনা, তাই সবাইকে শাসিয়ে চলে।

বৃষ্টির বেগ এবার যেন একটু কমেছে। এখনও বাইরে পা বাড়াবার মতো আকাশের অবস্থা হয়নি বটে, তবে এবার যেতেই হবে,—জামা কাপড়ের অবস্থা যাই হোক না কেন।

ভয়ে ভয়ে সন্তোষের দিকে আমি কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম,—অন্তত মারাত্মক রোগের ছোঁয়াচটা বাঁচুক। সন্তোষ বললে, কুকুরটাকে সাবধান বাবু, বুড়ি একবার চটলেই মুখের শব্দ ক'রে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়। ওটা ভারি পাজি।

বুড়ি আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে আড় হযে শুযে পড়লো। ভিতরে ঢুকে বিড় বিড় করে কি যেন বকছে। সন্তোষ বললে, অতগুলো মামলা বাধিয়ে রেখেছে, মাগি মরলে সকলের হাড় জুড়োয়, বাবু।

বললুম, কিসের এত মামলা সন্তোষ?

ওই ত' বলে কে? একজনের পেছনে আরেকজনকে উসকিয়ে দেয়, এই ওর চিরকালে স্বভাব। এই দেখুন না এই যে সামনের জমিটা,—প্রায় পৌনে তিন বিঘে,—এ জমি হল খিদিরপুরের চাটুয্যেদের। ও মাগি বেনামীতে চোদ্দ বছর খাদনা জুগিয়ে এই জমি দখল নিয়েছে। অত বড় জমিদার হিমসিম খাচ্ছে হাইকোর্টে গিয়ে। দু হাজার টাকা করে এ জমির কাঠা!

কুকুরটা এবার আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোঁ গোঁ করে উঠল। সন্তোষ তাড়াতাড়ি করাতখানা হাতের কাছে টেনে নিল। চেয়ে দেখি বৃষ্টি এবাব ধ'রে গেছে। এবার এ নরককুণ্ড থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।

চারিদিকে জল জমেছে। আকাশ কিন্তু এবাব ধ'রে। আমার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ কয়েক পা বাইরে বেরিয়ে এলো। বললে, বুড়ির মববার আর দেরি নেই। তবে পুরনো হাড় কিনা বাবু, ক্ষয় হ'তে সময় লাগে। কিন্তু ওর চেহারা যা দাঁড়িয়েছে, এবার যাবে। আর একটা ওলাউঠোর ধাক্কা যদি যায়, ও নিজেই কাৎ হবে! এ সব কি জানেন, মরবার আগে কামড় দিচ্ছে! মরবে নিশ্চয়ই।

সন্তোষকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে হন হন ক'রে এবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে চললুম।

সতীনাথ ভাদুড়ী

অপরিচিতা

পিকাডিলি-সার্কাসের বিখ্যাত কন্দর্পমূর্তিটির নিচে অপেক্ষা করছিলাম দত্তর জন্য এক রাত্রে। করোনেশনের আরও এক সপ্তাহ দেরি আছে। কিন্তু এখনই চেনা লণ্ডনকে আর চিনবার উপায় নেই। ভিড়ের ঠেলায় পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে থাকা দায়।... বছর চারেক থেকে দত্ত বিলাতে আছে ; তবু এখনও এতটুকু সময়ের জ্ঞান হল না! মন বিরক্ত হয়ে উঠছে তার উপর। এসেই হয়তো বলবে, এক বান্ধবী তাকে কিছুতেই আসতে দিচ্ছিল না, নেহাত আমাকে কথা দিয়েছিল বলে একরকম জোর করে চলে এল ; কাল আবার এর জন্য অভিমান ভাঙানোর পালা আছে।...আরও কত কথা। রোজ শুনতে শুনতে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে এসব। এক এক সময় সন্দেহ হয় যে মিছে কথা বলছে। আবার পর মুহূর্তে মনে হয় যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে কি কেউ এত বিশদ ও সুনিশ্চিত বিবরণ দিতে পারে, তার বিভিন্ন প্রেমের পাত্রীর! দত্ত বড়লোকের ছেলে। ব্যারিস্টারির ছাত্র। চার বছর আগে এসেছে বিলাতে, কিন্তু সব পরীক্ষাগুলো পাশ করা তার হয়ে ওঠেনি। যে কোনো গল্পই আরম্ভ কর না তার সঙ্গে, সে তার মধ্যে মেয়েদের প্রসঙ্গ আর প্রেমের রাজ্যে নিজের দিগ্বিজয়ের অসংখ্য কাহিনী এনে ফেলবেই ফেলবে। আমি যতদূর বুঝেছি, প্রেমে বিজয়লাভ বলতে সে বোঝে একজন সদ্যপরিচিত মহিলার সঙ্গে রেস্তরাঁয় অনেকক্ষণ বসে খাওয়া এবং তারপর সময় থাকলে, বড় রাস্তার উপব দিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ানো। এই নিয়েই তার এত লম্বা লম্বা গল্প, এত লম্ফঝম্ফ। তবু একথা অস্বীকার করতে পারব না যে, তার এই সব গল্প আমার খারাপ লাগে না আজকাল। এত ঝাড়া-হাত-পা ইংলণ্ডে আসবার পর আর কখনও হইনি। পড়াশোনার চাপ নেই মাথার উপর। যে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য এদেশে আসা তা পেয়ে গিয়েছি। পরীক্ষার ভাল করবার পর বিবেক একটু ভোঁতা হয়ে এসেছে। বাড়ি থেকে মিছে কথা বলে টাকা আনিয়ে থেকে গিয়েছিলাম করোনেশন দেখবার জন্য। প্রায় তিন বছর এদেশে হল। কিন্তু এতদিন পড়াশোনার দায়িত্ব মাথায় থাকায় এদেশকে উপভোগ করতে পেরেছি খুবই কম। লোকজনের সঙ্গে ভাসাভাসা পরিচয় হয়েছে, কিন্তু আলাপ জমেনি। সত্যি কথা বলতে কি লোকজনেব সঙ্গে মিশবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ী ল্যাণ্ডলেডি ছাড়া অন্য কোনো ইংরেজ মহিলার সঙ্গে আলাপ করবার সুবিধা আমার হয়নি। নাচতে জানি না, খেলাধুলোয় রুচি নেই, বড়লোকের ছেলে নয়, আমার মতো লোক নতুন আলাপ জমাবার সুযোগ পাবে কি করে এদেশে! সাধে কি আর দত্তদের দলে ভিড়বার চেষ্টা করছি ইদানীং! আমার মতো আনাড়ীকে তালিম দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটু চালাকচতুর করে দেবার জন্য তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। যে তার সবজান্তা ভাবটাকে স্বীকার করে নেয, তাকেই দত্ত বন্ধু বলে স্বীকৃতি দেয়। আমার চেয়ে এক বছর আগে বিলাতে আসবার দাবিতে, সে নিজেকে সব বিষয়ে অনেক উঁচুতে মনে করে। আমিও নির্বিরোধে তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই বলেই সে আমার উপর এত সদয়।... দত্তর এখনও আসবার নাম নেই!...একখানা খবরের কাগজ কিনলাম। করোনেশনের হিড়িকে আর কিছু না হোক, আলোর জলুস বেড়েছে ; কাগজ পড়তে কোনো কষ্ট নেই।...বড় বড় অক্ষরে—করোনেশন!...করোনেশন!...করোনেশন!...কাগজে করোনেশন ছাড়া আর অন্য কোনো খবর নেই!...'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড় কর্তাদের ভিতর করোনেশনের মরশুমে লণ্ডনে নিরাপত্তা ও শান্তি বক্ষার জন্য বিশদ আলোচনা।'

'টিলবেরি ডকে অস্ট্রেলিয়া হইতে করোনেশন উপলক্ষে আগত পুলিস দলের সহিত আমাদেব নিজস্ব প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার।—দুর্বৃত্তদের করোনেশনের সময় মোটেই সুবিধা হইবে না।'...

'পুলিসের ধারণা যে ক্যানাডার দাগী হীরা চোর রবার্টসন সম্ভবত করোনেশন উপলক্ষে ইংলণ্ডে আসিয়াছে...!'

'দেরি করে ফেললাম না কি? লিজা কিছুতেই'...দত্ত এসে গেল তাহলে। তাকিয়ে দেখি সে ঘড়ি দেখছে। লিজার গল্প এখনই শেষ করে লাভ নেই।...

'না না দেরি আর কি। আমিও তো এই আসছি। চল্!'

সম্মুখের 'কর্নারহাউস' রেস্তরাঁয় আমাদের যাবার কথা ছিল। খাবারের ট্রে নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসলাম।

'নতুন স্যুট তয়ের করালে যে দেখছি!'

'হ্যাঁ, দেশে যাওয়ার আগে একবার করিয়ে নেওয়া গেল।'

'বুঝেছি বুঝেছি দাদা, করোনেশনের মরশুমে কাজে লাগবে। ঠিকই করেছ। অপরিচিতাদের সঙ্গে আলাপ করতে হলে ভাল দরজী-বাড়ির স্যুটই প্রারম্ভিক পাসপোর্ট এদেশে।'

'না না সেজন্য পোশাক তয়ের করাইনি। আর আমার মতো চেহারায় যত দামী স্যুট পরি না কেন, কোনো মেয়ে ফিরেও তাকাবে না।'

'এ তোমার ভুল ধারণা। ভাল পোশাকে লোকের চেহারা বদলে দিতে পারে। খেঁদি পেঁচিকে রানীর পোশাক পরিয়ে দাও, দেখবে ঠিক রানী রানী দেখতে লাগছে। তবে হ্যাঁ, পোশাকের কাটছাঁট সেলাই-এর ভালমন্দ দেখা মাত্র বুঝতে পারি। তুমি করালেই যদি, তবে আর একটু বেশি খরচ করে একটা ভাল দোকান থেকে করালে না কেন?'

আমার জামার ভিতরে 'অস্টিন রিড'-এর দোকানের নাম লেখা আছে। নিজের সামর্থ্যের চেয়ে বেশি খরচ করে ঐ ভাল দোকানটির থেকে জামা তয়ের করিয়েছি। ইচ্ছা হল দত্তকে সেই লেখাটা দেখিয়ে দিই। কিন্তু তাতে লাভ নেই। তাহলে আজকে রাত্রের গল্প আর হয়তো ভাল করে জমবে না। বরঞ্চ ইংলণ্ড সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার দিকটা বাড়িয়ে বললেই সে খুশি হবে বেশি। তাই তার প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আমি যেদিন প্রথম লণ্ডনে আসি সেদিনও এই 'কর্নার হাউস' রেস্তরাঁয় খেতে এসেছিলাম। একটা 'Lancashire Hot-Pot' নিয়ে কি অপ্রস্তুত! পাত্রটিকে নাড়িচাড়ি উপুর করি, কিছুতেই ভিতরের মাল বার হয় না। সবাই তাকিয়ে আমার টেবিলের দিকে। ময়দা না কি দিয়ে যেন মুখটা আঁটা থাকে না, সেটিকে কেটে যে ভিতরের তরকারি বার করতে হয়, তা কি তখন জানি?'

'এখনও যে তখনকার চেয়ে বিশেষ বেশি জেনেছ এদের সম্বন্ধে তা ভেবো না। এখানকার কোনো নামজাদা হোটেলে তো একদিনও খাওনি বোধ হয়?'

তার ভাবখানা যে ভাল হোটেলে খেতেই সে অভ্যস্ত। নেহাত আমার খাতিরে আজ এই সস্তা রেস্তরাঁয় ঢুকে ফেলা রুটিন-ডিস খাওয়ার জন্য এসেছে। 'বলেছ ঠিকই! ভাল হোটেলে খাওয়ার রেস্ত কোথায় পাব। দেশে কাত্যায়নী কেবিনে চা খাওয়া অভ্যাস ছিল ; এখানে তাই এই সস্তা রেস্তরাঁর জাঁকজমকেই আজও হকচকিয়ে যাই। ঐ শোন হোটেলের মিউজিক! যে রেস্তরাঁয় খাওয়ার সময় ভদ্রমহিলারা পিয়ানো বাজিয়ে শোনান তাকে কি আমি বাজে হোটেল বলে ভাবতে পারি?'

'এখানকার এই তৃতীয় শ্রেণীর পিয়ানোর গৎগুলোকে আর মিউজিক বোলো না! আর প্রত্যেকবার বাজানোর পর পিয়ানিস্ট মহিলাটি অপেরার সেরা নর্তকীর ধরনে কি রকম করে সকলকে ঝুঁকে কুর্নিশ করে হাততালি পাবার জন্য লক্ষ্য করেছ?'

'ভদ্রমহিলার হাবভাব দেখে শুধু আমরা কেন, এই রেস্তরাঁর প্রত্যেক খদ্দেরই হাসে। অথচ মজা দেখেছ, প্রত্যেকেই যথাসময়ে হাততালিও দিতে ভোলে না। অদ্ভুত এই ইংরেজ জাতটা! আমি তো এদের মতি-গতি কিছুই বুঝতে পারলাম না তিন বছরেও।'

'ওসব কি আর বইয়ে লেখা থাকে ; ওসব চেষ্টা করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শিখতে হয়।'

'আমাদের প্রোফেসার বলছিলেন যে, আসল ইংরেজ-চরিত্র দেখতে হয় যুদ্ধের সময়, আর করোনেশনের সময়। যুদ্ধের সময়ের ইংলণ্ড দেখবার সুযোগ না হয় হয়নি, কিন্তু করোনেশনের সময়ের ইংলণ্ড তো দেখছি। ইংরাজদের মধ্যে নূতনত্ব তো কিছু চোখে পড়ছে না ; শুধু রাস্তার ভিড় খানিকটা বেড়েছে আগের থেকে।'

'তোমার প্রোফেসার ভেবেছিলেন বোধ হয় যে তুমি করোনেশনের সময় এখানে থাকবে না ; তাই

খানিকটা বাড়িয়ে বলেছিলেন। যে দেশে রাজারানী আছে, সেখানেই লোকে করোনেশনের সময় হুজুগে মাতে। এর মধ্যে ইংরেজ জার্মান কিছু নেই! তুমি বলছ রাস্তার লোক বেড়েছে; আমার তো ভাই নজরে পড়ে না। আজকের ভিড় দেখে বলছ তো? পিকাডিলি-সার্কাসে প্রতি শনিবারেই এই রকম ভিড় হয়। বরঞ্চ আজকে একটু কম মনে হল। করোনেশন হচ্ছে শনিবার সন্ধ্যার একটা পরিবর্ধিত সংস্করণ। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।'

এইরে! একটু বিরক্ত ভাব যেন দস্তুর! কি আবার বেফাঁস বলে ফেললাম? তার চেয়ে বেশি জানি এমন কোনো কথা বলেছি বোধ হয়! সামলে নেবার জন্য বলতে হয়—'পিকাডিলি-সার্কাস অঞ্চলে আমার যাওয়া আসা এতকাল কম ছিল কিনা, সেইজন্য এর আগে হয়তো ভাল করে লক্ষ্য করিনি এখানকার লোকজনের ভিড়। এই রেস্তরাঁয় প্রথমদিনই আর এক কাণ্ড করেছিলাম। শোনো বলি। খেয়ে দেয়ে বার হবার সময় দেখি দরোয়ান আমাকে যেতে দেবার জন্য দরজা ফাঁক করে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে আসবার পর বুঝি যে সে দরোয়ান নয়; আমারই মতো একজন খদ্দের। আমারই জন্য ভদ্রতা দেখিয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। একটা ধন্যবাদও দেওয়া হয়নি। প্রথম দিনের এই দু'দুটো কাণ্ড থেকেই বোধহয় পিকাডিলি-সার্কাসের দিকটা এড়িয়ে চলবার একটা চেষ্টা ছিল আমার অবচেতন মনে।'

'তুমি যে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে চলে যাচ্ছো! সাবধান! থিয়োরি শিখতে শিখতেই তোমাদের জীবন কেটে গেল! কাজে খাটাতে না পারলে শুকনো মনোবিজ্ঞান শিখে লাভ কী? ইংরেজদের সাইকোলজি শুনবে? স্বাভাবিক ইংরেজ অস্বাভাবিক মানুষ। এই অমানুষ জাতটা মানুষ হয় সপ্তাহে একদিন—শনিবার সন্ধ্যায়। আজ একটু অন্যরকম অন্যরকম লাগছে না? শুধু যে পানশালা, নাচঘর, সিনেমা, থিয়েটার আজ ভরা তা নয়; শনিবারে সমাজ একটু রাশ আলগা দেওয়ায় আসল ইংরেজ ফুটে বার হয় নকলের মধ্যে থেকে। বলছিলাম না যে করোনেশনের সময়ের ইংরেজ শনিবারের রাতের ইংরেজের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ; কথাটা হয়তো ঠিক হয়নি। পরিবর্ধিত ও অমার্জিত সংস্করণ বলাই ঠিক হবে। আর এক কথা। আমার বদ্ধমূল ধারণা কি জানো? জাতীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় মেয়েদের মধ্যে। চেহারা আর পোশাকের কথা বাদ দিলে পুরুষ সব দেশে মোটামুটি একই রকম। কিন্তু মেয়েরা তা নয়। কোথাও মেয়েরা দেখবে কেঁদে জেতে, কোথাও হেসে, কোথাও ঠাণ্ডা বরফ, কোথাও গরম আগুন, কোথাও গম্ভীর, কোথাও চটুলা, কোথাও দেহসর্বস্ব, কোথাও ভাবপ্রবণ, কোথাও দেখবে তোমাকে খাইয়ে খুশি করতে চায়, কোথাও তোমার পয়সায় খেয়ে তোমাকে খুশি করতে চায়। আমি তো যে কোনো দেশে গিয়ে মেয়েদের শুধু চলার ভঙ্গি দেখে বলে দিতে পারি সেখানকার জাতীয় বৈশিষ্ট্য কি কি। চোখের চাউনি দেখতে পেলে তো কথাই নেই!'

'বোরকা পরা থাকলে কি করবে? সেখানে না দেখতে পাবে চোখের বিজুলী, না বুঝতে পারবে চলার ভঙ্গি ঢিলে আলখাল্লার মধ্যে দিয়ে?'

'বোরকা পরা মেয়ের সম্বন্ধে আমার কোনো কৌতূহল নেই। জানবার আছেই বা কী? বোরকাই সেখানকার স্ত্রী-পুরুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তুমি হঠাৎ বোরকার কথা তুললে কেন? আমায় ঠাট্টা করে নাকি? সত্যিই মেয়েদের চোখের চাউনির ভাষা আমি বুঝতে পারি। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

'না না সে কথা কে বলছে! মনের ছাপ চোখে পড়ে বই কি। মেয়েদের চোখের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা তোমার আছে জেনেই তো তোমার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করি।'

'শিখে যাবে হে। এই করোনেশনের সপ্তাহেই সব চাউনির ভাষা পড়তে শিখে যাবে। 'বিলোল-কটাক্ষ' কথা দুটো বইয়ে পড়েছ তো? কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, তুমি কারও চাউনি দেখে চিনতে পারবে না সেটা বিলোল-কটাক্ষ, না অন্য কিছু। যতই অভিধান দেখে তার মানে খুঁজে বার কর না কেন। সারাজীবনের পুঁথিগত বিদ্যাব চাইতে এক ঘণ্টার অভিজ্ঞতায় যে লোকে বেশি শিখতে পারে, এ তোমায় আমি হাতেনাতে দেখিয়ে দেব। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রের কথা হচ্ছিল না? পাঁজি দেখে যেমন আমরা আমাদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করি, ওদেরও সেই রকম গোছেরই ব্যাপার। শনিবার ছাড়া

রোজই অশ্লেষা মঘার পালা, নীতিবাগীশদের যাত্রা নাস্তি। মহাশনিবার হচ্ছে করোনেশন ; একেবারে চূড়ামণিযোগের ব্যাপার। লোকাচার শাস্ত্রের বিধি অনুযায়ী ওরা প্রত্যেকে সেই সময় একখানি করে সাময়িক ছাড়পত্র পায়—একেবারে travel-as-you-like টিকিট। এই জিনিসকেই তোমার প্রোফেসার বলেছিলেন ইংরেজদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। করোনেশনের হুল্লোড়ের মধ্যে এ কয়দিন নিজেকে ডুবিয়ে দাও ; করোনেশনের আবহাওয়া প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিয়ে একেবারে আপন করে ফেল ; করোনেশনের উদ্দাম আবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়। তবে না ইংরেজদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবে। বুঝবে যে এরাও জীবনের স্বাদ নিতে জানে। ভয় কোরো না! সংকোচের কারণ নেই। শুচিবাই-গ্রস্তা ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনে বসবার সপ্তাহও সে যুগের লম্বা-জুলফি-ওয়ালা ইংরেজরা যেমনভাবে উদ্‌যাপন করেছিল, আজ তাঁর নাতি-নাতনীর যুগে তার চেয়ে অনুদারভাবে এ যজ্ঞ সমাধা হবে না। এই সপ্তাহের স্মৃতি তোমার জীবনের সঞ্চয় হয়ে থাকবে!'...

দস্তুরমতো লেকচার দেওয়া আরম্ভ করেছে দত্ত, আমার ভয় ভাঙানোর জন্য। গত কয় মিনিটের মধ্যে করোনেশনের সম্বন্ধে তার মত বদলেছে। আমি এতে আশ্চর্য হইনি। তার মতের নড়চড় হয় না ততক্ষণ, ঠিক যতক্ষণ তুমি তার কথার প্রতিবাদ করছ। আমি যে অকুণ্ঠভাবে নিজেকে তার হাতে সঁপে দিয়েছি, এ বিষয়ে দত্তর আর সন্দেহ নেই। সেইজন্য তার অপদার্থ শিষ্যকে উপদেশ দেবার প্রেরণা পাচ্ছে সে।—কানে ভেসে আসছে তার কথার স্রোত।. .এখন চলছে একটি ইংরেজি কবিতার কয়েকটি লাইন। নীরস জীবন নিয়ে বিরাট ওকগাছ কতকাল বেঁচে থাকে। কিন্তু তাতে লাভ কী? লিলি বাঁচে মোটে একদিন—সৌন্দর্যের রসে ভরপুর জীবন। বসন্তের ঐ একদিনই যথেষ্ট...তবে মিশতে হবে ওদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।...এক এক জায়গায় আলাপ করবার নিয়ম এক এক রকম। নাচ ঘরে যে নিয়ম কার্যকরী রাস্তায় সে নিয়ম অচল। হাউড পার্কে উপবিষ্টা মহিলার সঙ্গে প্রথম আলাপের কৌশল কখনও রেস্তরাঁয় আহাররতা মহিলার বেলা চলতে পারে না।...যত খারাপ ডিশই দিক, এই সব সস্তা হোটেলের একটা মস্ত গুণ যে এখানে যারা খেতে আসে তাদের সঙ্গে আলাপ করা সহজ। এদের অধিকাংশই প্রেম করবার জন্য উদ্‌গ্রীব, সব শনিবারে। এই করোনেশনের বাজারে তো কথাই নেই! তবু এদের মধ্যে থেকেও মেয়ে চিনে বার করতে হয়। সে চোখ থাকা চাই। চাউনির ভাষা বুঝবার চোখ।...বুঝতে শেখো, জানতে শেখো, চিনতে শেখো!

বহুদূর হলঘরের কোনার দিকের একটি টেবিল দেখিয়ে দত্ত বলল—'ঐ যে দুটি মহিলা দেখছ, ওঁদের সঙ্গে আলাপ করা যেতে পারে।'

দত্তর লেকচার একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এখন তার শুধু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নয়—একেবারে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম মহিলা দুটিকে ভাল করে লক্ষ্য করবার জন্য। একজন পোশাক সবুজ রঙের ; আর একজনের গোলাপী।...মহিলা দুজন মৃদু হাসতে হাসতে গল্প করছেন নিজেদের মধ্যে।...খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন মধ্যে মধ্যে চারিদিকের টেবিলের লোকজন আড়চোখে দেখে নিচ্ছেন, নিজেদের হাসিগল্পের খোরাকের জন্য বোধ হয়। হাবভাবে এখানকার অন্য মহিলাদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য আমার কিছুই নজরে পড়ল না।...

দত্তকে জিজ্ঞাসা করি, 'কি করে বুঝলে?'

এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল সে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষের দিকে গোয়েন্দা যেরকম করে নিজের যুক্তির শৃঙ্খলের বলয়গুলো এক এক করে তুলে ধরে পাঠকদের সম্মুখে সেই রকমভাবে দত্ত আরম্ভ করে।

'প্রথমত বেশভূষা দেখে!'

এই পয়েন্টটি এত সংক্ষেপে সেরে দিল যে, আমি জিজ্ঞাসা করবারও সুযোগ পেলাম না, বেশভূষার মধ্যে বিশেষত্ব কি দেখলে? পোশাকের রঙের মধ্যেই কিছু আছে নাকি? কে জানে?

'দ্বিতীয়ত, ওদের খাবার ডিশগুলো লক্ষ্য করেছিলে? সস্তায় পেট ভরানোর চেষ্টা। গরিব। তা না হলে এখানে আসবেই বা কেন! একটু একটু করে খাচ্ছে, ছোট ছেলেপিলেদের মতো। যাতে অনেকক্ষণ ধরে স্বাদ পাওয়া যায়। গরিবরা মনের দিক থেকে উদার হয়।'

'বেশি খিদে নেই বোধ হয়। খিদে থাকলে তবে তো গোগ্রাসে গিলবে।'

'যা বলছি শোনো। জানবার ইচ্ছে থাকলে বাজে তর্ক কোরো না। অন্তত এখন নয়। ওতে চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। তোমার সব প্রশ্নের জবাব দেবো আমি পরে।...ঐ! ঐ! তাকিয়েছে! তাকিয়েছে!...তাকাচ্ছে আমাদের দিকে! এইভাবে তাকানোটাই আসল! অব্যর্থ লক্ষণ।'...

সত্যিই সবুজ পোশাক পরা মহিলাটি আবার যেন এদিকে তাকালেন মনে হল।...কি যেন বলছেন ফিসফিস করে সঙ্গিনীকে।...দুজনেই প্লেটের উপর ঝুঁকে পড়েছেন।...ঠিকই তাকিয়েছেন।...আর কোনো সন্দেহ নেই!...দত্তর চোখ আছে!...

'হ্যাঁ মুখার্জি, তোমাকে আর একটা কথা সেদিন বলেছিলাম মনে আছে বোধ হয়? এসব ক্ষেত্রে দুই সংখ্যাটি বড় পয়মন্ত; বড় ভাল। ওরা দুজন আছে। প্রেমিকারা একা বার হওয়া শোভন মনে করেন না। দুজন একসঙ্গে বার হলে নানান দিক দিয়ে সুবিধে। সেসব তোমাকে সেদিন বলেইছি। ওরা খোঁজেও দুই বন্ধুকে। নইলে দু'য়ে দু'য়ে চার মিলবে কি করে? তোমাকেও বলে রাখি, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ যদি করতে চাও তবে খবদ্দার একা বেরিয়ো না। আবার তিনজনও থাকবে না। সুবিধে আছে হে, সুবিধে আছে এতে; চালাক লোকের পক্ষে একটি ইশারাই যথেষ্ট। একদিনে রংরুটকে কতটুকুই বা শেখানো যায়!...'

দত্তর কথা মনে বসেছে। মেয়েটি এদিকে তাকানোর পর আর দত্তর গল্পকে অতিরঞ্জিত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

'দুজনে থাকার এক মস্ত সুবিধে...একজন বসে থাকতে পারে, আর একজন উঠে যেতে পারে বাইরে।' দত্তর কথার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম।

সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

'আর কত পরিষ্কার করে বোঝাই? মার্জিত সমাজে কি মেয়েরা—ওগো আমি তোমার সঙ্গে প্রেম করতে চাই গো বলে সাইনবোর্ড লাগিয়ে বসে থাকবে।'

ব্যাপার আমার পক্ষে বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠল দেখছি! তবু বাঁচোয়া যে, হঠাৎ হাততালির শব্দে দত্ত আর কথা বলতে পারছে না। পিয়ানা এই মুহূর্তে থেমেছে। পিয়ানিস্ট ভদ্রমহিলা সম্মুখে ঝুঁকে কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে হতাশ না করবার জন্য সকলেই হাততালি দিচ্ছে। এখানকার বাঁধা খদ্দেররা এরই প্রতিক্ষায় ছিল এতক্ষণ, প্রাণ খুলে হেসে নেবার জন্য।...দূরের টেবিলের সেই সবুজ আর গোলাপী পোশাকপরা মহিলাদুটির উপর আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ।...তাঁরাও হাততালি দিতে দিতে হাসছেন।...চারিদিকের লোকজনের মুখের দিকে দেখছেন।...এইবার আমাদের দিকেও নিশ্চয়ই তাকাবেন। লক্ষ্য রাখতে হবে সেই সময় তাঁদের চাউনির ভঙ্গি।...অবশ্যম্ভাবী প্রত্যাশায় মন মেতে উঠেছে।...প্রাণপণ শক্তিতে হাততালির ঐকতানে যোগ দিয়েছি হাসতে হাসতে।...তাকিয়েছেন! ঐ তাকাচ্ছেন সবুজ পোশাকপরা মহিলা আমারই দিকে! শুধু আমার দিকে! দত্তর দিকে নয়! ঘরভরা এত লোকের মধ্যে আর কারো দিকে নয়! এ এক নতুন উদ্দীপনা। দ্বিগুণ উৎসাহে হাততালি দিচ্ছি।...

যখন থামলাম, দেখি আমার একার হাততালিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক আমার দিকে তাকিয়ে। কেউ কেউ আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে, সেই সবুজ পোশাকপরা মহিলাকে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছেন।...ঠিক সবুজ পরীর মতো দেখতে লাগছে ওঁকে। .

'এই!'

দত্ত জুতোর ঠোকর মেবে আমায় সাবধান করে দিল। সে খুশি হয়েছে তার যুক্তির সত্যতা প্রমাণ হওয়ায়। আরও বেশি খুশি হয়েছে শিষ্যের পরিবর্তন দেখে।

সে কি সোজা পরিবর্তন! এক নম্বরের চালিয়াত ভেবে যে দত্তর কাছে ঘেঁষতাম না এক মাস আগে পর্যন্ত, তারই কাছে সত্যেন দত্তর 'সবুজ-পরী' কবিতার দু'লাইন আউড়ে দিলাম এখন। সবুজ ছাড়া আর সব রঙ পৃথিবীতে নিরর্থক, সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত। দত্ত চক্ষের চাউনির ভাষা বোঝে; আমার চোখে যে সবুজের নেশা লেগেছে একথা বুঝতে তার দেরি হয়নি।

সবুজপরী ঘড়ি দেখলেন।..আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন।...আমার সাহস বেড়েছে; তাই চোখ ফিরিয়ে নিলাম না। চোখাচোখি হতে তিনি সঙ্গিনীর দিকে ফিরে তাকিয়ে কী যেন বললেন।.. দুজনেই

হাসছেন।...ফিকে সবুজ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঘরের ঐ কোনাটি!...গোলাপীর পাশে সবুজ যে এত সুন্দর মানায় তা আগে জানতাম না! সবুজ পাতার মধ্যে গোলাপ ফুল দেখতে ভাল লাগে চিরকাল; কিন্তু তখন যে নজর থাকে গোলাপী রঙের ফুলটির দিকে; সবুজের দিকে কে তাকায়?

দত্ত উপদেশ দিচ্ছে—'দেখেছ! বলেছিলাম না! ওরা নিজেদের নিজেদের মধ্যে ঠিক করেছে কে আগে উঠবে। আজকের এমন আলাপের সুযোগ নষ্ট হতে দিও না! মন তৈরি করে ফেল! নার্ভাস হবার কিছুই নেই। কী বলে কথা আরম্ভ করবে সেটা আগে থেকে ভেবে রেখো। ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা লেগে গেলে বলবে 'মাপ করবেন। যা ভিড় করোনেশনের মরশুমে!' না হয় দেশলাই আছে কিনা খোঁজ নিতে পারো মহিলাটির কাছে। তোমার পক্ষে বোধ হয় সহজ হবে বলা 'ভারি সুন্দর রাতটা!' ভাব দেখাবে যে কথাটি কাউকে উদ্দেশ্য না করেই বলা। তারপর মুখে হাসি এনে মেয়েটির দিকে তাকাবে। মেয়েটি অবধারিত হেসে তোমার কথার সমর্থন করবে। ব্যাস! তারপরেই আরম্ভ করবে গল্প। এত খুঁটিনাটি কি কাউকে মুখস্থ করে শিখিয়ে দেওয়া যায়?'

আর শেখানোর দরকারও ছিল না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি। দত্ত ঠিক বলেছে। কথার আরম্ভটাই আসল। পরের কথাগুলো আপনিই মুখে জোগাবে।

সবুজপরী হাত ঘড়িতে আর একবার সময় দেখে নিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

'মুখার্জি ওঠো।'

দত্ত একথা বলবার আগেই আমি উঠে পড়েছিলাম।...পান্নার দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে সবুজপরী এগিয়ে চলেছেন দরজার দিকে। যেমন করে হোক তাঁর কাছে পৌঁছতে হবে। আর দ্বিধা করবার অবকাশ নেই। একখানা চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম প্রথমেই। কে কী ভাবল সে কথা ভাববার সময় নেই আমার এখন! একটি সবুজ জ্যোতির্মণ্ডল ছাড়া আর সমস্ত পৃথিবী মুছে গিয়েছে আমার চোখের সম্মুখ থেকে। এখন যদি উনি সত্যিকার সবুজপরী হয়ে উড়েও যান ডানা মেলে তবুও তার পিছু নিতে হবে! কার সাধ্য আমাকে আটকায়! সবুজপরী দরজা দিয়ে বাইরে বেরুলেন। এখন প্রত্যেক সেকেণ্ডর মূল্য আছে আমার কাছে। প্রায় ছুটে চলেছি। আমার আগের ভদ্রলোকটি বার হবার সময় দরজাটি খুলে ধরে দাঁড়ালেন, খোলা কপাটের চার্জ আমার হাতে সপে দেবার জন্য।...

'ধন্যবাদ।'

দারোয়ান বলে ভুল না করলেও, আজও সেই লণ্ডনে প্রথম দিনের ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটে গেল। ভদ্রলোকটির মুখখানি কেমন হয়ে গিয়েছিল দেখবার সময় পাইনি।...সবুজপরী পেভমেণ্টের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলেছেন। এমন সময় হনহন করে চলবার দরকার কি? এইটাই নিয়ম না তো? একটি খুব জরুরী কাজের ভান দেখাতে চান বোধ হয়। তাঁকে ধরতে হলে আমার দৌড়ান ছাড়া উপায় নেই।...ছুটতে আরম্ভ করেছি হন্তদন্ত হয়ে।...তিনি কন্দর্পমূর্তির পাশ দিয়ে গিয়ে ওদিককার পেভমেণ্টে উঠলেন।... আমিও প্রায় পৌঁছে গিয়েছি তাঁর কাছে। হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গিয়েছি শেষ মুহূর্তেও। হাঁটুর কাছে কি রকম যে অসাড় ভাব, কী বলে কথা আরম্ভ করা যায় ভেবে ঠিক করতে পারছি না।...দেশলাই চাওয়া ঠিক হবে না।...

...তাঁর পাশে পৌঁছে গিয়েছি। আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলে না। মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম—'ভারি সুন্দর রাতটি!'

নজর আমার তাঁর মুখের দিকে। সবুজপরী অবাক হয়ে তাকিয়েছেন।...অল্প হাসি হাসি মুখ। হাসির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন যে, সত্যই আজ রাতটি অতি সুন্দর।...তাঁর চাউনির ভাষা বুঝতে চেষ্টা করছি, দত্তর নির্দেশ মতো।....তিনি চিনতে চেষ্টা করছেন আমায়। প্রশ্ন করছেন। আমার কাছ থেকে বোধ হয় অন্য কথার আশা করেছিলেন। সলজ্জ আরক্তিম মুখে ও চাউনি ঠিক খাপ খাচ্ছে না। একটা কিছু বলতে হয় এখন।

'মাপ করবেন, যদি আপনার আপত্তি না থাকে তাহলে চলুন কোথাও বসে কিছুক্ষণ গল্প করতে করতে খাওয়া যাক একটু কিছু।'

এতক্ষণে তিনি যেন বুঝলেন, আগাগোড়া ব্যাপারটা। কাঠিন্যের আভাস পড়ল কেন দৃষ্টিতে? দত্তর শেখানো সব হিসাব গুলিয়ে দিয়ে সবুজপরী জবাব দিলেন—'আমি দুঃখিত। আমার এখন বিশেষ কাজ আছে।'

গলার স্বর বেশ শান্ত ও সংযত।

দত্ত এর আগে আমায় আর একদিন বুঝিয়েছেন, অনেক সময় এদের 'না' মানেই 'হ্যাঁ'। তাই নয়তো?

'আচ্ছা তবে কাল বিকেলে আপনার যদি সময় হয়...'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সবুজপরী বললেন—'না দুঃখিত! কালও আমার কাজ আছে।'

এবার গলার স্বর দৃঢ়তর। চোখে বিরক্তির আভাস সুস্পষ্ট। ভদ্রতার খাতিরে মুখে হাসি আনবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা আছে।...একটা মাকড়শা কিংবা শুঁয়োপোকাকে দেখছেন যেন তিনি?...

আর ভুল বুঝবার অবকাশ মোটেই নেই। এক মিনিটের অভিজ্ঞতায় মেয়েমানুষের চোখের ভাষা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আমার কাছে। সে দৃষ্টি বলতে চায়—নেহাত তুমি বিদেশী ছাত্র বলে পুলিশ ডাকছি না, নইলে তোমার মতো লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।...

...ধরণী দ্বিধা হও!...আমার নিজের চোখের চাউনি কোথায় লুকোই, তা সুদ্ধ ভেবে ঠিক করতে পারছি না লজ্জায়!...

কিন্তু মহিলাটি ভদ্র। মনের উষ্মা কথাবার্তায় প্রকাশ না পেয়ে যায়, এ বিষয়ে শিক্ষা আছে, অধিকাংশ ইংরেজের মতো। আমার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন নিজের গন্তব্যের দিকে।

মুহূর্তের মধ্যে কী যেন ঘটে গেল। ফুট ছয়েক লম্বা দুজন লোক দুদিক থেকে এসে আমার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়েছে! ছিল কোথায় এরা? এরা কি ঐ মহিলাটির প্রণয়ী? না নিকট আত্মীয়? না আমার আস্পর্ধা দেখে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে দুজন পথচারী ইংরেজ আমায় উচিত শিক্ষা দেবার জন্য? ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁপছে। এখন কী করা উচিত সে কথা ভাববার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার লুপ্ত হয়েছে। এদের সঙ্গে মারামারি কববার কথা ভাবাও যায় না। ও জিনিস কোনোকালেই আমার আসে না। পুলিশ ডাকবার সাহস নেই, নিজের বিবেক পরিষ্কার নয় বলে। এখনই লোক জড়ো হয়ে যাবে আমাকে ঘিরে! এরা যখন আমায় ধরেছে, তখন কি আর ঘা কতক না দিয়েই ছাড়বে! সিনেমায় দেখেছি ঝগড়ার সময় ইংরেজরা আমাদের মতো চড়-চাপড় মারে না, ঘুঁসি মারে ; নাকে, মুখে, চিবুকে। নিজের মুখখানিকে আসন্ন আঘাত থেকে বাঁচানোর জন্য অজ্ঞাতে হাত উঁচুতে তুলবার চেষ্টা কবতেই সেই দুজন আমার দু' কাঁধে হাত রাখল। ছাঁত করে মনে পড়ল, লণ্ডনের রাস্তা দিয়ে পুলিশ যখন কাউকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, তখন একজন ডান বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাতটি চালিয়ে দেয, আর একজন দেয় বাঁ বগলের মধ্যে দিয়ে তার হাত। এরা তো দেখি তা-ই করছে! কলোনির পুলিশ? দুজনেই লণ্ডন পুলিশের মতো লম্বা! সেই রকমই দৃঢ় অথচ সংযত এদেব ভাব। মাথার উপব এখন যদি এদের বাজও পড়ে, তবু এরা নিজেদের কর্তব্য করতে ভুলবে না! কালকের কাগজে পড়েছিলাম যে, করোনেশনের সপ্তাহে প্রতি রাস্তায় সাদা-পোশাক-পরা পুলিশের লোক থাকবে, দুর্বৃত্তদের ঠাণ্ডা করবার জন্য। তবে তো এরা ঠিকই সাদা পোশাকপরা পুলিশ! ভয়ে ঘেমে উঠেছি। বেশ জোবেই তারা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ঐ ভদ্রমহিলাটিকে কী বলছিলে?'

এরা নিশ্চয়ই সব দেখেছে। কোনো জবাব জোগায় না আমার মুখে।

'আমি—অ্যাঁ—আমি বলেছিলাম যে...' কথা খুঁজবার ব্যর্থ চেষ্টা আর আমায় করতে হল না। সবুজপরী অল্প কিছুদুর মাত্র গিয়েছিলেন। তিনি থমকে ফিরে দাঁড়ালেন। বোধ হয় কানে গিয়েছে এখানকার পুলিশের কথাবার্তা! এই দিকেই যেন এগিযে আসছেন! আর রক্ষা নেই! এতক্ষণে ষোল কলা পূর্ণ হল! আমার দুঃসাহসের কথা হয়তো অতিরঞ্জিত করেই বলবেন পুলিশের কাছে। এখনই পেনি কাগজের ফটোগ্রাফার আমার ছবি তুলে নেবে! আর কাল সকালেব কাগজেই পিকাডিলি-

সার্কাসে ভারতীয় দুবৃত্তের চাঞ্চল্যকর সংবাদ বেরিয়ে যাবে। ভারতবর্ষের কাগজেও ঘোরাতে পারে। ভারতীয় হাইকমিশনারই হয়তো বাড়িতে চিঠি লিখে দেবেন! এতবড় বিপদে আমি জীবনে পড়িনি এর আগে!

সবুজপরীর মুখে হাসি! তবে কি এদের মধ্যে একজন তাঁর প্রণয়ী? সবুজপরী খানিক দূর থেকেই হাসতে হাসতে বললেন, 'আচ্ছা, কাল তিনটের সময় তোমায় আমি ফোন করব বুঝলে? এখন আসি ; আবার কাল ফোনে জানাবো, কখন তোমার বাড়িতে যাব।'

অবাক হয়ে গিয়েছি। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার সম্মুখের লোক দুজনের মধ্যে কাউকে বলছেন বুঝি। তা তো নয়! উনি বললেন আমাকেই! আমার নামধাম কিছুই তো জানেন না! আমার বাড়ির ফোন নম্বর উনি পাবেন কি করে?..

মুহূর্তের বিস্ময়। তারপরেই জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা আমার কাছে। উনি লোক দুটিকে শুনিয়ে দিলেন যে আমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় আছে আগের থেকে। এ না করলে আজ আমার নিস্তার ছিল না।

সেই লম্বা চওড়া জোয়ান দুজন অবাক হয়েছে আমার চেয়েও বেশি। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুতও। সবুজপরীর কথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাত নামিয়ে নিয়েছে আমার গায়ের থেকে। ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে পালাবার পথ খুঁজছে তখন তারা।

...অপরিচিতা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন। রঙবেরঙের আলো পড়েছে অন্ধ কন্দর্পমূর্তিটির গায়ে!

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জুয়াড়ির বৌ

ধরিতে গেলে জুয়ার দিকে মাখনের ঝোঁক ছিল ছেলেবেলা হইতেই। তার অল্প বয়সের খেয়াল আর খেলাগুলির মধ্যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের এমন জোরালো মানসিক বিকারের সূচনা অবশ্য কেউ কল্পনা করিতে পারিত না। বাজি ধরে না কে, লটারির টিকিট কেনে না কে, মেলায় গেলে নম্বর লেখা টেবিলে দু-চারটা পয়সা দিয়া ঘূর্ণমান চাকায় লেখা নম্বরের দিকে তীর ছোড়ে না কে? এসব তো খেলা—নিছক খেলা। তবে মাখনের একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কথায় কথায় সকলের সঙ্গে বাজি ধরিত, লটারির টিকিট কেনার পয়সার জন্য বিরক্ত করিয়া করিয়া গুরুজনের মার খাইত, মেলায় গিয়া অন্য জিনিস কেনার পয়সা তীর ছুড়িবার খেলায় হারিয়া আসিত। এই তুচ্ছ ছেলেমানুষি পাগলামি যে একদিন একটা মারাত্মক নেশায় দাঁড়াইয়া যাইবে এ কথা কারো মনে আসে নাই।

প্রকৃত জুয়া আরম্ভ হয় ঘোড়দৌড়ের মাঠে। মা ' তখন কলেজে গোটা দুই পরীক্ষা পাস করিয়াছে। নলিনীর দাদা সুরেশ ছিল তার প্রাণের বন্ধু, একদিন সে-ই ঘোড়-দৌড়ের মাঠে নিয়া গেল।

'আজ একটু রেস খেলি চ' মাখন।'

'রেস? আমার কাছে মোটে দশটা টাকা আছে।'

'আবার কত চাই? লাগে তো আমি দেবখন—আয়।'

সাত টাকা জিতিয়া দুজনের সেদিন কী ফুর্তি! সায়েবি হোটেলে সাতগুণ দাম দিয়া চিংড়ি মাছের মাথা আর মুরগির ঠ্যাং গিলিয়া বায়স্কোপ দেখিয়া সুরেশ বাড়ি গেল আর মাখন ফিরিল তার মেসে।

তারপর আর দু-একবার রেস খেলিতে গিয়া কয়েকটা টাকা হারিয়াই সুরেশ যদি-বা বিরক্ত হইয়া মাঠে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল, একটা দিন যাইতে না পারিলে মাখনের মন করিতে লাগিল কেমন কেমন। সুরেশের কাছে প্রায়ই সে টাকা ধার করিতে লাগিল।

আরেকটা পরীক্ষা কোনোরকমে পাস করিবার পর একদিন হিসাব করিয়া দেখা গেল সুরেশের কাছে মাখন অনেক টাকা ধারে। বন্ধুকে টাকা ধার দিতে দিতে সুরেশের নামে পোস্টাফিসে জমা টাকাগুলি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

'এবার বাড়ি গিয়ে তোর টাকা এনে দেব।'

ছেলেকে একেবারে এতগুলি টাকা দেওয়া মাখনের বাবার পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না, তবু তিন-তিনটা পরীক্ষা পাস করা ছেলে চাকরির চেষ্টা করার আগে একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দেখিতে চায়, সুযোগ না পাইলে ভয়ানক কিছু করিয়া বসিবার মতো প্রচণ্ড আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে চায়, টাকাটা তাকে না দিলেই বা চলে কেমন করিয়া?

বন্ধুকে দেওয়ার জন্য টাকাগুলি সঙ্গে নিয়া মাখন কলিকাতায় পৌঁছিল শনিবার সকাল দশটার সময়। সমস্ত পথ সে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এতদিন অল্প টাকা নিয়া খেলার জন্য সে হারিয়াছে। বেশি টাকা নিয়া খেলিলে জিতিবার সম্ভাবনা বেশি। বন্ধুর সমস্ত ঋণ একেবারে শোধ করার কি দরকার আছে? আজ যদি কিছু বেশি টাকা টাইগার জাম্পের উপর ধরে—টাইগার জাম্প আজ নিশ্চয় জিতিবে,—ঘোড়াটা ফেবারিট হইলেও তিনগুণ নিশ্চয় পাওয়া যাইবে! সুরেশকে দিয়া দেওয়ার আগে টাকাটা খাটাইয়া কিছু লাভ করিয়া নিলে দোষ কি আছে? সব টাকা নয়—অর্ধেক। হারুক বা জিতুক অর্ধেক টাকা সে স্পর্শ করিবে না, ঋণ পরিশোধের জন্য থাকিবে।

সন্ধ্যার আগে শেষ ঘোড়াদৌড়ের শেষে খালি পকেটে মাখন এনক্লোজারের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

পরদিন অনেক বেলায় সে ম্লানমুখে সুরেশদের বাড়ি গেল। দরজা খুলিয়া দিল নলিনী। আগে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিত, আজ কিন্তু মুখখানা তার বড়ই গম্ভীর দেখাইতে লাগিল।

'ছাতে চুল শুকোচ্ছিলাম, আপনাকে আসতে দেখে নেমে এলাম।'

নলিনীর হাসির অভাবটা পূরণ করার জন্য মাখন নিজেই একটু হাসিবার চেষ্টা কবিয়া বলিল, 'বেশ করেছ। সুরেশ কই?'

'দাদা আসছে। টাকা এনেছেন দাদার?'

মাখন থতমত খাইয়া বলিল, 'টাকা? ও, টাকা। তুমি জানলে কী করে টাকার কথা?'

'আমি কেন, সবাই জানে। বাবা রেগে আগুন হয়ে আছে। আনেন নি তো? তা আনবেন কেন!'—গম্ভীর মুখ অন্ধকার করিয়া নলিনী ভিতরে চলিয়া গেল।

সুরেশ আসিলে টাকার কথাটা উঠিল বড়ই খাপছাড়া ভাবে। মাখন বলিল, 'তোর টাকাটা দিতে পারব না সুরেশ। এক কাজ কর, ওই টাকাটা আমায় পণ দে, আমি নলিনীকে বিয়ে করব।'

কথা ছিল কথাটা গোপন থাকিবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা থাকিল না! বিনা পণে বন্ধুর বোনকে বিবাহ করার জন্য মনে মনে বাড়ির সকলেই একটু চটিয়াছিল—নলিনী তেমন রূপসীও নয়। কথাটার সমালোচনা হইত নানাভাবে—একটু কটুভাবেই। নলিনী যে কী করিয়া মাখনকে ভুলাইল ভাবিয়া সকলে অবাক হইয়া যাইত। আজকালকার মেয়ে, ফন্দিবাজ বাপের মেয়ে, ওদের পক্ষে সবই হয়তো সম্ভব। আচ্ছা, পয়সাকড়ি যখন দিল না, গয়না কিছু বেশি দেওয়া কি উচিত ছিল না নলিনীর বাপের?

শুনিতে শুনিতে একদিন রাগে নলিনী দিশেহারা হইয়া গেল। বড় গুরুজন কেউ মন্তব্য করিলে রাগে দিশেহারা হইয়াও হয়তো সে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু সেদিন মন্তব্যটা করিয়াছিল ননদ বিধু। তার সঙ্গে ইতিমধ্যে কতকটা ভাব হইয়া যাওয়ায় সে বলিয়া ফেলিল, 'পণ দেওয়া হয় নি মানে? পণ তো ওঁকে আগেই দেওয়া হয়েছে।'

তারপর সব জানাজানি হইয়া গেল। প্রথমটা কেউ বিশ্বাস করিতেই চায় না, কিন্তু সত্য কথায় বিশ্বাস না করিয়া উপায় কী! মাখনকে জিজ্ঞাসা কবায় সেও স্বীকাব কবিয়া ফেলিল।

রাত্রে মাখন বলিল, 'টাকার ব্যাপারটা বলতে না তোমায় বারণ করেছিলাম? বললে কেন?'

নলিনী বলিল, 'ব্যবসার নাম করে দাদাকে দেবার জন্য টাকা নিয়ে গিয়েছিলে আমায় বল নি কেন? আমার রাগ হয় না বুঝি?'

'হুঁ, রাগ হলে তুমি বুঝি দশজনের কাছে আমার বদনাম করে শোধ তুলবে? তুমি তো কম শয়তান নও!'

বিশ্রী একটা কলহ হইয়া গেল, কথা বন্ধ রহিল তিন দিন। আবার কথা আরম্ভ হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা অতগুলো টাকা কী করলে? দাদার কাছ থেকে নিয়েছ, বাবার কাছ থেকে নিয়েছ, টাকা তো কম নয়!'

প্রথমে কৈফিয়তটা ভালো করিয়া নলিনীর মাথায় ঢুকিল না। চুপি চুপি কার সঙ্গে মাখন ব্যবসা করিতেছিল, সব টাকা লোকসান গিয়াছে। তারপর সে টের পাইল মাখন মিথ্যা বলিতেছে। মনটা তার খারাপ হইয়া গেল। স্বামীর মন তো তার ছোট নয়, টাকা-পয়সার ব্যাপারে সে বরং অতিমাত্রায় উদার। টাকা-পয়সার ব্যাপারেই তার কেন মিথ্যা বলার প্রয়োজন হইল?

বাপ আর শ্বশুরের চেষ্টায় মাখনের একটা চাকরি জুটিয়া গেল ভালোই। বছর পাঁচেকের মধ্যে বেতন বাড়িয়া দাঁড়াইয়া গেল প্রায় তিনশ টাকায়। এতদিনে নলিনীর একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে এবং কতকটা স্বামীর চাকরির জন্যই অতি দ্রুত প্রমোশন পাইয়া পাইয়া স্বামীর সংসারে প্রায় গিন্নির পদ পাইয়াছে। সংসারে বিশেষ অশান্তি নাই, রোগশোক নাই, অনটন নাই—নলিনীর মনেও জোরালো দুঃখ কিছু নাই। কেবল সেই যে তিন দিন কথা বন্ধ থাকার পর মাখনের মিথ্যা বলার জন্য মনটা তার খারাপ হইয়া গিয়াছিল, মৃদু আশঙ্কার মতো একটা স্থায়ী অস্বস্তির মধ্যে সেই মন খারাপ হওয়ারই কেমন যেন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া জের চলিতেছে। কোনো পাপ করে নাই নলিনী তবু ভয়ে রূপান্তরিত পুরানো পাপের মতোই কী যেন একটা দুর্বোধ্য ভার সব সময়েই তার মনকে বহন করিতে হইতেছে।

মাখনের জুয়ার নেশা কাটিয়া যায় নাই, ভালবাসার নেশার মতোই প্রথম বয়সের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা আর অসহ্য অধীরতার যুগটা পার হইয়া ধীরস্থির হিসাব করা নেশায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। পাকা প্রেমিকের অভ্যস্ত প্রেম করার মতো তার জুয়া খেলাটাও দাঁড়াইয়া গিয়াছে অনেকটা নিয়মিত। টাকা অবশ্য জমে না, অনেক সাধ অবশ্য মেটে না, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনের সময় টাকার জন্য সাময়িকভাবে রীতিমতো বিপদে পড়িতে হয়, তবু মোটামুটি সংসার চলিয়া যায়। মাখনের শ-খানেক টাকা বেতন হইলে যেমন চলিত তেমনিভাবে চলিয়া যায়। মাখনের বেতন শ-খানেক টাকা ধরিয়া নিলে অবশ্য অনেক হাঙ্গামাই মিটিয়া যাইত, এর চেয়ে অনেক কম বেতনেও জগতে অনেক লোক চাকরি করে, কিন্তু মুশকিল এই যে তিনশ টাকা যে বেতন পায় তার বেতনের দুশ টাকা কোনো কাজে না আসিলেও বেতন তার শ-খানেক টাকার বেশি নয় এটা ধরিয়া নেওয়া তার নিজের পক্ষেও অসম্ভব, আত্মীয় বন্ধুর পক্ষেও অসম্ভব।

আত্মীয় বন্ধুর রাগ অভিমান বিরক্তি আর উপদেশ উপরোধ সমালোচনা এখনো চলিতে থাকিলেও নলিনী একরকম আর কিছুই বলে না। সে জানে এ রোগের ওষুধ নাই। এ কথাটাও সে জানে যে প্রয়োজন হইলে জুয়ার খরচটা মাখন কমাইয়া দিবে, কিন্তু সত্য সত্যই প্রয়োজন হওয়া চাই। পেট ভরানোর মতো, গা ঢাকা দেওয়ার মতো, রোগের সময় ডাক্তার টাকা ওষুধ কেনার মতো খাঁটি প্রয়োজন। এ রকম আসল প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ববোধের কাছেই কেবল তার জুয়ার নেশা হার মানে।

কত কৃত্রিম প্রয়োজনই নলিনী দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছে! কতবার কতভাবে স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, সংসারে এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই। মাখন শুধু বলিয়াছে, আচ্ছা আচ্ছা, হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় কিছুই হয় নাই।

বাড়ি বদলানোর জন্য নলিনী অনেকবার ঝগড়া করিয়াছে। বলিয়াছে, 'এ বাড়িতে আমি থাকব না, একটা ভালো বাড়িতে চলো!' বলিয়া রাগ করিয়া বাপের বাড়িতে চলিয়াছে। তখন অবশ্য মাখন বেশি ভাড়ার একটা ভালো বাড়িতে উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার ফলটা নলিনীর পক্ষেই মারাত্মক। কারণ,

জুয়ার খরচ মাখন এক পয়সা কমায় নাই, টান পড়িয়াছে সংসারের খরচেই। আবার উঠিয়া যাইতে হইয়াছে কম ভাড়ার বাড়িতে।

নলিনী বলিয়াছে, 'আমি দুগাছা করে নতুন চুড়ি গড়বে।'

মাখন বলিয়াছে, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তারপর দুবছরের মধ্যে সস্তা একজোড়া দুলও নলিনীর গড়ানো হয় নাই। কারণ, চুড়িও নলিনীর আছে, দুলও আছে।

কিন্তু নলিনী যেদিন বলিয়াছে, 'একটা লাইফ ইনসিওর পর্যন্ত করবে না তুমি?' তার এক মাসের মধ্যে মাখন দশ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স করিয়াছে এবং এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়া আসিলেও বেশি ভাড়ার বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার ফলটা নলিনীকে ভোগ করিতে হয় নাই।

ধরিতে গেলে টাকা-পয়সার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়াই হইয়া গিয়াছে। তবু সেই রহস্যময় মৃদু আতঙ্কের পীড়ন একটু শিথিল হয় নাই। কী যেন একটা বিপদ ঘটিবে—অল্পদিনের মধ্যেই ঘটিবে। কিন্তু কী ঘটিবে? মাখন একদিন জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়া সর্বনাশ করিবে? কিন্তু মাখনের সর্বস্ব তো তার তিনশ টাকার চাকরি, উপার্জনের টাকা জুয়ার নেশায় নষ্ট করা সম্বন্ধে সে যতই অবিবেচক হোক, চাকরি নষ্ট করার মানুষ সে নয়। সে বিশ্বাস নলিনীর আছে। তবে? আরো অনেক বেশি আরামে ও সুখে বাঁচিয়া থাকার সুযোগ পাইয়াও স্বামীর দোষে কোনোরকমে খাইয়া পরিয়া অতি গরিবের মতো বাঁচিয়া থাকিতে হওয়ার যে জ্বালাভরা অভিযোগ, এটা কি তারই প্রতিক্রিয়া?

কিন্তু কোথায় জ্বালাভরা অভিযোগ? রাজপ্রাসাদে রাজরানীর মতো সুখে ও আরামে থাকিবার ব্যবস্থা মাখন করিয়া দিক এটা সে চায়, মাখনের ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে চায়, কিন্তু না-পাওয়ার জন্য বিশেষ ক্ষোভ তো তার নাই।

নলিনী তাই কিছু বলে না। সব বিষয়েই সে একরকম হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, মাখনের সহজ সাধারণ ভালবাসার মধ্যে একটু রোমাঞ্চ আনিবার চেষ্টায় পর্যন্ত। চেনা মানুষ স্বামী হইয়াছে, তার কাছে কি অচেনা মানুষের নাটকীয় ভালবাসা আশা করা যায়? এতদিনে ছেলেমানুষ ছিল তাই চেষ্টা করিয়াছে, বিবাহের আগে বুদ্ধি কম ছিল তাই তখন ভাবিয়াছে, বিবাহ হইলে হয়তো মাখন বদলাইয়া যাইবে। কিন্তু জুয়ার নেশায় উত্তেজনা আর অবসাদের মধ্যে যার মনের জোয়ার ভাঁটা, বৌয়ের কথা কি তার মনে পড়, বৌয়ের জন্য একবার একটু পাগল-হওয়ার সময় কি তার থাকে!

ভাবিতে ভাবিতে নলিনীর সাধারণ ছোট ছোট চোখ দুটিতে অস্পষ্ট স্বপ্নের স্পষ্ট ছায়া এমন অদ্ভুত ভাবালুতার আবরণে ঘনাইয়া আসে যে জগতের সব ডাগর ডাগর চোখগুলিতেও তা সম্ভব মনে হয় না। হয়তো তখন দুপুরবেলায় আঁচল পাতিয়া মেঝেতে গড়ানোর অবসরটা পাওয়া গিয়াছে। ছেলেমেয়ের একজন খেলায় মত্ত, একজন ঘুমে অচেতন। চোখ বুজিলে কষ্ট বাড়িয়া যায়, নলিনী তাই চোখ মেলিয়া স্বপ্ন দেখে- –তার কুমারী জীবনের স্বপ্ন . আত্মহারা আবেগের সঙ্গে তাকে ভালবাসিলে মাখন কী করিত। সম্ভব অসম্ভব কত কথাই নলিনী ভাবে।

তারপর অল্প অল্প অস্বস্তির মধ্যে মৃদু ভয়ের পীড়নে স্বপ্ন শেষ হইয়া চোখ দুটি তার বড় সাধারণ দেখাইতে থাকে। দুটি সন্তান যার তার কেন আর এসব স্বপ্ন দেখা. আর কি এ স্বপ্ন সফল হয়! যদি-বা হয়, কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে আংশিকভাবে সফল হয়, দুদিন পরে সেটুকু সম্ভাবনাও আর থাকিবে না। আবার ছেলে বা মেয়ে কোলে আসিবে নলিনীর, তারপর সব শেষ। উদাসীন মাখনের মধ্যে প্রেমের উদ্দীপনা জাগানোর কথা ভাবিতে তার নিজেরই কি লজ্জা করিবে না? কী দিয়াই বা সে উদ্দীপনা জাগাইবে।

এখনো কেউ জানে না! দুদিন পরেই জানিবে। মাখন হয়তো খুশি হইয়া আদর যত্ন বাড়াইয়া দিবে, বলিবে : 'একটু দুধ খেয়ো। এ সময় দুধটুধ খেতে হয়। কিন্তু তারপর?' আরো শ্রান্ত হইয়া পড়িবে মাখন. আরো ঝিমাইয়া পড়িবে। মাথা কপাল খুঁড়িয়া মরিয়া গেলেও আর নলিনী তাকে জাগাইয়া তুলিতে পারিবে না। নলিনী ভ্রূ কুঁচকাইয়া যায়, সঙ্কুচিত চোখ দুটিতে মরণের চেয়ে গভীর আতঙ্কের ছাপ পড়ে. শীতের দুপুরে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যায়।

কোনো উপায় কি নাই? যে-কোনো একটা উপায়? ব্যর্থ হইলে যদি সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনাও

থাকে, তবু সার্থকতার যেটুকু সম্ভাবনা থাকিবে তারই লোভে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। কিন্তু সেরকম উপায়ই বা কোথায় যাতে সমস্ত শেষ হইয়া যায়, নয় মাখনের ভালবাসা মেলে?

ঠিক সেই সময় দুরু দুরু বুকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে মাঠে রেলিং ঘেঁষিয়া এগারটি ঘোড়ার মধ্যে একটির অগ্রগতি লক্ষ করিতে করিতে ভাবিতেছিল, এবারো না জিতলে বিপদে পড়িবে বটে, কিন্তু যদি জেতে—

সন্ধ্যার পর ঘোড়দৌড়ের মাঠ হইতে বন্ধু অবনীর সঙ্গে শ্রান্ত ক্লান্ত মাখন ফিরিয়া আসে। সুরেশের মতো অবনী এখন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। মানুষটা সে একটু বেঁটে, রোগা, লাজুক আর ভীরু। কথার জবাবে পারিলে কথা বলার বদলে মৃদু একটু হাসিয়াই কাজ সারে। কখনো কেউ তাকে উত্তেজিত হইতে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। ঘোড়া ছুটিবার সময় মাখন যখন আগ্রহ উত্তেজনায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়াইতে থাকে, অবনী নির্বিকার ভাবে বিড়ি টানিয়া যায়। জিতিলে মাখন 'হুররে' বলিয়া প্রচণ্ড একটা চিৎকার করিয়া লাফাইয়া ওঠে, হারিলে ঝিমাইয়া পড়ে। অবনী জিতিলেও মৃদু একটু হাসে, হারিলেও হাসে।

নলিনীর সাজপোশাক দেখিয়া দুজনেই একটু অবাক হইয়া যায়। ফ্যাশন করিয়া শাড়ি পরিয়াছে, রঙিন ব্লাউজ গায়ে দিয়াছে, শুধু ঘষামাজায় খুশি না হইয়া গালে বোধ হয় একটু রঙের আর চোখে একটু কাজলের ছোঁ[illegible] দিয়েছে।

মাখন বলে, 'কোথায় যাবে?'

নলিনী একগাল হাসিয়া বলে, 'কোথায় আবার যাব?'

'সেজেছ যে?'

'সেজেছি? কী জ্বালা, কোথাও না গেলে বাড়িতে বুঝি ভূত সেজে থাকতে হবে?' তারপর অবনীর কাছে গিয়া বলে, 'সইকে বুঝি তালা বন্ধ করে রাখেন, আসে না কেন?'

অবনী নীরবে মৃদু একটু হাসে।

'চলুন সইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।'

বলিয়া স্বামীর যে-বন্ধুর সঙ্গে তিন হাত তফাতে দাঁড়াইয়া নলিনী সংক্ষেপে কথা বলিত, রীতিমতো তার হাত ধরিয়া তাকে টানিয়া তোলে এবং মাখনের দিকে একনজর না চাহিয়াই বাহির হইয়া যায়।

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও নলিনী ভিতরের উত্তেজনা গোপন করিতে পারে না। অবনীর বৌ বলে, 'কী হয়েছে সই?'

'কিছু না।'

কোমরে আঁচল জড়াইয়া অবনীর বৌ রান্না করিতেছিল। নলিনীর চেয়ে সে বয়সে বড়, কিন্তু বড়ই তাকে ছেলেমানুষ দেখায়। মানুষটা সে সব সময়েই হাসিখুশি, কাজ করিতে করিতে গুনগুন করিয়া এখনো গান করে। তাকে দেখিলেই নলিনীর বড় হিংসা হয়, মনটা কেমন করিতে থাকে। ওর স্বামীও তো জুয়া খেলে, তার চেয়ে অনেক কষ্টেই ওকে সংসার চালাইতে হয়, দুটি ছেলের মধ্যে একটি ওর মরিয়া গিয়াছে, তবু সব সময় এমন ভাব দেখায় কেন, দুদিন আগে বিবাহ হইয়া আসিয়া স্বামীর আদরে মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না!

অবনীর বৌ বলে, 'এমন সেজেগুজে হঠাৎ?

নলিনী বলে, 'এমনি এলাম তোমায় দেখতে।'

'কী ভাগ্যি আমার!' ভাতের হাঁড়ি উনানে চাপাইয়া হাসিতে হাসিতে অবনীর বৌ কাছে আসিয়া বসে।

কথা আজ জমে না। রাত্রির সঙ্গে নলিনীর ভয় বাড়ে, ক্রমেই বেশি অন্যমনস্ক হইয়া যায়, তবু উঠিবার নাম করে না। যত রাত হইবে মাখন তত বেশি রাগ করিবে—তত বেশি নাড়া খাইবে মাখনের মন। একটুও কি পরিবর্তন আসিবে না? রাগের মাথায় পড়িয়া যাইবে তখন?

রান্না শেষ হয়, অবনীর খাওয়া হইয়া যায়, তখনো নলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবনীর বৌ অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে। হাসিখুশি ভাব মিলাইয়া গিয়া তারও মুখে যেন ভয়ের ছাপ পড়ে।

'আমায় কিছু বলবে সই?'

নলিনী মাথা নাড়িয়া বলে, 'কী বলব? না, না, কিছু বলব না।'

'তোমায় নিতে আসছে না যে।'

'কে জানে। ওর কথা বাদ দাও।'

খানিক পরে অবনীর বৌ বলে, 'ওই তবে তোমায় দিয়ে আসুক আর রাত করে কাজ নেই। পুঁইচচ্চড়ি রেঁধেছি, মুখে দিয়ে যাবে সই?'

হোক আরেকটু রাত, মাখনের রাগ আরেকটু বাড়িবে। আরম্ভ যখন করিয়াছে, শেষ না দেখিয়া ছাড়িবে না। মরিয়া হইয়া নলিনী সখীর রান্না পুঁইচচ্চড়ি মুখে দিবার জন্য সখীর সঙ্গে একথালায় খাইতে বসে। দুজনে বেশ পেট ভরিয়া খায়, সকালের জন্য পান্তা না রাখাতেই ভাতে কম পড়ে না, আর ডাল ভাজা মাছ তরকারি যতটুকু থাক, ভাগাভাগি করিয়া খাওয়ার সময় তো মেয়েদের কখনো কম পড়েই না।

খাওয়ার পরে পান মুখে দিয়া অবনীর বৌ স্বামীকে ডাকিয়া বলে, 'ওগো শুনছ, একটু বেরিয়ে এসো ঘর থেকে। সইকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসো। বাবা, এগারটা বাজে!'

নলিনীর বুক কাঁপিয়া ওঠে। যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছে, এতরাত্রে আবার অবনীর সঙ্গে একা ফিরিতে দেখিলে কী রাগটাই না জানি মাখন করিবে! করুক রাগ, রাগাইবার জন্যই তো সাজিয়া গুজিয়া এভাবে সে বাহির হইয়াছে, এখন সেজন্য ভয় পাইলে চলিবে কেন? নিজেকে নলিনী অনেক বুঝায় কিন্তু বুকের টিপ্‌টিপানি কিছুতেই কমে না।

দু-বন্ধুর বাড়ি বেশি দূরে নয়। রিকশায় মিনিট দশেক লাগে। অবনীর বাড়ির কাছেই গলির মোড়ে রিকশা পাওয়া যায়। অবনী দুটি রিকশা ভাড়া করিতেছিল, নলিনী বারণ করিল, 'মিছিমিছি কেন বেশি পয়সা দেবেন? একটাতেই হবে।'

'না, না, দুটোই নিই—'

নলিনীর গলার আওয়াজ বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, এসব খাপছাড়া উত্তেজনা কী তার সহ্য হয়! তবু মরিয়া হইয়া সে বলিল, 'আসুন না, একটাতে বসে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।'

গল্প কিছুই হয় না, সমস্ত পথ দুজনেই যতটা সম্ভব পাশের দিকে হেলিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। বাড়ির দরজার সামনে রিকশা থামামাত্র নলিনী তড়াক করিয়া নামিয়া যায়। অবনীকে বলে, 'ওঁকে ডেকে দিয়ে আপনি এই রিকশাটা নিয়ে ফিরে যান।'

দরজা খুলিয়া দিতে আসিয়া মাখন দেখিতে পাইবে এতরাতে বৌ তার এক রিকশায় অবনীর সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া বাড়ি ফিরিয়াছে, নলিনীর এই আশা বা আশঙ্কা পূর্ণ হইল না। দরজা খুলিয়া দিল চাকর।

ঘরে গিয়া নলিনী দেখে কী, মেয়েটাকে কোলে নিয়া আনাড়ির মতো থাপড়াইয়া থাপড়াইয়া মাখন তাকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করিতেছে। বৌয়ের সাড়া পাইয়া মাখন ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, 'কী আশ্চর্য বিবেচনা তোমার! দুজনকে ফেলে রেখে এত রাত পর্যন্ত বাইরে কাটিয়ে এলে? খুকিকে তো অন্তত নিয়ে যেতে পারতে সঙ্গে।'

মেয়েকে নামাইয়া দিয়া মাখন নিজের বিছানায় উঠিয়া শ্রান্তভাবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। খুব যে রাগ করিয়াছে তার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

'তুমি কাউকে পাঠালে না কেন? অবনীবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে—'

'কাকে পাঠাব? শম্ভু এতক্ষণ খুকিকে রাখছিল।'

দুমিনিট আগে দরজা খুলতে যাওয়ার সময় শম্ভু তবে মেয়েকে মাখনের কোলে দিয়া গিয়াছিল, সন্ধ্যা হইতে মাখনকে মেয়ে রাখিতে হয় নাই! নলিনী জিজ্ঞাসা করিল না, মাখন নিজে কেন তাকে আনিতে যায় নাই। আর জিজ্ঞাসা করিয়া কী হইবে? নিজের চোখে বৌ আর বন্ধুকে জড়াজড়ি করিতে

দেখিলেও বোধ হয় তার রাগ হইবে না। এমন বদমেজাজি মানুষ, এক গ্লাস জল দিতে দেরি হওয়ায় আজ সকালেই শম্ভুকে মারিতে উঠিয়াছিল, শুধু বৌকে তার এত অনুগ্রহ কেন? একদিন কি সে রাগের মাথায় বৌয়ের গালে একটা চড় বসাইয়া দিতে পারে না, যাতে খানিক পরে ভালবাসার জন্য না হোক অন্তত অনুতাপের জন্যও অনেকগুলি চুমু দিয়া চড়ের দাগটা মুছিবার চেষ্টা করা চলে?

বাহিরটা একবার তদারক করিয়া আসিয়া নলিনী ঘুমন্ত মেয়ের পাশে শুইয়া পড়ে। মাখন বলে, 'খেলে না?'

নলিনী বলে, 'ওদের বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়া যায়, তারপর মাখন যেন ভয়ে ভয়েই আস্তে আস্তে বলে, 'আজ অনেকগুলি টাকা জিতেছি।'

নলিনী সাড়া দেয় না।

'প্রায় সাতশ।'

নলিনী তবু সাড়া দেয় না।

'তোমায় একটা গয়না গড়িয়ে দেব—যা চাও।'

নলিনী চুপ করিয়া থাকে। নিঃশব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবে 'কে শুনতে চায় তুমি হেরেছ কি জিতেছ, কে চায় তোমার গয়না, একবার কাছে ডাকতে পার না আমায়?'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মাখন বলে, 'রাগ করেছ? না না, ঘুমোও আর জ্বালাতন করব না।'

বুদ্ধদেব বসু

বোন

কেমন করে নৈনিতাল যাবার পথে এক ইস্টেশনে এক ব্যাটা গোরা ওঁর কামরার জানলায় উঁকি মেরেছিলো—তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠছিলেন আরকি! এমন সময় কমলালেবুর খোশা ছাড়াতে-ছাড়াতে 'মিস্টরে'র আবির্ভাব ;—রাঙামুখো কুত্তাটাকে দেখেই তাঁরও মুখ রাঙা হয়ে উঠলো—করলেন কী, এক টুকরো লেবুর খোশা নিয়ে পিছন থেকে দিলেন ব্যাটার চোখে ছিটিয়ে। চোখ কচলাতে-কচলাতে সাহেবমশাই 'আ'ম ভে-এ-রি সরি' বলে আর কুল পায় না। তারপর কেমন করে দুজনায় খুব ভাব হয়ে গেল, সাহেবটা সে কামরাতে উঠল, সারাক্ষণ দু-জনে কী গল্প আর হাসাহাসি! সাহেব নামবার সময় 'মিস্টরে'র সৌজন্য ও ইংরিজি উচ্চারণের কী বলে তারিফ করছিলো—ছোড়দি এইসব গল্প করছিলেন, বা অমলা করছিলো। আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসে শুনছিলেন মা আর পিসিমা, শুনছিলো ডলু, খুকু, পারুল, কমল, আর—লিলি।

হ্যাঁ, লিলিও শুনছিলো বইকি। যদিও এ-গল্প এর আগে উনিশবার শুনেছে, তবু। কিন্তু কানে শুনলে কি আর চোখে দেখা যায় না? তাই তো ঘড়ির কাঁটা ন'টা বাজো-বাজো হতেই খুকু ভ্যাঁ করে চীৎকার দিয়ে উঠলো।

বাধা পড়লো গল্পয়—নিশ্বাস নেবার জন্যেও ছোড়দির একটু থামবার দরকার ছিলো।

—কী? কী হলো?

—ডলুটা আমায় চিমটি কেটেছে মা—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

কে বা কানে তোলে ডলুর প্রতিবাদ! মা ডলুকে ধমকালেন—দোষ করে আবার মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে! চুপ করে থাক, নয়তো খাবি থাপ্পড়।

ছোড়দি কাঁধ-ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ইশ্‌শ্‌—ছেলেপুলের কান্না! থাম না রে, খুকু।

লিলি কিন্তু আদর্শ দিদি। চট করে খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে বললে চল তোকে খাইয়ে আনি। ডিমভাজা খাবিনে—ডিমভাজা? ডলু আজ ডিম পাবে না—ওর ভাগেরটা তোর।

খুকুকে নাচাতে-নাচাতে লিলি নেমে গেলো। অমলা শুরু করলে—বুঝলে মা, তারপর—

রান্না না-হয়ে থাকলে লিলি আর কী করবে?—যত দোষ ঐ রামের মা-র! জানে, সন্ধে হলেই ছেলেপিলেদের ঘুম পায়, তবু একদিনও যদি তার রান্না হয়। নাঃ—!

নিতান্তই চটে গিয়ে খুকুকে নিয়ে সে বাইরের ঘরে গেলো। সাতটা-পাঁচ। জানলাগুলি খুলে পাখাটা খুলে দিয়ে সে টেবিলের ধারে বসে পড়লো। দরজাটা বন্ধই থাকলো।

খবরের কাগজ।...খুকুর কান্না ততক্ষণে থেমে গিয়েছিলো—সে উপরে মা-র কাছে ফিরে যাবার জন্যে দিদির কোল থেকে পালাই পালাই করছিলো। লিলি আদর্শ দিদি কিনা—কিছুতেই ওকে যেতে দেবে না—গেলেই পড়বে ঘুমিয়ে, তারপর খাওয়া নিয়ে ভজকট! কিন্তু অবোধ খুকু কি আর সে-কথা বোঝে!

সাতটা-বারো।...অগত্যা সেই কী-ছাই কাগজটাকেই খুলতে হলো -খুকুকে পোষ মানাবার জন্য। ছবি দেখতে পেয়ে খুকু মহা খুশি! 'ওটা কী, লিলি-দি? এরোপ্লেন? এই দাড়িওলা লোকটা হাসছে কেন? বাঃ, কী সুন্দর এই কুকুরটা!'...সাওয়া-সাত। কোনো-কোনো লোকের উপর লিলির এমন রাগ হয়—বিশেষ করে তাদের উপর, কথা দিয়ে যারা কথা রাখে না। অথচ সেদিন হাস্নাহানাদের বাড়ি থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিলো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না—কী বলেই বা হঠাৎ চলে আসা যায়?—এ-সব কথা কি আর কেউ বোঝে?—সেই নিয়ে কত—

দরজায় খুট করে একটু শব্দ হলো। হঠাৎ খুকুর কৌতূহল-নিবারণে আদর্শ-দিদির বিপুল আগ্রহ দেখা গেলো।—হ্যাঁ, এইটে হচ্ছে এরোপ্লেন। এই যে পাখার মতো দুটো দেখছিস, এ দুটো চালিয়ে আকাশে ওড়ে—ঘণ্টায় একশো মাইল—

—মোটে একশো! আমি হলে তো ছাব্বিশ হাজার মাইল (আবার খুট!) উড়ে যেতাম্‌ ভো করে।

—দূর বোকা! লিলি উঠে দরজাটার খিল খুলে দিয়ে নীরবে আবার এসে বসলো।—আর ভিতরে ছোট্ট ঘরের মতো আছে—সেখানে বসবার জায়গা—

এইবার ঘা পড়লো জোরে—দরজাও খুলে গেলো।

—চারদিক অবশ্যি কাচ দিয়ে ঢাকা—নইলে হাওয়ায়—

—দ্যাখো লিলি-দি, পিরটি-দা এসেছে—পিরটি-দা!

পিরটি বা প্রিটি—নামটা আসলে প্রীতীশ—মৃদুস্বরে জিগেস করলে, দরজাটা খোলাই ছিল নাকি?

খুকু অবাধে বলে যেতে লাগলো, না, পিরটি-দা—লিলি-দি এইমাত্র উঠে-

—হ্যাঁহ্‌—এইমাত্র উঠে! তুই দেখেছিলি! চুপ থাক, ফাজিল মেয়ে।

খুকু ঘাবড়াবার পাত্র নয়। তবু আস্তে-আস্তে বলতে আরম্ভ করলো, হ্যাঁ, সত্যি—

প্রিটি খুকুর চেয়েও আস্তে বললে, কী হয়েছে তোমার?

—হবে আবার কী? সেই কখন থেকে—। যাও, এখন আর কী হয়েছে জিগেস করতে হবে না!

ও, এই! প্রিটি এতক্ষণে সহজভাবে নিশ্বাস টানতে পারলো। এতক্ষণ তার ভয় হচ্ছিলো, বুঝি তার সেই চিঠিটা—যাক।

—আমি বুঝি ইচ্ছে করে দেরি করেছি? পথে আসতে-আসতে বাস্‌টার—

—অ্যাক্সিডেণ্ট! লিলির গলা কেঁপে গেলো।

—বাসটার টায়ার গেলো ফেটে। সারাতে পুরো পনেরো মিনিট। যা-তা!

—কলকাতার শহরে ওই একখানা বাস্‌ই চলছে নাকি আজকাল?

প্রিটি চুপ করে রইলো।

—না-হয় ফেরার সময় আমার কাছ থেকেই দু-আনা নিতে-ধার। কাল আমি ঠিক ফেরৎ নিতাম—পয়সার প্রতি আমার বেজায় লোভ কিনা!

প্রিটি তবু নিরুত্তর।

—না-হয় হেঁটেই ফিরতে একদিন--

—আজ তা-ই যাবো।

—-কেন, শুনি! তারপর গলার আওয়াজে স্বাভাবিকতা আনবার চেষ্টা করে বললে, আমার বাক্সয় প্রায় দশ টাকা জমেছে।...তুমি নেবে না? যদি এমনি করে তোমার হাতে গুঁজে দিই—তবু নেবে না?

এর পর এরা পরস্পরের হাত নিয়ে যে কাণ্ডটা করতে লাগলো, ভাগ্যিশ খুকু ছাড়া আর-কেউ তা দ্যাখেনি। যে দেখতো সে-ই বলতো, কী ছেলেমানুষি!

এমন-কী দোষই বা ওর—একদিন না-হয় পনেরো মিনিট দেরিই করে ফেলেছে—তা পনেরোটাই তো মিনিট! আর, ইচ্ছে করে তো আর করেনি। বাস্-এর টায়ার ফাটলে কার দোষ? পকেটে আর পয়সা না-থাকলে দোষ কার? তাছাড়া, দোষ করে ফেলেছে বলে বেচারার করুণ মুখ দেখলে দয়াও হয়।— লিলির কেন—কারই বা না হয়? অনেকের হয়তো নাও হতে পারে, কিন্তু লিলি তাদের মতো নয়, লিলি ক্ষমাশীল, লিলি মহানুভব. অল্পতেই ওর করুণা হয়, বড়ো সহজেই ক্ষমা করে ফ্যালে। তাই

আচ্ছা, এইবার তোমাকে ক্ষমা করলুম। এখন বসতে পারো- হঠাৎ হাত সরিয়ে নিয়ে লিলি বললে। তারপর, খুকুকে কোলের কাছে টেনে আদর করতে-করতে দেখলে, আমার মন কেমন উদার! একটু ঝগড়াও করলুম না।

—ভারি তো! আমি বুঝি একবার ক্ষমা করিনি--এর চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ?

— ও মা, কবে আবার— ! লিলি অবাক।

মেয়েরা সুবিধেমতো নানা কথাই ভুলে যায় বিশেষ করে যে-সব কথা অন্যের মুখে শুনতে তাদের ভালো লাগে। প্রিটি তা জানে, তাই সে বিস্তৃত বর্ণনা শুরু করলে.

— সেই যে একবার একমাস ধরে কালাজ্বরে ভুগলাম- একবার দেখতে যাওয়া হয়েছিলো? হ্যাঁ, ছোটো ভাইকে রোজ পাঠানো হতো বটে—কখনো চিঠি দিয়ে, কখনো এমনি কিছু না-ও তো বাঁচতে পারতাম। আমার যে-মেশোমশাই বছরে শুধু একবার—বিজয়া দশমীর দিনে -- আমাদের বাড়ি আসেন, তিনিও তিন দিন এসেছিলেন--এমনকি পাশের বাড়ির গিন্নি একবার খোঁজ নিইয়েছিলেন.--রোজই ভাবতাম, মানুষ ম'রে গেলে তা আর চোখে দেখতে পায় না।

—হ্যাঁ, অমন দূর থেকে দোষ দিতে সবাই পারে। যারা জানে না, তাদের কত অসুবিধে, তারাই কিনা--

—চুপ! চুপ! এখন তোমার এ-পার্ট নয়। শোনো, সবই আসছে। প্রথম ইনজেকশনের পর জ্বরটা যেদিন একটু কমলো প্রতিজ্ঞা করলাম—আর না। মনে পড়লো শোপেনহাওয়ার, মনে পড়লো এভল্যুশনে মেয়েরা পুরুষের এক ধাপ পেছিয়ে আছে। তৃতীয় ইনজেকশনের পর জ্বর গেলো ছেড়ে—চাঙ্গা হয়ে উঠলো পৌরুষ। ভাবলাম, ভালো হয়ে উঠেই একদিন আচ্ছা বকে আসবো। সাতদিন তালিম দিলাম—ভাত খাওয়া অবধি। ভাত খেলাম;- কত যে প্রার্থনা করেছি- -কবে গিয়ে মনের ঝাল ঝেড়ে আসতে পারবো!

—সেই যেদিন তুমি এলে—মাথার রুমাল বাঁধা —কী কাহিল, কালো, শুকনো-- দেখে এমন মন-খারাপ লাগছিলো, অথচ সেরে উঠেছো ভাবতে ফুর্তিও হচ্ছিলো খুব--সে ভারি অদ্ভুত।

—সেদিন তোমার চোখে জল দেখেছিলাম— আমার সেই অনেক সাধের বকুনিগুলো উড়ে গেলো— চিহ্ন রইলো না। নিমেষে ক্ষমা করে বসলুম। সে কথা মনে রইলো না, বরং হোঁচট খেয়ে তোমার পা যে মচকে গিয়েছিলো—

—তোমার আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি! ভারি না একটু—

—এ-বেলা ডাক এসেছে রে, লিলি?

—এসেছে, ছোড়দি, কিন্তু শ্রীশবাবুর চিঠি নেই।

অমলা এগিয়ে এসে টেবিলে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়ালো।—খুকুকে খাইয়েছিস?

—রান্নাই হয়নি তো—

—না, হয়নি! রামের মা প্যানপ্যান করছে শুনে এলাম—ছেলেপুলেদের আগে খাইয়ে নেয় না—শেষে সবাই একসঙ্গে আসে, অথচ সে তো আর দুটোর বেশি তিনটে হাত গজাতে পারে না।

—হয়েছে নাকি রান্না? যাই তবে—

—গল্প করতে পেলে সব আকাশে বৃহস্পতি! কেন, এতক্ষণে ওকে খাইয়ে আনা যেতো না? ও যে ঝিমুচ্ছে, সেদিকেও খেয়াল নেই তোর? খালি গল্প করলেই দিন কাটে নাকি? যা শিগগির ওকে নিয়ে—পারুল কমলকেও ডেকে আন। আমরা ছোটো ছিলাম যখন—কোনো কাজের কথা বলতেও হতো না—আর তোরা যা হচ্ছিস—

খুকু সত্যিই ঝিমুচ্ছিলো ; লিলি ওকে কোলে নিয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলো। প্রিটি জানে যে রান্নাঘর চমৎকার জায়গা ; প্রিটি জানে যে সে যদি শুধু একবার মুখ ফুটে বলে যে তার খিদে পেয়েছে, তাহলে বাকি ব্যবস্থা লিলিই করতে পারে। কিন্তু ওদের প্রেমের তখন সবে শৈশব, একটুও ঠাণ্ডা সয় না।

অমলা টেবিলের উপর তার চিৎ-করা বাঁ হাতখানা মেলে ধরে জিগেস করলে—তুমি হাত দেখতে পারো, প্রিটি?

রসনার পরিচালনায় প্রিটির আর উৎসাহ ছিলো না ; সে মাথা নেড়ে জানালে—না।

—জানো না? আমি জানি মোটামুটি। এসো তোমাকে শিখিয়ে দিই।

প্রিটি ভাবছিলো, পানের আশা যখন নেই, ট্যানট্যালাসের মতো আকণ্ঠ জলমগ্ন হয়ে থেকে লাভ কী? এই বেলা সরে পড়া যাক।...শ্রীশবাবু ভারি অদ্ভুত লোক কিন্তু—বৌকে নেয়াবার একটু গরজ নেই তাঁর।

অমলা তার পুরু নরম বাঁ হাতের তেলোর উপর ডান হাতের বেঁটে ও মোটা একটা আঙুল চালাতে-চালাতে বলতে লাগলো, এই যে খুব স্পষ্ট রেখাটা দেখছো, হিন্দু মতে এটা ভাগ্যরেখা, বিলেতি মতে হার্ট-লাইন। ফেট-লাইন ওঠে প্রায় কব্জির কাছ থেকে উপরের দিকে ;—আমারটা মাঝ-পথে এসেই হারিয়ে গেছে। দেখি তোমারটা?

প্রিটির তখন মনে পড়েছে যে পকেটে তার একটি পয়সা নেই। যা থাকে কপালে—হেঁটেই লম্বা দেবে।

প্রিটির ভাগ্য-রেখা এতই সূক্ষ্ম যে তা আবিষ্কার করবার জন্য হাতখানাকে দুই হাত দিয়ে টান করে ধরে খুব নিচু হয়ে দেখতে হয়। প্রিটি হঠাৎ টের পেলো যে তার নাকের ঠিক নিচেই অমলার কালো মাথাটা। সে শশব্যস্তে বলে উঠলো, আপনার নিশ্চয়ই ভারি অসুবিধে হচ্ছে। বসুন না, ছোড়দি।

—রাত্তিরে ভালোমতো বোঝা যায় না। একদিন সকালবেলায় এসো, তোমার হাত দেখে সব বলে দেবো।

সব শুনে কাজ নেই প্রিটির। সে জানে হাত-দেখা বাজে, তবু তার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগলো, হাতখানা তক্ষুণি সরিয়ে না-নিয়ে পারলো না—একটু অভদ্রভাবেই।...নাঃ, এই এক রাজার মুলুক হেঁটে পাড়ি দেয়া কি সম্ভব? আরো, যাবার সময়? আসতে সে স্বচ্ছন্দে পারতো—হেঁটে কেন, বোধহয় এক পায়ে লাফাতে-লাফাতেও আসতে পারতো। কিন্তু—যাওয়া অন্য কথা।

অগত্যা লজ্জার মাথা খেয়ে সে বলে ফেললো, আমাকে দু-আনা ধার দিতে পারেন, ছোড়দি—আমার বাস-এর পয়সা নেই।

অমলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, নেই? অথচ তুমি এত দূর এসেছো? রোজই এ-রকম থাকে না নাকি?

প্রিটিব কান লাল ও গরম হযে উঠলো। যে-ছেলে জীবনের প্রথম প্রেমে পড়েছে, একটুতেই তার অপমান লাগে। সে গম্ভীরভাবে জবাব দিলে, আর কখনো এ-রকম হয়নি।

—ও কী? চটলে নাকি?—অমলা হাসতে-হাসতে প্রিটির চুলগুলো ধরে এক নাড়া দিলে।

—পয়সা আমি তোমাকে দেবো, এক শর্তে।

এ আবার কী? প্রিটির মনে হলো তারও হাসা উচিত, কিন্তু সে চট করে গম্ভীর ভাবটা সরাতে পারলো না। জিগেস করলে, কী শর্ত?

—আমাকে নাম নিয়ে ডাকবে আর 'তুমি' বলবে।

—কেন? বয়েসে তো আপনি বড়োই।

—ছাই বড়ো! ছয় না সাত মাসের মোটে—আজকালকার দিনে ওকে আবার বড়ো বলে নাকি! ছোড়দি আর আপনি শুনতে-শুনতে হয়রান হলুম। মনে হয় কতই যেন বুড়ো হয়ে গিয়েছি!

দু-আনার পক্ষে এ বড়ো বেশি সুদ। প্রিটি এতে রাজি নয়। একেই তার কিছু ভালো লাগছে না, তার উপর ছোড়দি এতও বাজে বকতে পারেন! নাঃ, এবার আর না-পালালেই নয়। হেঁটেই যাবে সে।

প্রিটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অমলা বললে, যাচ্ছো নাকি? পয়সা নিলে না?

—আমি তো আপনার শর্তে রাজি হইনি।

—প্রথমটায় একটু বাধো-বাধো ঠেকেই—একটু চেষ্টা করো, অভ্যাস হয়ে যাবে। ভারি বিশ্রী শোনায় আপনিটা। একটু বোসো, আসছি।

অমলার অটোগ্রাফের বইটা খুঁজে বার করতে একটু দেরি হয়ে গেলো। প্রিটিকে লিখতে বলবে—ও নিশ্চয়ই এক্ষুণি লিখবে না—বাড়ি নিয়ে যেতে চাইবে। অমলা প্রথমটায় আপত্তি করবে...

অমলা যখন ফিরে এলো, তার তিন সেকেণ্ড আগে প্রিটি লিলির হাত থেকে একটা টাকা নিয়ে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

—প্রিটি কোথায় রে?

—চলে গেছে।

—চলে গেছে? কখন?

—এই তো এইমাত্র।

—কী করে গেলো? ওর না পয়সা ছিলো না?

লিলি ঢোঁক গিলে বললে, উপবের পকেটে একটা সিকি ছিলো—আগে টের পায়নি।

ছোড়দি দাঁতে দাঁত চেপে কী উচ্চারণ করলেন, লিলি ঠিক বুঝতে পারলো না।

—মা, তুমি ভারি কেয়ার্লেস। অমলার মুখে এই অভিযোগ শুনে মা তো অবাক।

—কেন, কী করেছি আমি? বা করিনি?

অমলা তার ঘন চুলের বোঝা পিঠের উপব ছেড়ে দিয়ে বললে, মেয়ে মানুষ করতে তুমি জানো না।

মা হেসে উঠলেন।—তুমি নিজে মানুষ হওনি? না অন্য কারো পেটে জন্মেছিলে?

—আমার কথা আলাদা। আমাদের সময়ে ঘর-ভরা ছেলেমেয়ে ছিলো না, তুমি সব সময় আমাদের দেখাশোনা করতে পারতে। তা ছাড়া, চোদ্দ বছরে পড়তেই আমার তো বিয়েই হয়ে যায়।

মা মেয়ের চুল নিয়ে বিনুনি বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, তুই অনেক বেশি আদব পেয়েছিস, তা ঠিক; কিন্তু লিলিরাও তো কষ্টে নেই।

অমলার ঠোঁটের উপর দিয়ে যে-বাঁকা হাসি খেলে গেলো, মা তা দেখতে পেলেন না।

—না, না, কষ্টে থাকবে কেন? সুখেই তো আছে খুব, কিন্তু সুখেরও বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

—তুই দূর থেকে দু-দিনের জন্য এসেছিস কিনা—কিন্তু সব কথা যদি শুনতিস—

—চাইনে শুনতে। এখন আমি তো আর এবাড়ির কেউ নই, সব কথা শোনার জন্য মাথা-ব্যথা নেই আমার। যা চোখে পড়ে, না-বলে পারিনে—এই যা। এত বড়ো মেয়ে যার, সেই মা-র একটু ভ্রূক্ষেপ নেই—এমন আর দেখিনি।

—এত বড়ো আবার কে? লিলি? ও তো সবে পনেরোয় পা দিয়েছে—এখনই ওর বিয়ে?

—বিয়ে দাও বা না দাও সে তোমার ইচ্ছে,—কিন্তু ও তো আর শিশু নেই। ওর বয়সে আমার এক বছব কারাবাস হয়ে গেছে—আর লিলি তো দিব্যি ইস্কুলে যায় আর গপ্‌প্‌ করে দিন কাটায়।

—শ্রীশের মতো ভালো পাত্র পেয়েছিলাম—ছাড়তে সাহস হয়নি। লিলির জন্যে তেমন পাচ্ছি কই? এ-ক'বছরে হাওয়াও বদলে গেছে—আঠারোর আগে বিয়ের কথা ভাবেই না কেউ। লিলিও যেন কেমন—বয়স বাড়ছে, কিন্তু বড়ো হচ্ছে না, এখনো কী-রকম ছেলেমানুষ দেখছিস তো। ভাবতে অবাক লাগে, ওর বয়েসে আমার একটি মেয়ে হয়েছিলো।

—তোমার কাছে—উঃ, অত শক্ত করে বেঁধো না, মা—তোমার কাছে ছেলেমানুষ মনে হবেই তো—এইজন্যেই তো তোমাকে আমি কেয়ার্লেস বলি। মেয়েরা যেদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরে, সেদিন থেকেই তাদের চব্বিশ ঘণ্টা চোখে-চোখে রাখতে হয়, তাও তুমি জানো না। কী অবাধ স্বাধীনতা দাও তুমি!

—আমার কাছে যদ্দিন আছে, একটু হেসে-খেলে বেড়াক না। জন্মের মতো তো কয়েদখানায় ঢুকতেই হবে।

—হেসে খেলে তো বেড়াচ্ছে, শেষকালে গড়াতে-গড়াতে না গোল্লায় যায়। কোনোদিকেই তো তোমার চোখ নেই!

—কেন? লিলি তো বরাবর পরীক্ষায় ফার্স্ট হচ্ছে—গান শেলাই সুদ্ধু। ঘরের কাজকর্মও শিখছে—ও কী-ই বা বয়েস, কতটুকুই বা পারে!

—তুমি মা বলেই এ-কথা বলছো, কিন্তু আমার শাশুড়ি যখন আমার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় কাজ আদায় করে নিতেন, আমার বয়েসও ওরই মতো ছিলো। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। তুমি যে একেবারে রাশ আলগা করে দিয়েছো—মেয়ে যা খুশি তা-ই করে, যার সঙ্গে ইচ্ছে তার সঙ্গেই মেশে। একটা কথার কথা বলছি— প্রিটির সঙ্গে কি ওকে অত মিশতে দেয়া উচিত? এমন কিছু নিকট আত্মীয় তো নয়,—আজকালকার দিনে বাপ খুড়োর সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক থাকে না - আর এ তো কত লতাপাতা? তুমি ভাবো, মেয়ে তোমার কচি খুকিটি—কিছু বোঝেন না! তোমাদের দিনকাল আর নেই গো—এখনকার মেয়েরা সব বারোতে বুড়ো। সব পারে ওরা— চোখ-কান খোলা থাকলেই সব বুঝতে। মানুষকে বিশ্বাস করবার একটা সীমা থাকা ভালো। শেষটায় একটা-কিছু হোক, লোকে তখন দুষবে তোমাকেই, নইলে আমার কী, বিয়ে হয়ে গেলে মেয়ে পরস্য পর। আমি তোমাদের সাতেও নেই, পাঁচেও নেই -

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে অমলা দম নেবার জন্যে থামলো। সে থামামাত্র পিসিমা – তিনি এতক্ষণ ঘরের এক কোণে বসে চক্ষুমুদ্রিত করে মালা জপ করছিলেন—কথাটা লুফে নিলেন ; ঠিক বলেছিস। অত বড়ো মেয়ে, পরের ছেলের সঙ্গে তোর অত গুজগুজ করতে যাওয়া কেন? এখন নাকি নিয়মকানুন সব উল্টে গেছে—আমরা সেকেলে লোক বাপু, আমাদের চোখে এতটা ভালো লাগে না।

বলে তিনি গভীর অর্থসূচক দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

মা এতক্ষণে গাঙে ঠাঁই পেলেন। অমলার খোঁপায় কাঁটা গুঁজতে-গুঁজতে বললেন, তুই কি খেপেছিস, অমলা? প্রিটি ভারি ভালো ছেলে—পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে ;—চেহারাখানাও কী মিষ্টি! অথচ এমন পোড়াকপাল, মা-টা গেলো মরে—আর মা মরলে বাপ তো তালুই। যে যাই বলুক, প্রিটির সঙ্গে কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করতে আমি পারবো না।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে হাই ঠেকিয়ে অমলা বললে—আহা, খারাপ ব্যবহার করতে কে বলছে? প্রিটি এখানে আসুক না যত খুশি—ওকে আদর-যত্ন করো, খাওয়াও-দাওয়াও—লোকে ভালোই বলবে। কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো।

কথাটা তখনকার মতো এখানেই চাপা পড়লো। অমলা আবার বড়ো ঘুম-কাতুরে।

মা হলে হবে কী, স্ত্রীলোক তো। অমলার ওকালতিতে টাল সামলাতে পারবেন কেন? সুতরাং লিলি আর প্রিটি হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে, কী-যেন একটা হয়েছে। কী হয়েছে, তা ঠিক বুঝতে না-পারলেও এটা ঠিক বুঝলো যে কিছু-একটা হয়েছে।

এই তো সেদিন ওরা দু'জনে বসে গল্প করছিলো, হঠাৎ ছোড়দি এসে জিগেস করলেন, কী আলাপ হচ্ছে তোমাদের?

প্রশ্নটা নিতান্তই বেমানান। লিলি গম্ভীরমুখে জবাব দিলে এই কত দেশ বিদেশের কথা।

—আমিও একটু দেশ বিদেশের কথা শুনি। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ — কাজে লেগে যাবে। বলে তিনি গ্যাট হয়ে বসলেন।

মহা মুশকিল। প্রেমের ইস্কুলে ওরা সবে ভর্তি হয়েছে দু-জনে বসে পাটের চাষ নিয়ে আলাপ করবার আর্ট এখনো ওদের আয়ত্ত হয়নি। তাই খানিকক্ষণ এটা ওটা নিয়ে হুঁ হাঁ বিনিময়ের পর প্রিটির হঠাৎ মনে পড়ে গেলো যে কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি থেকে তার একখানা খাতা আনতে হবে।

সেদিনকার মতো ওরা বেচে গেলো—মানে, মরে বাচলো বটে, কিন্তু রোজই এ-রকম হচ্ছে, দু দণ্ড নিরালায় বসে কথা কইতে পারে না ওরা। হাতের কাজ সেরে লিলি একটু বসেছে কি মা ডাকলেন শেলাই করতে, কি ছোড়দি প্রিটিকে ডাকলেন তাকে একটা এমব্রয়ডারির নক্সা এঁকে দেবার জন্যে, কখনো বা পিসিমা নিতান্ত অযাচিত অনুগ্রহ করে তাঁর তীর্থযাত্রার কাহিনী ওদের শোনাতে বসেন। চাইকি, একজন একজন করে সবাই এসে জুটলেন—ঘর সরগরম। লিলি মনের দুঃখে এক ফাঁকে উঠে গিয়ে বই খুলে বসে, প্রিটি মুখের অম্লানতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে, পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার আছে কিনা -এই আলোচনায় যোগ দেয়।

যদি এ-দিন দু জনে শুধু আলাপ করতে পারতো কী বিশ্রী!' 'ছোড়দি একটি চ্যাটারবক্স।' 'পিসিমা ভারি ফানি— ' এর বেশি মনে মনে ভাবলেও, মুখে বলার সাহস ওদের হয় না,—তাহলে এত দুঃখ সত্ত্বেও ওরা সুখী হতে পারতো। কিন্তু সেটুকু সময়ও হয় না। দু জনের বুকে হিমালয় পর্বত চেপে বসেছে।

প্রিটি যদি সবার সামনে বলতে পারতো— 'শোনো লিলি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে', বা লিলি, 'আমাকে একটা এক্সট্রা কষে দাও না, প্রিটি দা বলে তাকে হাত ধরে টেনে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে পারতো, তাহলে সবই সহজ হয়ে যেতো জলের মতো। কিন্তু ওদের ধারণা পরস্পরকে ভালোবেসে ওরা পৃথিবী সুদ্ধ লোকের কাছে অপরাধী হয়ে আছে, তাই ওদের বড়ো ভয়, বড়ো কুণ্ঠা। একজন আর-একজনের সঙ্গে কথাও বলে না —চেনেই না যেন। ওদের নবিশি এখনো শেষ হয়নি, তাই ওরা ভাবছে যে এই ভাবেই সকল সন্দেহ থেকে ওরা রেহাই পাবে , আর একটু পাকা হলেই বুঝতে পারতো যে লুকোবার কিছু নেই, এই ভান করাই লুকোবার অব্যর্থ উপায়। ওরা জানে না, লুকোবার চেষ্টা করতে গিয়েই ওরা আরো বেশি করে ধরা পড়ে যাচ্ছে।

প্রিটির সবচেয়ে অবাক লাগে এই ভেবে যে ছোড়দি ওকে রোজই আসতে বলেন এবং দেখা হলেই নানা আলাপ করেন—যা কথা বলতে পারেন তিনি। ওরা যা আশঙ্কা করে তা-ই যদি হতো, যদি ওদের কপালই পুড়ে থাকতো, তাহলে তাহলে ছোড়দি অন্তত ওকে অমন আপ্যায়িত করতেন না নিশ্চয়ই। অথচ সবাই কেমন যেন বদলে গেছে কিছুই আগের মতো নেই। প্রিটি ভাবে—কিন্তু কোনোই কূলকিনারা করতে না পেরে, ভাগ্যের হাতে তার সব সমস্যা তুলে দিয়ে আগেকার মতোই আসা যাওয়া করছে।

এক সন্ধ্যায় নিচের ঘর অন্ধকার দেখে সে ভু করলে, রান্নাঘরে আগে খোঁজ নিয়ে- সোজা উপরে উঠে গেলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার বুদ্ধি খেললো —সামনের বড়ো ঘরটায় না গিয়ে কোণের যে ছোটো ঘরটায় গিয়ে ঢুকলো, সেটা লিলির। দায়ে পড়ে বেচারার সাহস হয়েছে।

প্রিটির ততক্ষণে হয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গ অবলম্বন করে ছোড়দি যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবেন তা ভেবে তার শরীরের রক্ত বরফ হয়ে গেলো। ছোড়দি কী চালাক আর কী খারাপ। একটা ছুতো করে তাকে আটকে রেখে তার মুখ দিয়ে বের করে নিতে চাচ্ছেন যে সে লিলিকে— প্রিটি ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে, এখন আর এড়াতে পারবে না। এ বাড়িতে আসা তার এই বোধহয় শেষ।

এতক্ষণ যা একটু ঘোর-কপট ছিলো, তাও ঘুচলো। ছোড়দি স্পষ্ট ভাষায় জিগেস করলেন, আচ্ছা প্রিটি, কোনো মেয়ে তোমার প্রেমে পড়েনি?

—না—এই একটি কথা বলতে গিয়ে প্রিটির গলা আটকে এলো।

—না! বলো কী? এমন সুন্দর চেহারা তোমার—না-প'ড়ে পারে? —দু-একজন নয়, নিশ্চয় অনেকেই পড়েছে—থাক, থাক, আমার কাছে না-ই বা বললে। যা লাজুক তুমি! এমনও হতে পারে যে তুমি তা জানো না। এমন হতে পারে যে মেয়েদের মনের কথা জানবার ক্ষমতাই তোমার নেই। কিন্তু তুমি? তোমার নিজের মনের কথা তো জানো? তুমি কখনো পড়োনি কোনো মেয়ের প্রেমে?

প্রিটির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। তার ইচ্ছে হলো ছোড়দির পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। যদি তাঁর একটু করুণা হয়। ইশ—একটু দয়া-মায়াও নেই ছোড়দির।

—বলো না, কার সঙ্গে? আবদারের সুরে ছোড়দি বললেন। ছোড়দি কী চালাক! তাকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে চান।

—কারু সঙ্গে নয়। কথাটা বলে প্রিটি হাঁপাতে লাগলো।

—কারু সঙ্গে নয়? একদিনের জন্যেও না?...আচ্ছা প্রিটি, কোনো মেয়েকে চুমো খাওনি তুমি?

প্রিটি ভাবলে, কখনো তার জন্ম না-হলেই ভালো ছিলো। এ-প্রশ্নের উত্তরে কী করে সে 'না' বললে, তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না।

—কক্ষনো না? হ'তেই পারে না।

পরের মুহূর্তেই আবার :

—পারবেই বা না কেন? ইচ্ছে হয়েছিলো, সাহস হয়নি, পারোনি না? বলো না, প্রিটি! চুমো খাওয়াতে দোষ কী? বিলেতে তো লোকেরা রাস্তায় চুমো খায়।...তুমি একেবারে বোকা—তাই ঘাবড়ে যাও। মেয়েরা মুখে অমন আপত্তি করেই—ওর নামই ইচ্ছে। সে-আপত্তি বুঝি কেউ মানে? তুমি কিচ্ছু জানো না দেখছি! বলে ছোড়দি একখানা হাত কপালের উপর তুলে দিলেন।

—আচ্ছা প্রিটি, যদি কোনো মেয়ে মুখেও আপত্তি না করে, তাহলে তুমি পারোঁ? যা ভিতু তুমি—নিশ্চয় পারবে না। আমি দশ টাকা বাজি রাখতে পারি—এসো তোমার সাহস পরীক্ষা করা যাক। ধরো, আমার কোনো আপত্তি নেই—পারবে আমাকে চুমো খেতে? ছোড়দির হাতখানা কপাল থেকে যেন লাফিয়ে উঠে প্রিটির গলায় এসে পড়লো।

প্রিটির সমস্ত শরীর কাঠ হয়ে এসেছিলো। যন্ত্রের মতো সে অমলার হাতখানা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সঙ্গে-সঙ্গে অমলা তড়াক করে উঠে বসলো।—ভারি আস্পর্ধা তো তোমার! তুমি ভেবেছো নাকি যে সত্যি-সত্যি আমি তোমাকে—! সবার কাছে রং চড়িয়ে এ কথা বলে বেড়াবে—না? খবরদার—! বেশ তো! বলো না—যাও! কেউ বিশ্বাস করবে কিনা! উল্টে তোমাকেই ঠেশে ধরবে। ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও এ-ঘর থেকে—না, যেয়ো না, শোনো, বোসো—থাক, না-বসলেও চলবে। শোনো, আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গে তামাশা করছিলাম।

—আমারও তা-ই মনে হয়েছে।

—তোমারও তা-ই মনে হয়েছে, না? তামাশা করবার আর লোক নেই আমার—না? কী বেয়াদপি! আমি তোমার সঙ্গে তামাশা করবো? তামাশা! তামাশা কাকে বলে, জানো? সব নিয়েই তোমার ফাজলেমি! যাও তুমি এখান থেকে—আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাইনে।

হতভম্ব হয়ে প্রিটি বেরিয়ে যাচ্ছিলো, অমলা হঠাৎ ছুটে এসে তার হাত ধরে বললে, যেয়ো না, প্রিটি। রাগ করলে আমর উপর? সত্যি তুমি চমৎকার দেখতে। বলে সে প্রিটির হাতখানা নিয়ে নিজের গলায় জড়াতে যাচ্ছিলো, প্রিটি জোর করে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলে।

হঠাৎ অমলার তীক্ষ্ণ চীৎকারে বাড়ি কেঁপে উঠলো। চৌকাঠের কাছে এসে প্রিটি বাধ্য হলো থমকে দাঁড়াতে।

ছুটে এলেন মা, দৌড়ে এলেন পিসিমা, আর কাঁপতে-কাঁপতে লিলি—তার বুকের উপর ঢেঁকির পাড় পড়ছে—কাঁপতে-কাঁপতে লিলি এলো।

অমলা তখন খাটের উপর লুটিয়ে আকুল হয়ে কাঁদছে।

—কী? কী হয়েছে?

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে অমলা বললে, 'ঐ প্রিটি...ঐ ছেলেটা, মা—ও আমাকে—বাকি কথাটা বলতে অমলার লজ্জায় বাধলো।

রোদনে তিরস্কারে বিলাপে মিশে যে তুমুল সোর উঠলো প্রিটি তাতে একটি কথাও বলতে পারলো না। বললেই বা কে শুনতো, শুনলেই বা বিশ্বাস করতো কে? যে-একজন করতো, তাকেও বলা হলো না।

লিলি সমস্ত রাত কাঁদলো, ইহজীবনে তাকে আর দেখবে না বলে নয়—তার চেয়েও বড়ো ও নিষ্ঠুর এক দুঃখে—সে-কথা কাউকে বলা যায় না, সে-কথা দুঃস্বপ্নেও মনে আনা অসম্ভব।

প্রিটি সমস্ত রাত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো, ইহজীবনে ওকে আর দেখবে না বলে নয়—লিলি যে-কারণে শোক করবে, তা তাকে আর দেখতে পাবে না বলে নয়, সেই দুঃখে।

আশাপূর্ণা দেবী

মাটির পৃথিবী

সুদীর্ঘ কালের অনভ্যাসের ফলে দেশের বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়া প্রথম প্রথম ভারি কষ্ট হয় অনিলার। ছোট ছোট সব অসুবিধা যে এত বড় হইয়া দেখা দিবে এ জ্ঞান কি অনিলার আগে ছিল?

মেটে উঠানে নামিয়া পাতকুয়ার জল তুলিয়া কাজ। হ্যারিকেনের আলোয় চোখ জ্বালা করে, কেরোসিনের গন্ধে মাথা ধরিয়া ওঠে।

গাছের পাতা পড়িয়া সারা বাড়ী জঞ্জালে ভরিয়া যায়, ভাঙা দেওয়ালের লোনা মাটি লইয়া ছোট ছেলেমেয়েগুলো গা হাত পা অপরিষ্কার করে। পরিষ্কার মানুষ অনিলা প্রতিনিয়ত ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে।

ইহার পরই নামিল বর্ষা।

দাদাশ্বশুরের আমলের জরাজীর্ণ বাড়ীখানা কঙ্কাল-বাহির-করা দেয়ালগুলো লইয়া যেন সর্বদাই দাঁত খিঁচাইয়া থাকে—মনে হয় এই অজস্র বৃষ্টির সুযোগে—দীর্ঘদিন অবহেলায় ফেলিয়া রাখিবার প্রতিশোধ লইতে, হুড়মুড় করিয়া অনিলার মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িবে একদিন। প্রবল ঝড়ে উঠানের গাছগুলো এলোমেলো কাণ্ড করিতে থাকে ; ছেলেমেয়েদের লইয়া দুয়ার-জানলা-বন্ধ ঘরে অনিলা যেন আপনার বুকের ভিতর সেই তাণ্ডবলীলা অনুভব করে।

কলিকাতায় কি বর্ষা ছিল না? স্বামী কি তাহাকে সদা সর্বদা বুকের ভিতর আগলাইয়া রাখিত? মাইল কতক দূরে থাকিয়া এত অসহায়তা বোধ করে অনিলা কেন?

ছোট ছেলেটাকে উপরতলায় ঘুম পাড়াইয়া আসিয়া শান্তি পায় না, গা ছমছম করে,—নীচের তলায় দালানের একপাশে তক্তপোশ পাতিয়া শোওয়াইয়া কয়দিন একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। গতকল্য ইঁদুরের গর্ত হইতে সাপ বাহির হইয়াছে।...

'ত্যাগের মহান্ আদর্শ'-টাদর্শ গোছের বড় বড় কথাগুলি ছাপার অক্ষরে পড়িতে বেশ, ব্যাবহারিক জীবনে উহার কোন দাম নাই ; যে মনের জোর লইয়া অনিলা পরিত্যক্ত শ্বশুরের ভিটায় বাস করিতে আসিয়াছিল, তাহার চিহ্ন আর খুঁজিয়া পায় না। কাজ যে করে সে অনিলার—ঘোরালো করিয়া বলিতে গেলে—'আত্মসম্মান'—সোজাসুজি নাম চক্ষুলজ্জা।

মুরলী তো তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছিল, নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা অনেক করিয়াছিল, অনিলাই সে সব কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

মেয়েটার আজীবন সুখের মূল্য দিতে গোটা তিন চার বছর একটু কষ্ট সহিয়া থাকিতে পারিবে না তাহারা? তবে আর সন্তান-স্নেহ জিনিসটা রহিল কোথায়? বড় ঘরে মঞ্জুর বিবাহ দিতে বসিয়া যে ঋণের বোঝা বহিতে হইয়াছে মুরলীকে, অনিলা তাহাকে ব্যয়-সংক্ষেপের জোরে হাল্কা করিয়া দিবে। মঞ্জু—তাহাদের আদরের মঞ্জু। প্রথম মাতৃস্নেহ যাহাকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তিল তিল করিয়া।

মুরলীর প্রবল আপত্তিকে হাসির হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া অনিলা ক্রমাগত সাহস দিয়াছে—অত ভাবছো কেন শুনি? ক'টা দিন আর? বছর তিন চার দেশে গিয়ে থাকলেই ধার শোধ হয়ে যাবে। মাস মাস বাড়ীভাড়ার পঞ্চাশটি করে টাকা বাঁচবে—কম তো না। মেসে থাকতে তোমার গোটা পনেরই লাগুক, শনিবার শনিবার বাড়ী যেতেও গোটা পাঁচ ধরে নাও, তবুও তো তিরিশ থাকলো? তা ছাড়া দেশে দুধ মাছ সস্তা, তরিতরকারি তো অর্ধেক অমনি মেলে। সংসার-খরচ থেকে ও ক'টা টাকা তুলে দেব আমি। কিছু কষ্ট হবে না আমার।'

তা তুলিয়া হয়তো সে সত্যিই দেয়। কিন্তু কষ্ট না হওয়ার কথাটা রাখিতে পারিয়াছে কি?

অবাক হইয়া যায় অনিলা আপনার নিষ্ঠুরতায়। মুরলীর বিচ্ছেদ-কাতর মলিন মুখখানি সে অনায়াসে অবহেলা করিয়াছিল কোন্ প্রাণে? 'বুড়া বয়সে ভীমরতি' বলিয়া উপহাস করিয়াছিল কি হিসাবে? কে জানিত রাত্রির পর রাত্রি অন্ধকার ঘরে জাগিয়া বসিয়া সেই উপহাসের মাশুল তাহাকেই যোগাইতে হইবে!

মেজ মেয়ে রঞ্জু একখানা পোস্টকার্ড লইয়া প্রায় বানান করিয়া পড়িতে পড়িতে আসিয়া কহিল—মা, বাবা এ শনিবারেও আসবেন না। এই যে লিখেছেন—'এ সপ্তাহেও যাওয়া বন্ধ করিলাম, কারণ সামনে পূজা আসিতেছে, নূতন জামাইয়ের তত্ত্ব'—এখানটা কি মা—কিছুতেই পড়তে পাচ্ছি না, এমন ছাই লেখা বাবার—! পোস্টাকার্ডখানা ফেলিয়া দিয়া তরকারীর ঝুড়ি হইতে একটা বিলেতী আমড়া সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করে রঞ্জু, আসিবামাত্রই জিনিসটার উপর তাহার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, তাই চিঠির শেষটা পড়িবার গরজ কমিয়া গেল।

কিন্তু পড়িবার আছেই বা কি? পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়াছে মুরলী অনিলাকে! কোন্ অনিলাকে? যে অনিলা আঠারো বৎসর আগে এই দালানে বসিয়া এমনি করিয়া আলু ছাড়াইত আর নববধূর শঙ্কিত দৃষ্টি আর কম্পিত হৃদয় লইয়া অধীর আগ্রহে পিয়নের পরিচিত শিকল নড়ার প্রতীক্ষা করিত—সেই অনিলাকে? যে মুরলী মিথ্যা কলেজের ছুটি দেখাইয়া অসময়ে বাড়ি আসিয়া হাজির হইত—সেই মুরলী? পোস্টকার্ডের গায়ে দুই ছত্র মামুলী কুশলপ্রশ্ন-সহ জানাইয়াছে –এ সপ্তাহেও যাওয়া হইল না। খরচের টানাটানি।

কুটনো-কোটা ভিজা হাত মুছিয়া তুলিয়া পড়িবার প্রয়োজন হয় না। চোখ বুলাইয়া এমনিই পড়া যায়। তবু অভিমান যদি করে অনিলা অন্যায়ই করিবে।

দোষ কি মুরলীরই?

পর পর দুই শনিবার সে বাড়ী আসে নাই—হয়তো খরচের ভয়েই আসিতে পারে নাই, শুধুই তো ট্রেন-ভাড়া নয়, কলিকাতা হইতে আসার সময় ছেলেমেয়েদের নাম করিয়া কিছু ভাল-মন্দ লইয়া না গেলে সামনে গিয়া দাঁড়াইবে কেমন করিয়া? ভাদ্র মাসের গঙ্গার ইলিশ অনিলার কত প্রিয়বস্তু মুরলী কি তাহা জানে না?

বাড়ী সে যায় নাই কিন্তু চিঠি দিয়াছিল—প্রয়োজনের অতিরিক্তই। তাহারই উত্তরে—নির্দোষ

ভাবিয়াই লিখিয়াছে অনিলা—মুরলীর মনে কষ্ট দিবার জন্য লেখে নাই, তবু পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিল—"রেল কোম্পানীর প্রাপ্য পাওনাটা তো মুরলী সরকারের ঘরেই ধরিয়া দিতেছে—তবে আর বেচারা রেল কোম্পানী কি অপরাধ করিল?"

তাহাতেই এত অভিমান হইয়াছে মুরলীর? কিন্তু অনিলা কি তাহার দুরন্ত অভিমানী স্বভাবের খবর রাখে না? নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে লাইনগুলি একাকার হইয়া যায়। পোস্টকার্ডের খানিকটা যেন সাদা, বাকীটা শুধুই কালো রঙের। চার বৎসরের ছয়মাস কাটিয়াছে, আর কতগুলি মাস আছে মনে মনে হিসাব করিতে গিয়া, হিসাবের ঠিক হয় না, ক্রমাগত ভুল হইতে থাকে। অভিমান? না এমনি করিয়া দূরে সরিতে থাকে মানুষ? অবোধ দুইটা শিশু লইয়া এই বনের ভিতর ভাঙা বাড়ীতে পড়িয়া আছে অনিলা—সে কথা কি মুরলী মনে পড়ে না?

কিন্তু মান-অভিমানের পালা লইয়া তো গৃহস্থ-ঘরের কাজ চলে না। বাড়ী মুরলীকে আসিতেই হয়। নূতন তত্ত্ব, মেয়ে-জামাইকে পূজার সময় আনিবার পরামর্শ দুইজনে মুখোমুখি না বসিলে সাব্যস্ত হইবে কেন?

মেয়েকে বড় ঘরে দিবার সাধ অনিলারই বেশী, একরকম জিদ করিয়াই সে এ কাজ করিয়াছে, কাজেই তত্ত্বের ফর্দ লিখিতে বসিয়া বারে বারে ভাবি কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে বেচারা। উদাস অনিচ্ছুক স্বামীকে দিয়া নিখুঁত করিয়া সব কাজ আদায় করিয়াই বা লয় কেমন করিয়া?

অথচ কুটুম্বের মানরক্ষা না করিলেই বা চলে কৈ? শ্বশুরবাড়ীতে মঞ্জুর মুখ থাকিবে না, হয়তো গরীবের মেয়ে বলিয়া খোঁটা দিবে। অকস্মাৎ কন্যার কাল্পনিক মলিন মুখ স্মরণ করিয়া মায়ের প্রাণ আকুল হইয়া ওঠে।

কুণ্ঠা ঝাড়িয়া বলে— তা বললে কি হবে— মেয়ে জামাইকে প্রথম পুজোয় না আনলে বলবে কি লোকে? এসে যাতে পুজোর ক'দিন থাকে সেই রকম করে বলে আসবে বেয়ানকে। বিয়ে হয়ে ইস্তক জামাইকে আনতে নিতে পারিনি।

হ্যাঁ জামাই তোমার এই বাড়ীতে চার দিন চার রাত কাটাতে আসবে। ওই আনন্দেই থাকো। নবাবপুত্তুর "বেলগাড়ী চড়ে ট্যাং ট্যাং করে শ্বশুরবাড়ী আসতে পারবেন না", ট্যাক্সি করে আনতে হবে।

বিদ্রূপ হাস্যে মুখ বাঁকাইয়া মুরলী একটা সিগারেট ধরায়।

অনিলা শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া বলে — কে বললে তোমাকে এ কথা?

—বলেছেন তোমার কন্যে। দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিন, চুপি চুপি বললে—নেমন্তন্ন-টন্ন না করায় ভাবি সব চটেছে, ওরে ধরলে অবিশ্যি আসতো না। কলকাতায় শ্বশুরবাড়ী শুনে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল, এখন দেখছে ঠকিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। গাড়ীতে চেপে ধাবধাড়া গোবিন্দপুরে শ্বশুরবাড়ি আসা —লাটসাহেবের পুষ্যি পুত্তুরের কম্ম নয়। এখন এনো ট্যাক্সিতে, অনেক তো জমিয়েছ তুমি।

অনিলার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে, তবু সহজে আপনাকে খেলো করে না। সতেজ গলায় বলে—বেশ, দেব আমি টাকা, তুমি বলে তো এস।

কানের ফুল তো তাহার দুইজোড়া রহিয়াছে এখনো।

বিবাহের অষ্টমঙ্গলার পর এই প্রথম বাপের বাড়ী আসিল মঞ্জু, দেশের বাড়ীতেও আসা তাহার এই প্রথম। আসিয়া বেচারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে। স্বামীকে এখনো আপন বলিয়া নিঃসঙ্কোচ হইবার কাল তাহার আসে নাই। বড়লোকের ছেলে, ভাল বাড়ীতে থাকা অভ্যাস। তাহাকে লইয়া মঞ্জু এখন করে কি? দেশের বাড়ী ভাঙা, একথা শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে মানুষ বাস করে সে বাড়ী যে এত ভাঙা হয় এ তাহার ধারণার অগোচর। কলিকাতার বাসায় কেমন ছিল তাহারা ছোটখাটো সুন্দর বাড়ীখানি রাস্তার উপর বারান্দা। মাকে যে কত কি সব দুঃখ দিত তবু বেলা আসিলে সে এই বাড়ীতে আসিয়াই বর্তাইয়া যাইত মাকে পাইয়া ছোট ভাইবোনদের পাইয়া। বর সঙ্গে আসাতেই না যত বিপদ।

লজ্জা ঢাকিতে সে না পারে মার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বলিতে, না পারে ভাইবোনদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া হাসি-গল্প করিতে। বরের পিছন-পিছনই ঘুরিয়া মরে।

যে স্নেহ-পুলকিত চিত্তে অনিলা মেয়ে-জামাইকে আহ্বান করিয়া লইয়াছিল—একদিনেই যে তাহা কঠিন হইয়া আসে।

কী বেহায়াই বনিয়া যায় মেয়েগুলো! মা-বাপ ভাই-বোন সব পর হইয়া গেল—সর্বস্বই এখন বর। কিন্তু মেয়েকে কি অনিলা হিংসা করিয়া ফেলিবে নাকি?

ভোরের ট্রেনে মুরলী কলিকাতায় যাইবে, একদিন বৈ পূজার ছুটি নাই তাহার। অফিসে কাজ বেশি। ওভারটাইম খাটিলে দু'পয়সা পকেটেও আসিবে। ম্লানমুখে অনিলা শেষরাত্রে উঠিয়া যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতেছে, পূজায় এই প্রথম ছাড়াছাড়ি থাকিবে তাহারা। একবার বাপের বাড়ী ছিল—বিজয়া দশমীর সকালে কত কারসাজি করিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল।...মুরলী উঠিয়া মুখ হাত ধুইতেছে—মঞ্জু ঘুমভাঙা চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া আসিয়া কহিল—মা, ও বলছে আটটার গাড়ীতে চলে যাবে।

অনিলা হতবুদ্ধিস্বরে বলে—কে চলে যাবে? জামাই?

—হ্যাঁ।

—ও মা, সে কি কথা! কেন? কত দুঃখে আনলাম, একদিন থেকে চলে যাবেন কি!

—কি করবো মা—এ রকম থাকা অভ্যেস নেই তো ওদের, বলে—"মাথার ওপর ছাত ভেঙে পড়বে। মশায় টেনে নিয়ে যাবে—" আরো কত কি—। হাসির ভান করিয়া চুপ করে মঞ্জু।

হঠাৎ যেন সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া যায় অনিলার। বটে, এত বড় কথা? উহাদের অভ্যাস নাই, আর অনিলার ছিল? কে জানে মেয়েরও এ অবহেলায় যোগ আছে কিনা—যাহার সুখের রসদ যোগাইতে সব দিক দিয়া মাটি হইতে বসিয়াছে অনিলা। কঠোর দৃষ্টিতে মেয়ের পানে আপাদমস্তক চাহিয়া কঠোর গলায় বলে—বেশ, না থাকতে পারে যাবেন—বেঁধে তো রাখতে যাবো না ; তা তুমিও ওই সঙ্গে 'আলায় আলায়' এসো গিয়ে, বড়মানুষের বৌ, হয়তো কত অসুবিধে হচ্ছে।

—আহা আমি কেন যেতে যাবো, বা—রে? শাশুড়ী তো বলেছেন এ মাসটা থাকবো।

—অনেক দয়া তাঁর। কিন্তু আমি আর রাখতে সাহস করিনে বাছা। কি জানি, মশার কামড়ে যদি ম্যালেরিয়াই ধরে যায়।

পরিহাস ভাবিয়া মঞ্জু হাসিয়া ফেলে—তোমাদের তো কই ম্যালেরিয়া হচ্ছে না—আমার রক্ত বুঝি মিষ্টি?

আরো গম্ভীর হইয়া অনিলা উত্তর দেয়—গরীবের সব সয় বাছা—তাই বলে তোমাদের সইবে কি? উনি বেরুলেই—যাচ্ছি আমি জামাইয়ের কাছে। বলিগে—যাতে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

—আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ মা? মঞ্জু হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে। অনিলা আর উত্তর দেয় না, কিন্তু মন তাহার নরম হইয়া যায় কই? না, মঞ্জুকে সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহার আর নাই।....

নিজের উপর বিশ্বাসও তাহার নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

মুরলীর মলিন মুখ তাহার সন্তান-স্নেহকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল নাকি?

অন্য ছেলে-মেয়ের এবার পূজোয় নূতন জামা-জুতা হয় নাই, নূতন জামাইয়ের তত্ত্বের রসদ যোগাইতে তাহারা বিরস মুখে পুরানো জামা গায়ে দিয়া বেড়াইতেছে। কেন, উহারা কি তাহার বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে নাকি? সকলের ভাগ কাড়িয়া একজনকে ঢালিয়া দিবার কি অধিকার অনিলার?...

নিরাভরণা অনিলা মুখ বুজিয়া দাসীর মত খাটিবে, পূজার ছুটিতে মুরলী মেসের ভাত খাইবে ; আর, সকলের সৌভাগ্যের উপর ডাকাতি করিয়া স্বার্থপর মঞ্জু সর্বাঙ্গ মুড়িয়া অনিলার সামনে স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে!

এত অসহ্য সহ্য করা কঠিন, অন্তত অনিলার পক্ষে। সুখে থাক, ভাল থাক, চোখের আড়ালে থাকাই ভাল।

বিবাহ দিলেই পর।

ট্যাক্সিতে উঠিয়াও মঞ্জু ফোঁস্ ফোঁস করিয়া কাঁদিতে থাকে। অনিলা কি দেখিতে পায় নাই? কে জানে কেমন করিয়া মেয়েকে একবিন্দু সান্ত্বনা দিবার ইচ্ছাও তাহার শুকাইয়া গেল। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে 'দুর্গা' উচ্চারণের সঙ্গে একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেলিয়া কোলের ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে।....

সুবোধ ঘোষ

আত্মজা

উপেনবাবুর ছেলে নেই, একথা তাঁরা সকলেই জানেন যাঁরা উপেনবাবুকে জানেন। সন্তান বলতে শুধু দুটি মেয়ে আছে উপেনবাবু।

নিকট আত্মীয় অথবা বন্ধুস্থানীয় যাঁরা উপেনবাবু সম্পর্কে আরও বেশি খবর রাখেন, তাঁরা জানেন যে, উপেনবাবুর মেয়ে হলো একটি এবং আর একটি হলো মেয়ের মতো।

রমা আর অম্বি। একটি হলো উপেনবাবুর আত্মজা, আর একটি হলো পালিতা। একটি মেয়ে এবং একটি মেয়ের মতো, এই দুই সন্তানকে নিয়ে সপত্নীক উপেনবাবু একটা বহু পর্যটনার সার্ভিস খাটতে খাটতে সারা ভারতের প্রায় অর্ধেক ভূখণ্ডের জল-বাতাস উপভোগ করে এখন কলকাতায় এসে অবসর উপভোগ করছেন। পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে পুরনো বস্তি ভেঙে যে নতুন পাড়াটা হয়েছে, তারই পাশে উপেনবাবুর নতুন বাড়ি।

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যাঁরা নবাগত উপেন পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন নি, তাঁরা অনুমান করেন, এই দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে। দু'জনেই মাথায় মাথায় সমান। দু'জনেই বেশ দেখতে, মুখের ধাঁচে দু'জনের মধ্যে কোনো পার্থক্যও দেখা যায় না। দু'জনেরই চোখ দুটো একই রকমের টানাটানা। তবে একজনের গায়ের রঙ মায়ের তুলনায় একটু কম ফরসা। কেমন একটা শ্যামলা ছায়া দিয়ে মাখানো রঙ। বয়স দু'জনের তো একেবারে সমানই মনে হয়, এবং স্বভাবও যে একই রকমের। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে সবচেয়ে নিন্দুক চক্ষুগুলিও দেখে খুশি হয়েছে, আলাপে আচরণে এবং চলায়-বলায় দুইজনেই বেশ শান্ত। যেমন লাজুক, তেমনি ভদ্র। এত মিল যখন, তখন এ'দুটি মেয়ে নিশ্চয় যমজ মেয়ে।

পরিচিত হবার পর প্রতিবেশিনীদের ভুল ভাঙে। উপেনবাবুর স্ত্রী চারুবালাই আগন্তুকা আলাপকারিণীর ভুল ভেঙে দেন।

চারুবালা বলেন—রমা হলো আমার মেয়ে, আর অম্বিকে আমার মেয়ের মতোই মনে করতে পারেন।

প্রতিবেশিনীদের কৌতূহল আর মুখের প্রশ্নগুলির সামনে রমা হাসিমুখে বসে থাকে, আর অম্বি মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে আনমনার মতো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি।

প্রতিবেশিনীর বললে—তাই বলুন! আমরা তো ভেবেই পেতুম না, দু'বোন হয়েও দু'জনের মধ্যে একটুও মিল নেই কেন।

রাজশাহীর পিসিমা প্রায় কুড়ি বছর পরে এলেন তাঁর ভাই উপুকে দেখতে।

রমা পিসিমার পায়ে হাত দিয়ে সামনে বসে থাকে, আর অম্বি পাখা হাতে নিয়ে পিসিমার মাথায় বাতাস দেয়।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—এটি কে রে উপু?

উপেনবাবু—ও হলো রমা, আমার মেয়ে।

পিসিমা—আর এটি কে?

উপেনবাবু—ওর নাম অম্বালিকা, আমার মেয়ের মতোই।

হঠাৎ ব্যথা পাওয়ার মতো অম্বির হাতটা চমকে ওঠে, হাতের পাখা তুলে মুখ ঢাকা দেয় অম্বি। কে জানে, নিজের পরিচয় শুনে এভাবে চমকে উঠে অম্বি, না ঐ পরিচয়টাকেই সহ্য করতে পারে না? কিংবা একটা অহেতুক লজ্জা? চারুবাবু জানেন, অম্বির এই বেয়াড়া অভ্যাস।

পিসিমা প্রশ্ন করেন—তোদের কাছেই মেয়েটা মানুষ হয়েছে বুঝি?

উপেনবাবু—হ্যাঁ।

পিসিমা—নামটা ওরকমের কেন?

উপেনবাবু—নামে কি আসে যায় বড়দি। মুখে একটা নাম চলে এলো, সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিলাম, ব্যস্।

এর বেশি কিছু আর বড়দিকে জানাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না উপেনবাবু। কাউকেই এর বেশি কিছু কোনোদিন বলেনও নি। উপেনবাবুর এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে প্রায় কুড়ি বছর আগের যে-ঘটনার ছবি তাঁর মনের মধ্যে চকিতে উঁকি দিয়ে চলে গেল, সে ঘটনা শুধু জানেন উপেনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী চারুবালা। অম্বালিকা, এই নামের ইতিহাসের সঙ্গে অম্বির জীবনেরই ইতিহাস মিশে রয়েছে। সে বড় পুরনো ইতিহাস, আজ সেটা নিছক একটা আষাঢ়ে কাহিনীর মতোই অবাস্তব বলে মনে হয়।

পূর্ব গোদাবরী জেলার ভিতর তখন যে নতুন রেল লাইন তৈরি করা শুরু হয়েছিল, তার তদারকের ভার ছিল রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুরই উপর। গোদাবরীর একটা শাখাস্রোতের ধারে রেল ইঞ্জিনিয়ারের বাংলো। কুলিরা মাস ছয়েক বয়সের একটি মেয়েকে নিয়ে এসে বাংলোর বারান্দায় শুইয়ে দিলো।

উপেনবাবু বিরক্ত হন—কার মেয়ে? এখানে কেন?

কুলিরা বলে—আপনার ট্রলিম্যানের মেয়ে।

উপেনবাবু—কোন্ ট্রলিম্যান? সেই ভাল্লুকে আঁচড়ানো মুখ, রোগা-মতন লোকটা?

কুলিরা—হাঁ সাব।

উপেনবাবু—সে কোথায়?

কুলিরা—কলেরায় মরেছে। ওর বউও মরেছে। দুজনকেই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু এই মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে; কিন্তু এটাকে তো আর ভাসিয়ে দেওয়া যায় না সাব।

উপেনবাবু—নিশ্চয় না, কিন্তু সব ঝামেলা আমার এখানে কেন? গাঁয়ের কোনো লোকের বাড়িতে ওকে রেখে দিয়ে এস।

কুলিরা আক্ষেপ করে—এ জাতের মেয়েকে এই গাঁয়ের কেউ ঘরে রাখবে না সাব।

উপেনবাবু চুপ করে থাকেন। একটা কুলি বলে—ওকে তো শেয়ালে টেনে নিয়েই যাচ্ছিল। যদি আমরা ঠিক সময় মতো না পৌঁছে যেতাম, তবে এতক্ষণে ওর....।

ঘরের ভিতরে দু'মাসের রমাকে আয়ার কোলে তুলে দিয়ে চারুবালা বাইরে বের হয়ে আসেন।—শেয়ালে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল? এই মেয়েকে?

কুলিরা বলে—হাঁ, মেমসাব।

চারুবালা বলে—মেয়েটা রইলো, তোমরা যাও।

কুলিরা চলে যায়, এবং আবার ঘরের ভিতরে এসে দু'মাসের রমাকে আয়ার কাছ থেকে নিজের কোলে নিয়ে চারুবালা বলেন—ঐ মেয়েটাকে এখনি গরম জল আর সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে একটা জামা পরিয়ে দাও আয়া।

কাজে বের হয়ে যান রেল ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবু। দশ মাইল দূরের অফিস তাঁবু থেকে ট্রলি করে ফিরে এসে যখন আবার এই বাংলো-বাড়ির বারান্দায় উঠলেন উপেনবাবু তখন রাত মন্দ হয় নি। বারান্দায় চেয়ারে বসে ধুলোমাখা বুটের ফিতা খুলতে খুলতেই চেঁচিয়ে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—মেয়েটা ঘুমিয়েছে নাকি?

চারুবালা—কোন্ মেয়েটা?

উপেনবাবু—ঐ যে, সেই মেয়েটা! আজ সকালে যে অম্বালিকাটি এসেছে।

চারুবালা—হ্যাঁ, দুধ খেয়ে আয়ার ঘরে ঘুমিয়ে আছে।

যেমন আকস্মিক মেয়েটার আবির্ভাব, তেমনি আকস্মিক মেয়েটার নামকরণ। প্রায় কুড়ি বছর আগে ঐ ছয় মাসের যে একটা প্রাণ শিয়ালেরও মুখ থেকে উদ্ধার পেয়ে রেল-ইঞ্জিনিয়ার উপেনবাবুর কোয়ার্টারের একটি ঘরে দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই প্রাণটাই আজ উপেনবাবুর নিজের মেয়ের মতো হয়ে গিয়েছে!

এই মেয়েকে নিজের মেয়ের মতো মনে করবার অথবা গড়ে তুলবার কোনো ইচ্ছা ছিল না উপেনবাবুর, চারুবালারও না। শুধু একটা প্রাণকে ক'টা দিন আশ্রয় দিয়ে আর খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা, এইমাত্র। থাকুক কিছুদিন। আর এক বছর পরেই তো এদিকের কাজ শেষ হবে, নতুন সার্ভের কাজে গঞ্জামে বদলি হয়ে চলে যাবার আগেই এই মেয়েকে ওরই জাতের একটা লোকের হাতে সঁপে দিয়ে এবং কিছু টাকা দিয়ে চলে গেলেই হবে।

এক বছর পরেই, বদলি হবার আগে খোঁজ খবর করায় মাইল দশেক দূরের এক গাঁ থেকে ক'জন জাতের লোকও এসেছিল। মাত্র পঞ্চাশটা টাকা পেলেই তারা সেই মেয়েকে মানুষ করবার ভার নিতে রাজি আছে।

ঘরের ভিতর থেকে চারুবালা বলেন—দূর কর, দূর কর। কোত্থেকে কতগুলো অলুক্ষণে আপদ এসে জুটেছে।

লোকগুলির দিকে ভ্রূকুটি করে উপেনবাবুও বলেন—আগে নিজেরা মানুষ হও, তারপর পরের মেয়েকে মানুষ করবে। চেয়ার থেকে উঠে সত্যসত্যই তাড়া দিলেন উপেনবাবু—ভাগো, ভাগো, ভাগো!

অমানুষগুলিকে তো ভাগিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু অম্বির মনুষ্যত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না করে পারেন নি উপেনবাবু, চারুবালাও। যদি এই মেয়ে এভাবে বড় হয়ে উঠতে থাকে, এবং যদি এভাবে কারও কাছে এ মেয়েকে তাঁরা ছেড়ে দিতে না পারতে থাকেন, তবে এই মেয়ের পরিণামই বা কি হবে? সমস্যাটা কল্পনা করতে পেরেছিলেন উপেনবাবু। এ মেয়ে তাহলে যে বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠবে।

কিন্তু বাড়ির মেয়ের মতো হয়ে উঠলে ক্ষতি কি? কিসের ভয়? এই প্রশ্নগুলিকেও দূরদর্শী উপেনবাবু বিচার করে দেখতে আর বুঝতে ভুলে যান নি।

ক্ষতি, মেয়েটারই ক্ষতি। মেয়েটার মনটা হয়ে যাবে এ-বাড়ির মেয়ের মন, অথচ বিয়ে দেবার জন্য খুঁজতে হবে এ-বাড়ির চেয়ে অনেক নীচের জাতের একটা বাড়ি। সে বাড়িকে তখন এই মেয়েটাই বা সহ্য করবে কেমন করে?

উপেনবাবু আর চারুবালার ক্ষতিটাই বা কি কম হবে? একটা মমতার ভুলে মেয়েটাকে যদি একেবারে বাড়ির মেয়ের মতো করে ফেলা হয়, তবে যার তার হাতে আর যে-সে মেয়েটাকে তুলে দিতেও যে মনটা কেমন কেমন করে উঠবে।

সতর্ক হয়েছিলেন, এবং একটা পরিকল্পনাও করেছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও সায় দিয়ে বলেছিলেন—তাই ভালো। গঞ্জামে থাকতে থাকতে একটা ব্যবস্থা করে ফেললেই হবে।

গঞ্জামে থাকতে থাকতেই কোনো একটা চাপরাশি বা ভেগুারের ছেলের সঙ্গে অম্বির বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। এই রকম শিশু বয়সেই তো এ জাতের বিয়ে হয়। শুধু খোঁজ করে বের করতে হবে, ভালো একটা ছেলের বাপ। খেটেখুটে খেয়েপরে আছে, এই রকম একটি শ্বশুরের হাতে অম্বির ভাগ্যকে সঁপে দিতে পারলেই দায়মুক্ত হওয়া যাবে। মোটামুটি এই ছিল উপেনবাবুর পরিকল্পনা।

আশ্চর্যের বিষয়, গঞ্জামের তিনটি বছরের মধ্যে একটি দিনও অম্বির জন্য পাত্র খুঁজবার চেষ্টা করেন নি উপেনবাবু। চারুবালাও স্মরণ করিয়ে দেন নি। গঞ্জাম থেকে বদলি হয়ে যাবার আগে উপেনবাবু বললেন—না, আর বেশি দেরি করা উচিত নয়। সাসারামে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। মেয়েটাকে আর বেশি ভদ্র করে তুলে লাভ নেই। বয়স অল্প থাকতে থাকতে আর মনটা পেকে উঠবার আগেই রেল-অফিসের কোনো ছোকরা পিওন-টিওনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলেই হবে।

চারুবালা বলেন—দিতেই হবে। একটু ভালো পণ দিলে ওরকম পাত্রও পেয়েই যাবে।

সাসারামের পাঁচ বছর কাটিয়ে দিয়ে ঝাঁসি যাবার সময় আক্ষেপ করলেন উপেনবাবু—এ তো বাড়ির মেয়ের মতোই হয়ে উঠছে দেখছি। এখন কি যে করি ভেবে পাচ্ছি না।

চারুবালা বলেন—রমার মাস্টার পড়াতে এলে দেখাদেখি অম্বিও আজকাল মাস্টারের সামনে গিয়ে বসতে আরম্ভ করেছে।

উপেনবাবু—কেন?

চারুবালা—লেখাপড়া শিখতে চায় অম্বি।

উপেনবাবু—না, না, কোনো লাভ নেই, মাস্টারকে আড়ালে বলে দিও, অম্বিকে যেন কিছু না শেখায়।

চারুবালা—আমি অম্বিকেই বারণ করে দিয়েছি।

উপেনবাবু—ভালো করেছ। একটু এ-বি-সি-ডি আর কবিতা শিখে লাভ তো কিছু নেই, উল্টে মেয়েটার না-এদিক না-ওদিক একটা অবস্থা হবে। মুটে মজুরের ঘরকে ঘেন্না করবে অথচ কোনো ভদ্রঘরে ঠাঁই পাবে না। সুতরাং...।

চারুবালা বলেন—ঝাঁসিতে থাকতে থাকতেই মেয়েটাকে পাত্রস্থ করার যাহোক একটা উপায় বের করতেই হবে।

•

বহু দূর অতীতের সে-সব চেষ্টার কাহিনী এখন অতীতের একটা স্মৃতি মাত্র। আজ দেখা যাচ্ছে, উপেনবাবু ও চারুবালার প্রত্যেকটি পবিকল্পনা যেন ব্যর্থ করেই বড় হয়ে উঠেছে অম্বি। যে মেয়েকে বাড়ির মেয়ের মতোও মনে করতে চান নি উপেনবাবু, সেই মেয়েই আজ তাঁর নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠেছে।

কিন্তু, ঐ মেয়ের-মতো পর্যন্তই। ব্যস্, আর না, আর বেশি নয়। অম্বিকে মানুষ করতে কবতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে যেন থেমে গিয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। কারণ, সমস্যাটা এসেই পড়েছে। রমার বিয়ে দিতে হবে, অম্বিরও বিয়ে দিতে হবে। ভয় হয়, অম্বিও যেন রমার মতো, অর্থাৎ লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোকের মতো শখ আর মন না পেয়ে যায়। রমার জন্য যেরকম পাত্র পাওয়া যাবে সেরকম পাত্র তো আর অম্বির জন্য পাওয়া যাবে না। অম্বির জীবনটাই যে একটা সমস্যা। জাত-পাত-জন্মের ইতিহাস নিয়ে একটা পরিচয় তো আছে অম্বির। আর পরিচয়টা তো সুবিধার নয়। সুতবাং কে বিয়ে করবে অম্বিকে, জাত-পাত শিক্ষা-দীক্ষা আর অবস্থার দিক দিয়ে একটু নীচু গোছের লোক ছাড়া? তাই এবার একটু বেশি কঠিনভাবেই সতর্ক হয়েছেন উপেনবাবু আর চারুবালা। যতই খাবাপ লাগুক, অম্বির মন আর মনের শখগুলিকে একটু নীচু করিয়েই রাখতে হবে।

বাইরের চোখে রমা ও অম্বির মধ্যে কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে না। কিন্তু মেয়ে আর মেয়ের মতো, এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, সেটা চোখে পড়বে তাদেরই, এ বাড়ির ভিতরে চোখ দিয়ে দেখবার সুযোগ যাদের আছে।

রমা লেখা-পড়া শিখেছে। কলেজে পড়ে। এই তো থার্ড ইয়ার চলেছে। ইংরাজীতে অনার্স

নিয়েছে। আর নিরক্ষরা অম্বি, কোনোকালেই লেখা-পড়া শেখে নি, শেখানোও হয় নি। ও শুধু বই-এর ছবি দেখে বইয়ের মর্ম বুঝতে চেষ্টা করে। তার বেশি কোনো সাধ্য নেই।

রমার কাছে উপেনবাবু ও চারুবালা হলেন বাবা ও মা। কিন্তু ঠিক একরকমের সম্বোধনের অধিকার পায় নি অম্বি। অম্বির কাছে উপেনবাবু হলেন আপ্পি এবং চারুবালা হলেন আম্মি। কে জানে কবে থেকে, বোধহয় গঞ্জাম থেকেই এই সম্বোধনের ইতিহাসের শুরু।

রমা শোয় চারুবালারই ঘরে, তাঁর পাশের খাটের বিছানায়। আর অম্বি শোয় পাশের ঘরের একটা খাটে, মাঝে একটা দেয়ালের ব্যবধান, যদিও দেওয়ালে একটা দরজা আছে এবং দরজাটা খোলাও থাকে।

এই মাত্র, এ ছাড়া রমাতে ও অম্বিতে আর কি পার্থক্য? কিছুই না।

পার্থক্য বলাও ঠিক নয়, বলা উচিত, সতর্কতার ছোট একটি প্রাচীর। বাপ-মা'র মন নামে কতকগুলি দুর্বলতা আর মমতা দিয়ে তৈরী একটা জগতের কোথায় যেন একটা ভয় আছে। তাই সতর্ক না থেকে পারেন না উপেনবাবু আর চারুবালা।

এখনো এক একদিন নিভৃতে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়, এবং আলোচনাটাও শেষ পর্যন্ত কথায় কথায় কি রকম যেন হয়ে যায়।

চারুবালা বলেন—সেই তো, সেই সমস্যাই দাঁড়াল। পরের মেয়ের নিজের মেয়ের মতো হয়ে উঠল, অথচ.. ।

উপেনবাবু—কি হলো?

চারুবালা—কে এখন বিয়ে করবে এই মুখ্যু মেয়েকে?

কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করেন উপেনবাবু। তারপর বলেন—ঠিকই বলেছ, সমস্যাই বটে। তবে, ধর, বাঙালী সমাজেরই মধ্যে যদি এমন ছেলে পাওয়া যায়, তাতে যাই হোক, লেখা-পড়া কিছু শিখেছে আর ছোটখাট চাকরি বা দেকানদারী করে খেয়েপরে থাকবার মতো রোজগারও করছে...।

চারুবালা—পাওয়া আর যাবে না কেন, খোঁজ করলেই পাওয়া যাবে।

উপেনবাবু—যদি ভালো পণও দেওয়া যায়...।

চারুবালা—তাহলে কোনো আপত্তিই করবে না। অম্বির মতো মেয়েকে খুশি হয়েই বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবে।

—কিন্তু। উপেনবাবু কেমন যেন একটু চেঁচিয়ে এবং রুক্ষস্বরেই বলেন। —কিন্তু অম্বি রাজি হবে কি?

চারুবালাও রাগ করে বলেন—তা, আমাব ওপর চোখ রাঙাচ্ছ কেন? দোষ তো তোমার। তুমিই ভুল করেছ; তাই।

উপেনবাবু—ভুল করেছ তুমি।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে থাকেন। তারপর দু'জনেই শান্ত হয়ে আর বেশ গম্ভীর হয়ে আলোচনা করতে করতে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত করে ফেলেন—যাতে রাজি হয় অম্বি, তাই করতে হবে। আর ভুল করলে চলবে না।

সত্যিই দেখা যাচ্ছে, আর ভুল করতে চান না চারুবালা আর উপেনবাবু। এবার থেকে তাঁরা দু'জনেই আরও বেশি সর্তক হয়েছেন।

কারণ, সেই সমস্যাটা এতদিনে এসে পড়েছে। রমার আর অম্বির বিয়ের জন্য ভাবতে হচ্ছে। রমাকে নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, বিয়ের খোঁজ-খবর চেষ্টা করলেই করা যাচ্ছে। কিন্তু অম্বির জন্যে যে কোনো চেষ্টাও করা যাচ্ছে না। আগে অনেক ভুল করলেও অম্বিও এইবার যেন বুঝতে পেরেছে, আর ভুল করা চলবে না। সতর্ক হয়েছে অম্বিও। এখন তো সে আর গঞ্জামের সেই চার বছর বয়সের একটা জেদী অবুঝ আর আবদেরে মেয়ে নয়। কুড়ি বছর বয়সের টানা-টানা দু'টি চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে আজ আপ্পি আর আম্মির মনের সমস্যাটাকে সহজেই বুঝতে পারে।

উপেনবাবু ডাকেন—অম্বি।

অম্বি উত্তর দেয়—যাই আপ্পি।

উপেনবাবু—রমা আর তুই তৈরী হয়ে নে তাড়াতাড়ি। পরেশনাথ মন্দিরে আরতি দেখতে যাব।

বের হবার আগে অম্বির সাজসজ্জার রূপ আর রকম দেখে রমা ভ্রূকুটি করে—এ কি একটা বাজে শাড়ি পরে বের হচ্চিস? কানপাশা দুটো খুলে রাখলি কেন?

অম্বি বলে—ঠিক আছে। তুই বাজে বকিস্ না।

উপেনবাবু আর চারুবালা তাকিয়ে তাকিয়ে সবই দেখতে পান এবং কানেও সব শুনতে পান। কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করেন না। যেন এটাই তাঁদের ইচ্ছা। অম্বিকে একটা বাজে শাড়ি পরিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিতে তাঁদের আপত্তি নেই। উপেনবাবু অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নেন, আর চারুবালা অন্য একটা দরকারের কথা ব্যস্তভাবে ঘোষণা করেন—ফেরবার পথে একটা নতুন পঞ্জিকা কিনে আনবে, ভুলে যেও না যেন।

পঞ্জিকা কিনতে সেদিন ভুলেই গেলেন উপেনবাবু এবং ঘরে ফিরে হাতমুখ না ধুয়ে চুপ করে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। চারুবালা জিজ্ঞাসা করেন—কি হলো?

উপেনবাবু কিরকম বিদ্রূপের সুরে গম্ভীরভাবে বলেন—দেখা হলো তোমার ছোটমামার সঙ্গে?

চারুবালা—কি বললেন ছোটমামা?

—রমাকে দেখেই বললেন, এইটিই বুঝি তোমার সেই পালিতা মেয়ে?

চারুবালার কণ্ঠস্বরও তিক্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু ওভাবে বাঁকা করে কথা শুনিয়ে আমাকে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?

উপেনবাবু অন্যমনস্কের মতো বলতে থাকেন— ছোটমামার কথা শুনে অম্বি তো হেসে কুটি-কুটি। সারা রাস্তাটাই হাসতে হাসতে এসেছে, বোধহয় এখনো হাসছে।

বলতে বলতে উপেনবাবু গম্ভীর মুখটাই শুকনো হাসি হেসে ফেলে। উপেনবাবু হাত মুখ ধুতে চলে যান। চারুবালা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন। মনে হয়, ছোটমামার প্রশ্নটা সত্যিই একটা কঠিন বিদ্রূপ। কিন্তু তারচেয়ে বড় বিদ্রূপ বলে মনে হয়, অম্বির ঐ হাসি। এবং এই বিদ্রূপ মনে মনে সহ্য করতে গিয়ে অম্বির উপর মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কিন্তু বেশী দুশ্চিন্তা করতে হয় না চারুবালাকে, উপেনবাবুকেও না। কারণ, অম্বিই সতর্ক হয়ে যায়।

বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের মেলামেশার আসরও এক একদিন বেশ জমে ওঠে। রমা গান গায়। এলাহাবাদে থাকতেই গানের মাস্টারের কাছে সুর সেধে গলা মিষ্টি করেছে রমা। রমার গান শুনে সকলেই প্রশংসা করে—বেশ গান, বেশ গলা।

আর, অম্বি যেন ঘুরে বেড়ায় এই গানের আশেপাশে। গানের কাছে আসতে চায় না। গানের স্বরলিপি বইটা রমার কাছে এনে দিয়েই সরে যায়। একটু দাঁড়িয়ে গান শোনে, তার পরেই আরও দূরে সরে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে থাকে।

রমা হঠাৎ বলে ফেলে—অম্বিও তো গাইতে পারে।

আতঙ্কিতের মতো এক দৌড় দিয়ে অন্য ঘরে পালিয়ে যায় অম্বি, রমার ডাকাডাকি শুনতে পেয়েও এমুখো হয় না।

আত্মীয়-স্বজনের মেলা ভাঙবার পর ভিতরের বারান্দায় একদিকে চুপ করে বসে থাকেন উপেনবাবু। কাছে এসে বসেন চারুবালা। শোনা যায়, পাশের ঘরে একটা মুখচোরা সঙ্গীত যেন ভয়ে ভয়ে বাতাসের কাঁপন এড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গান গাইছে অম্বি।

উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করে—এলাহাবাদে থাকতে গানের মাস্টারের কাছে অম্বিও কি গান শিখেছিল?

চারুবালা বললেন—না।

উপেনবাবু বড় করুণভাবে হাসতে থাকেন—এটা আবার কিরকমের একটা ব্যাপার হলো? শেখানো হলো না, তবুও শিখল!

উত্তর দেন না চারুবালা। শুধু বুঝতে পারেন তাঁদের কথাবার্তার সাড়া পেয়ে মুখচোরা সঙ্গীতটা চুপ করে গিয়েছে, গান বন্ধ করে দিয়েছে অম্বি।

অম্বির এইসব সতর্কতা দেখে একটু খুশিও হন উপেনবাবু, চারুবালাও।

সেদিন দুপুরবেলা ভাঁড়ার ঘরের ভিতর হতে বিস্মিত হয়েই ডাক দিলেন চারুবালা।—অম্বি অম্বি।

—যাই আম্মি।

অম্বি কাছে এসে দাঁড়াতেই এক গাদা লেস হাতে তুলে নিয়ে চারুবালা বললেন—একি? এগুলি বুনলো কে? তোরেই কীর্তি নিশ্চয়।

—হ্যাঁ।

—তোকে কে শিখিয়েছে এসব বুনতে? রমা?

—না।

—রমার দেখাদেখি শিখেছিস?

—হ্যাঁ।

—কি দরকার তোর এসব শিখে আর মিছিমিছি সময় নষ্ট করে?

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কিন্তু এই সব শিশি-বোতলের পেছনে এগুলি লুকিয়ে রেখেছিস কেন? নিয়ে যায়।

লেসের গাদা হাতে নিয়ে নিজের ঘরের খাটের কাছে এসে দাঁড়ায় অম্বি। এ লেস সহ্য করতে পারল না আম্মি, ভাবতে গিয়ে অম্বির চোখ দুটো একবার চিকচিক করে ওঠে। এই তো সেদিন আম্মি নিজের হাতে রমার হাতের তৈরী লেস নিয়ে পাশের বাড়ির বৌদিকে দেখাচ্ছিলেন। থাক্ সে কথা। লুকিয়ে রাখতেই তো চেয়েছিল অম্বি। কিন্তু লুকোবার মতো জায়গা কই?

সামনের আলমারিটার মাথার উপর লেসের গাদা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে অম্বি। বুঝতে পারে অম্বি, আরও বেশি সতর্ক হতে হবে।

আপ্পি ও আম্মির সতর্কতা দেখে দুঃখ করে না অম্বি। এসবের জন্য কোনো ভাবনা নেই অম্বির মনে। আপ্পি আর আম্মিকে সুখী করবার জন্য দুটো কানপাশা খুলে রাখতে, আর সব গান ও লেস লুকিয়ে রাখতে কষ্ট হলেও এমন কি কষ্ট? ও ছাই কষ্ট খুব সহ্য করা যায়।

কিন্তু একটা ভয় অম্বির ভাবনাগুলিকে মাঝে মাঝে অস্থির করে তোলে। বিছানার উপর শুয়ে ছটফট করতে করতে কেঁদেই ফেলে অম্বি। কি হবে উপায়, আপ্পি আর আম্মি যদি একদিন বলে ফেলেন—তুই আর নিজের হাতে খাবার জল-টল আমাদের দিস না অম্বি!

বাজার থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে চেয়ারের উপর বসবার পর আপ্পি যদি একদিন বলেই দেন—থাক, তোর পাখার বাতাসে আর দরকার নেই , অম্বির এই হাত দুটো যে তাহলে চিরকালের মতো অসাড় হয়ে যাবে।

সেই যে কবে, স্মৃতি হাতড়ে খুঁজতে থাকে অম্বি, সেই যে বেরিলিতে থাকতে অসুখের সময় অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন আম্মি তারপর আর কই? ভাবতে গিয়ে অম্বির মাথাটাই যে তৃষ্ণার্ত হয়ে বালিশের এপাশে আর ওপাশে আশ্রয় খুঁজতে থাকে। কিন্তু এটা তো অম্বির জীবনের ভয় নয়। এটা দুঃখ বলা যেতে পারে এবং সে দুঃখ গোপন করার মতো শক্তি আছে অম্বির।

ভয় হলো সেই ভয়। আম্মির যখন মাথা ধরবে, আর আম্মির মাথা টিপে দেবার জন্য যখন হাত বাড়াবে অম্বি, তখন যদি আম্মি মাথা সরিয়ে নিয়ে আপত্তি করে বলে ফেলে – সর সর, তোর হাতের সেবার দরকার নেই! তবে কি হবে উপায়? আপ্পি ও আম্মির গা ছুঁয়ে থাকবার অধিকারও যদি একদিন বন্ধ হয়ে যায়, তবে সে দুঃখ গোপন করার মতো মনের জোর থাকবে তো?

কেন থাকবে না? একটু শান্ত হয়ে ভাবতে থাকে অম্বি। তা হলেও সহ্য করতে হবে, আর আপ্পি ও আম্মি যেন একটুও বুঝতে না পারেন, কত কষ্টে সহ্য করেছে অম্বি সেই দুঃখকে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসে অম্বি। কাজ করতে হবে। কিন্তু কোন্ কাজ? রমার সঙ্গে যেন কোনো তুলনার মধ্যে না পড়তে হয়, সেই সব কাজ। রমা যেসব কাজ করে না, সেই সব কাজেই এই হাত দুটোকে এবার উৎসর্গ করে দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয় অম্বি। রমা থাক লেখাপড়া গান আর

লেস নিয়ে। আর অম্বি থাকবে শুধু...ঐ তো দেখা যায় আম্বির জুতোগুলিতে একেবারেই পালিশ নেই। মনে পড়ে, ঝিয়ের হাতের কাচা কাপড় দেখে একটুও খুশি হন না আম্মি।

বিছানা থেকে উঠে কাজে মন দেয় অম্বি। এ ঘর থেকে অন্য ঘর ঘুরে ঘুরে হাত দুটোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে আর কাপড় কাচিয়ে যেন জীবনের সেই ভয়টাকে একেবারে ক্লান্ত করে দিতে থাকে অম্বি।

উপেনবাবু বললেন—ভাবতে ভালোও লাগছে; আবার আর একদিকে মনটা খারাপও লাগছে।

চারুবালা—কেন?

উপেনবাবু—রমার সঙ্গে অধীরের বিয়ের জন্য যদি প্রস্তাব করি, তবে অধীর আপত্তি করবে না বলেই মনে হচ্ছে।

চারুবালা—আমারও তাই মনে হয়।

উপেনবাবু—রমাকে নিয়ে তো আর সমস্যা নেই। কথা হলো, তারপর অম্বির জন্য কি উপায় হবে? সেই জন্যই মনটা খারাপ লাগছে।

সম্পর্কে উপেনবাবুদের আত্মীয়ই হয় অধীর, এবং খুব বেশি দূরের সম্পর্কও নয়। বেশ ভালো ছেলে। গণিতের এম.এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, এবং এক বীমা কোম্পানীতে আজ এক বছর হলো ভালো মাইনের একটা কাজও পেয়ে গিয়েছে। অধীরের খুড়িমাও এসে বলে গিয়েছেন—ভালো পাত্রী পেলে, এইবার ছেলেটাকে সংসারে বসিয়ে একবার কেদার-বদরী ঘুরে আসতেন।

এর মধ্যে অধীরও কয়েকবার এসেছে, পণ্ডিতিয়ার পশ্চিমে এই নতুন বাড়িতে। উপেনবাবু আর চারুবালার সঙ্গে গল্প করে চলে গিয়েছে অধীর। একটু তফাতে একটা সোফার উপর পাশাপাশি বসে গল্প শুনছে রমা ও অম্বি।

উপেনবাবু বলেছেন—ঐ, ওদের মধ্যে ঐটি হলো আমর মেয়ে রমা, আর ঐটি হলো অম্বি, আমার মেয়ের মতোই।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায় অম্বি, যেন নির্মম এক বিদ্রূপের আঘাত ওর মুখের রং মুহূর্তের মধ্যে কালো করে দিয়েছে।

একদিন এসে, কলেজ ম্যাগাজিনে লেখা রমার একটা প্রবন্ধের খুবই প্রশংসা করে অধীর। সুন্দর ভাষা এবং ইংরেজী কবিতা সম্বন্ধে এই সব নতুন নতুন কথা এত ভালো করে গুছিয়ে যে বলতে পারে, তাঁর মনে ও মনের সুরুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না।

প্রশংসা শুনে রমা লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। উপেনবাবু ও চারুবালার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে। উপেনবাবু বলেন— রমার গান তো তুমি এখনো শোন নি অধীর!

অধীর বলে—হ্যাঁ, একদিন এসে শুনতেই হবে।

অম্বি রমার কানে-কানে কি যেন বলে। চারুবালা ও উপেনবাবু দু'জনেই উদ্বিগ্নভাবে ও ব্যস্তভাবে বলেন—কি? কি শেখাচ্ছে অম্বি?

রমা লজ্জিতভাবে বলে—এখনি গাইতে বলছে। কিন্তু...।

অধীর বলে—না, না, এত তাড়াহুড়োর কি আছে! আর একদিন হবে।

অধীর চলে যাবার পর চারুবালা অম্বিকে বলেন—বাইরের লোকের সামনে ছেলেমানুষি করিস না অম্বি।

দিন পার হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। ভাদ্রটা তো পার হতেই চললো। ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন উপেনবাবু আর চারুবালা। এইবার প্রস্তাবটা করে ফেলতেই হয়। অধীরের খুড়ীমাকে হয় একবার নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে, নয় তো নিজেরাই গিয়ে...।

ট্যাক্সির হর্ণের শব্দে ফটকের দিকে তাকাতেই দেখা যায়, অধীরের খুড়িমা ধীরে ধীরে আসছেন।

উপেনবাবু উল্লাসের সুরেই বলেন। আপনার কথা চিন্তা করা মাত্র যখন আপনি এসে গিয়েছেন, তখন বুঝছি নিশ্চয় সুসংবাদ আছে।

খুড়িমা হাসেন—হ্যাঁ সুসংবাদ আছে। ছেলে বিয়ে করবে, পাত্রীও সে পছন্দ করে ফেলেছে। এখন তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলেই...।

আকস্মিক আনন্দে বিচলিত হয়ে চারুবালা বলেন—কোনোই আপত্তি নেই. তবে উনি চাইছিলেন, পরীক্ষাটা হয়ে যাবার পরে কোনো তারিখে যদি বিয়ের দিন....

খুড়িমা—কার পরীক্ষা?

চারুবালা—রমার।

খুড়িমা বলেন—কি হলো? তোমাদের দিক থেকে কি কোনো অসুবিধা নেই!

চারুবালা চেঁচিয়ে ওঠেন—অম্বি?

উপেনবাবু প্রশ্ন করেন—আপনি কি অম্বির কথা বলছেন?

খুড়িমা—হ্যাঁ, অম্বিকেই তো বিয়ে করতে চায় অধীর।

নীরব হয়ে গেলেন উপেনবাবু ও চারুবালা।

খুড়িমা বলেন—কি হলো? তোমাদের দিক থেকে কি কোনো অসুবিধা আছে?

উপেনবাবু বলেন—না, আমাদের আর অসুবিধা কি? কিন্তু...।

খুড়িমা—আমিও কিন্তু কিন্তু করছিলাম, কিন্তু ছেলে সে-সব আপত্তি শুনতে চায় না।

উপেনবাবু বলেন—কার মেয়ে, আর কি জাতের মেয়ে, সে-সব কথা অধীর যদি জানতে পেত, তবে বোধহয়..।

খুড়িমা—জানতে চাই না। আমি কি আর কথাটা তুলি নি মনে করেছ?

কিছু বললেই বলে, এখন তো অম্বি উপেনবাবুরই মেয়ে।

চমকে ওঠেন দু'জনেই। বোবার মতো তাকিয়ে থাকেন উপেনবাবু।

চারুবালা বলেন—অম্বি যে লেখা-পড়া কিছুই শেখে নি।

খুড়িমা—তাও জানি, আর ছেলেও সব শুনেছে। তবু...।

কি কঠিন ও নির্মম খুড়িমার মুখের এই কথাটা—তবুও। উপেনবাবু ও চারুবালার সারা-জীবনের সতর্কতার সাধনা ব্যর্থ করে আর মিথ্যা করে দিয়ে সংসারে একটা ভয়ংকর তবুও জেগে উঠেছে। তাঁদের সব সঙ্কল্প ও পরিকল্পনার পিছনে একটা বিদ্রূপের অম্বি যেন কুড়ি বছর ধরে আক্রোশ নিয়ে ছুটে ছুটে এসে এতক্ষণে চরিতার্থ হয়েছে।

চারুবালা খুড়িমার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমাদের কোনোই আপত্তি নেই, অম্বি যদি আপত্তি না করে।

খুড়িমা উঠলেন—তাহলে তাই কর, অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে তারপর খবর দিও।

চলে গেলেন খুড়িমা।

বার বার মনে পড়ে খুড়িমার মুখের ঐ ভয়ানক কথাটা—তবুও। উপেনবাবুব মনের সব ভাবনা যেন ভয় পেয়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। এত বাধা এত নিষেধ, তবুও। এত সতর্কতা, তবুও আজ কুড়ি বছর ধরে সব অরণ্যের বাধা ভেদ করে আর পাহাড়ের বাধা ছাপিয়ে গোদাবরীর সেই শাখাস্রোতের আত্মাটা ছুটে এসেছে, কেউ তার গতি রোধ করতে পারে নি।

—এ কি করে সম্ভব হয়। করুণ আক্ষেপের মতো উপেনবাবুর কথাগুলি কাঁপতে থাকে।

চারুবালা গম্ভীরভাবে বলেন—কি?

উপেনবাবু—এই যে রমাকে পছন্দ না করে অম্বিকে পছন্দ করল অধীর!

চারুবালা—জানে তোমার ভগবান, আমি এ ছাই অনাসৃষ্টির কিছু বুঝি না।

—তাহলে কি...? কথাটা সমাপ্ত না করেই নীরব হয়ে রইলেন উপেনবাবু। যেন বিরাট একটা প্রশ্ন ভূমিকম্পের মতো তাঁর মনেব অতলেব ঢেউগুলিকে ছন্দহারা করে দিয়েছে। তাহলে কি রূপ গুণ কুল মান ও শিক্ষা ছাড়াও এবং এসবের উপরেও কিছু আছে? কুয়াশামাখা সূর্যের মতো রহস্যময় একটা কিছু। নইলে রমাকে পছন্দ না করে অম্বিকে পছন্দ করে, এ কোন্ প্রেমের চক্ষু?

জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে উপেনবাবু বলেন—যাক্, এসব ফিলসফি চিন্তা করে আর কোনো লাভ নেই। অম্বিকে জিজ্ঞাসা করে অধীরের খুড়িমাকে একটা চিঠি পাঠিয়ে দাও। লেঠা চুকে যাক্।

চারুবালা—অম্বিকে জিজ্ঞাসা করবার আর দরকারই বা কি? রাজি তো হয়েই আছে। এই কাণ্ডটি করবার জন্যই বোধহয় এ বাড়িতে মেয়ের মতো হয়ে ঢুকেছিল। খুব শিক্ষা দিলো অম্বি। শত্রুতেও যেন আর পরের মেয়েকে আপন মেয়ের মতো করে না পোষে।

চারুবালার ক্ষোভ যেন থামতে চায় না। উপেনবাবুও শুকনো হাসি হেসে বলতে থাকেন—কি অদ্ভুত অদৃষ্ট! নিজেরই মেয়ের মতো, তবু ওর বিয়ের কথা শুনে আনন্দ করতে পারছি না।

চারুবালা বলেন—বেরিলিতে থাকতে নিউমোনিয়া করে যে অম্বি আমাকে একটা মাস রাত জাগিয়ে হাড় মাস কালি করে দিয়েছিল, সেই অম্বিই কি না আজ....

বোধহয় বলতে চান চারুবালা, সেই অম্বিই আজ তার আপ্পি ও আম্মির স্নেহমমতার ঋণ শোধ দিলো এইভাবে? এই রকম অপমান করে আর সব সতর্ক পরিকল্পনা মিথ্যা করে দিয়ে?

আরও স্পষ্ট করে এবং হিসাব করে আজ উপেনবাবু অনুভব করতে পারছেন—আজ এই প্রথম নয়; সেই গঞ্জাম থেকেই শুরু হয়েছে অম্বির জয়ের আর তাঁদের পরাজয়ের ইতিহাস। পরাজয়টা শুধু এতদিনে চরমে এসে পৌঁছেছে। মেয়ের মতো হয়েও অম্বি আজ কি জানি কিসের গর্বে তাঁদের নিজের মেয়েকে ছোট করে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সহ্য করতে কষ্ট হয়, ভাবতেও ভালো লাগে না। উপেনবাবু ার চারুবালার এই কুড়ি বছরের যত স্নেহ ও মমতার সব শ্রী ও গৌরব চূর্ণ করে দিলো অম্বি।

—যাক অনেক ভুল হয়েছে, আর ভুল করতে চাই না! উপেনবাবু বেড়াতে বের হবার জন্য চাদর কাঁধে তুলে নিয়ে তাঁর শেষ সতর্কতার সংকল্প ব্যক্ত করেন—যাক্, পরের মেয়েকে কুড়ি বছর ধরে পোষা আর নিজের মেয়ের মতো মনে করাই ভুল হয়েছে! এখন ভালোয় ভালোর পরকে পরের মতোই বিদায় করে দাও।

সবে মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত ও বিষণ্ণ উপেনবাবু বারান্দার উপর আরাম-চেয়ারে শুয়েছিলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন। পাশের ঘরের ভিতরে লুকিয়ে থেকে একটা করুণ শব্দ যেন বোবা হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! এ তো সেদিনের সেই মুখচোরা গানের শব্দ নয়, মুখচোরা কান্নার শব্দ।

ব্যস্তভাবে চারুবালাকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন উপেনবাবু—কাঁদছে কেন অম্বি?

চারুবালা—ও কাঁদছে ওর মনের শখে, আমি কি করব বলো?

উপেনবাবু—বিয়ের কথা বলেছ ওকে?

চারুবালা—হ্যাঁ!

উপেনবাবু—কি বললে অম্বি?

চারুবালা—ঐ তো শুনতে পাচ্ছ, যা বলছে।

উপেনবাবু—এ তো কাঁদছে শুধু। হাঁ-না কিছু বলে নি?

চারুবালা—না, কোনো কথা বলে নি।

উপেনবাবু—তার মানে হলো, রাজি আছে।

চারুবালা অপ্রসন্নভাবেই বলেন—তাই তো, রাজি না হবার কি আছে?

অস্বস্তি বোধ করছিলেন, এবং বিচলিতভাবে নিঃশ্বাসও ফেলছিলেন উপেনবাবু। চারুবালাও থেকে থেকে ছটফট করে উঠছিলেন। কিন্তু না, আর না, মনের দুয়ার বন্ধ করে এইবার বেশ একটু শক্ত হয়েই বসেছেন দু'জনেই। আর ভুল নয়। যে মেয়ে নিজের মেয়ে নয়, মেয়ের মতোও নয়, একেবারে আস্ত একটা পরের মেয়ে, তার কান্নার কাছে নিজেদের দুর্বল করে ফেলতে চান না উপেনবাবু আর চারুবালা।

—আপ্পি! দরজা খুলে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে একটা পাখা হাতে নিয়ে উপেনবাবুর সামনে এসে দাঁড়ায় অম্বি। উপেনবাবুর ক্লান্ত শরীরের উপর বাতাস দেবার জন্য পাখা তুলতেই উপেনবাবু বলেন—থাক, পাখা রেখে দিয়ে বোস।

চমকে ওঠে অম্বির হাত। অম্বির হাতের পাখা মেঝের উপর পড়ে গিয়ে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে। উপেনবাবুর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। এতদিনের সেই ভয়ের চাবুকটা এসে এইবার সত্যিই অম্বির মনের সব কল্পনাকে একটি আঘাতেই একেবারে বিমূঢ় করে দিয়েছে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অম্বি। যেন সহ্য করার শক্তি খুঁজছে অম্বি। আপ্পি আর আম্মি যেন কিছুতেই বুঝতে না পারেন, অম্বির মনের ভিতর কোনো দুঃখ অভিযোগ আর বিদ্রোহ আছে।

অম্বিই দেখে আশ্চর্য হয়, আর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, আপ্পি আর আম্মি বসে রয়েছেন মুখ করুণ করে, যেন দুটো শিশুর মুখ। কেউ যেন দু'জনকে অসহায়ের মতো ফেলে রেখে আর ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই অভিমান।

উপেনবাবুর গায়ের উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অম্বি। উপেনবাবুর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে অম্বি বলে—আমায় বিয়ে দিও না আপ্পি।

উপেনবাবু—সে কি কথা!

অম্বি বলে—আমাকে পরের বাড়ি পাঠিও না। আমি চিরকাল এখানেই থাকব। যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন আমিও বেঁচে থাকব।

চারুবালা বলেন—আবোল-তাবোল কথা বন্ধ করে শান্ত হয়ে বস অম্বি।

অশান্ত, দুঃ:, শার অবুঝ মেয়ের মতো চিৎকার করে বলতে থাকে অম্বি।—আমার বিয়ে হবে, রমারও বিয়ে হবে, তারপর তোমাদের দেখবার জন্যে থাকবে কে? আমি বিয়ে করব না আম্মি।

চমকে ওঠেন উপেনবাবু আর চারুবালা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। একি বলে অম্বি, পূর্ব গোদাবরীর একটা পাতার ঘরের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনা আর শেয়ালের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনা অতি অন্ত্যজ একটা পরের মেয়ের প্রাণ? এসব কথা কি একটা মেয়ের মতো মেয়ের প্রাণের উদ্বেগ? না, মেয়ের-চেয়ে-বড় একটা সত্তার ব্যাকুলতা?

চারুবালা বলেন—সে চিন্তা তোর কেন অম্বি?

অম্বি—চিন্তা না করে পারছি না আম্মি।

উপেনবাবু বিচলিতভাবে বলেন—হেসে হেসে কথা বল অম্বি, নইলে আমি তোর কোনো কথাই শুনব না।

অম্বি—হাসতে পারছি না আপ্পি। আমি যে তোমাদের...।

চুপ করে অম্বি। ঘরের অন্তরাত্মা যেন ক্ষণিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে দু'কান সজাগ রেখে একটা কথা শুনবার প্রতীক্ষায় রয়েছে, যে কথা আজ পর্যন্ত অম্বির মুখে কোনোদিন শোনা যায় নি।

অম্বি বলে—আমি তো তোমাদের ছেলের মতোই। চিরকাল তোমাদের কাছেই থাকব।

বুকের ভিতরে যেন একটা ধাক্কা লেগেছে, আবার চমকে ওঠেন উপেনবাবু ও চারুবালা। কুড়ি বছরের একটা নীরব বিদ্রোহ, একটা শান্ত অভিমান যেন এতদিনে মুখ খুলে ফেলেছে।

—আমাকে কথা দাও আম্মি। চারুবালার একটা হাত শক্ত করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চারুবালার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অম্বি। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে অম্বির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন চারুবালা।

অম্বির দিকে চকিতে একবার তাকিয়েই চোখ বন্ধ করলেন উপেনবাবু। আকস্মাৎ একটা বিস্ময়ের ঝড় এসে যেন তাঁর মনের যত ভুলের আবর্জনা উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। মেয়ের-মতো তো নয়, তাঁদের আত্মারই মতো এই মেয়েটা আজ বিশ বছর ধরে তাঁদের সব ভুলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে। পরাজয় সম্পূর্ণ হলো এতদিনে, এবং এই পরাজয়েও এত আনন্দ ছিল?

গলার স্বরের কাঁপুনি সংযত করে আস্তে আস্তে উপেনবাবু বলেন—তোর বিয়ে না দিয়ে পারব না অম্বি, তুই তো আমাদেরই. ।

চেঁচিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে অম্বি—বলো না, আর ওকথা বলো না আপ্পি। সহ্য করতে পারি না।

হেসে ফেলেন উপেনবাবু।—তুই তো আমাদেরই মেয়ে।

ঘরের বাতাস কয়েক মিনিট একেবারে নিস্তব্ধ হয়েই থাকে। চারুবালার কাঁধের উপর মুখ গুঁজে দিয়ে একেবারে শান্ত হয়ে বসে থাকে অম্বি। যেন বিশ বছরের একটা অভিযোগ এতদিনে শান্ত হলো।

উপেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে চারুবালা বললেন—অধীরের খুড়িমাকে কালই চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে, তারপর...।

চারুবালার কথা শেষ না হতেই ফুঁপিয়ে ওঠে অম্বি।—আম্মি!

উপেনবাবু আর চারুবালা এক সঙ্গেই বিচলিতস্বরে বলতে থাকেন।—ছি-ছি, ওরকম করতে নেই অম্বি। সব মেয়েরেই বিয়ে হয়, আর বাপমাকে ছেড়ে থাকতেও হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

নিঃশব্দ নায়ক

কাঁঠাল খেতে খুব ভালবাসে সুহাসিনী। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তে এঘরে-ওঘরে যখন পাকা কাঁঠাল আসতে আরম্ভ করে তখন সুহাসিনীর রসনা সজল হয়ে ওঠে বললে সবটা বলা হয় না, কেমন উত্তেজিত হয়ে পড়ে মানুষটা। ফ্যাকাশে চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে, একটা অস্বাভাবিক চাকচিক্যও দেখা যায় তার চোখে, জোরে জোরে শ্বাস টানতে আরম্ভ করে, ছটফটও করতে থাকে খুব। চোখে কিছু দেখতে না পেলেও এদিক ওদিক তাকায়—বলতে কি তখন সুহাসিনীর ঐ অবস্থা দেখলে যে-কেউ ধরে নিতে পারে সুহাসিনী বুঝি তার প্রেমিকের গলার শব্দ শুনল। প্রেমিক—যারা সুহাসিনীকে জানে, যারা তাকে বরাবর দেখে আসছে, তারা অবশ্য কথাটা শুনলে ঠোঁট টিপে হাসবে। তা হলেও, পাকা কাঁঠালের গন্ধ নাকে লাগলেই সুহাসিনীর এমন বেসামাল অবস্থা উপস্থিত হয়। এত ভালবাসে সে কাঁঠাল, এত প্রিয় তার কাঁঠালের গন্ধ।

তেমনি আনারস। পাকা আনারসের গন্ধ কম চড়া না। কারো ঘরে আনারস এল কিনা সুহাসিনী নিজের ঘরে বসে টের পায়। আর টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুহাসিনীর জিভে জল আসে। আনারসও সুহাসিনীর প্রিয়। তেমনি পাকা কলা পাকা আম। বা চৈত্র মাসে যদি কেউ ফুটি নিয়ে আসে। বাড়িতে হয়তো আনল না। পাশের গলি দিয়ে কোন ফেরিওয়ালা যদি পাকা ফুটির ঝুড়ি মাথায় করে কোনরকম হাঁক-ডাক না করেও চলে যায় তো, আর কেউ বলতে না পারুক, সুহাসিনী ঠিক বলে দেবে, ফুটি নিয়ে যাচ্ছে। ফুটি, আপেল, আঙ্গুর, ন্যাসপাতি যা-ই লোকটা নিয়ে যাক।

অবশ্য পাকা আম-কাঁঠালের মতন ফুটির মতন আঙ্গুর বা ন্যাসপাতি তেমন একটা চড়া গন্ধ ছড়ায় না। তবু ফুলের একটা গন্ধ আছে তো। আর সেই গন্ধ সুহাসিনীর নাকে লাগবেই। এত তীব্র তার নাক, এত প্রখর তার ঘ্রাণশক্তি।

এবার মাছের কথায় আসা যাক। কোন ঘরে ইলিশমাছ রান্না হচ্ছে টের পেলেও সুহাসিনী কম ছটফট করে না। ইলিশ বা চিংড়িমাছ। রান্না চাপালে দুটোর গন্ধই বাড়ি মাত করে। আর সবচেয়ে বেশি মাতাল হয় সুহাসিনী। যেন প্রেমিকের গলার আওয়াজ পাওয়ার মতন—ইলিশ চিংড়ির গন্ধ তার মগজের ভিতর ঢুকে তাকে অস্থির উন্মনা করে তোলে।

অবশ্য সব মাছেরই গন্ধ আছে। বস্তি-বাড়ি। লাগালাগি ঘর। এক ঘরে ইলিশ আসে, আর এক ঘরে হয়তো চুনোমাছ রান্না হয়। সুহাসিনী ঠিক টের পাবে। শোল বোয়াল রান্না হলেও সুহাসিনী বলে দিতে পারে।

মোট কথা, গন্ধটাই তার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গন্ধের মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে সে যত বেশি অনুভব করে, একটা কিছুর গন্ধ তার ইন্দ্রিয়কে যত বেশি সজাগ সচেতন করে তোলে তেমন আর কিছু না।

এই জন্যই পাকা কাঁঠালের কথা বলা হল, ইলিশ মাছের কথা বলা হল। গন্ধ যত তীব্র, সুহাসিনী তত রোমাঞ্চিত, অভিভূত, উল্লসিত!

তা বলে কি আর খারাপ গন্ধ তার নাকে লাগে না! খুবই লাগে। ময়লার গন্ধ, কাঁচা ড্রেনের গন্ধ, ইঁদুর পচা বেড়াল পচা—অথবা সস্তায় পচা ভুসভুসে মাছ বাজার থেকে কিনে এনে কার ঘরে রান্না হচ্ছে—তখনও বাড়ি মাত হয়ে ওঠে। তখন আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে রাখা ছাড়া সুহাসিনীর উপায় থাকে না। তখন আর সে রোমাঞ্চিত না, উৎফুল্ল না। বিরক্ত বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে থাকে কখন একটা দমকা হাওয়া এসে দুর্গন্ধটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আম-কাঁঠালের কি চিংড়ি-ইলিশমাছের সুগন্ধ যদি তার ইন্দ্রিয়কে একভাবে নেড়ে-চেড়ে দেয় তো এসব দুর্গন্ধও তাকে কম বিব্রত করে না।

আরো কতগুলি গন্ধ আছে, নাকে লাগে মাত্র সুহাসিনীর অনুভূতি ধারালো সচকিত হয়ে ওঠে। যেমন কেউ বেশ চড়া গন্ধের সাবান গায়ে মেখে চান করছে, কি কোন ঘরের কোন মেয়ে কি বৌ সুগন্ধ তেল মেখে চুলে বাঁধছে বা মুখে স্নো ঘষছে পাউডার মাখছে।

তখনও সহাসিনী জোরে জোরে শ্বাস টানে, এভাবে শ্বাস টেনে বেশ কিছুটা শৌখিন গন্ধ বুকের ভিতর জমা করে নিয়ে তারপর এক সময়, দীর্ঘশ্বাস বললে কথাটা ঠিক হবে না, ঝড়ো হাওয়ার মতন প্রচণ্ড জোরালো একটা শ্বাস বুক থেকে বের করে দিয়ে এসব তেল সাবান স্নো পাউডারের গন্ধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। যেন আজ আর এসবের তার দরকার নেই। তারপর চুপ করে থাকে। ভাবে। সুহাসিনীর এই ভাবনাগুলির কথা পৃথিবীর কেউ টের পায় না। একমাত্র সে নিজেই জানে কী নিয়ে সে ভাবছে, কেন ভাবছে।

গন্ধের কথা গেল। এখন শব্দের কথায় আসা যাক। বাড়িতে এতগুলি ঘর। রান্নার শব্দ হাঁচি-কাশির শব্দ ঝগড়ার শব্দ হাসির শব্দ—ফটফট খড়মের আওয়াজ করে কেউ ঘরে ঢুকছে, রাগ করে কেউ কাঁসার বাসন ছুড়ে ফেলছে, কেউ গান গাইছে, ছেলেব পিঠে দুম দুম কিল বসাচ্ছে কোন ঘরে, ছড়া কেটে ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে কেউ—তা ছাড়া রেডিওর শব্দ, কয়লা ভাঙার শব্দ, টিন পেটাবার আওয়াজ, পোয়াতি বৌ বমি করছে—তার প্রচণ্ড ওয়াক্ ওয়াক্, অথবা পেটের বেদানায় কেউ চেঁচাচ্ছে—জলে ছোট-বড় ঢেউ ওঠার মতন বাড়ীর সর্বত্র সরু মোটা ছোট বড় মাঝারি নানারকম শব্দ এখন তখন জেগে উঠছে, আবার ঢেউয়ের মতন সে সব এক সময় মিলিয়েও যাচ্ছে।

কিন্তু শব্দের মধ্যে সুহাসিনী তেমন কোন রস পায় না প্রেরণা পায় না। তার এক কান দিয়ে সব ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কে খড়ম পরে হাঁটছে, কোন্ পোয়াতী বমি করছে, কে রাগ করে কাঁসার বাসন ছুঁড়ে মারল তাতে সুহাসিনীর কিছু এসে যায় না। এসব শব্দ শুনে কোন ছবি তার মনে জাগে না, কোনো রং সৃষ্টি হয় না। সবই তার কাছে পুরনো একঘেয়ে।

তাই বলা হচ্ছিল, পাকা কাঁঠালের গন্ধ বা ইলিশমাছ রান্নার সুগন্ধ যেমন সরাসরি তার হৃদয় মন রসনা—এমন কি জঠরকে স্পর্শ করে, গন্ধটি নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠাল-কোয়ার সোনালী হলুদ রং বা বেশ লাল করে ভাজা তেল চুপচপে ইলিশমাছের লোভনীয় টুকরোগুলি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে, নাচতে থাকে এবং মনে মনে ক্ষীরের মতন ঘন মিষ্টি কাঁঠালের রস গরম ইলিশ ভাজা খেতেও তার আটকায় না, সেখানে শব্দ তাকে কিছুই দিতে পারে না, এই ধরনের কোন মোহ বাসনা বা অনুরাগ তার মনে সৃষ্টি করতে পারে না।

অথচ প্রতি মুহূর্তে কত রকম শব্দ হচ্ছে এ-বাড়িতে। কোন কোন গন্ধের মতন যদি অন্ততঃ একটা শব্দের প্রতিও তার টান থাকত লোভ থাকত মমতা থাকত। শব্দকে সুহাসিনী গ্রাহ্য করে না। মুখের ওপর মাছি বসলে যেমন বিরক্তি ধরে, তেমনি শব্দগুলি যখন একটার পর একটা কানে আসতে থাকে তখন তার ক্রোধ বিরক্তি ও ক্লান্তির শেষ থাকে না। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানো চলে, কিন্তু এতগুলি

ঘরের এত সব শব্দ সে দূর করবে কেমন করে। তখন কানের ছিদ্রের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে চুপ করে বসে থাকা কি শুয়ে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। সময় সময় তাই করতে হয় তাকে।

অথচ একটা আধটা শব্দ যে একদিন সুহাসিনীর ভাল না লাগত এমন না। শব্দ শুনতে সে কান পেতে থাকত, কখন শব্দটা হবে তার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও আলস্য করত না।

এবং মজা এই যে, আজ যেমন গন্ধ ধরে সুহাসিনীকে একটা কিছুর ছবি মনে মনে আঁকতে হয়, শব্দে ওঠা-নামা ধরে একটা জিনিসের রূপ চোখের সামনে কল্পনা করতে হয়, পাঁচ বছর আগে তা তাকে করতে হত না। তখন পৃথিবীটা তার কাছে বড় সহজ সরল ছিল। কেন না চোখ দিয়ে সব কিছু সে দেখতে পেত। কষ্ট করে অঙ্ক কষার মতন কেবল শব্দ দিয়ে গন্ধ দিয়ে তাকে আম কাঁঠাল গরু ছাগল পোকা-মাকড় কি মানুষের চেহারা চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হত না।

কিন্তু ঈশ্বর কি আর সকলকে এক রকম সুখ দেয়। হুট করে সেবার বসন্ত হয়ে সুহাসিনীর চোখ দুটো গেল। প্রাণে বাঁচল, কিন্তু চোখের জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

বুঝুন, মাত্র উনিশ বছর বয়স, রূপ রস যৌবন নিয়ে গন্ধ নিয়ে, বাসনা বিলাস সোহাগ নিয়ে পৃথিবীটা চোখের সামনে জ্বলছিল। জ্বলতে জ্বলতে একদিন দপ্ করে নিভে গেল। তখন মনের অবস্থা কী দাঁড়ায়!

না, দোষ দেবে কাকে। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে সুহাসিনী আজ এই পাঁচ বছর গুম হয়ে আছে। ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়েছে। একটা ময়লা বিছানা, একটা জানালা। এই তার পৃথিবী।

চোখ যাবার পর গোড়ায় ক'দিন যে হাতড়ে হাতড়ে সে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে না দাঁড়ায় এমন না। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন না সুহাসিনী বুঝতে পারল, পোড়ার বসন্ত কেবল তার চোখ দুটো নিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, তার মুখটাকেও পোড়া বেগুনের মতন কালো কুৎসিত করে রেখে গেছে।

সুহাসিনী কি আর আরশি দিয়ে নিজের চেহারা দেখেছিল?

কথাটা তার কানে এসেছিল। বস্তি-বাড়ি। কত রকম কথা এঘরে ওঘরে হয়। তা বলে গলা চেঁচিয়ে কি কেউ এমন একটা কথা বলে! তা হলেও, যত ফিসফিস করেই বলুক, সুহাসিনী ঠিক শুনতে পেয়েছিল।

তাই তার এক এক সময় ভাবতে ইচ্ছে করে, ঈশ্বর তার সঙ্গে বেশ ভাল রসিকতাই করল। উনিশ বছরে চোখের আলো নিভিয়ে দিল, কিন্তু কান দুটোকে কেমন প্রখর করে তুলল, নাকটাকে কী ভীষণ ধারালো করে দিল। কোন ঘরে এখন আলপিন পড়লেও সে শুনতে পায়, একটা ঘরে কেউ যদি, আম-ইলিশমাছ দূরে থাক, হোমিওপ্যাথি শিশি থেকে এককোঁটা ওষুধ ঢেলে খায় তো সুহাসিনী ঠিক গন্ধ পাবে।

রসিকতা ছাড়া কী। যার চোখ নেই তার নাকের কানের এত ধার কেন? এতে তার কষ্ট বাড়ল কি কমল? খুব কষ্ট পেয়েছিল সে পোড়া বেগুনের উপমাটা শুনে। যদিও দুঃখ করেই ফিসফিসে গলায় তারা বলাবলি করছিল—আহা, কী চোখ ছিল গো, মেয়েটার কী সুন্দর ভুরু দুটো ছিল, গোলাপের মতন টুসটুস করত দুটো গাল, ঠোঁট—আজ আর চেনাই যায় না, এমন মুখখানা এমন হয়ে গেল।

বুকের ভিতর একটা ধাক্কা লেগেছিল সুহাসিনীর, খুব ভয় পেয়েছিল সে। জানত তার চোখ দুটো গেছে, কিন্তু মুখেরও যে এমন সর্বনাশ হয়ে গেছে, সেদিন সে প্রথম জানল। তখনই হাতড়ে হাতড়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল। তারপর আর একদিনও উঠোনে নামে নি, দরজায় দাঁড়ায় নি। এই বিছানা আর এই জানালা। আজ পাঁচ বছর। এখন তার বয়স চব্বিশ।

ভয়টা আর নেই, অথবা এই ক'বছরে ভয়টা পুরনো হয়ে গেছে। এখন আর চেহারা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। পোড়া বেগুন হলে একটা মেয়ের মুখ কেমন হয় তার একটা ছবি ক্রমাগত ভেবে ভেবে সে মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে। অনেক দিন আগেই ঠিক হয়ে গেছে ছবিটা, এখন সেই ছবিও তার কাছে পুরনো।

কাজেই নতুন করে ভয় পাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিল শব্দ নিয়ে। আজ যেমন কোন কোন গন্ধের ওপর তার ভীষণ টান, প্রেমে পড়ার মতন সে-সব গন্ধ নাকে লাগা মাত্র সে দুর্বল হয়ে পড়ে, জোর জোর শ্বাস টেনে গন্ধগুলি বুকে পুরে নেয়, তেমনি কোন কোন শব্দ একদিন তাকে খুব টানত। আজকের মতন সব রকম শব্দের প্রতি যে তার বিদ্বেষ ছিল তা নয়, একটা দুটো শব্দ শুনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও সে আলস্য বোধ করত না।

অথচ সেদিন চোখেও দেখতে পেত। আমটাকে দেখত কাঁঠালটাকে দেখত—পোকা মাকড় মানুষ ছাগল গরুগাড়ি ঘোড়া—উনিশ বছর ধরে সবই সে দেখেছিল। তাদের শব্দ শুনেছে, তাদের গন্ধ তার নাকে লেগেছে। তখন শব্দ গন্ধগুলি তার উপরি পাওনা ছিল।

যেমন যুগলকে সে চোখে দেখত, এ বাড়ির ছেলে, না-দেখার কোন কারণ ছিল না। যুগল বাজার নিয়ে ফিরছে, তাড়াহুড়ো করে গায়ে তেল মাখছে, কলতলায় গিয়ে বস্তি-বাড়ির আর পাঁচটা মানুষের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে চান করছে, যুগল ভাত খেতে বসল, খেয়ে উঠে বিড়ি টানতে টানতে গায়ে জামা চড়াল, গত তিন দিন নীল রঙের জামা চড়িয়ে কাজে বেরিয়েছে, আজ সাদার ওপর ফিকে বাদামী ডোরা-কাটা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে সে বেরোল। সুহাসিনীও বাড়ির সদরে গিয়ে দাঁড়িয়ে। যতক্ষণ চোখে দেখা যায়, মানুষটাকে সে দেখল। যেন এতক্ষণ বাড়ির ভিতর তাকে ফেলে সুহাসিনীর আশ মেটেনি, এখন কেমন লম্বা লম্বা পা ফেলে যুগল হেঁটে চলে যাচ্ছে, কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কোন দিকে তাকাচ্ছে না, চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে সুহাসিনীর এত ভাল লাগত। তেমনি যুগল যখন সন্ধেবেলা কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে। তার পায়ের শব্দ শুনতে সুহাসিনী কান পেতে থাকত। কান পেতে থেকে যুগলের হাসি শুনেছে কথা শুনেছে। যুগল যখন তাদের দক্ষিণের ভিটের ঘরে বসে বিড়ি টানত, জানালাটার কাছে গিয়ে সুহাসিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত, বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধটা সুহাসিনীর ভাল লাগত। এ বাড়ির আরো কত মানুষ তো' বিড়ি খায়—সেদিনও খেত, কিন্তু কারো ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকতে কোন ঘরের জানালার কাছে গিয়ে কি সে দাঁড়িয়েছে?

অর্থাৎ যুগলের সব কিছুই তার ভাল লেগেছিল। সকালের দিকে সাবান মেখে যুগল চান করতে পারত না। তাড়হুড়োর সময়। সন্ধেবেলা কলতালায় বসে ধীরে-সুস্থে গায়ে সাবান ডলে সে চান করত আর গুনগুনিয়ে গান করত। গেলাসটা বাটিটা ধোওয়ার অছিলা করে সুহাসিনীও তখন পা টিপে টিপে কলতলায় চলে গেছে। বুক ভরে সে যুগলের গায়ের সাবানের গন্ধ নিয়েছে, দু'কান ভরে তার গুনগুন গান শুনেছে, আর চোখ ভরে মানুষটাকে দেখেছে।

চোখের দেখার সঙ্গে শব্দ-গন্ধগুলি তার উপরি পাওনা হত। হুঁ, সেদিন—যেদিন রূপ নিয়ে রস নিয়ে যৌবন নিয়ে—লোভ বাসনা আর প্রচুর রং নিয়ে শব্দ নিয়ে পৃথিবী তার চোখের সামনে জ্বলছিল, যুগলের পৃথিবীও জ্বলছিল, দুজনের চোখ-ঠারাঠারি হয়েছে, শব্দ না করে হাসাহাসি হয়েছে, খাটো গলায় কথা-বলাবলি হয়েছে, এমন কি গা ছোঁয়াও। তারপর, ঐ যে মাথার ওপর বসে আছে এক রসিক পুরুষ, ফুঁ দিয়ে সুহাসিনীর চোখের আলো নিভিয়ে দিল, পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপরও সুহাসিনী একটা মানুষের হাঁচি-কাশি শুনেছে, হাঁটা-চলার শব্দ শুনেছে, তার বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ সাবানের গন্ধও সুহাসিনীর নাকে লেগেছে—কিন্তু হাত পা নাক চোখ নিয়ে লম্বা ছিপছিপে গড়নের গৌরবর্ণ মানুষটা চিরজন্মের মতন সুহাসিনীর চোখের আড়ালে চলে গেল।

যেন এই জন্যই, নিজের চোখের জন্য যত না, একটা মানুষকে কোনদিন আর চোখ ভরে দেখতে পাবে না বলে সুহাসিনী বেশি কেঁদেছিল।

তার পর আস্তে আস্তে তার এই কান্না পুরনো হয়ে গেল। কেননা ক্রমেই সে বুঝতে পারছিল, চোখের আড়ালে চলে গেছে তার অর্থ যুগলকে চিরকালের জন্য সে হারিয়েছে। এক মাসের মধ্যে যুগল বিয়ে করে ফেলল। এই বাড়ির উঠোনেই কুশাসন কলাপাতা বিছিয়ে অনেক লোকজন নেমন্তন্ন খেয়ে গেল। সারাদিন শুধু হৈ-চৈ হল। রাত্রে ফুলশয্যা হল। বড় সুন্দর বৌ হয়েছে যুগলের, রাঙা টুকটুকে বৌ হয়েছে—অনেক শব্দ অনেক কথা সুহাসিনীর কানে এল।

সুহাসিনী বেশ বুঝতে পারছিল, তার চোখ গেছে পর থেকে নানারকম শব্দ গন্ধ দিয়ে তার মন ভরিয়ে তুলতে পৃথিবীর কোন কোন মানুষ উঠে পড়ে লেগেছিল। যেন এ-ও এক ধরনের রসিকতা।

যেন আগের চেয়েও বেশি সাড়া-শব্দ করে যুগল কাজ সেরে বাড়ি ফিরত, দৌড়-ঝাঁপ করে কলতলায় ছুটে যেত, ঝপ-ঝপ করে মাথায় জল ঢালত, আগের চেয়ে অনেক বেশি চড়া গন্ধের সাবান গায়ে মাখত। আর সারাক্ষণ কমলা কমলা। হুঁ, তার বৌয়ের নাম। তা-ও সুহাসিনীর কানে এসেছিল। কমলা রান্না হল? কমলা আমাকে একটু চা করে দাও। কমলা, দেখ তো এই মাথার তেলটা কেমন হল, ভারি সুগন্ধ, তোমার জন্য নিয়ে এলাম। কমলার খুশি গলার খিলখিল হাসি এই উত্তরের ভিটের অন্ধকার ঘরে বসে সুহাসিনী শুনেছে। এবং একটু রাত হতে ও ঘরের ভুরভুরে তেলের গন্ধ এ ঘরে ভেসে এসেছে।

কিন্তু ক'দিন এসব শব্দ গন্ধ নতুন থাকে। একদিন পুরনো হয়ে গেল।

পুরনো হতে হতে এখন এমন হয়েছে, এই সব শব্দ-গন্ধে ঘেন্না ধরে গেছে সুহাসিনীর। যেন তার থুথু ছিটোতে ইচ্ছা করে। সময় সময় একলা ঘরে বসে সে থুথু ছিটোয়। বা দরকার হলে, যাতে কোনরকম শব্দ-গন্ধ এ ঘরে না আসে, হাতড়ে হাতড়ে উঠে গিয়ে জানালার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দেয়। তারপর গুম হয়ে বসে থাকে।

তবে হাঁ, কোন ঘরে যদি কাঁঠাল আসে, ইলিশ মাছ রান্না হয়, সুহাসিনী তখন জোর জোর শ্বাস টানে। এই একটা দুটো গন্ধ তাকে তৃপ্তি দেয় সান্ত্বনা দেয়। তাছাড়া এ বড়ির অন্য সব গন্ধ, গন্ধ এবং শব্দ তার কাছে বিষের মতন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। এ ঘরে ও ঘরে আমটা কাঁঠালটা দু-চার টুকরো ইলিশমাছ, দুটো চারটে হলেও বাগদা চিংড়ি আসছে। বস্তির মানুষ পয়সা কোথায় যে, রোজই এসব ভাল ভাল জিনিস পাবে, বেশি করে খাবে। তা হলেও এক-আধ দিন করে সব ঘরেই এটা-ওটা আসছে।

আর সুহাসিনীর নাকও এমন হয়ে গেছে, কোন্ ঘরে কোন্‌টা এল তার এই কোণার ঘরের ময়লা বিছানায় শুয়ে বসে থেকে সে ঠিক টের পায়। ঠিক বলে দিতে পারে—এ ঘরে আজ আনারস এসেছে, ও ঘরে চিংড়িমাছ এল।

একটি ঘর ছাড়া। তাই সুহাসিনী ক'দিন ধরে ভাবছে। যুগলের ঘরে এ বছর এখন পর্যন্ত আম কাঁঠাল, একটু চিংড়ি কি ইলিশমাছ এল না। গত বছরও আসে নি। সে-রকম কোন গন্ধই ওদিকের ঘর থেকে আসছে না। একদিনও না। ব্যাপারটা কী? এসব ভাল ভাল খাদ্য, কথায় বলে বছরের নতুন জিনিস, সব ঘরেই একদিন দুদিন করে যখন আসছে, যুগল কেন তার আদরের বৌকে এনে খাওয়াচ্ছে না? খটকা লাগার মতন কথা। গেল বারই সুহাসিনীর চোখ দুটো নষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করে ফেলে প্রথম বছর দুই যুগল বৌয়ের জন্য খুবই খরচায় নেমে গিয়েছিল। রোজই একটা না একটা নতুন জিনিস বৌকে এসে দিয়েছে। কেবল কি তেল সাবান স্নো ক্রিম, দুদিন পর পর নতুন শাড়ি নতুন ব্লাউজ নতুন সায়া এসেছে কমলার জন্য। হাঁক-ডাক শোনা গেছে কত—কমলা, আসছে মাসে তোমার পাথর-সেট দুল গাড়িয়ে দেব, পুজোর সময় নতুন হার গড়িয়ে দেব। আর খাওয়া-দাওয়া? যেন কী এনে বৌকে খাওয়াবে সে দিশা করতে পারত না। রোজ কাঁঠাল এসেছে ল্যাংড়া আম ফজলি আম এসেছে ওঘরে। ইলিশমাছ চিংড়িমাছ মাংস দৈ রাবড়ি রসগোল্লা—ভাল পয়সা পায়, চাকরিটা মোটামুটি ভাল, মা আর ঐ এক ছেলে—ঘরে আর খাইয়ে কে, তারপর তো বৌ এল--যেন দু হাতে খরচ করে যুগলের আশ মিটত না। হুঁ, বিয়ের পর প্রথম দু বছর। এঘরে বসে সুহাসিনী সব টের পেয়েছে।

কিন্তু তারপর সব যেন কেমন ফিকে হয়ে গেল। কমলা, এটা এনেছি তোমার জন্য, কমলা কাল তোমাকে ওটা এনে দেব—এসব হাঁক-ডাক কমে গেল। যেন হঠাৎ বৌয়ের আদরটা কমে গেছে। যেন একটু সকাল সকাল বৌ পুরনো হয়ে গেল। তাই কি?

তাই আজ ক'দিন ধরে খুব ভাবছে সুহাসিনী। কারণ কি? একটা তো মোটে বাচ্চা হয়েছে ওদের। তা-ও এদিকে হয়েছে। বিয়ের পর প্রায় পাঁচ বছর পার করে। ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দটা সুহাসিনী খুব শোনে।

চিৎকারটা যখন অসহ্য লাগে, তখন হাতড়ে হাতড়ে উঠে গিয়ে ওদিকের জানালার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দেয়। যুগলের ছেলের চিৎকার বলে না, সব চিৎকারের বেলায়ই সুহাসিনী তা করে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এত সহজে কারো বৌ পুরনো হয়?

ওঘরের স্নো পাউডার তেল সাবানের গন্ধও আর নাকে লাগছে না।

না লাগুক, বোঝা যায় যুগল বৌকে এসব কিছু আর এনে দিচ্ছে না। অবশ্য স্নো ক্রিম সুগন্ধী তেল সাবানটা বড় কথা না। এ সব ছাড়াও মানুষকে ভালবাসা যায়। এসব না মেখেও মানুষের দিন কাটে। কতজনই তো বৌকে এসব কিনে দিতে পারে না, পয়সার অভাব, বৌয়েরা সাদা নারকেল তেল মাথায় মাখে। মুখের চামড়া নরম রাখার জন্য সর্ষের তেল মাখে। তা বলে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি ভালবাসা চলে যায়?

কিন্তু যুগলের তো তেমন একটা অভাব নেই।

আচ্ছা, না দিক এনে স্নো ক্রিম তেল পাউডার, সুহাসিনী চিন্তা করে, এসব নিয়ে খুব একটা ভাববার কিছু নেই। ছেলের মা হয়েছে, এখন হয়তো যুগলের বৌ আর এত সাজগোজ পছন্দ করে না। কিন্তু তা বলে, বছরের আমটা কাঁঠালটা, একটু ইলিশমাছ একটু চিংড়িমাছ—এক আধ দিনও যুগল বৌকে এনে খাওয়াবে না? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগে সুহাসিনীর। মস্ত অভাবের সংসারেও তো এমনটা হয় না। ধার-কর্জ করে হলেও মাসে অন্তত একদিন বৌকে ছেলেমেয়েকে এটা ওটা এনে খাওয়ায়। কিন্তু যুগল এ কী করছে, হঠাৎ এমন কঠিন হয়ে গেল মানুষটা?

ভাবনাটা গুরুতর। গুরুতর এইজন্য, ভাল করে পাঁচ বছর না ঘুরতেই যদি বৌয়ের ওপর অরুচি ধরে যায়, বৌ পুরনো হয়ে যায়, বৌকে একফোঁটা আদর করতে ইচ্ছে না করে তো আর দু বছর কি চার বছর পরে যুগল এই বৌকে কী করবে, মেরে তাড়িয়ে দেবে? আর একটা বিয়ে করবে?

কথাটা ভাবতে কেমন গা শিরশিব করে। না, সুহাসিনী স্বার্থপর না—হিংসুটে না। তার অন্ধ হওয়ার এক মাসের মধ্যে যুগল বিয়ে করে এই বৌকে ঘরে এনেছিল, তা বলে সুহাসিনী কি চাইবে যে বৌটা দুঃখে থাক, যুগল তাকে অনাদর অবহেলা করুক? এতটা নীচ আত্মা সুহাসিনীর না। তার কপাল ভেঙেছে ভাঙুক, ঈশ্বর তার সঙ্গে রসিকতা করেছে করুক, তা বলে কমলা দুঃখে থাকবে, স্বামীর আদর সোহাগ পাবে না, এর মধ্যেই পুরনো ন্যাতার মতন যুগল তাকে হাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—এ একটা কথাই নয়। যদি এমন হয়, যুগল অন্যায় করছে, ভয়ানক পাপ করছে।

চিন্তা করে সুহাসিনী গুম হয়ে থাকে। তার হাত পা কেমন অসাড় হয়ে যায়। বুকের ভিতর টিপ-টিপ করে।

ক'দিন ধরেই এমন হচ্ছিল। এটা কি অসুখ? যদি অসুখ বলা হয় তো মানুষটা যে বেশ কিছুকাল থেকেই অসুস্থ। চোখের সামনে তাল তাল অন্ধকার নিয়ে পাঁচ বছর একটা ঘরে আটকে থাকা, একটু আলো না বাতাস না, কারো সঙ্গে একটা কথা না। দেখলে কি মনে হবে এই সুহাসিনী পঁচিশ বছরের যুবতী? দাঁত-পড়া মানুষের মতন গাল দুটো তুবড়ে গেছে, চোখ দুটো গর্তে ঢুকে পড়েছে, দড়ির মতন হাত পা, একটু বেশি নড়াচড়া করতে গেলে মাথা ঘোরে, পা-হাত ঝিন্-ঝিন্ করে, একটু বেশি সময় বসে থাকলেও যেন হাঁপ ধরে—কাজেই অধিকাংশ সময় শিয়রে একটা জানালা দিয়ে ময়লা বিছানাটায় সে শুয়ে থাকে। শুয়ে থেকে তার আকাশ-পাতাল ভাবনা।

তা এভাবে তো কেটে যাচ্ছিল দিন।

কিন্তু কাল থেকে, কাল না পরশু থেকেই যেন এই উপসর্গগুলি দেখা দিয়েছে। সুহাসিনী ঠিক বুঝতে পারছিল না, এমন হল কেন। তবে ক'দিন থেকে দক্ষিণের ভিটের ঘরের একজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে সে খুব মাথা ঘামায় নি। ঐ যুগলকে নিয়ে, যুগলের বৌকে নিয়ে, এত মাথা ঘামাচ্ছিল বলে কি তার মাথার ভিতরটা শূন্য হয়ে গেল, মরুভূমির মতন হয়ে গেল, না কি বাড়িটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল? যেন কোন লোকজন নেই, ঘর দুয়ার ছেড়ে সব কোথায় চলে গেছে। কেন না একফোঁটা শব্দ শুনতে পাচ্ছে না সে। টিকটিকিটা পর্যন্ত ডাকছে না। টিকটিকিটা ডাকছে না, চড়ুইপাখিগুলির কোন

শব্দ শোনা যাচ্ছে না। অথচ দিন-ভর ওরা উঠোনের ওপাশটায় পেঁপে-ঝোপের কাছে কিচমিচ করত। ব্যাপারটা কি? এ-বাড়ির লোকজনের সঙ্গে চড়ুই-টিকটিকিগুলিও কি কোথাও সরে গেল?

তাছাড়া সুগন্ধ হোক দুর্গন্ধ হোক, কোনরকম গন্ধও তো সুহাসিনী টের পাচ্ছে না। তেল সাবানের হোক, রান্নার গন্ধ হোক, কি নর্দমার গন্ধ হোক—রাতদিন যেখানে বস্তি-বাড়ির বাতাস গন্ধে গন্ধে বোঝাই হয়ে থাকে সেখানে কোন গন্ধ সুহাসিনীর নাকে লাগছে না? এ কখনো সম্ভব?

কেমন ভয় করছিল তার। এমন তো তার কোনদিন হয়নি। চোখ দুটো যাবার পরেও তো দুবার বড় বড় অসুখে সে ভুগে উঠেছে। একবার টাইফয়েড হয়েছিল, একবার কলেরার মতন হয়েছিল। দুবারই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মাথার ভিতরটা তো এমন ফাঁকা দুর্বল মনে হয় নি। সব রকম শব্দ তার কানে এসেছে, সব রকম গন্ধ নাকে লেগেছে।

আর এই দুদিন যাবৎ তার কী হয়েছে। তার যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তলায় সে বসে আছে। জলের সোঁ সোঁ শব্দের মতন কানের ভিতর একটা বিশ্রী শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কোন গন্ধও সে টের পাচ্ছে না। পরীক্ষা করার জন্য বাঁ হাতের তেলোটা কয়েকবার নাকের কাছে তুলে ধরেছে। জোরে জোরে শ্বাস টেনেছে। তার বাঁ হাতের তেলোয় সর্বদাই একটা লেবু লেবু গন্ধ লেগে থাকে। এমনি। লেবু না ধরলেও এমন একটা গন্ধ টের পাওয়া যায়। কিন্তু আজ সুহাসিনীর নাকে কোন গন্ধই লাগল না। অথচ নিজের হাত। বিমূঢ় হয়ে গেল সে।

জিনিসটা আরো বেশি পরিষ্কার হয়ে গেল টেঁপির কথা শুনে। টেঁপি আজ সকালে বাজার থেকে ছোট দেখে একটা পাকা কাঁঠাল কিনে এনেছে দিদির জন্যে, আর আট টাকা কেজীর দেড়শো ইলিশমাছ। তিন টুকরোর বেশি ওঠেনি। টেঁপি ঘরে ঢুকেই বলছিল, 'দিদি তোর জন্য কাঁঠাল এনেছি, ইলিশমাছ এনেছি।'

কিন্তু ফ্যাকাসে চোখ দুটো সুহাসিনী এমন করে মেলে ধরে রেখেছিল, টেঁপি যে ঘরে ঢুকল, কথা বলল, তার পায়ের শব্দ বা কথা, কোনটাই যেন সুহাসিনী শুনতে পাচ্ছিল না। তা না হলে কাঁঠাল ইলিশমাছের নাম শুনলেই সুহাসিনীর মুখে হাসি ফোটে, শোয়া ছেড়ে উঠে বসে। বছরে ঐ একদিন দুদিনই দিদিকে এনে এই দুটো জিনিস খাওয়ায় টেঁপি, এই দুটো জিনিস দিদির প্রাণ। তার বেশি সে এই দিদিকে খাওয়াতে পারে না। সাবানের কারখানায় সামান্য চাকরি। কত আর মাইনে। দু বোনের কোনরকমে ডাল-ভাত খাওয়া জোটে।

অবশ্য এই ছোট বোনটা আছে বলেই সুহাসিনী কোনরকমে খেয়ে বেঁচে আছে। দুটি বোন ছাড়া তিন কুলে তো আর কেউ নেই তাদের। টেঁপি না থাকলে কবে সুহাসিনী মরে হেজে ভূত হয়ে যেত।

যাই হোক, এখন টেঁপি ঠিক বুঝতে পারছিল, দিদি তার কথা বোঝেনি।

'এই দিদি!' বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে টেঁপি প্রায় চিৎকার করে উঠল।

'কি বলছি, শুনছিস?'

যেন এবার সুহাসিনী বুঝতে পারল টেঁপি ঘরে ঢুকেছে, তাকে কিছু বলছে।

'কি বলছিস?' সুহাসিনী ঘাড়টা তুলে ধরল।

'তোর কাঁঠাল এনেছি, ইলিশমাছ এনেছি।' এত জোরে টেঁপি কথাটা বলল, বস্তির সব মানুষের শোনার কথা। 'কাঁঠাল, কাঁঠাল, ইলিশমাছ ইলিশমাছ।' তারপরও চেঁচিয়ে দুবার তিনবার করে টেঁপি শব্দ দুটো উচ্চারণ করল।

এবার সুহাসিনী বুঝল। হাত বাড়িয়ে দিল। কাঁঠালটা দিদির বিছানার পাশে রাখল টেঁপি। মাছের ঠোঙাটা অবশ্য হাতেই ধরে রাখল। কিন্তু সেটাও হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল সুহাসিনী। টেঁপি তখন ঠোঙাটা সুহাসিনীর নাকের কাছে ধরল। সুহাসিনী জোরে জোরে শ্বাস টানল। তারপর ফ্যাকাসে চোখ দুটো অসহায়ের মতন মেলে রেখে সুহাসিনী মাথাটা দুবার নাড়ল।

'কোন গন্ধ পাচ্ছি না রে টেঁপি।'

'কাঁঠাল? কাঁঠালটার গন্ধ পাচ্ছিস না?—পাকা কাঁঠালের গন্ধে তো ঘর ভরে গেছে।' কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে টেঁপি কাঁঠালটা দিদির নাকের কাছে তুলে ধরল।

সুহাসিনী জোর শ্বাস টানল। তারপর ঘাড়টা সরিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'নাঃ কোন গন্ধই লাগছে না আমার।'

মুখটা কালো হয়ে গেল টেঁপির। 'গন্ধ টের পাচ্ছিস না, কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার না করলে কোন কথাও যে বুঝতে পারছিস না দেখছি।'

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল সুহাসিনী। তারপর আস্তে বলল, 'মনে হয় চোখের মতন নাক কান দুটোই আমার নষ্ট হয়ে গেল।'

'না ; তা হবে কেন।' মুখ ভার করে টেঁপি বলল, 'শরীরটা একটু বেশি খারাপ হয়েছে, মাথাটা দুর্বল হয়েছে, এই জন্যই এমনটা হচ্ছে।' একটু চুপ থেকে পর টেঁপি বিড়বিড় করে উঠল 'দেখি, সামনের মাসে টাকা পেলে একবার ডাক্তার দেখাতে হবে।' কথাটা সে খুব আস্তে বলল বলেই সুহাসিনী আর শুনল না। না হলে সুহাসিনী তখন বলত, কী হবে আর আমাকে ডাক্তার দেখিয়ে, একটা অন্ধ মেয়ের জীবনের দাম কী।

রান্নাবান্না করে তারপর নিজে খেয়ে দিদির ভাত-তরকারিটা তার বিছানার পাশে বেড়ে রেখে ঢেকে-ঢুকে, রোজ যা করে টেঁপি, কারখানায় চলে গেল।

সুহাসিনীর খেতে অনেক বেলা হয়। সে তো আর কাজে যায় না। কাজেই খাওয়ার তাড়া থাকে না।

কিন্তু আজ [illegible] খেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। অথচ হাতড়ে হাতড়ে ঢাকনা সরিয়ে সে টের পেয়েছে, তিন টুকরো ইলিশমাছের দু টুকরোই তার জন্যে রেখে গেছে, একটা বাটি ভরতি করে কাঁঠালের কোয়া রেখে গেছে।

সুহাসিনী দুবার মাছের বাটি থেকে মাছ তুলে নাকের কাছে ধরেছে, জোরে জোরে শ্বাস টেনেছে, তারপর আবার মাছটা বাটিতে রেখে দিয়েছে। দুটো কাঁঠালের কোয়া তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করেছে, তারপর আবার বাটিতে রেখে দিয়েছে।

কেমন যেন পাথরের মতন স্থির বোবা হয়ে শুয়ে রইল সে।

তার হাত নড়ছিল না, মাথা নড়ছিল না। পাথরের মতন স্থির হয়ে থেকে সে ভাবছিল, যদি গন্ধই না পেলাম তো এই ইলিশমাছ, এই কাঁঠাল খেয়ে লাভ কী। বেদনায় হতাশায় তার ফ্যাকাসে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল। চোখ দুটো চকচক করতে লাগল।

তার চেয়ে যদি যুগলের বৌকে এই মাছ কাঁঠাল পাঠিয়ে দেওয়া যেত! তার নাক আছে চোখ আছে জিভের স্বাদ আছে—কিছুই নষ্ট হয়নি, কত রস করে খেত মেয়েটা। যুগল যে কিছুই এনে দিচ্ছে না কমলাকে।

যুগলের চিন্তায় কমলার চিন্তায় সুহাসিনীর ফাঁকা মাথাটা ভরে উঠল।

বেলার মনে বেলা গড়াতে লাগল। কিছুতেই যুগলের চিন্তাটা তার মাথা থেকে সরছিল না। যেন যুগল তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। অবশ্য বৌটার খারাপ অদৃষ্টের কথা ভাবতে গিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে যুগলকেও এত ভাবছিল। অন্যায় করছে যুগল। পাপ করছে।

তারপর এক সময়, তখন বেলা আর বড় নেই, গাছের মাথায় রোদ উঠে গেছে, পেটের ক্ষুধার জন্যই হোক বা নিয়ম রক্ষার জন্যই হোক, সুহাসিনী হাতড়ে হাতড়ে থালার ঢাকনা সরিয়ে ঝোল দিয়ে ভাত মেখে দু গরাস মুখে তুলল। এক টুকরো মাছ ভেঙে মুখে দিল। কিছুই স্বাদ পাচ্ছিল না। চোখ কান নাকের সঙ্গে জিভটাও অসাড় হয়ে গেছে। অর্ধেক খেল অর্ধেক ভাত পাতে পড়ে রইল। দু টুকরো মাছের দেড় টুকরোই বাটিতে থেকে গেল। কাঁঠালের কোয়া খেল ঠিক তিনটা। বাকি সব থেকে গেল।

চোখ নেই, তাই সুহাসিনী দেখল না ভাতের ওপর কাঁঠালের ওপর মাছি বিজবিজ করছিল।

কিন্তু সেটা বড় কথা না, তখন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেল সুহাসিনীর ঘরে, তার ময়লা বিছানার কাছে, অলৌকিকও বলা চলে। অবিশ্বাস্য হত অবশ্য বাইরের মানুষে চোখে। যদি তারা কেউ জিনিসটা চোখে দেখত। কিন্তু সুহাসিনীর মনে যেন ক্রমেই এমন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল। যুগল আসবে, একদিন না একদিন সুহাসিনীর কাছে আসবে। যদিও ঘরে বৌ রেখে তার কাছে চলে

আসা যুগলের অন্যায় হবে পাপ হবে—তা হলেও সুহাসিনীর মাথায় এই চিন্তাটা প্রায় শিকড় গেড়ে বসেছিল।

তাই হল তখন। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

যুগল তার বিছানার ওপর কেমন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। উত্তেজনার উচ্ছ্বাসে সুহাসিনী কাঁপতে কাঁপতে রোগা হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। যুগল জিভ দিয়ে সুহাসিনীর ঠোঁট চাটছিল থুতনি চাটছিল। তার মুখে গাল ঠেকিয়ে সুহাসিনীও তাকে একটু আদর করল, চুমু খেল, কিন্তু আবার অনুযোগ করতেও ছাড়ল না। 'এটা ঠিক হচ্ছে না যুগল, এমনটা করা কিন্তু তোমার উচিত না। আমি হিংসুক নই, স্বার্থপর নই,—তা হলে তোমাকে এত কথা বলতাম না। কমলাকেও আদর করবে। পরের মেয়ে ঘরে এনেছ—তুমি যদি তাকে না দেখ, কে দেখবে—আমার লক্ষ্মী আমার সোনা, আমার তো কিছু নেই, অন্ধ মানুষ, স্বাস্থ্য গেছে রূপ গেছে—তা বলে ঘরের বৌকে—'

কথাটা সে শেষ করতে পারল না, টেঁপি ঘরে ঢুকল। কারখানার কাজ সেরে এই তার ফেরার সময়। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই কপালে চোখ তুলে টেঁপি চিৎকার করে উঠল! 'কী করছিস দিদি, এ তুই কী করছিস!'

কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে সুহাসিনী তার দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে ধরল।

'ওটা ভোম্বলদের কুকুর।' দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে টেঁপি সমান জোরে চেঁচাতে লাগল। 'ইস্, এটার গায়ে ঘা আছে, এমন করে গলা জড়িয়ে ধরছিস, যা যা—' টেঁপি কুকুরটাকে তাড়া করল। 'মাছের গন্ধ পেয়ে একেবারে তোর বিছানায় উঠে এসেছিল।' তাড়া খেয়ে কুকুরটা বেরিয়ে গেল।

সুহাসিনী কিছুই বলছিল না। তার শিথিল রুগ্ন হাত দুটো বিছানায় নেমে এল। ফ্যাকাসে চোখের কোণা বেয়ে দু ফোঁটা গরম জল টপ টপ করে ঝরে পড়ল।

বিমল মিত্র

জেনানা সংবাদ

বিলাসপুরের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তি মারা গেল। মরা গেল যত হঠাৎ, তত হঠাৎ, কিন্তু মৃত্যুর প্রসঙ্গ চাপা পড়লো না। কৃষ্ণমূর্তি যতখানি ছিল বাঙালী বিদ্বেষী ঠিক ততখানি ছিল মাদ্রাজী-বিদ্বেষী। অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্তির বউ ছিল বাঙালী মেয়ে।

কথা উঠলো—দায়িত্বটা নেবে কে। এমন ক্ষেত্রে না 'বেঙ্গলী এসোসিয়েশন' না 'সাউথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' কারোরই মাথাব্যথা হবার কথা নয়। কারণ কৃষ্ণমূর্তি না-বাঙালী না-মাদ্রাজী। তবে আট-দশটা নাবালক ছেলেমেয়ে আর বিধবা বাঙালী বউ-এর ভারটা নেবে তা হলে কে? প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কয়েকশো টাকা ছাড়া বেচারার নির্ভর করবার আর কিছু নেই। বিগতপ্রাণ কৃষ্ণমূর্তি আর তার বিগতশ্রী পরিবারের প্রসঙ্গটা ঘটনাক্রমে রটনায় পর্যবসিত হলো।

রেলওয়ে ইনস্টিটিউটের করিডরে বসে অফিসারদের মধ্যে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

আজাইব সিং বললেন—বাঙালী মেয়েরা কিন্তু স্ত্রী হিসাবে আইডিয়াল—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—আমি তা হলে সত্যি কথাই বলি—তেমন বাঙালী মেয়ে যদি পেতাম তা হলে আমাকে আর আজীবন ব্যাচিলর থাকতে হতো না—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার। বললেন—কিন্তু যাই বলো—বাঙালী মেয়েরা বড় ঘর-কুনো, ওই স্বামীটি আর নিজের সংসারটিই কেবল চেনে তারা—

সোনপার সাহেব সিন্ধী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল বাঙালী। গান জানতো। শান্তিনিকেতনে পড়া। বললেন—আপনার কথায় আমার আপত্তি আছে মুদেলিয়ার গারু, ক্যালিফোর্নিয়ার কোনও অজ পাড়াগাঁয়েও যদি কোনো ভারতীয় মহিলাকে দেখতে পান, জানবেন সে বাঙালী মেয়ে—

মুদেলিয়ার দমবার পাত্র নন। দুপাশে মাথা হেলাতে লাগলেন। বললেন—তা হলে বলুন-না কেন মাহেঞ্জোদারোতে যে নাচওয়ালীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে, সে-ও বাঙালী মেয়ের কঙ্কাল—

পাশের হল্-এ বিলিয়ার্ডখেলার গোলমাল শোনা যায়। আর করিডর-এর খোলা জানালা দিয়ে বাইরে নজরে পড়ে ইনস্টিটিউটের বিরাট লন। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। তীব্র আলো জ্বালিয়ে লন-এর ওপর দুদলের ব্যাডমিণ্টন খেলা চলছে। আর দিল্লী স্টেশনের উর্দু-ঠুংরি গান চলেছে রেডিওতে। এতক্ষণে বোধ হয় ওয়ানডাউন এল, আজ বুঝি বম্বে-মেল লেট্। পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে টিমটিমে ল্যাম্প জ্বেলে সার সার টাঙ্গাগুলো শনিচরী বাজারের দিকে ছুটে চলেছে।...

সোনপার সাহেব বললেন—আপনি কিছু বলছেন না, মেটা সাহেব—গুরুবচন মেটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এখানকার পি-ডব্লিউ-আই, বেল-লাইনের তদারক করা কাজ তাঁর। আজীবন ব্যাচিলর। শেয়ালকোটের কোন্ গ্রাম থেকে কবে সি-পি'তে বসবাস কবতে শুরু করেছেন কেউ জানে না। তবু রসিকপুরুষ হিসেবে বন্ধুমহলে তাঁর সুখ্যাতি আছে।

স্টেশনমাস্টার মুদেলিয়ার বললেন—আপনি কিছু মতামত দিন মেটা সাহেব—

জুন মাসের মাঝামাঝি। এবার এখনও 'মনসুন' আবস্ত হল না! গুরুবচন মেটা আকাশের দিকে চেয়ে সকলের গল্প শুনছিলেন।

বললেন—আমি ব্যাচিলর মানুষ, তরুণী মেয়েদেব সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা থাকা অপরাধ—তা ছাড়া বেঙ্গলে কখনও যাই নি—কলকাতা সম্বন্ধে আমার ধারণা কিছুই নেই—বাঙালী মেয়ে বলতে দেখেছি শুধু সবোজিনী নাইডুকে—জব্বলপুরে যেবার কংগ্রেসের মিটিং-এ এসেছিলেন—

টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—সরোজিনী নাইডু? হার এক্সেলেন্সী...

গুরুবচন মেটা বললেন— তবে অনেক বছর আগে একজন বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আমার একবার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল —জব্বলপুরে —

সবাই বললেন—বলুন, বলুন—

গুরুবচন মেটা বলতে শুরু করলেন—আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, সমস্ত বাঙালী মেয়ের সম্বন্ধে আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো ভুল করবেন। মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অভিজ্ঞতা কম, তার ওপর বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে আরও কম। কারণ প্রথমত আমি বাঙালী নই, বাঙলাদেশে কখনও যাই নি—তার পব আমাব অভিজ্ঞতা শুধু একটিমাত্র বাঙালী মেয়েতেই সীমাবদ্ধ—

টি. আই বুড়ো এণ্টনি বললে—তা হোক—বলন মিঃ মেটা—ভেরি ইণ্টারেস্টিং—

মেটা বললেন—আমার মতে আপনাদের কথা যদি সত্যি হয় যে, সব প্রদেশবাসীরাই বাঙালী মেয়েদের বউ করে পেতে চায়, তো তার প্রধান কারণ হলো বাঙালী মেয়েদের রান্না। অমন সুস্বাদু রান্না করতে আর কোনও জাতের মেয়েরা পারে না—

—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং--তার পর? বুড়ো এণ্টনি বললে।

—তবে একটা কন্‌ডিশন, গল্পটা আমি যেখানে শেষ করবো, তার পরে আমাকে আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবেন না—আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয় জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ, ব্যাপক—কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্ল্যাইম্যাক্স আছে—সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়—তাতে আপনারা রাজী?—গুরুবচন মেটা সকলের দিকে সপ্রশ্ন চোখে চাইলেন।

সোনপার সাহেব সকলের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—রাজী আমরা—আপনি বলুন—

রেডিওতে বুঝি এবার ইংবিজী প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে। রেকর্ডে জ্যাজ্ অর্কেস্ট্রা। সামনের লন-এ

ব্যাডমিণ্টন খেলা বন্ধ হলো। কাট্‌নি ব্রাঞ্চের শেষ গাড়িটা অনেকক্ষণ ছেড়ে গেছে। এতক্ষণে সেখানা বোধ হয় পেণ্ড্রা রোডের পথে অমরকণ্টকের রেঞ্জ-এর গা দিয়ে টানেল পার হচ্ছে। পূর্বদিকে প্লাটফরমের উপর গোস্‌ রুটি আর চায় গরমের হল্লা নেই। প্লাটফরমের তালগাছপ্রমাণ লাইট-পোস্টটার আগাপাস্তলা শুধু পোকায় পোকা।...

গুরবচন মেটা বলতে আরম্ভ করলেন—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগের ঘটনা—আমি তখন থাকি আমাদের জব্বলপুরের বাড়িতে। আমার বড় বোনের তখন বিয়ে হয়ে গেছে, সে সবে লায়ালপুরে চলে গেছে—আমি থাকি সারা বাড়িচাতে একলা—মাঝে মাঝে বাবার দালালী ব্যবসাটা নিয়ে বাইরে ঘুরতে হয়—কখনও নাইনপুর, গণ্ডিয়া, ছিন্দোয়াড়া, আর বালাঘাট—ন্যারো গেজের সমস্ত সেক্‌শনগুলো...আবার কখনও ভুসাওয়াল, ইগ্‌গতপুর, বীণা, এলাহাবাদ-কট্‌নি...সাতদিন আটদিন পরে হয়তো একদিন বাড়ি এলাম...আবার একদিন ব্যাগ আর ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি টুপ করে—

কাজের মধ্যে কাজ ওই দালালী ব্যবসা, আর ফূর্তি বলুন আর যাই বলুন একমাত্র রিক্রিয়েশন শিকার করা...

তা বাবারও ছিল শিকারের শখ, আমারও তাই। বাবার দুটো ডবল-ব্যারেল বন্দুক পেয়েছিলাম আমি, একটা বারো বোরের আর একটা যোলো বোরের...আর নিজে কিনেছিলাম একটা রাইফেল—ফোর-ফিফ্‌টি—

যখনি ট্যুর-এ যেতাম—ওটা থাকতো সঙ্গে। কখনও কখনও তেমন জায়গায় গিয়ে পড়লে হাতিয়ার-অভাবে যেন বেকুব না হই। একবার অনুপপুর থেকে নেমে মাইল তিনেক দূরে এক নদীব ধারে মাচা বাঁধা হলো বাঘ মারবার জন্যে—উত্তর আর পশ্চিম দিক থেকে নর্মদা আর শোণ সেখানে এসে মিশেছে—জায়গাটা বাঘ শিকারের পক্ষে আইডিয়াল .বিকেলবেলা উঠলাম গিয়ে মাচাব ওপর আমি, পেণ্ড্রা-রোডের ঠাকুরসাহেবের ছেলে নর্মদাপ্রসাদ—সে-ও ভালো শিকারী- -আর আমাদের 'কিল্‌'টা রাখা হলো ঠিক...

কিন্তু যাক্‌গে, আমার গল্পে ও-সব অবন্তর প্রসঙ্গ। আমার এ-গল্প তো শিকাব-কাহিনী নয়, এ গল্প মেয়েমানুষ নিয়ে—সুতরাং সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি--

আপনারা হাওহাগ স্টেশন দেখেছেন? 'স্টেশনে নেমে সোজা পূর্বদিকে যে-রাস্তাটা চলে গেছে—ডাইনে বাঁয়ে ছোট-বড় অনেক রাস্তাই গেছে—কিন্তু যে-রাস্তাটা বি-এন-আরের মস্ত প্রকাণ্ড মাঠটা ঘুরে বেঁকে সোজা গেছে দক্ষিণ-মুখো, আমি সেই রাস্তাটার কথা বলছি....এখন অবশ্য অনেক বাড়ি হয়েছে ওখানে, রেফিউজিরা ভিড় করেছে, আশেপাশের জলাজমিগুলোও ভরাট হয়ে গেছে, কিন্তু ও-তল্লাট অমন ছিল না—ওই রাস্তায় ঢোকার মুখে ডানদিকে ছিল শুধু 'সানি-ভিলা', কতকগুলো অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান থাকতো ওই বাড়িটাতে, আর তার পর ঝোপ-জঙ্গল, কয়েকটা কবর আর সামনে বি-এন-আরের জমিতে বিরাট বিরাট আম গাছ—আর তারই বাঁকে পশ্চিম-মুখো 'শিয়ালকোট লজ'—আমার বাড়ি। সামনে ধরুন বাগান এককালে ছিল, কিন্তু তখন তত কিছু বাহার ছিল না, শুধু গোটাকতক আগাছা আছে এদিক-ওদিক। তবু দোতলার বারান্দায় দাঁড়ালে সামনের রাস্তা আর আশেপাশের সব কিছুই দেখা যায়।

একদিন আমার একতলাটায় একটা ভাড়াটে এল।

এ-পাড়ার দিকে ভাড়াটে বড় একটা আসে না। কারণ এখান থেকে ফ্যাক্টরি অনেক দূর। তার পর জি-আই-পি স্টেশন থেকে এখানে আসতে গেলে রিক্সা করতে হবে। বাজার-হাট সব দূর। বিশেষ করে ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতে গেলে তখনকার দিনে আরো অসুবিধে।

কিন্তু তবু একটা ফ্যামিলি এল। বাঙালী ফ্যামিলি।

কুড়ি টাকা ভাড়া। একমাশের ভাড়া অ্যাডভান্স-ও দিয়ে দিলে। রসিদটার নীচে সই দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন নিজে। বাড়িভাড়া হয়েছে স্ত্রীর নামে—

আজাইব সিং বললেন—স্বামীনাথন! বাঙালী 'সারনেম' তো অমন শুনি নি কখনও, ব্রাদার--

সোনাপার সাহেব বললেন—হয়—হয়—মেটা ইজ রাইট—আমার ফার্স্ট ওয়াইফ-এর কাছে শুনেছি—বাঙালী জাতটা যেমন পিকিউলিয়র, ওদের সারনেম-গুলোও তেমনি পিকিউলিয়র—আমি জানি আমার ওয়াইফ-এর একজন কাজিন ছিল, তার সারনেম 'গোস্'—

মুদেলিয়ার স্টেশন মাস্টার বললেন—তা কেন—স্বামীনাথন কখনও কোনও বাঙালীর সারনেম হতে পারে না—ওটা আমাদেরই একচেটে—

সোনপার বাধা দিতে যাচ্ছিলেন। টি-আই বুড়ো এণ্টনি বললে—ওটা একটা মাইনর পয়েণ্ট—আপনার সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পটা বলুন, মিস্টর মেটা—

গুরুবচন মেটা বললেন—সেই বেঙ্গলী গার্লের গল্পই তো বলছি, স্বামীনাথন হলো তার হাসব্যাণ্ড-এর সারনেম—মিসেস স্বামীনাথন একজন বাঙালী মেয়ে, বিয়ে করেছিল হ্যারি স্বামীনাথনকে—ম্যাড্রাসী ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান—

টি আই বুড়ো এণ্টনি বললে—সো ভেরি ইণ্টারেস্টিং...আমাদের ডি-এল-এস অফিসের ক্লার্ক কৃষ্ণমূর্তির মতো—তার পর—তার পর?

গুরুবচন মেটা বললেন—কিন্তু তার আসল নাম হলো—

বলতে গিয়ে গুরুবচন মেটা নিজেই হঠাৎ থেমে গেলেন। বললেন—আসল নামটা আপনাদের আগে বলে দিয়ে আর একটু হলে ভুল করছিলাম। কারণ আসল নামটা কি আমারই জানবার কথা? একদিন কি দু'দিন মাত্র দেখেছি ওদের—তা-ও দু' এক সেকেণ্ডের জন্যে—সুতরাং নাম জানা দূরে থাক, চেহাবাটাও ভালো করে দেখা হয় নি। আর আমি বাড়িতেই বা থাকি কতক্ষণ—মাসের মধ্যে যে দশ-বারো দিন বাড়ি থাকি তা-ও ওই শিকার নিয়ে কাটে—তবে এক এক দিন শুনতাম বটে—যেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থাকতাম—বাঙালী স্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান-ম্যাড্রাসী স্বামীকে গান শেখাচ্ছে—বাঙলা গান—গানটার একটা লাইন আমাব এখনও মনে আছে—পরে শুনেছিলাম পোয়েট টেগোরের লেখা গান—হে নাটারাজ—হে নাটারাজ. ..

সোনপার সাহেব বললেন—এ গানটা আমার ফার্স্ট ওয়াইফ গাইতো—বেঙ্গলীদের টিউন ভেরি পিকিউলিয়র—

—তার পর শুনুন—গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন।

—একদিন সাইকেল নিয়ে 'চৌকি' গেছি কী কিনতে, দেখা হলো সুবেদার কেদার সিং-এর সঙ্গে। কেদার আময় জিজ্ঞেস করলে—তোমার বাড়িতে একতলায় নতুন এক ভাড়াটে এসেছে দেখলাম—নতুন জেনানা—

আমি বললাম—হ্যাঁ—এক ম্যাড্রাসী ফ্যামিলি—

—ম্যাড্রাসী নয়—আমি চিনি ওকে—চাইবাসায় থাকতো ওব বাবা, ফরেস্ট অফিসার, ওর নাম মিস সুজাতা দাশ, ওর বাবা ছিলেন মিস্টার দাশ, রেইস্ আদমি—খানদানী বংশের লোক—কিন্তু সঙ্গের ও-লোফারটা কে?

আমি বললাম—ও ওর হাসব্যাণ্ড— হ্যারি স্বামীনাথন—

সুবেদার কেদার সিং বললে—শেষকালে কিনা ওর সঙ্গে বিয়ে হলো!

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা যেন সুবেদার সাহেবের মনঃপূত নয়। সুবেদার সাহেবের কাছেই শুনলাম—মেয়েটি নাকি ভারি খুবসুরৎ ছিল আগে। ভারি বলিয়ে কইয়ে, নাচিয়ে গাইয়ে। চাইবাসার সব লোকই নাকি ভালোবাসতো সুজাতাকে। বড়লোক বাপ, ঘোড়া ছিল, মোটর ছিল, আবার মাঝে মাঝে সাইকেলও চড়তো ও। কখনও পরতো শাড়ি, কখনও সেরোয়ানি, কখনও শালোয়ার, কখনও পরতো চোদ্দহাত মাদ্রাজী শাড়ি কাছা-কোঁচা দিয়ে, আবার কখনও পরতো স্রেফ ব্রিচেস আর নেকটাই-এর সঙ্গে ট্রাইজার শার্ট।

আমারও দেখে মনে হলো ভারি মজবুত গড়নের মেয়ে। ভইষেব দুধ. ঘি আর মাঠা না খেলে অমন চেহারা হয় না। তার ওপর আছে তাকত্ আর মেহন্নত। মোটর চালানো, ঘোড়ায় চড়া আর সাইকেল পেটা—

সেদিন প্রথম আলাপ হলো।

সন্ধ্যে তখনও হয় নি। হরিশঙ্কর রোডে গিয়েছিলাম বিল্ কালেক্শনে, মহাসামুন্দের পি-ডব্লিউ-আই শুক্লাজী ছাড়লো না। একটা বুল-ডিয়ার মেরে নিজের ট্রলি করে রায়পুরে পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল। তার পর সেটা নিয়ে গণ্ডিয়া জাংশানে ন্যারো-গেজ ট্রেন ধরে সন্ধ্যের কিছু আগে আমার 'শিয়ালকোট-লজে' এসে পৌঁছুলাম। এবার বাড়িতে প্রায় দিন কুড়ি গরহাজির ছিলাম—

আমার চাকর আমার আগে-আগে বুল-ডিয়ারটা নিয়ে ঘুরে গেছে। আমি ধীরে সুস্থে আস্তে-আস্তে আসছি। কদিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ পরেশান হয়েছিলাম—দীনদয়ালকে বলে দিয়েছিলাম—মাঠা যেন তৈরি রাখে—গিয়েই একগ্লাস খেয়ে নেবো—

কিন্তু গেট্ দিয়ে ঢুকতেই দেখি মিসেস স্বামীনাথন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কাছাকাছি আসতেই দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

বললে—জয় রামজী কি—

তারপর সামনে এসে দাঁড়াতেই বললে—আপনি শিকারপ্রিয় লোক আমি জানতাম না—

আগাগোড়া ক্রেপ্-সিল্কের বুটিদার শাড়ি-ব্লাউজ মিসেস স্বামীনাথনের পরনে। জরিদার একজোড়া পা-ঢাকা চটি—দুদিকের ব্লাউজের নীচে থেকে সমস্ত হাতদুটো মাস্ল্-ওয়ালা—মোদ্দা কথা আমাদের গুজরানওয়ালা লাহোরের মেয়েদের পর্যন্ত হারিয়ে দিতে পারে পাঞ্জায়—এমনি তাকত-ওয়ালা জেনানা—দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

তার পরেই আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে রীতিমতো বাগিয়ে ধরলে—

বললে—ষোল বোরের বন্দুক ব্যাভার করেন আপনি?

বললাম—তিনরকমই আছে, যখন যেটা সুবিধে সেইটে নিই—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—আমার আর আপনার দেখছি একই—হল্যাণ্ড অ্যাণ্ড হল্যাণ্ড—আপনি কী কার্ট্রিজ কেনেন?

—তার কিছু ঠিক নেই, আজকের বুল-ডিয়ারটা মেরেছি বাকশটে—যখন যেটা সুবিধে হয়, কখনও এল-জি, কখনও এস-জি—

—অ্যাল্ফা ম্যাক্স—?

—তারও কোনো ঠিক নেই—তবে অ্যাল্ফা ম্যাক্স-ই আমি পছন্দ করি—

মিসেস স্বামীনাথন বন্দুকটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, ট্রিগার টিপছে, কাঁধের ওপর রেখে 'এইম্' করছে—হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা যেন জখম হয়ে আছে। আঙুলটা কাটা।

দীনদয়ালকে দিয়ে দোস্ত-দোস্তালি সকলের কাছে কিছু কিছু মাংস পাঠিয়ে দিলাম। সুবেদার কেদার সিং-এর কাছ, এতোয়ারিতে মুন্সিজীর কাছে, আরো অনেকের কাছে,—আর পাঠালাম একতলায় মিসেস স্বামীনাথনের কাছে।

সেইদিন থেকে ঘনিষ্ঠতা শুরু হলো। সকালবেলায় সাইকেল চড়ে মিসেস স্বামীনাথন যখন বাজার করে ফেরে তখন বেশ দেখায়। পিঠে বেণী ঝুলিয়ে দিয়েছে, সিল্কের ঢিলে পায়জামা, গায়ে একটা জুট-সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি আর সামনের বেতের বাস্কেটের মধ্যে আলু, ভিণ্ডি, পরবোল আর ভাজি—এই সব—

হঠাৎ সেদিন আমাকে নেমন্তন্ন করে বসলো মিসেস স্বামীনাথন—

গোয়াড়িঘাট থেকে গ্রীন পিজিয়ন্ মেরে এনেছে দু'তিন ডজন। নতুন বটফল পাকতে শুরু করেছে—বর্ষা শুরু হয়ে গেছে কিনা।

বললে—আজ সকাল-সকাল হ্যারি টাউনে বেরিয়ে গেছে—হাতে কাজ ছিল না, বেরিয়েছিলুম আমার বন্দুকটা নিয়ে, মতলব ছিল 'ডাক' মারবার, কিন্তু...আজ সন্ধ্যে সাতটায় আসছেন তো, হ্যারিকে বলেছি সে-ও আসবে তার আগেই—

সেদিনকার নেমন্তন্নটা বিশেষ করে মনে আছে, এই পঁচিশ বছর পরেও কারণ অমন মাংসের রোস্ট্ জীবনে আর খেলুম না—আর খাবোও না। শুনেছিলাম মিসেস স্বামীনাথন নিজে রান্না করেছিল—

সন্ধ্যে সাতটার সময় নেমন্তন্ন। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে সাতটা বুঝি আর বাজে না! কারণ তখন দীনদয়ালের রান্না খেয়ে-খেয়ে আমার অরুচি হয়ে গিয়েছে। আর তা ছাড়া গ্রীন পিজিয়নটা বরাবরই আমার প্রিয় খাদ্য। তার কাছে কোথায় লাগে মাটন, কোথায় লাগে ফাউল। যা হোক্, ঘড়ির কাঁটায় সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমি একতলায় গিয়ে হাজির হয়েছি। মিসেস স্বামীনাথন সেদিন পুরোপুরি বাঙালী সাজে সেজেছিল। একটা পীককের গায়ের রঙের মতো ব্রাইট জর্জেট-শাড়ি ফিগারটাকে লেপ্‌টে জড়ানো, আর চিতাবাঘের মতো ডোরা-ডোরা ছিটের ব্লাউজ কাঁধ পর্যন্ত, তার নীচের বাচ্চা হরিণের মতো নরম মোলায়েম দুটো হাত। বন্দুক হাতে যে-মিসেস স্বামীনাথনকে দেখেছি গুজরানওয়ালার মেয়েদের মতো কর্কশ-কঠিন, কী জানি কেমন করে কেউটে-সাপের ফণার মতো হাতের মাস্‌ল্‌গুলোকে সেদিন সে লুকিয়ে ফেলেছে।

আমি যেতেই পরদা সরিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলে। বললে—আসুন মেটাজী—

বললাম—মিষ্টার স্বামীনাথন কোথায়?

—হ্যারি এখনই এসে পড়বে, বোধ হয় কোনো কাজে আটকে পড়েছে, সেলস্‌ম্যানের কাজ বড় বিশ্রী কাজ মেটাজী, প্রত্যেককে প্লীজ করতে করতে অস্থির—

টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসলাম দুজনে।

বললাম—ওঁর ব্যবসা তো অনেক ভালো, আর আমাদের দেখুন তো, মাসের মধ্যে পনেরো দিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়—শরীরের আর কিছু থাকে না—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—তা হোক, কিন্তু হ্যারি যে বাইরেই যেতে চায় না, বিয়ের আগে ওর ভালো একটা চাকরি ছিল, ছ শো টাকা মাইনে পেতো—সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন এই মোটরের সেলস্‌ম্যানশিপ ধরেছে। এখন কত বলি একটু বাইরে ঘোরাঘুরি করো—তা যাবে না—আমাকে ছেড়ে বাইরে গিয়ে একটা রাত কাটাতে পারেনা ও—এমন ঘরকুনো—

হেসে বললাম—সে তো যে-কোনো স্ত্রীর পক্ষেই ঈর্ষার বিষয়, মিসেস স্বামীনাথন,—কিন্তু ছ শো টাকার চাকরিটা ছাড়লেন কেন—আজকালকার বিজ্‌নেসের বাজার যে-রকম—

—না ছেড়ে যে উপায় ছিল না মেটাজী, তখন এমন ব্যাপার হয়ে পড়েছিল, চাকরি তো চাকরি, হ্যারির জীবন নিয়ে টানাটানি, আমার রীতিমতো ভয় হয়ে গিয়েছিল—

—কেন?

—হয়তো আত্মহত্যা করে বসতো। বলা তো যায় না—

—কেন, আত্মহত্যা করবার কী হয়েছিল?

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির পাগলামির কথা তো সব জানেন না—পুরুষমানুষ যে অমন সেন্টিমেন্টাল হতে পারে তা হ্যারির সঙ্গে মেশবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না—জানেন, তিনবার ও সুইসাইড করতে গিয়েছিল—

—কেন! আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

—আমার সঙ্গে বিয়ে হবে না বলে—হাসতে হাসতে মিসেস স্বামীনাথন বললে।

তার পর বললে—আমরা হলাম গোঁড়া হিন্দু বাঙালী—বাবা সাহেবী খানা খেলেও হিন্দুয়ানি আমাদের বংশের রক্তের মধ্যে শেকড় বসিয়েছে, আর তা ছাড়া তখন আমার হাতে চা খেতে বি-সি-এস থেকে শুরু করে আই-সি-এস পর্যন্ত পাঁচ ছ'জন ক্যাণ্ডিডেট তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে মোটর ড্রাইভ করে রোজ সন্ধ্যেয় আমাদের বাড়ি আসছে...আর হ্যারি ভারি তো ছ শো টাকা মাইনের মার্কেনটাইল ফার্মের একাউনটেন্ট—আমাকে কিনা বিয়ে করবার সাধ তার—সেন্টিমেন্টাল না তো কী বলব ওকে বলুন—

বেশ আগ্রহ হচ্ছিল গল্প শুনতে। মিসেস স্বামীনাথন গল্প বলবার সময়ে ঠোঁটের যে অপূর্ব ভঙ্গী হচ্ছিল তাতে সেন্টিমেন্টাল হ্যারি কেন, যে-কোনো পুরুষের আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

বললাম—তার পর—

খিল খিল করে হেসে উঠলো বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন। বললে—তার পর তো দেখছেনই এখন মিসেস স্বামীনাথন হয়েছি—কিন্তু হ্যারি ওমনি ছাড়ে নি আমাকে—অমন নাছোড়বান্দা পুরুষমানুষও আমি দুটো দেখি নি, মেটাজী—এই দেখুন না—বলে হাতের কাটা আঙুলটা দেখালে উঁচু করে—

বললে—সারা শরীরে আমার খুঁত নেই কোথাও—অন্তত আমার অ্যাডমায়ারাররা তাই বলতো—কিন্তু সারা জীবনের এই খুঁতটি আমার করে দিয়েছে হ্যারি—

গল্প আরো জমে উঠেছে। বললাম—কেন?

হঠাৎ হাতঘড়িটার দিকে চাইলে মিসেস স্বামীনাথন।

বললে—রাত নটা বাজতে চললো এখনও তো হ্যারি আসছে না—

বললাম—আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না, মিসেস স্বামীনাথন—

—তা হোক কতক্ষণ আর অপেক্ষা করা যায়, আসুন আমরা আরম্ভ করে দিই—হ্যারি নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে গেছে—

তার পর শুরু হলো ডিনার। অপূর্ব রান্না, অপূর্ব তার টেস্ট। জীবনে সেই ডিনারের কথা আর কোনোদিন ভুলবো না। খেতে খেতে আমাদের গল্প চলতে লাগলো। বললাম—তার পর, বলুন—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—সেইদিনের ঘটনাটা বলি—মজুমদার আসবার কথা আছে, আসবার কথা আছে দীপেন কুমার আর অলকের—কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই হ্যারি দুপুরবেলা বাড়িতে এসে হাজির ওর মোটর-বাইক নিয়ে—অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে হ্যারি—

যেতে হবে শিকারে। ঠিক ছিল ফিরে আসবো সন্ধ্যের আগে। কিন্তু হলো না। নোয়ামুণ্ডির জঙ্গলে গোটাকতক তিতির মেরে ফিরে আসছি—হ্যারি বললে বড়বিল সাইডং-এর ধারে একটু বিশ্রাম নিতে ; বিশ্রাম আর নেব কী বলুন, নোয়ামুণ্ডি থেকে চাইবাসায় আসতে ইঞ্জিন চালাতেও হবে না—এমন ঢালু রাস্তা, শুধু চেপে বসলেই হলো এমন গড়ানে, তবু হ্যারি নাছোড়বান্দা, বললে—একটু বিশ্রাম করতেই হবে—সেইখানে বসেই হ্যারি কাণ্ডটা বাধালে—

বললাম—কোন্ কাণ্ড?

মিসেস স্বামীনাথন আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললে—আপনি আর একটু দো-পেঁয়াজি নিন মেটাজী—আপনার হয়তো লজ্জা হচ্ছে—

খানিক পরে মিসেস স্বামীনাথন আবার বলতে শুরু করলে—সেইখানে বসে আমরা চা-পান শেষ করলাম, তার পর বোধ হয় একটু ক্লান্তি এল হ্যারির শরীরে—ও শুয়ে পড়লো আমার কোলে মাথা রেখে। তাতেও দোষ ছিল না, কারণ কোলটা আমার হলেও, কেউ-না-কেউ শোবার জন্যেই তো হয়েছে ওটা—সুতরাং আমি আপত্তি করি নি—কিন্তু বিপদ ঘটলো তার পর। হ্যারি বললে, আমি যদি হ্যারিকে বিয়ে না করি তো ও আত্মহত্যা করবে। তা কী করে হয় বলুন, আমরা হলুম হিন্দু বাঙালী আর ও হলো মাদ্রাজী ক্রিশ্চিয়ান। আর তা ছাড়া মজুমদারকে প্রায় একরকম কথা দেওয়াই হয়ে গেছে—কিন্তু হ্যারি বললে আমার কোলে শুয়েই সে আত্মহত্যা করবে, আমাকে না পেলে ওর নাকি মরা-ই ভালো। তা ভালো তো ভালোই, কি বলুন, কিন্তু আমাব সামনে আর আমার কোলে শুয়েই বা আত্মহত্যা করা কেন—আড়ালে করলেই তো চুকে যায় ঝঞ্ঝাট....আপনাকে আর স্লাইস রুটি দেব, মেটাজী—

খানিক থেমে মিসেস স্বামীনাথন আবার আরম্ভ করলে—আমি বিরক্ত হয়ে কোল থেকে হ্যারিব মাথাটা দিলাম সরিয়ে। ও-ও আপত্তি করলে না, কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই আমার বাবো বোরের বন্দুকটায় একমুহূর্তে একটা এল-জি পুরে নিয়ে নিজের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলে—আর সঙ্গে সঙ্গে —আপনি আর-একটু কারি নিন. মেটাজী—কিছুই খেলেন না দেখছি..

বললাম—ও কথা থাক, আপনি বলুন তার পর কী হলো—

মিসেস স্বামীনাথন বললে—দশটা বাজতে চললো, এখনও দেখছি হ্যারি আসছে না—নিশ্চয়ই কোনো কাজে আটকে পড়েছে—কী বলেন—

বললাম—তার পর বলুন—

—তার পর আর কি—এই তো আমার মাঝখানের আঙুলটা দেখছেন, আধখানা উড়ে গেছে, এ ওই হ্যারিকে কেবল বাঁচাবার জন্যে—আমিও তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ধরে বাধা দিতে গেছি, কিন্তু দেরি হয়ে গেল একটু—হ্যারি বাঁচলো এইটুকুর জন্যে, কিন্তু আমার আঙুলটা...বাইরে যেন সাইকেল-রিক্সার ঘণ্টা বাজলো, না মেটাজী?

মিসেস স্বামীনাথন টেবিল ছেড়ে উঠলো। বললে—এক্সকিউজ মি—এতক্ষণে বোধ হয় হ্যারি এল—

সত্যিই হ্যারি সাইকেল-রিক্সায় এল। কিন্তু সেই সময়, ঠিক আমাদের গল্পের চৌমাথায় পৌঁছুবার আগেই হ্যারি না-এলেই যেন ভালো করতো। পরে অনেকবাব ভেবেছি, সেদিন আমার সামনে অমন অবস্থায় মিসেস স্বামীনাথনের স্বামী কেন এল। কেন এল-না আরো অনেক পরে, যখন খাওয়াদাওয়া সেরে আমি আমার ঘরে চলে আসতুম। তা হলে মিসেস স্বামীনাথনও অমনভাবে ধরা পড়তো না।

সেই রাত্রে মিসেস স্বামীনাথনের যে-ব্যবহার দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। আর সে ব্যবহার কিনা করলো আমারই উপস্থিতিতে।

রিক্সার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে মিসেস স্বামীনাথন মাতাল হ্যারিকে পেছন থেকে ধরে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। হ্যারি তখন বেশ টলছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ভালো করে।

আমাকে চিনতে পেরে হ্যারি বললে—হ্যাল্লো বয় -

তারপর কী একটা বেয়াদরি করতেই মিসেস স্বামীনাথন এক কাণ্ড করে বসলো।

মিসেস স্বামীনাথনের শরীরে আবার সেই কর্কশ-কাঠিন্য ফুটে উঠেছে? বলে উঠল—স্কাউড্রেল...?

তার পর হ্যারির চুলের মুঠি ধরে সে কী ঝাঁকুনি। অচৈতন্য হ্যারির চেতনা ফিরিয়ে আনবার অনেক চেষ্টা হলো। শেষে আমার দিকে একবাব কাতর চাউনি দিয়ে হ্যারিকে বেডরুমে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে—

পাশের ঘরে যেতে যেতে হ্যারি আমার দিকে ফিবে বললে—চিয়ারিউ, বয়—চিয়ারিউ—

তখনও বাকি ছিল পুডিং আর কফি। আমার ডিনার শেষ হলো না। মিসেস স্বামীনাথনকে সেই অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাবার জন্যে আমি নিঃশব্দে ওপরে আমার ঘরে চলে এলাম। মনে হলো—মিসেস স্বামীনাথনের অপমান যে-ই করুক--তা দাঁড়িয়ে দেখাও যেন অপরাধ।

টি-আই বুড়ো অ্যান্টনি বললে— সো ভেবি ইণ্টারেস্টিং—তার পর, মিষ্টার মেটা—

মুদেলিয়ার বললেন—ড্রান্‌কার্ডস আর অলওয়ের স্কাউড্রেলস্--ঠিকই হয়েছে—

সোনপার সাহেব বললেন—বাজে কথা, আমি ত বরাবরই ড্রিঙ্ক করি, তবে মডারেট ডোজে—কিন্তু আমার ফার্স্ট ওয়াইফ কখনো আপত্তি করেন নি—বরং—-

মুদেলিয়ার বললেন—তা তো করবেই না, আমি শুনেছি বেঙ্গলী গার্লরা কোলকাতার হোটেলে পাবলিক্‌লি স্মোক আর ড্রিঙ্ক করে—

সোনপার সাহেব বললেন—আই টেক সিরীয়স অবজেক্‌সন টু ইট—

টি-আই অ্যাণ্টনি বললে—চুপ করুন আপনারা

—তার পর বলুন মিঃ মেটা—

গুরুবচন মেটা আবার বলতে শুরু করলেন। বিলাসপুরে রেলওয়ে কলোনি তখন নিস্তব্ধ। রাস্তার আলোগুলো চুপচাপ প্রহরীর মত ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু বিলাসপুর ইয়ার্ডে শাণ্টিং-এর শব্দ মাঝে মাঝে আকাশকে চমকে দেয়। আর, এই ইন্‌স্টিটিউটের ভেতরে বিলিয়ার্ড খেলা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দিল্লীর রেডিওতে তখন দরবারী কানাড়ায় খেয়াল ধরেছে কোনো ওস্তাদজী।

মেটাজী বললেন—তার কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল মিস্টার স্বামীনাথনের সঙ্গে

বাড়ির বাইরে। আমি ট্রেন থেকে নেমে 'কিংসওয়ে'তে খেতে গেছি—রাত্রির খাওয়াটা ওখানেই সেরে নেওয়ার মতলব—কারণ ট্রেন লেট্ ছিল আর এত দেরিতে আবার দীনদয়াল কেন কষ্ট করবে এই ভেবে। হঠাৎ দেখি, হ্যারি স্বামীনাথন দূরে একটা টেবিলে বসে আছে। সঙ্গে আর একটি মেয়ে—বাঙালী নয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—

আমাকে দেখতে পেয়েই হ্যারি নিজের বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে উঠে এল। এসে আমার সামনের চেয়ারেই মুখোমুখি বসল। বললে—গুড্ ইভনিং, বয়—

দেখলাম, নেশা বেশ হয়েছে। এবং ক্রমে আরও হবার আশা আছে—

আমার খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—আমি উঠি—

—সে কি, একটু খাবেন না—

আমার আপত্তিতে হ্যারি আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না। বললে—ভালো কথা, একটা কথা আপনাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করবো ভাবি—

—কী কথা—

—এই-যে রাত্রে বাড়িতে ফিরে সুজাতার সঙ্গে আমি প্রায়ই ঝগড়া করি, আপনি টের পান? কী যে ওর স্বভাব মশাই। সকলে সব জিনিসে রস পায় না, তা না পাক, ধরুন আমার মদ খেতে ভালো লাগে, সুজাতার ভালো লাগে না। তোমার ভালো লাগেনা তুমি খেও না, কিন্তু আমি যদি খাই তুমি বাধা দেবার কে—ঠিক কিনা বলুন—এখন এই নিয়ে রাত্রে মশাই রোজ আমাদের ঝগড়া হয়—

বললাম—এবার তা হলে উঠি—

—কিন্তু আপনি উত্তর দিলেন না তো?

—কীসের উত্তর?

—ওই আপনি টের পান কিনা—

—কেন বলুন তো, আমি পেলেই বা..

—সেই কথাটা সুজাতাকে একবার বোঝান দিকি, আমিও যত বলি মেটাজী টের পেলেই বা, সুজাতা বলে—তুমি শেমলেস্ হতে পারো কিন্তু আমার লজ্জা করে। অর্থাৎ আমি যে মদ খাই এটা যেন দোষের নয়, দোষটা হলো আপনার টের পাওয়াতে—

বললাম—মিসেস স্বামীনাথন যখন চান না—তখন আপনি ওটা খান কেন?

—আপনি বুদ্ধিমান হয়ে এই কথা বলছেন—হ্যারি বোতল হাতে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার পর বললে—আপনি আমাদের হিস্ট্রি কিছু জানেন না, আমি ছ শো টাকার চাকরি ছেড়েছি সুজাতার জন্যে, জানেন—নইলে আজ আমি মোটরগাড়ির পেটি সেল্স্ম্যান—তিনবার আমি সুইসাইড করতে গেছি—তিনবার সুজাতা আমাকে বাঁচিয়েছে—সুজাতা কি আমায় কম ভালোবাসে ভেবেছেন! ওর সব ভালো, অমন সতী স্ত্রী পাওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা? একরাত্তির আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না—আমি যেমন ওর জন্যে আমার চাকরি, আমার সব ত্যাগ করেছি, ও-ও আমার জন্যে ওর বাবার প্রচুর সম্পত্তি স্যাক্রিফাইস্ করেছে—শেষে মজুমদারকে এড়াবার জন্যে আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে—অমন একনিষ্ঠ ভালোবাসার তুলনা হয় না, মেটাজী—কিন্তু ওর ওই এক দোষ—আমার মদ খাওয়া মোটে পছন্দ করে না—কিন্তু ন্যান্সীকে দেখুন—ওই বসে আছে—

দূরের টেব্‌লে বসা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখালে হ্যারি।

বললে—ওই ন্যান্সীকে দেখুন—ওকে আমি যত খাওয়াবো তত খাবে—একবারও 'না' বলবে না—ও এক পিপে মদ খাওয়ালে খেতে পারে—সুজাতাকে কত বলেছি খেতে—কিছুতেই খাবে না, মাতাল দেখলে এক শো হাত দূরে পালিয়ে যাবে—ওদের আর সব ভালো মশাই, বাঙালী মেয়েরা ওই এক ব্যাপারে ভারি কন্‌জারভেটিব—

সেদিন অনেক কষ্টে মাতালের হাত থেকে ছাড়িয়ে বাড়ি আসতে পেরেছিলাম। দেখেছিলাম, আমি চলে আসতেই হ্যারি আবার ন্যান্সীর টেব্‌লে গিয়ে বসলো।

কিন্তু বাড়ি এসে একটু সকাল সকাল শোবার ব্যবস্থা করছি। রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে। হাওবাগের এ-দিকটা সন্ধ্যে থেকেই অবশ্য নিরিবিলি হয়ে যায়। তারপরে ক্লান্তও ছিলাম খুব। দীনদয়াল এসে খবর দিলে—একতলার মেমসাহেব সেলাম দিয়েছে—

অত রাত্রেই গেলাম নীচেয়। মিসেস স্বামীনাথন একলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। বললে—এবার আপনি অনেকদিন বাইরে ছিলেন মেটাজী—

বললাম—আমার ব্যবসায় শুধু ওই ঘোরাই সার—লাভ বিশেষ কিছু নেই—কিন্তু মিস্টার স্বামীনাথন কোথায়?

মিসেস স্বামীনাথন বেশ চিন্তিত দেখলাম। বললে— সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকেছি, মেটাজী—

বললাম—হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছেন—

—না, কিন্তু ক'দিন থেকেই বেশি রাত্রে ফিরছে হ্যারি—দিন দিন ওর যেন অত্যাচারটা বাড়ছে—দেখুন না, এখন এগারোটা বাজলো, এখনও এল না—আপনার সাইকেলটা একবার দিতে পারেন মেটাজী—আমারটা পাঙচার হয়ে পড়ে আছে কাল থেকে—

—কিন্তু এত রাত্রে সাইকেল কী করবেন—জিজ্ঞেস করলাম আমি!

—আমি হ্যারিকে খুঁজতে যাবো—

—এতবড় শহরে কোথায় খুঁজবেন তাকে?

—জব্বলপুরে যত মদের দোকান আছে, সব জায়গায় খুঁজবো—আজ একটা গাড়ি বিক্রি করবার কথা ছিল ওর—পাঁচ হাজার টাকার 'কার'—আজ কয়েক শো টাকা ওর হাতে আসবার কথা, সেই সকালবেলা বেরিয়েছে, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, তার পর এই রাত হলো...আপনি সাইকেলটা আনিয়ে দিন আমি ততক্ষণে কাপড়টা বদ্‌লে নিই—

বলে মিসেস স্বামীনাথন ভেতরে চলে গেল সেই মুহূর্তে। আমি দীনদয়ালকে ডেকে সাইকেলটায় বাতি জ্বালিয়ে দিলাম। খানিক পরেই মিসেস স্বামীনাথন বেরিয়ে এল অপূর্ব পোশাক পরে। সেই রাত সাড়ে এগারোটায় মিসেস স্বামীনাথনের যে অপরূপ রূপ দেখেছিলাম তা জীবনে ভুলবো না। শালোয়ার আর সেরোয়ানি পরা পাঞ্জাবী মেয়ে হাজার হাজার দেখেছি। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের সেই পোশাকে আমার ব্যাচিলর মনে সেই রাত্রে যে-মোহ বিস্তার করেছিল তা অসহ্য। অত রাত্রে ওই জ্বালা-ধরা পোশাক পরে মাতাল স্বামীকে মদের দোকানে দোকানে ঘুরে খুঁজে বেড়ানো বড় রোমাণ্টিক মনে হয়েছিল আমার সেই তরুণ বয়েসে।

মিসেস স্বামীনাথন সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে— জেণ্টস্ সাইকেল বলেই এই পোশাকটা পরলাম—এতে অন্য কোনো উদ্দেশ্য কিন্তু নেই আমার, মেটাজী—

আমি একবার বললাম—এত রাত্রে আর নাই-বা বেরুলেন, মিসেস স্বামীনাথন—

—ভয়? ভয়ের কথা বলছেন?

মিসেস স্বামীনাথন হেসে উঠলো। বললে...এর চেয়েও অ্যাড্‌ভেঞ্চারাস কত কাজ আমায় জীবনে করতে হয়েছে...আর তা ছাড়া আপনি মেয়েমানুষ হলে বুঝতেন, মেটাজী—হাসব্যাণ্ড যদি মনের মতো না হয়, তার চেয়ে বড় অশান্তি মেয়েদের জীবনে আর কিছু নেই—

তার পর সাইকেলের প্যাডেলে একটা পা রেখে বললে—এ ছাড়াও আপনার তিনমাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়ে আছে, টাকার অভাবেই দিতে পারা যায় নি—কথা ছিল এই টাকাটা পেয়ে ওটা মিটিয়ে দেব—কিন্তু আজ যদি সবটাই উড়িয়ে দেয়, কী সর্বনাশ হবে বলুন তো মেটাজী—হয়তো আমি গিয়ে পড়লে কিছু টাকা অন্তত বাঁচলেও বাঁচতে পারে—

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিল মিসেস স্বামীনাথন।

আমি বললাম—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, হ্যারি হয়তো মদের দোকানে নেই—অন্য কোথাও...

'কিংসওয়ে' হোটেলে হ্যারি স্বামীনাথনকে যে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর সঙ্গে মদ খেতে দেখেছি সে-কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না আমি।

কিন্তু প্রখর-বুদ্ধি মিসেস স্বামীনাথন আমার কথার তাৎপর্য ধরে ফেলেছে এক নিমেষে। কথাটা শুনে যেন হঠাৎ তার মুখ দিয়ে কোনো উত্তর বেরুল না। যেন নিজেকে তার পরাজিত মনে হলো, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। বললে—আপনি যা ভাবছেন তা হতে পারে না, মেটাজী—হতে পারে না, কখনও হতে পারে না—ওই হ্যারি তিনবার সুইসাইড করতে গিয়েছিল আমার জন্যে, ও জানে আমি ওর জন্যে কী-ই না স্যাক্রিফাইস্ করেছি...হ্যারি অমন আন্‌ফেথফুল হতে পারবে না—এখনও যে রাত্রে আমি পাশে না শুলে ওর ঘুম আসে না...কিন্তু...

কথাটা বলে কিন্তু তখনও খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মিসেস স্বামীনাথন। মনে হলো যেন হঠাৎ এক বিদ্যুৎ-ঘোষিত মৌসুমী ঝড় তার মনের আকাশে বইতে সুরু করেছে, তার পর কেউটে-সাপের মতো ফণাটা হঠাৎ বিস্তার করে বললে—আপনি ঠিক বলেছেন...সত্যিই তো কিছুই অসম্ভব নয়...সাইকেলটা একবার ধরুন তো মেটাজী।

মিসেস স্বামীনাথন হঠাৎ নিজের ঘর থেকে বারো বোরের বন্দুকটা বার করে নিয়ে এল। আমি তখন বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি। বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে মিসেস স্বামীনাথন শরীরের বাঁ দিকে।

সেই অবস্থায় সাইকেলটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললে—আমাকে একটা এল জি ধার দিতে পারেন, মেটাজী—

—কেন, এল-জি কী করবেন?

—আগে দিন, তার পরে বলবো—একটু শীগ্‌গির করুন মেটাজী—

দীনদয়ালকে বলে আমার বাক্স থেকে একটা এল-জি কার্ট্রিজ আনিয়ে দিলাম মিসেস স্বামীনাথনের হাতে।

—এবার বলুন এল-জি কী করবেন?—আবার জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

মিসেস স্বামীনাথন বললে—হ্যারির জন্যে আমারও সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি, কিন্তু গড্ ফরবিড্ আপনার কথা যদি সত্যিই হয়, মেটাজী, তখন আমি কী করবো! হ্যারিকে গুলী করা ছাড়া আমার কী উপায় আছে বলুন—ওর মদ খাওয়া আমি তবু টলারেট করেছি, কিন্তু মেয়েমানুষ জড়িত থাকলে আমি ওকে ক্ষমা করবো কী করে, মেটাজী—ওকে আমি খুন করবো এই আপনাকে বলে রাখছি—ওর সঙ্গে যদি মেয়েমানুষ থাকে তো ওকে আমি খুন করব—হাতিয়ার সঙ্গে রাখলুম—যাতে দেরি না হয়—

তার পর একটা কথাও না বলে সাইকেলে উঠে মিসেস স্বামীনাথন অন্ধকারে অন্তর্হিত হলো।

বুড়ো টি-আই এণ্টনি বললে—স্প্লেনডিড, মিস্টার মেটা, স্প্লেনডিড—তার পর—

মুদেলিয়ার স্টেশনমাস্টার বললেন—আমার ছোট ছেলের পড়ার বইতে পড়ছিলাম 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জর দ্যান ফিকশন'—কথাটা নেহাত মিথ্যে নয় তা হলে—

সোনপার সাহেব বললেন—জীবন সম্বন্ধে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা আপনার মুদেলিয়ার গারু, চোদ্দ বছর বয়েসে রেলে ঢুকেছেন, খেয়েছেন চারুপানি আর ঘষতে ঘষতে আজ বিলাসপুরের স্টেশনমাস্টার—ভাবছেন চরম স্যাল্‌ভেশন পেয়ে গেছেন—কিন্তু জীবনের জানলের কী—একটু মদও খেলেন না—একটু মদও খেলেন না—একদিন অফিস কামাইও করলেন না, কখনও বে-নিয়মও করলেন না জীবনে—

গুরুবচন মেটা বললেন—অন্য কথা থাক, গল্পটা শেষ করে নিই—রাত অনেক হয়ে গেল...

ইনস্টিটিউটের সমস্ত ঘর অন্ধকার। পেণ্ড্রা রোডের দিক থেকে একটা মালগাড়ি ক্লান্ত গতিতে আসছে। দূরে লোকো-শেডের দেয়ালে ইঞ্জিন-গর্জনেব প্রতিধ্বনি বার বার রেল-কলোনির নিস্তব্ধতা ভেঙে দেয়। প্লাটফরমের চায়ের দোকানটি পর্যন্ত এখন বন্ধ হয়ে গেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি হয়ে গেল কিন্তু মনসুন এখনও শুরু হলো না।..

—তার পর সেই রাত্রে ওপরে নিজের ঘরে শুয়ে-শুয়ে অনেকবার ভেবেছি। ভেবেছি—'কিংসওয়ে' হয়তো এতক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যারি সেখানে নেই। হয়তো ন্যান্সীর সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে মিসেস স্বামীনাথনের একী ভয়াবহ কাণ্ড। সারাদিন হ্যারির নাওয়া খাওয়া নেই তাই মিসেস স্বামীনাথনও উপোস করেছে সারাদিন। তার পরে এই ক্লান্ত উত্তেজিত অবস্থায় এত রাত্রে বারো বোরের বন্দুক আর ধার-করা এল-জি কার্ট্রিজ নিয়ে পরের সাইকেল চড়ে স্বামীর খোঁজে মদের দোকানে দেখতে যাওয়া—এ-নিয়ে যদি কেউ গল্প লেখে তো মনে হবে গাঁজাখুরি, কিন্তু নিজের চোখেই তো দেখলাম। আমার মনে হলো—আর কোনো দেশের মেয়েরা এমন করে এমন অবস্থায় বেরুতে পারতো না, এক বাঙালী মেয়েরা ছাড়া। আর আমার নিজের জাত শিয়ালকোট-গুজরানওয়ালার মেয়েদের কথা জানি—তারা ওই দূর থেকেই যা—

সে যা হোক—সে রাত্রে অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে-শুয়েই জেগে থাকবার চেষ্টা করেছিলাম—ওদের ফেরার খবর পাব বলে। হ্যারি রাত্রে ফিরবেই এমন ধারণা আমার ছিলই। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সী সঙ্গে থাকলেই শুধু বিপদ ঘটবে তাও জানতাম। আর এ-ও জানতাম হ্যারিকে খুন করতে পেছপাও হবার মতো মেয়ে মিসেস স্বামীনাথন নয়। কারণ হ্যারিকে মিসেস স্বামীনাথন যেমন গভীর করে ভালোবাসে তেমন করে ক'জন মেয়েমানুষ তাদের স্বামীকে ভালোবাসতে পারে?

কিন্তু কোন্ দিকে কখন সে-রাত্রে চোখে ঘুম নেমে এল টের পাই নি। পরের দিনও আবার সকাল হবার আগেই জব্বলপুর ছেড়ে ভোরের ট্রেন ধরে ভুসাওয়াল যেতে হলো।

কয়েকদিন পরে যখন ফিরে এলাম 'শিয়ালকোট-লজ'-এ, তখন সে-প্রসঙ্গ বাসী হয়ে গেছে। সুজাতা স্বামীনাথনকে দেখি সাইকেল চড়ে বেতের বাস্কেটে করে বাজার করে আসে। তার পর হ্যারি স্যুট্ টাই পরে সাইকেল-রিক্সায় চড়ে কোথায় বেরিয়ে যায়। আবার ফেরে অনেক রাত্রে। একটা টিমটিম আলো জ্বালিয়ে সাইকেল-রিক্সায় চড়ে।

সেদিন সেই রাত্রে তবে কি হ্যারিকে 'কিংসওয়ে'তেই পাওয়া গিয়েছিল? ন্যান্সী কি ছিল না সঙ্গে? আমার ব্যাচিলর মনে এ-সব প্রশ্ন মাঝে মাঝে আলোড়ন করতো।

সেদিন সুজাতা স্বামীনাথন সোজা চলে এল ওপরে আমার এলাকায়।

বললে—একটা কথা আপনাকে বলতে এসেছিলাম—মেটাজী—

বললাম—বসুন, আমারও অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে—আপনার কথাটাই আগে বলুন—

সুজাতা বললে—তাই বলি। আপনার সেই এল-জি কার্ট্রিজ-টা আমার কাছেই রয়েছে—কাজে লাগেনি—ওটা এখনও কিছুদিন থাক আমার কাছে—দরকার না হলে ফিরিয়ে দেব আপনাকে—আপত্তি নেই তো—

বললাম—এবার আমার কথাটা বলি—সেদিন রাত্রে আপনাকে বন্দুক-হাতে একলা ছেড়ে দিয়েছিলাম—পরে মনে হলো সঙ্গে গেলে হতো—ঝোঁকের মাথায় কী হয়তো করে বসবেন—দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমার এখনও ভালো জ্ঞান হলো না, মিসেস স্বামীনাথন—

সুজাতা বললে—দেখুন, হ্যারিকে যদি আমি কোনওদিন খুন করি তো সে একা আমার দায়িত্বে—এ ব্যাপার সম্পূর্ণ আমার আর হ্যারির, এতে কোনও থার্ড পারসন নেই...

বললাম—আপনি কি সত্যই ও-বিষয়ে সিরীয়স—

—নিশ্চয়ই। আপনি জানেন না মেটাজী, আমি অন্য বাঙালী মেয়ের মতো মানুষ হই নি—আমার শিক্ষা-দীক্ষা সব আলাদা—সেদিন রাত্রে হ্যারির খোঁজে বেরিয়েছিলাম আপনার সাইকেল আর এল-জি নিয়ে, ভাববেন না ঠাট্টা করতে বা ভয় দেখাতে—আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি হ্যারি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না—ওই মদের ওপরেই যা দুর্বলতা আছে ওর—আর কোনও কিছুতে নেই, মেটাজী—হ্যারি মিছে কথা বলবার লোক নয়—কিন্তু যদি..

বললাম—সেদিন শেষ পর্যন্ত কোথায় দেখা পেলেন ওর—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—ও বাড়ির দিকেই আসছিল—সারাদিন সেই মোটর বিক্রি নিয়ে এমন পরিশ্রম গিয়েছিল যে, বাড়িতে এসে খাবার সময় পর্যন্ত পায় নি—তবে স্বীকার করলে ও যে মদ খেয়েছিল—এই নিন চার মাসের বাকী ভাড়া—একটা রসিদ সময় মতো পাঠিয়ে দেবেন—

কী জানি কেন তখনও সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে ন্যান্সীর কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারলাম না।

কিন্তু যাবার সময় সুজাতা বললে—কিন্তু এ-ও বলে রাখছি মেটাজী, যদি কোনোদিন আমি চাক্ষুষ প্রমাণ পাই, সেদিন আমি হ্যারিকে...আমার ওই বারো বোরের বন্দুকে এল-জি লোড্ করে রেখেছি—ওকে আমি খুন করবোই—আপনিই সেদিন আমার প্রথম চোখ খুলিয়ে দিয়েছেন—

বললাম—না, না, মাফ করবেন সুজাতা-বাঈ, আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই দেখি নি—

সুজাতা স্বামীনাথন বললে—না, শুধু আপনি নন, আরো অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে, হ্যারিকে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে নানা জায়গায় দেখা যায়, কিন্তু আমি নিজে যদি কোনওদিন চোখে দেখতে পাই তো খুন করবো ওকে। আমি আমার বাবা মা ভাই বোন আর বাবার প্রচুর সম্পত্তি পায়ে ঠেলে শুধু ওর টানে চলে এসেছি। শেষকালে সেই হ্যারি যদি আন্‌ফেথফুল হয় তা হলে...সে আপনি ব্যাচিলর মানুষ ঠিক বুঝবেন না..

গুরুবচন মেটা আবার আরম্ভ করলেন—ঈশ্বরের কী ইচ্ছে ছিল কে জানে। ঠিক তার পরদিনই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। সেদিনও জুন মাস, মনসুন আরম্ভ হয় নি। চুপচাপ ওপরের পশ্চিমমুখো বারান্দায় বসে আছি। কোনো কাজ নেই হাতে। সামনের বাগান পেরিয়ে বি-এন-আরের আমবাগানের দিকে চেয়েছিলাম। আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। দীনদয়াল একগ্লাস ঠাণ্ডা মাঠা দিয়ে গেছে। তাও খাওয়া শেষ করে খালি গেলাসটা [illegible]ব চেয়ারের ওপর রেখে দিলাম। সানি-ভিলার দিকে হাওবাগ স্টেশনে বুঝি কোনো মালগাড়ি এল। ওদিকের আকাশটা ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় কালো হয়ে আসছে। আমার সামনের বাগানের দিকে চেয়ে দেখলাম, সুজাতা স্বামীনাথন সাইকেল চড়ে চৌক থেকে ফিরল মার্কেটিং করে। ওপর দিকে চাইতেই দুজনে [illegible] করলাম। তার পর আধঘণ্টাও কাটে নি, দেখি একটা সাইকেল-রিক্স আসছে আমারই 'শেয়ালকোট লজ' লক্ষ্য করে। দূরে থাকতে দেখতে পাওয়া যায় নি। গেট্-এর মধ্যে সাইকেল-রিক্সটা ঢুকতেই নজরে পড়লো হ্যারি একলা নয়। প্রচুর মদ খাওয়ার জন্যে নিজে একেবারে অর্ধ-বেহুঁশ, আর সঙ্গে সেই ন্যান্সী—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। সে-ও প্রকৃতিস্থ বলে মনে হলো না।...

নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হলো না। এখানে ন্যান্সীকে নিয়ে এল কেন? তবে হয়তো ওর খেয়াল নেই। দুজনে কিংসওয়ে থেকে বেরিয়ে কোথায় যেতে কোথায় চলে এসেছে। কিংবা হয়তো পুরনো রিক্সওয়ালা। রোজকার অভ্যাসমতো বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছে। ওরা দুজনেই জানে না, কোথায় কোন্ বাড়িতে এসে ওদের নামিয়েছে রিক্সওয়ালা—

উত্তেজনায় সমস্ত নার্ভ আমার শিথিল হয়ে এল। এখনি যে বিপদ ঘটবে, তা ওরা কেউ জানে না। অথচ কালকেও আমার কাছে সুজাতা স্বামীনাথন যে প্রতিজ্ঞা করে গেছে—ও মেয়ে তো সে-কথা ভোলবার নয়!

মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমার থরথর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো, এখনি একতলায় একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে আর তার পর দুটো না হোক, একটা লাইফ সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক 'এইম্' করে মারতে পারলে একটা টাইগারের লাইফ-এর পক্ষেও একটা এল-জি যথেষ্ট।

কথাটা মনে পড়তেই আরো আতঙ্ক হলো আমার। ওটা তো আমার এল-জি। যদি প্রমাণ হয়, আমিই সুজাতাকে ও এল-জি'টা দিয়েছি, তা হলে মার্ডার চার্জে তো আমিও পড়বো। হ্যারির বডি থেকে যদি এল-জি'টা বেরোয়। তার পর সুজাতা স্বামীনাথনের সঙ্গে ব্যাচিলর বাড়িওয়ালা গুরুবচন মেটার একটি কল্পিত সম্পর্ক খাড়া করে দিয়ে হ্যারি স্বামীনাথনকে খুনের অপরাধের...

আর ভাবতে পারলাম না।

কান পেতে রইলাম উদ্গ্রীব হয়ে। নীচের ওদের তুমুল ঝগড়া চলেছে। মাঝে মাঝে সুজাতার

গলা। তার পর হ্যারির। হ্যারি মদ খেলেও মনে হলো যেন সেন্স ঠিক আছে তার। এইবার বুঝি সুজাতা স্বামীনাথনের বারো বোরের বন্দুকটা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে উঠবে...

গুরুবচন মেটা থামলেন।

আজাইব সিং বললেন—থামলেন কেন, মেটাজী—

বুড়ো টি-আই এণ্টনি বললে—শেষ হয়ে গেল নাকি—

সোনপার সাহেব বললেন—বন্দুকের শব্দটা শেষ পর্যন্ত হলো কিনা বলুন মেটাজী, আর দেরী করবেন না—

মুদেলিয়ার বললেন—সুজাতা কি দুইজনকেই মারলো, না, একজনকে মারলো—

সোনপার সাহেব বললেন—আপনার যেমন চাকপানি-খাওয়া বুদ্ধি, মুদেলিয়ার গারু! এল-জি তো একটা শুনে আসছেন। দুজনকে মারবে কী করে—

মুদেলিয়ার বললেন—তবে কি নিজেই আত্মহত্যা করলো নাকি সুজাতা? বড় সমস্যায় ফেলেছেন—উঃ—

গুরুবচন মেটা মিটমিট হাসতে লাগলেন। বললেন—আপনারা এ-কাহিনীর যত কিছু পরিণতি ভাবতে পারেন ভাবুন, কিন্তু আমার ধার কাছ দিয়েও ঘেঁষতে পারবেন না, এই আমি বলে দিলাম।

টি-আই বুড়ো এণ্টনি সামনে মুখ এগিয়ে নিযে এসে বললে—আর বাজে কথা বলবেন না স্যার, শেষটা বলে দিন দয়া করে—

গুরুবচন মেটা বললেন—আপনাদের আমি গোড়াতেই বলেছি যে, গল্পটা যেখানে আমি শেষ করবো তার পরে আমাকে আর কেউ কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। আপনারা জানেন বোধ হয় যে, গল্প যেখানে শেষ হয়, জীবন সেখানে শেষ হয় না। জীবন বিস্তীর্ণ ব্যাপক, কিন্তু গল্প জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠলেও এক জায়গায় তার ক্লাইম্যাক্স আছে। সেখানে এসে গল্পে দাঁড়ি টানতে হয়। আমার সেই শর্ততে আপনারা রাজী হয়েছিলেন, মনে আছে বোধ হয়...যা হোক এখনই শেষ অধ্যায়টা বলি...

একটু থেমে মেটাজী বলতে লাগলেন—সেই রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বারান্দায় ছটফট করছি, কী হবে, কী হবে! ভাগ্যিস দীনদয়াল বাড়ি ছিল না, চৌকে গিয়েছিল ভইষের খড় কিনতে, নইলে সে-অবস্থায় আমাকে দেখলে হয়তো পাগল ভাবতো। তার আসতে প্রায় একঘণ্টা দেরি। হঠাৎ মনে হলো নীচেকার গোলমাল যেন থেমে এল।—পাশের সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে মুখ ফিরিয়ে যা দেখলাম, তাতে অবাক্ হয়ে গেছি! আর কেউ নয়। মিসেস স্বামীনাথন দৌড়ুতে দৌড়ুতে ওপরে উঠছে। মুখখানা লজ্জায় ঘৃণায়, পরাজয়ের কলঙ্কে অপমানে একেবারে থ্যরোলি অন্যরকম দেখাচ্ছে, চোখ ফেটে জল বেরুবে এখনি—

সুজাতা স্বামীনাথন আমাকে কথা বলবার অবসর দিলে না পর্যন্ত। ছুটে এসে আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে—দেখেছেন তো হ্যারির কাণ্ড—

তার পর আমাকে টানতে টানতে বললে—কাম অন্ মেটাজী, কাম্ অন—

আমি হতবাক্ হয়ে সুজাতা স্বামীনাথন-এর পেছনে চলতে লাগলাম।

তার পর আমার শোবার ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে—মেটাজী, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আই মাস্ট বি আন্‌ফেথফুল, আমি . আমি এর প্রতিশোধ নেব...বলে একমুহূর্তে ঘরের একমাত্র দরজাটা বন্ধ করে সজোরে খিল লাগিয়ে দিলে।

কমলকুমার মজুমদার

নিম অন্নপূর্ণা

যূথী বারান্দায় দাঁড়িয়ে সবুজ পাখীটির ঘোরাফেরা দেখছিল, এ সময় তার হাত-দুটি অদ্ভুতভাবে উঁচু করা ছিল, একারণ, যে-ফ্রকটি তার পরনে ছিল সেটিতে একটিও বোতাম নেই এবং বোতামের জায়গা থেকে সোজা শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু-হাট খোলা, ফলে বেচারীকে সর্বক্ষণই সাধারণভাবে চলাফেরার সময় তার আপনকার হাত দুটিকে উঁচু করে রাখতেই হয়, এতে করে মনে হয় তার ভারী আনন্দ হয়েছে—সে খুসী, অন্যথা অর্থাৎ যদি ভুল হয়, যদি সে হাত নামায়, ঝটিতি ফ্রকটি গা বেয়ে ঝরে পড়ে, খুলে পড়ে ; তখন সে, যূথী, সখেদ একটি 'আরে' বলে, পুনরায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জোর পটুত্বের সঙ্গে, ফ্রকটি আপনার কাঁধে তুলে দিয়ে থাকে।

সম্মুখে টিয়া কেমন ঘাড় বাঁকায়, সম্মুখের টিয়া কেমন পক্ষবিস্তার করে—কেমনে পক্ষবিস্তার করত লাল ঠোঁটদ্বারা কি যেন বা পাখাতেই খোঁজে, এসবই তার নজরে পড়েছিল। কখনও বা টিয়াপাখিটি তেতো বিরক্তির সঙ্গে এক পাহাড় ছোলা থেকে শুধুমাত্র একটি তুলে ছাড়িয়ে ফেলে, খোসাটি মাটিতে পড়ে, যূথী তা লক্ষ্য করেছিল এবং সে, তখনই, একটি ঢোক গিলে আর আর দিকে দেখেছিল। এবার, আবার তার সামনে, সবুজ পাখী সাদা দেওয়াল, অতি মনোহর এক দৃশ্য রচিত হয়েছে—তবুও যূথীর চক্ষুদ্বয় দুর্বৃত্ত এবং সে মরিয়া হয়েই, কোনক্রমে, পাখীর বাটিতে আঘাত করে, ফলে দাঁড়টিতে দোলা লাগল, আর সেই সঙ্গেই দুচারটি ছোলাও ছিটকে পড়েছিল, সত্বর তৎপর ছোলাগুলি তুলতে গিয়ে ফ্রকটি তার খুলে যায়, ছোলাগুলি তুলে মুখে পুরেই তবে সে ফ্রকটি ঠিক করে ; এখন, সে দাঁড়ের কাছে এল, এক হাত দ্বারা অন্য হাতের কাঁধের কাছের জামার অংশটি ধরে, ডান হাতখানি জামায় মুছে মুছে আপনাকে প্রস্তুত করছিল, বোধহয় হাতে ঘাম জমেছিল, একথা প্রকাশ থাকে যে জামার একদা রঙীন অদ্য ম্লান ফুলগুলি মুচড়ে মুষড়ে গিয়েছিল। আর পাখীটি ভারী অস্থির, পাখীটি ভারী তেরছা, নিজের দেহেতেই যেন বড় বেশি করে জোট পাকিয়ে গিয়েছে। অবশ্য সে পাখীটি একবারও আওয়াজ করে নি।

এসময়, যূথী একটু ভাবুক হয়েছিল। অন্যমনস্ক হয়েছিল, ভেবেছিল। ভেবেছিল— সে যদি পাখী হত— কেননা সে শুনেছে কোন কোন ময়রা দোকানের ঝাঁপ খুলেই রাস্তায় নামে, হাতে এক চ্যাংয়ারী খাবার, তাতে জিলিপী আছেই কচুরী নিমকি আর আর কি সব আছে, ময়রা 'চিলো চিলো' বলে চীৎকার করে, এবং তার ঘটিয়াল ভুঁড়িখানি নসরপসর, আকাশ চিলে চিলময়—আকাশটা যেমত বা গাড়ীর আড্ডা—ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মত চিলগুলো চিঁহি চিঁহি করে উঠে ; অদনন্তর খাবারগুলি সে, ময়রা, ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আর বলতে থাকে, 'আমরা বাসি খাবার বেচি না, কাউকে দিইও না' ; এখানে অনেক ভিখারীর ছেলেরা দাঁড়িয়ে, কেউ মার কোলে, সকালের সৌখীন রোদ এদের পাশ কাটিয়ে রাস্তায় ইতস্তত, এরা যেমন বা আচারের শিশি থেকে বার হয়ে এসেছে, তারা ময়রার মহানুভবতা দেখে, হাতখানি প্রসারিত করে চিলেদের খাওয়া দেখে।—এই সূত্রে যূথীর, 'ভিখারী' কথাটা মনে পড়তেই, মুখখানি সিঁটিয়ে উঠেছিল, কেননা সে শুনেছে অনেক পাপ, সাতজন্ম পাপ করলেই ভিখারী হয় ; ছেলেমানুষ যূথী একথা স্মরণেই ছোট একটা নমস্কারও করেছিল, অর্থ এই যে, তার অতি বড় শত্রুরও যেন এমন দশা না হয়। নমস্কার যেমন সে করেছিল, তেমন সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, চিলকে দেখলে তার বড় ভয়, সে চিল হতে চায় না, কেননা চিল যদি হয়, তাহলে হয়ত চিলই তার ভয়ঙ্কর ঠোঁট দিয়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। এইটুকু ভাববার পর, সে আর বেশি সময় নেয়নি, একারণে যে বেশি দেরী করলে, এ বাড়ির লোক—নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

ইদানীং পাখীটি কিয়ৎপরিমাণে শান্ত, তার ঠিক কিছু নীচে যূথীর জ্বলজ্বল মুখখানি, ছেঁড়া লাল

পাড় দিয়ে বেড়া-বেণী করা, চোখদুটি পিঙ্গল, এলেবেলে, হিঙ্গুল, মারাত্মক ; মুখের ছোলাগুলি একান্তে ঠেলে দিয়ে, মাথাটা তার কি যেন লক্ষ্য করবার জন্য আনচান করছিল, পরক্ষণেই সে হাতটা তিন তিনবার কপালে আর বুকে ঠুকেই ধাঁ করে দাঁড়টায় যেই না ঠেলা দিতে গেল, পাখীটা তৎক্ষণাৎ তার লাল ঠোঁট দিয়ে যূথীর আঙুলে কামড়ে ধরেছে।

ছেলেমানুষ যূথীর চীৎকারে এই বাড়িখানি যেন 'শ্রীমধুসূদন' বলে উঠেছিল ; পাখীটা এখনও যূথীর আঙুল ছাড়েনি, দাঁত নড়ছে, এবং কয়েকটি ছোলা যূথীর মাথা এবং গা বেয়ে ঝরে পড়ে। কোনক্রমে, ভাগ্যক্রমে সে-আপনার হাতখানি ছাড়িয়ে আনতে পেরেছিল।

যূথী বোকার মতই আঙুলটির দিকে চেয়েছিল কেননা, আঙুল বেয়ে খরধার রক্ত পড়ে, আর যে কোন কিছু করার মত দক্ষতা তার নেই। এবাড়ির বৌটি বয়সে নবীনা, সদ্যস্নাত মুখমণ্ডল, ব্লাউজটি পরা, সবেমাত্র সায়াটি পরে পরণের ভিজে গামছাখানি একহাতে খানিক টেনে যখন বার করছে তৎক্ষণাৎ এই ভয়াবহ চীৎকার তাকে বিদ্রাবিত করে, এবং পরক্ষণেই এই আতঙ্ককারী দৃশ্যে সে বক্ষোহীনা স্পন্দন-রহিত ; ফলে সায়া থেকে উঠা লাল এই গোমছাখানি তার হাতে তেমনি সম্বন্ধ ছিল, সুন্দর খঞ্জন নয়নযুগল—স্ফীত, স্বপ্নহীন, ভীত, শক্ত, উজ্জ্বল, রগছোঁয়া, ভ্রূদ্বয়ে বিদ্যুৎ ইঙ্গিত, দেহ বয়সোচিত ধর্ম্মে উষ্ণ, এতদ্দর্শনে আগুনগরম সুতরাং আপনার আলুলায়িত কেশরাশি—যা সিক্ত—তার ঘাড়ে সপ্‌সপে হিম সঞ্চার করে, তাই তার রোমহর্ষ হয়। এবং এ তরুণ মুখখানি কক্ষের আঁধার থেকে সকালের তীব্র আলোয় ক্ষণেকের জন্য এসেই পুনশ্চ কক্ষে ফিরে যায়।

যূথীর পালাবার কোনই পথ ছিল না। ভয়ে, বিশেষত যন্ত্রণায় এবং কিয়ৎ-পরিমাণে লজ্জায় তার আনন পিঙ্গল, চক্ষুদ্বয় জলে কালো, মুখখানি পার্শ্ববর্ত্তী শূন্যতায় আটকে জমে আড়ষ্ট এমত মনে হয়, আর যে, সে বিবিধ সুকৌশল ভঙ্গী সহকারে তা খুলে আনবার প্রাণান্ত চেষ্টা করে এবং ঠিক এই সময় ডান হাতের আঙুলটি চেপে ধরবার উচিতবুদ্ধি তার হয়েছিল, এতে করে গায়ের জামাটি, খুব আশ্চর্য্য যে, মাত্র এক পাশেই খুলে পড়েছিল। এবং যন্ত্রণায় আর একবার সে চীৎকার করেছিল! এই হৃদয়বিদারক শব্দে পরিচ্ছন্ন, শুভ্র, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত বাড়িখানি বিড়ালের চোখের মত বড় হয়ে গিয়েছিল এবং তন্নিমিত্ত এ গৃহস্থিত চিনিপাতা জীবন মুহূর্ত্তকালের জন্য পাশার অক্ষের মত নিষ্পেষিত শব্দ করে উঠে।

দ্বিতীয় চীৎকারে এবাড়ির বিধবা গিন্নী খেতু মিত্তিরের মা ছুটে আসবার চেষ্টা করেছিলেন, কেননা তাঁর ভিজে কাপড়—ভিজে কাপড়েই তাঁকে অনেক শুদ্ধ কাজ করতে হয়—মুখে তাঁর, এ সময়োচিত অষ্টোত্তর শত নাম—'বিদুর রাখিল নাম কাঙাল ঈশ্বর' পদে এসে থেমেই, 'কি হল কি হল' বাক্য, ভিজে কাপড়ে এখনও কিছু ব্যস্ততার শব্দ ছিল, এ কারণে যে সম্মুখবর্ত্তী এ-দৃশ্যে কিরূপ ভঙ্গী যে করা উচিত তা ভাববার মত তাঁর অবকাশ ছিল না, হয় তিনি বেশি করে আলো অথবা বেশি করে ঝাপসা কিছু দেখেছিলেন তাঁর দেহটি কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবশে সম্মুখে এবং শুচিবায়ুতার জন্য পিছনে দুলে গিয়েছিল, আর মুখে বারম্বার একই কথা ধ্বনিত হয়েছিল, 'ওমা কি সব্বনাশ গো, কি সব্বনাশ!' তাঁর স্বরের মধ্যে যথাযথ অসহায়তা ছিল। ইতঃমধ্যে নবীনা বৌটি কোনক্রমে এখানে এসেছিল, তখনও বাঁ হাতে সায়াটি আঁট করে ধরা, এবারের ঝটিতি গিঁট বেঁধেই যখন সে যূথীকে সাহায্য করতে যাবে তৎক্ষণাৎ থমকে গেল।

কেননা, খেতুর মা আপনার গায় গতর খেলিয়ে বলেছিলেন, 'বলি হ্যাঁগা, তুমি কি পাগল নাকি। বললে বড় অন্যায় হয়, সাধে কি তোমার ভাগাড়ে কোল...বলি চান করেছ না, ওকে ছুঁলে আবার কাপড় জুটবে ?' ইত্যাকার বাক্যে বুঝা গেল খেতু মিত্তিরের মা খানিক নিশ্চিন্ত খানিক সমঝে উঠতে পেরেছিলেন, এবং আপন পুত্রবধূকে নিবারণ করে এবার যূথীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'নে নে চোষ না হারামজাদী আঙুলটা, মরণ! হ্যাঁরা কাটল কি করে?'

যূথী চুপ, হয়ত তার মনে পড়েছিল যে, পাখীটা কথা বলতে পারে, ফলে আরও ভীত হয়ে সে দাঁড়িয়েছিল ; নবীনা বৌটি রক্তদর্শনে মুখখানিকে ঠেলে বাঁধা পুঁটলির মত করেছিল, অজস্র চুলকে ঘাড় থেকে একটু হাটাবার জন্য মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'পাখী।'

'পাখী! সাত সকালে কি অলুক্ষণে কাম্ভরে বাবা' বলে খেতুর মা সাক্ষী-মানা কণ্ঠে বললেন, 'পাখী, আমার পাখীর ত অমন স্বভাব নয়' এবং পাছে দোষ পড়ে—একথা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পুনরায় বলেছিলেন, 'তুই সাত সকালে মরতে আমাদের বাড়ি ঢুকেছিলি কেন?...নে চোষ না আঙুলটা পোড়ারমুখী, আবার ধ্যানাপানা...নাও বৌমা, টক্ করে একটু চুন এনে দাও...'

বৌটি সত্বর চুন আনতে গেল।—যূথী, এখনও বুদ্ধিভ্রংশ, খেতুর মার কথায় খানিক হাঁ করে রক্তাক্ত আঙুলটি মুখে পুরবে কিনা ভাবতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ—এতাবৎ আপনার মুখে সযত্নে রক্ষিত ছোলাগুলি, যা সে মুখে পুরেই চিবোয় নি, একারণে যে চিবোলেই ত শেষ, তাই অতি কৃপণের মতই মুখের একান্তে রেখেছিল এবং হাঁ করে আঙুল মুখে পুরবে, না মুখটা আঙুলের কাছেই নিয়ে যাবে এই বিষম দ্বিধায় অদ্ভুত হাস্যকর অবস্থা তার হয়েছিল—হঠাৎ ঠিক এই মুহূর্ত্তে তার মুখনিঃসৃত ছোলা কটি পড়ে, গড়িয়ে, খেতুর মার জল-সাদা হাজাদষ্ট পায়ের নিকটে লেগেছিল। বেচারী যূথী! উপরন্তু বেচারী যূথীর মুখ থেকে অল্প লালা তার নিজের হাতেই পড়েছিল এবং সে কম্পমানা!

অন্যপক্ষে, ছোলা পড়তেই, খেতুর মা ঝটিতি দু-এক পা সরে এসেছিলেন, মাটি থেকে চোখ ফিরিয়ে তিনি যূথীকে দেখে, রাগে রোষে আক্রোশে তাঁর গাত্রবস্ত্র যেমত বা শুষ্ক হয়েছিল ; কি বলে যে গঞ্জনা সুরু করবেন তা সঠিকভাবে তাঁর ঠোঁটে গুছিয়ে নিতে পারছিলেন না, সাহসা আক্রমণ আরম্ভ হয়ে গেল, 'ওমা মেয়ের কি নোলা গো।...কোথা যাব গো...' এসময় আপনার গণ্ডস্থলে তর্জ্জনী ছিল, এর পরেই দাঁতে দাঁতে ঘষে বলতে লাগলেন, 'বেশ হয়েচে, খুব হয়েচে, এবার নিজের রক্ত পেট ভরে খাও...'

যে যূথী এতক্ষণে কাঁদে নি, হঠাৎ ধরা পড়ে যাওয়ার দরুণ চীৎকার করে কেঁদে উঠল, তথাপি চোখ দুটি ভারী সজাগ ছিল, খেতুর মা আপনকার গা গতর ভিজে কাপড়ে ঘর্ষণ করত বললেন, 'একাঃ চড়ে তো...দাঁত কপাটি ভেঙে দেব, আবার কাঁদনা হচ্ছে, ছ্যাঁচড়া আক্কটে ভিকিরীর মরণ! পাখীটা তোর টুঁটি ছিঁড়লে আমি হরিনুট দিতুম...হাবামজাদী, ছোলাচুরি! ফের যদি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসবি ত ঝেঁটিয়ে তোর খাল খেঁচে নেব...তাই বলি আমার পাখী কেষ্ট নাম ভেন্ন যে জানে না, সে কেন কামড়াবে...উঃ তোর বাপ মা কি কিছু খেতে দেয় না...চোষ না রক্তটা!'

এমন সময় বৌটি একটি গোটা পানে খানিক চুন নিয়ে এসে দাঁড়াতেই, খেতুর মা সত্যিই ক্ষিপ্ত তিরিক্ষি হয়ে উঠে ছোট একটা লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, বললেন 'খুব যে দরদ দেখাতে এগিয়ে যাচ্ছিলে' বলেই, পরেই, হঠাৎ চুনসমেত পানটির দিকে নজর পড়তেই গায়ে যেন বিছুটি লাগল, খেঁকিয়ে উঠে বলেছিলেন, 'তোমার কি কোন আক্কেল নেই গা, বলি এই বাজারে একটা গোটা পান নষ্ট করলে, বলি...আকালের কথা কি তোমার অজানা...না. .'

বৌটি তটস্থ, থ, জড়সড়, চকিতেই মেঝেতে পানটি রেখে দিলে, না পানটি হাত থেকে খসে মেজেতে পড়েছিল, তা বুঝা গেল না। বক্তের অজস্র ফোঁটার মধ্যে পানটি লক্ষ্য করেই খেতুর মা যূথীকে প্রচণ্ড কণ্ঠে বললেন, 'তোল বলছি, হাঁ করে রইলি যে হাবামজাদী।'

এবম্প্রকার বাক্যে বেচারী যূথীর প্রকৃতপক্ষে কি যে করা শোভনীয় তা সে নিজেই কিনারা করতে পারছিল না, সে একবার মেজের দিকে অন্যবার খেতুর মার দিকে আড়ে আড়ে চেয়েছিল। খেতুর মা এইটুকু বিলম্বেই অস্থির। মুহূর্ত্তের মধ্যে সকালের আলোকে বাঁকা চোখে দেখেন এবং নিমেষেই পান তাঁর নিজের হাতে তুলে, একবারমাত্র চুনসমেত পানটির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়ই একথা ভেবেছিলেন যে তাঁকে এ কাজের পব আর একবাব স্নান করতে হবে, ভেবে পরক্ষণেই যূথীর বেড়া-বেণীটা হেঁচকাটানে নামিয়ে বেশ জবর মুঠো করে ধরার পরে পানটা তার কাছে এগিয়ে দিতে—সে, যূথী, অতি সহজভাবে সেটা নিয়ে নিজের আঙুলের উপর চেপে ধরেছিল, এবং যুগপৎ আপনার দাঁত দ্বারা কাছের জামাটা কিঞ্চিৎ টান দিয়েছিল!

খেতুর মার ক্রোধ-উন্মত্ত বেণী আকর্ষণে যূথী বড় নিশ্চিন্ত হয় ; ঝাঁটা লাথি—এ সবে তার যেমন বা সকল কিছু বোধগম্য পরিষ্কার লাগে, সুতবাং এই সে চেয়েছিল, যেহেতু সে কোনমতেই দুই চোখে দুইদিকে দুভাবে আর দেখতে পাচ্ছিল না. এ ছাড়া এত আলো থেকেও সব কিছুতেই যেমন বা সন্ধ্যা,

তাই যূথী ইত্যকার নির্ম্মম ব্যবহারেও অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিল ; এখন খেতুর মার সঙ্গে পা মিলিয়ে অক্লেশে চলতে পারবে। খেতুর মা আর কালবিলম্ব না করে তার চুলের মুঠি ধরে এক টান মেরেছিলেন!

খেতুর মা তাকে যখন নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পাখীটার পাশ দিয়েই তাঁদের যেতে হয়, ফলে, এ সময়ে যূথী খেতুর মার কাছে ঘেঁষে এসেছিল, এবং চোরা-গোপ্তা চাহনিতে পাখীটার প্রতি সে দেখে, পিতলের চক্‌চকে দাঁড়ের উপরে নিশিত তীব্র সাংঘাতিক রুক্ষ পা দুটি, আর তার ঠিক উপরেই পাখীর সুডৌল উদর দেখা যায়,—শেষ রাতে চন্দ্রকিরণে প্রকাশমান শরৎকালীন মেঘ যেমন, হয়ত সবুজ কিম্বা পাণ্ডুর, কি নরম কি তুলতুলে! সুওদর সুউমার—শুকউদর সুকুমার তথা কোমলতা, এরূপ যে প্রবচন, সেইটুকু প্রত্যক্ষের, দেখার মানসে মানুষ কি টিয়াপাখী পোষে!

যূথী আপনাকে নির্ব্বিকারভাবে, খেতুর মার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে নিয়ে, রাস্তায় নেমে, এই পরিপ্রেক্ষিতহীন লাল গলিতে নেমেই, দুবার চিক্‌চিক্ করে থুতু ফেলে—মাথার কাপড়ে হাত দেবার কথা তাঁর মনেই হয়নি, একাবণে যে গলি সুন্‌সান্—যূথীদের বাড়ির দরজার সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। এবং দরজায় লাথি মারতেই, দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল, এটা তিনি, খেতুর মা, আশা করেননি, ফলে দোমনা হয়ে ছেলেমানুষের মত অহেতুক সর্দ্দি টেনেছিলেন।

দরজা খোলার পব, ভিতরেব ঝাপসা অন্ধকার কাটার পর দেখা গেল, প্রীতিলতা।

প্রীতিলতা দেওয়ালে একটি পা ঠেস দিয়ে দণ্ডায়মান, হাতের আলগা মুঠোয় একগাদা, একথোকা চুল, যা অবহেলায় অনিয়মে মেহেদীপিঙ্গল, তবু সেখানে অন্ধকার ; সে জননী, তথাপি এ খেলা তার ভাল লাগে, অজস্র চুলে চুলে পাচনতুল্য গন্ধ, এ-হেন গন্ধে আপনাকে বড় পুরাতন বলে বোধ হয়, গায়ে ন্যাপথলির আর তোরঙ্গের মরিচার গন্ধে—মিলেমিশে—দিনগুলিকে যেমন বা সুদীর্ঘ করে, আর যে, তাকে, প্রতিলতাকে, অযথাই, মন্দভাগ্যক্রমে, নিশ্চিহ্ন করেছে ; বস্তুত সে নিজেকে খুঁজে না পেলেও, আপনাকে বুঝে না পেলেও অদ্য সে নিশ্বাস নেয়, আজও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। ভেবেছে হায় আমার থেকে আমার ছায়া সুখী। সে চোখ ছোট করে দিনমান দেখে, সে চোখ সুতীক্ষ্ণ করত অন্ধকার দেখে।

খেতু মিত্তিরের মা প্রীতিলতাকে দেখে থমকেছিলেন, তারপর নিজের বেণীধৃতমুষ্টি দেখেই যেন বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি ফিরে পেলেন, এবং অন্যহাতে ভিজে কাপড়ের খানিক দিয়ে ওষ্ঠদ্বয় আবৃত ছিল, এখন কথা বলার সময় মুখের কাপড় কিয়ৎ পরিমাণে সরানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন, 'এই নাও বামুনের মেয়ে...' এই 'নাও' বাক্যের মধ্যে সত্যনিষ্ঠার গরব ছিল।

প্রীতিলতা, অল্প আয়াসেই মুখখানি বাঁকিয়ে তাদের দেখেছিল—ভাতে ব্যাঙ লাফিয়ে পড়লে চাষা যেমত লাফ দিয়ে উঠে—তেমন তেমন লাফ, তেমনি যেমন বা তার ভিতরে দিযে উঠল, কিন্তু দেহে কোন সাড়া দেখা গেল না, কেবলমাত্র হস্তধৃত চুলসমূহ, এ দৃশ্য দেখেই, সে চকিতে মুঠো ছেড়ে দিয়েছিল।

অন্যপক্ষে, খেতুর মা যূথীর বেণীও ছেড়ে দিয়েছিলেন, দিয়েই বললেন, 'তোমার মেয়ে কি বলব বাবা, বললে পেত্যয় যাবে না, সাত সকাল লোকে শুনলে বলবে খেতু মিত্তিরের মা কি লোক গা...ভদ্দরনোকের মেয়ে ঘেন্না পিত্তি নেই একেবারে ভিকিরীর অদম গা...পাখীর ছোলা চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড বাধালে..মুখ থেকে না পড়লে কি আমিই টের পেতুম...' এই টুকু বলেই খেতুর মা চারিদিকে চেয়েছিলেন, এ কারণে যে তাঁর মনে হয়েছিল, এখানে বারান্দায় কেউ নেই ; আর যে—তিনি একাই বকে মরছেন, খেতুর মা আশা করেছিলেন এইটুকু বলতেই যূথীর মা যূথীকে আর আস্ত রাখবে না, কিন্তু কই? ফলে তাঁর বড অসম্ভব রাগ হয়, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং দৃঢ় হল, বলেছিলেন, 'বলি তোমার কি মনে হয় আমি মিথ্যে বলেচি...সৎশাসনে না রাখলে মেয়ে কালে...বাতাসী ছেনতাল হবে, ঝরঝরে হবে পরকালে...'

প্রীতিলতা, আশ্চর্য্য মনোযোগসহকারে সকল কথাই শুনছিল, যেহেতু খেতুর মার গলায়, কথার

টানের মধ্যে, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার ধাঁচ ছিল, মিল ছিল ; বিশেষত যেখানে আছে, 'বন অধিষ্ঠাত্রী তুমি বনে বনে।' যেখানে, 'গৃহলক্ষ্মীরূপে তুমি সকলের ঘরে। দীনজনে রাজ্য পায় তব কৃপা বলে।' সে, প্রীতিলতা, যেমত বা করযোড়ে যূথী-সংবাদ শুনছিল, কিন্তু তা হলেও এ কথা সত্য যে, 'ভিকিরী' কথা তাকে রক্তের প্রাচুর্য্য দিয়েছিল—চুরির কথাটা এ তুলনায় মাটির—আচম্বিতে প্রীতিলতার স্বল্পতোয়াসদৃশ দেহখানি রুষ্ট সাপের মতই আলোড়িত হয়ে উঠে, আপনকার বরফ-দেওয়া চোখের দৃষ্টিকে, অমোঘভাবে ছোরা যেমন করে হাতে ধরে, তেমনি—সেইভাবে উদ্যত করে ধরেছিল। খেতুর মা কথা শেষ না করেই যেই তুড়ি দেওয়ার শব্দের মত তাচ্ছিল্যভরে 'হ্যাঁ' আওয়াজ করেছেন, তদ্দণ্ডেই প্রীতিলতা 'ইঃ' ধ্বনি করে উঠে, আর ঠিক এ হেন সময় এক ঝাঁক জঙ্গী-বিমান উড়ে গিয়েছিল। এখানকার সকলেই, এ বারান্দা প্রায়-ঢাকা-পাঁচিলের ওপরে, উপরে যে আকাশ, সেদিকে চাইল। তথাপি, প্রীতিলতা নিজেকে এখন, ইতঃমধ্যেই শাণ দেবার অবকাশ পেয়েছিল, সে মুখখানিতে ঈদৃশ ভঙ্গী করে যে যেমন মনে হয় সে কিছু খাচ্ছে অথবা তার জিহ্বা আঠায় জড়িয়ে গিয়েছে, এরপরই সে বিড়ালের মত ফ্যাস্ করে উঠেছিল, বললে, 'নিজে যে বগলে সাবান দাও বিধবা হয়ে, তা-বেলা কিছুটি হয় না...না?' একবার নিজস্ব ভাষাটা অনুধাবন করেই পুনর্ব্বার বললে, 'সে-বেলা কিছু হয় না'...এই সঙ্গে অঢেল শোনা ইংরাজী বলার জন্য—অবশ্য এ সকল শব্দ বাক্য নয়, গ্যাট ম্যাট হুট ফাট জাতীয় ইংরাজীআত্মক—তার জিহ্বা যারপর নাই কড়কে উঠল।

প্রীতিলতার ঘোর বাক্যস্রোতে খেতুর মার মুখাবৃত কাপড়ের অংশ ঝরে পড়ল, কোন দিকে যে অজস্র আলো তথা কোন দিকে যে দরজা তা বেচারী খেতুর মা, বুড়োমানুষ, ঠিক ঠিক ঠাওর করতে পারলেন না, অবশ্য অবশেষে তিনি অদৃশ্য হন। প্রীতিলতার কাছে খেতুর মার এই চিত্তভ্রমবশত হাঁকপাক বড় মজার মনে হয়েছিল এবং বেচারী এই প্রসঙ্গে হাসতে গিয়ে আপনকার বিবর্ণ, আর্ত্ত বেদনাময় মুখখানিকে যন্ত্রণা দিয়েছিল! তবু সে কাতর নয়, সে হেসেছিল ; তার শতচ্ছিন্ন কাপড়েব আঁচল তুলতে গিয়ে মাকড়সার পায়ের দক্ষতায় তার আঙুলগুলি পুনরায় চুলগুলিকে সংগ্রহ কবে, এবং সে, প্রীতিলতা আপনকার অজস্র চুলের অঞ্জলিবদ্ধ অন্ধকাবে মুখমণ্ডল ন্যস্ত করত বর-দেখা হাসি হাসল!

যূথী নিজের ব্যথাটাকে বড় করবার চেষ্টা করে তাব মাকে হাতখানি দেখাচ্ছিল, তবু চুলের আঁধার এবং তার উপর ঘোরদর্শন রাত্রে বিদ্যুৎরেখাতুল্য হাসি, তাকে, যূথীকে, অনেকেব কথা স্মরণ করেছিল, যথা বাবা কোথায়, যথা লতা কই? নিশ্চয়ই সে তাদের আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, কেননা সে এক আপৎকালের সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সহসা, পলকেই তার মাথায় যেমত বা বাত্যাপ্রবাহ খেলে গেল, আর যে, সে কেবলমাত্র এক পা পিছনে সরে, ভীতত্রস্তস্বরে আঃ আঃ করে বলেছিল, 'তোমার পায়ে পড়ি আর করব না আ...করব না' এবং তার অল্পবুদ্ধিতে রক্তাক্ত হাতটি ঈষৎ উঁচু করে দেখিয়ে মার, প্রীতিলতার, দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা করুণা ভিক্ষা করতে চেয়েছিল এ কারণ প্রীতিলতা—সূক্ষ্ম, বিবশ, যদিও বিশীর্ণা যদিচ বহুদিবস অভাবে তথাপি ইদানীং সরোষিত তীব্র ভয়ঙ্কর ফণা তুলে আসছিল—অজস্র ছেঁড়া-মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার অঙ্গাংশ সকল লাল—মলিন ছিন্ন কাপড়ে ধরা-পড়া একটি ঝড়!

যূথীর গলায় আর কোন স্বর ছিল না, মুখমণ্ডল ভয়ে কালসিটে, তবু এটুকু ব্যবধান মধ্যে সে একটিমাত্র চোরা ঢোক গিলেছিল, যেহেতু প্রীতিলতা আর বেশি এগিয়ে আসতে পারেনি, যেহেতু গায়ে গতরে, তার নিজেরই, কোনই ক্ষমতা ছিল না, যেহেতু সে, প্রীতিলতা, যে যূথীর মুখে না-পাওয়ার দুর্দ্দৈব তৎসহ না-মাজা বাসনের মত ময়লা—এই 'না-মাজা' কথাটা তার আপনার ইজ্জতে লেগেছিল, যেহেতু 'না-মাজা' কথাটায় এই সংসার, এখনকার দিনের পরিচ্ছন্ন দৈন্য-উপহত চেহারাটা ছিল, যেরূপে বীজমধ্যে বৃক্ষের ছায়া পর্য্যন্ত নিহিত থাকে . এবং দীনা প্রীতিলতার মধ্যে দিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস বয়ে গেল ; এখন সে থমকে দাঁড়াল।

প্রীতিলতা অন্য আব একদিক থেকে নিশ্বাস নেবাব জন্য ছোট বারান্দার আর আর দিকে চাইল ; এখানে সেখানে সাতবাসটে অন্ধকার—বালতি আব টোল খাওয়া ডেকচির জল ছাড়া, আব কোথাও

যে সকাল হয়েছে এ সত্যের উল্লেখ নেই ; প্রায়-ঢাকা বারান্দার উপর দিয়ে এক লুপ্ত আকাশ দেখা যায়, যাতে করে মনে হয়—তারা যেখানে আছে, সেটা পৃথিবী। অবশ্য, মেঘমন্দ্র প্লেনের শব্দ, ক্কচিৎ মোটরের হর্ন, অথবা কখনও সাইরেন আছেই ; এতদ্ব্যতীত রাত্রে হরিধ্বনি থেকেও বীভৎস হয়ে উঠে মানুষের কণ্ঠস্বরের নামে উত্তাল উদ্দাম পোড়ার আওয়াজ, মনে হয় এক আপনাকেই কামড়ায়—ধনীরা সুখী কেননা এ-হেন মর্ম্মন্তুদ আওয়াজে তারা পাশবিক অত্যাচারীর সদর্প-মাভৈ ধ্বনি শুনে আপনার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে ; সুতরাং তারা নিশ্চিন্তে ঘুমায়। অন্যপক্ষে, সামান্যা রমণী প্রীতিলতা তাদৃশ চর্ম্ম-লোল-কারী টঙ্কার শ্রবণে অল্পকাল নিমিত্ত নিশ্বাস স্থগিত রাখে, আপনার গৃহস্থালীর কতিপয় ফাঁকা বাসনপত্রে হাঁড়িতে, এ আওয়াজ নির্দ্দয়ভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে, তখন সে আত্মরক্ষাহেতু আপনার বক্ষদ্বয়ে হস্তস্থাপন করে, তবু বেচারীর শীর্ণ একটি হাত কপালে করাঘাত করতে ছুটে যেতে চায়, এবং সে কোনরূপে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে 'নারায়ণ-নারায়ণ' বলে কোনক্রমে হাতের তালু দেয়ালের গায়ে এঁটে ধরে, হাঁকায়, মনে হয় সে যেন বা পালাচ্ছে ; রুগ্ন শুষ্ক শক্ত হিম ওষ্ঠপুট জিহ্বা দ্বারা অল্প অল্প বুলাবার চেষ্টা করে এবং পাগল চোখে এদিক সেদিক তাকায়, মনে হয় এ রৌদ্রকর্ম্মা, সে-আওয়াজ তাকে যেন টানছে, ডাকছে। সে 'না, না' বলে উঠেছে তবু ঘাম হয় এবং ঝটিতে 'লতি-যূথী' বলে ডাক দিয়ে আপন কন্যাদ্বয়ের সাড়া নেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনস্থ করে ঝুল ঝেড়ে ফেলবে, পয়সা পেলেই পরনের কাপড় ধোপ-দুরস্ত করতে হবে তাহলে এ-দুঃসহ আওয়াজ তাকে—তাদের তার চিনতে পারবে না! কিন্তু অনেক শূন্যতা, অনেক পাগলা সেলাই তাকে, প্রীতিলতাকে অতিমাত্রায় ছোট করে।

এখন, প্রীতিলতা আপন গর্ভজাত কন্যা যূথীর দুঃখময় সুখের দিকে চাইল, ফলে হঠাৎ-নিভে-যাওয়া মনটা দুর্দ্ধর্ষ লাল হয়ে উঠল, রক্তস্রোত স্ফীত তাতাথৈ, যদিও সে নিজে ভেবে পায়নি, এমনধারা এক বিচ্ছু খেউড়ে নিষ্ঠাবতী বিধবা খেতুর মাকে রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য করতে পারে, যার ফলে তার পেটটা যেন বা ভরে গিয়েছিল, পরিধেয় বস্ত্রসকল নিরবচ্ছিন্ন, তা ছাড়া শুভ্র ; মুহূর্ত্তের জন্য সে রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজের ফাঁদ থেকে অনায়াসে অব্যাহতি পেয়েছিল— প্রীতিলতার দেহটা যেমত বা দেহ থেকে ছুটে বার হয়ে চলে গেছে, নিমেষের জন্য লজ্জাও তার হয়েছিল যেহেতু যূথী তার কথাটা, খেতুর মার প্রতি, নিশ্চয়ই শুনেছিল। তাদের মত ঘরে এমন কুৎসিত কথা শুনলেও পাপ হয়! এ-কারণেই রক্ত তার ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়েছিল, এবং এই আশাতীত দুর্ব্বিভাব্য গতিবেগে যূথীকে পার হয়ে, ক্ষণেক থেমে, আশ্চর্য, পলকেই নিশ্চয় করে, অসম্ভব ঢঙে পুনশ্চ কন্যাকে প্রদক্ষিণ করে—বাজিকর যেমন মড়ার খুলিকে কেন্দ্র করে, সাপুড়ে যেমন সাপকে কেন্দ্র করে, পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে—এসময় নাবালিকা যূথী আপনার রক্তাক্ত হাতখানি অন্য কোন উপায় না দেখে তুলে ধরেছিল।

এখানকার, বারান্দার, ধূমসদৃশ আলোয় রক্তাক্ত হাতখানি দেখতে দেখতে প্রীতিলতার চিত্তবিভ্রম ঘটে ; সহসা, তাই, সে নতজানু হয়ে বসেই যূথীকে জড়িয়ে ধরেছিল। সেই সেঁকো কদর্য্য অভাবের মধ্যেও—যে গভীরতা গীতের শুদ্ধ পর্দ্দায় থাকে, যে গভীরতা জলে প্রতিফলিত তারায়, যে গভীরতা শিশুর হাস্যের রহস্যের মাধুর্য্যের প্রাণধর্ম্ম—এ-গভীরতা সহজেই সে খুঁজে পেলে ঘুমজড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল, 'খুব কেটেছে।'

যূথী এখন মার বাহুবন্ধনে, ঈষৎ সলজ্জ আপন হাতের প্রতি নজর রেখে, অতীব ধীরে মাথা নাড়িয়েছিল।

এখন তারা ঘরে। যূথীর আঙুলটি বাঁধা হয়েছিল. সে মার কোলে ঠেস দিয়ে আর লতি আর এক পাশে, তারা দুই বোন একটি কথাও বলেনি, এক তক্কে বুঝেছিল যে আমরা বড় নিঃসহায়। এবং মার দিকে বড় বেশি করে ঘেঁষে এসেছিল, প্রীতিলতা এইটুকু উষ্ণতার মধ্যে, এমন হতে পারে যে, সচেতন হয়ে উঠেছিল, কেননা সে যূথীর মাথার উপরে আপন গণ্ডস্থল স্থাপন করে, পরক্ষণেই তার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠল, যেহেতু গন্ধকের মত ঘৃতকুমারীর মত এক ধরণের গন্ধ তাকে বিপর্য্যস্ত করে, সুতরাং প্রীতিলতা, ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে বসে, আড়ে চাইল, সে এখন কঠিন। এ সময়ে তার মনে হয়, মনে পড়ে, কি অদ্ভুতভাবে দুইজনে পিঁপড়েকে অনুসরণ করেছিল, একজন হামাগুড়ি দিয়ে, আর একজন বেঁকে হাঁটুতে হাত দুটি রেখে, অল্পকাল পরে পরেই তাদের দ্রুতগতি দেখা যায়, মাটি

থেকে মুখ সরিয়ে ঝটিতি যূথী লতিকে বলেছিল, 'এই, মা দেখছে কি না দেখ', এতে লতি যখন এদিকে চায়, তখন তার মাথাটা বই পড়ার মত করে নেড়েছিল, আর যূথী লতিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে পিঁপড়েটিকে হারিয়েছিল! সারাটা মেজেতে চোখ বুলিয়ে যূথী সখেদে বলল, 'হ্যা।' লতি হঠাৎ চাপা গলায় বললে, 'দিদি এই যে!' আঃ সুন্দর, রুক্ষ, দিবালোক, লাল আনুগত্য, সবুজ যেমন বৃষ্টির অনুগত, বৃষ্টি যেমন মেঘের, মেঘ যেমন বাষ্পের, বাষ্প যেমন নীলাব্ধিবসনার। এরপর দুই বোন 'লাইন লাইন' বলে চেঁচিয়ে উঠল। এ লাইন বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে চলে যায় ; দুই বোনই দেখেছিল, মধ্যে পগার তারপর যে বিরাট বাড়ি তারই খানিকটা, যে বাড়ি থেকে কালোয়াতি গান আসে, ফোড়নের গন্ধ আসে, বিড়ালের ঝগড়ার শব্দ আসে। বেচারী লতি বলেছিল, 'দিদি আমরা যদি পিঁপড়ে হতাম'—প্রীতিলতা জননী হয়েও এ দৃশ্য কোন এক অন্তরাল থেকে দেখেছিল, কোন এক মন দিয়ে শুনেছিল! এ কথা স্মরণে তার গায়ে যেন বা কাঁটা দিয়ে উঠল! প্রীতিলতা ভীতা।

ঠিক এমত সময়ে একটি কাশির আওয়াজ, সে আওয়াজে বটগাছের শিকড় পর্য্যন্ত অস্থায়ী হয়ে যায়, প্রীতিলতার প্রাণপুরুষ কেঁপে উঠল। প্রীতিলতা আপনার দৃষ্টিকে রূঢ় করে কব্জা করে রেখেছিল সম্মুখের অনেকটা সিমেণ্ট করা ড্যাম্প সিক্ত দেওয়ালের দিকে, অথচ বিস্ময়কর এ কথা যে, কে যেন বা তার দৃষ্টি দেহ মন সব কিছুকে জানালার দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে, যে জানলায় দু একটা গরাদ নেই, সেখানে দড়ি দিয়ে বাঁধা। প্রীতিলতা অত্যন্ত শক্ত করে নিজেকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছিল, কেননা এসময় কাশির এবং লাঠির ঠক্ ঠক্ আওয়াজ ক্রমে নিকটস্থ হয়, স্বল্পালোকে অদ্ভুত একটু ছায়া পড়বে, এরপর গলির মাঝের নর্দ্দমার ঝাঁঝরিতে লাঠির আঘাতে ঠং করে একটা পাজি আওয়াজ সংঘটিত হবে, আর যে, তার পরক্ষণেই পৌঁছবে, তাদের সূক্ষ্ম গলিতে এবং তাদের রকে—ঐ জানালার পিছনে—ধপ করে গাঁঠরি রাখার শব্দ হবে, আর যে তখনই শ্বাসপ্রশ্বাস দীর্ঘনিশ্বাস সমস্ত কিছু মিলে সঘন অধীরতার শব্দ মিলে একটি পাতাহীন পৃথিবীর রুক্ষতার উদয় হবে। এই ভয়ঙ্কর নিশ্বাস সকলের শব্দ প্রীতিলতার ঘাড়ের অতীব নিকটে অনুভূত হয়, সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, কেননা ঘাড়ের এইটুকু গোপন-অতীব অল্পপরিসর স্থানেই কেবলমাত্র কাম, অভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে আশ্রয় করেছিল, কেননা দেহের মধ্যে অন্য কোথাও দেহ ছিল না, ফলে প্রীতিলতা বিমর্দ্দিত, ত্রাসিত, শঙ্কার জড়তার, ক্লৈব্যের, শৈত্যের, জাড্যের, হিমবাহ স্বেদবিন্দুর সঞ্চার হল ; সে আপনাকে আর কোনক্রমে আর দৃঢ় করে ধরে রাখতে পারল না, ঝটিতি জানলার দিকে সে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়েছিল।

জানালার পিছনেই রক, সেখানে, ইদানীং পথশ্রমে যারপরনাই ক্লান্ত—দ্রুত নিশ্বাসে ব্যস্ত হাড়ের খেলা, এ খেলার আশপাশ দিয়ে অন্ধকার সহস্র ছেঁড়া চুলের মত ভেসে ভেসে যায়। এবার ছোট ছোট স্বস্তির কাশির আওয়াজ, এবং অশীতিপর বৃদ্ধের সমস্ত মুখমণ্ডলে যেমত বা ছানিপড়া-মুখখানি, দুঃখময়, গ্রহকবলিত, মুমূর্ষু ঘাড়ের উপর নড়ছিল। অনেকটা কাঁচা সর্দ্দি গড়িয়ে পড়ে স্থির, বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে এদিক ওদিক চাইল, তারপরেই ভগ্নস্বরে গান আরম্ভ করল। গানটা টহলদারী, রেখাবের নিজস্ব বেদনা এ গানের সুরে বর্তমান ছিল।

প্রীতিলতা কখন যে এ গানে আপনকার বোধ হারিয়েছিল, তা সে জানত না ; গানটি শুনে শুনে, এই কয়দিনেই, তার ভাল লেগেছে এবং সে আপন মনে, অনেক সময়, গায়। এখন, সহসা সে বুঝতে পারল যে, সে অতিধীরে বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানটি গাইছে, আর যে, ত্বরিতে লজ্জায়, কাঁধের পিছন থেকে কাপড় তুলে মাথায় দেবার কারণে তুলতে গিয়ে বুঝতে পারলে হাতে কাপড়ের পাড় মাত্র উঠে এসেছে, এবং আর কোন উপায় নেই বলে মেনে নিয়ে সেটাকেই যথাযথভাবে রাখল। কিছু পরে, যূথী-লতিকে বিশেষ সবাধানতার সঙ্গে আপন দেহ থেকে মুক্ত করত প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, কারণ এখন, সে ধীরে ধীরে জানলার এক পাশে এসে, জানলার পাট বন্ধ করে দিয়ে, আপাতত শায়িত বৃদ্ধকে এ কয়েক দিনের অভ্যাসবশত উঁকি মেরে দেখবে। এইভাবে দেখার সময়ে তার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, অভুক্ত দেহ কি এক উত্তেজনায় রিমঝিম করে উঠেছিল। পলকেই স্থান পরিত্যাগ করে যে দেওয়ালে বহুকাল পূর্বে একটি আয়না ছিল, সেখানে এসেই থমকে দাঁড়াল, এখানে একমাত্র জায়গা যেখানে সে আপনাকে আবছায়া দেখতে পায়! হায়! সত্যিই যদি আয়না থাকত!

খনিক সেখানে কালক্ষয় করে, উন্মত্ত যেমত, চঞ্চল পদবিক্ষেপে মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সজোরে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দিল, এরা তিনজন কোন কিছু ভাববার পূর্ব্বেই প্রগল্‌ভ ভয়ঙ্কর কাশির আওয়াজ শুনতে পেলে। প্রীতিলতা কর্ত্তব্যবুদ্ধিভ্রংশ হয় নি ; সে অসম্ভব উল্টোপাল্টা কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'ওঠ না তোরা, বুড়ো কি মরবে?'

দুই বোন বিশেষ সপ্রতিভ হয়ে উঠল, কর্ত্তব্যপালনে এদের অল্পক্ষণ দিক্‌ভ্রম ঘটেছিল, তারা খানিক সন্তর্পণে বারান্দায় এল, অন্ধকারে খুঁজল। এরপর একজন দরজা খুলে দিলে, ইতিমধ্যে মার গলা এল, 'দেখিস ছুঁস নি যেন।' অন্যজন জল নিয়ে এসে দাঁড়াল। বৃদ্ধ এখন উঠে বসে কাশছিল, ওদের দেখে আপনার টিনটা এগিয়ে দিলে।

বৃদ্ধ অদ্ভুতভাবে দুইহাত টিনটা মুখের কাছে আনতেই, এ লোল-দেহে যেমত বা বিদ্যুৎ খেলে গেল, দ্রুত একটি হাত সরিয়ে পার্শ্বস্থিত জগদ্দল বালিশের উপর রাখতে যেই গেল, সে-মুহূর্ত্তে খানিক জল তার দেহের এখানে সেখানে পড়ে সাধারণ মনুষ্যদেহের হিম কল্পনা হয়ে দেখা দিল। বৃদ্ধ দু-একটা কাশি সহযোগে জল খায়...।

যূথী লতিকে খুব অল্প-স্বরে বলেছিল, 'কি বোকা, জল গিলে গিলে খাচ্ছে।

লতি গ্যাসের অন্তিম আলোর কিছুটা মুখে তুলে নিয়ে বললে, 'চিবি।য় খাবে বুঝি!'

যূথী পাখীর মত মুখখানিকে উঠানামা করে বলেছিল, 'আমি ত করি', এবং পরে ইস্কুল মাষ্টারনীর মত করে স্পষ্ট ব।ছিল. 'ওতে পেট ভরে যায়।'

লতি এ তত্ত্ব বুঝবার পূর্ব্বেই হঠাৎ ভৌতিক আওয়াজ শুনল, 'ঘরকে যাওনা, ঘরকে যাওনা।' তারা দুই বোন দেখল বৃদ্ধ আপনার বোঁচকাটি দুই হাতে আগলে তাদের ও কথা বলছে। এতে করে দুই বোন ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধের রকম-সকম দেখে মুখটিপে হাসতে লাগল।

বোঝা গেল বৃদ্ধ এবার বেশ রাগ করেছে, যেহেতু, বলেছিল, 'খামাখা দাইড়ে আছ কেন, ঘরকে...ভাল জ্বালা', এ কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'লতি যূথী..'

প্রীতিলতা জানত, বৃদ্ধ কাউকে কাছে আসতে দেয় না কেন, প্রথম যেদিন সে তাদের এ গলিতে এসে আশ্রয় নেয় সেদিনই। তাদের বাড়িতে ঠিক দুদিন পর যৎকিঞ্চিৎ চোকর সিদ্ধ হয়েছিল। তারা সকলেই শুয়েছে, ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ভাঙা গলায় গান গেয়ে উঠেছিল। ব্রজ ঘুমের জন্য তখন হাঁকপাঁক করছে, কেননা সে কোনক্রমেই অবশ্যম্ভাবী তথা ভবি৺ব্যর দিকে আর চাইতে পারছিল না, কেননা আগামী কালের সূর্য্য শুধুমাত্র যে সে জড়ভড়ত, তা প্রমাণ করার জন্য পুনর্ব্বার দেখা দেবে। কিন্তু এমত সময় প্রীতিলতার ধোঁয়াটে কণ্ঠস্বর তাকে, ব্রজকে, ইহকালের স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীর মধ্যে এনে দিয়েছিল। প্রীতিলতা বললে, 'বুড়ো হলে কি হয়, খুব টনটনে জ্ঞান। যখনই যূথী-লতি যায় অমনি মারমুখো হয়ে উঠে...বোধ হয় জানো, বোঁচকায় অনেক টাকা আছে।'

'দূর'

'শুনেছি ভিখারীদের অনেক টাকা থাকে...'

'দূর, লড়াইয়ের বাজারে...টাকা করতেই লোকে...বলে...পয়সা দেবে কে...'

ব্রজর উত্তরের মধ্যে ঊর্দ্ধের সিলিঙের সমস্ত নগ্নতা হয়েছিল। ফলে প্রীতিলতা আপনার কব্জির একমাত্র লোহাটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, 'মজা দেখেছ, বুড়ো রোজ দাড়ি কামায়...'

ব্রজ এ-হেন এজাহারে চোখ দুটি খুলেছিল, সম্মু.এর অন্ধকার দেখে নিয়ে পুনরায় চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে আপনার দাড়ি দিয়ে হাতের বাজুর কাছে ঘষলে এবং কথার মোড় ফিরোবার জন্য বললে, 'বস্তায় মানে বোঁচকায় চাল আছে...'

প্রীতিলতা ব্রজর কথা শুনে প্রথমে বলেছিল, 'তাই নাকি', তারপর বলেছিল, 'ও'—ছোট কথা অর্থাৎ উত্তর দুটি তার নিজের কাছে কেমন যেন বোকা বোকা ঠেকেছিল। ইতিমধ্যে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই যা আত্মনিগ্রহ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল, তা বৃদ্ধের গান, যা এখন সদ্য সদ্য শুনলেও মনে হয় বহুদিন পূর্ব্বে শুনেছি—কেননা এই গানটির মধ্যে আধিদৈবিক পূর্ণতা ছিল, বর্ষার নিশ্চিন্ত ঘুমের মোহ অথবা

সুন্দর প্রভাতের সোহাগ এ গীতির ধমনী, এ জগতের মধ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম, বাপ মা ভাইবোন আকাশ বাতাস, পুষ্করিণীতে হাঁসের সন্তরণ, সব কিছুই ছিল।

সকালবেলা, প্রীতিলতা একটু গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া নিয়ে এসে, গতকালের যূথী-লতি সংগৃহীত কাঠ-কুটো দিয়ে উনোন জ্বালিয়ে জল চাপিয়ে দিয়েছিল। অদূরে ব্রজ উবু হয়ে বসে, দুটি হাত তার নিজেরই পায়ের তলায় চাপা, কেননা এ সময়ে তার দাড়ি বড় চুলকাচ্ছিল। চুলকালে পাছে প্রীতিলতার নজরে পড়ে, এবং তারই দূরদৃষ্ট অথবা হয়ত অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টতঃ ওতপ্রোত হয়ে উঠে। বেশীক্ষণ ব্রজকে এভাবে থাকতে হয়নি, যেহেতু তারা দুই বোন খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল।

তারা দুইবোন, যূথী এবং লতি, খাওয়া-খাওয়া খেলা করছিল, এ খেলার মধ্যে নিশ্চয়ই পেটভরা বা তৃপ্তির আনন্দ ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের দক্ষতার কারণে মা-বাবাকে গর্বিত করা। প্রীতিলতা অন্যমনস্কভাবে ধোঁয়া থেকে চোখ ফেরাবার অথবা সকালের আলোকে পড়ে নেবার জন্য কপালে একটি হাত রেখে এদিকে চেয়েছিল। যূথী-লতির ন্যাকা, কদর্য্য, অস্বাভাবিক, পৈশাচিক চর্ব্বণের চাকুম চাকুম শব্দ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে বড় বিশ্রী লাগছিল ; প্রীতিলতার দেহে এ কারণে বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেল, সে আর যেন স্থির থাকতে পারল না, ত্বরিতে উঠে ওদের দিকে না গিয়ে সদর দরজার দিকে গিয়েই আপনাকে স্মরণ করার অর্থে আপনকার কেশদাম দুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করেই একবার ভেবে নিয়েছিল যে, পিছনের দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি যে, কেন সে বাইরের দিকে যেতে চাইছিল—থমকে দাঁড়াল। তার পরক্ষণেই, ঘুরে সেইভাবে দাঁড়িয়ে, কর্কশ তীক্ষ্ণ আনুনাসিক আওয়াজ করে বলল, 'বসে আছ, মারতে পারছ না?' ব্রজর পৌরুষ এতাবৎ একগলা জলে নিমজ্জিত হয়েছিল, আপনার কন্যাদ্বয়ের এরূপ খেলা তার সকল কিছুকে অপহরণ করে, তথাপি নিজে থেকে কোন বিহিত করার মত মানসিক ক্ষমতা তার আয়ত্তের বাইরে ছিল, কেননা ভয় ছিল যে যদি করে তাহলে প্রীতিলতা তার প্রতি হয়ত অদ্ভুতভাবে তাকাতে পারে। এখন প্রীতিলতার হুকুমের সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠল, এসময় তার ছেঁড়া কাপড়টা প্রায় খসে যাচ্ছিল, সেটা নিমেষেই ধবে, প্রচণ্ডভাবে অফুরন্ত কিল চড় ঘুষি মারতে লাগল। প্রীতিলতা নিশ্চয়ই আপনার ক্রোধ সম্বরণ করতে পারেনি সেও লতিকে নিয়ে পড়েছিল। দুজনেই, কন্যাদ্বয়, যখন ধরাশায়ী, তখন প্রীতিলতা তার নগ্ন বক্ষদ্বয় দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাপড় সংযত করতে করতে ব্রজর দিকে চাইল, এবং যে ব্রজ তার প্রতি চেয়েছিল। এরপর স্বামী-স্ত্রী জোড়ে, ভূমিলুণ্ঠিত ব্যাকুল ক্রন্দনরত মেয়ে দুটির প্রতি পিছন ফিরে দেখেছিল যূথী উদম ল্যাংট এ কারণে যে সমস্ত ফ্রকটা খুলে গুছিয়ে তার একান্তে, পাশে লতির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহটি আভরণহীন, দুজনে মিলে মনে হয় এক মহতী কল্পনার সৃষ্টি করেছে, মনে হয় এরা দুজনেই মধ্যযুগীয় কোন স্থাপত্যের আহ্লাদিত ফ্রিজের (frieze) অংশ, বাপ মা ঐ দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নেবার কালে দুজনে মুখোমুখি হয়েছিল, দুজনেই অপূর্ব্বভাবে হেসেছিল, হয়ত আপন আপন চোখের জল রোধ করবার জন্যই হেসেছিল।

এদিকে উনুনের জল তখন ফুটন্ত। প্রীতিলতা তাড়াতাড়ি গুঁড়ো চায়ের পুরিয়া খুলে জলের উপর ফেলল এবং একটি ছোট চামচ দিয়ে গুলতে গুলতে ব্রজর দিকে চাইল। ব্রজর কাছে এ চাহনীর অর্থ অতীব সুস্পষ্ট সে অনন্য উপায়ে আপন মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এসময় এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যাওয়ার মর্ম্মভেদী শব্দে তীক্ষ্ণ ক্রন্দনধ্বনি আর ছিল না, ছেলেমানুষ দুটির মুখে শুধুমাত্র ক্রন্দনের ভঙ্গীমাত্র ছিল! ক্রন্দনের অভিব্যক্তি কি অ-ছবিলা!

'আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিতে, না লেখা না পড়া, খালি খাই...খাই...কোথাকার দুর্ভিক্ষ হাভাতের ঘর থেকে যে এসেছে ভগবান জানেন...' প্রীতিলতা বলেছিল।

এ কথায় ব্রজ ভেবেছিল পুনরায় মারবার হুকুম আছে, তাই তার দেহটা ঈষৎ উঠতে গিয়ে থেমে গেল, একারণ যে, এখন সে আর এক কথা ভাবছিল—ভাবছিল নয়ত, পাচ্ছিল—ভয়ঙ্কর দুঃসহ গলিত ঘৃণ্য কদর্য্য গন্ধ, অনেক মৃতদেহের গন্ধ—মানুষেরা কি আদতে মাছ—অভুক্ত তথা বুভুক্ষু জীবিতদের শবের গন্ধ নিশ্চয়ই এরূপই হয় ফলে এ কথায়, নিজের জন্য অবশ্যই ব্রজর যথেষ্ট লজ্জা হয়েছিল।

এখন প্রীতিলতা অনেক কথা বলে চলেছে, 'এই ধাড়িটাই ছোটটাকে পর্য্যন্ত নষ্ট করলে—কথা সব

শুনলে গা জ্বলে যায়, সেদিন বলছে, ঘরে বসে শুনছি', বলে অসম্ভবভাবে যূথীর কণ্ঠস্বর নকল করে তথা ভেঙিয়ে বলেছিল, 'লতি মেঘ কি করে হয় জানিস—হাজার হাজার বাড়ির রান্নার ধোঁয়া মেঘ হয়, ওটা না রুই মাছের ঝোলের মেঘ—ওটা না সোনা মুগের ডালের মেঘ'...এ কথা শেষ করেই অদ্ভুত করে ভেঙাতে গিয়েই, প্রীতিলতা ভয়ঙ্কর ত্রাসে কম্পিত, সে বড় অবাক হয়, কেননা নিমেষেই তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল যে বহিরাগত ত্রাস তার দেহে সঞ্চারিত এবং রক্তকে যা হেতুহীন করেছে। এইপ্রকার জ্ঞানোদয়ে সে বুঝেছিল তার সুন্দর আয়ত নয়নযুগলের একটি ছোট যুগপৎ অন্যটি বড়, এবং বিশেষ পরিমাণে উষ্ণ। প্রীতিলতা, এমন মনে হয়, তার ইদানীং স্বভাবসিদ্ধ যন্ত্রণায় চীৎকার—কি আর্ত্তনাদ—করে উঠতে চেয়েছিল, এ কারণে যে তার মুখ চীৎকারকারীর ন্যায় ভাঙাচোরা অথচ কোন আওয়াজ নেই। পরক্ষণেই যেহেতু সে স্ত্রীলোক সেইহেতু আপনাকে সংযত করতে পেরেছিল। এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে প্রীতিলতা সেই ত্রাসকে প্রতি-আক্রমণ করতে অথবা ত্রাসের ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল। গরম চায়ের খানিকটা চুমুক দিতেই সে বুঝতে পারলে, দেহে অজস্র শিরা-উপশিরা বর্ত্তমান, এবং সে আপনকার হাঁটুদ্বয় প্রজাপতির পাখার ন্যায় ধীরে বিভক্ত করল, ঝটিতি বন্ধ করে এবং পুনরায় এ কার্য্যে সে ব্যাপৃত হয়—কারণ তার গাত্র উত্তপ্ত, চোখে লজ্জা অথচ দেহ-প্রজ্বলন-হেতু বৃশ্চিক নিশ্বাস প্রবাহিত হয়নি অথচ তৃপ্তির পূর্ব্বেই অথ খণ্ডিতা লক্ষণনিচয় ওতঃপ্রোত ; মনে হয়, নিশ্চয় দেহগত ত্রাসকে দুষ্পূরণীয় কাম দ্বারা জর্জ্জরিত করতে চেয়েছিল, বলেছিল, 'ওই বুড়োটাকে আজ বলে দিও, বড় ভয় ভয় করে...কার মনে যে কি আছে...বলা যায় না' বলেই শায়িত উলঙ্গ মেয়ে দুটিকে বলেছিল, 'মরণ—ওঠ্ না বুড়োধাড়ি নির্লজ্জ বেহায়া', বলেই গলা নামিয়ে বলল, 'বুঝলে...'

ব্রজ বুঝল, যদিও এ হেন আপৎকালে দীন-ভিখারী-জনিত প্রীতিলতার ইঙ্গিতের পিছনে কোন সুস্পষ্ট ছবি সে দেখতে পায়নি অথবা আদৌ ছিল না। কেননা মন নির্জ্জনতা-অন্বেষী নয়, কেননা মন দ্বীপ-সন্ধানী নয়, তথাপি বলেছিল, 'পাগল!' ইস্। ভাত যদি থাকত তাহলে সে আনায়াসে এ-মিথ্যা ভয়ের, ত্বরিতেই, সুযোগ নিতে পারত।

'না না বড় ভয় করে'—এ কথায়, অন্য কিছু নয়, প্রীতিলতার আপন ত্রাসের উল্লেখ ছিল। আয়না থাকলে, দেখতে পেত যে সে, যারা এখন সমস্ত শহর-কলকাতায় ভূগর্ভের অন্ধকার ছড়িয়ে দিচ্ছে—তাদেরই মধ্যে একজন। কিন্তু সে হার মানবার মত দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি। কেননা তার কাছে একটা পাড়ই যথেষ্ট—যূথী কাদের বাড়ি থেকে মনোরম নয়ন-অভিরাম জরীর পাড় নিয়ে এসেছিল, সেটি প্রীতিলতা আপনাব গায়ে জড়িয়ে দুই মেয়েকে দেখিয়েছিল, তারা মাকে এরূপ সজ্জায় দেখে চকিতে শিল্পী হয়ে যায়, তারা রহস্য যে কি তা বুঝেছিল, যে রহস্যে বলাকা-চিহ্নিত শ্যাম আকাশের বৈচিত্র্য, নীল সাগরেব বারিরাশির মধ্যে সন্তরণবিলাসী আলোক, তারই পূর্ণ হেমকান্তি ধরেছিল। যূথী-লতি আর স্থির থাকতে পারেনি, এরই মধ্যে যূথী বুদ্ধি করে জানলাটা আরো ভাল করে খুলে দিয়েছিল যাতে মায়ের দেহ জুড়ে যে আলো, তা দূর শতাব্দীর স্মৃতির মধ্যে, তাকে কোলে নেওয়া যায়—এরপর দুজনেই মাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছিল, মনে হয় তারা যেমত বা অতিশয় ভীত, শঙ্কিত। (ভগবান! তুমি অন্তরে থাকতেও মানুষের এত ভয় কেন!) প্রীতিলতা অবশ্যই হার স্বীকার করবে না। সে কোনদিন মরা মাগুর মাছ খায়নি, কাউকে খেতেও দেয়নি। সে হাভাতের একজন হতে কোনক্রমেই পারবে না।

প্রীতিলতা মুখ ঘুরিয়ে বসে, এদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে পরক্ষণেই সে সেইদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে বসে। পুনরায় সেদিক থেকে অন্যদিকে। কিন্তু এই মেয়ে দুটি! মনে হয় এরা বীভৎস, এরা ক্রমশঃ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ব্রজর প্রতি রাগ করার কিছু নেই, এ কারণে যে ব্রজর প্লুরিসিই তার কাল, উপরন্তু তার অক্ষমতা—দুই মিলে তার সমস্ত স্বপ্ন শুধু নয়, জীবনকে বানচাল করেছে। এখন এ সময় একটা টিউশানি পর্য্যন্ত নেই, শহরে অনেকে নেই যারা আছে বোবখা-পরিহিত আলোয় ভৌতিক। তারা সকলেই পরমায়ুকে সব কিছু বলে ধরে নিয়েছে। প্রীতিলতার গা ছম্‌ছম্ করে। তখন এ ভয়কে ঠেকাবার জন্য বৃদ্ধের গীতটি প্রথমে গুনগুন করে গেয়ে যেন আরোগ্য-স্নান করে।

কিন্তু কতক্ষণের জন্য এ গীত! পলকেই প্রীতিলতার দৃষ্টিপথে উদয় হয় এখানে সেখানে জমে থাকা আবর্জ্জনা যেমত অযত্নের গৃহের মাকড়সার জালের মত শঙ্কাপ্রদ অন্ধকার! এ-অন্ধকার ফাংগাস-শীল। প্রীতিলতা মনকে ফেরাবার জন্য তৈজসপত্রে কিছুটা সংস্কার করতে মনস্থ করেছে কিন্তু বাড়িতে এক ফোঁটা ছাই নেই। ছাই নেই তাকে কি, যূথী-লতি ত আছে। যূথী-লতি ছাই নিয়ে এসে খবর দিল, 'মা আমরা মোড়ের পাঁশগাদায় গিয়ে ছাই তুলব, এমন সময় গিয়ে দেখি বুড়োটা...'

'বুড়োটা' শুনেই প্রীতিলতার গায়ে হিমপ্রবাহ খেলে গেল, আপনার শৃঙ্খলিত অস্থিসমূহের বিশৃঙ্খলতার শব্দ শোনা গেল, তবু আপনাকে সংযত করতে সে বলেছিল, 'ছিঃ, বুড়োটা বলতে নেই...আমাদের অমন করে কথা বলতে নেই...'

যূথী এতে, এখন, থেমেছিল ; ফলে লতিদিদির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলতে লাগল, জানো মা, বুড়ো ... মানে বুড়োমানুষ, বলে মার মুখের দিকে অল্প হাসবার চেষ্টা করেছিল, "বুড়ো মানুষ রাস্তায় বসে কাপছে, তার গলা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে—"

শুনে যেটুকু মন সাড়া দিয়েছিল সেইটুকু দিয়ে এদের মা বলেছিল, 'বলিস কি!' বলেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু এরূপ সমাচার তার মধ্যে ধূমায়িত হয়ে এক অভূতপূর্ব্ব বিদ্যুৎ-সম্ভূত রোশনাইয়ের সৃষ্টি করে, এমন কি দুটি হাত ছেলেমানুষের মত হাততালি দেবার জন্য খানিক অগ্রসর হয়েছিল ; সে সেইভাবে হাত দুটি রেখে কিম্ভূত এক প্রশ্ন করে ফেলল, 'আঃ কোথায় সে মর...' কথাটা 'মর'-এ এসেই থেমে গেল, 'বে' অক্ষর যোগে সম্পূর্ণ হয়নি। যূথী-লতি মার এহেন পদ রচনাটা যথাযথ বুঝে উঠতে পারেনি, তারা অবাক হবে কিনা এ কারণে দুজনে দুজনের দিকে চেয়েছিল, ইতিমধ্যে শুনল তার মা পুনর্ব্বার সংশোধন করে বলেছিল, 'বেচারাকে কোথায় দেখলি?'

'মোড়ে—কাশছে আর রক্ত পড়ছে...' এরপর তিনজনেই স্তব্ধ, তিনজনে তিন জনকে অদ্ভুত বিশেষ রূপে নিপট গম্ভীর দেখেছিল। প্রীতিলতা, এ কথা ঠিক যে, এই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃ ছেলেমানুষ ভাবেনি। সহসা এই স্তব্ধতার মধ্যে থেকে, কচি কচি মুলো দিয়ে আধা সর্ষে বাটা দিয়ে ডেংও ডাঁটার চচ্চড়ি বেশ খানিকটা গুড় দেওয়া—স্বাদ পেল। এতে করে একটি ঢোক গিলেই, গলিত শবদর্শনজনিত ভীতি তাকে, প্রীতিলতাকে, অতিমাত্রায় কুক্ষিগত করল। কখন যে আপনকার ছিন্নভিন্ন অঞ্চলপ্রান্ত খসে পড়েছিল তা তার খেয়াল হয়নি এ কারণে যে এখন সে সেই প্রথম ভোরের মোহমুক্ত সজল গীতটি গুনগুন করছিল, কেননা এই গীতে অদ্য সকালের একটি দৃশ্যকে সে মুছে দিতে চেয়েছিল।

প্রীতিলতা, তখন, ছোট করে আগুন জ্বালিয়ে একটু চোকর সিদ্ধ করছিল ; যূথী আর লতি নিকটে বসে আনন্দে নিজেদের আর সামলে রাখতে পারছে না, তারা বাবু হয়ে বসে আপন আপন হাত কোঁচড়ে ঠেসে রেখেছিল, মাঝে মাঝে কাঁধ উঠছিল। এমত সময়ে লতি জানলার বসানের দিকে দেখে বললে, 'মা দুটো আমলকী ফেলে দাও না—বেশ টকটক হবে।' জানলার বসানে বহুদিন পূর্ব্বে আনা ত্রিফলা পড়েছিল। লতির কথায় প্রীতিলতা গোটাকয়েক আমলকী বেছে নিয়ে ফুটন্ত চোকরে ফেলে দিল।

লতি আহ্লাদে সমস্ত দেহকে কেমন একভাবে মুড়ে ফেলতে চাইল, অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছে সে, এই কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে অর্থাৎ মাকে খুসী করবার মানসে বলেছিল, 'ভাতের থেকে আমার চোকর খুব ভাল লাগে।'

যূথী আপনার নীরবতার বোকামী থেকে নিষ্কৃতি পাবাব জন্য যোগ দিল, 'ভাতের থেকে চোকর একশগুণে ভাল, হাই ক্লাস....' মুখখানা এ সময় এমন বিসদৃশ কবেছিল যে তার কানটা মলে দিতে ইচ্ছা করে।

প্রীতিলতা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠে বললে, 'থাক, থাক, আর চোকরের গুণ গাইতে হবে না...লোককে যেন বোলো না আমরা চোকর খাই।' এই শেষ উক্তিতে প্রীতিলতা আপনাদের ঘরগত চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিল। এর পরেই সে চোকর পরিবেষণ শুরু করে।

লতি আপনার পাশতলা থেকে একটি চামচ বার করে বললে, 'আমি সাহেবদের মত খাই' এ কথা শেষ না হতেই যূথী সুকৌশলে চামচটা কেড়ে নিল, ফলে দুজনে মারপিট বেধে গেল। এ কারণে থালা

উল্টে পড়েছিল, যূথী পা দিয়ে লতির থালাও উল্টে দিল। প্রীতিলতা খুব সহজেই দুজনকে প্রচণ্ড দুই চড়ে শান্ত করে পড়ে যাওয়া চোকরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত এক দেহভঙ্গী করে মুখ ফিরিয়ে ঘরে যেতে যেতে বললে, 'তুলে খেয়ে ফেল' ; এই কথাটা বার হতেই এক ঝলক ত্রাস এসে তার দেহে প্রবেশ করেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের জানলার দিকে চেয়েছিল, খানিকটা নির্ঝঞ্ঝাট স্থান সেখানে বর্ত্তমান, খানিকটা অব্যক্ততা সেখানে ওতঃপ্রোত। এইটুকু দর্শনে প্রীতিলতা বলেছিল, 'বেচারা' আর যে, সে অন্যমনস্ক ভাবে কোন আপনজনের সঙ্গে প্রত্যহের আগন্তুক হাড়ের খেলাকে মিলিয়ে নিতে চেয়েছিল, ভেবেছিল 'বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, এমনই হতেন।' এ সব কথার কারণ এই যে, আপনজন হলে মানুষ অনায়াসেই নিগূঢ় বেদনা অনুভব করতে পারে।

ব্রজ আজ দুদিন কোন কিছু আনতে পারেনি, গতকাল সে বলেছিল, 'আজ এক অদ্ভুত জিনিস দেখলুম জানো—এক ভদ্রলোক লোঙ্গরখানায়...' আর কথা বার হয়নি, অনুক্ত কথার স্বর তার বিশ্রী দাড়িতে ঘোরাফেরা করতে লাগল, শায়িত প্রীতিলতা একটা চোখ খুলে ভয়ঙ্করভাবে চেয়ে থেকেই ঝটিতি উপুড় হয়ে শুয়েছিল, ব্রজ স্ত্রীর ব্যবহারে সত্যিই অস্থিহীন হয়ে পড়লে। সে ধীরে ধীরে বসে পড়ল। অন্যপক্ষে, প্রীতিলতা, খানিক সামলে উঠে বসে হঠাৎ ব্রজর হাত ধ'রে, 'আমার বুকে হাত দিয়ে বল, কখনও এসব গল্প...আমার বড় ভয় করে', বলে আস্তে হাত সরিয়ে পুনরায় তড়িৎগতি স্বামীর হাতে হাত রেখেই ভীতভাবে বলে উঠল, 'আবার জ্বর—তাহলে...'

'একটু গা গরম...'

প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে ম্লান সন্ধ্যার মমত্ব ছিল, যে মমত্ব দীর্ঘশ্বাসের পরমার্থ, যে মমত্ব কিশোরীর লজ্জার লাল ; আপনকার ধমনীসমূহকে ত্বক বিদীর্ণ করত বাইরে আনতে ব্রজর ইচ্ছা হল কেননা প্রীতিলতার প্রশ্নে নয় আগ্রহে, আগ্রহ নয় অনুভূতির মধ্যে সময়ের বিবেচনা ছিল, পূর্ণতা ছিল, যে পূর্ণতা দ্বারা রমণীরা চিরকাল ভালবেসেছে। অতএব এরূপ প্রশ্নে ব্রজ কিছুটা ঘর্ম্মাক্ত হল।

অন্যপক্ষে প্রীতিলতা আপনার আঁচল দ্বারা স্থানটি সংস্কার করে, যূথীকে বলতে গিয়ে দেখলে সে ঘুমিয়ে, লতির মুখের বুড়ো আঙুলটি, সে বলতে গিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। ব্রজ মাটিতেই শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল কিন্তু প্রীতিলতা অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠে, 'ও কি মাথা খারাপ নাকি—আশ্চর্য্য আজ মাসখানেকও হয় নি ভুগে...' বলে মাদুরটা মাটিতে খানিকটা গড়িয়ে দিয়ে, একপ্রান্ত তখনও তার হস্তগত, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম ছোট একটি হাঁ করে ব্রজর প্রতি চোখ তুলে ধরেছিল বলেছিল, 'জানো বুড়ো মিনষের নাকি মুখ দিয়ে...'

ব্রজ নিজের অসুস্থতার কারণে অর্থাৎ সে নিজে ভুগছে, স্ত্রীর কথায় ভীত হবার পূর্ব্বেই বলেছিল, 'দূর...'

'আমারও তাই মনে হয়... দাঁত ফাঁত দিয়ে হয়ত পড়ে থাকবে...' এই বলতে বলতে মাদুর পেতে দিয়ে বললে, 'ভেবেছিলাম তোমাকে বলব ওকে এখান থেকে চলে যেতে, তোমার শরীর...'

'আঃ দূর'

'তা পরে ভাবলুম কিছু ত দিতে পারি না, অন্তত একটু জায়গা, কি বল গরীবকে দিলে ভগবান মুখ তুলে...

পুনরায় অভুক্ত স্তব্ধতা। ব্রজ জ্বর-উত্তপ্ত চোখেই ভাবছিল, খুব আশ্চর্য্য নয়, প্রীতিলতা গান গাইত, প্রীতিলতার কণ্ঠস্বরে লালিত্য ছিল। এখন, বিশেষত আজ তার—একদা মায়াবিনী প্রীতিলতার—কণ্ঠস্বরে ক্রমাগত বালি ঝরার ভয়াবহতা। কে মনে নেই, একদা ধাঁধা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'জ্বলল আঁধার নিভল আলো' এর মানে কি, ব্রজ নির্বোধের মত এই হেঁয়ালির দিকে চেয়েছিল। তেমনি এই কণ্ঠস্বরের দিকে চেয়েছিল, অর্থ করতে পারেনি, হেঁয়ালির অর্থ যে পেট তা ব্রজর বুদ্ধিতে আসেনি—উদর যখন জ্বলে তখন সকলই অন্ধকার, উদর প্রজ্বলন হেতু আলোক, হায় কি অন্ধকারময়ী! তারাই ধন্য, যারা খাবার দেখলে সত্যি সত্যি যারপরনাই ভীত হয়।

অনেকক্ষণ পর অসম্ভবভাবে ঘুম ভেঙে গেল, দেখল ছিন্নভিন্ন বস্ত্রে ভূষিতা প্রীতিলতা. আপনকার হাঁটুতে মাথা রেখে নির্লজ্জভাবে ঘুমিয়ে ; অদূরে কন্যাদ্বয় দেওয়ালে—ভিজে ভিজে দেওয়ালে ঠেস

দিয়ে কান্নার বীভৎসতা প্রকাশ করছে ; একারণে ব্রজ রোজগারি বাপের মত বিরক্ত, সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড চড় মারার জন্য কিঞ্চিৎমাত্র চেষ্টা করতেই, দেখল যে তার দুর্ব্বল দেহটা দেওয়ালের সঙ্গে গিয়ে আঘাত খেলে ; ইচ্ছা দেহটা যুত করতে পারেনি। খানিক দেওয়ালের কাছে সেইভাবে সে দণ্ডায়মান ছিল।

যূথী-লতি কান্না থামিয়ে চোখ বড় করে, প্রীতিলতা চোখ খুলে তাকিয়েছিল—প্রীতিলতা কিন্তু মাথা তোলে নি, ফলে যে দুঃখময় রেখা তার দেহ ভর করেছিল তা অদৃশ্য হয়ে যায়নি, কি দুগ্ধহীন-স্তনক্ষুব্ধ সে রেখা!

প্রীতিলতা বুঝেছিল, ব্রজ বার হচ্ছে, কেননা এখন সে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে আপনার প্যাণ্টুলুনের ভাঁজ ঠিক করছিল। প্রীতিলতা প্রশ্ন করল, 'কোথায়?'

'বালিগঞ্জ।'

প্রীতিলতা দক্ষিণ দিকে চাইল, কেননা বালিগঞ্জ দক্ষিণে, মনে হল সেখানে কি মৃত্যু নেই...আর্ত্তনাদ নেই! যে আর্ত্তনাদ আরও প্রবলতর হয়ে তাদের দরজায় ফিরিঙ্গি কায়দায় আঘাত করছে। প্রীতিলতা ভয়ে আপন মুখমণ্ডলে বস্ত্রপ্রদান করেছিল। সে ত্রস্ত শঙ্কিত। সমগ্র পৃথিবীটা যেন বা ডাক্তারবাবুর কম্পাউণ্ডার নিমাই জগমণির মত, অনেকটা ধুকুড়ীয়া বাগানের আখমাড়া ম'ম করা রাণ্ডি যেন, যার হাস্যে সদ্য কাঁচা সর্দ্দির আদুরে আওয়াজ, পাটের রকমারি রঙে উদ্‌ব্যস্ত রুমালে বটবৃদ্ধ শরীরটা ঢেকে বসে আর যাই হোক এ দৃশ্য খুব সুন্দর নয়।

প্রীতিলতা মুখমণ্ডলের বস্ত্র সরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ফিরতে ত....'

হ্যাঁ সাতটা আটটা...' ব্রজ এই উত্তর দিতে দিতে চলে গেল। প্রীতিলতার মনে হল কোথায় যেমন বা ব্রজ অদৃশ্য হয়ে গেল। কি দুর্দ্ধর্ষ রহস্য! মানুষ যে দোমড়ান অনন্ত বৈ অন্য নয়, সে সত্য বুঝবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে প্রীতিলতা প্রীতিলতার মধ্যেই থেমেছে এবং গুনগুন করে সেই গীতধ্বনি করেছিল।

এখন সে শুয়ে, সে যখন ভাবছিল, ব্রজ দুটি ভাত না পেলে আব উঠতে পারবে না, ঠিক এমত সময়ে, যূথী প্রায় মার ঘাড়ের উপর পড়ে দ্রুত নিশ্বাসে বলেছিল, 'মা দেখ লতি কি কুঁড়িয়ে খাচ্ছে...'

অচিরাৎ জ্যা-মুক্ত ছিলার মতন প্রীতিলতা উঠে দাঁড়াল, সত্বর বারান্দায় গিয়ে লতির সম্মুখে দাঁড়াল। ক্ষণেকের জন্য মার মনে হয়েছিল, আমার কি যূথীর মত হিংসে হয়েছে! সঙ্গে সঙ্গে একটি চড়ের আওয়াজ শোনা গেল—এ চড় লতির গালে প্রীতিলতাই মেরেছিল সঙ্গে সঙ্গে লতির মুখ থেকে কি যেন ছিটকে পড়ল। পলকেই প্রীতিলতা এবং যূথী ছুটে গিয়ে দেখে, জলসিক্ত হরীতকী...। ছোট একটা নিরেট নিপট আর্ত্তনাদ—আর্ত্তনাদের সঙ্গেই ধ্বনিত হয়েছিল বহু পূর্ব্বে সেনেটে উক্ত লাটিন ডায়লগ : 'এবং তুমিও!' এ দৃশ্যে পরক্ষণেই প্রীতিলতা জলদগম্ভীর রৌদ্রকর্ম্মা আওয়াজ শুনেছিল।

প্রীতিলতা সমাগত পবিত্র সন্ধ্যাকে কশ্চিৎ জলপ্রপাতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। অমিত্রাক্ষব ছন্দ যেরূপ সদাই বিষণ্ণভাবে শেষ হয়, তেমনি তার দক্ষিণ হস্ত থেকে ধ্যানপ্রসূত কতিপয় নকসা অদৃশ্য হল। সে সেই গীতটি ক্লান্তকণ্ঠে, ছোট ঘরের মধ্যে মন্থর গতিতে ঘুরে, ঘুরে, গাইছিল। ঘরে আর অন্য কারও নিশ্বাস ছিল না। এ কারণে যে যূথী-লতিকে বাপের জন্য অপেক্ষা করতে এই কিছুক্ষণ আগে মোড়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এখন অন্ধকারে কোথায় যে সে, এ কথা ভুলে গেল, সে সত্যই দেওয়ালে হস্তদ্বারা অনুভব করত 'এই যে বোধ হয় আমি' এরূপ মনে করবার চেষ্টা করেছিল, এবং তৎসহ সমস্ত স্থাপত্যের প্রতি তার বীতশ্রদ্ধা এসেছিল, সমস্ত আকাশের কিছুটা নিদ্রার বাস্তবতা এখানে যে, সে তা জানত না অথবা কেউ তাকে জানায় নি—অনেকবারই সে সেখানে, দেওয়ালে, মাথা খুঁড়েছিল। কিন্তু তবু প্রীতিলতা খুব আশ্চর্য্য সহকারে দেখেছিল যে এরূপ সংঘাতপ্রসূত বেদনা উক্তির 'উঃ'-কারের মধ্যে বৃদ্ধের প্রভাতী গীতের রেশ বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে, ইদানীং প্রত্যহের সময়মাফিক নর্দ্দমার লোহা আর লাঠির আওয়াজ, ভয়ঙ্কর আওয়াজ, সমস্ত দিককে বিমর্দ্দিত করেছিল ; এবং অন্ধকার কক্ষমধ্যে একাকিনী প্রীতিলতা চকিত ভীতা, আপনকার শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কাকে যে সে রক্ষা করতে চাইল তা সঠিক বুঝা গেল না—যেহেতু

এখানে অন্ধকার—সম্মুখের শূন্যতাকে অথবা নিজেকেই। (হায় প্রীতিলতা যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে সে দেখতে পেত, এই শূন্যতা ভেদ করে সে কখনও যায় নি!)

প্রীতিলতা ভীত হয়ে অদ্ভুতভাবে আপন আত্মরক্ষায় যত্নবান হয়েছিল। এবং একথাও ঠিক যে, সে সেই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে। এবং এতে করে সে আর একটি অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত হল।

আদতে আপনাকে ধরে রাখাই তার উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা অতীব সাধু কৌশল। ইত্যাকারে খানিক অসময় পার সত্যি হয়েছিল, কিন্তু আর পারা গেল না, কখন যে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা তার খোঁজ ছিল না।

তির্যক গ্যাসের আলোয় বসে বৃদ্ধ খানিক শ্রান্তি দূর করে শূন্যতার সংঘাত হেতু কম্পিত হতখানি দ্বারা আপন কপাল মুছছিল, এরপর অসম্ভব মায়াজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, 'হরি বল'—অনন্তর এখন, যখন সে কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থ বোধ করেছিল তখন সে গীতটির সুর ধরেছিল। অন্ধকার কক্ষমধ্যে ইদানীং অন্ধকারে পরিবর্ত্তিত একটি দেহে সে গীত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, এ কারণে যে প্রীতিলতা এখনও তেমনিভাবে দণ্ডায়মানা।

বৃদ্ধ গীতটি গাইতে গাইতে, খানিক স্খলিত পদে স্বভাব মত বাইরে যাবার নিমিত্ত এখান থেকে চলে গেল, শুধুমাত্র বস্তাটা সেখানে। প্রীতিলতা আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে নি। খানিক বিবস্ত্রতা সত্ত্বেও ছুটে, থমকে, কাপড় সংগ্রহ করত কোনক্রমে জড়িয়ে, সদর দরজার নিকটে এসে স্থির, এমত সময় সে আপনার নিশ্বাসের সময় পেয়েছিল, শব্দও নিশ্চয়। কত রকমারি নিশ্বাস প্রীতিলতা ফেলেছে উষ্ণ, দীর্ঘ, হারমানা!

এখন, সে, সদর দবজাব এপাশে, অল্প গ্যাসেব আলোয সেই ঘুমন্ত ভাল্লুকের মত বস্তাটা এবং সম্মুখেই অদ্ভুত এক ভঙ্গীসহকারে প্রীতিলতা, গৃহিণী, দণ্ডাযমান। মনে হয়, এক মুহূর্ত্তের জন্য মুখ ফিরিয়েছিল, এমন হতে পাবে সে ছায়া দেখতে চেয়েছিল। আঃ পরোক্ষ অনুভূতি!

ঝটিতি প্রীতিলতা রাস্তায় নেমে, বস্তাটায় হাত দিতেই, হস্তদ্বয় তড়িৎবেগে ফিরে, কিছুক্ষণের নিমিত্ত, আকাশহীন শূন্যতায় কম্পিত হতে থাকল। পরক্ষণেই যখন সে বস্তাটা ধরে কায়দা করার চেষ্টা করে, তখন দেখে—বৃদ্ধ হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে, একটু এসেই বৃদ্ধ কেমন যেন বা নেচে উঠল—বোধ হয খোয়ার জন্য, তারপবই পাশের দেয়ালে হেলে পড়ে, দেওয়াল ঘষতে একটু এসেই সমগ্র জোর দিয়ে প্রীতিলতার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ল। পুরুষের স্পর্শে গৃহিণী প্রীতিলতা অচিরাৎ এক নৈসর্গিক বয়স ফিরে পেলে, সে পিঠের ঝটকায় এমনভাবে বৃদ্ধকে আঘাত করেছিল যে বৃদ্ধ টাল সামলাতে না পেরে রকে মুখ থুবড়ে পড়ল ; কম্পিত, বিচলিত হাত দ্বাবা কোনক্রমে রকের কিনারাটা ধবেছিল, চোখ দুটি চাইবার চেষ্টা করলে, মুখমণ্ডল যেন বা ফুলে উঠে, গ্যাসেব আলো পেলে, মুখখানি এসময় অর্দ্ধ উন্মুক্ত ছিল ; হঠাৎ বোতল থেকে তরল পদার্থ যেরূপ নির্গত হয় তেমনই সশব্দে রক্ত পড়ল। এ দৃশ্যে প্রীতিলতা মজ্জাগত মনুষ্যত্বের বশে তাকে সাহায্য করতে গিয়ে, থমকে, আপনকার উদ্যত হস্তদ্বয় দেখেই সেই হাতে বস্তাটা তুলতে গিয়ে পুনরায় দেখল যে, রকের কিনার থেকে জর্জ্জরিত হাত দুটি ধীরে নেমে গেল, ফলে সমস্ত শরীরটা তারই দিকে ঢলে পড়তেই একটু সরে গিয়ে—রকে বসে পড়েছিল। শুধু মনে হল, এখনও কি মানুষেরা মৃদুস্বরে কথা কয়, ছোট করে হাসে!

প্রধূমিত কক্ষের মধ্যে প্রীতিলতা যেমত সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল, বহুবার সে জানলায় দাঁড়িয়েছে, গরাদ মুঠো করে পুনর্ব্বার ফিরে গেছে। এমত সময় শুনল, দুটি কচি পদধ্বনি, এখানে এসেই যেন নিভে গেল। জানলা থেকে প্রীতিলতা বললে, 'রক থেকে দেখ ত কি হল বুড়োর'—এ কণ্ঠস্বর আজও প্রতিধ্বনিত হয় নি। যূথী-লতা দেখার পূর্বে—প্রীতিলতা বলেছিল, 'ঝট করে ক্লাবে খবর দে।'

কিছু পরে ক্লাবের ছেলেরা এল, এসে দেখে বললে, 'হাঁ শাল্‌লা—চ ওঠা শালাকে...'

যূথী-লতি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একবার বুড়োর বস্তার বা লাঠির বা মগের কথা তাদের মনে হল না। ইতিমধ্যে মার কণ্ঠস্বর শুনেই তারা ভিতরে চলে গেল।

হঠাৎ হাঁড়ি উনুনে চড়েছে, তলায় আগুন, এসব দেখে তারা যেন এক পরীর রাজ্যে চলে গেল। তারা হাসল, তারা স্বাভাবিকভাবে চলতে গিয়ে সর্পগতিতে এগিয়ে গিয়েছিল।

যদিও যূথী প্রশ্ন করতে গিয়ে চুপ, তারা দুই বোন বাবু হয়ে বসে, বাপের জন্যেও একটা জায়গা করেছে ; এমন সময় খানিক সুস্থ আওয়াজ। মেয়ে দুটি 'বাবা! বাবা!' বলে উঠে গিয়েছিল।

'আজ খুব বরাত ভাল—চাল পেয়েছি', বলে এক পকেট থেকে চাল বার করল। 'একি চাল কোথায়...'

'বলছি,—তোমার শরীর...'

'জ্বর নেই—পাঁচটা টাকাও পেয়েছি...'

'বেশ বেশ...আর দেরী কর না, বসে পড়।'

গরম ভাতের সামনে বসে ব্রজর নিজেকে মানুষের মত মনে হল, এবং প্রীতিলতাকে তারিফ করবার জন্য বলেছিল, 'হ্যাঁ কোথায় পেলে...'

এ কথার উত্তর প্রীতিলতা প্রস্তুত করবার জন্য ডালভাতের ন্যাকড়াটার গিঁট খুলবার জন্য একটু ঘুরে বসতেই...ব্রজ তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলে, 'ওমা তোমার পাছার কাছে রক্ত...'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতিলতা ঘুরে বসেই শুনলে, লতি বলছে, 'জানো বাবা বুড়োটা মরে গেছে...'

প্রীতিলতা যুগপৎ বলেছিল, 'কি যে অসভ্যতা কর এদের সামনে, জান না কিসের রক্ত—নোংরা' বলেই থেকে গিয়ে জিব কাটল।

ব্রজ দুবার 'ও ও' বলেই কেমন যেন থ হয়েছিল।

'নে খা-না তোরা', প্রীতিলতা দমকা আওয়াজ করে বলেছিল। অনন্তর গরম ভাত পাওয়ার জন্যই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক, একটু সোহাগ-খোরাকী গলায় বলেছিল, 'বুড়োর জন্য মন খারাপ করছে...খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না...'

প্রতিভা বসু

প্রতিভূ

একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি। মাথার চুল এতো সাদা হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় চিনতে পারিনি, একটু পরেই ও, আপনি? বলে তাড়াতাড়ি আদর-যত্ন করে বসালাম, কক্ষান্তরে গিয়ে চায়ের জল চাপাতে বলে মিষ্টি আনতে দিলাম।

মহিলাটি বললেন, প্রায় দশ বছর বাদে, না?

আমি বললাম, তা তো হবেই।

তোমার চেহারা তো ঠিক আগের মতোই আছে।

হেসে বললাম, আপনার চুল ছাড়া আপনিও প্রায় তেমনি আছেন।

ঠিক তেমনি?

পাড়-ছাড়া কাপড়ে অবশ্য এই প্রথম দেখছি।

বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়েই এটা ধরলাম। তারপরে খুলির বিয়ে হলো, রঞ্জনের বিয়ে হলো—

সবাই কলকাতায় আছে তো?

কেউ না। আমি নিতান্তই নিঃসঙ্গ। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ছোট্ট একটা বাড়ি করেছি নিউ আলিপুরে, একা থাকি।

ওঁরা কে কোথায় আছেন?

বড়োটি পুণায়, ছোটটি জলপাইগুড়ি, মেয়ে দিল্লিতে।

সবাই দেখছি খুব দূরে দূরে। যান না মাঝে মাঝে?

যাই, কিন্তু থাকি না।

ঘুরে ঘুরে থাকলে পাবেন, তা হলে এতো একা একা লাগে না।

একটু হাসলেন। যাদের নতুন জীবন, নতুন সংসার, পুরোনো মানুষ সব সময়েই সেখানে অবান্তর। এক গ্লাশ জল দেবে?

নিশ্চয়ই।

জল এনে দিলাম। খেয়ে গ্লাশটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, তোমার 'সঙ্গ সুধা' গল্পটা আমি পড়েছি।

বলামাত্রই আমার ত্রাস হলো, জানি, এরপর তিনি কী বলবেন।

তোমার তো ঐ একটাই বিষয়—প্রেম।

আপনার জন্য চা করে নিয়ে আসি আমি ওঠবার চেষ্টা করেছিলাম, তিনি বসিয়ে দিলেন, চা পরে হবে, কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই যে, গল্পটায় তুমি যা লিখেছ তা কি সত্যি বিশ্বাস করো?

আমি আমতা-আমতা করছিলাম। আমার লেখা নিয়ে চিরকাল আমি এঁর কাছে তিরস্কৃত। অনেকবার অনেক গল্প বা উপন্যাস পড়ে উত্তেজিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন, মুখ লাল করে বলেছেন, হাজার হোক, তুমি তো একজন মেয়ে, তোমার হাত দিয়ে কী করে এই সব অসংগত অন্যায় ভালোবাসার গল্প বেরিয়ে আসে, ছি! এ রীতিমতো সমাজবিরোধী কাজ, কতো মেয়ের এতে চরিত্র নষ্ট হতে পারে তা তুমি জানো?

আমার মুখটা তখন বোকা-বোকা হয়ে গেছে।

ভুরু কুঁচকে বলেছেন, মনে হয় তোমার জীবন খুব মসৃণ নয়, সত্য করে বলো দেখি কতো পুরুষের সঙ্গে প্রেম করেছ?

মিনমিন করে বলেছি, গল্প তো গল্পই, তার সঙ্গে কি নিজের জীবনের মিল থাকে কোনো?

থাকে। নিশ্চয়ই থাকে। অন্তত তোমার গল্প পড়লে নিশ্চিত বোঝা যায় সেটা। নইলে অত খুঁটিনাটি জানো কী করে? নায়ক-নায়িকার সংলাপ পড়তে পড়তে তো মনে হয় কাগজের পাতা থেকে বুঝি এখুনি উঠে আসবে। এ বয়সে আমাদেরই বুক কাঁপে।

সাহসভবে হাসি হাসি মুখ করে বলেছি, তাহলে বলুন ভালো লাগে আপনার, নইলে বুক কাঁপবে কেন?

ঐ জন্যেই তো বলছি নিজের অভিজ্ঞতা না থাকলে কেউ ও রকম লিখতে পারে!

ঠাট্টা নয়, আমার ধারণা উনি সত্যি আমাকে কখনো বোধ হয় খুব সচ্চরিত্র বলে ভাবতেন না। তবু আমি ভালোবাসতাম এই মহিলাটিকে। এক সময় আমরা প্রতিবেশী ছিলাম, বয়সে অনেকটা বড়ো হওয়া সত্বেও অদ্ভুত একটা বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলাম। অল্প বয়সের বিধবা, কিছুটা যে পিউরিটান হবেনই এ তো ধরাধার্য, কিন্তু তার বাইরে—সঙ্গটা অতিলোভনীয় ছিলো। অনেক বই পড়তেন, রসিকতা করতেন, নিজের দুঃখ-বেদনা নিয়ে কখনো অন্যকে এতোটুকু বিব্রত করতেন না। থাকতেন ভায়েদের সংসারে, একমাত্র মোছামোছা পাড়ের শাড়ি পরা ছাড়া আর অন্য সব বিষয়েই বৈধব্যে নিষ্ঠাবতী ছিলেন। দেখতে সাধারণ হলেও শ্যামলা রংয়ের উপরে সুন্দর একটা সহজাত লালিত্য ছিলো।

পাড়া বদলে আসার পরও আসতেন তিনি, এবং যখনি আসতেন তখনি বুঝতাম কপালে আছে কিছু। কেননা, লক্ষ্য করে দেখেছি, যতোবারই এসেছেন, কোনো লেখা পড়ে উত্তেজিত হয়েই এসেছেন। এসেই তীরন্দাজ হয়ে শেলবিদ্ধ করেছেন। আমি রাগ করিনি, ওঁর পছন্দমতো বেশি দুধ

চিনি দিয়ে চা করে উত্তেজনা প্রশমিত করেছি। তারপর লেখার প্রসঙ্গ ঢুকে গেলেই অন্য মানুষ।

সেদিনও চা মিষ্টি দিয়ে মুখ মিষ্টি করতে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম। দশ বছর বাদে হলেও ভয় পেলুম। প্রবল ঢেউটা সামলাবার জন্য অপেক্ষা করছিলুম। বললেন, বিলিতি স্ত্রী-পুরুষ নিয়ে তোমার আরো অনেক গল্প আমি পড়েছি, কিন্তু এদের একেবারে চরমে নিয়ে পৌঁছে দিলে? শেষে একজন ষাট বছরের মহিলা একজন পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধকে বিবাহ করলো?

কান চুলকিয়ে বললুম, মানে, ঐ আর কী, এই বয়সে বিবাহের মানে তো—

একজন সঙ্গী, এই তো?

ঠিক তাই।

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বললেন, তোমরা কদ্দিন বিদেশে ছিলে?

বললুম, তা মন্দ কী। বছর তিন-চার তো হবেই।

অনেক সাহেব-মেমদের সঙ্গেই নিশ্চয় বন্ধুতা হয়েছে?

তা তো হয়েইছে।

এ-রকম দেখেছ বুঝি?

দেখেছি।

তা হলে আমার বয়সী মহিলাও সেখানে বিয়ে করে?

আপনার বয়সী একজন বন্ধুকে নিয়েই আমার ঐ গল্প।

বলেই ভয়ে-ভয়ে তাকালাম।

ভদ্রমহিলা হাসলেন, এখন আর কী করে বলি এটাও তোমার জীবনের গল্প। তোমার তো সে বয়েসে আসতে ঢের দেরি।

এই সময়ে আমার গৃহসেবিকা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে ঢুকলো। আমি নিচু হয়ে চা ঢালতে লাগলাম। তিনি বললেন, দ্যাখো, আমি কিন্তু তোমার একজন ভক্ত পাঠিকা।

অ্যাঁ! হাত থেকে চা প্রায় ছলকে পড়েছিলো।

তোমাকে আমার একটা গল্প বলতে ইচ্ছে করছে।

বলুন না।

গল্পটা ব্যক্তিগত। শেষ বয়সের একটি স্বীকৃতিমাত্র। বিরক্ত লাগলে বোলো, থামিয়ে দেবে।

আমি উৎসুক হলাম।

এক চুমুক চা খেলেন, থেমে থেকে বললেন, জানো তো সারাটা জীবন কীভাবে কাটালাম। স্বামী যখন মারা যান, আমার বয়েস মাত্র তেইশ। তার মধ্যেই তিন সন্তানের জননী। ম্যাট্রিক পাস করে বিয়ে হয়েছিলো, তারপর তো সব শিকেয় উঠেছে। স্বামী টাকাকড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেননি, একটা লাইফ ইনসিওর করবো করবো ভাবছিলেন, ভগবান তার আগেই তুলে নিলেন। কাজেই শ্বশুর ভাসুর তৎক্ষণাৎ অলক্ষ্মী বলে বাপের বাড়ি ঠেলে দিলেন, আমিও বাপহীন বাপেরবাড়িতে গিয়ে দুই দাদার গলগ্রহ হয়ে বসলাম। বলাই বাহুল্য, কেউ আমাকে আদর করে জায়গা দেয়নি, নিতান্ত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারেনি বলেই থাকতে দিয়েছে। খাওয়া বিষয়েও ঠিক তাই। আমার আর কী! আমি তো একটা বিধবা মানুষ, মায়ের ভাতের সঙ্গে দুটি ভাত আর কিছু সেদ্ধ, তার উপরে উপোস-কাপাস তো লেগেই আছে, কিন্তু মুশকিল হতো বাচ্চাদের নিয়ে। তারা তো আর আমার মতো খিদে হজম করে থাকতে পারতো না? কাঁদতো। ছোটটাকে বুকের দুধেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করাতে চেষ্টা করতাম, বোঁটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেও এতোটা খাদ্য সে পেতো না যাতে তার ঐ ছোট্ট পেটটুকুও ভরানো যায়।

আমি কারো দোষ দিচ্ছি না, সত্যি তো আমার পরিবার নেহাৎ ছোটো নয়। তিনটে বাচ্চা, একটা মা, চারটে পেট, ওঁরাই বা পারবেন কেন? সেজন্য আমি দিনরাত খাটতাম, ভাবতাম কাজের লোকটিকে তুলে দিলে সেটুকু তো ওদের সাশ্রয় হবে? তার মাইনেটা তো বাঁচবে? আর সে একা যা খেতো, তাতে আমাদের চারজনের পেট ভরে যাবে। আমার বড়ো ছেলেটা তখন পাঁচে পা দিয়েছে, মেয়েটা তিন, আর ছোট ছেলে মাস দশেকের।

কিন্তু তাতেও খুব সুরাহা হলো না, আমি কাউকেই খুশি করতে পারলাম না। অতিষ্ঠ হয়ে শেষে কাজের চেষ্টার বেরুলাম। আমা মতো একজন যুবতী মেয়ের বেরুনো নিয়েও আপত্তি উঠেছিলো, সেটা আমি মানিনি, কেননা মানবার কোনো উপায়ই ছিলো না। ইস্কুলে ইস্কুলেই ঘুরতাম, আমাদের সময়ে ভদ্র মেয়েদের ঐ একটা পেশাই মাত্র ছিলো। আমি সেখানে একটা আয়ার কাজের জন্যও চেষ্টা করেছিলাম, হয়নি। একদিন দৈবাৎ একজন লাইফ ইনসিওরেন্সের ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এই ভদ্রলোকই আমার স্বামীকে ইনসিওর করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

আমার দুঃখ দৈন্য দেখে, সব শুনে উনি আমাকে ওঁদের কোম্পানিতে এজেণ্ট হবার পরামর্শ দিলেন। সেই এজেন্সি নিয়ে পরিচিত, অর্ধ পরিচিত, অপরিচিত, আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব, কোনো দরজাতেই ধরনা দিতে বাকি রাখিনি। সে যে কী কষ্ট, কী অপমান, আমি কেমন করে বোঝাবো! শেষে আমাকে দেখলে লোক আঁতকে উঠেছে। আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু ঐ তিনটি পেটের শত্রুই তো ছিলো আমার আসল দড়ি, আমি আর পালাবো কোথায়?

এই করে করেই দু-চার বছরে আয় হতে লাগলো কিছু। অন্তত আমাদের খোরাকিটা আমি ভালোভাবেই আমার বউদিদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বলতেন, জাতও গেছে পেটও ভরে না এমন কাজ করে লাভটা কী? দুঃখের সঙ্গী এক বৃদ্ধা মা, কিন্তু তাঁর আর কতোটুকু ক্ষমতা? তিনিও তো পরাধীন।

এই পাথারে ভাসতে ভাসতেই হঠাৎ একজন মানুষকে আমি একদিন ভালোবেসে ফেললাম।

আপনি ভালোবেসেছিলেন। আমি প্রায় চমকে উঠলাম এ কথা শুনে।

প্রায় ষাট বছর বয়সের মহিলাটি তাঁর চেয়ে অনেক কনিষ্ঠ আমার দিকে অপরাধী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, খুব কি অন্যায়? খুব কি অসম্ভব? তুমি তো এই, আমাদের মতো দুঃখিনীদের জীবনকেই আলোতে নিয়ে যাও। ভালোবাসার সততা নিয়েই তো তোমার কারবার, বলো, সে কি ভয়ানক একটা অবাস্তব ঘটনা আমার পক্ষে? জগৎ-সংসার থেকে আমি কতোটুকু পেয়েছি? বিয়ে হয়েছিলো ষোলো বছর বয়সে, তার পরের সাত বছরে এক দমকে তিন সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে, কোন সুখের অমরাবতীতে আমি বাস করছিলুম?

তাইতো।

মানুষটির সঙ্গে আমার অদ্ভুতভাবে চেনা হয়েছিলো। বোঝোই তো যে কাজ আমি নিয়েছি তাতে কেমন তাকে তাকে থাকতে হয়? সারাদিন কেবল কাকে ধরি আর কাকে ধরি এই চিন্তা। আসন না পেয়ে একদিন ট্রামে এই ছেলেটি লেডিস সীটে আমার পাশে বসেছিলো, চেহারাটি বেশ শিক্ষিত শিক্ষিত, চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ। একটু তাকিয়ে কেমন মনে হলো এর সঙ্গে একটা ছুতো ধরে পরিচয় করলে হয়। বয়েস অল্প আছে—ধরাপড়া করলে একটা ইনসিওর করলেও করতে পারে। কিন্তু কীভাবে আলাপটা শুরু করা যায় ভেবে পাই না। হঠাৎ গুরুগম্ভীর আওয়াজে সে নিজেই বললো, আমার জন্য আপনার বসতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?

আমি বিগলিত হয়ে বললাম, কী আশ্চর্য! অসুবিধে কেন হবে?

সে বললো, অন্যমনস্কভাবে আপনার অনুমতি না নিয়েই বসে পড়েছিলুম।

বলতে যাচ্ছিলুম, তাতে কী হয়েছে? তার আগেই সে আমার দিকে ফিরে তাকালো, আমিও তাকালুম, সঙ্গে সঙ্গে বুকটা কেঁপে উঠলো আর মনে হলো আমার একটা সর্বনাশ হয়ে গেল।

সর্বনাশ কেন?

সর্বনাশ নয়? আমি বিধবা না? আমার তিনটে বাচ্চা আছে না? পাপ-পুণ্য বলে একটা কথা আছে না?

পাপ-পুণ্য!

নিশ্চয়ই। আর তো কোনোদিন এরকম হয়নি। কতো তো ঘুরে ঘুরে কাজ করি। তাড়াতাড়ি রাস্তা দেখতে লাগলাম। বুকটা তখনো ধ্বকধ্বক করছিলো। সেই আমার জীবনে প্রথম প্রেম অথবা প্রথম পাপ।

আমি হেসে বসলাম, পাপ তো নয়ই, প্রথম প্রেমও নয়, তার আগে নিশ্চয়ই স্বামীর সঙ্গে প্রেম ছিলো?

তা ছিলো। তিনিও হাসলেন, তবে সে ছিলো জুটিয়ে দেয়া প্রেম। অবশ্য তাও কম খাঁটি ছিলো না। আমার স্বামীকে আমার খুব ভালো লেগেছিলো, কিন্তু তার মধ্যে তো কোনো বাধা-বিরোধ ছিলো না। আমার ধর্মই ছিলো তাঁকে ভালোবাসা। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিলন একটা বাধ্যতামূলক ঘটনা মাত্র। ঐ বয়সে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হলে শরীরে তো আগুন ধরবেই! অন্তত কয়েকদিন পর্যন্ত সে-আগুনের তাপ উর্ধ্বমুখী থাকবেই। সেখানে মনের চেয়ে দেহের প্রশ্নই বেশি। আর তারপরে দুটো মানুষের স্বার্থসংঘাত, সন্তান, একত্র বসবাস সবটা মিলিয়ে এমন একটা আলাদা জগৎ তৈরি হয়ে যায় যে, সেটা প্রায় অবিচ্ছেদ্য হয়ে ওঠে। বলো ঠিক কিনা?

আমি মনে মনে অতীতের সেই শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবাটির সঙ্গে এই মহিলাটিকে মেলাবার চেষ্টা করতে করতে বলি, একদিক থেকে সে তো ঠিকই।

তিনি চশমার কাচ মুছলেন। চা শেষ করলেন। বসবার ভঙ্গি বদলে নিয়ে বললেন, আসলে ভবিতব্য কেউ ঠেকাতে পারে না। মানুষের সাধ্য আর ভগবানের সাধ্য তো এক নয়? তিনি যা করেন তা হতেই হয়। সেদিন ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হবারই দিন ছিলো, নইলে আমি যেখানে নামলাম, সেও কেন সেখানে নামলো?

আমি বললাম, ওটা বোধ হয় উনি ইচ্ছে করেই নামলেন।

না। মোটেও না। মহিলা মাথা ঝাঁকালেন, সে আমার আগেই নেমেছিলো, ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু খুব আশ্চর্য যে, সে যে গলিতে ঢুকলো, আমারও সেই গলিতেই কাজ ছিলো। একটু দূরে গিয়ে একটা একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এই প্রথম সে আমাকে লক্ষ্য করলো। আমার রকমসকম দেখে জিজ্ঞেস করলো, কোনো বাড়ি খুঁজছেন নাকি?

অপ্রস্তুতভাবে বললাম, হ্যাঁ।

এখানকার নম্বর বড় গোলমেলে। কার বাড়ি বলুন তো?

চোদ্দোর-এর-মহিমারঞ্জন সেন।

ও, মহিমবাবু। কিন্তু ওঁরা তো কেউ নেই এখানে, ওঁর মৃত্যুর পরে ওঁর পরিবার তাঁর পিত্রালয়ে চলে গেছেন।

মহিমবাবু মারা গেছেন? আমি একেবারে থ। দিন কয়েক আগে এই নাম-ঠিকানা আমার এক আত্মীয়া আমাকে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, মস্ত চাকরি করেন, নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে যদি তেমন ধরে পড়তে পারো, বেশ মোটারকম ইনসিওর করবেন দেখো। ছোটো ছেলেটার অসুখ ছিলো, আসতে পারিনি, এর মধ্যেই মরে গেল লোকটা। আমি একেবারে শোকের পাথারে ভেসে গেলাম।

ছেলেটি বললো, আপনার আত্মীয় ছিলেন?

বললাম, না।

বন্ধু?

তখন বললাম, দেখুন, আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি করি, উনি করবেন এরকম একটা খবর পেয়ে এসেছিলাম, এই মৃত্যু আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

হার্টস্ট্রোকে মারা গেছেন। ছেলেটি বেশ ভারভারিক্কি। কোন কোম্পানিতে আছেন আপনি?

জেনারেল।

ও, জেনারেল, আমার এক আত্মীয় আছেন সেখানে, আমার কাছে এসেছিলেন একদিন।

আপনি করবেন? আমি আশান্বিত চোখে তাকালাম মুখের দিকে। আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আবার আমি চোখ সরিয়ে নিলাম। আবার বুকটা কাঁপলো।

ছেলেটি তার স্বভাবসুলভ গম্ভীর ভঙ্গিতে জোর দিয়ে বলল, করবো।

আমি ঢোঁক গিলে ফেললাম, তা হলে কি আমি একদিন আসবো? আপনার ঠিকানাটা—

এই তো আমার বাড়ি, আপনি ইচ্ছে করলে এখনো আসতে পারেন।

দেখলাম তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলছিলাম আমরা। চট করে একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত ঘরে ঢুকতে প্রথমে আমার দ্বিধা হয়েছিলো। অল্প বয়সের বিধবা, কতো পুরুষের কতো জঘন্য লোভের হাত থেকে রক্ষা পেতে পেতে এই বয়সে এসে পৌঁছেছি। কাজেই ভয়টা অমূলক ছিলো না। সে কড়া নাড়লো না, তালা খুললো, সহজভাবে বললো, আসুন।

আমি সম্মোহিতভাবে তাকে অনুসরণ করলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি ঘর, ঘরটি বড়ো, এক কোণে বসবার ব্যবস্থা, অন্য কোণে একটি খাটে ঢাকা বিছানা। মাথার কাছে লেখাপড়ার টেবিল।

বসুন, বলে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এলো তক্ষুনি—বললো, চা খান একটু।

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, না, না।

সে বললো, ব্যস্ত হবেন না, চা-টা আমিই খাবো, আপনি সঙ্গ দিলে খুশি হবো, এই পর্যন্ত। সিগারেট খেতে পারি?

নিশ্চয়ই।

এখন বলুন, আপনার নিয়মকাকুন, আমি কিন্তু খুব বেশি করতে পারবো না।

কতো? খুশিতে আমি থর থর করছিলাম।

ধরুন হাজার দশেক। পনেরো পর্যন্তও হতে পারে।

আমি চুনোপুটি, সারাদিন ঘুরে ঘুবে সাধ্যসাধনা করে একটা লোককে পাঁচ হাজারে বাগাতেই নাকের জল চোখের জলে এক হয়ে ঘরে ফিরি, আর লোকটা এক ডাকে পনেরোও হতে পারে বলে দিল! থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই সামলে নিয়ে নিস্পৃহ মুখে দালালির মুখস্থ বিদ্যেটা ঝেড়ে দিলাম।

চুপ করে শুনে নিয়ে বলল, কবে আসবেন বলুন, আমি প্রস্তুত থাকবো।

আমি ভাবলাম শুভস্য শীঘ্রম্। বিচলিত গলায় বললাম, কাল আসবো?

কখন?

যখন বাড়ি থাকবেন।

তবে এই সময়েই আসুন।

গেলাম। শুধু সেদিনই নয়, সমস্ত কাজটা নিষ্পত্তি করতে বেশ কয়েকদিনই আসা-যাওয়া করতে হলো। আর সেই আসা-যাওয়াই কাল হলো আমার। কখন যেন বুঝে ফেললাম আর উপায় নেই দেখা না করে।

•

আমি বিধবা, বয়স্ক, তিন ছেলেমেয়ের মা সবই বলেছিলাম তাকে, তাতে তার কিছুই উনিশ-বিশ হয়নি। আর সত্যি বলতে আমি তো দেখতেও ভালো না? এ-কথাও বলেছিলাম। শুনে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ হসলো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, তাই নাকি?

আমি বললাম, ঠাট্টার কথা নয়।

সে বললো, আমিই কি ঠাট্টা করেছি? আমি শুধু বলছিলাম যে, আমার যা পাবার তা আমি পেয়েছি, এখন তোমার বিবেচনা।

বিবেচনা মানে কী জানো? বিবাহ। আসলে সেই সময়ে বড়ো অশান্তিতে ছিলাম। বাড়িতে সব সময়ে ঝগড়াঝাঁটি চলছিলো। ভাইয়ে-ভাইয়ে বনছিলো না, বউয়ে বউয়ে নিত্য কলহ। আর আমি তো একটা জগদ্দল পাথর সকলের কাছে। যদিও সেই সময়ে আমার উপার্জন বেশ ভালোর দিকে যাচ্ছিলো, আমি ভালো টাকাই দিচ্ছিলাম, তবু আমার ছেলেমেয়েকে ওরা দেখতে পারতো না, আপদ-বালাই ছাড়া ভাবতো না. দুঃখের কথা কী বলবো. নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া সব কিছুতেই এতো তফাৎ করতো যে, প্রায়ই মনে হতো বস্তিতে গিয়ে থাকি, তবু এদের সঙ্গে নয়। আর মাকে তো একটা মনুষ্য হিসেবেই জ্ঞান করতো না।

এই সব শুনেছিলো বলেই বিয়ের প্রস্তাবটা দিয়েছিলো। বলেছিলো, ঐ নোংরার মধ্যে থেকো না, কষ্টের মধ্যে থেকো না, আমার কাছে, তোমার নিজের সংসারে চলে এসো, ছেলেমেয়ের সব দায়দায়িত্ব আমার। বলো তো প্রতিজ্ঞা করতে পারি যে, তাদের নিয়ে কখনোই তোমার কাছে আমি কোন বেদনার কারণ হবো না। বরং বিনা চিন্তায় বিনা খরচে তিনটি বড়ো বড়ো সন্তানের পিতা হবো ভাবতে আমার ভালোই লাগছে। আমি ছেলেপুলে ভালোবাসি।

ততোদিনে আমার বয়েস আরো দু' বছর এগিয়ে এসেছে। আমি বললাম, কেন তুমি এতোদিন বিয়ে করোনি? তবে তো এই বিপদ তোমার হতো না।

সিগারেটে ধোঁয়ার রিং তুলতে তুলতে বললো, যখন দেখা হয়েছিলো তেত্রিশ পূর্ণ করেছিলাম, খুব কি বেশি দেরি করেছি? তাছাড়া যাকে চাই তাকে পাবো তবে তো বিয়ে?

আমি কেঁদে ফেললাম, শেষে কি এই তোমার পাওয়া? মাথায় হাত রেখে বলল, পরিপূর্ণ পাওয়া।

একটা কলেজে পড়াতো সে, মা-বাবা ছিলো না, কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া কিছু অর্থবিত্ত ছিলো। আর ছিলো একটি পঙ্গু বোন। ছোটবেলায় পোলিও হয়ে তার পা দুটি অকেজো হয়ে যায়। সারাদিন শুয়ে থাকতে হতো তাকে। এই দাদাই লেখাপড়া শিখিয়ে, গান শিখিয়ে এক ধরনের সহনীয় করে রেখেছিলো তাঁর জীবন। যে বাড়িটিতে থাকতো, নিজেদেরই বাড়ি। পিছনের অংশটায় এক গরিব আত্মীয় প্রায় বিনাভাড়ায় ছিলো। সামনের দু'খানা ঘরের একখানাতে সে নিজে অন্যটিতে তার বোন।

এই প্রেম আমি অতি সাবধানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। নিজেকে সব সময়েই কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছিলাম, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবের পরে আমার মনে হলো, লাথিঝাঁটা খেয়ে পড়ে আছি কিসের আশায়? কী আমি আর পাবো এই সমাজ থেকে। ভাইয়েরাই বা কী দেবে যার বিনিময়ে এই সম্মান আমি প্রত্যাখ্যান করবো। কিন্তু ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে বুক হিম হয়ে যায়। ততদিনে তারা তো বেশ বড়ো হয়ে উঠেছে। পাঁচ বছরের ছেলে বারোতে পা দিয়েছে, তিন বছরের শিশু দশ বছরের বালিকা, ছোটটি পর্যন্ত সাত।

এরই মধ্যে কী করে যেন উড়ে-উড়ে এই খবরটা পৌঁছে গেল আত্মীয়-পরিজনদের কানে। দাদা-বউদিরাও শুনলেন, মার কানেও গেল। দপ করে জ্বলে উঠলো আগুন, আর সেই আগুন আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিল। দুটি বালক-বালিকাই জ্বালানো সবচেয়ে বেশি। রাত্রিবেলা একা হয়ে চোখ বড়ো-বড়ো করে বললো, মা, মামীরা বলেছে তুমি নাকি আমাদের ফেলে রেখে একটা লোকের সঙ্গে কোথায় চলে যাবে? একথা শুনে আমার আপাদমস্তক থরথরিয়ে কেঁপে উঠলো। বড়ো-বড়ো নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললাম, মামীরা বলেছে?

ছোট ছেলেটা শুয়েছিলো, ফট করে উঠে বসলো, কচি-কচি ঘুমগলায় বললো, বড় মামী বলেছে তার নাম নাগর।

কী বলবো তোমাকে, সারারাত আমি আর ঘুমুলাম না। পরের দিন ভোর না হতেই উঠেই বেরিয়ে পড়লাম, ফিরলাম একেবারে বাড়ি ঠিক করে। বাড়ি মানে টালিগঞ্জ বস্তিপাড়ায় একটা ঘর, ভাড়া পনেরো টাকা। মাকে বললাম, মা, আমি আর দাদাদের সঙ্গে থাকবো না, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে?

মা কী খুঁজছিলেন, ভুরু কুঁচকে বললেন, কেন, এখানে থাকলে বুঝি ইচ্ছে মতো জীবনযাপন করা যায় না?

মার কাছে এই জবাব আমি আশা করিনি। চুপ করে থেকে বললাম, এখানে যে কী সুখে আছি তা তো তুমি জানো। কিন্তু নিজের জীবন যে-ভাবেই কাটুক, যাদের জন্য উদয়াস্ত রোজগারের ধান্দায় আমার জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে, যাদের মানুষ করে তোলবার আশায় আমি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি, তাদের জন্য সরে যাওয়া দরকার।

এবার মা যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন। একটা পঞ্জিকা।

বৃদ্ধ চোখে মনোযোগ সহকারে সেই পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় একাদশীর তারিখটা দেখতে-দেখতে, নিষ্ঠুর হয়ে বললেন, তাদের জন্যে ঘোরো, না কিসের জন্য ঘোরো কে জানে। মেয়েমানুষের চরিত্রই হলো আসল, সেই চরিত্রই যার খোয়া গেছে তার আর ছেলেপুলের কথা ভাববার দরকার কী?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরে চলে এলাম। গুছিয়ে নিলাম জিনিসপত্র, খেলাম না, স্নান করলাম না, চলে এলাম ট্যাক্সি ডেকে।

মা ভাইয়েদের সঙ্গেও ওই শেষ, রমেনের সঙ্গেও ওই শেষ।

কার সঙ্গে? আমি কুঁচকোনো চোখে তাকালাম।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, ওঁর নাম রমেন।

সে আমি বুঝেছি, কিন্তু ওর সঙ্গেও শেষ কেন?

তা ছাড়া উপায় কী বলো? আমার ছেলেমেয়েদের জীবন নিশ্চয়ই আমার জীবনের চেয়ে অনেক বেশিই মূল্যবান। তাদের মনে এক ফোঁটা কালিও আমি ঢালতে পারি না।

কিন্তু উনি তো ওদের সব ভারই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

সে চাইতে পারে, কিন্তু ওরা যে ওকে কী ভাবে গ্রহণ করবে তা তো আমি জানি না! তাই অনন্যচিত্ত হয়ে ওদের মানুষ করার চেষ্টায় নিজেকে উৎসর্গ করে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে ফেললাম। আমাব ঠিকানা আর কে জানে? কে আমাকে খুঁজে পাবে এত বড়ো একটা শহরে?

পরিজনদের সঙ্গে এই বিদ্রোহটা করতে পেরে আমি সুখীই হয়েছিলাম। আমার ছেলেমেয়েরাও সুখী হয়েছিল। একটা নিরাপদ স্বাধীন জীবনের স্বাদ পেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি হয়ে, ভালো মাস্টারের শিক্ষা পেয়ে ওরা বেশ যোগ্য হয়ে উঠতে লাগলো। লেখাপড়ায় কেউ খারাপ ছিল না, সময় মতো সবাই ভালোভাবে পাশটাশ করে চাকরিতেও ঢুকলো, বিয়েও করলো, আর কাজ ফুরিয়ে আমিও একা হয়ে গেলাম। এখন শুধু ঘাটের আশায় বসে থাকা!

কথা শেষ করে আমার দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা। আমি বললাম, মা ভায়েদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, সে তো উচিত কাজই করেছিলেন, ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা ছাড়া আপনার নিজেরও একটা আত্মসম্মানের দায় ছিলো। কিন্তু ওই ভদ্রলোককে কেন আপনি কষ্ট দিলেন?

মহিলা ঠোঁটে জিভ বুলোলেন, কেশে নিয়ে বললেন, তাঁকে কতোটা কষ্ট দিয়েছিলাম তাতো জানি না, নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে আমার যে খুব লেগেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই তো একজন মাত্রই ছিল যার কাছে আমি চোর-জোচ্চোরের মতো ছাপ মারা বিধবা নামের একটা দাগী আসামী ছিলাম না। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, সে সবকিছু উড়িয়ে দিয়ে বলতো, যারা তোমাকে তোমার চরিত্র নিয়ে নির্যাতন করে তাদের তুমি বুঝিয়ে দিয়ো চরিত্রের অর্থ কেবলমাত্র ঐ একটি কিছুতেই সীমাবদ্ধ নয় এবং ভালোবাসা জিনিসটা কোনো অর্থেই পাপাচারণ হতে পারে না। তুমি তো কাউকে ঠকাচ্ছো না, বঞ্চিত করছ না, এর মধ্যে হিংসা স্বার্থপরতা কুশ্রীতা মিথ্যা কিছুই নেই। শুধু নিজের দুঃখময় জীবনে একটা ছেদ টানার চেষ্টা, অপমান অসম্মানের হাত থেকে বিস্তার পাওয়া। তোমার স্বামী মারা গেছেন সেটা তো তোমার অপরাধ নয়? তোমাকে থান পরিয়ে মাথা মুড়িয়ে খেতে না দিয়ে কী লাভ হবে? উনি কি বেঁচে উঠবেন তাতে। না কি তুমি তাঁকে খুন করেছ যে এই শাস্তিবিধান? তাছাড়া যারা তোমাকে একটা বোঝা ছাড়া আর-কিছু ভাবেন না তাদের উপর নিজেকে চাপিয়েই বা রেখেছ কেন? আলাদা হয়ে যাও না, বাচ্চাদের শিক্ষার দায়িত্বও তো একটা আছে তোমার? তারা কী শিক্ষা পাচ্ছে সেখানে? কী অন্ধকারে বড়ো হচ্ছে, ভেবেছ কখনো? একটু যুক্তিবুদ্ধির দাস হও, নিজেকে মানুষ ভাবতে শেখো, মেয়েদের জলের তলায় ঠেসে ধরাই যে-সমাজের একমাত্র কর্তব্য তার সঙ্গে লড়াই করতে শেখো। আমি তো আছি, ভয় কী তোমার?

তবু ভয়। জন্মেছিলাম একটা গোঁড়া পরিবারে, আমার মেরুদণ্ড ছিল না, এতো কথা শুনেও আমি অবিশ্রান্ত আমার অপরাধবোধে এমন সচেতন হয়ে থাকতাম যে শেষ পর্যন্ত কেমন শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। আজ আমি সত্য বলছি, তোমার লেখা পড়ে আমার ভিতরকার আসল সত্তাটা এমনভাবে জাগ্রত হয়ে উঠতে চাইতো যে আমাব ক্রোধের সীমা থাকত না। রমেনের সঙ্গে অনেক সময়েই আমাব যে ধরনের কথাবার্তা হতো সেই সব কথা যেন তুমি ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিয়ে তুলে ধরতে। আমি থাকতে পারতাম না, তোমাকে ভালবাসি বলেই ছুটে এসে ওরকম ভাবে বকে যেতাম। কিন্তু এটাও খুব সত্য কথা যে সেই লেখা পড়ার জন্য আবার আমি উন্মুখ আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।

কিন্তু যাদের জন্য নিজের জীবনের সবকিছু অপচয় করে চুল পাকালাম আজ সেই সন্তানরা আমার কোথায়? আমার কথা তারা কতটুকু ভাবে? প্রয়োজন ফুরোনো মাত্রই জীর্ণ বস্ত্রের মতো মাকে ত্যাগ করে কেমন যার যার সংসার নিয়ে সে সে উধাও। আমার কি মনে হয় জানো, ওই যে ছেলেবেলায় তার মামীরা আমার বিরুদ্ধে তাদের মনে এক অবিশ্বাসের বীজ বুনে দিয়েছিল, সেই কণ্টক প্রত্যক্ষে না হোক, পরোক্ষে বিঁধেই ছিল শেষ পর্যন্ত। নইলে মানুষ হওয়া মাত্রই এমন পাখির মতো উড়ে গেল কেন? তারা তো দেখেছে কী ভাবে আমি তাদের খাইয়েছি, পরিয়েছি সুখে রাখার চেষ্টায় আপ্রাণ হয়েছি? কিছু তো পিছুটান থাকা স্বাভাবিক ছিল? না কি এই-ই জগৎ সংসারের নিয়ম? এ ভাবেই চলতে থাকে চাকা। হয়তো তাই। কিন্তু আমি তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমার জন্য অনেক বিশ্রাম খুঁজেছিলুম, পাইনি।

সারাজীবন কাজ করেছি, খেটে খুটে অনেক উঁচুতেই উঠেছিলাম শেষ পর্যন্ত তা বলে আমি তো কিছু ভোগ করিনি? সেই তো এক বেলা কোনো রকমে সেদ্ধ পোড়া দিয়ে দুটি আতপ চালের তণ্ডুল ভক্ষণ আর বারো মাসে তেরো পার্বণের তেত্রিশ রকমের উপোস, এই তো জীবন। শেষ বয়সে সব খুইয়ে আবাব একটা বাড়িও করে বসলাম। সেও তো ওদের কথা ভেবেই? এখন যখ হয়ে নিজেই আগলে বসে আছি। উঠে দাঁড়ালেন, সজল চোখে হেসে বললেন, তোমাকে খুব জ্বালালাম আজেবাজে বকে জানি দিদিকে তুমি ভালোবাসো, তাই বিরক্ত হবে না। চলি কেমন?

আমি সাগ্রহে বললাম, আর একটু বসুন। আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছিল, সেই রমেনের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হয়েছিল কিনা। ইতস্তত করে বললামও সে কথা। তিনি যেতে যেতে দাঁড়ালেন, মাথা নেড়ে বললেন, মাস কয়েক আগে একদিন দেখা হয়ে গেল পথে। তেত্রিশ বছরের যুবক এখন তেষট্টি বছর পূর্ণ করেছে, কিন্তু চোখ মুখ তেমনি সতেজ, তেমনি সুন্দর। স্বভাবও তেমনি বেপরোয়া। তাকিয়েই বললো, লতিকা না? আমিও অবশ্য পলকমাত্রেই চিনতে পেরেছিলাম। ভোলবার মতো লোক তো সে ছিল না?

তারপর?

তারপর আর কী? গতানুগতিক কুশল প্রশ্নের বিনিময়। শুনলাম, আমাকে অনেক খুঁজেছিল, আমার ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে ঘাড় ধাক্কা টাক্কাও হয়তো খেয়ে থাকবে, তারপর উত্তরবঙ্গে না কোথায় অন্য একটা চাকরি জোগাড় করে চলে যায়, শেষে অনেক ঘাটের জল খেয়ে বৃদ্ধ বয়সে আবার ফিরে এসেছে। কপালে আর বিয়ে করা ঘটেনি, বোনটি মারা গেছে বছর দুয়েক আগে, এখন আমার মতই সীমাহীন সঙ্গীহীন অন্ধকার অবসর।

তারপর?

তারপর? আমার মাথার চুল নেড়ে দিয়ে হাসলেন, তারপর আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো। সোনামণি তোমার 'সঙ্গসুধা' গল্প গল্পেই ঘটে। জীবনে নয়। ষাট বছরের মহিলা কখনোই আর পঁয়ষট্টি বছরের মানুষটাকে বিয়ে করে সুখের ঘর বাঁধতে পারে না সন্তান পরিত্যক্ত হয়ে একা ঘরে শক্ত হয়ে মরে পড়ে থাকলেও না। জানো না, মেয়েরা ঘাস মাটি? পদদলিত হয়ে বেঁচে থাকাই তাদের ধর্ম।

নবেন্দু ঘোষ

তলানি

ছেলেটা লুকোবার চেষ্টা করল।

আপিস টাইমের ভিড়, কিন্তু তবু আমার সন্ধানী সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারল না ছেলেটা। আজকাল ট্রাম-কোম্পানিতে একটু কড়াকড়ি শুরু হয়েছে, ইন্‌স্পেক্টাররাও বাধ্য হয়ে কড়া নজর রাখে। আর সেকেণ্ড ক্লাসগুলোতেই যত রাজ্যের ফাঁকিবাজ, চোর-জোচ্চোর আর বদমাশদের ভিড় হয়। ফলে আমরা যারা সেকেণ্ড ক্লাসে কন্ডাক্টরি করি তাদের পদে পদে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয়, ঝগড়া করতে হয়, মারামারিও যে মাঝে মাঝে হয়, একথা অস্বীকার করতে পারব না। তাই দম ফেলতে পারি না, ইচ্ছে করলেও দয়া দেখাবার উপায় নেই। আপনি বাঁচলে বাবার নাম—বাপ্‌, যা দিনকাল পড়েছে।

ধরলাম ছেলেটাকে, "এই ছোঁড়া, তোর টিকিট?"

ছেলেটা ভয় পেল না, হাসল। কালো, রোগা চেহারা। পাঁচ-ছ-বছর বয়েস। পরনে একটা কালো রঙের হাফপ্যান্ট, আধছেঁড়া, ময়লা চিটচিটে একটা শার্ট, গায়ের ওপর জমানো কালো ময়লা আভাস। আর উজ্জ্বল দুই চোখ, কুকুরের চোখের মতো। বন্য আর নির্ভয়। কোথায় যেন দেখেছি ছেলেটাকে!

"হাসছিস যে! টিকিট কই?"

"নেই।"

"কেন নেই?"

রাগ হল। এই ছোঁড়াগুলো ভারি জ্বালাতন করে। যুদ্ধের পর কোথা থেকে যে এদের আমদানি হচ্ছে। পিলপিল করে যেন বেড়ে চলেছে শয়তানেরা।

কানটা ধরে একটু মনের ঝাল মেটাতে চাইলাম, "বল্‌ কেন নেই?"

আমার হাতের ওপর ধাঁ করে একটা চড় মেরে এক ঝাটকায় কানটাকে মুক্ত করে নিয়ে ছেলেটা ফুঁসে উঠল, কুটিল চোখে বলল, "নেই।"

"নেই তো চড়েছিস কেন?"

"নেমে যাব।"

"নেমে যাব! বটে! তার আগে তোকে আমি পুলিসে দেব।"

যাত্রীরা ব্যাপারটা উপভোগ করছিল, কয়েকজন সহাস্যে সমর্থন করল আমাকে।

একজন বলল, "পুলিসেই দিন দাদা। এমনিভাবে ভেসে ভেসেই এরা কালে আমাদের পকেট মারবে, গলা কাটবে আর রিভলবার নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকবে।"

আর একজন ছেলেটাকে প্রশ্ন করল 'হ্যাঁরে ছোঁড়া, তোর মা-বাপ নেই?'

ছেলেটার ঠোঁট বাঁকা হয়ে উঠল, দুচোখের তারায় আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে গেল। সে জবাব দিল না। কোথায় যেন দেখেছি ছোঁড়াকে!

"আহা গোসা করছ কেন বাবা—বলো না—"

"ন্নেই", ধমকে জবাব দিল ছেলেটা। যেন কোণঠাসা কুকুরছানা দাঁত খিঁচলো।

জগুবাবুর বাজারে ট্রাম থামল।

আমি ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলাম, 'যা ভাগ—'

ছেলেটা নেমে গেল, কয়েক হাত দূরে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সা-লা—"

"অ্যাই!" ধমকে উঠলাম।

ছেলেটা নড়ল না, দুচোখ পাকিয়ে, একটা হাত তুলে শাসানির ভঙ্গিতে আবার বলল, "ইট মেরে তোর মাথা ভেঙে দেব—তোর মুখে হেগে দেব—"

হুড়মুড় করে যাত্রীরা উঠছিল। তাদের ভেতর দিয়েই চটেমটে নামবার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় ফার্স্ট ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠল। বাধ্য হয়ে থামলাম, আমিও ঘণ্টা বাজালাম। ট্রাম চলতে শুরু করল।

সমস্ত কোলাহলকে ভেদ করে ছেলেটার তীক্ষ্ণ গলা আবার ভেসে এল, "এই সালা—এই—এই সালা—"

ট্রামের পাশাপাশি কয়েক পা দৌড়ে এল সে গালাগালি করতে করতে। শেষে এক-সময়ে থেমে গেল। আর সেই সময়েই ছেলেটাকে চিনতে পারলাম।

যাত্রীরা সহানুভূতি জানিয়ে বলল "দেখেছেন মশাই দেখেছেন, শালার ছেলে যেন একেবারে বিচ্ছু—"

"হবে না, ব্যাটাদের মা-বাপের ঠিক নেই যে—"

হয়তো তাই। কিন্তু ঐ ছেলেটার মা-বাপ ছিল। আমি তাদের দেখেছি। অন্তত ওর মাকে আমি বহুদিন ধরেই চিনতাম। সে চেনা অবশ্য শুধু দেখার। কন্ডাক্টরি করতে করতে ট্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতাম ওর মাকে। সে কবেকার কথা। সেই যেবার আমি কন্ডাক্টর হয়ে কোম্পানিতে ঢুকলাম তার মাসকয়েক পর থেকেই—

এলগিন রোড পার হল ট্রামটা! তারপর থিয়েটার রোড। গতি বাড়ল ট্রামের। চাকায় চাকায় শব্দ উঠল। কর্মব্যস্ত জগতের ধ্রুপদের সঙ্গে যেন পাখোয়াজের বোল তুলে আমার ট্রাম এগোল। মাঝে মাঝে তারের গায়ে বিদ্যুতের তীব্র ঝলসানি যেন মাত্রা নির্দেশ করতে লাগল। দুলে দুলে ভিড় ঠেলে ঠেলে টিকিট দিতে দিতে গলদঘর্ম হয়েও কিন্তু ছেলেটার মায়ের কথা এড়াতে পারলাম না। সব মনে পড়তে লাগল।

বিয়াল্লিশ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেই ট্রামের চাকরিটা পেলাম। বারকয়েক ফেল করার পর অতি কষ্টে পাশ করেছিলাম। তাছাড়া সামর্থ্যও আর ছিল না, আমাকে দেখলেই দাদা-বৌদির মুখ অন্ধকার হয়ে উঠত। তাই বাবু শ্রেণীতে টিকে থাকার করুণ চেষ্টা না করে একধাপ নিচেই নেমে গেলাম।

তখন বিয়াল্লিশের গোলমাল শুরু হয়েছে। কন্ডাক্টরি করতে করতে ক্রীতদাসত্বের জ্বালায় জ্বলি আবার ভয়ে ভয়েও থাকি। দেশের উত্তেজনা মাঝে মাঝে ট্রামের ওপর হিংস্রভাবে ভেঙে পড়ে। সেই বিপ্লবের দিনেই আমার চাকরি-জীবনে হাতে-খড়ি। তারপর বিয়াল্লিশ সন গেল, তেতাল্লিশ এল। পৃথিবীময় তখন যুদ্ধ চলছে। ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তেও যুদ্ধদানবের লোহার রথ এগিয়ে এল। দেশে মৃত্যু এল দুর্ভিক্ষের রূপ নিয়ে।

কত মৃত্যু দেখলাম তখন। দেখে দেখে মন তখন নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে। নিত্যদিন বিদ্যুৎ যানের মধ্যে, ভিড়ে, গরমে, ঘামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট বেচে বেচে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তবু প্রমোশন পেলাম না। সেকেণ্ড ক্লাসেই দিন কাটতে লাগল আমার।

সেই সময়। বোধ হয় সেটা শ্রাবণ কি ভাদ্র মাস। অশ্রান্ত বর্ষণের ফলে সেদিন সন্ধ্যের পর সবে রাস্তায় জল জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জন্য ট্রামে ভিড় হয়নি। সেদিন আর দাঁড়িয়ে নেই, আমি, বসে বিড়ি ধরিয়েছি।

ট্রামটা থামল পূর্ণ থিয়েটারের সামনে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ছোট্ট একটি ছাতা মাথায় দিয়ে একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে ট্রামে উঠে একপাশে বসল।

ট্রাম চলতে লাগল। অন্ধকার আর বৃষ্টিধারায় বাইরের রাস্তাবাড়ি সব ঝাপসা। গাড়ির কাচ নামানো। বাধ্য হয়ে ভেতরের যাত্রীদের দিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েটির ওপর নজর পড়ল। মনে হল একে যেন কোথায় দেখেছি। একটু ভাবতেই চিনতে পারলাম। কদিন ধরেই মেয়েটিকে ঠিক সন্ধের পর ট্রামে দেখি। এসপ্ল্যানেডে গিয়ে নামে রোজ। আর ফেরে সেই শেষ ট্রামে।

ভালো করে তাকালাম। অল্প বয়স কিন্তু অনুপাতে যে শ্রী থাকা দরকার তা নেই। রোগা, গালভাঙা, শুকনো। একটা রঙীন সস্তা শাড়িকে যথাসম্ভব গুছিয়ে আঁটসাট করে পরেছে। গলায় একটা পুঁতির মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথায় চুল আছে খুব, সেগুলো সযত্নে মস্ত বড় খোঁপায় বাঁধা। মুখের ওপর

পাউডারের একটা ক্ষীণ আভাস, আর অল্প-দামী এসেন্সে সুরভিত ছোট্ট একটা রুমাল হাতে। এতে আকৃষ্ট হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু সব মিলিয়ে মেয়েটির যে বসার ভঙ্গি, মুখের মধ্যে যে পাকা পাকা ভাব আর চোখের মধ্যে যে আশ্চর্য একটা জ্বালাময় দীপ্তি ছিল তা আমাকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য করল। আমি তখন যুবক, বাইশের কোঠায় পা দিয়েছি, রক্ত আমার উগ্র পৌরুষের সঙ্গে লোভ-লালসার অনুচর। কিন্তু জীবন কি সেটা টের পেয়েছিলাম বলেই রাশ আমার হাতছাড়া হয় নি আর মানুষের মুখ দেখেই তার চরিত্র অনুমান করে নেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মেছিল। সেই ক্ষমতাবলেই অবিষ্কার করলাম যে ঐ মেয়েটির চোখে গভীর পাঁকের বিষাক্ত ইতিহাস।

এসপ্ল্যানেড নয়, মিউজিয়ামের কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি একবার এদিক ওদিক দেখে ছাতাটা খুলে নেমে গেল।

বুড়ো ইন্‌স্পেক্টর তারিণীদা ছিলেন তখন আমাদের ক্লাসে, মেয়েটি যেতেই বললেন, "ঐ গেল একটি"—

প্রশ্ন করলাম, "কী গেল তারিণীদা?"

তারিণীদা গাল দিলেন, "শালা ন্যাকা সাজছিস—বিদ্যেধরীদের তুই দেখিসনি?"

"বিদ্যেধরী! ওইটুকু তো মেয়ে"—ইচ্ছে করেই বোকা সাজলাম। তারিণীদাকে চটালে লাভই হয়।

"ওইটুকু!" তারিণীদা অনুকম্পার হাসি হেসেই আমাকে নস্যাৎ করার উপক্রম করলেন, "আরে এই কলিতে সবই সম্ভব। আর তোদের দেশে তো ওসব আকছার চলেছে। তোদের দেশে রাজা থেকেও রাজা নেই, তোরা দেশের লোক হয়েও মানুষ নস্ তো ওসব হবে না? তাছাড়া ইজ্জত বেচেও কিছু হয় না, তারপরেও তো ফুটপাথে মরে শালা। তোদের দেশে ওটুকু মেয়েরাও রাতের আঁধারে এই ঝড়জলের রাতে ঘুরে বেড়ায় আর তোরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস। ঘুমোবিই তো—তোরা কি মায়ের দুধ খেয়েছিস"—

বাধা দিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললাম, "মায়ের দুধ তুমি খেয়েছ তো তারিণীদা?"

"আমি!" তারিণীদা মাথা নাড়লেন, 'না। তাছাড়া আমি তো তোদের মতো ব্যাটা ছেলে নই, মেয়েছেলেও না। আমি কি তা জানি না, তা ভাববারও চেষ্টা করিনি—শুধু দিনরাত একটি কথাই মনে রেখেছি যে আমি ট্রাম কোম্পানির একটি টিকিট ইনস্পেক্টর"—

এসপ্ল্যানেড। কারো দিকে না তাকিয়েই তারিণীদা নেমে গেলেন।

তারিণীদার কথাগুলো ভাবলাম। কথার মধ্যে বুড়ো এমন একটি আবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন যে অনেকক্ষণ ধরে ট্রামের তালে তালে তা আমার মাথায় হাতুড়ির মতো আঘাত করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কথাগুলো আমাকে লজ্জা দিয়েছিল।

তারপরেও দু'তিনদিন আমি মেয়েটিকে লক্ষ্য করলাম। সেই একই রকম প্রসাধন তার। সন্ধ্যের পর সে ট্রামে ওঠে। নিঃশব্দে, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও করুণ ভঙ্গিতে এককোণে বসে থাকে। নড়ে না চড়ে না, কিন্তু তার জ্বলজ্বলে চোখের তারা দুটো কামরার একপ্রান্তে থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখে নেয়। যেন কী খোঁজে সে। কাজের ফাঁকে তার সেই সন্ধানী দৃষ্টির গতি লক্ষ্য করেছি আমি। আমাকেও রেহাই দেয়নি তা, লেহন করেছে আমার সর্বাঙ্গ।

এমনিভাবে কদিন কেটে গেল।

সেদিন বিকেলে আমার ডিউটি ছিল না। শ্যামবাজারে আমার মাসিমার ওখানে বেড়াতে গিয়ে ফিরতে প্রায় রাত দশটা হল। এসপ্ল্যানেডে এসে একটা টালীগঞ্জগামী ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এমনি সময় লক্ষ্য করছিলাম। এমনি সময়ে লক্ষ্য করলাম সেই মেয়েটাকে। ওয়েটিং-রুমের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই চোখ রাখলাম তার ওপর।

লোকজন আসছে, দাঁড়াচ্ছে, গল্প করছে। দু'একজন পায়চারি করছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে তাদের মধ্যে একজন আধাবয়সী পশ্চিমা লোক পায়চারি করতে করতে মেয়েটিকে দেখল, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মেয়েটির দু'তিন হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল লোকটা। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে কী যেন বলল।

মেয়েটা আস্তে আস্তে তার দিকে মাথা ঘোরাল। লোকটা আবার কী যেন বলল। মেয়েটা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেল কার্জন পার্কের দিকে। লোকটা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

বালিগঞ্জের একটা ট্রাম এল। একদল লোক আমার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। দৃষ্টিপথ পরিষ্কার হতেই দেখলাম যে লোকটা সেখানে নেই।

কৌতূহল মেটাবার জন্যে পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিকই ধরেছি। আধো অন্ধকারেও প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে সেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। তার পাশেই লোকটা। মাঠের নির্জনতা আর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

নতুন করে তারিণীদার কথাগুলো মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল যে-বিদ্যুতে লোহার ট্রাম মাটি কাঁপিয়ে ছোটে সেই বিদ্যুতের মতোই একটা নাম না-জানা ঢেউ আমার রক্তে দোলা দিল, বারবার আমার পেশীগুলোতে এসে মাথা খুঁড়তে লাগল। তবুও কিছু করতে পারলাম না।

কদিন পর। আবার বিকেলের দিকে ডিউটি। আবার মেয়েটাকে দেখলাম। দেখেই কেমন যেন রাগ হল। তারিণীদার কথা সত্য। কিন্তু দেশের অবস্থা তো একদিনেই বদলাতে পারব না আমরা। ততদিন কি এইভাবেই গোল্লায় যাবে সব?

টিকিট চাইতে গিয়ে কড়া নজর মেলে তাকালাম মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা একটা দু আনি দিয়ে আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, "এসপ্ল্যানেড"—তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

টিকিটটা পাঞ্চ করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কি বল তো? তোমায় যেন চিনি।"

মেয়েটা তাকাল আমার দিকে, তার চোখের তারায় শানিত দীপ্তি। কিন্তু মুখের কোথাও এতটুকু রেখাপাত হল না তার, স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনি আমাকে চেনেন না"—

"নামটা কি বলোই না।"

"না, টিকিট দিন।"

টিকিটটা দিয়ে বললাম, 'রোজই রাতের বেলা বাড়ি থেকে বেরোও তুমি—কেন?"

"আপনার তাতে দরকার কি?" মেয়েটার গলাতে প্রচণ্ড ঝাঁজ।

"তোমার মা-বাবা নেই?"

"তাতেই বা দরকার কি আপনার? যান, টিকিট বেচুন গে—"

চটে আরো কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু একজন যুবক যাত্রী হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, "অত জেরা করছেন কেন মশাই? আপনি কি দারোগা সাহেব?"

বললাম, "দেখছেন না এ কী?"

মেয়েটা সাপের মতো ফুঁসে উঠল, "শুনছেন? শুনছেন আপনারা? কি ছোটলোক!"

সেই যুবক যাত্রীটি আমায় ধমকে বলল, "খবরদার মশাই, ফের ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বললে আপনাকে এবার মার লাগাব—"

কামরার মধ্যে আরো কয়েকজন ওদের সমর্থন করল। শেষ পর্যন্ত সেই অপমান হজমই করলাম।

জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। সেই যুবকটির দিকে চকিত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেমে গেল।

কয়েক সেকেন্ড বাদে যুবকটিও নেমে গেল।

দাঁতে দাঁত ঘষলাম শুধু।

কালীঘাট থেকে ডালহাউসি রুট। তারপরেও কতদিন দেখেছি মেয়েটিকে। সেই একই ভঙ্গি। নিঃশব্দ, করুণ, কিন্তু কুটিল চাউনি। দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতাম আমি। ঘৃণায়।

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম মেয়েটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম আপদ গেছে।

তারপর তেতাল্লিশ সন শেষ হয়েছে। যুদ্ধ একইভাবে চলেছে পৃথিবীতে। দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা

তখন আর রাস্তাঘাটে বেশি নজরে পড়ে না। যারা নিম্নবিত্ত, নিতান্ত দরিদ্র ছিল তারা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তখন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে, তার থালায় অন্নের মাপ কমিয়েছে, তার নারীর লজ্জাবস্ত্রে দুঃশাসনের মতো আকর্ষণ করছে আর তাদের রক্তে এনেছে নতুন জীবনের প্রতিজ্ঞা। আমার বুকেও সে প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হয়েছে, গুমরে মরেছে, কিন্তু তবু আমি কিছু করতে পারিনি। ট্রাম চলেছে আমার—বিদ্যুতের তারে নীল আলোর স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে, লোহার লাইনে লোহার চলার গান গেয়ে, পৃথিবীর মহৎ নতুনদের অশান্ত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে। আর সেকেন্ড ক্লাসের কামরায় চামড়ার থলি থেকে টিকিট বের করে সবাইকে পাঞ্চ করে দিয়েছি আমি, পয়সা গুনে নিয়েছি, বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দিয়েছি। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি বজায় রাখার দুরন্ত প্রয়াসে কখনো দেখতেই পাইনি যে বসন্তের সন্ধ্যায় নিবে আসা দিনের রাঙা আলোর তলায় ময়দানকে কেমন দেখায়, কিংবা শরতের দুপুরে।

শরৎ নয়, শীতকাল তখন। সেদিন বেশ কনকনে উত্তুরে বাতাস বইছিল। কোম্পানির গরম কোটেও যেন শীত আটকাচ্ছে না। এলগিন রোডের কাছে ঘ্যাঁচ করে ট্রামটা থেকে পড়ল। সামনেই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। হৈ হৈ শুরু হল। ঠায় পাঁচমিনিট বাদে ট্রামের মোটর আবার গোঁ গোঁ করে উঠল। আর ঠিক সেই সময়ই একজন যুবতী এসে ট্রামে বসল।

টিকিট চাইতে গিয়ে চমকে গেলাম। এ যে সেই মেয়েটা! আরে! চেহারাটা যে বেজায় পালটে গেছে! গায়ে গতরে মাংস জমেছে, গাল ভরেছে, ঠোঁটের ওপর হালকা লিপস্টিকের রক্তাভা। পরনে ভালো একটি রঙিন তাঁতের শাড়ি, হাতে ব্যাগ, পায়ে ভালো চটি।

"টিকিট"—

"পাঁচ পয়সা"—মেয়েটার গলা আগের চেয়ে অনেক সরল হয়েছে।

"কোথায় যাবেন?"

মেয়েটা তাকাল আমার দিকে। স্পষ্ট বুঝলাম যে আমাকে চিনতে পারল, কিন্তু মুখে চোখে তা ফুটে উঠল না। মুখ ফিরিয়ে বলল, "আপনি টিকিট দিন না, অত কথার দরকার কি?"

রাগ দমন করে টিকিট দিয়ে সরে গেলাম। ব্যবসা জমিয়েছে মেয়েটা। পাপের সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠেছে। চেহারাটা পালটেছে। আশ্চর্য, দেখতে ভালোই দেখাচ্ছে। পাপচারণের ফলে দেহের ওপর একটা বিচিত্র ছাপ পড়েছে। চোখের তারায়, ঠোঁটের বঙ্কিম রেখায়, বসবার ভঙ্গিতে, তাকাবার কায়দায়—এক বিচিত্র বার্তা। সে বার্তা পড়তে বা বুঝতে কারো ভুল হয় না।

একটা স্টপ পরেই নেমে গেল মেয়েটা। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে এগিয়ে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাসে উঠে বসল। ওপরে উঠছে মেয়েটা তাই আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে গেল। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে সে আর চড়বে না।

সেকেন্ড ক্লাসের কন্ডাক্টর হওয়াটা সেদিন যেন কেমন খুব গৌরবের বলে মনে হল না।

মনের দুঃখটা বোধ হয় কেউ টের পেয়েছিল। কদিন বাদেই আমাকে ওয়েলিংটন্-গড়িহাটা রুটের ফার্স্ট ক্লাসে অস্থায়ীভাবে কাজ করতে দেওয়া হল।

নতুন রুটে ফার্স্ট ক্লাসে কাজ আরম্ভ হল। খুব মন দিয়ে কাজ শুরু করলাম নতুন উদ্যমে।

শীত গেল। বসন্ত এল।

হঠাৎ একদিন দুপুরে দেখতে পেলাম। রাতের ছায়াতে নয়, বসন্ত দুপুরের উজ্জ্বল আলোতে। কিন্তু এ রুটে এল কী করে? তাও কি জীবিকার জন্যে?

উন্নতি হয়েছে। ধাপে ধাপে অনেক ওপরে উঠেছে মেয়েটা। পরনে ক্রেপ সিল্কের রঙীন শাড়ি, গায়ের বর্ণ ঘষামাজাতে ফর্সা হয়েই উঠেছে। গায়ের গয়নাগুলো সবই সোনার। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে দুলিয়ে খুট্‌খুট্ করে সে ট্রামে উঠল, সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবান কৃষ্ণবর্ণ লোক। লোকটার চেহারা কর্কশ, রুক্ষ। ঘাড়ছাঁটা, দামী জামাকাপড়। উদ্ধত, দুর্বিনীত ভঙ্গি। কালোবাজার করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছে। দেখেই বোঝা যায়।

"টিকিট"—মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"আমি দেব," সেই লোকটা বলল।

"না আমি", মেয়েটা বলল।

লোকটা হাসল, পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টস করে বলল, "হেড না টেল?"

মেয়েটা বলল, "হেড।"

লোকটা হাত মেলে পরাজিতের মুখভঙ্গি করল, "আচ্ছা তুমিই দাও।"

মেয়েটা নির্লজ্জের মতো হেসে উঠল। একগাড়ি লোক কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই তার। হাসতে হাসতে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে অনেকগুলো নোটের ভেতর থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে আমার দিকে তাকিয়েই হাসি থামাল। সে আমায় চিনতে পারল। আমি তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সাক্ষী।

"দুটো চৌরঙ্গী", গম্ভীর হয়ে বলল সে।

আমি নোটটা ফিরিয়ে দিলাম, "চেঞ্জ নেই।"

বিরক্তমুখে ভুরু কুঁচকে মেয়েটা বলল, "আমার কাছেও নেই।"

মনের ভেতরে বহুদিন ধরে একটা আক্রোশ জমা ছিল। এই মেয়েটার জন্য একদিন যে অপমানিত হয়েছিলাম সেকথা এখনো ভুলিনি।

বললাম, "তা আমি কী করব? চেঞ্জ নিয়ে বেরোতে পারেন না?"

মেয়েটার চোখেও শত্রুতা লক্ষ্য করলাম, সে বিষভরা গলায় বলল "ছোটলোকের মতো কথা বলছ কেন?"

আস্পর্ধা দেখে জ্ঞান হারালাম, বললাম, "মুখ সামলে কথা বোলো, তোমায় আমি চিনি"—

মুহূর্তে সেই কৃষ্ণবর্ণ লোকটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল, "শাট্ আপ ইউ ব্লাডি সোয়াইন—শালা"—

আচমকা সামলাবার আগেই একটা চড় এসে লাগল গালে। সঙ্গে সঙ্গে আমি লাফালাম। যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠল। ইনস্পেক্টর ইদ্রিস মিঞা এসে পড়ল মাঝখানে। সবাই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করল, চাকরি বাঁচাবার জন্য সেই মেয়েটা আর সেই লোকটার কাছে মাপ চাইতেও হল। তবু আমার কথা বলতে পারলাম না। আর সেকথা বললেই বা কে বিশ্বাস করত? ঐশ্বর্য থাকলে অনেকের সমাজে সম্মান পাওয়া যায়। টাকা থাকলে চোর-লম্পটেরাও আজকের সমাজে সাধু এবং বিশ্বাসভাজন বলে নাম কেনে। ষাট টাকার চাকরি যার জীবন-ভোমরা তার কথায় কান দেবে কে?

ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি। ইদ্রিস মিঞা রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছিল, তবে বাঁচাবার চেষ্টাও করেছিল। অস্থায়ীভাবে আরো কিছুদিন কাজ চলবে কিন্তু হঠাৎ একদিন যে আবার সেকেন্ড ক্লাসে ফিরে যেতে হবে তা বুঝতে পারলাম।

মনের ভেতর অপমান জমা হয়ে রইল। আক্রোশের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। একদিন কি সুযোগ পাব না। তারিণীদার কথা সব বাজে। এদের জন্য দরদ দেখানোর কোনো মানে হয় না।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম এসেছে তখন। আবার দেখলাম ওদের। দুজনকেই।

একি! মেয়েটার কপালে সিঁদুর। না, ভুল দেখেছি। সিঁথিতে নেই, শুধু কপালে। গৃহস্থ-বধূ সাজার চেষ্টা করছে।

ওরা চিনল ঠিকই। কিন্তু আজ আর কোনো গণ্ডগোল হল না।

ওদের কথাবার্তা শোনার কৌতূহল হয়েছিল আমার। চেষ্টাও করেছিলাম। অতি সাধারণ কথাবার্তা। শাড়ি, সিনেমা, চাকরবাকরের গল্প, লোকটার নতুন কনট্র্যাকটের কথা।

আশ্চর্য হয়েছিলাম। মেয়েটা আজকাল তরতর করে বেশ কথা বলে।

ট্রাম থেকে ওদের নেমে যাবার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। মেয়েটার সন্তান হবে। আশ্চর্য! আর কত দেখব!

তারপর অনেকদিন দেখিনি ওদের। আবার দেখলাম পঁয়ত্রিশের গোড়ায়। তখন আমি টালিগঞ্জ থেকে ডালহাউসিতে কাজ করছি। আবার সেই সেকেন্ড ক্লাসে। দেখলাম মেয়েটার কোলে একটা

ছেলে। সঙ্গে লোকটা কিন্তু মেয়েটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। লোকটাও কথা বলছে না বেশি, গম্ভীর হয়ে আছে। ওর বেশি সেকেন্ড ক্লাস থেকে আর বোঝা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি আমি। আবার সেকেন্ড ক্লাসে ফিরে এলাম। ঐ মেয়েটাকে একদিন অপমান করতে পারলাম না। অক্ষম পুরুষের মতো এই প্রতিশোধ কামনার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাইনি।

যুদ্ধ শেষ হল। কনট্রাকটের বাজার মন্দা হয়ে এল। দেশে নিত্য নতুন বেকারের দল বাড়তে লাগল। উত্তেজনা। আন্দোলন। সে ঢেউ এসে ট্রামের গায়ে লাগে। ছেচল্লিশ সাল এল।

এরি মধ্যে দেখলাম মেয়েটাকে। দিনে বেলা। টালিগঞ্জের একটা স্টপে। এক বছরের ছেলেটাকে কোলে করে সে দাঁড়িয়ে। একবার ফার্স্ট ক্লাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর ফিরে এসে সেকেন্ড ক্লাসেই উঠল। সঙ্গে আজ লোকটি নেই।

"টিকিট"—

মেয়েটা তাকাল। আজ তার চোখে সেই আগুন দেখলাম না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বিষণ্ণ দুটি চোখে সে একবার তাকিয়েই হাতের ছোট্ট একটা মানিব্যগ থেকে পয়সা বের করতে ল্যাগল।

"ভবানীপুর একটা"—

"কেন? চৌরঙ্গী নয়?" খোঁচা দিয়ে ক্লেশতিক্তকণ্ঠে বললাম। আমার আক্রোশ এখনো যায়নি।

"না". মেয়েটা মুখ তুলল না।

"সেই লোকটা কোথায়?"

"কার কথা বলছেন?

"আপনার সঙ্গেকার"—

"আমার স্বামী", মেয়েটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকাল একবার আমার দিকে। কিন্তু চোখে তার সেই আগুন নেই কেন? কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে এখন! সোনার গয়নাও কমে গেছে দেখছি। শাড়িটাও সাধারণ তাঁতের। ব্যাপার কি?

হেসে বললাম, "স্বামী! ওহো—তা তিনি কোথায়?"

"কাজে।"

ব্যঙ্গভরা গলায় বললাম, "কাজে? না পালিয়েছে?"

মেয়েটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তাকাল আমার দিকে, তারপর বলল, "আপনি কি চান যে আমি চেঁচাব?"

মুহূর্তের জন্য বোধ হয় মেয়েটার চোখে একটা বন্যভাব ঘনিয়ে এল। দেখে মনে মনে থমকে গেলাম, কিন্তু মুখে একটা বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে অন্য কোণে চলে গেলাম। থাক, আর ঘাঁটাব না। তবে শিগগিরই অপমান করার সুযোগ পেয়ে যাব। ধাপে ধাপে যেমন উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপেই আবার নামতে শুরু করেছে।

আবার সেই করুণ বিষণ্ণ ভঙ্গিটা ফিরে এসেছে মেয়েটির।

কদিন পরেই দাঙ্গা শুরু হল। ঝড়ের মতো এল শয়তান। কলকাতার রাস্তায় রক্তের হোলি খেলে হিন্দু মুসলমান। গুলি, অ্যাসিড, বোমা। আর আতঙ্কে শহর কাঁপে, দিনরাত কাঁপে। তার মধ্যে আমাদের ধর্মঘট গেল। এমনিভাবে ছেচল্লিশ গেল, সাতচল্লিশ এল। দেশভাগের আয়োজন শুরু হল।

মনের মধ্যে আরো জ্বালা জমা হল। পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছি। বয়স প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ হল কিন্তু বিয়ে করলাম না, এমন কি কোনো মেয়েকে ভালবাসার চেষ্টা করব সে-ভরসাও হল না। কী হবে তা করে? তাতে শুধু চিত্তে তাপই বাড়ে, দুঃখুও বাড়ে। তার চেয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো যে পুরুষের জীবনে নারীর দরকার আছে। ওসব আমাদের দরকার নেই। আমাদের মতো গরীবদের ত্যাগ এবং ব্রহ্মচর্যের পাঠ নিয়ে কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপারটা বড়লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমাদের বঞ্চনাকে ওরা হিসেব করে পুষিয়ে নেবে।

এমনি যখন মনের অবস্থা হয়ে উঠেছে তখন একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম সেই মেয়েটিকে।

"টিকিট?"

"ছ পয়সা—এসপ্ল্যানেড।"

তাকালাম, "এসপ্ল্যানেড!"

ও মাথা নেড়ে বিষণ্ণভাবে হাসল।

দাঁতে দাঁত ঘষলাম। দাঁড়াও রাক্ষসী, তোমাকে অপমান করার দিন পাব।

কিন্তু কি বিশ্রী হয়ে গেছে মেয়েটা! কানের রিং দুটো ছাড়া যে আর সোনা নেই গায়ে! হাতে আবার কাঁচের চুড়ি ফিরে এসেছে, গলায় নকল মোতির মালা।

এসপ্ল্যানেডেই নেমে গেল ও।

তারপর অনেকদিন দেখেনি। অনেক দিন।

লোহার লাইনে শব্দের তরঙ্গ তুলে, আমার ট্রাম যখন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে তখন মাঝে মাঝে মেয়েটার কথা বিদ্যুৎ-চমকের মতোই মাথার মধ্যে খেলে গেছে। বোধহয় ময়দানকে দেখেই মনে পড়েছে। দিনের বেলা ময়দানের সবুজ, স্নিগ্ধ আলো-টলমল রূপটি দেখে আমার তার রাতের রূপের কথা মনে পড়েছে। নির্জন, অন্ধকার ময়দানে হয়তো ঐ মেয়েটা এখনো যায়। চৌরঙ্গীর মোড় দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে কারো গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে হয়তো কোনো কুলি কিংবা কোনো গাড়োয়ানকে বগলদাবা করে ঐ ময়দানেরই কোথাও গিয়ে মাঝে মাঝে মেয়েটা বসে—তারপর—

"টিকিট করেছেন? আপনার টিকিট? টিকিট মশাই?"

ঢং ঢং—

আমার ট্রাম চলেছে। দিন গেছে রাত গেছে। তবু আমার ট্রাম চলেছে। ট্রামের চাকার লোহার গান শুনতে শুনতে আমার প্রতিদিন শক্তি বেড়েছে। আমার লোহার রথের উদ্দাম গতি আর যৌবন চাঞ্চল্য আমাকে প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে লোহার মতো কঠিন না হলে, লৌহযানের মতো একরোখা না হলে কখনো জীবনকে বদলানো যাবে না।

দিন কেটেছে আর একটু একটু বদলেছি।

কিন্তু এর মধ্যে আর দেখিনি সেই মেয়েটাকে। মনে হয়েছে যে আমাকে এড়িয়ে সে গাড়িতে চড়ে তার নৈশ অভিযানে যায়। আমি তার উত্থান-পতনের, সেই বিয়োগান্ত কাহিনীর আংশিক সাক্ষী—আমার সামনে দাঁড়াতে যে লজ্জা করে।

কিন্তু দেখা আবার হল। উনপঞ্চাশে। তখন বৈশাখ মাসের শেষ। রাতের বেলা ফিরছি বালিগঞ্জের দিকে। এসপ্ল্যানেড ছাড়তেই কাল বৈশাখী এল। রাস্তায় লোকজন কমে গেছে, রাত নিঃশব্দ হয়ে আসছে, মনের সুখে ঝড় ধুলো উড়িয়ে হা হা করে ছুটল। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার ট্রাম ছুটল। ড্রাইভার রামবিরিজ দুবের মনেও ঝড়ের দোলা লাগল। ঝড়ের বুক চিরে ট্রাম ছুটল। কিন্তু যাদুঘরের কাছাকাছি স্টপে কে যেন হাত তুলল! থামল ট্রাম। একটি মেয়েলোক উঠল। আবার ট্রাম ছুটল।

"টিকিট"—

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "পয়সা নেই"—

খেঁকিয়ে উঠলাম, "নেই তো উঠলে কেন? নেমে যেতে হবে"—

মেয়েলোকটি আমার দিকে তাকাল। ঝড়ো হাওয়াকে চিরে আমার ট্রাম তখন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে চলেছে, হাওয়া এসে চোখের ওপর চিলের মতো ঝাপটা মারছে, তবু চিনলাম। সেই মেয়েটি।

"তুমি!"

মেয়েটে বলল, "রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরতেই হবে"—

অনেকদিনের আক্রোশ জমা ছিল, বললাম, "একদিন চড় মেরেছিল তোমার সেই দুদিনের নাগর মনে আছে?"

সে বলল, "মাপ করুন দাদা"।

দাদা! বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পড়ল একটা।

মেয়েটি বলে চলল, "আজ কিছুই পাইনি—ওদিকে ছেলেটার জ্বর, একা পড়ে আছে বাড়িতে"—

খুক্ খুক্ করে কাশতে শুরু করল সে। তাকালাম। কালো কুচ্ছিত হয়ে গেছে তার চেহারা, বুড়িয়ে গেছে। ছ বছর আগেকার সেই গালভাঙা শীর্ণ চেহারা আবার ফিরে এসেছে কিন্তু সেদিন অল্প বয়সের ছাড়পত্র ছিল দেহে, আজ কোনো সম্বলই নেই। সাধারণ মোটা একটা মিলের শাড়ি পরনে। নিরাভরণ।

"দাদা"—

বললাম, "বোসো।"

ঝড়ের শব্দ থেমে গেল আমার কানে। ট্রামের চাকার লৌহ-সংগীত যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। করুণ, বিষণ্ণ, সেই পুরনো ভঙ্গিতে বসে রইল মেয়েটি। লোক উঠল, নামল, টিকিট দিলাম, পয়সা নিলাম আর তারি ফাঁকে ফাঁকে সেদিন মেয়েটির জীবনের টুক্‌রো টুকরো খবর নিলাম। ছ-বছর ধরে দেখেছিই শুধু, অথচ ওর জীবনের কিছুই তো জানি না।

ওর নাম ছিল বাসনা। মা ছিল না, বাপ কোন ছুতোরের দোকানে কাজ করত। টাইফয়েডে বাপ মরল। ও এল ওর দিদির ওখানে ভবানীপুরে। ভগ্নীপতি কাজ করে কোন মোটর কোম্পানিতে। কিছুদিন বাদেই ভগ্নীপতি কলেরা হয়ে মরল। দুইবোন অন্ধকার দেখে। তিনটি বাচ্চা আছে আবার দিদির। শেষ পর্যন্ত দুইবোন রাস্তায় বেরলো। দুজন দুদিকে যেত! পাড়ার মধ্যে ওসব করলে ইজ্জত থাকবে না। এমনি ভাবে চলতে চলতে অবস্থা একটু ফিরল। হঠাৎ কালোবাজারের সওদাগরকে পাকড়াও করে বাসনা। মিথ্যা এক কাহিনীর জৌলুসে সওদাগর তাকে আনকোরা ভেবে আলাদা এক ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলল। কিন্তু সওদাগরের ফুর্তির দিকেই ঝোঁক। বাচ্চাটা হতেই রস উড়ে গেল তার। তারপর একদিন নিরুদ্দেশ হল সে। আবার সব গেল। হতভাগী ঘর বাঁধতেই চেয়েছিল, ফলে মনের ওপর আঘাত পড়ল। একের পর এক গয়না আর টাকা সব গেল। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য গেল। দিদির সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে অন্য বাসা করল সে। কিন্তু কঠিন ব্যাধি হল। তা সত্ত্বেও আবার নতুন করে বেরোতে লাগল সে, কিন্তু আগের মতো আর জমল না। দেহে ঘুন ধরেছে—

খুক্ খুক্ কাশতে লাগল মেয়েটা। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়ায়।

কালীঘাটের মোড় এল।

"যাই দাদা"—নেমে গেল সে। ধুলোর ঘূর্ণির মধ্যে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ট্রাম বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গেল।

ট্রামের চাকায় চাকায় হঠাৎ যেন শব্দ উঠল—"দাদা-দাদা-দাদা"—

তারপর আরো দুবার দেখা হয়েছিল।

প্রথমবার দিনের বেলা। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কাছে সঙ্গে তার ছেলে।

ছেলেটাকে সেই কবে দেখেছিলাম। এখন সে পাঁচ বছরের। রোগা খিটখিটে।

"চড়ব দাদা—জ্বর হয়েছে, আর হাঁটতে পারছি না।"

"ওঠ।"

উঠে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। সংকোচে।

বললাম, "বসো।"

বসল। সেই করুণ, বিষণ্ণ ভঙ্গিতে। চোখের দৃষ্টিতে আর সেই ধার নেই। ঘোলাটে, মৃত দৃষ্টি। খুক্ খুক্ করে কেশে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটা নাকিসুরে কাঁদতে লাগল সারা রাস্তা, "খিদে পেয়েছে—কখন খেতে দিবি? বল্ না, কখন খেতে দিবি? এই রাক্কুসী"—

সমানে শুনে গেল মেয়েটা। নাড়ল না, কথাটি বলল না।

শেষ দেখা 'পূর্ণ'র সামনে। ফুটপাতে ছেলেটাকে নিয়ে বসে আছে। ছেলেটা ভিক্ষে চাইছিল, "ও, বাবু—খিদেয় মরে যাচ্ছি, বাবু ও বাবু—"

কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখেছিলাম। তারপর ট্রাম ছেড়ে দিয়েছিল। ফিরেও তাকাইনি। তাকালেই 'দাদা', ডাকটা মনে পড়ে। তার চেয়ে না তাকানোই ভালো।

এরপর মেয়েটাকে আর দেখিনি। কিন্তু ছেলেটাকে দেখেছিলাম মাস ছয় পরে। পঞ্চাশ সালে।

একজন কনস্টেবল ছেলেটাকে নিয়ে কালীঘাটের মোড়ে আমার ট্রামে উঠল।

যাত্রীরা প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার? চুরি করেছে?

কনস্টেবল মাথা ঝাঁকাল, "উহুঁ, ওর মা মরেছে—"

"কেন? কি হয়েছিল?"

"ব্যামো। ঘরে মরে পড়ে ছিল—এই ছোঁড়া কাঁদছিল—যাচ্ছি থানায় নিয়ে রিপোর্ট দিতে।"

"তা এখন কি হবে ছেলেটার?"

"ওর কে এক মাসি আছে—সেখানে যাবে। সরকার এখন দেশশুদ্ধ অনাথের বোঝা বইবে নাকি?"

"তাতো নিশ্চয়ই সিপাইদাদা—তা কি করে বইবে?"

ছয়মাস আগে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। আজ কিন্তু ছোঁড়া কাঁদল না।

কিন্তু আশ্চর্য। মেয়েটা মারা গেল! সেই কবে থেকে দেখে আসছিলাম। কত চেনা হয়ে গিয়েছিল?

ট্রামের চাকায় যেন প্রতিধ্বনি উঠল, "দাদা—দাদা—দাদা—"

তবু কিছু করতে পারলাম না, ছেলেটার দিক থেকে মুখটা শুধু ফিরিয়েই নিলাম।

সেই ছেলেটা—একটু আগে জগুবাবুর বাজারে যে আমাকে গাল দিয়ে নেমে গেল, কিন্তু ও থাকে কোথায়? মাসির ওখানে? নিশ্চয়ই না, ও থাকে রাস্তায়, ফুটপাথে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির বারান্দায়। স্বাধীন কুকুর কিংবা ইঁদুরের মত।

ট্রামটা থামল। আমার ট্রাম এখন ডালহাউসি ছুঁয়ে আবার বালিগঞ্জে ফিরছে। ভিড় কম।

যাদুঘরের স্পট থেকে একটি মেয়ে উঠল সেকেন্ড ক্লাশে।

"টিকিট।"

মেয়েটি তাকাল, বলল, "কালীঘাট।"

টিকিট দেবার সময় চিনতে পারলাম। সেই একই চোখের চাউনি।

বাসনারই মতো আর একটি মেয়ে। বাসনা মরলেও ওদের দল বাড়ছে। সবংশে।

মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। ট্রামের চাকার লোহার গান শুনতে শুনতে দাঁতে দাঁত ঘষলাম। আমার প্রতি নখের ডগা দিয়ে যেন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে চাইল। কিন্তু তবু কিছুই করতে পারলাম না শুধু একজন যাত্রীর কাছে হঠাৎ অকারণে চেঁচিয়ে উঠলাম, "টিকিট—টিকিট মশাই?"

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ছাত্রী

মীরার বাবা গণেশ দত্ত ছিলেন আমাদের জেলা স্কুলের মাস্টার। আমরা এক পাড়াতেই থাকতাম, আমার বাবা ছিলেন জজ কোর্টের উকিল। ওখানে ছোট খাট একটু বাড়িও আমাদের ছিল। কিন্তু গণেশবাবুরা ছিলেন ভাড়াটে বাসায়। অনেকগুলি ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টেই ছিলেন। মীরা তাঁর মেজো মেয়ে। শামলা রঙ, দোহারা লম্বাটে গড়ন; মুখ চোখের শ্রী-ছাঁদ ভালোই। দেখলে পলক পড়ে না এমন অবশ্য নয়, আবার দেখে চোখ ফিরিয়ে নেওয়ারও দরকার হয় না। রাস্তার এপারে ওপারে সামনাসামনি বাড়ি হওয়ায় জানালা দিয়ে ওদের ঘর সংসারের অনেক দৃশ্যই আমাদের চোখে পড়ত। কখনো দেখতাম রুগ্না মায়ের বিছানা ঝেড়ে দিচ্ছে মীরা, কখনো বাপের পিঠে তেল মালিস করছে, ঠাঁই করে খেতে দিচ্ছে ভাইদের, কোনদিন বা ছোট বোনকে কোলে নিয়ে পিঠ চাপড়ে তার কান্না থামাচ্ছে—চোখে পড়ত। আবার এই সব কাজের এক ফাঁকে ওকে বইপত্র নিয়ে স্কুলে বেরোতেও দেখতাম। আর সে বইও দু' একখানা বই নয়, একরাশ বই হাতে ও ঘাড় গুঁজে পথ হাঁটত। পাড়ার বকাটে দু' একটা ছোকরা ঠাট্টা করে বলত—'ইস্, পল্লবিনী লতা একেবারে নুয়ে পড়েছে।'

মীরা কারো দিকে তাকাত না, পাড়ার কোন ছেলে আলাপ করতে চাইলে এড়িয়ে যেত। এইজন্যে অনেকেরই রাগ ছিল ওর উপর।

আমার মা কিন্তু বলতেন, 'মেয়েটির গুণ আছে রে। সংসারে এত কাজকর্ম করেও ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। মেয়েটি পড়াশুনোয় ভালো'। পড়াশুনোয় আমিও নেহাৎ খারাপ ছিলাম না। তবু মার মুখে অন্য একটি মেয়ের বিদ্যার প্রশংসা শুনে কেমন যেন আমার একটু হিংসে হত। হেসে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'ক'জনের মধ্যে সেকেণ্ড হয় মা?'

মা বলতেন, 'যতজনই হোক্ দু'জনের চেয়ে বেশি ছাত্রী নিশ্চয়ই ওদের ক্লাসে আছে। কেন, ওর উপর তোর এত রাগ কিসের রে?' মা হাসতেন।

একটু রাগ ছিল বই কি। মীরা আমার সমবয়সী হয়েও আমার চেয়ে দু'ক্লাস নীচে পড়ে। সেই হিসেবে ওর একটু শ্রদ্ধামনোযোগ আকর্ষণের দাবি কি আমার নেই? মীরা আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যে আসে যায় তা আমি জানি। মার কাছ থেকে গোপনে গোপনে পাঁচ দশ টাকা ধার নেয়, আবার গোপনেই তা শোধ দিয়ে যায়। মা ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নেই বাড়িতে।

আমি একদিন বললাম, 'মীরা বড় অহংকারী, না মা?'

মা হেসে বললেন, 'নারে, মেয়েটি বড় লাজুক, আজকালকার মেয়েদের মত বেটাছেলের সঙ্গে ও বেশি মেলামেশা করতে জানে না।'

কিন্তু এই মীরাই ম্যাট্রিকুলেশনে সেবার ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে শহরের সবাইকে অবাক করে দিল। পাড়ার অনেকেই বলাবলি করতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, মেয়ে বটে একখানা গণেশ দত্তের। এ মেয়ে যে পরীক্ষায় ভাল করবে তা তাঁরা সবাই জানতেন।'

রেজাল্ট বেরোবার পর গণেশবাবু মেয়েকে সঙ্গে করে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমার বাবা-মাকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, 'ও'দের প্রণাম কর।'

আমি পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। মীরা ওঁদের প্রণাম সেরে উঠতেই গণেশবাবু আমাকেও ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু সেই উপরি পাওনা প্রণামটি থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন মা। এক সঙ্গে মীরা আর তার বাবাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ও কি? পরিমল মীরার চেয়ে ছ' মাসের ছোট। ওকে আবার প্রণাম কিসের। ছি ছি।'

ধমক খেয়ে মীরা একটু পিছিয়ে গেল।

গণেশবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'ও, পরিমল বুঝি বয়সে ছোট। কিন্তু তাতে কি হল বউঠান, পরিমল বামুনের ছেলে, মীরার চেয়ে কত বেশি উপরে পড়ে, কত বেশি বিদ্যেবুদ্ধি রাখে। সংসারে বয়সটাই তো আর সব নয়?'

সেইদিন মীরার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ও বলল, আমার ইন্টারমিডিয়েটের সব বই আর নোট-ফোটগুলি ওর চাই। আমিও তাই চাইছিলাম। চাইছিলাম, ও আমার কাছ থেকে বইপত্র সব চেয়ে নিক।

মীরা আমাদের কলেজে ভর্তি হল। তার বছর দুই আগে থেকে কলেজে কো-এডুকেশন চলছে। আমার ইচ্ছে ছিল বি এ-টা কলকাতায় এসেই পড়ি। কিন্তু বাবা মা ছাড়ছেন না। প্রফেসাররাও আমাকে আটকে রাখলেন। তাই বছর দুই মীরার সঙ্গে একই কলেজে পড়বার আমার সুযোগ হয়েছিল। তখন থেকেই মেধাবিনী ছাত্রী হিসেবে ওর নাম ছড়াতে শুরু হয়েছে। শুধু ছাত্রদের কমনরুমেই নয়, প্রফেসারদের ঘরেও ওকে নিয়ে আলোচনা হয়। কলেজ ম্যাগাজিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ওর প্রবন্ধ বেরোয়। সে রচনার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে অধ্যাপক মহল মুখর হয়ে ওঠেন। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শুধু একটা মাত্র অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে শোনা যায়। মীরা বড় অমিশুক। বই আর পড়াশুনো ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই। ইউনিয়নের ইলেকশনে ওকে পাওয়া যায় না, কলেজের উৎসব-অনুষ্ঠানে ও গরহাজির থাকে। মীরা একেবারে গতানুগতিক অর্থে ভাল ছাত্রী।

আমি একদিন ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাল আমাদের থিয়েটারে এলে না কেন। সবাই যে তোমার নিন্দে করছে। বলছে দাম্ভিক আর অহংকারী।'

মীরার মুখে একটু বিষণ্ণতার ছাপ পড়ল, আস্তে আস্তে বলল, 'কি করব বল। মায়ের মাথার অসুখ কাল যে খুব বেড়ে গিয়েছিল। আমি ছাড়া মাকে যে কেউ সামলাতে পারে না।'

নানা রকম অসুখে ভুগে ভুগে মীরার মার মাথায় ছিট হয়েছিল। মাঝে মাঝে তিনি একেবারে উদ্দাম হয়ে উঠতেন। কিন্তু এ কথাটা মীরাদের বাড়ির কেউ প্রকাশ করতে চাইত না। মীরা সেদিনই আমাকে প্রথম সব খুলে বলল।

আই এ'তেও কয়েকটি লেটার আর স্কলারশিপ নিয়ে মীরা থার্ড ইয়ারে উঠল। আর আমি ফিলসফিতে একটি সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স জুটিয়ে কলকাতায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম।

ছুটি-ছাটায় যেতাম আমাদের শহরে। আর মীরার সুখ্যাতির কথা শুনতাম। সেবার এসে শুনলাম আমাদের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে মীরার বেশ একটু আলাপ হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শেলীর তুলনা করে মীরা কলেজ-ম্যাগাজিনে ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লিখেছিল। তাই নিয়ে দু-একজন প্রফেসারের আলোচনা শুনে প্রিন্সিপ্যাল সীতাকান্ত ঘোষাল সেটা দেখতে চান। প্রবন্ধটি পড়বার পর মীরাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি তোমার নিজের লেখা! কোত্থেকে টুকেছো তাই বল।'

মীরা নতমুখে জবাব দিয়েছিল, 'আপনার লেকচার নোটের সাহায্য নিয়ে ওটা আমি নিজেই লিখেছি।'

প্রিন্সিপ্যাল স্থিরদৃষ্টিতে মীরার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা যাও। ক্লাসে যাও।'

এর পর মীরাকে আর একদিন ডেকে প্রিন্সিপ্যাল হঠাৎ ওকে ভাল করে পড়াশুনো করে ইংরেজীতে একটি ভাল অনার্স নিয়ে বেরবার জন্যে উৎসাহ আর উপদেশ দিয়েছেন।

খবরটা আমরা বেশ উপভোগ করলাম। কারণ অধ্যয়নে-অধ্যাপনায় সতীকান্ত ঘোষালের যে কিছুমাত্র মনোযোগ আছে তা আমরা ইদানীং ভুলেই গিয়েছিলাম। বছর দশেক ধরে বিষয়, আশয়, প্রভাব, প্রতিপত্তির দিকে তাঁর এমন নজর পড়েছিল যে, কলেজের দিকে মন দেওয়ার তাঁর অবসরও ছিল না, উৎসাহও ছিল না। সতীকান্ত না আছেন হেন জায়গা নেই। জেলা বোর্ডের পলিটিকসে তিনি রয়েছেন, বেনামীতে কয়েকটি রাস্তা তৈরির কনট্রাকট্ নেওয়ার কাজের মধ্যেও তিনি আছেন। শহরের 'বাণী প্রেস'টি কিনে তিনি তাঁর স্বত্বাধিকারী হয়েছেন। খুব লাভ হচ্ছে প্রেসের ব্যবসায়। জুনিয়র প্রফেসর, এমন কি ছাত্রদের নিয়ে নোট লিখিয়ে তিনি নিজের নামে তা বাজারে চালাচ্ছেন, তাতেও বেশ পয়সা আসছে। কলকাতার দু-তিনটি নামজাদা প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। শোনা যায়, সে সব কারবারে অংশও আছে তাঁর। এ ছাড়া ডুয়ার্সে চা-বাগানের শেয়ার আছে। মাঠে খামার জমির পরিমাণ তাঁর বেড়ে চলেছে। জলায় মাছের ব্যবসায়ে তাঁর টাকা খাটছে।

এই তো গেল সম্পত্তির কথা। এবার প্রতিপত্তির কথাটা বলি। শহরে প্রতিপত্তিরও তাঁর তুলনা নেই। থানা পুলিস থেকে শুরু করে জজ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম। তিনি সবাইকে চেনেন। তাঁর বিচক্ষণ বুদ্ধিমত্তাও কারো চিনতে বাকি নেই। লোকের উপকার আর অপকারের দু রকম ক্ষমতাই তিনি রাখেন। তাই শহরসুদ্ধ লোকের তাঁর সম্বন্ধে এক চোখে শ্রদ্ধা আর এক চোখে ভয়।

শহরের অভিজাত পাড়া কলেজ রোডে তাঁর বড় দোতলা বসতবাড়ি। এছাড়া আরো খান দুই বাড়ি আছে। সেগুলি তিনি ভাড়া দিয়েছেন। ছেলেমেয়ে দুটি। দুজনেরই বিয়ে হয়েছে। ছেলে শভেন্দু শহরের সবচেয়ে পসারওয়ালা উকিল মৃত্যুঞ্জয় মুখুজ্যের মেয়েকে বিয়ে করেছে। সে নিজেও জজকোর্টে ওকালতি করছে। মেয়ে শুভ্রাকে বিয়ে দিয়েছেন ধনী জমিদারের ঘরে। জামাই নীলাম্বর এম বি পাশ করেছে। ডাক্তারিতে তেমন সুবিধে না হলেও তার ফার্মেসি বেশ জেঁকে উঠেছে। ওষুধ বিক্রি করে খুবই লাভ করছে নীলাম্বর চাটুজ্যে।

আর এই সব ধনসম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তির কেন্দ্রে আছেন সতীকান্তর স্ত্রী হিরণপ্রভা। শোনা যায়, তিনিই স্বামীর এই বৈষয়িক উন্নতির মূলে। তাঁর বাবা ছিলেন গঞ্জের তেল-লবণের কারবারী। হিরণপ্রভা লেখাপড়া বেশি শেখেনি। কিন্তু বিদ্যার অভাব রূপ আর বুদ্ধি দিয়ে পূরণ করেছেন। তাঁকে দেখলে তাঁর কথাবার্তা শুনলে কিছুতেই মনে করবার জো নেই তিনি কম লেখাপড়া জানেন। বাংলায় লেখা তাঁর চিঠিপত্র তাঁর বেয়াইর মুশাবিদাকে হার মানায়।

কিন্তু এমন প্রভাবশালী সতীকান্তরও যে শত্রু নেই তা নয়। তারা আড়ালে আবডালে বলাবলি করে, তাঁর সব ঐশ্বর্যই সহজ পথে আসেনি। অনেকখানি বাঁকাচোরা পথে ঘুরে এসেছে। তারা বলে সতীকান্তর আর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে না থাকাই ভাল। কারণ পড়ানর দিকে তাঁর মোটেই মন নেই। রুটিনে সপ্তাহে দু-তিনটি অনার্স ক্লাস তাঁর থাকে। তাও তিনি সমানে করেন না। প্রফেসর কুণ্ডু, কি প্রফেসর ধরের উপর বরাত দিয়ে অন্য কাজকর্মে তিনি সরে পড়েন। পড়ানর চেয়ে তাঁর অনেক বড় আর জরুরী কাজ আছে। কলেজে ইংরেজী অনার্সের ফল সবচেয়ে খারাপ হয়। ছেলেদের ভাগ্যে দু-একটা কোন বার জোটে, কোন বার জোটেও না। কিন্তু তা নিয়ে কেউ কিছু প্রকাশ্যে বলতে পারে না। বলে লাভ নেই। কারণ গভর্নিং বডি প্রিন্সিপ্যালের হাতের মুঠোয়। শোনা যায়, এই বেসরকারী কলেজের বেশির ভাগ অংশই সতীকান্ত কিনে রেখেছেন। তাই তাঁর কাজকর্মের সমালোচনা করবে কে।

পঞ্চাশের উপর বয়স হয়েছে সতীকান্তর। কানের কাছে চুলে একটু একটু পাক ধরেছে। কিন্তু এখনো বেশ শক্ত জবরদস্ত চেহারা। রীতিমত লম্বা চওড়া। পুরু ঠোঁট, নাকটাও একটু চ্যাপটা। সুপুরুষ না হলেও স্বাস্থ্যবান পুরুষ। একটু যেন স্থূল রুক্ষ্ম বৈষয়িক ধরনের মুখ। দেখলে প্রফেসার বলে সত্যিই আজকাল আর তাঁকে মনে হয় না। মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তার আকারেও বোধ হয় কিছু অদল-বদল হয়। যাই হোক, শহরে যে কয়েকজন লোক লেখাপড়া ভালবাসতেন সতীকান্তর উপর ভিতরে ভিতরে তাঁদের খুব শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁরা বলতেন, প্রিন্সিপ্যালের জীবনের ধারাই যখন বদলে গেছে ওঁর জীবিকাটাও এবার বদলে নেওয়া উচিৎ।

তাই অনার্সের ছাত্রী মীরাকে ডেকে উৎসাহ দেওয়ার কথা শুনে আমরা বিস্ময় আর কৌতুক বোধ করলাম।

তারপর মীরা একদিন প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে গিয়েও হাজির হল। কদিন ধরে তিনি কলেজে আসেন না! কেউ বলে তিনি সুস্থ, কেউ বলে তিনি জরুরী কাজে ব্যস্ত। এদিকে আর একজন ইংরেজীর প্রফেসারও ছুটিতে। অনার্স ক্লাসগুলি প্রায়ই বন্ধ যাচ্ছে। কোর্স শেষ হওয়ার কোন রকম লক্ষণ নেই, ক্লাসের আরো দুজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে মীরা গিয়ে হানা দিল প্রিন্সিপ্যালের দরজায়। কিন্তু সেখানে লাঠি হাতে গোঁফওয়ালা দুজন দারোয়ান। দু'দিন তারা হটিয়ে দিল মীরাদের। একদিন বলল বড়বাবু বাড়িতে নেই, আর একদিন বলল তাঁর বুখার হয়েছে। তৃতীয় দিনে সঙ্গীরা কেউ যেতে চাইল না। বলল, 'আমাদেরও মান সম্মান আছে। আমরা তো আর চাকরির উমেদার নই। বাংলা দেশে কলেজ আরো আছে। সেখানে গিয়ে পড়ব।'

কিন্তু মীরা একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তার জেদের ধরনটাও আলাদা। সে যখন সঙ্কল্প করেছে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করবে. তখন যেমন করে হোক সে তার প্রতিজ্ঞা রাখবেই। তাই সে তৃতীয়দিনেও বিকেল বেলায় এসে উপস্থিত হল। দারোয়ানদের অনুরোধ করে একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল চেয়ে নিয়ে লিখল, 'শ্রদ্ধাস্পদেষু—আমাদের অনার্স ক্লাসগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে। আমি সেই সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।—জনৈকা ছাত্রী।'

এরপর প্রিন্সিপ্যাল তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ খোলা একটি ঘর। সেখানে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে প্রিন্সিপ্যাল চুরুট টানছেন আর গম্ভীর ভাবে জরুরী একটা ফাইলের পাতা ওলটাচ্ছেন।

মীরা ঘরে ঢুকে ভীরু পায়ে আরও একটু এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

সতীকান্ত মেয়েটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। আমাকে এই পেনসিলে লেখা চিরকুট পাঠিয়েছ তুমি?'

মীরা সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ। আমাদের ক্লাসগুলি একেবারেই বাদ যাচ্ছে।'

সতীকান্ত বললেন, 'সে সব দেখবার জন্য লোক আছে। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল আছে, অন্য প্রফেসাররা রয়েছে। তা নিয়ে তোমার কেন এত মাথাব্যথা, আমাকে এসব নিয়ে আর কোনদিন বিরক্ত করতে এস না। সেই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকেছিলাম, যাও এবার।'

মীরা চলে আসছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল সামনের ঘরের দরজার একটি পাট খোলা। তার ফাঁক দিয়ে বই বোঝাই কয়েকটা কাঁচের আলমারি দেখা যাচ্ছে।

মীরা বলল, 'আপনার লাইব্রেরিটা একটু দেখে যাব?'

সতীকান্ত এবার অবাক হলেন। এতখানি অপমান করবার পরও যে তার লাইব্রেরি দেখতে চায় সে কি রকমের মেয়ে। একটু নরম হয়ে বললনে, 'যাও দেখে এসো।'

মীরা লাইব্রেরি ঘরে ঢুকল। ঘর ভরা আলমারি আর আলমারি ভরা বই, খোলা শেলফের মধ্যে অনেক বই আছে। সাহিত্য ইতিহাস দর্শনে শেলফগুলি ঠাসা। কিন্তু কেউ কোন একখানা বইতে যে শিগগির হাতে দিয়েছে তা মনে হয় না। দু' একখানা বই টেনে নিয়ে দেখল মীরা। ধুলোয় একেবারে ভর্তি। মীরা আঁচল দিয়ে খানকয়েক বইয়ের ধুলো মুছতে লাগল। হঠাৎ কিসের শব্দ হতেই মীরা পিছন ফিরে দেখল, 'কখন সতীকান্ত এসে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। একটু দূরে থেকে তাকে স্থির দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছেন। কিন্তু তাঁর সেই দৃষ্টিতে আগের উগ্রভাব আর নেই। বরং কিসের একটা কোমলতা এসেছে। চোখাচোখি হতেই তিনিই বললেন, 'কি করছিলে।'

মীরা চোখ নামিয়ে লজ্জিত ভাবে বলল, 'কিছু না।'

তারপর দুখানা বই ঠিক জায়গায় রেখে দিল মীরা। তৃতীয়খানা রাখতে যেন তার আর মন সরে না। সতীকান্ত তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন, 'বইটা তুমি নেবে? কি বই ওটা।'

মীরা তেমনি লজ্জিত স্বরে বলল, 'আমাদের সিলেবাসের রোমিও-জুলিয়েট। মার্জিনে মার্জিনে চমৎকার সব নোট রয়েছে। অনেকদিন আগের পেনসিলের লেখা। তবু বেশ পড়া যায়।

'কই দেখি।' সতীকান্ত এগিয়ে এসে মীরার হাত থেকে বইখানা তুলে নিয়ে দু একটা পাতা উল্টে পাল্টে দেখলেন। তারপর বইখানা ওর হাতে ফেরত দিয়ে বললেন, 'নাও।'

হঠাৎ মীরা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই বুঝি আপনার সার্টিফিকেট?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'

মীরার মনে হল, তিনি একটা নিঃশ্বাস চাপলেন।

আলমারির মাথার উপরে উঁচুতে সতীকান্তর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তার পাশে তাঁর প্রথম যৌবনের একখানি ফটো। মীরার চোখে পড়ল দুখানাতেই মাকড়সার ঝুল পড়েছে। সতীকান্তও তা লক্ষ্য করলেন।

একটু বাদে মীরা বেরিয়ে আসছিল, সতীকান্ত বললেন, 'তোমার আরো যদি বইয়ের দরকার হয় পরে এসে নিয়ো। আর এর আগে যা বলেছি তার জন্য কিছু মনে কোরো না। আমি অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে বড়ই বিব্রত আছি।'

মীরা মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

সতীকান্ত বললেন, 'ভালো করে পড়াশুনো কর, রেজাল্ট খুব ভালো হওয়া চাই।'

মীরা বলল, 'তার জন্যে আপনার সাহায্য দরকার।'

সতীকান্ত বললেন, 'হুঁ।'

এই দেখা-সাক্ষাতের বিবরণ আমি মীরার কাছ থেকে শুনেছি। ছুটিছাটায় শহরে এসে, সতীকান্তর পরিবর্তন কিছু কিছু চোখেও দেখলাম। অন্য কাজ কর্মের কিছু কিছু ভার তিনি কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিয়ে কলেজের উপর বেশী মনোযোগ দিচ্ছেন। প্রায় নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন, অন্য ক্লাসগুলিরও খোঁজখবর নেওয়ায় তাঁর উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তঁরা ভাষা আর ব্যবহার থেকে রূঢ়তা অনেকখানি কমেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য তিনি নিজেও ফের একটু একটু পড়শুনো শুরু করেছেন। তাঁর ইজিচেয়ারটা আজকাল লাইব্রেরি ঘরেও মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক রাত অবধি সে ঘরে আলো জ্বলে। প্রিন্সিপ্যালের এই পরিবর্তনে সহকর্মীরা আর ছাত্ররা সবাই খুশি হয়ে উঠল। এবার কলেজটার সত্যিই তবে উন্নতি হবে।

মীরার সঙ্গে সতীকান্তর স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূর ক্রমে আলাপ হয়ে গেল। মেয়ের বয়সী এই দরিদ্র মেয়েটির উপর প্রথমে স্বাভাবিক বাৎসল্যই বোধ করলেন হিরণপ্রভা। আরো যখন শুনলেন মেয়েটি ভালো ছাত্রী, ওকে দিয়ে তাঁর স্বামীর কলেজের সুনাম বৃদ্ধির আশা আছে, তখন মীরার উপর তাঁর

আগ্রহ আরো বাড়ল। ইদানীং কলেজের দিক থেকে স্বামীর যশের ঘাটতি নজর এড়ায়নি হিরণপ্রভার। তিনি তাতে খুশি হননি। স্বামীর যশ সব দিক দিয়ে বেড়ে চলুক এই তাঁর কথা। তিনি মীরাকে ডেকে বললেন, 'কি বল, একটা ফার্স্ট ক্লাস পাবে তো!'

মীরা লজ্জিত ভাবে সবিনয়ে বলল, 'পাব একথা কি বলা যায়। আপনাদের আশীর্বাদে চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

হিরণপ্রভা বললেন, 'চেষ্টা কর, খুব ভালো করে চেষ্টা কর। ওঁর মুখ রাখা চাই বুঝেছ?'

তারপর বললেন, 'তোমার নাকি বাড়িতে পড়াশুনার অসুবিধা। আলাদা ঘরটর নেই, তাছাড়া আরো কিসব গোলমালটোলমালের কথা শুনেছি। ইচ্ছে হলি তুমি আমার বাড়িতে এসেও পড়তে পার। এখানে তো ঘরের অভাব নেই। কত ঘর খালি পড়ে আছে।' মীরা বলল, 'সব দিন দরকার নেই। তবে আপনাদের লাইব্রেরিটা যদি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারি ; তাহলে খুব ভাল হয় ; কলেজের লাইব্রেরিতে ছেলেদের বড় ভিড়।'

হিরণপ্রভা মৃদু হেসে বললেন, 'বেশ, তুমি এখানেই এসে পোড়ো।'

তাঁর অনুমতি পেয়ে মীরা মাঝে মাঝে আসতে লাগল প্রিন্সিপ্যালের বাড়িতে। সেই নিরালা লাইব্রেরি ঘরটি তার বড় ভালোলাগত। মনে হত এখানে যেন সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

সতীকান্তর মেয়ে শুভ্রা মাঝে মাঝে বাপের বাড়িতে বেড়াতে আসত। আলাপ করতে আসত পুত্রবধূ জয়ন্তী। কিন্তু হিরণপ্রভাই তাদের আগলে রাখতেন। তিনি বলতেন, 'না না, ওকে পড়তে দাও তোমরা ওর পড়াশুনোর ব্যাঘাত কোরোনা।'

শুভ্রা হেসে বলত, 'বাবা, কি কড়া পাহারা। মা, বাবার চেয়ে তুমি যদি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হতে আরো বেশি মানাত।'

মীরা ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেল, কলেজের বছর দশেকের ইতিহাসে তা কেউ পায়নি। অন্যান্য রেজাল্টও আগের চেয়ে কলেজের এবার বেশি ভালো হল।

মীরা কলকাতায় গিয়ে এম এ. ক্লাসে ভর্তি হল। সাফল্যের আনন্দটা পুরোপুরি ভোগ করতে পারল না। বাসার অবস্থা খারাপ। মায়ের অসুখ কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে, আর্থিক অবস্থাও ভালো হচ্ছে না। কয়েকটি আপোগণ্ড ভাইবোন। শুধু একটি মাত্র ভাই বড় হয়ে উঠেছে। সুধীর বি এ পড়ছে।

মীরা বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি না হয় না গেলাম। তোমাদের দেখাশোনা করবে কে।'

গণেশবাবু বললেন, 'সে যা হয় হবে। এত ভালো রেজাল্ট করে তুই পড়া ছেড়ে দিবি তাই কি হয়। তুই আমার বংশের রত্ন।'

মীরা পড়তে গেল কলকাতায়। বাবার কাছ থেকে তো কিছু নিত না। বরং সস্তা হস্টেলে থেকে কম খরচে চালাত। টুইশনের টাকা পাঠাত বাসায়।

নানা কাজে সতীকান্ত কলকাতায় যেতেন। মাঝে মাঝে উৎসাহ দিয়ে আসতেন মীরাকে আর কিনে দিতেন বই।

একদিন দেখা হয়ে গেল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে। দেখি সতীকান্ত আর মীরা পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বসে। দুজনেই যেন ছাত্রছাত্রী। দুজনেরই হাতে বই। দুজনেরই মুখে গাম্ভীর্য, চোখে অধ্যয়নের স্পৃহা।

মীরা আমাকে দেখে উঠে এল, বলল, 'ভালো আছ?'

বললাম, ভালো আর কই। এখনো বেকার। সেকেণ্ড ক্লাস এম এ এর সহজে কি চাকরি হয়। তোমরা বুঝি মাঝে মাঝে আস এখানে?'

মীরা বলল, 'আমরা? ও প্রিন্সিপ্যালের কথা বলছ? হ্যাঁ, উনি কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে আসেন। আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের উপর উনি একটা বই লিখছেন।'

বললাম, 'ভালোই তো।'

কর্মখালিতে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করতে করতে আমি আরামবাগ কলেজে শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি পেয়ে গেলাম। মীরার রেজাল্ট এম এ'তে আশানুযায়ী হল না। হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেল।

কলকাতার কলেজে ওর চাকরি জুটেছিল। কিন্তু এই সময় ওর মা মারা গেলেন। ওকে যেতে হল আমাদের শহরে ফিরে। গণেশবাবু একেবারে ভেঙে পড়লেন। তাঁর স্বাস্থ্যও খারাপ।

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কাজ কি তোমার বাইরে থেকে। তুমি এই কলেজেই পড়াও। এখানে কলকাতার চেয়ে খরচ কম। তাছাড়া তুমি তো এই কলেজেরই মেয়ে। এর উপর তোমার দরদ বেশি থাকবে।'

গণেশবাবুরও তাই মত। তিনি মেয়েকে কাছ ছাড়া করতে চান না। আরো বছর দুই কাটল। এর মধ্যে গণেশবাবু মারা গেলেন, আর সুধীর বি এ ফেল করে পড়া ছেড়ে দিয়ে কোর্টে পেশকারের চাকরি নিল। শোনা গেল সতীকান্তবাবুর চেষ্টাতেই এই চাকরি হয়েছে। সেবার ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে আরো কিছু খবর শুনতে পেলাম। সতীকান্তবাবুর পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়েছে। প্রায় রোজই ঝগড়াঝাঁটি হচ্ছে। স্ত্রী ছেলে মেয়ে কারো সঙ্গেই তাঁর আর বনিবনাও হচ্ছে না।

মা-ই বললেন একথা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন মা?'

মা বললেন, 'যাক বাপু, তোমার এসব নোংরা কথার মধ্যে থেকে কি দরকার।'

কিন্তু ঘুরিয়ে মা-ই জানালেন এসবের মূলে আছে মীরা। ওর জন্যেই পরিবারে অশান্তি। কলেজে মীরাকে চাকরি দেওয়া হয় এতে গোড়া থেকেই হিরণপ্রভার অসম্মতি ছিল। স্বামীর সঙ্গে এই মেয়েটির অনুক্ষণ মেলামেশা তিনি আর পছন্দ করছেন না। সতীকান্ত বই লেখার নামে কি মীরাকে থিসিস লেখায় সাহায্য করার নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হয় কলেজে নয় লাইব্রেরিতে কাটান। তাঁদের আলাপ আলোচনা যেন শেষ হতেই চায় না। সতীকান্তর অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্ষতি হয়, তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। এই মেলামেশা নিয়ে নানা জায়গায় কথাও উঠেছে, তাও যেন তিনি গ্রাহ্যে আনতে চান না। আসলে লোকটি একগুঁয়ে, বেপরোয়া ধরনের। কিন্তু পুরুষের না হয় অমন একগুয়ে হলেও চলে। বিশেষ করে সতীকান্তর মত খ্যাতিমান শক্তিমান পুরুষের। কিন্তু মীরার আক্কেলখানা কিরকম। কুমারী মেয়ে, ওর তো একটা লজ্জা সরম ভয় ভাবনা থাকা উচিত। এ ধরনের বদনাম রটা কি ভালো। আর যা ইচ্ছা করলে, একটু সাবধান হলেই, এড়িয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে কলেজে, যেখানে পুরুষে মেয়েতে এক সঙ্গে পড়ে, সেখানে এই কাণ্ড। মুখ তো কেউ কারো চেপে রাখতে পারে না। তাই নানা জনে নানা কথা বলছে।

বললাম, 'মীরাকে ডেকে তুমি একটু বুঝিয়ে বল না। ও একটু সাবধান হোক।'

মা বললেন, 'ইশারা ইঙ্গিতে কি বলিনি? বেশি বলতে আমার লজ্জা করে বাপু! হাজার হলেও পেটের সন্তানের বয়সী।'

কিন্তু যাঁরা বলবার তাঁরা বিনা লজ্জা-সঙ্কোচেই বলেন। মীরাকে একদিন খবর দিয়ে নিয়ে গেলেন হিরণপ্রভা। তারপর প্রায় বিনা ভূমিকায় বললেন, 'তোমাকে এ কলেজের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে।'

মীরা বলল, 'কেন আমি কি দোষ করেছি।'

হিরণপ্রভা বললেন, 'না তুমি দোষ করবে কেন, তুমি গুণের হাঁড়ি। এক মাসের মধ্যে তোমাকে কাজ ছেড়ে দিতে হবে।'

মীরা বলল, 'বেশ গভর্নিং বডি যদি বলেন—'

হিরণপ্রভা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গভর্নিং বডি বলুক আর না বলুক, আমি বলছি, সেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। বেশ, 'সেই বডিকে দিয়েই আমি বলাব।'

মীরা বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

শুভেন্দু, শুভ্রা, জয়ন্তী পাশের ঘরেই ছিল। তারাও এবার হিরণপ্রভার সঙ্গে যোগ দিল, 'এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই। এক মাস নয়, এক সপ্তাহের মধ্যেই কলেজ ছেড়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে। অত বড় একজন মানী গুণী মানুষ। তুমি তাঁর নামে বদনাম রটাচ্ছ।'

মীরা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমি বদনাম রটাচ্ছি!'

শুভেন্দু বলল, 'তোমাকে উপলক্ষ করেই তাঁর নামে বদনাম রটছে। এটা কিছুতেই আমরা সহ্য করব না।

মীরা বলল, 'সহ্য করতে তো আমি বলিনে।'

শুভ্রা বলল, 'বটে! তুমি ভেবেছ আমরা তোমার বলা না বলার অপেক্ষায় থাকব। দাদা যা বলল, আর একটি সপ্তাহ আমরা দেখব। তারপর—'

মীরা নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। অন্য কলেজে চাকরির জন্যে ও নিজেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু শুভেন্দুর এই শাসানিতে মীরা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। ওরও জেদ বেড়ে গেল। দেখা যাক কি করতে পারে ওরা।

এক সপ্তাহ নয়, সাত আট সপ্তাহই কাটল। এর মধ্যে গরমের ছুটিতে হিরণপ্রভা সপরিবারে দার্জিলিং গেলেন। স্বামীকে ধরে নিয়ে গেলেন সেই সঙ্গে। কিন্তু সতীকান্ত সপ্তাহ দুই কাটতে না কাটতেই চলে এলেন। সেখানে স্ত্রীর কড়া পাহারা তাঁর সহ্য হল না। হিরণপ্রভা বৈষয়িক অবৈষয়িক স্বামীর নামের সব চিঠিগুলি আগে নিজে খুলে দেখতেন। তাঁকে না দেখিয়ে সতীকান্ত কোন চিঠি ডাকে দিতে পারতেন না। তিনি প্রতিবাদ করলে ছেলেমেয়ে পুত্রবধূর সামনে মীরার কথা তুলে স্বামীকে তিনি অপমান করতেন। সপ্তাহ দুই বাদে সতীকান্ত তাই পালিয়ে এলেন।

কিন্তু পরদিনের গাড়িতে হিরণপ্রভা এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিরহ আর সহ্য হচ্ছিল না, না? তোমার বিরহ আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।'

নিজের লাইব্রেরি-ঘরে বন্দী হয়ে রইলেন সতীকান্ত। বাইরে থেকে তালাচাবি পড়ল। হিরণপ্রভা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'ওই ঘরে তার গায়ের গন্ধ আছে। বসে বসে শুঁকতে থাক।'

সতীকান্ত চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার কলেজ খুলে গেছে যে, আমাকে কলেজে যেতে হবে না?'

হিরণপ্রভা বললেন, 'তাকে আগে কলেজ ছাড়াই, তারপর তোমাকে সেখানে পাঠাব।'

সতীকান্ত ভেবে পেলেন না তাঁর হাতের মুঠি এমন আলগা হয়ে গেল কি করে। কি করে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা এমন ভাবে হস্তান্তরিত হল। ছেলেমেয়ে, চাকরবাকর, বেয়ারা-দারোয়ান কেউ তাঁর পক্ষে নয়। সব হিরণপ্রভার। আর তাঁর চরিত্র সংশোধনের ভার সকলের হাতে। গভর্নিং বডিকে হাত করলেন হিরণপ্রভা। তাঁদের বুঝিয়ে বললেন, ব্যাপারটাকে প্রশ্রয় দিলে কলেজের দুর্নাম বেড়ে যাবে। প্রথমে মীরাকে পদত্যাগ করার জন্যে অনুরোধ করা হল। কিন্তু সে যে কর্তৃপক্ষের অনুরোধ রাখবে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নির্দিষ্ট সময় পাব হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ তাকে বরখাস্ত করলেন আর এখবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সতীকান্তও রেজিগনেশন লেটার পাঠালেন। বললেন, শাস্তি একা কেন ভোগ করবে মীরা। তা তাঁরও প্রাপ্য। কর্তৃপক্ষ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করলেন না, কিন্তু সতীকান্ত এরপর থেকে আর কলেজে গেলেন না।

তাঁর এই ব্যবহারে তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সতীকান্তকে কলেজে পাঠাবার জন্যে নানারকম চাপ দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত বদলালেন না।

হাটে বাজারে শহরের প্রতিটি চায়ের দোকানে, বার-লাইব্রেরিতে এই একটি মাত্র আলোচনা ক'দিন ধ'রে চলতে লাগল, দুষ্টু ছেলেরা ছড়া কাটল, দেয়ালে দেয়ালে প্লাকার্ড পড়ল।

তারপর একদিন ভোরে উঠে শুনলাম, মীরাও নেই, সতীকান্তও নেই। দুইজনেই শহর ছেড়ে চলে গেছেন।

প্রথমে তাঁরা কলকাতাতেই ছিলেন। কিন্তু হিরণপ্রভা ছেলে আর জামাইকে সঙ্গে করে সেখানেও গেলেন। ফলে কলকাতা থেকেও পালালেন সতীকান্ত।

এরপর বছরখানেক বাদে মার সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলাপ হয়েছিল। পুজোর ছুটিতে বাড়ি গিয়েছি। শুনলাম কলেজে নতুন প্রিন্সিপ্যাল এসেছেন, ডক্টর চৌধুরী। সতীকান্তবাবুদের সেই হৈ চৈ এরই মধ্যে শান্ত হয়ে গেছে। মীরার ভাই সুধীর বিয়ে করে সংসারী হয়েছে।

কথায় কথায় মা বললেন, 'মেয়েটা খারাপ ঠিকই। কিন্তু যত খারাপ সবাই বলত তত খারাপ নয়।'

বললাম, 'কি রকম।'

মা বললেন, 'লোকে তো বলতে মেয়েটা টাকার লোভেই, সতীকান্তবাবুব সম্পত্তির লোভেই অমন একজন বুড়োকে—'

হেসে বললাম, 'তা যে নয় তা কি করে জানা গেল।'

মা বললেন, 'সতীকান্তবাবু তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হিরণপ্রভা আর শুভেন্দুর নামে লিখে দিয়ে গেছেন। কিছু টাকা কলেজেও দিয়েছেন শুনলাম।'

আমি একটুকাল চুপ করে থেকে বললাম, 'মা আমার উপনিষদের সেই কাত্যায়নী আর মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান মনে পড়ছে। কাত্যায়নী রইলেন ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধন সম্পদ নিয়ে। আর মৈত্রেয়ী বললেন যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।'

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই স্ত্রীর গল্পটা মার জানা ছিল। তিনি বললেন, 'কাত্যায়নী কে? হিরণপ্রভা?'

বললাম, 'তা ছাড়া আবার কে?'

মা একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'না বাপু, তা না। মানুষকে অমন সরাসরিভাবে ভাগ কোরো না। প্রত্যেকের মধ্যেই একজন করে কাত্যায়নী আছে, আর একজন করে মৈত্রেয়ী। সেদিন হিরণদির অসুখের খবর শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। কিসের অসুখ? ডাক্তার বৈদ্য কি সে অসুখ ধরতে পারে? পারি আমরা। মেয়ে মানুষের সে অসুখ আমরা মেয়েমানুষেই বুঝি। হিরণদির সেই শরীর নেই, সেই রূপ নেই, যেন শুকিয়ে গেছেন। আমাকে দেখে তাঁর সে কি কান্না। সবই আছে। কিন্তু একের বিহনে সব অন্ধকার।' বলতে বলতে মায়ের চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। হিরণপ্রভার সঙ্গে তার অনেক দিনের বন্ধুত্ব।

একটু থেমে বললেন, 'আর ছেলেমেয়ে দুটির দিকেই কি তাকান যায়। তারা উপরে যত শক্ত ভাবই দেখাক, ভিতরটা তাদের পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে না? তাদের দুঃখ তাদের লজ্জাটা একবার ভেবে দেখ দেখি। অতবড় মানী-গুণী বাপ। তিনি আজ থাকতেও নেই। তাদের সামনে বাপের কথা কেউ তুললে এমন ভাব হয় তাদের—।'

তারপর প্রায় বছর দশেক মীরার সঙ্গে আমাদের কারোরই কোন যোগাযোগ ছিল না। শুনেছি ওরা ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছে, নানা কলেজে চাকরি করেছে। মাঝে মাঝে দু'একবার কলকাতায়ও যে বেড়াতে না এসেছে তা নয়। কিন্তু পরিচিত কারো সঙ্গেই দেখা করেনি।

কিন্তু এবার গরমের ছুটির মধ্যে হঠাৎ ওর একটা চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমি সম্প্রতি যে সব প্রবন্ধ লিখেছি সেগুলি ওর নাকি খুব ভালো লেগেছে। ওরা এখন নাগপুরে স্থায়ীভাবে আছে। যদি কোন দিন আমি ওদিকে বেড়াতে যাই যেন দেখা-সাক্ষাৎ করি। তাহলে ওরা দুজনেই খুব খুশি হবে।

ছুটিতে কোথায় যাই কোথায় যাই ভাবছিলাম। মীরার চিঠি পেয়ে ঠিক করলাম নাগপুরেই যাব ; যদিও গরমটা ওখানে বেশি, তা হোক।

প্রথমে এক মারাঠা বন্ধুর বাড়িতে উঠছিলাম। সেখান থেকে দেখা করতে গেলাম মীরার সঙ্গে।

শহরতলির অপেক্ষাকৃত একটু নিরালা জন-বিরল অঞ্চল ওরা বসবাসের জন্যে বেছে নিয়েছে। বাংলো প্যাটার্নের পাটকিলে রঙের ছোট একটু বুড়ি। খানতিনেক ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। বারান্দার নীচে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে মীরা ফুলের চাষ করেছে।

আমাকে দেখে মীরা খুবই খুশি হয়ে উঠল। বলল, 'তুমি যে এত তাড়াতাড়ি আসবে আশাই করিনি। বহুকাল চেনা পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয় না।'

সতীকান্তবাবুর বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারলাম না। তিনি আগের মতই গম্ভীর আর রাশভারী রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'ভালো আছ?'

আমি প্রণাম করে বললাম, 'হ্যাঁ, ভালোই আছি। আপনি?'

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'ভালো।'

কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য তেমন ভালো দেখলাম না। মীরার কাছে শুনলাম ব্লাড প্রেশারে খুব ভুগছেন। আর দেখলাম সতীকান্তবাবু অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছেন। সব চুল পাকা। দাঁতও বেশির ভাগই পড়ে গেছে। শরীরের সেই বাঁধুনি আর নেই। কি জানি, রোগই হয়ত তাঁকে এমন অশক্ত করে তুলেছে।

সেই তুলনায় মীরার বয়স বেশী বেড়েছে বলে মনে হয় না। সে যেন তিরিশের নিচেই রয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকেই মীরা খুবই কর্মঠ। তার সেই তৎপরতা যেন আরো বেড়েছে! সকালে কলেজে

পড়ায়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে তার বেশির ভাগ সময় সতীকান্তবাবুর সেবা-শুশ্রূষায় কাটে। তিনিও ইউনিভার্সিটিতে পড়ান। তবে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখন ছুটি নিয়েছেন।

মীরা আমাকে কিছুতেই মারাঠী বন্ধুর ওখানে ফিরে যেতে দিল না, বলল, 'তুমি আমার চিঠি পেয়ে এসেছ, আমাদের এখানেই থাকবে।'

বললাম, 'কোন অসুবিধে হবে না তো?'

মীরা হেসে বলল, 'অসুবিধে কিসের?'

দিন পনের ছিলাম ওদের সঙ্গে। ঘরে আসবারপত্র সামান্য। দুখানা তক্তপোশ। খান দুইতিন সস্তা ইজিচেয়ার। দু'খানা লিখবার ছোট টেবিল। সামনে দু'খানা হাতলহীন চেয়ার। আর লম্বা লম্বা বইয়ের র‍্যাক। সতীকান্ত তার সেই আগের লাইব্রেরির একখানা বইও নিয়ে আসতে পারেননি, কি আনেননি। কিন্তু এখানে ছোটখাট আর একটি লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে।

খাওয়া দাওয়াও খুব অনাড়ম্বর। ডাল ভাত আর একটা তরকারি; সতীকান্তর জন্যে আধসেরখানেক দুধ। আমার জন্যে মীরা বিশেষ ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল; আমি বাধা দিলাম।

একদিন বললাম, 'মীরা, এত কষ্ট করে আছ কেন? তোমার রোজগার তো খুব খারাপ নয়।'

মীরা বলল, 'পরের সম্পত্তি সবাই বড় দেখে।'

একটু বাদে ফের বলল, 'বেশী কিছু থাকে না পরিমল। ছোট ভাইবোনদের কিছু কিছু করে পাঠাতে হয়, ওরা তো এখনো সবাই যোগ্য হয়ে ওঠেনি। সুধীর একা পেরে ওঠে না।'

বললাম, 'তুমি গরীবের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই তোমার না হয় এ সবে অভ্যাস আছে। কিন্তু ওর কষ্ট হয় না?'

মীরা বলল, 'না ওঁর ইচ্ছেমত এই ব্যবস্থা হয়েছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু এত কৃচ্ছ্র কি ভাল মনে কর, সবাই যদি তোমার মত হয় জাতির ঐহিক সম্পদ বাড়বে কি করে?'

মীরা হেসে বলল, 'সবাই আমার মত হবে কেন? তোমাকে বললাম তো এর চেয়ে বেশি ভাল অবস্থায় থাকবার সাধ্য আমার নেই। কিন্তু যতই বল মানুষের মনের উপর বস্তুর প্রাধান্যতে কিছুতেই সায় দিতে পারিনে। সম্পদ সৃষ্টির নামে মানুষ একান্তভাবে বস্তুনির্ভর, বস্তুসর্বস্ব হবে—আর তাই যে সবচেয়ে ভালো একথা কি করে মানি। তোমার ইদানীংকার প্রবন্ধগুলিতেও এই তর্ক তুলেছ। তাই তোমাকে ডাকলাম।'

একদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরলাম। অনেকখানি পথ পার হওয়ার পর একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বললাম, 'এসো এখানে একটু বসা যাক।'

খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ভারি নিস্তব্ধ নির্জন জায়গা, যেন সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে।

বললাম, মীরা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মীরা আমার দিকে স্মিতমুখে তাকাল, 'কর না।'

বললাম, 'তুমি এমন কাজ করতে পারলে কি করে।'

মীরা হাসল, 'তোমার এতদিন বাদে এ কথা?'

'এতদিন বাদে না, আমার অনেক দিনই একথা ·ন হয়েছে। তুমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলে না?'

মীরা হেসে বলল, 'মানুষ অবশ্য হাতের কাছে আরো দু' একজন ছিল।'

বললাম, 'ঠাট্টা রাখ। অমন একজন বুড়ো, তোমার সঙ্গে বয়সের যাঁর অত তফাৎ, যাঁর স্ত্রী-পুত্র নাতি-নাতনী সব ছিল—। আমার একেক সময় মনে হয় বাইরের লোকের উৎপাতে তুমি বাধ্য হয়ে পালিয়ে এসেছ।'

মীরা স্মিতমুখে বলল, 'তাই যদি হবে, তাহলে একাই পালাতাম, ওর সঙ্গে আসতাম না।'

বললাম, 'তুমি তাহলে ভালোবেসেই এসেছ?'

মীরা কোন জবাব দিল না।

বললাম, 'কিন্তু একি এক ধরনে বিকৃতি নয়, ব্যভিচার নয়, অন্যায় নয়?'

মীরা এই তিরস্কারের এবারও কোন জবাব দিল না। তেমনি হেসে চুপ করে রইল।

মায়ের কথাগুলি আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তুমি একজন পারিবারিক মানুষকে তাঁর পরিবার থেকে ছিনিয়ে এনেছ। তুমি একটি পরিবারকে অনাথ করেছ।'

মীরা এবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। অনুত্তেজ শান্ত সুরে বলল, 'ওকথা বলো না। তাঁর পারিবারিক বাঁধন ভিতরে ভিতরে অনেক দিন আগে থেকেই খুলে গিয়েছিল। চলে আসবার দিন শেষ রাত্রে তিনি যেভাবে আমার জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তুমি যদি তাঁর সে মূর্তি দেখতে তাহলে আজ অন্য কথা বলতে। আমি তাঁর ডাকে চমকে উঠে জানলার কাছে দাঁড়ালাম। প্রথমে মনে হল যেন ভূত। তারপরে দেখলাম ভূত নয় জেল থেকে পালিয়ে আসা কয়েদী। তেমনি বেশ বাস, তেমনি মুখ চোখ। তিনি বললেন,—মীরা, আমাকে মুক্তি দাও। আমি বুঝতে পারলাম এ-শুধু পরিবারের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি নয়, কামনার পীড়ন থেকেও মুক্তি। একে মুক্তি দিতে হলে আগে বাঁধতে হবে।'

মীরা একটু থামল।

আমি বললাম, 'তারপর?'

মীরা বলল, 'তার আগের কথা একটু শুনে নাও। তার আগে এই কয়েক বছর ধরে কতবার তিনি আমার কাছে গেছেন, কত ছলে আমাকে কাছে ডেকেছেন , আর কত চেষ্টায় আসল বলবার কথাটাকে ঢেকে রেখেছেন। চেষ্টা করেছেন যাতে না বলে পারা যায়। নিজের সঙ্গে তাঁর নিজেব সেই দুঃসাধ্য সংগ্রাম আমি তো না দেখেছি, এমন নয়। তবু শেষ মুহূর্তে তাঁকে বলতেই হল! প্রথমে একটা তীব্র ঘৃণা হল আমার, তারপর এক গভীর মায়ায় আমার সমস্ত মন ভরে গেল। ভাবলাম এই আর্তকে আমার আশ্রয় দিতে হবে। যে বটগাছ ভেঙে পড়ল, তাকে আমার তুলে ধরা চাই। আজ আমার দক্ষিণা দেওয়ার দিন এসেছে।'

আমি বললাম, 'শুধু দক্ষিণা, শুধু দাক্ষিণ্য?'

আমার কথা বোধ হয় মীরার কানে গেল না। কি ইচ্ছে করেই সে কানে তুলল না। মীরা আগের কথার জের টেনেই বলে চলল, 'তুমি বলছিলে পরিমল, আমি কি ভালোবাসার আর মানুষ পেলাম না? পাওয়ার অবসর পেলাম কই। প্রথম থেকেই এক প্রবল প্রচণ্ড ভালোবাসাকে ঠেকাতে ঠেকাতে—'

আমি বাধা দিয়ে হেসে বললাম, 'এই বুঝি তোমার ঠেকাবার নমুনা?'

মীরা আমার দিকে তাকাল 'তুমি কি ভেবেছ শুধু দু'হাত দিয়েই ঠেকান যায়, আর কিছু দিয়ে ঠেকান যায় না?'

বললাম, 'তাহলে তুমি তাকে ঠকিয়েছ বলো।'

মীরা একটু হাসল, 'এবার বুঝি উতোর গাইতে শুরু করলে? ছিঃ ঠকাব কেন। আমার যা সাধ্য আমি দিয়েছি তিনিও তা প্রসন্ন মনে নিয়েছেন। তাছাড়া একসঙ্গে থাকতে কত অদলবদল হয়, কত নতুন সম্বন্ধ গড়ে ওঠে—'

এরপর সতীকান্তবাবুর কথা উঠল। বললাম, 'ওঁর রোগটা কি? তোমার এত সেবাযত্নেও উনি সারছেন না কেন? তাছাড়া বড় তাড়াতাড়ি যেন বুড়িয়ে পড়েছেন। তরুণী ভার্যা তো মানুষকে আরো তরুণ করে তোলে।'

মীরা লজ্জা পেয়ে বলল, 'তুমি বড দুষ্টু। হয়ত ততখানি তারুণ্য আমার মধ্যে নেই, যাতে জরাকে জয় করা যায়।'

একটু বাদে মীরা ফেব কথা বলল। তার মুখে বিষণ্ণতার ছায়া, মুখের কথায় বিষণ্ণতার স্বর।

মীরা বলল, 'তুমি ঠিকই ধরেছ। ওঁর অসুখ শুধু দেহের নয়। উনি আজকাল বড় বেশি ভাবেন।'

'কি ভাবেন? যাদের ছেড়ে এসেছেন তাদের কথা কি ওঁর মনে হয়?'

মীরা বলল, 'মনে হয় বই কি। সরাসরি চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, তাঁরাও কেউ লেখেন না। তবু

অন্যভাবে তাঁদের খোঁজখবর আনান। তার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকেন। দেখ বাইরে থেকে এক কথায় একদিনে সব ছেড়ে আসা যায়। কিন্তু ভিতর থেকে ছাড়তে হয় প্রতিদিনের চেষ্টায়।'

'তোমার হিংসে হয় না?'

মীরা একটু হেসে বলল, 'হয় বই কি। তবে হিংসেয় একেবারে ফেটে মরিনে। কারণ তিনি শুধু তাঁদের জন্যেই ভাবেন না, আমার জন্যেও ভাবেন।'

'তোমার জন্যে আবার কি ভাবনা?'

মীরা বলল, 'ভাবনা নেই? ভাবেন, আমাকে কতটুকু দিয়ে যেতে পারলেন। শুধু বিদ্যার সাধনায় কি মানুষে সব সাধ মেটে? মেয়েদের সব সাধ মেটে?'

মীরা চোখ নামাল।

একটু বাদে আমি বললাম, 'তুমি কি তাহলে সুখী হওনি?'

মীরা এবার ফের মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল, তাকিয়ে হেসে বলল, 'আশ্চর্য, এতক্ষণ আলাপের পর তোমার কি এই মনে হচ্ছে, আমি সুখী হইনি, আমি দুঃখে আছি?' কথা শেষ করে মীরা আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল।

আব তার সেই হাসি দেখতে দেখতে আমার নতুন করে মনে হল, সুখের আর এক অর্থ দুঃখ বহনের শক্তি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দুর্ঘটনা

কেবিনের সামনে ডেক চেয়ারে বসে পড়তে পড়তে মনোযোগটা বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। স্টিমার চলতে শুরু করে দিয়েছে, কাঠের চাকায় উঠছে আহত জলের ক্ষুব্ধ আর ক্রুদ্ধ গর্জন। কচুরির ঝাঁক ছিন্ন-ভিন্ন করে আর জলে সমুদ্রের ঢেউ জাগিয়ে স্টিমার এগিয়ে চলেছে। সকালের রোদে নদীর জল কাচের গুঁড়োর মতো জ্বলছে, ইলিশ মাছের সন্ধানে লম্বা জাল ছড়িয়ে নেচে চলেছে জেলে-ডিঙির বহর।

হাতের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসে তখন ঘটনার ভয়ঙ্কর আবর্ত। তিনটে খুন করে আর দুর্মূল্য পান্নার ড্রাগনটা হস্তগত করে দস্যু সর্দার ক্যাং চু পলাতক। বাঙালি ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় তাকে ধরবার জন্য ইরাবতী নদী দিয়ে লঞ্চ ছুটিয়েছে পূর্ণবেগে। এমন সময় জলের তলায় প্রলয়ঙ্কর শব্দে কী ফাটল? চুম্বক মাইন? কিছু বোঝা গেল না। কিন্তু মুহূর্তে ডিটেক্‌টিভ সমুদ্র রায় লঞ্চ থেকে—

উত্তেজনায় গায়ের লোমগুলো যখন দাঁড়িয়ে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় ইন্দিরা চৌধুরী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বইটা মুখের সামনে ধরে কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করতে লাগল কথাগুলো। স্টিমারের অবিশ্রাম গর্জনের মধ্য দিয়েও সেই কল-কাকলি বেশ স্পষ্ট ভাবেই কানে আসতে লাগল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়েছে ফ্রন্ট ডেকের রেলিং ধরে—ইন্দিরার দিকে পিঠ দিয়ে। সুন্দর ছেলেটি, আরও সুন্দর মেয়েটি। বিশৃঙ্খল হাওয়ায় ওদের চুল উড়ছে, উড়ছে পাঞ্জাবির প্রান্ত। বাতাসে ভাসছে একটা মৃদু-মধুর সুরভি। ওরা এখন নিজেদের মধ্যে নিমগ্ন।

সত্যি বড্ড খিদে পেয়েছে।—ছেলেটির গলা।

মেয়েটি ধমক দিলে : তুমি বড্ড পেটুক বিভাস। স্টিমারে ওঠবার আগে অতগুলো খেয়ে এলে না রেস্তোরাঁ থেকে? এখন আবাব খেলে অসুখ করবে না?

—না, কিছুতেই না—ছেলেটি জোর গলায় প্রতিবাদ করলে : জানো, আমি ডাক্তার? আমাদের কখনও অসুখ করে না। সত্যি ইলু, তোমার টিফিন-ক্যারিয়ারের গল্‌দা চিংড়িগুলো—

—আবার?—ইলু অথবা ইলা এবার কড়াভাবে শাসন করে দিলে : ফের গল্‌দা চিংড়ির নাম করেছ কি টিফিন-ক্যারিয়ার সুদ্ধু নদীতে ফেলে দেব। দশটার আগে একটুকরো কিছু খেতে পাবে না। ডাক্তার! ছাই ডাক্তার তুমি! এম্‌-বি পাস করেছ খালি মানুষ মারতে।

শাসিত হয়ে বিভাস চুপ করে রইল। বোঝা গেল গল্‌দা চিংড়ির ব্যাপারে সে নিরাশ এবং মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ইলা কোমল স্বরে বললে, সত্যি লক্ষ্মীটি, রাগ করে না। তোমার জন্যে খাবার আনা হয়েছে তুমিই তো খাবে। আমি বলছিলাম—

স্টিমার বাঁক ঘুরছে একটা। অসতর্ক নৌকাগুলোকে জানান দেবার জন্যে প্রচণ্ড গভীর রবে বাঁশি বাজিয়ে দিল দুবার। কয়েকটা কথা তার মধ্যে হারিয়ে গেল, বাকী কথাগুলো তেমনি অখণ্ড মনোযোগে শুনে যেতে লাগল ইন্দিরা। নিজের ব্যর্থ শূন্য জীবনটা পরিপূর্ণ যৌবন-সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে এখনো মাঝে মাঝে লোলুপ হয়ে ওঠে।

ইলা বলে যাচ্ছে : আচ্ছা, এতটুকু কি রোমান্স নেই তোমার? বিয়ের পর হনিমুন করতে চলেছ, কোথায় ভালো ভালো কবিতা মনে পড়বে, তা নয় গল্‌দা চিংড়ি আর গল্‌দা চিংড়ি!

—বোঝো না, মানুষ কেটে কেটে ভয়ানক রিয়্যালিস্টিক হয়ে গেছি। এখনো কবিগুরুর কবিতা মনে পড়ে বইকি, কিন্তু সে হচ্ছে :

‘ “পাক-প্রণালীর” মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবী নাহি করে মুচিটা,
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন—’

—ওরে অকৃতজ্ঞ, কবে তোমাকে চামড়ার লুচি খাইয়েছি?

—অনেকদিন।

—মিথ্যেবাদী, ছোটলোক—ইলার ঝঙ্কার। তারপর খানিকটা দাম্পত্য কলহ, একঝলক মিষ্টি হাসি। সকালের রোদ, নদীর জল, নীলাঞ্জন আকাশ, ষ্টিমারের চাকায় জলের গর্জন, সব মিলে অপরূপ একটুকরো লিরিক্‌ কবিতা।

স্কুল মিস্‌ট্রেস কুরূপা মিস্‌ ইন্দিরা চৌধুরীর বুকের ভেতরটা অকারণে পুড়ে যাচ্ছে। রক্তের মধ্যে একটা চাপা আক্রোশ—স্টিমারের প্যাড্‌লের মতো অশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত। গালে মুখে যেন রক্ত-কণিকা এসে ঝিঁ ঝিঁ করছে। কোন্‌ ফাঁকে হাত থেকে রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসটা খসে পড়ল।

ওদের কাছে এখন সমস্ত পৃথিবীর রঙই আলাদা। আকাশ-বাতাস-নদীর জল আর স্টিমারের বাঁশিতে যেন সানাইয়ের সুর উঠছে। শরতের রোদে দিগন্তটা যেন বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো এসে দাঁড়িয়েছে ওদের দৃষ্টির সামনে। স্টিমারের চাকায় তারই জলতরঙ্গ। আর শুধু পৃথিবীই নয়—ওদের এই মিলনোৎসবে চারদিককার সমস্ত মানুষও যেন এসে যোগ দিয়েছে। যে-সমস্ত নিদ্রাতুর যাত্রী এই দিন-দুপুরেই ডেকের ওপর লম্বা হয়ে পড়েছে, অথবা মুরগীর ঝোলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যারা ঘোরাঘুরি করছে বাটলারের ঘরের সামনে, কিংবা এঞ্জিনের খোপরে ঢুকে যে সব কালিমাখা খালাসী কয়লা ঠেলছে বয়লারের গোলাপী আগুনে—তারা আর কেউ নয়, এই আনন্দিত বরযাত্রারই সঙ্গী। তাই পোড়ামুখ কুৎসিত ইন্দিরা চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে নিতেও দেরী হল না ইলার।

ডেকে তিনজন। গল্প জমে গেল। কোথায় যাচ্ছেন, কী পরিচয়, কী করেন। বাড়িতে কে কে আছেন। কবে বিয়ে হল। আশা করি, দাম্পত্য-জীবন মধুময় হয়ে উঠেছে। আপনাদের দেখে ভারি ভালো লাগল—একেবারে আইডিয়াল কম্বিনেশন যাকে বলে।

বিকেল হয়ে এসেছে। নদীর জলে ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা আলো। ইলার সুন্দর মুখে সেই আলো এসে অপরূপ মায়া ছড়িয়ে দিলে। আর সেই দিকে একবার চোখ বুলিয়ে গল্প শুরু করলে ইন্দিরা :

—জানতে চেয়েছেন আমার মুখটা এমন ভাবে পুড়ল কী করে। ওটা নিতান্ত অ্যাক্‌সিডেন্ট। কিন্তু ওকথা থাক। একটি মেয়ের গল্প বলি শুনুন। মনে করে নেবেন এটা সত্যি সত্যিই গল্প—এর মধ্যে বাস্তব কিছু নেই।

বিভাস আর ইলা একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলে। অর্থাৎ নিজের জীবনের কথাই বলতে যাচ্ছে ইন্দিরা। আত্ম-চরিত অথবা বাস্তব ঘটনা বলবার রেওয়াজই এই, গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করে নিতে হবে।

ইন্দিরা বললে, হ্যাঁ, নিতান্তই গল্প। স্টিমারে এর শুরু, স্টিমারেই এর শেষ। সুতরাং এর কিছু বিশ্বাস করবেন না। মনে করবেন শুধু সময় কাটানো ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

ইলার চোখ জ্বলজ্বল করছে আগ্রহে। বিভাস তাকিয়ে আছে সকৌতুক দৃষ্টিতে। দুজনেই সমস্বরে জবাব দিলে, আচ্ছা, বলুন আপনার গল্প।

স্টিমার চলছে পূর্ণবেগে। আকাশে ম্লান হয়ে আসছে আলো। দুপাশের গ্রামগুলো যেন স্বপ্নের এক একটুকরো ছবির মতো দেখাচ্ছে—উড়ে চলেছে গাং শালিকের ঝাঁক, মাছরাঙারা পান্নায়-গড়া হালকা দেহ নিয়ে ঝুপ্ ঝুপ্ করে ছোঁ মারছে জলে। জেলেদের জালে রুপোর মতো ঝলকাচ্ছে ইলিশ মাছ। নিচের থেকে আসছে [illegible] আর খালাসীদের রান্নার একটা মিষ্টি মিশ্র গন্ধ।

ইন্দিরা বলতে শুরু করলে :

"একটি মেয়ের গল্প। অসাধারণ কিছু নয়—সাধারণ মেয়ে। পথে ঘাটে যাদের দেখা যায়, সংসারে যাদেব সঙ্গে প্রত্যেকদিন সাক্ষাৎ, তাদেরই একজন। তাকে দেখলে কারো চোখ তার ওপরেই আটকে পড়ে না—অথবা চোখ ফিরিয়ে নেবারও দরকার হয় না। গ্রামে যারা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালায় এবং শহরে এসে যারা লেখাপড়া শিখেও সহজ ভাবে একা একা পথ চলতে পারে না, এ মেয়েটি তাদেরই দলে।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এসব কালো মেয়ের মুখে একটা চমৎকার লাবণ্যের আলো থাকে—অন্তত প্রথম বয়সে। ঝক্‌ঝকে ফর্সা রঙ সে আলোকে ম্লান করে রাখে, কিন্তু শান্ত শ্যামলতার ভেতর দিয়ে তা ঠিকরে পড়ে প্রাণের আলোর মতো। ঘনিষ্ঠভাবে না মিশলে একে দেখা যায় না—যারা দেখে তারা ভুলতে পারে না। একটা জিনিস মনে রাখবেন। উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী মেয়ের প্রেমে যারা পড়েছে তাদের আত্মরক্ষার সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কালো মেয়েকে যারা ভালোবেসেছে, তাদের উদ্ধারের বিন্দুমাত্র আশা নেই।

আমি যে মেয়েটির কথা বলছি—ধরুন তার নাম লক্ষ্মী—এই লাবণ্যের আশীর্বাদ সে-ও পেয়েছিল। লেখাপড়া মন্দ করেনি, থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল। তারপরে তার বিয়ে হয়ে গেল, যেমন করে এই সব মেয়েদের হয়। প্রেমে পড়ে না—সিভিল ম্যারেজে নয়, বাপ মায়ের পছন্দ-করা একটি সাধারণ বাঙালী ছেলের সঙ্গে! তার নাম মনে করুন, সত্যেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে চাকরি করে, কলকাতায় নিজের একখানা দোতলা বাড়ি আছে, আছে বাপ-মা ভাইবোন। গল্পের নায়ক মতো কোন গুণ নেই, না রোমিও, না ডন-জুয়ান। কালো রঙের একটি ছেলে, মাঝারি ধরনের বি-এ পাস করে ঢুকেছিল চাকরিতে।

কিন্তু লক্ষ্মী সুখী হয়েছিল—সুখী হয়েছিল সত্যেনও। আফিস পালিয়ে দুপুরে সত্যেন আসত বাড়িতে, স্ত্রীকে নিয়ে যেত বিলিতী বায়স্কোপে ম্যাটিনীর ছবি দেখতে। সন্ধ্যায় লেকের ধারে বসে 'হ্যাপি বয়' আইসক্রীম খেত, আউটরাম ঘাটের পাশে ছায়াঘেরা লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে দেখত রেঙ্গুনের জাহাজ আর গঙ্গার জলে দিনান্তের আলোর ঝলক। সূর্য ডুবে যেত ; হাওড়ার আকাশে উঠত চাঁদ, গুন্ গুন্ করে লক্ষ্মী গান গাইত ; 'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে চাঁদ উঠেছিল গগনে'—

বেশ কাটছিল, কিন্তু কাটল না। সত্যেনের দেখা দিল প্লুরিসি—তারপর প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মা।"

ইন্দিরা চশমার কাচ মুছে নেবার জন্যে চুপ করলে এক মুহূর্তের জন্যে। নদীর পুব পাড়ে গ্রামগুলোকে অস্পষ্ট করে দিয়ে নেমেছে সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে এখনো জ্বলন্ত তামার রক্তরাগ। স্টিমারের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সার্চলাইটের আলো দূরে নারিকেল-বীথি সমাকীর্ণ নদীর বাঁকটাকে উদ্ভাসিত করে দিলে। এদিকে ইলা আর বিভাস নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইন্দিরার মুখের দিকে।

ইলার স্বরে বেদনা প্রকাশ পেল : যক্ষ্মা?

ইন্দিরার চশমাটা পরে নিলে। কাচের ওপরে ইলেকট্রিকের আলো পড়ে যেন ইন্দিরার চোখ দুটোই জ্বলতে লাগল : "হ্যাঁ, যক্ষ্মা। এসব কাব্যের এ রকম বিয়োগান্ত পরিণতিও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। কী করা যাবে উপায় নেই।

চিকিৎসা চলতে লাগল। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত যা কিছু দিয়ে—লক্ষ্মীর গয়না বন্ধক দিয়ে। কিন্তু কোনো লাভ নেই—সকলেই বুঝতে পারছিল যা অনিবার্য তাই ঘনিয়ে আসছে। লক্ষ্মীব মনের অবস্থা আপনারা অনুমান করতে পারেন, সে সম্বন্ধে কোন কথাই আমি বলব না। তবু যখন একবিন্দু আশা থাকে না—তখনো আশা করতে ছাড়ে না মানুষ। হয়তো লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও তাই হয়ে থাকবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সবাই যখন ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, তখন আবো বেশি করে ভরসা পাচ্ছে সত্যেন। এ রোগের নাকি ধর্মই এই। তার ধারণা সে সম্পূর্ণ সেরে গেছে, এখন আব ভয়েব কোনো কারণ নেই। বাস্তবিক, আগের চাইতে তার বাইরের স্বাস্থ্য সেরেও গিয়েছিল অনেকটা। সত্যেন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল : এ ভাবে আমাকে আলাদা করে রাখবার দরকার নেই, আমি সকলের সঙ্গে মিশব, সকলেব সঙ্গে খাবো। লক্ষ্মীই বা এমন করে দূরে থাকবে কেন? আমার কাছে সে স্বচ্ছন্দেই আসতে পারে এখন।

শেষ কথাটাই সত্যেনের আসল লক্ষ্য। কিন্তু বাড়িব নতুন ডাক্তাব—ধরা যাক তার নাম বিভাস—"

বিভাস আর ইলা একসঙ্গে চমকে উঠল।—বিভাস?

ইন্দিরা হেসে উঠল : মনে করুন কাল্পনিক নাম। সামনে যাকে পাওয়া যায়, তাকে মডেল কবে নিয়ে গল্প বলতে সুবিধা হয় না? তা ছাড়া বিভাস নামে আর একজন ডাক্তার থাকলেই বা ক্ষতি কি?

ইলার মুখে প্রতিবাদ ঘনিয়ে এল, কিন্তু বিভাস কৌতুক বোধ করছিল। বললে, না, না, ক্ষতি নেই। আপনি বলে যান।

—কী বলছিলাম?—কৌতুকময় স্মিতহাস্যে ইন্দিরা একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে ইলার দিকে : "লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার জন্যে সত্যেন যেন দিনেব পব দিন উন্মাদ হয়ে উঠতে লাগল। এটাও নাকি এ রোগের আরো একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। ভেতরে যত ক্ষয়ে আসে, অতৃপ্ত ক্ষুধাগুলো তত বেশি তীব্র হয়। কিন্তু তরুণ ডাক্তার বিভাসের"—ইন্দিরা একবার থামল . "বিভাসের কড়া নিষেধ—যে কোনো রকম উত্তেজনা রোগীর পক্ষে মারাত্মক। সুতরাং লক্ষ্মীর স্বামী-সম্ভাষণের অধিকার ছিল না।

তা ছাড়া আরো একটু ব্যাপার ছিল—যা আর কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও লক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়ায় নি। দিনের পর দিন রোগীব চিকিৎসায় নিঃস্ব হয়ে আসা এই পরিবারটির প্রতি জেগে উঠছিল বিভাসের একটা অহৈতুকী সমবেদনা। শেষ পর্যন্ত সে দুবেলা যাতায়াত করতে শুরু করলে। ফী চাওয়া তো দূরের কথা, সে সম্বন্ধে কোনো কথা উঠলেই জিভ কেটে তিন হাত পিছিয়ে দাঁড়াত। বলত, না, না, টাকা আর কেন, এ তো আমার কর্তব্যই—

দরিদ্র পরিবারটি তাতে অপমানিত হল না, বরং স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিন্তু নতুন ডাক্তার—বিশেষ করে তরুণ ডাক্তারদের কর্তব্য-বোধ ক্ষেত্র বিশেষে মাঝে মাঝে মারাত্মক হয়ে উঠে। না-না বিভাসবাবু, কিছু মনে করবেন না, এ কটাক্ষ আপনাকে নয়। এটা আমি সাধারণ ভাবেই বলছি—একেবারে দায়িত্বহীন উক্তি বলেই আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন।

যাই হোক, কর্তব্যের তাগিদেই নতুন ডাক্তার একদিন একঝুড়ি ফল নিয়ে এল। লক্ষ্মী তখন দাঁড়িয়েছিল বারান্দার পাশে—ম্লান বিষণ্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছিল, সামনের বড় বাড়িটার মাথার ওপর রক্ত মাখিয়ে সূর্য অস্তে নামছে। হয়তো তাব মনে পড়ছিল আউটরাম ঘাটের সেই সন্ধ্যা, সেই

ঝলমলে জল—সেই ঘাট ছেড়ে হাওয়া দূরের পথিক কালো কালো জাহাজগুলোর গম্ভীর উদাস বাঁশির সুর।

বিভাস বললে, আপনাকে ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে—যেন একখানা আঁকা ছবির মতো।

লক্ষ্মী চমকে পেছন ফিরে তাকালো। বিকালের আলোয় বিভাসের চোখে যে আগুন সে দেখল, সে আগুন মেয়েদের অত্যন্ত বেশি চেনা—যেমন পাখিমাত্রেই বন্দুকের নল দেখলে চিনতে পারে।"

বিভাসের মুখ কালো হয়ে উঠছিল। হঠাৎ যেন তীব্রভাবে বলে ফেলল, থাক। আপনার গল্প আর ভালো লাগছে না, মিস চৌধুরী—মাপ করবেন।

কিন্তু ইলেকট্রিকের আলোয় ইলার মুখের চেহারাটাই যেন বদলে গেছে আশ্চর্যভাবে। তেমনি তীব্র ভাবেই ইলা বললে, না, না, বেশ লাগছে। বলে যান আপনি।

বিভাস কিংবা ইলা কারো কথাই যেন শুনতে পায়নি এই ভাবে ইন্দিরা বলে চলল : "বিদ্যুৎগতিতে চলে যাচ্ছিল লক্ষ্মী, কিন্তু বিভাস তার পথ আটকালো। বললে, আপনার স্বামীর জন্যে এই ফল—

— মাকে দেবেন—তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিয়ে লক্ষ্মী চলে গেল।

শাশুড়ীকে বিভাস কী বলেছিল কেউ জানে না, কিন্তু আড়ালে তিনি লক্ষ্মীকে খানিকটা গালি-গালাজ করলেন। বললেন, বৌমা সত্যু যেমন, ও-ওতো তেমনি ঘরের ছেলে। এই দুঃসময়ে কত কী করছে—তুমি ওকে অপমান করলে কেন?

লক্ষ্মী জবাব দিল না, জবাব দেবার কিছু ছিলও না। বিভাসের উপকারের জালে এই দুঃস্থ পরিবারটি কেমন করে দিনের পর দিন জড়িয়ে যাচ্ছে—কেমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে, এতো সে নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিল। বিভাসের বিরুদ্ধে একটি মন্তব্য করলে শ্বশুর-শাশুড়ী যে একসঙ্গেই তার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন, এ কথা বুঝতে তার বাকী ছিল না।

ওদিকে সত্যেন দিনের পর দিন কেমন হয়ে উঠেছে। তার মনের মধ্যে আগুনের মতো জ্বলে যাচ্ছে লক্ষ্মীকে কাছে পাওয়ার কামনা। খাবারের বাটি ছুড়ে ফেলে দেয়, আছড়ে ভেঙে ফেলে ওষুধের গ্লাস। জাগরণক্লান্ত রাত্রিতে জানলায় বসে বসে লক্ষ্মী শুনতে পায় খাঁচায় আটকানো একটা বুনো জানোয়ারের মতো সত্যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

সেদিন জ্যোৎস্নায় বান ডেকে গিয়েছিল। নিশীথ রাত্রে কলকাতায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত চাঁদ ওঠে। দিনের সমস্ত শব্দ আর সমস্ত কুশ্রীতা যায় তলিয়ে, শান্ত, স্তব্ধ, কোমল ঘুমের ওপরে জ্যোৎস্না যেন ফুলের পাপড়ির মতো ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু ঘরের মধ্যে মানুষ তখন ঘুমে কাতর—জ্যোৎস্নার সেই ফুল তারা কুড়িয়ে নিতে পারে না। আর লক্ষ্মীর মতো যারা সেই রাত্রিতে প্রহর জাগে, তাদের চোখে সে জ্যোৎস্না যেন দেখা দেয় কঙ্কালের খানিকটা হাসির মতো—আজন্ম বৈধব্যের নির্মম নিষ্ঠুর শুভ্রতার মতো।

রেলিং ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ্মী। গালের দুপাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। এমন সময় তার ঘাড়ে আগুন ছুঁইয়ে গেল তীব্র একটা নিশ্বাসের হালকা। চকিত হয়ে পেছন ফেরতেই কে তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকে চেপে ধরলে। বুনো জানোয়ারের চোখ জ্বলছে ধক্ ধক্ করে—সত্যেন।

লক্ষ্মী বললে, একি, তুমি!

সত্যেন জবাব দিল না। তেমনি লোহার মতো কঠিন দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে ঘরে টেনে নিয়ে চলল। তার মধ্যে বহুদিনের উপবাসী পশুটা জেগে উঠেছে।

লক্ষ্মী প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল .—কী করছ, কী করছ তুমি পাগলের মতো? সর্বনাশ হয়ে যাবে যে। পায়ে পড়ি তোমার, আজ ছেড়ে দাও। তোমার শরীর সেরে উঠুক—

সত্যেন তবুও জবাব দিল না। তার গায়ে যেন পাঁচটা হাতীর বল এসেছে। লক্ষ্মীর কান্না, মিনতি কিছুই তার কানে গেল না, সে পাগল হয়ে গেছে। স্ত্রীকে দুহাতে তুলে সত্যেন ঘরে নিয়ে এল।

ফলাফল রাতারাতিই টের পাওয়া গেল। শেষবারের মতো এক ঝলক রক্ত তুললে সত্যেন। লক্ষ্মীর কাছ থেকে এ জন্মের শেষ পাওনা আদায় করে সে চলে গেল—বিধবা হল লক্ষ্মী।"

ইন্দিরা থামল। নদীর বুকে গাঢ় অমাবস্যার রাত্রি। হু হু করে হাওয়া আসছে। সার্চলাইটের আলো তেমনি চমক ফেলেছে নিশীথের তরঙ্গিত খরধারায়, দু তীরের মর্মরিত সুপারি আর নারিকেলের বীথিতে। বিভাসের মুখ বিরক্তিতে কুঞ্চিত—ইলার মুখে সমবেদনার ম্লান রেখা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইলা বললে, গল্প শেষ হল আপনার?

—না, হল আর কই। এ সব সাধারণ গল্প—প্রতিদিনের সংসারের গল্প। এর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। যেমন করে প্রত্যেকদিনের জীবন চলে, এ গল্পও তেমনি খাওয়া-বসা চলা-ফেরায় এগিয়ে চলতে থাকে। তবু আর একটুখানি বলেই আমি গল্পটা শেষ করব, আপনাদের আর ধৈর্য্যচুতি ঘটাব না।

ইন্দিরা বলতে লাগল : "লক্ষ্মী বিধবা হল। বাঙালির ঘরের শাশুড়ীরা ছেলের শোকে যেভাবে চীৎকার করে কাঁদেন, সত্যেনের মাও তেমনি করে কাঁদতে লাগলেন, তেমনি করেই গাল-মন্দ দিতে লাগলেন অলক্ষণা ছেলের বউকে। বিয়ের একবছরের মধ্যেই যে রাক্ষসী জলজ্যান্ত স্বামীকে এমন করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে, তাঁর সাজানো সংসারে এমন ভাবে আগুন ধরিয়ে সব পুড়িয়ে শেষ করে দিতে পারে, তাকে তিনি যে একবিন্দুও ক্ষমা করতে পারেন না, এর মধ্যে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছুই নেই।

গালাগালি সহ্য করেও লক্ষ্মী পড়ে রইল স্বামীর ভিটে আঁকড়ে ধরেই, দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় বয়ে বাপের বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার প্রবৃত্তি সে বোধ করলে না। দিন কয়েক—দিন কয়েক কেন, মাস কয়েক কাটল একটা বিরাট শোকোচ্ছ্বাসের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে। কোনো ক্ষতিই কারো অপূর্ণ থাকে না—এও রইল না।

এ দিকে সংসারের অবস্থা ক্রমেই অচল হয়ে আসবার উপক্রম করছে। ব্যাঙ্কে পুঁজি যা ছিল, সত্যেনের চিকিৎসাতেই তা শেষ হয়েছে। ঋণের বোঝাও ভারী হয়ে উঠেছে নেহাৎ মন্দ নয়। শ্বশুর যা পেন্সন পান তা নামে মাত্র, ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। দেনার কিস্তি শোধ না করলে শেষ সম্বল বাড়িখানাও চলে যায়—আর বাড়ি বাঁচাতে গেলে মাসের দশদিন পরে উপোস দিতে হয় গুষ্টিসুদ্ধ সকলকে।

লক্ষ্মীর আই-এ পাশ করা বিদ্যাটা কাজে লাগল এতদিনে। পাড়ায় একটা ইস্কুলে ছোট মতন একটুখানি চাকরি সে জোগাড় করে নিলে। কাদায়-আটকে বসা পারিবারিক চাকাটা নড়ে উঠল, চলতে শুরু করলে একটু একটু করে। সংসারে অলক্ষণা বিধবা বউয়ের প্রতি গালিবর্ষণটা কমে এল, তাব মূল্য বাড়ল, এমন কি খানিকটা আদরও জুটল বলা যায়। কোনো কোনো দিন ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখত বুড়ী শাশুড়ী উনুনের আঁচে বসে তার জন্যে খাবার তৈরি করছেন।

দিন কাটছিল, হয়তো এমনি করেই কেটে যেত। লক্ষ্মী ভুলে যেত নিজেকে, শ্বশুর-শাশুড়ী ভুলে যেতেন সংসার থেকে সত্যেনের ক্ষতচিহ্নটাকেও। তারপরে দূর ভবিষ্যতে হয়তো এও দেখা যেত যে একরকম করে নিজের মধ্যেই লক্ষ্মী সুখী হয়ে উঠেছে। জীবনের ধর্মই মানিয়ে চলা, স্বীকার করে নেওয়া—লক্ষ্মীর বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হত না।

কিন্তু যা হত তা হল না। এল রাহু। কর্তব্যপরায়ণ ডাক্তার বিভাস সত্যেনের মৃত্যুর পরেও বাড়িতে তার কর্তব্যকে ভুলতে পারল না।

সত্যেনের জন্যে আর ফলের ঝুড়ির দরকার নেই, কিন্তু শাশুড়ীর জন্যে আছে। বুড়ো বয়সে মিষ্টি খাবার লোভ হয় মানুষের, বিভাস বাক্স বোঝাই করে ভালো ভালো সন্দেশ আমদানি করতে লাগল। বিজয়ার দিনে অকারণে দশ টাকার নোট দিয়ে শ্বশুরকে প্রণাম করে গেল। তিনি আপত্তি করলে বিভাস ম্লানমুখে বললে, আমাকে এমন পর করে দেখছেন কেন? সত্যেন আমার বন্ধু ছিল, তাঁর শূন্য জায়গাতে আমার কি এতটুকু দাবি নেই?

বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে বিভাস। শ্বশুরের চোখে জল এল। তিনি বললেন, না বাবা, একজন গেছে, তার জায়গায় তোমাকে পেয়েছি খানিকটা অন্তত। তোমাকে কি পর ভাবতে পারি কখনো?

কিন্তু সত্যেনের সব শূন্য স্থানেই বিভাস নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করতে লাগল, এমন কি লক্ষ্মীর ক্ষেত্রেও।

শ্বশুর-শাশুড়ী কিছু বুঝতে পারছিলেন কি না তা কে জানে। যদিও বুঝে থাকেন তা হলেও বোধ হয় তখন তাঁদের করবার কিছু ছিল না। দারিদ্র্য আনে অপরিহার্য ক্ষুদ্রতাকে বহন করে—আনে লোভ। আরো বিশেষ করে সে দারিদ্র্য যখন অসহায়—নতুন আশ্বাস আর নতুন উৎসাহে বুক বেঁধে চলবার ক্ষমতা যার নেই, সে চোখ বুজেই কোনো একটা অলম্বনকে আশ্রয় করতে চায়। সেটা দড়ি কিংবা সাপ একটা কিছু হলেই হল—সাময়িক আশ্বাসটাই তার পক্ষে বড় কথা। লক্ষ্মী তখন শোনেনি, পরে জেনেছিল বিভাস শ্বশুরকে নাকি তিনশো টাকা ধার দিয়েছে এবং সে টাকা ফেরৎ পাবার জন্য তার কিছুমাত্রও তাগিদ নেই।

এমন হয়তো হতে পাবে যে এই পরিবারটির উপরে বিভাসের খানিকটা মায়া বসে গিয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন তা থেকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছিল তার লক্ষ্মীর প্রতি লোভ, একটা অপরিসীম লোলুপতা। আচম্‌কা ঘরে ঢুকে বলে বসত, বৌদি অমন করে বসে আছেন কেন? আসুন না, একটু গল্প করি।

খানিকটা পরিমাণে স্বীকার না করেও উপায় ছিল না বিভাসকে। সে এখন এ বাড়িতে ছোট ছেলের মর্যাদা লাভ করেছে, লক্ষ্মীর পরম স্নেহভাজন দেবর। এবং দেবর হিসাবে খানিকটা বাড়াবাড়ির প্রশ্রয় সে নিশ্চয় পেতে পারে, এ সম্পর্কে কোনো অনুযোগ জানাতে গেলে খানিকটা গাল-মন্দই লাভ হবে।

সেদিন রবিবারের ছুটি।

শ্বশুর শাশুড়ী গেছেন গঙ্গাস্নান করতে। ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়িতে ভালুক-নাচ দেখছিল। আর স্নান শেষ করে এসে দোতলায় আয়নার সামনে চুল বাঁধছিল লক্ষ্মী।

এমন সময় আয়নায় ছায়া পড়ল। চোরের মতো নিঃশব্দ পায়ে বিভাস ঘরে চলে এসেছে। বললে, বৌদি!

রাগে লক্ষ্মীর চোখ-মুখ রাঙা হয়ে গেল।

—আপনি এমন ভাবে আমার ঘরে এলেন কেন?

—কেন, আসতে নেই?—বিভাস বেশ আরাম করে লক্ষ্মীর খাটের ওপরে জাঁকিয়ে বসল : সত্যি, যত দিন যাচ্ছে বৌদির রূপ তত বেশি খুলছে, যেন তপঃকৃশা পার্বতী।

অসহ্য ক্রোধে লক্ষ্মী বললে, আপনার স্তুতি আমার দরকার নেই। এমন সময়ে আপনি আমার ঘরে আসবেন না—পাড়ার লোক দেখলে কী ভাববে বলুন তো?

—কী ভাববে?—বিভাসের মুখে শয়তানের হাসি দুলে উঠল : কী ভাববে বলো না লক্ষ্মীটি? সত্যি, লক্ষ্মী নামটা তোমার সার্থক।

লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল—জবাব দিল না।

—সত্যেনের জায়গা এ বাড়িতে আমি পেয়েছি। তার লক্ষ্মীকেই বা পাবো না কেন?—বলতে বলতে বিভাস উঠে দাঁড়াল, তারপর আলগা একটা টান দিয়ে লক্ষ্মীকে একেবারে বুকের ওপরে নিয়ে এল।

মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুল না। পলকের জন্য মনে হল সে যেন মরে গেছে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই একটা প্রবল ধাক্কায় বিভাস ছিটকে দেওয়ালের দিকে চলে গেল, সশব্দে ঠুকে গেল তার মাথাটা।

বিমূঢ় হয়ে বিভাস তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। বড় বড় নিশ্বাস পড়তে লাগল তার। চাপা কঠিন গলায় জবাব দিলে, বেশ।

সেই যে বিভাস লক্ষ্মীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—একমাসের মধ্যে এ বাড়ীতে আর পা দিল না। আর লজ্জায় অপমানে বিছানায় লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল লক্ষ্মী। একথা কাউকে বলবার নয়, কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং বৈধব্যের অপরাধে কলঙ্কের সমস্ত বোঝাটা তারই ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে।

কিন্তু বিভাসেরও দিন আসছিল। এল যথা সময়ে।

পাড়ায় ভয়ঙ্কর হাম হচ্ছে। বাড়িতে ছেলেপিলের হয়েছে, লক্ষ্মীরও হল। যেমন তীব্র জ্বর, তেমনি

তীব্র যন্ত্রণা। তিনটা দিন সে চোখ মেলেও তাকাতে পারল না—দেখতে পেল না তার চারদিকে কী ঘটছে বা না ঘটছে।

সেই সময়ে নিরুপায় শ্বশুর বিভাসকে ডেকে নিয়ে এলেন।

নতুন ডাক্তার, কর্তব্যপরায়ণ। সে ভালো ওষুধই এনে দিল। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন করে নয়, নিজের হাতেই ওষুধ নিয়ে এল। বললে, এইটে মুখে মাখিয়ে দেবেন, হামগুলো তাড়াতাড়ি উঠে যাবে, কোনো স্পট্‌ও থাকবে না।

মুখে ওষুধের তুলি পড়তেই আচ্ছন্ন অচেতন লক্ষ্মী অসহ্য যন্ত্রণায় উঠে বসল। সমস্ত মুখে কে যেন খানিকটা তরল আগুন বুলিয়ে দিয়েছে। আঙুল লাগাতেই সঙ্গে সঙ্গে পোড়া চামড়া উঠে আসতে লাগল, বেরিয়ে পড়ল লাল টকটকে দগদগে ঘা। চিরদিনের মতো বীভৎস ভয়ঙ্কর হয়ে গেল লক্ষ্মী।"

স্টিমারের বাঁশি হঠাৎ উচ্চকিত হয়ে উঠল। সামনে একটা বন্দরের ওপরে সার্চলাইটের দীপ্তি পড়েছে। ইন্দিরা উঠে দাঁড়াল। বললে, এই স্টেশনে আমি নামব। ধন্যবাদ, অনেক আনন্দ পাওয়া গেল আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে।

ইলা ব্যাকুল হয়ে বললে, দাঁড়ান, দাঁড়ান। ঘাটে লাগতে তো আরো কয়েক মিনিট দেরী আছে। তার পরে কী হল বলুন।

সুটকেশটা তুলে নিয়ে ইন্দিরা হাসল : কী আর হবে। বিভাসের নামে কেস করা যেত। কিন্তু প্রমাণ তো করা চাই। ওষুধের শিশিটা যে সে-ই এনে দিয়েছিল কী করে বলা যাবে? তা ছাড়া শ্বশুর শাশুড়ীও কি চাইতেন ঘরের কেলেঙ্কারি নিয়ে খবরের কাগজে টানাটানি হয়? তাঁদের না ছিল টাকা, না ছিল সহায়।

নীচে খালাসীদের চীৎকার : হাফিজ, হাফিজ।—স্টিমার ঘাটে ভিড়েছে, শোনা যাচ্ছে মানুষের কোলাহল। ইন্দিরা বললে, আচ্ছা নমস্কার।

—নমস্কার।

দোতলায় সিঁড়ির মুখে কী ভেবে আবার থেকে দাঁড়ালো ইন্দিরা। মুখ ফিরিয়ে বলিল, হ্যাঁ, আর একটা কথা। লক্ষ্মী শেষ খবর পেয়েছে বিভাসের সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর একটি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে, এই আপনার মতোই অনেকটা।

সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল ইন্দিরা।

বিভাস কাষ্ঠ হাসি হাসল : দেখছ ইলু, কী চমৎকার একটা গল্প বানিয়ে—

কিন্তু ইলা জবাব দিল না। দু চোখে তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের আগুন ছড়িয়ে কেবিনে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাতর বিভাস ডাকতে লাগল : ইলা, শোনো, শোনো—

স্টিমার থেকে নেমে ইন্দিরা হেঁটে চলছে পথ দিয়ে। সত্যিই বানিয়ে বলা গল্প। নিজের সব ভেঙে গেছে বলেই যা কিছু সুন্দর দেখতে পায় তাকেই কি তার ভাঙতে ভালো লাগে? তার মুখখানা পুড়ে গিয়েছিল কোনো ডাক্তারের অ্যাসিডে নয়, নিছক একটা স্টোভ দুর্ঘটনাতেই।

সন্তোষকুমার ঘোষ

স্বয়ম্বরা

জিওগ্রাফির বইয়ের পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল ভাঁজ করা এক টুকরো নীল কাগজ, যার শিরোনামায় লীলার নাম। সারা শরীর জ্বলে গেল, কান দুটো গরম হয়ে উঠল লীলার। অনুপমের চিঠি, সন্দেহ নেই। এই নিয়ে বুঝি তিনবার হল। লোকটার স্পর্ধাও তো কম নয়।

আড়চোখে লীলা একবার তাকিয়ে দেখল, রুবি দেখেছে কিনা। রুবি তখন ভূগোলের অঙ্কে ডুবে গেছে। গ্রীনউইচ শূন্য আর কলকাতা প্রায় নব্বুই। গ্রীনউইচে যখন সকাল সাতটা, কলকাতায় তখন ক'টা লীলাদি?

কেন, তুমি বার করতে পারছ না? লীলা অঙ্কটা ছাত্রীকে আরেকবার বুঝিয়ে দিলে। কিন্তু বোঝাতে গিয়েও ভুল হয়ে যায়, একটা অস্বস্তি কাঁটার মতো মনে বিঁধে আছে। চিঠিটা বাঁহাতের মুঠোতেই রইল। ব্যাগ খুলে রাখবে সে উপায়ও নেই। রুবি ড্যাবডেবে বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। চিঠিটা অবশ্য না পড়েও ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া চলে। লীলা জানে ওতে কী লেখা আছে। দু'-চার ছত্র কবিতা, তাও আবার ভুল কোটেশন। একটা দুটো বানান ভুল। আর "তুমি-আমার-ঘুম-কেড়ে-নিয়েছো" জাতীয় খানিকটা অজ-বিলাপ। অবশ্য অজ শব্দটার অভিধানগত অর্থে। এসব ন্যাকামি তো লীলা কম দেখল না—প্রথম প্রথম মজা পেত, এখন শুধু গা জ্বলে।

দরজার বাইরে পর্দার নিচে দু'খানি পা তখন থেকে ঘুর-ঘুর করছে। খুক-খুক কাশি ঠিক শ্লেষ্মাজনিত নয়—শোনা যাচ্ছে। লোকটা কী ভীরু। মেরুদণ্ড বলে কিছু ওর নেই না কি! সাহস থাকে তো আসুক না। এসে বসুক। এটা তো ওর দিদির বাড়ি। ভাগ্নীকে পড়ানোয় লীলা ফাঁকি দিচ্ছে কি না সেটা লক্ষ করবার অধিকার তো ওর আছেই। আর যেমন চরিত্র তেমনি চেহারা। রোগা টিঙটিঙ করছে, ধাক্কা দিলে বুঝি পড়ে যাবে। নির্ঘাৎ ডিসপেপসিয়ায় ভুগছে। নিষ্প্রভ চোখ দুটির নির্বুদ্ধিতা উঁচু পাওয়ারে লেনস্ দিয়েও ঢাকতে পারেনি। কথা বলতে এলেই কুঁজো হয়ে যায়। যেন কুর্নিশ করছে, কপালের রগটা মাঝে-মাঝে চেপে ধরে, যেন স্বাস্থ্যহীনতাই বাহাদুরি। এই মূঢ়কে কে বোঝাবে দুর্বলতার অভিনয় করে বড় জোর অনুকম্পা কুড়নো চলে, কিন্তু ভালবাসা কেড়ে নিতে হলে চাই সাহস আর বলিষ্ঠতা,—শরীরের এবং চরিত্রের। আধো-আধো বুলি শুনলে মনে একমাত্র মাতৃভাব আসে, তার বেশি কিছু না।

পড়ানো শেষ হল। ব্যাগটা গুছিয়ে লীলা উঠে দাঁড়াল। নিচু হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিলে শাড়ির ড্রেসটা ঠিক আছে কিনা। তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল। এদিক-ওদিক তাকালে একবার কৌতূহলবশেই; তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলে। শেষ ধাপ অবধি পৌঁছেছে, এমন সময় পিছনে খুক-খুক কাশির শব্দ শোনা গেল।

ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছিল। এবার মিহি-মার্জিত গলা কানে এল, শুনছেন।

ঘুরে দাঁড়াল লীলা—কী বলুন।

বেশি দূর নামতে সাহস করেনি অনুপম, গোটা-পাঁচেক ধাপ ওপরে সিঁড়িটা যেখানে ঠেকেছে, সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। কী রোগা আর হলদে! এক ফোঁটা মাংস নেই; এক ফোঁটা নেই রক্ত। একটু কাঁপছেও বুঝি নার্ভাস হয়ে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

—আমার ইয়ে, আমার চিঠিটা পেয়েছেন?

—পেয়েছি। লীলা হেসে ফেলল রকম-সকম দেখে, মাস্টারনী মুখোশটা আর বজায় রইল না।—কিন্তু জিওগ্রাফির বই তো ডাকবাক্স নয়?

প্রশ্রয় পাওয়া জীব-বিশেষের মতো অনুপম কোঁচা দোলাতে দোলাতে নেমে এল আরও তিন-চার

ধাপ। মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে মিটিমিটি হেসে বললে, সব ডাকই কি ডাকবাক্সের মারফত পৌঁছায়, না পাঠানো চলে?

লীলার মুখে একটা কঠিন কথা এসেছিল: প্রেমের শখ আছে অথচ হাতে চিঠি দেবার সাহস নেই?—বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কথাটাকে একটু কোমল করে বললে, হাতে দিতে পারেন না?

অনুপম হয়তো ভাবলে এ-ও প্রশ্রয়। লীলা ওকে তবে উৎসাহ দিচ্ছে। যে দু'ধাপ বাকি ছিল, সে দু'ধাপও নেমে এল। চকচকে গাল দুটো। একটু আগেই কামিয়েছে বুঝি। বেহিসেবি স্নো মেখেছে। নির্মূল-শ্মশ্রু চোয়াল এখন আরও যেন তোবড়ানো। লীলাকে ছুঁতে সাহস করলে না অনুপম। ধরা গলায় শুধু বললে, অভয় দিচ্ছেন?

লীলা ধমক দিলে, সোজা হয়ে দাঁড়ান অনুপমবাবু। আপনার আগের চিঠি দুটোও পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে কোন হৈ চৈ করিনি এই জন্যে যে তা হলে এই ট্যুইশনিটা ছাড়তে হত। আজও করতাম না। কিন্তু আপনি ডাকাডাকি করেই সমস্ত অনর্থ ঘটালেন। গোটাকতক শক্ত কথা বলছি, মনে কিছু করবেন না। আপনার গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে অনুপমবাবু।

—একটু থেমে, শান্ত ঠাণ্ডা গলায় লীলা ফের বলতে শুরু করল, আপনি দিদির বাসায় পরম সুখে আছেন, খেয়ে, গড়িয়ে, সন্ধ্যায় বাঁশি বাজিয়েও হাতে বাড়তি যে সময়টুকু থাকে সেটুকু প্রেম করে কাটাতে চান। ভুলে যান যে আমার কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গরিবের মেয়ে, কোন রকমে পাশ করেছি, দুপুরে ইস্কুলে চাকরি করি। এর ওপরেও যদি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ি-বাড়ি পড়াতে যাই, সেটা প্রেম করতে নয়, প্রেমের কথা শুনতে নয়। সংসারে উপরি কটা টাকা আনতে। আমার ওপর কতজনের ভার জানেন? মা, বাবা, ছোট তিন বোন, নাবালক দু'ভাই। আমাকে ভালবাসেন বলছেন। পারবেন এদের ভার নিতে?

অনুপমের গলা ক্ষীণতর হয়ে এল, একটা চাকরির কথা চলেছে, সেটা ঠিক হলেই—

চিঠিখানা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে লীলা বললে, আগে ঠিক হোক, তারপর এ-সব দেবেন। আরও একটা কথা আপনাকে বলি, এ-সব চিঠিফিটি দেবেন না। কিছু বলার সাহস অর্জন করুন। এই সব আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করা, শুনিয়ে শুনিয়ে গুনগুন্ করে গান গাওয়া, ন্যাকামি-ভর্তি কবিতা কোট্ করে চিঠি পাঠানো, এ-সব ছাড়ুন। এতে মেয়েদের মন পাওয়া যায় না। পড়েননি, বলহীনের কাছে কিছুই লভ্য নয়?

অনুপমের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে লীলা বুঝি ঈষৎ করুণা বোধ করল। কিন্তু প্রয়োজন ছিল এই অপ্রিয় সত্য-ভাষণের, দুঃখ যদি পায় পাক। একটা দুঃখের ভেতর দিয়েও শিক্ষা হোক। এমন ভুল যেন আর না করে, পুরুষ না হয়েও স্ত্রীলোকের প্রণয়-প্রার্থনার মতো ভুল। রাস্তায় এসে লীলা দেখল এরই মধ্যে বেশ বেলা হয়েছে। যখন পড়াতে এসেছিল তখন সকালের চোর-রোদ পা টিপে টিপে পাশের উঁচু বাড়িটার ছাদ থেকে এ বাড়ির ছাদে সবে লাফিয়ে পড়েছে। তারপর এতক্ষণ ধরে কেবল গড়িয়ে নেমেছে, আর ছড়িয়ে পড়েছে। জানালার পর্দায়, কম্পাউণ্ডের করবী আর কৃষ্ণচূড়ার পাতায়, শিশির-ভেজা ঘাসের শীষে শীষে। কব্জির ক্ষুদ্রাকৃতি ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে আটটা। ইস্কুলের সময় প্রায় হয়ে এল। বাসায় ফিরে সবে পোশাকি জামা-কাপড় বদলাবার উপক্রম করছিল, মা বললেন, বাইরের ঘরে তোর জন্যে কে বসে আছে।

আমার জন্যে? লীলা বিস্মিত হল। কে আবার এসেছে এত সকালে। অনুতপ্ত অনুপমই আবার আসেনি তো! কিন্তু এত শীগ্গির পৌঁছাবেই বা কী করে। তেল মাখবে বলে খোঁপাটা খুলে ফেলেছিল, আবার আলাদা করে চুলগুলো গ্রন্থিবদ্ধ করতে হল। কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই চিরুণি বুলিয়ে নিলে কপাল আর কানের কাছে।

বাইরের ঘরে এসে যাকে দেখল, তাতে মনে হল এতসবের প্রয়োজন ছিল না। নিতান্তই একজন

ক্যানভাসার। এর আগেও দু'একবার এসেছে লীলার কাছে। নিব, কলম, পেন্সিল, চক, ব্লটিং আর কাগজের ব্যবসা করে লোকটা। তাছাড়া ওর বুঝি নিজেরই কী একটা কালি আছে। লীলাদের ইস্কুলের কনট্রাকটা নেবে বলে ওকে এসে ধরেছে। লীলারই এক সহপাঠিনীর কিরকম আত্মীয় হয় বুঝি। প্রথম দিন তার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছিল।

ডান হাতের কনুইটা টেবিলের ওপর। বাঁ হাতটা নিচে ঝোলানো লোকটাকে কুণ্ঠিত, জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকতে দেখে লীলার মায়া হল।

নমস্কার। লীলাকে ঢুকতে দেখে লোকটা উঠে দাঁড়াল।

নমস্কার। গম্ভীর কণ্ঠে লীলা বললে মাস্টারনী মানান গলায়, যেন চিনতে পারেনি এমন ভাব করলে।

আমি মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্সকে রিপ্রেজেন্ট করছি। স্মরজিৎ মিত্র।

ব্যাগ খুলে কার্ড বার করে দিলে লীলাকে। এর আগেও তো আমি এসেছি!

কথা বলছে না তো খই ভাসছে। এই ক্যানভাসার জাতীয় লোকগুলো এমন চালিয়াৎ হয়! ফিরিস তো বাবা পেনসিল-কাঁচি-ছুরি-ফিরি, অথচ পোশাকের ঘটা দেখে মনে হবে একটা প্রিন্স কিংবা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাগনেট হবে বুঝি। টুপি-ট্রাউজার-শার্ট-কোট-কলারের ষোড়শোপচার আয়োজন আছে ঠিক।

লীলাব অনুমতি নিয়ে লোকটা সিগারেট ধরালে একটা ; আগুনটা ধরালে এক আশ্চর্য কৌশলে, শুধু মাত্র ডান হাতে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, নাউ টু বিজনেস। আমি ফেয়ার ফিল্ড চাই, ফেভার নয়। আমার স্টেশনারি জিনিসগুলোর স্যাম্পল্ আপনার কাছে দিয়ে যাই। বাজারের আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। জানেন মিস্ সোম, আমি ডিজঅনেস্টিতে বিশ্বাস করি না। এই যে ফার্মটা গড়ে তুলেছি, মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স—এটা আমারই এণ্টারপ্রাইজে তৈরি। ক্যাপিটাল সামান্য যা কিছু তাও আমার।

একবার কইতে শুরু করলে থামতে চায় না। গলার স্বরও কী আশ্চর্য ভারি লোকটার, অল্প অল্প ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। কথা বলতে বলতে টেবিলে একটা চাপড় মেরেছিল, আস্তেই অবশ্য তবু টেবিলটা যেন এখনও থর থর করে কাঁপছে। কী মোটা মোটা আঙুল- বাহুমূল, কব্জি আর কনুইয়ের বেড়-এ বোধ হল কোন তফাত নেই। বেলা হয়ে যাচ্ছিল। লীলা বললে, 'আমাব বাসায় এসে তো সুবিধে হবে না। এ-সব ব্যাপার হেড মিসট্রেসের হাতে। ইস্কুলে আসবেন। ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

—আশা দিচ্ছেন?

—চেষ্টা করে দেখতে পারি। লীলা সংক্ষেপে বললে।

স্মরজিৎ মিত্র উঠে দাঁড়াল। কড়কড়ে ইস্ত্রি পুরো-হাতা শার্ট বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে ট্রাউজারের পকেটে। চকচকে নতুন পয়সার মতো তামাটে মুখ। স্বাস্থ্য এতটা উজ্জ্বল না হলে কালোই বলা যেত।

—একদিন তবে আপনার স্কুলে যাচ্ছি। শেষবারের মতো মাথাটা নুইয়ে নমস্কার করে স্মরজিৎ চলে গেল। চৌকাঠ পেরিয়ে নামল রাস্তায়। তারপর ফিরে একবার বাড়িটাকে দেখে নিয়ে আবার সোজা এগিয়ে গেল। লোকটা পা ফেলছে জোরে জোরে, দূরে-দূরে। ওর চলায় ফেরায় কথায়, এমন কি উঠে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, সিগারেট ধরানোয়, কোথায় একটা অস্বাভাবিকতা আছে, চোখে সেটা বেঁধে, কিন্তু বোঝা যায় না, কেন?

পরদিন সকালে যখন ছাত্রী পড়াতে গেল, তখন লীলা ঈষৎ অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল। কালকেব সকালের বিশ্রী ঘটাটা ভুলতে পারেনি। অনুপম আজ আর চিঠি দিতে সাহস করবে না ঠিক, কিন্তু কে জানে হয়তো ওর দিদিকে কিছু বলে থাকবে। ও সব প্যানপেনে ছেলেদের অসাধ্য কিছু নেই। নিজেব কীর্তিকাহিনী চেপে গিয়ে হয়তো দিদিকে বলেছে মাস্টারনী ওকে অবোধ মেষশিশু পেয়ে ঘাড় মটকানোর মতলবে ছিল ইত্যাদি। ছাত্রীর মাও কি ভাইয়ের কথা অবিশ্বাস করতে পারবেন, লীলাকে

হয়তো ছাড়িয়ে দেবেন। নতুন টিচার আসবে রুবির জন্যে। আবার দিনকতক তাকেও চিঠি লেখালেখি করবে অনুপম (পুরনো চিঠিগুলোর নকল রেখে দিয়ে থাকে যদি। তাহলে তো কোন মেহনতই নেই), তারপর? হয়তো বা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নতুন টিচারটা পটেও যেতে পারে বা। সিঁড়ির মুখেই দেখা হল অনুপমের সঙ্গে। মুখোমুখি পড়ে গিয়ে বুকটা একবার কেঁপে গেল লীলার। আজ আবার কী হয় কে জানে। কিন্তু অনুপম ওকে দেখে গম্ভীর মুখে একপাশে সরে দাঁড়াল, কোন কথা বললে না। লীলা খানিকটা স্বস্তি পেল। এরপরে আরও দু'তিন দিন অনুপমের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আরও যেন হলদে হয়ে যাচ্ছে অনুপম। এ ক'দিনে চোয়াল যেন আরো চুপসে গেছে। ভেবেছিল, অনুপম ওকে কিছু বলবে ; কিন্তু লক্ষ করল, ওকে দেখলেই অনুপম গম্ভীর মুখে সরে যায়, স্পষ্ট বোঝা যায় এড়াতে চায়। ক'দিন পরে অনুপমকে আর দেখতেই পেল না। একদিন দু'দিন তিনদিন কেটে গেল। শেষে লীলাই একদিন কৌতূহলী হয়ে ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মামাকে যে দেখছিনে।

রুবি বললে, ও মা, জানেন না বুঝি। মামা এখান থেকে চলে গেছে।

—চলে গেছে? কোথায়?

—কানপুরে। আমার এক মাসিমার কাছে। সেখানেই এক ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছে, শুনেছি।

লীলা বললে, ও!

জানালার বাইরে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্কও হয়ে গেল। নিছক চাকরির জন্যেই লোকটা কানপুর গেছে এ কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। আঘাতটা ভুলতেই গেছে। কেবলমাত্র তার জন্যেই একটা লোক দেশান্তরী হয়েছে। কথাটা ভেবে লীলার মন খারাপ হয়ে গেল।

বিজনেস করছে অথচ লোকটার সামান্য কাণ্ডজ্ঞানও নেই। এসেছে যখন শেষ ঘণ্টাটিও বেজে গেছে। চক-মাখা হাত ধুয়ে লীলা ছাতা আর বই হাতে নিয়ে তৈরি হয়েছে বাড়ি যাবে বলে। এমন সময় বেয়ারা নিয়ে এল ভিজিটিং কার্ড। এ কার্ড লীলার ব্যাগের মধ্যে আরও খান-দুই আছে। মিত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স, রিপ্রেজেণ্টড বাই এস. মিত্র। পরিষ্কার স্বাক্ষর করেছে : এম-আই-টি আর-এ। ইঙ্গবঙ্গীয় মিটার হয়নি, এই ঢের। নিচে নেমে এসে লীলা ধমকের সুরে বললে, আচ্ছা, এই বুদ্ধি নিয়ে আপনি ব্যবসা করবেন?

তাতে কী হয়েছে? ঈষৎ স্মিত, কতকটা অপ্রতিভ মুখে স্মরজিৎ উঠে দাঁড়াল। আরেক দিন না হয় আসব!

পাশাপাশি গেল, রাস্তা অবধি এল ওরা। লীলা বললে, বিবেচনার অভাবে আজ আপনার শুধু পরিশ্রমই সার হল!

শুধু পরিশ্রমই নয়। স্মরজিৎ একটু হেসে বললে, পারিশ্রমিকও কিছু তো পেলাম, পাইনি?

লীলা সামান্য চমকে উঠল। সহজ, স্বাভাবিক গলায় একেবারে সোজাসুজি কথা বলছে লোকটা। বাঁকা গলি-খুঁজি চেনে না। ট্রাউজারের পকেটে বাঁ হাত রেখে পাশাপাশি সটান হেঁটে যাচ্ছে। কোথাও কুণ্ঠা নেই। সেদিন মনে হয়েছিল, আজও মনে হল, লোকটার সপ্রতিভতা আছে। কিন্তু সেটা যেন অতিপ্রকট।

আপনি কোনদিকে যাবেন? জিজ্ঞাসা করলে স্মরিজৎ।

—বাসায়। আপনি?

—ঠিক নেই।

লীলা বললে, আচ্ছা, তাহলে চলি।

—চলবেন? লোকটা এক মুহূর্ত যেন ইতস্তত করল, তারপর বললে, চলুন তবে। আমিও এদিকেই যাব।

কিছু বলাও যায় না। রাস্তা তার একার নয়। তবু পাশাপাশি হেঁটে যেতে লীলা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। ট্রামে-বাসেও এ সময় বড় ভীড। একটা রিকশা দেখে লীলা এক মুহূর্ত দাঁড়াল। কিন্তু স্মরজিৎও দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

—রিকশা করবেন? উঠুন না। অনেকখানি তো পথ।

—না, না। কুণ্ঠিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল লীলা। প্রায় চীৎকারের মতো শোনাল, এক রিকশায় ওঠার চেয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়া ভাল। খানিকটা গিয়ে স্মরজিৎ প্রস্তাব করল, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, কী বলেন? সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।

একবার রিকশায় ওঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। চা খেতে অস্বীকার করবার শক্তি লীলার ছিল না। এই লোকটার না-বুঝ আবদারের মধ্যেও কোথায় যেন একটা দুর্নিবার দাবি আছে, প্রশ্রয় না দিয়েও উপায় নেই। নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে; পাশাপাশি চলেছে, একে ফেরাতে হলেও কিছু দিয়ে তবে ফেরাতে হয়।

চা খেতে খেতে স্মরজিৎ ওর জীবনের কাহিনী শোনালে। চমকপ্রদ কিছু নয়, প্রায় সবটাই মামুলি। লেখা-পড়া বেশিদূর হয়নি। মা-বাবাকে ছোটবেলাই হারিয়েছে। মামা-বাড়ি থেকে কোন রকমে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। আর বেশিদূর পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তবু কলকাতা পালিয়ে এসেছিল, এক বস্ত্রে ছ-আনা সম্বল করে। পড়াশুনার সুবিধে কিছু করতে পারেনি। কিন্তু ভাগ্যক্রমে চাকরি পেয়েছিল। আর সে কত রকমের চাকরি। মুদি-দোকানে, শুধু খোরাকি আর দু'টাকা পেত। সেই থেকে এক দপ্তরিখানায়,—দপ্তরিখানা থেকে বইয়ের দোকানে, বইয়ের দোকান থেকে—

লীলার মুখের দিকে চেয়ে স্মরজিৎ বললে, থাক এত কথা শোনবার আপনার ধৈর্য থাকবে না। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ফস্ করে ধরালে, এবং লীলা লক্ষ করল, সেই আশ্চর্য উপায়ে ডান হাতে।

স্মরজিৎ ফের বলতে শুরু করলে, এটুকু জেনে রাখুন, দিন কতক এক রেলওয়ে লেভেল ক্রশিং-এর গুমটি ঘরেও কাজ করেছি—সেখানেই বাঁ-হাতটা কাটা যায়।

—কাটা যায়? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল লীলা।

—কাটা যায়। প্যাণ্টের পকেট থেকে হাতটা বার করে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে টেবিলের ওপর রাখল স্মরজিৎ। কনুই থেকে কব্জি অবধি একখানা কাঠ শুধু, তারপর ইস্পাতের পাঁচটা আঙুল তীক্ষ্ণভাবে এগিয়ে এসে যেন দৃষ্টি বিদ্ধ করছে।

লীলা শিউরে উঠল একবার, এবং সেটা স্মরজিতের কাছে গোপন রইল না।

—ভয় পেলেন? অস্তিনটা আবার টেনে দিয়ে হাতটা পকেটে পুরে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করলে।

লীলা অপ্রতিভ ভাবে বললে, না। তারপরে বলুন।

এতক্ষণে বুঝি বোঝা যাচ্ছে লোকটাকে। এর একটা অঙ্গ নেই, সেইটে ঢাকতেই একটা স্মার্টনেসের অভিনয় করতে হয়, চটপটে ভাব দেখাতে হয়। এমন যে স্বাস্থ্য, শার্টের নিচে স্ফুরিত পেশীর ইঙ্গিত, সব কেমন মেকি মনে হয় লীলার। ওর চোখ দুটির তীব্র ঔজ্জ্বল্যের নিচেও একটা দৈন্য লুকানো। যা মুগ্ধও করে, করুণাও আনে।

রাস্তায় নেমে স্মরজিৎ বললে, এখনও আমার সংগ্রাম শেষ হয়নি। ভাল করে দাঁড়াতেই পারছি না। বাজার খারাপ। আমার স্টক কম, খুচরো কারবার, আমার কোটেশনও একটু চড়াই হয়, বড় বড় ব্যবসাদারদের মতো কম মার্জিনে তো ছাড়তে পারি না। আর আমাদের দেশে দেশ-প্রীতি সব মুখে মুখে, বিলিতি জিনিস পেলে কেউ দেশি জিনিস ছোঁয় না। তবে হাল ছাড়িনি। দমদমের ওদিকে একটা বাসা নিয়ে আছি। কালিটা আমার নিজের। তাছাড়া ছোটখাটো দু'একটা টয়লেটের উপচারের ফরমুলা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছি। এ থেকে বড় একটা পারফিউমারি আমি গড়ে তুলবই। আপনারাও রইলেন, দেখবেন একটু আধটু।

লীলা প্রতিশ্রুতি দিলে, দেখবে।

ওর বাসার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। স্মরজিৎ বললে, চলি তাহলে নমস্কার। শীগগিরই একদিন আপনার ইস্কুলে যাব।

—নমস্কার, বললে লীলা। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল পিছন ফিরে। সেই উদ্ধত চলার ভঙ্গি। পকেটে একটা হাত ঢোকানো। কিন্তু সে রকম বিসদৃশ মনে হল না। একটা হাত নিয়েই অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝছে

লোকটা, ভাবতেও ভাল লাগল। আঘাত আছে, কিন্তু পরাজয় নেই। ভিক্ষা নেই, তবু প্রাপ্য আদায়ের প্রতিশ্রুতি আছে। আবার দীর্ঘ পদক্ষেপে শুধু দৃঢ়তাই নেই, একটু কাঁপা কাঁপা অসহায়তাও আছে যেন। হয় লোকটাকে ভাল লাগবে না, ওর আলাপচারিতাকে যেচে এসে ভাব করার মতো মনে হবে, নয়তো ওর সবটুকু ভাল লাগবে,—চলা-ফেরা-আলাপ এমন কি প্যান্টের পকেটে লুকানো হাত নিয়ে অখণ্ড যে মানুষ তাকে।

হেড মিসট্রেসকে আগেই বলে রেখেছিল, স্মরজিৎ নিজেও এরপর একদিন এসে আলাপ করে গেল। কিছু কিছু জিনিস হেডমিস্ট্রেস সেদিনই নিলেন, প্রায় কুড়ি টাকার মতো। এছাড়া মাসে প্রায় টাকা পঞ্চাশের মতো জিনিস নিতে পারবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। সামনেই টার্মিনাল পরীক্ষা। সে জন্যে খাতার কাগজও চাই।

সেদিন খুব খুশি-খুশি দেখাল স্মরজিৎকে। রাস্তায় এসে লীলাকে বললে, আমার সত্যি খুব উপকার করেছেন।

কুণ্ঠিত হয়ে লীলা বললে, এ আর কী। এতে আপনার কতই বা থাকবে।

স্মরজিৎ বললে, দশ পার্সেণ্টের ওপর, তাছাড়া কালিটা আমার, ওটাতে তো ফিফটি পার্সেণ্ট। অবশ্য টাকার অঙ্কই শুধু নয়—আবার উচ্ছ্বাসের মুখে কি বলে বসে ঠিক নেই, লীলা তাড়াতাড়ি বললে, আর বেশি দূর যাব না, টিফিনের পর আমার আবাব ক্লাশ আছে।—

এই পার্কটায় তবে একটু বসি চলুন।

দুপুরের দিকে পার্কটা এমনিই নির্জন। এক কোণে কতগুলো লোক তাস খেলছে। চিনেবাদামওয়ালা ঝিমুচ্ছে এক কোণে, চাকরির জন্যে হাঁটাহাঁটি করে হয়রান দু'চারজন ছায়ার নিচে বেঞ্চের ওপর ঘুমিয়ে। যত্ন করে লাগানো সিজনফ্লাওয়ারগুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। সকালে রোদ্দুর ওদের ফুটিয়েছিল, রোদ্দুরই, এখন সব রস টেনে নিচ্ছে।

ঘাসের ওপরে বসল দু'জনে। খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। স্মরজিৎ একটু পরে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বাক্স বার করে বললে, হাত পাতুন। কঠিন হয়ে উঠছিল লীলার মুখ। বলল, এ আবার কী?

—খুলেই দেখুন না।

স্পর্ধার সীমা নেই। কী উপহার এনেছে, দেখো৷ ছোট শিশিতে এসেন্স, একটা কৌটায় স্নো কিংবা ক্রিম হবে বুঝি। যেমন রুচি, তেমনি সাহস!

—কিনে এনেছেন তো?

স্মরজিৎ বললে, কিনে আনিনি। আমার নিজের হাতের তৈরি সেদিন আপনাকে বলেছিলুম না ফরমুলার কথা? তাই থেকে এই হয়েছে। প্রথম তৈরি জিনিস আপনাকেই দিলাম দুটো। কিছু অন্যায় হয়েছে?

অন্যায়? খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল লীলার মুখ। আপনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন. সত্যি? কৌটা খুলে নাকের কাছে এনে প্রাণ ভরে টেনে নিলে গন্ধ।—তবে এবার আপনার ফার্ম পুরোদস্তুর পারফিউমারি হয়ে গেল।

—হলই তো। উৎসাহ পেয়ে স্মরজিতেরও মুখ খুলে গেল। অবিশ্যি বাজারে চালাতে এখন কিছু বেগ পেতে হবে। বিজ্ঞাপন ইত্যাদির খরচাও কম নয়। আপনি অবিশ্যি আপনার চেনা-শোনা. মেয়ে-মহলে বলে দিতে পারেন—

—পারবই তো। বললে লীলা।

—আমার আরও ইচ্ছে আছে, সমরজিৎ বলে গেল। একটা সুগন্ধি তেলের ফরমুলাও পেয়েছি। এ ছাড়া পাউডার আলতা এমন কি সাবান পর্যন্ত...আমাব স্বপ্নের কূল-কিনারা নেই লীলা দেবী।

তারপর লীলাব মুখের দিকে চেয়ে বলল, যাবেন একদিন আমার বাসায়, নিজে চোখে দেখে আসতে পারতেন সব, আমার ল্যাবরেটরি। সামান্যই আয়োজন, কিন্তু একটা বৃহৎ পরিণতির সূচনা দেখতে পেতেন।

আপনার বাসায়, বিস্মিত ভীরু-ভীরু গলায় লীলা জিজ্ঞাসা করল, আর কে আছেন? প্রশ্নটা নিজের কানেই অর্থহীন, অতি সাবধানী, বোকা-বোকা শোনাল।

আমার এক পিসিমা আছেন, বললে স্মরজিৎ। তারপর লীলার মুখের দিকে চেয়ে ওর প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বলল,—ভয় নেই, স্ত্রী-ভূমিকাবর্জিত বাড়িতে আপনাকে নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ করব, এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন এখনও হইনি—

লজ্জিত হয়ে লীলা বললে, সে জন্যে নয়, সে কথা ভেবে বলিনি। আমার আবার রবিবার ছাড়া ছুটি নেই কিনা, অন্যদিন টিউশনি, দুপুরে স্কুল—

বেশ তবে রবিবারেই যাবেন, বললে স্মরজিৎ।

লীলা সম্মতি দিল, কিন্তু রবিবার মানে যে একেবারে পরের রবিবার, তখন বুঝতে পারেনি।

খেয়ে উঠে একটু গড়িয়ে নেবে ভেবেছিল, ঠিক এমন সময় স্মরজিৎ এসে হাজির।

—চলুন।

—বাঃ রে, কোথায়?

—মানে নেই? আজ আমার ওখানে যাবেন কথা দিয়েছিলেন।

—দিয়েছিলাম বুঝি? কী আশ্চর্য দেখুন, লীলা বললে, একেবারে মনে নেই। যেতেই হবে?

জিজ্ঞাসা করে স্মরজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল, এ প্রশ্ন একেবারে নিরর্থক, যেতে হবেই, এসেছে যখন।

—একটু বসুন, তৈরি হয়ে নিই।

তৈরি হতে সেদিন সময় লীলার কিছু বেশিই লাগল। ঘণ্টাখানেক আগেই স্নান করেছে তবু আরেকবার সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হল। পোশাকের বাহুল্য কোনদিনই ছিল না, না ছিল শখ, না সামর্থ্য। আজ মনে হল বাইরে বেরুবার উপযোগী জামা-কাপড় আর দু'একটা বেশি থাকলে কিছু ক্ষতি হত না।

শ্যামবাজারে বাস বদল করতে হল। পেরিয়ে গেল বেলগাছিয়ার পুল, তারপর যশোর রোড। মসৃণ পথ। শহরতলির এ-দিকটাতে লীলা কখনও আসেনি। কয়েকটা বড় বড় কারখানা পেরিয়ে এরোড্রোম, তারপর থেকেই গ্রামের ছোপ লাগল। রাস্তার দুপাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু শিরীষ, বট, অশত্থ। ক্বচিৎ কৃষ্ণচূড়া। ঝাউ আর দেবদারু। ঝাঁকড়া চুল গ্রামীণের মতো পলাশ। লাল আর সবুজ, মাঝখান দিয়ে পথ, গির্জার খিলানোর মতো। দু'ধারের মাঠের মাঝে-মাঝে অসম্পূর্ণ ইঁটের পাঁজা।

—এসে গেছি। আসুন নামি।

স্মরজিতের কথায় চমক ভাঙল।

—এখানেই?

—আবার কত দূরে, বারাসাত যেতে চান না কি?

যশোর রোড থেকে ছোট একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে এসে মাঠের রাস্তা। আপনার হয়তো চলতে অসুবিধে হবে, স্মরজিৎ বলল।

—কিছু মাত্র না। আমার বেশ ভালই লাগছে।

কানের পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ হাওয়া। প্রান্তরের একটা নিজস্ব সুর আছে, লীলা ভাবলে। এটা বুঝি নিয়ত প্রবহমান হাওয়া যা কখনও ফুরোয় না। দূরের গাছগুলোর একটা পাতাও নড়ছে না, তবু কানের কাছে এই গুন্-গুন্ আসে কোথা থেকে।

খানিকটা এগোতেই আবার লোকালয় পড়ল। শহরের সঙ্গে এর তফাত সহজেই চোখে পড়ে। শহরের বাড়িগুলো একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠেছে। কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে। আর এখানে এক একটি জায়গায় কতগুলো কুঁড়ে ঘর একসঙ্গে জড়ো-সড়ো হয়ে আছে একে অপরের ওপর ভর করে। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্ধকার। নিজের পায়ের শব্দে নিজেরই চমক লাগে। আম-জাম-আমলকী-কামরাঙা আর জামরুল। পাতায় পাতায় পাখির কলস্বর।

—আমার বাসা। একটু দেখে আসবেন। বাঁশের মাচাটা বড় দোলে। এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিল। এবার লীলা ফিরে এল বাস্তবে।

খানতিনেক ছোট বড় ঘর। একটার দাওয়া পাকা, বাকি দুটোই কাঁচা। জানালা বন্ধ থাকায় ঘরটা স্যাঁতসেঁতে লাগছিল, স্মরজিৎ খুলে দিল। তারপর ডাকল, 'পিসিমা, পিসিমা।'

পিসিমা আসতেই লীলা খানিকটা ইতস্তত করে প্রণামই করল। স্মরজিৎ বললে, আপনারা গল্প করুন বসে। আমি হাত মুখ ধুয়ে আসছি।

পিসিমা বললেন, তোমার কথা আমি ওর কাছে অনেকবার শুনেছি। তুমি ওর জন্য অনেক করেছ।

লীলা কুণ্ঠিত হয়ে প্রতিবাদ করলে। স্মরজিৎ ফিরে এসে বললে, আসুন আমার ল্যাবরেটরি দেখবেন।

গোটা কতক কাচের নল, খালি শিশি আর ছোট বড় বোতলে মিলিয়ে ডজন কয়েক, এরই নাম স্মরজিৎ দিয়েছে ল্যাবরেটরি? মুহূর্তে লীলার সব উৎসাহ যেন নিবে গেল। একে ভিত্তি করে উঠে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দুরাশা ছাড়া কী! চেয়ে দেখল, আশা-দীপ্ত চোখে স্মরজিৎ তার দিকেই তাকিয়ে। লজ্জিত হয়ে পড়ল লীলা। বললে, বাঃ বেশ তো।

আর অমনি খুশি হয়ে উঠল স্মরজিৎ। আপনি এনকারেজ করছেন? অনর্গল কথা বলে গেল। দু'একটা প্রিপারেশনের তাৎপর্যও বুঝিয়ে দিলে সংক্ষেপে। আপনার মনে হয় না এর পসিবিলিটি প্রচুর। আরও যখন বড় হবে, তখন একটা কারখানা করব। সামনের এই জমি এবং জলাটা কিনে নেব।

ভিজে মাটির গন্ধ লাগছে নাকে। শীতের বেলা গড়িয়ে এল। ঘরখানা অন্ধকার প্রায়। একটা হাত ঘুরিয়ে স্মরজিৎ বিশদ ব্যাখ্যা করছে, কাটা হাতটা অসতর্কভাবে ঝুলছে এখন। আর স্মরজিতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা চোখ দুটো চুরুটের আগুনের মতো জ্বলছে।

হঠাৎ কেমন শিউরে উঠল লীলা। শরীরটা ছমছম করে উঠল, বললে, চলুন যাই।

—এখুনি যাবেন? স্মরজিৎ একটু যেন দমে গেল।

—চলুন তবে।

পিসিমা ইতিমধ্যে চা তৈরি করেছিলেন। খেয়ে আর লীলা বসল না।—এসো মাঝে মাঝে। পিসিমা এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, তাঁর কণ্ঠে অনুনয়ের সঙ্গে কাতরতাও শোনা গেল, অন্তত তাই মনে হল লীলার।

—আসব, লীলা বললে। যদিও সে ইতিমধ্যেই স্থির করেছিল, আর কোনদিন আসবে না। পিসিমার কণ্ঠের ব্যাকুল কাতরতা থেকে সহজেই অনুমান হয় স্মরজিতের আত্মীয়-বন্ধু বেশি নেই। নির্বান্ধব পুরীতে পিসিমা আছেন একলাই, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। লীলাই হয়তো এ-বাড়িতে প্রথম অতিথি।

সেদিন বাড়ি ফিরে পোশাক বদলাতে বদলাতে লীলা নিজেকে প্রশ্ন করেছিল, তার এই আকস্মিক আশাভঙ্গের হেতুটা কী? কী দেখবে বলে আশা করে গিয়েছিল, কী দেখতে পায়নি। সন্দেহ নেই, দূর থেকে স্মরজিতের বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ওর মনে সামান্য একটু অনুভূতি এনে দিয়েছিল। এই লোকটি অদৃষ্টের সঙ্গে এক হাতে পাঞ্জা কষছে, চিত্রটি সম্ভ্রম এনেছিল মনে, সেই সম্ভ্রম থেকে এসেছে কৌতূহল। যাকে খেয়ালও বলা যায়। কিন্তু কাছে এসে বিকলাঙ্গ জীবনের স্বরূপ দেখে বুঝি স্তম্ভিত হয়ে গেছে। দূর থেকে মনে হয়েছিল, ফিকে রঙিন, কাছে গিয়ে দেখল রক্তের মতো গাঢ় লাল। সভয়ে পিছিয়ে এসেছে, পালিয়ে বেঁচেছে। খসে খসে পড়া মাটির দেয়াল, স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি, সমস্ত উঠোন ভরে হাঁস মুর্গি পায়রার যদৃচ্ছ বিচরণ দূর থেকে বাহবা দেওয়া চলে, কাছে এসে অংশীদার হওয়া চলে না।

চা ঢালতে ঢালতে পিসিমা গল্প করছিলেন, ওঁকে বেরুতে হয় স্মরজিতের তৈরি জিনিস নিয়ে।—বুড়ো মানুষ পেরে উঠিনে। একটুকুতে হাঁপিয়ে পড়ি। আমার কাছ থেকে কেউ জিনিস কিনতেও চায় না—আক্ষেপ করে বলেছিলেন।

শুনতে শুনতে ঠোঁটের কাছে চায়ের বাটি বিষিয়ে উঠেছিল। পিসিমা বুড়ো মানুষ, ক্যানভাসার হিসাবে অযোগ্য ; তাই কি স্মরজিৎ ওকে এখানে এনেছে? ওকেও তার বণিকবৃত্তির জোয়ালে জুড়ে দিতে চায় বুঝি, সন্দেহ এসেছিল মনে।

চলে আসবার আগেও স্মরজিৎ বলেছে, এখুনি যাবেন? বাড়ির পেছনে একটা পোলট্রি করেছি, দেখে যাবেন না?

—না।

—আর ছোট একটা বাগানও করেছি, এ থেকে পরে হয়তো নার্সারি চলতে পারে একটা। তবে একলা মানুষ। স্মরজিৎ হেসে বলেছিল, তাতে আবার মোটে একটা হাত, সব পেরে উঠিনে।

'তাই বুঝি আমাকে এনেছেন,' রূঢ় এই প্রশ্নটা এসেছিল জিহ্বাগ্রে, কিন্তু লীলা নিজেকে সংবরণ করেছে।

মনে মনে স্থির করলে লীলা, আর কখনও দমদমে যাবে না। কি কাজ স্মরজিতের সঙ্গে এত মাখামাখির, কত দিনেরই বা চেনা। কালি, নিব, পেনসিল বিক্রি করতে এসেছিল, লীলার সাহায্য চেয়েছিল, সে সাহায্য তো লীলা যথাসাধ্য করেছে। এর চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা মারাত্মক হবে। প্রথমত লীলা কাউকে বিয়েই করবে না,—মা-বাবা-ভাই-বোনের এই গোটা সংসারটার বোঝা তার ঘাড়ে। বিয়ে যদি কখনও করতেই হয় তবে এমন কাউকে করবে, সে সঙ্গতিপন্ন, অন্তত এই সংসারটার দায়িত্বও নিতে পারবে। স্মরজিৎ নিজেই টলমল করছে—

চিন্তার রাশ টেনে দিলে লীলা। এসব কথা ভাবছে কেন। স্মরজিৎ তো কখনও আভাসও দেয়নি। লীলার কাছে সহানুভূতি পেয়েছিল। হয়তো জীবনের প্রথম সহানুভূতি। তাই উৎসাহ নিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় গেছে; হয়তো আর কোনও কথা স্মরজিৎ নিজেই ভাবেনি। আর এমন পাগলের দুরাশা কি স্মরজিতের হবে।

ঠিক দু'দিন পরে স্কুলে ঢোকবার সময় গেটের সম্মুখে স্মরজিৎকে পায়চারি করতে দেখে লীলা জ্বলে উঠল। বাঁ হাতটা পকেটে, ডান হাতে ব্যাগ, ঠোঁটে সিগারেট, কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুরছে দেখে। মেয়ে স্কুলের সামনে, কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে। নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে।

—আজ আবার এসেছেন কেন? সামনে গিয়ে রূঢ় কণ্ঠেই লীলা জিজ্ঞাসা করল,—আপনাকে তো হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, আর কী চাই?

বিস্ময়ে অপমানে একেবারে সাদা হয়ে গেল স্মরজিতের মুখ, আর?

একটু নীরস কণ্ঠে বলল, আর কিছু চাই না। আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সেদিনকার পেমেণ্টটা এখনও কিছু বাকি আছে। আরও কী কী কঠিন কথা বলবে বলে লীলা স্থির করে রেখেছিল, কিন্তু পেমেন্টের কথা শুনে যেন একটু চমকে গেল। পেমেণ্ট? শুধু টাকা চাইতেই লোকটা এসেছে নাকি। আসুন, বলে স্মরজিৎকে নিয়ে গেল একাউন্টেন্টের কাছে। লিখিয়ে দিল চেক।

চেকটা নিয়ে স্মরজিৎ আর দাঁড়াল না। শুধু একটা নমস্কার মাত্র করে রাস্তায় গিয়ে নামল। একটু এগিয়ে স্টপেজের ধারে ট্রামের অপেক্ষা করতে লাগল। ট্রাম এল প্রায় বোঝাই হয়ে। স্টপেজে দাঁড়াল কি দাঁড়াল না। ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল স্মরজিৎ, লীলার মনে হল পড়ে যাচ্ছিল, হাতল ধরে কোনও রকমে সামলে নিল। আহা, একখানা মোটে হাত।

একটু আগেই অভদ্র ব্যবহার করেছে, সেজন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হল লীলা। হয়তো সত্যিই ওর টাকার দরকার, পেমেন্টের জন্যেই এসেছিল। শুধু পেমেন্টের জন্যই।

পরের রবিবার যখন দমদমের বাসে নিজে থেকেই চড়ে বসল, তখন লীলাও কম বিস্মিত হয়নি। নিজেকে বোঝালে, গত সপ্তাহে যে অপমান করেছি তার জন্যে মার্জনা চাইতে যাচ্ছি। এ শুধু 'ভদ্রতাবোধের' তাগিদ। কর্তব্য।

দু'এক বার ভুল করে রাস্তা সে চিনে বার করলও ঠিক। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে স্মরজিৎ একটা বই পড়ছিল, লীলাকে দেখে ওর মুখে যে দীপ্তি দেখা গেল সেটুকু গোপন করতে চেষ্টাও করল না। বইখানা মুড়ে রাখল চেয়ারের হাতলে। চেঁচিয়ে ডাকল, পিসিমা, ও পিসিমা, দেখে যাও কে এসেছে।

স্মিতমুখে পিসিমাও এসে দাঁড়াল দরজায়। এসো, মা এসো।

লীলা লক্ষ করল, সে এলেই ওরা দুজনেই কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। মৃতকম্প আবহাওয়ায়

যেন স্পন্দন লাগে। বাইরে থেকে কেউ যে এতদূরে কষ্ট করে এসেছে, ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এই জন্যেই বুঝি পিসিমা কৃতজ্ঞ বোধ করেন। নির্জন দ্বীপে পরিত্যক্ত দুটি প্রাণী যেন দিগন্তে সাদা পালের চিহ্নটুকু দেখা গেলেও উদ্বেল হয়ে ওঠে।

নিজের কাছে নিজেকেই কেমন অপরাধী মনে হতে লাগল লীলার। এরা তো কই জিজ্ঞাসা করল না, কেন এসেছে। কোন কৈফিয়ত চাওয়া নেই, অভিযোগ নেই, এসেছে যে এতেই খুশি।

পিসিমা বুঝি কালির বড়িতে স্ট্যাম্প দিচ্ছিলেন। অল্প অল্প কালি লেগেছে তার কাপড়ে, ঘাম মুছতে গিয়ে কপালেও। সেখানে গিয়ে লীলা বসে পড়ল।—আমিও স্ট্যাম্প লাগাব, পিসিমা।

পিসিমা সম্বোধনে নতুন একটা সম্পর্কের ইঙ্গিত-ধ্বনিত হয়ে উঠল, সেটা ধরা পড়ল লীলার কানেও। চোখে-মুখে অকারণেই রক্ত ছড়িয়ে গেল।—এ তো সহজ কাজ।

—তোমাদের কাছে সহজ বাছা, কিন্তু আমরা এই পেরে উঠিনে।

ঘুরে ঘুরে সেদিন স্মরজিতের বাগান দেখলে লীলা। পোলট্রিও। আপাতত হাঁস-মুর্গি সব ডজনখানেক করে আছে, স্মরজিৎ বললে। শেয়ালে নিয়ে যায়, ঠিকমত দেখা-শোনা হয় নাতো। তবু যখন ডিম দেবে—রোজ যদি ছ'ডজন করে পাওয়া যায়, তবে, বাজারে ডিম এখন দু'আনা করে—

—থাক, অত হিসেব করতে হবে না। লীলা হেসে বললে।

কেবল লাভের কথা ভাবলে চলে না। লোকসানের জন্যেও তৈরি থাকতে হয়।

—সে তো আছেই। অন্যদিকে চেয়ে স্মরজিৎ আস্তে আস্তে বললে। কিছুক্ষণ থেকে লীলা মৃদু ও মধুর একটা সৌরভ পাচ্ছিল—কিসের গন্ধ বলুন তো?

পেছন দিকে তাকিয়ে স্মরজিৎ বললে, নেবু ফুলের।

—এমন চমৎকার?

স্মরজিৎ একটা পাতা ছিঁড়ে আঙুলে অল্প একটু চটকে লীলার নাকের সমুখে ধরল, দেখুন দিকি। এতদিন নেবু খেয়েছেন, নেবুগাছ চেনেন না বুঝি?

ঘুরে ঘুরে স্মরজিৎ ওর বাগান দেখালে গোটা-কতক ফুল তুলে বেঁধে দিলে তোড়া করে। রোদ এরই মধ্যে কখন নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সীমানার বাইরের ক্ষেত থেকে অর্ধপক্ক রবিশস্যের ঘ্রাণ ভাসছে হাওয়ায়। সে হাওয়ায় ঠাণ্ডার অবসাদময় আমেজ। পায়ের নিচে নরম মখমলের মতো ঘাসের ওপর খইয়ের মতো ফুল ছড়ানো। মাথার ওপর কখন থেকে এক ঘেয়ে গুন্‌গুন্। কী? না মৌমাছি চাক বাঁধছে।

বাসে তেমন ভীড় নেই। তবু স্মরজিৎ যখন প্রথম দুটো বাস ছেড়ে দিতে বললে, লীলা আপত্তি করলে না। শীতের পড়ন্ত বেলার আলস্যটুকুর ছোঁওয়া লেগেছে মনেও।

দমদমে গেল পরের রবিবারেও। তারপরের রবিবারও বাদ গেল না। ক্রমশ ফি-রবিবারেই। ছুটির দিন এলেই কী এক দুর্বার আকর্ষণ বোধ করে। প্রথমটা অস্বস্তি, ক্রমশ অস্থিরতা, অথচ কারণ বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত প্রতিবারেই দেখা যায় দমদমের বাসে লীলা উঠে বসেছে।

গিয়ে যে খুব ভাল লাগে তা-ও নয়। কিন্তু খারাপও তো লাগে না। কী যেন একটা যাদু আছে, বন্ধুর অসমতল মাঠের, রবিশস্যের আঘ্রাণের, নিঃসঙ্গ ঘুঘু কণ্ঠের, নেবু-পাতার মিষ্টি-মধুর সৌরভের। একখানা হাত শুধু দূরেই ঠেলে দেয় না, একটা রহস্যময় পদ্ধতিতে কাছেও টানে। সেই ছমছমে ঠাণ্ডা প্রায়ান্ধকার ঘরটায় ঢুকলে শরীরটা শিউরে ওঠে, রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু রোমাঞ্চ তো শুধু ভয়েই হয় না।

নিজেকে ক্রমশ একটা জালে জড়িয়ে ফেলছে লীলা, স্পষ্ট বুঝতে পারে। এদের দ্বৈত সংগ্রামের সঙ্গে অলক্ষে কবে যেন নিজেও যুক্ত হয়ে গেছে। অথচ এ-তো সে চায়নি। স্মরজিতের তৈরি প্রসাধন উপচার নিয়ে নিজের পরিচিত মহলে ইতিমধ্যেই দু'চার বার গেছে; সাফল্যও আশানুরূপ না হোক, পেয়েছে। পাঁচ টাকার জিনিসও যেদিন চালাতে পেরেছে সেদিন আনন্দ হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে পড়েছে। আবার কখনও কখনও স্মরজিতের প্রতি অকারণেই সমস্ত চিত্ত বিরূপ হয়ে গেছে। কঠিন আঘাত করতে

চেয়েছে এই মানুষটিকে। আবার পরক্ষণেই হয়তো নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হয়েছে। দোষ তো স্মরজিতের নয়। এ দ্বন্দ্ব লীলার মনের। নিজের রুচি আর অন্ধ আকর্ষণের সংঘাত। নিজের সঙ্গেই ক্লান্তিকর এক লুকোচুরি।

আবার নেশাও। জানে না ভবিষ্যৎ কী, জানে পরিণাম রমণীয় নয়। কিন্তু তবু রাশ টানতে পারে না। অস্বস্তিকর চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেই বুঝি লীলা সে সপ্তাহে খুব প্রাণপণ খাটল। যখনই অবসর পেয়েছে, মিত্র কোম্পানির মাল নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরেছে। সাফল্যও হয়েছে আশাতীত। পিসিমা যা পারেন না, এমন কি স্মরজিৎও নয়, তা লীলাকে দিয়ে যেন অনায়াসেই হয়। তার কাছ থেকে জিনিস রাখতে দোকানদারদের বিশেষ আপত্তি নেই। কথাবার্তায় লীলা স্মার্ট, আর লোকে তো বলে চেহারাটা এখনও পর্যন্ত ভালই। রবিবার গিয়ে স্মরজিৎকে হিসাব দিতেই স্মরজিৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—বলেন কী? হাজার টাকা? হাজার টাকার অর্ডার এক হপ্তায়? বুঝেছি, আর বেশি বাকি নেই ; আমাদের সংগ্রামের দিন শেষ হয়ে এসেছে।

—আমি জানি, মা যখন পাশ এসে দাঁড়িয়েছেন তখন আর কোন ভাবনা নেই। মা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। পিসিমা পাশের ঘরে চা করতে চলে গেলেন।

সেদিন বহুক্ষণ ধরে ওরা কারবারের উন্নতি সম্পর্কে পরামর্শ পরিকল্পনা করলে। ল্যাবরেটরি ঘরটাকে আর একটু বড় করতে হবে। খবরের কাগজের মারফত প্রচার-ব্যবস্থারও সময় এসেছে। দু'জনে মিলে ওরা বিজ্ঞাপনের কপিও মুসাবিদা করলে একটা। আর,—আর দরকার হয়তো লোক রাখতে হবে আর দু'একটা।

—একজন লোক তো রেখেইছি, স্মরজিৎ ঈষৎ হেসে বললে, তবে পার্ট-টাইম, এই যা। আসে আর চলে যায়। তাকে চিরকাল ধরে রাখা যায় না। কিন্তু যদি যেত। কী বলেন মিস্ সোম?

লীলার মুখের সমস্ত রক্ত মুছে গেছে। হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াও যেন স্তব্ধ! কিছুদিন থেকেই এই কঠিন মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করেছে ভয় করেছে। দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেই মুহূর্ত এল আজ, শীতের এই দ্রুত ক্ষীয়মান দিনান্তে। কী উত্তর দেবে? ওর নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়াই যে এখনও শেষ হয়নি।

এগিয়ে এসে স্মরজিৎ ওর কাঁধে ওর শক্ত ডান হাতখানা রাখলে। —আমি জানি লীলা, এ প্রশ্নের জবাব এত সহজে দেওয়া যায় না। আমি তোমাকে সময় দিলুম। সব দিক ভেবে তুমি একদিন, দু'দিন—সাত দিন পরেই না হয় জবাব দিয়ো। আমার সবই তুমি জানো। আমার দিক থেকে তো জানাবার কিছু নেই -শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এল।

কঠিন একটা প্রয়াসে নিজের সমস্ত সত্তাকে ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লীলা। আমি পরে আবার আসব, ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারল শুধু।

পরে? কিন্তু কত পরে লীলা? সাগ্রহে স্মরজিৎ জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু জবাব পায়নি। লীলা দ্রুত পায়ে চলে এসেছে গেট খুলে সদর রাস্তায়, তারপর মুশুরি কলাইয়ের ক্ষেত আর পাখির কাকলি পিছনে ফেলে শ্যামবাজারের বাসে।

দিন দুই বাদে একদিন সকালে পড়াতে গিয়ে দেখল, বাইরের ঘরের সোফায় বসে কে একজন খবরের কাগজ পড়ছে। ভঙ্গিটা মনে হল চেনে, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারল না। পড়াতে পড়াতে এক সময় রুবিকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের বাইরের ঘরে নতুন একজন লোক দেখলাম রুবি, কে বলো তো।

—নতুন লোক? ভ্রূ কুঁচকে বললে রুবি নতুন আবার কোথায়!

ওঃ, আপনি মামাবাবুর কথা বলছেন? জানেন লীলাদি, মামাবাবু আবার এসেছে।

মামাবাবু? এক মুহূর্ত ভাবল লীলা। অনুপম এসেছে, তা হবে, চিনতে তবে পেরেছিল ঠিক। কিন্তু অনুপমের স্বাস্থ্য এত ভাল হল কবে থেকে। ওর পায়ের শব্দে কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে একবার তাকিয়ে পরক্ষণেই নামিয়ে নিয়েছিল। টকটকে ফর্সা মুখ, গাল দু'টি বেশ ভরা-ভরা। গেঞ্জিতে ঢাকা চওড়া বুক। এই যদি অনুপম হয় তবে আশ্চর্য রূপান্তর তো!

লীলার একবার জানতে সাধ হল, অনুপমের সে সব পাগলামি এখনও আছে কিনা। কিন্তু সে-সব কথা জিজ্ঞাসা করা চলে না। ভুল বানান আর কোটেশনে ভর্তি চিঠিগুলোর কথা মনে পড়ে হাসি পেল। রুবি বললে, জানেন লীলাদি, মামা অনেক টাকা করেছে। এখান থেকে কানপুর গিয়েছিল, সেখান থেকে হোসিয়ারপুর। সেখানে কনট্রাকটারি করে নাকি বড়লোক হয়েছে।

পড়াতে পড়াতে লীলা দু'চার বার দরজার দিকে তাকিয়েছিল। চটিপরা দু'টি পা পর্দার নিচে ঘুর-ঘুর করছে দেখতে পাবে আশা করেছিল কিনা বলা যায় না। কিন্তু অনুপমের আর কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। হয়তো, এখন ওর মনে লজ্জা আছে। হয়তো, হয়তো, ভুলেই গেছে। লীলা আবার পড়ানোয় মন দিলে।

লন পেরিয়ে গেট খুলেছে, ছাতাটাও খুলতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে কানে এল, শুনুন।

লীলা ফিরে তাকাল। অনুপম।

হাফশার্ট আর ট্রাউজার্স। মুখে ফাল্গুনের সকালের নাতি-উষ্ণ রোদ। অনুপম নমস্কার করলে, চিনতে পারছেন না?

লীলা যন্ত্রচালিতের মতো প্রতি-নমস্কার করল। কিন্তু কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। যাকে মাস কয়েক আগে ধমকে দিয়েছিল, বেত্রাহত কুকুরের মতো যে সমুখ থেকে চলে গিয়েছিল মাথা নিচু করে, এ যেন সে নয়।

অনুপম দু'পা এগিয়ে এল।—আপনি সে সব কথা ভুলতে পারেননি দেখছি। এক সময় যে-সব ছেলেমানুষি করেছি, তার জন্যে আন্তরিক মার্জনা চাইছি লীলা দেবী। একটু হেসে অনুপম আবার বলল, সে সময় আপনি আমায় শাসন করে ভালই করেছিলেন। নইলে হয়তো আমার চৈতন্য হত না। জীবনে মানুষ হয়ে ওঠবার সময়ই পেতাম না।

লীলা তাকিয়ে দেখল, অনুপম মানুষ হয়েছে সত্যি। স্বাস্থ্য তো আশ্চর্য রকম ফিরিয়ে ফেলেছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটা আত্মপ্রত্যয়ের ঋজুতা। কণ্ঠস্বরে সেদিনকার সেই ভিখারী আকুতির স্পর্শ মাত্র নেই। পরিচ্ছদেও বেশ রুচির পরিচয় আছে অনুপমের। শার্টের হাতা থেমেছে কনুই অবধি, তাব নিচে—বাঁ-হাতটার সুপুষ্ট মনিবন্ধে সুদৃশ্য হাত ঘড়িটির ব্যাণ্ড ভারি সুন্দর মানিয়েছে। সেদিকে চেয়ে লীলার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে অনুপম একবার নিজের বাঁ-হাতটার দিকে তাকাল, তারপর হাত ঘড়িটার দিকে। কুণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী দেখছেন বলুন তো ঘড়িটায়? সময় ভুল আছে?

লীলা অপ্রতিভ হয়ে বললে, না। দৃষ্টি সরিয়ে নিলে। সে তো হাত ঘড়িটা দেখছিল না, ওর অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওর বাঁ-হাতটার দিকে, দুটো হাত বুকের কাছে নিয়ে কেমন স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়েছে অনুপম। দু-দু'টো হাত। অনুপম বললে, আপনাকে আমার আর মোটে একটা অনুরোধ করতেই বাকি আছে লীলা দেবী। সেদিনকার সব দোষ-ত্রুটি ভুলে যান। আমরা তো বন্ধুও হতে পারি?

এবারেও কোন জবাব দিকে পারল না লীলা। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে কিছু দেরি হয়েছিল। মা জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেছলি, দমদমে বুঝি? লীলা কোন জবাব দিলে না, মা আপন মনেই বলে চললেন, কী-যে শুরু করেছিস, তুই-ই জানিস। ওই হাতকাটা স্মরজিতের সঙ্গে কিসেব এত মেলামেশা। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে শুরু করেছে। ও ছোঁড়ার নিজেরই চাল-চুলোর ঠিক নেই। ওকে ব্যবসায়ে সাহায্য করছিস, ইস্কুলে ওর জিনিস নিচ্ছিস, ভাল কথা। এর পরেও আসে কেন? ওর সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়ালে তুই তো সুখী হবিই নে, এ দারিদ্র্যও ঘুচবে না, মাঝখান থেকে আমরাও না খেয়ে মরব। তোর ওপরই তো সব নির্ভর করছে মা!

মা আরও সন্নিহিত হয়ে এলেন। নিচু গলায় বললেন, একটা কথা বলব লিলি, ভেবে-চিন্তে জবাব দিবি। তুই-যে বাড়ি পড়াস না, সে বাড়ির গিন্নি আজ দপুরে এসেছিলেন। ভারি আলাপি মানুষ। এত

বড়লোক অথচ অহংকার নেই। কথায় কথায় বললেন, ওঁর এক ভাই আছে। দেখতে-শুনতে ভাল, পয়সাও আছে। কথার ভাবে বুঝলাম, তোকে ওঁদের খুব পছন্দ। এখন যদি তুই মত করিস—।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মা বললেন, কী, জবাব দিচ্ছিস না যে?

ক্লান্ত গলায় লীলা বললে, আমি আবার কী দেখব মা? তোমার যা ইচ্ছে তাই করো।

মা কাছে টেনে নিলেন মেয়েকে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, এই তো লক্ষ্মী। তোর ভালর জন্যই বলা। বয়স পেরিয়ে যেতে বসেছে, তোকে দেখলে আমার দুঃখু হয় না ভাবছিস্? এ বিয়ে হলে দেখবি কত সুখী হবি। আমাদের সংসারটাও একটা আশ্রয় পেয়ে দাঁড়াতে পারবে। আর যদি ঐ ছোঁড়াটার সঙ্গে তোর জীবন জড়াস—

কিন্তু মার কথাটা পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন ছিল না। লীলা স্থির করে ফেলেছে। স্মরজিতের সঙ্গে ওর জীবন আর জড়াবে না। স্মরজিতের প্রশ্নের জবাব স্থির হয়ে গেছে। সংসারের কথা ভেবেছে লীলা, নিজের কথাও ভেবেছে, আর সংশয় নেই।

তবু যখন পরদিন শেষ জবাব দিতে গেল, পা দু'টো বারবার কাঁপল লীলার। বেলা শেষের ম্রিয়মান রোদে রবিশস্যের ক্ষেতের সবুজও আজ কেমন স্তিমিত। ওর পায়ের শব্দে একটা কাঠবিড়ালি পালিয়ে গেল আমলকি গাছের ডালে। হেলে-পড়া খেজুর গাছের সূক্ষ্মশীর্ষ পাতাগুলো বিঁধে গেছে পদ্ম-পাতায়। বাঁশঝাড়ের আড়াল থেকে শোনা যাচ্ছে অলক্ষ্যে, একক ঘুঘুর একঘেয়ে কণ্ঠ।

স্মরজিৎ বাইরে বসে নেই। শোবার ঘরেও তাকে দেখা গেল না। কাছাকাছি কোথাও আছে ভেবে লীলা একটু বসল। অন্যমনস্কভাবে টুল থেকে একটা পত্রিকা টেনে নিতেই মেঝেয় ঠক করে একটা শব্দ হল। ত্রস্ত হয়ে নিচের দিকে তাকাতেই লীলার দৃষ্টি স্থির, সমস্ত দেহ অসাড় হয়ে গেলে। নুয়ে পড়ে সেটাকে তুলে যথাস্থানে রাখবে এমন শক্তিও নেই।

স্মরজিতের কাঠের বাঁ-হাতটা স্যাতসেঁতে, স্বল্পালোক ঘরের ভিজে মাটির ওপর গড়িয়ে পড়েছে। এই পরিত্যক্ত ঘরে আর কেউ নেই, শুধু সে আর নিস্পন্দ একখানি কাঠের হাত, ভাবতেই আরেকবার কেঁপে উঠল লীলা। হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক্ করতে লাগল, অথচ উঠবে যে, ছুটে যে পালাবে, সে সামর্থ্যও নেই ; পক্ষাহত প্রত্যঙ্গগুলোকে এই ঘরের মৃত আবেষ্টনীর সঙ্গে কে যেন কঠিন, নির্মম হাতে বেঁধে রেখেছে।

স্মরজিৎ ঘরে ঢুকল একটু পরেই। খালি গা, চুলগুলো ভিজে, কাঁধে গামছা। স্নান করে এল।

ওকে দেখে স্মরজিৎ একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। কতক্ষণ থেকে বসে আছেন। আজ ফিরতে দেরি হয়েছিল তাই অবেলায়—পিসিমা আবার গেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঝুঁকে পড়ে টুলের ওপর কী যেন খুঁজল স্মরজিৎ, তারপর এদিক ওদিক তাকাতেই মেঝেয় চোখ পড়ল। কুড়িয়ে নিয়ে কাঠের হাতখানা গামছা দিয়ে যেন কতকটা স্নেহে মুছে ফেললে মাটি।

লীলা কাঠ হয়ে বসে বসে সব দেখল।

—একটু বসুন, এখুনি আসছি, বলে স্মরজিৎ আড়ালে চলে গেল। ফিরে যখন এল, তখন পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো, বাঁ-হাতটা অভ্যস্ত রীতিতে পকেটে।

তক্তপোশের ওপর লীলার কাছ ঘেঁসেই বসল স্মরজিৎ।—তারপর লীলা, আমার সেদিনকার প্রশ্নের জবাব ঠিক করে এসেছ?

লীলার ঠোঁটদুটো একবার কেঁপে উঠল, কোন কথা ফুটল না। আরও কাছে এসে ওর কাঁধের ওপর ডান হাতটি রাখল স্মরজিৎ।—জানি তোমার লজ্জা করছে। থাক, তোমাকে আর মুখ ফুটে বলতে হবে না। ফিরে যখন এসেছ তখনই তোমার উত্তর আমি অনুমান করে নিয়েছি।

লীলার একখানা হিমহাত স্মরজিৎ ওর হাতের মধ্যে টেনে নিলে। লীলার সারা শরীর আরেকবার কেঁপে উঠল। আর অপেক্ষা করা চলে না। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। সমস্ত শক্তিকে অধরোষ্ঠে কেন্দ্রীভূত করে লীলা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলে, ফিরে আসিনি, ফিরে যেতে এসেছি। নির্বোধ দৃষ্টিতে

এক মুহূর্ত লীলার দিকে চেয়ে রইল স্মরজিৎ। ওর হাত থেকে লীলার হাতটা শিথিল হয়ে খসে পড়ল। লীলার কথার যেন মানে বুঝতে পারেনি, এমনভাবে রক্তহীন মুখে শুধু বললে, ফিরে যেতে এসেছ!

উঠে দাঁড়াল লীলা। হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম হয় না। পারব না, আমি পারব না।

অস্ফুট গলায় স্মরজিৎ বললে, পারবে না?

—না। লীলা চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণ স্মরজিৎও উঠে দাঁড়িয়েছে। টলতে টলতে এগিয়ে এসেছে দরজা অবধি। পারবে না? কিন্তু কেন? কেন? কেন?

যে হাতটা ক্ষণকাল আগে কোমল হয়ে লীলার কাঁধ স্পর্শ করেছিল, সেই হাতটাই অকস্মাৎ কঠিন ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে; প্রচণ্ড বেগে ঝাঁকুনি দিচ্ছে লীলাকে, আর ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করছে, কেন, কেন, কেন। কেন তবে এসেছিলেন? একদিন নয়, দু'দিন নয়, একবার নয় দু'বার নয়, বার বার? কেন? কেন দিনের পর দিন এসে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন, কাজের সহায়তা করেছেন। কোন মমতা যদি ছিল না, তবে কেন আমায় ভুল বোঝবার সুযোগ দিলেন? এ কি শুধু কৌতূহল? শুধু দয়া? লীলা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। অস্ফুট গলায় বলল, কৌতূহল, দয়া?

ধীরে ধীরে লীলা এগিয়ে গেল। চাক থেকে উড়ে আসা দু-একটা মৌমাছি উড়ছে ইতস্তত। বাতাসে মৃদুগন্ধ, কে জানে হয়তো নেবু-ফুলের। আকাশে সূর্যের শেষআলোয় দু'একটা চিল ডানা-না-কাঁপানো সাঁতার দিচ্ছে। পথের ধারের পুকুরের পানায় চুপ করে বসে আছে দু'একটি বক। আর সরু সাদা সিঁথির মতো পথ ফসল-ধোয়া মাঠ পাড়ি দিয়ে দূরের অশত্থ-বটের ছায়ায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তারপরেই ঝাপসা, তারপরেই অন্ধকার।

এই দীর্ঘ পথ ওকে একলা পাড়ি দিতে হবে ভাবতেই লীলার পা দুটো অবশ হয়ে এল। হাঁটুতে যেন জোর নেই। চলতে গেলে লাউয়ের লতায় পা জড়িয়ে যায়, ফনি-মনসার কাঁটা আঁচল আঁকড়ে ধরে। এই নিরালোক, নিরানন্দ পরিবেশ তাকে কঠিন মায়ায় ঘিরেছে, বেঁধেছে দুশ্চেদ্য মোহে। এই তমসা থেকে কেউ যদি তাকে হাত ধরে জ্যোতির্লোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে, দিক। কিন্তু একা এই ক্লান্ত পথ পাড়ি দেবার কথা ভাবতেই লীলা ভয় পেল। অন্যদিন ওর সঙ্গে থাকত স্মরজিৎ। আর আজ—লীলা পিছনে ফিরে তাকাল।

চৌকাঠে হাত রেখে স্মরজিৎ কাঠের পুতুলের মতো তখনও দাঁড়িয়ে। অবসন্ন ভঙ্গিতে দরজাটা ধরে আছে, পাংশু মুখখানা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শুনতে পেয়ে চকিত হয়ে তাকাল স্মরজিৎ।

লীলা ফিরে আসছে।

প্রায় ছুটে এসে লীলা ওর পায়ের কাছে, মাটিতে ধপ্ করে বসে পড়ল। শিথিল আচল পড়ল লুটিয়ে। ওকে আস্তে আস্তে তুলল স্মরজিৎ, গভীর মমতায় কাছে টেনে নিলে। মোমের মতো সাদা দু'খানি আকুল হাত কখন জড়িয়ে গেছে গলায়। বুকের ওপর সিক্ত পদ্ম দু'টি চোখের স্পর্শ। কান পাতলে শোনা যায় একটি দ্রুতশ্বাস স্পন্দিত হৃদয়ের ওঠাপড়া। আর পরম আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কাঁধের কাছে খোঁপাখোলা শ্রান্ত একটি মাথা এলানো। ধীরে ধীরে সেই মুখখানি স্মরজিৎ তুলে ধরল। ফিরে যেতে পারেনি। ফিরে এসেছে।

মিরজা আবদুল হাই

মেহেরজানের মা

রেল ইষ্টিশানে হাটের ভিড়। সবগুলো গাড়ীতেই লোক ঠ্যাসা তবুও একটা পাওয়া গেল একেবারে খালি। বেশ সাফ সুতরা। গদি মোড়া। মাথার উপর বন্ বন্ করে পাংখা ঘোরে। তারই ভেতর ছোট্ট একটা কুঠরি। আয়নায় মুখ দেখা যায়। কল থেকে টিপ টিপ করে পানি পড়ে। তারই ভেতর ধাক্কা দিয়ে রকীবাকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে জমিলা বেরিয়ে গেল।

রকীবার পেটে-পিঠে, শাড়ীর নীচে, চটের থলিতে সুপারী বাধা। হাতে মবিলের টিন। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল। আয়নার ভেতর দিয়ে নিজের পেটের দিকে নজর পড়তে মনে হল যেন আট ন'মাস। মেরাজান যখন পেটে এসেছিল, তখনকার কথা রকীবার মনে পড়ল। অনেক— অনেক দিন আগেকার কথা। বুকের দুরু দুরু ভাব ছাপিয়ে কেমন যেন একটা সরমরাংগা অনুভূতি তার মনের অতলে শিহরণ জাগাল।

দশটার গাড়ী ঝক ঝক করে এগিয়ে চলেছে। মানুষের হালে বেঁচে থাকার জন্য এই নূতন জীবিকার পথে নেমে পড়া। শুধু আজকের জন্য বেঁচে থাকা, কালের ভরসা কাল। গরীবের শুধু দিনের দিন বাঁচা, ভবিষ্যৎ ত' শুধু বড়লোকের। রকীবার অন্তরলোকের চিড় খাওয়া ভাবনা।

রকীবার বুকে হাতুড় পেটার আওয়াজ। প্রাপ্তির হিসাব পাঁচটার গাড়ীতে নাভারণে ফিরলে। এখন শুধু ভয়, মারধর আর জেল ফাটকের ভয়।

জামিলারই মুখে শুনা সব বেটাই না কি দু'পয়সা করে খাচ্ছে— তা সায়েব সুবা-ই হোক, আর মজুর ভিখিরী-ই হোক। মনকে যুক্তি দেখায় রকীবা।

বেনাপোলে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। থামার কিছু পরেই জমিলা এসে বলে, নেমে একটু হাঁটাহাঁটি কর।

রকীবা বলে— ভয় করে, যদি ধরে!

ধরবার হলে কি আর আমি নামতাম? আর ধরলেই বা কি? ওষুধ জানা আছে। চার আনা, আট আনা, বড় জোর একটাকাই নিল। আর তাই বা নেবে কেন? খেপে খেপে যে পেট ভরাই, তাই বা কি এমনি নাকি। ধরবে কোন খানকীর পুত।

প্রতি মুহূর্তেই রকীবা ভাবে এই বুঝি একটা বিপত্তি বাধে।

গাড়ী থেমেছে ত থেমেই আছে। নড়বার নাম করে না। ধরা যদি পড়ে ত কি হবে? খুব নাকি মারধর করে। কিন্তু কতজনকে মারধর করবে। জমিলাই দেখিয়ে দিয়েছে- - উ'রা সবাই। জমিলার মত প্রৌঢ়া ত আছে-ই, বুড়া বুড়ি, ছেলে মেয়ে যোয়ান অগুনতি। এদের ভরসাই বা কম কিসের।

গাড়ী ছাড়বার আগেই জমিলা বলে দিল— দেখ, ঘাটে ঘাটে গাড়ী থামবে, আমাদের দরকার মতই থামবে। এখান থেকে ছাড়ার পর, পয়লা দু'বারে নামবি না, তার পরের বার, বুঝলি?

রকীবা মাথা নাড়ে। এত বড় কলের গাড়ী যা গাঁয়ের পিসিডেন্ট কিম্বা থানার বড় বাবুও নাকি থামাতে পারে না, তাকে নিজেদের কথা মত থামাতে চালাতে পারে যারা নিজেকে তাদেরই একজন ভেবে রকীবা গর্ব অনুভব করতে লাগল।

তৃতীয় বার গাড়ী থামার সংগে সংগে রকীবা টিন হাতে করে নেমে পড়ে।

ফাঁকা মাঠ। অনেকগুলি নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ নেমে ত্রস্ত পায়ে মাঠের দিকে দৌড়াল। রকীবা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। জমিলা তার কনুই চেপে ধরে বলে- -দৌড়া, দাঁড়ালে চলবে না।

বনগাঁয়ে জিনিস বেচাকেনায় কারবারটা নির্ঝঞ্ঝাট নয়। ভোগান্তি অনেক। যাঁদের মহাজন সংগে—তাদের ত পোয়াবারো। আর যাওয়া-আসার হাঙ্গামা যতটুকু রকীবা আঁচ করে রেখেছিল—আসলে তার সিকিও নয়। ভয় শুধু মনেই।

পাঁচটার গাড়ীতে রকীবা যখন ফিরে এল, তখন তা'র কোমরে গোঁজা কিছুটা খুচরা পয়সা, আর টিনে ভর্তি সের চা'র সরিষার তেল।

সেরে কমসে কম টাকা দেড় টাকা পাবে। রকীবা শুধু হিসাব করে। আঙ্গুলের আঁকে আঁকে গুনতে গিয়ে তাল-গোল পাকিয়ে ফেলে।

ঘরে ফিরবার সময় রকীবা যেন আর হাঁটতে পারে না। অভূতপূর্ব একটা উত্তেজনা। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ানো বা শুধু পেটে ভাতে রাত দিন গৃহস্থের বাড়ী খাটনি, পান থেকে চুন খসলে অকথ্য অত্যাচার, সব কিছু যেন অনেকদিন আগেকার দেখা দুঃস্বপ্নের মত মনে হতে লাগল। হাওলাদার বাড়ীর সেই কল্কী সেকার ঘা'টা পিঠের উপর অনুভব করতে চেষ্টা করল। না, জ্বালা আর আছে বলে মনে হয় না। দু' একদিন পরই সে মেরাজানের জন্য একখানা দশহাত শাড়ী কিনে আনবে। একটুকরা তেনা পরে থাকে মেয়েটা। ভাল করে পরলে নয় হাতে হবার নয়। আর যা বাড়ন্ত গড়ন। পাড়ার বদ ছোকরারা এখন থেকেই বদ-নজর দেবার তালে আছে। বুক বুকে আগলিয়ে রাখে রকীবা। মান-ইজ্জতই যদি রাখা না যায় তবে দুনিয়ায় থেকে কি লাভ।

বজলটাকে নিয়েও চিন্তা কম নয়। ময়লা একটুকরা নেংটি পরে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে থাকলে রকীবার প্রাণে শান্তি থাকে। মেরাকে দেখবার একটা লোক থাকে। হোক না দুধের ছেলে। খোদাতালা যখন মুখ তুলে চেয়েছেন, বজলের জন্যও একটা লাল শার্ট আর একটা পেণ্ট। পেটের দায়ে মেরাকেও দায়ে মেরাকেও ঘরে রাখা যায় না। লোকজনের বাড়ীতে এটা সেটা কাজ কর্ম করতে হয়। বাধা ধরা কিছু নয়, তবু রকীবার ভয় কাটে না। গাঁয়ের ড্যাকরাগুলোর যা রকম-সকম!

মেহেরজানের শাড়ী হয়েছে। মাথায় নারিকেল তেল লেগেছে। বজলের পেণ্ট শার্ট সব কিছু।

দিন গড়িয়ে চলে। ধুঁকে ধুঁকে বাঁচার দিন নয়, পেট ভরা, বেশ হাসি খুশীর দ্রুত চলমান দিন।

দিন কয়েক যেতেই রকীব একদিন কালের পিছন ফিরে তাকায়। নিজের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়। ভাল করে যেন বুঝে উঠতে পারে না। কি করে বজল ও মেরা দু'জনেই মায়ের সংগে কারবারে নেমে পড়েছে। নেহাৎ যেন একটা গতানুগতিক ব্যাপার। তার প্রথম দিনের অভিযানের মত এদের আসায় কোন বৈচিত্র্য নেই। মনে রাখবার কিছু নয়।

তিন জনেই ভিন্ন ভিন্ন মহাজনের সংগে ভিড়ে গেছে। ঠিকা কাজে হাঙ্গামা যেমন কম, লাভও সেই অনুপাতে কম। তাই বা মন্দ কি, ঝক্কি যত মহাজনের ঘাড়ে

ন দশ বছরের বজল। ভয়ানক চটপটে। টিন হাতে সরিষার তেল আনাটা যেন তার ধাতে সয় না। দু'একদিন টিন নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারপরই বাদ দিয়েছে, হয়তো মহাজনের নির্দেশে। ফিরবার পথে লবণ নিয়ে আসে। দ্বিতীয় বা মধ্যম শ্রেণীর বেঞ্চের তলায়—সের কয়েক লবণ বিছিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। ধরা পড়বার প্রশ্নই উঠে না। যায়ত শুধু মালই যাবে। গাড়ী যখন চলে বজল তখন গাড়ীর তলায়, একটা লোহার রডের উপর অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে বিড়ি টানে। লাল পাট-সিল্কের একটা রুমাল গলায় বাঁধা, হাতে পিতলের একটা আংটি। কানে আধপোড়া বিড়ি। রকীবা যখন প্রথম শুনল যে বজল গাড়ীর তলায় বসে চলা ফেরা করে, ভয়ে তখন সে প্রায় কঁকিয়ে উঠেছিল। বলা যায় না কখন কি হয়। বজল মায়ের কাছে কসম করেছে—গাড়ীর ভিতর বসেই সে যাওয়া-আসা করবে। কিন্তু গাড়ী যখন চলে তখন গাড়ীর নীচটা দেখবার সুযোগ থাকে না বলেই রকীবা ভাবে—মা-অন্তপ্রাণ ছেলে নিশ্চয়ই মায়ের কথা রাখছে।

মেহেরজানকে রকীবা চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সম্ভব আর হয় কই। বেনাপোলে গাড়ী থামলেই রকীবা মেয়ের খবর করে। রকীবা প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দেয়—দেখিস, ঐ ছোঁড়াগুলির সংগে মিশবি না কিন্তু, বুঝলি?

মেরা বুঝেছে বলে মাথা হেলায়।

আর শোন, ঐ যে সেপাইগুলো, তা বেনাপোলেরই হোক, আর বনগাঁয়েরই, বুঝলি, সব বেটাই বদমাসের ধাড়ী। এ লাইনে সব শেয়ালের এক রা। খবরদার। বলে দিলাম।

উঠতি বয়সের মেরাজান বুঝে সব কিছুই।

সরসপুর থেকে নাভারণ—অনেকখানি পথ। প্রত্যেকদিন এতটুকু পথ হেঁটে গাড়ী ধরা সোজা কথা নয়। তা ছাড়া বৃষ্টি পড়লে, রাত্রে ঘরে ঘুমানো যায় না। ঝর ঝর করে পানি পড়ে।

মেরা বলে—এখন ত আর সে রকম অভাব নেই, ঘরটাকে মরামত কর।

সময় কোথায়? লোক লাগালে দু' তিন দিন কামাই দিতে হয়। রকীবা নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়।

সন্ধ্যার দিকে আর রকীবা ঘর থেকে বের হয় না। মাঝে মাঝে মোল্লা পাড়ার মজিদ আসে। অবস্থা মন্দ নয়। টিং টিং-এ চেহারা। শেয়ালের মত পিট পিটে ধূর্ত চোখ। সারা গায়ে পাচড়া না'কি, লোকে বলে খারাপ ব্যারাম। কোন জন্মের কুটুম্বিতা নেই, ঘেন্নাই করেছে হয়ত এতদিন, এখন বলে—চাচি আছ কেমন? আর আড়চোখে মেহেরজানের দিকে তাকায়।

রকীবার হুকুম আছে—ঐ ছোকরা মজিদ এলে, খবরদার বলে দিলাম,—ঘোমটা তুলবি না।

মেরা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, তা এই ঘেয়োটাকে ঘরে ঢুকতে দিস কেন?

এই মজিদেরই জ্বালায় আর ঝর ঝরে পচা চালের দৌলতে একদিন মেয়ে ও ছেলের হাত ধরে, রকীবা নাভারণের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় এসে উঠল। তালেব মিয়ার-ই কাজ করে সে। এই লাইনে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে মহাজনের আশ্রয়ে। কেউবা ইস্টিশনে, প্লাটফরমে, কিংবা কোন দোকানের বারান্দায়, রকীবাই ছিল দূরে। গরীব বলেই শুধু গ্রামে এত লোকের মাঝে নিজের ভিটায় থেকেও ছিল নির্বান্ধব। এদের মাঝে এসে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চারদিকে শ'য় শ'য় যেন আপনার লোক। জমিলা, নন্দ, নিখিলের মা, জৈতুন এবং সবাই যেন কত কালের আত্মীয়। ব্যবসায়ীরা নাকি মিলে মিশে থাকতে পারে না অথচ আশ্চর্য এরা সকলে একই কারবার করে কিন্তু অভিন্ন আত্মা। সুখে দুঃখে খবর করে, লাইনে কোন্ দিন কোন্ অফিসার চলে, কোথায় কিভাবে টিপলে কি ফল পাওয়া যায়, সবাই সবাইকে বলে। দিল খুলে আলাপ-আলোচনা করে। আশে পাশে সারা রাতই প্রায় বাতি জ্বলে। খোলা বারান্দাযও যেন ভয় নেই আর। গাড়ী ধরারও নেই তাড়াহুড়া।

বয়স যেন আর তাল সামলাতে পারছে না। মেরার শরীরের গড়ন বয়সকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে চলেছে।

বেনাপোলে বনগাঁয়ে ঠোঁট লাল করে পান খায় মেরাজান। রকীবার একদিন চোখে পড়ে গেল। দু' জন সেপাই মেরাজানের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। একজন বনগাঁয়ের আর অন্যজন বেনাপোলের। প্রায় সব সেপাইরই মুখ চিনে রকীবা। এদের কাছে পাকিস্তান-হিন্দুস্থান সব এক। একজন সেপাই হাত বাড়িয়ে কী যেন দেওয়া নেওয়া করল মেরাজানের সাথে। সেপাই দু'টি সরে গেলে পরে রকীবা জোর পায়ে এগিয়ে গিয়ে খপ করে মেরাজানের চুলের মুঠি ধরল।

মেরাজান চমকে উঠল।

হিড় হিড় করে লোহার বেড়াটার কাছে টেনে এনে রকীবা চাপা গর্জন করে উঠল—হারামজাদী, এই সেপাই ষণ্ডা দুটোর সংগে কি করছিলি?

মুখের উপর কোন দিন মেরা উত্তর দেয় না, কিন্তু আজ দিল—তোর সব তাতেই সন্দ। এত লোকের মাঝে চুল ধরে টানাটানি করিস না বলছি।

রকীবা কিছুটা থতমত খেয়ে গেল।

মেরাজান ততক্ষণে সামলিয়ে নিয়েছে।

—বুড়ি হয়ে গেছিস, তাল মান টের পাস না। এদের সঙ্গে খাতির রাখতে হয়।

—তোর খাতির ধুয়ে পানি খা গে, যা। হাজার বার করে মানা করেছি, হারামজাদীর কানে যায় না। ওই ড্যাকরা হাত বাড়িয়ে তোকে কি দিচ্ছিল?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মেরা বোধ হয় উত্তর ঠিক করল।—বাঃ রে, ও আবার কি দেবে। পান কিনেছিলাম, ওরাই বলল পান খাওয়াতে। তাই দিয়ে দিলাম একটা। আমিই ত দিলাম। পুলিশের লোক আবার কাউকে দেয় নাকি কোন দিন?

—কাজ নেই বাপু পান খাওয়ানোর। একটু বুঝে-সুঝে চলিস। রকীবা দরদ মিশিয়ে বলে।

মাঝে মাঝে, মাসে দু' মাসে, অনেকগুলি সেপাই আর বোর্ডার পুলিশের বড় সাহেবরা এসে হানা দেন। ধর পাকড় হয়, মারধর লাগে, কিন্তু কপাল গুণে রকীবার কিছুই হয় নি। এক দিন ব্যবস্থাটা হল বড় কড়া রকমের। অন্যান্য দিন আগে থেকেই কিছুটা আভাস পাওয়া যেত কিন্তু সে দিন হঠাৎ যেন পৌষের আকাশে মেঘ ডেকে উঠল। গাড়ীর পেছন দিয়ে নামতেই, লোহার বেড়ার অপর পাশের জংগল থেকে অনেকগুলি সেপাই মাথা তুলে দাঁড়াল। ক'জন বেড়া টপ্‌দিয়ে প্লাটফরমের ভেতর এসে পড়ল। হাতে লাঠি। যাকে ধরে, তাকেই দু এক ঘা লাগায়। হুল-স্থূল ব্যাপার। রকীবা স্তম্ভিতের মত পেটে বাধা সুপারীর থলেটার উপর হাত রেখে এদিক ওদিক চায়। হঠাৎ নজরে পড়ল একজন সেপাই বজলকে দৌড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। বজল লাফ দিল। তার পা-টা লোহার পাতের মাথা চোখা বেড়ার উপরটা অল্প স্পর্শ করল মাত্র। রকীবার বুকটা ধড়াস করে উঠল, বজল ততক্ষণে বেড়ার অপর পাশে জংগলের মাঝে তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেছে। হতভম্ব রকীবা পাগলের মত বেড়ার দিকে দৌড়াল। পরক্ষণেই তার পিঠের উপর লাঠির একটা প্রচণ্ড আঘাত।

সে দিন আর রকীবের বনগাঁ যাওয়া হল না। সুপারী, তেলের টিন, ট্যাঁকে যা কিছু ছিল সর্বস্ব দিয়ে তবে নিস্তার। রকীবার মাথা টন টন করছে। পিঠে জ্বালা আর ব্যথা। হাত দিলে টের পাওয়া যায় পিঠের চামড়া যেন বাইন মাছের মত হয়ে ফুলে উঠেছে। প্লাটফরমের উপরই সে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

ফিরতি গাড়ীতে যারা বেনাপোলে নামল তাদের দেখে রকীবার মনে হল কেউই কমে নি। অন্যান্য দিনের মত পুরা দলটাই ফিরে এসেছে। এদের সংগেই মেরা ও বজল গাড়ী থেকে নামল।

রকীবা ছুটে গিয়ে বজলকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—কোথাও লাগেনিত রে?

কানের আধ পোড়া বিড়িটা ধরাতে ধরাতে বজল জওয়াব দিল—দূর, লাগবে কেন? দেখেছিলি না কি—আমার লাফ দেওয়াটা? বাবা, কত পেট্রিস করে শিখেছি। পুলিশের বাবার সাধ্য আছে ধরবে।

নাক দিয়ে ধোয়া ছেড়ে ফিল্মী কায়দায় ভংগী করে বজল।

ছেলের বীরত্বে রকীবাও যেন কিছুটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

মেরা মায়ের কাছে এগিয়ে এসে পান চিবাতে চিবাতে বলে,—দেখি মা তোর কোথায় লাগল?

পরম স্নেহে মায়ের পিঠে বা হাতটা বুলায় মেরাজান।

রকীবা চুপ করে থাকে।

কিছুক্ষণ পর, মেরা আঙ্গুলের ডগা হইতে বাড়তি চুন টুকু দাঁতে কেটে নিয়ে ঠোঁটটাকে একটু বাঁকিয়ে বলে—মা, তোরও যেমন, বললে ত শুনবি না। বলেছিলাম না, খাতিরে কাজ হয়। দেখলি, ধরতে পারল আমাকে? খিক খিক করে মেরা আত্মপ্রসাদে হেসে ওঠে।

রাগ করে রকীবা—ঝাড়ু মারি অমন খাতিরের মুখে। মুখপুড়ী, দাঁত সিটকাবি না বলছি।

তেরছা করে হেসে মেরা বলে—তা হলে পড়ে পড়ে মার খা'। যেমন আক্কেল।

বাড়ন্ত শরীরে একটা ঝাকানি দিয়ে মেরা টিন হাতে সরে পড়ে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুয়ে শুয়ে রকীবা পিঠের ব্যথায় কঁকায় আর ইষ্টিশনের দিকে চায়। ঘুম আসে ন। বজল পাশে শুয়ে নাক ডাকায়। মেরাজান আজ আর ফিরে নি। সেই যে বেনাপোলে দেখল, ফেরার আর পাত্তা নেই। জমিলা, জৈতুন এদের প্রায় সকলের কাছেই রকীবা খবর নিয়েছে কিন্তু সঠিক খোঁজ কেউই দিতে পারে নি। যে ব্যাপারীর ঠিকায় মেরা কাজ করে তার লোকজনের কাছেও খবর নিয়েছে। মেরা নাকি নন্দর কাছেই বেনাপোলে মাল সমঝিয়ে দিয়ে কোথায় সরে পড়েছে। নন্দকেও খুঁজে পায় নি রকীবা। সে নাকি কিছুটা বাড়তি লবণ এসেছিল। তাই নিয়ে একেবারে যশোর চলে গিয়েছে। নাভারণের কাজটা ঠিকমতই সেরে দিয়ে গেছে। বেশ লেখাপড়া জানা ছেলে নন্দ, কিন্তু কেমন যেন পাগলাটে পাগলাটে।

রাত যতই বাড়তে লাগল, পিঠের ব্যথা ছাপিযে ততই মেরাজানের জন্য রকীবার দুশ্চিন্তা বাড়তে লাগল। যদি খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে থাকে? কাস্টমের অফিসারগুলি একদিক থেকে মন্দ নয়। এদের নিয়ে বড় মাথা ঘামায় না। তারা আছে তাদের তালে। গাড়ী শুধু তল্লাশীই করে। কি যে পায়

তা'রাই জানে। খুব ভাল লোক কি না তাই বা কে বলতে পারে? সন্দেহ জাগে রকীবার মনে। ব্যাপারী দালালদের সঙ্গে হয়ত যোগ-সাজস আছে, তাই রা করে না। কিন্তু ঐ যে সেপাইগুলি, তা বনগাঁয়েরই হোক আর বেনাপোলেরই হোক ভালোর ভালো আর খারাপের খারাপ। দু' দেশের হিন্দু-মুসলমানে এত যে মরামারি কাটাকাটি, এদের কাছে তা কিছু নয়। কেমন মিল-ঝিল। খাও দাও আর ফূর্তি কর, মাঝে মাঝে শুধু খবরদারী আর পয়সা কুড়ানো। কোন্ মেয়ের গতরটা একটু ভাল তাই খোঁজ নেওয়া ; তা এপারেই হোক আর ওপারেই হোক। অবশ্য সাড়ে সতেরোয় একদিন বড় সাহেবরা এলে তোড়জোড় করে লাঠির কেরদানী দেখানো। এদের বিশ্বাস করা যায় না। বদমায়েসের হাড্ডি সব। বিয়েশাদী একটা না দিলে মান ইজ্জত আর রাখা যাবে না। বিয়ের কথা মনে পড়ায় রকীবার মনে অনেকটা স্বস্তি জাগে। দু' একদিন কথাটা কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিল কিন্তু এক নন্দ ছাড়া সবাই বলে আরও বড় হোক। নন্দ ছেলেটা লেখাপড়া জানে মনে হয়, বড় বড় কথা বলে। বোধ হয় বই-পুথির শেখা কথা। একদিন নিজেই সে বলেছিল—চাচি, তোর মেহেরকে বিয়ে দে। হিন্দু-মুসলমান যাই হোক ছেলে একটা হলেই হল। আমাদের আবার জাত বেজাত কি? আগের কালে হিন্দুদের কাজ দিয়ে জাত ঠিক হত। কিছুদিন পর দেখবি—বনগাঁয় বেনাপোলের আমরা সবাই একজাত হয়ে গেছি। আমার ছেলে বা নাতির নাম হবে অমুক চন্দ্র স্মাগলার। এমনি সব পাগলাটে কথা। সব কথা গুছিয়ে রকীবার মনে পড়ে না। কিন্তু যে যাই বলুক, মেয়ের শাদী নিয়ে কথা—জাত বেজাতের প্রশ্ন আসে বৈকি। জাত ধর্ম ত আর দেশ থেকে উঠে যায়নি। এখনও চান্দ সুরুজ উঠে। রকীবা ভাবে, নন্দর সঙ্গেই ব্যাপারটা নিয়ে কাল আরেকবার আলোচনা করবে।

রাত তিনটার গাড়ীর ঘণ্টা পড়ার সংগে সংগেই রকীবা উঠে ইষ্টিশনের দিকে পা বাড়াল। এই গাড়ীতেও মেরা আসতে পারে।

আসুক হারামজাদী আজ। এত রাত বাইরে থাকা বের করছি। রকীবা মনে মনে গরজায়।

মেরা সত্যি সত্যিই গাড়ী থেকে নামল। ঢুলু ঢুলু চোখ, শ্লথ গতি। কেমন যেন খোড়ার মত পা টেনে টেনে প্লাটফরমের বাইরে বেরিয়ে এল। রকীবা একটু অন্ধকার জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। মেরা বাইরে আসতেই খপ করে খোপাটা চেপে ধরে চাপা গলায় গর্জিয়ে উঠল।

হারামজাদী, বল কোথায় ছিলি?

মেরা বোধ হয় এমন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতই ছিল, ভড়কাল না। বরঞ্চ বেশ তিক্ত গলায়ই জবাব দিল—যেখানেই থাকি, তোর কি?

রকীবার মাথায় যেন খুন চড়ল। চটপট পিঠে মাথায় কিল-চড় চালা'তে শুরু করল।

হারামজাদী খান্‌কী, মান-ইজ্জত রাখলি না।

মেরা ফোঁপাচ্ছিল, ঘোঁৎ করে উঠল—ও, বড় ইজ্জতওয়ালারে। চোরাই কারবার করেন - আবার মান।

কথা কইস না হারামজাদী, সারাদিন ছিনালী করে আবার তেজ দেখায়। খবরদার আমাকে আর মা বলে ডাকবি না। বারান্দায় আর উঠবি ত তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

থপ্‌থপ্ করে পা ফেলে নিজের জায়গায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল। মেয়ের চরিত্রহীনতার অপমানে সারা আগে যেন সে বিছুটির জ্বালা অনুভব করছে। এমন মেয়ে পেটে ধরেছি। বলে তার নিজের সত্তাটাই যেন অপবিত্রতার গ্লানিতে কালো হয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ পর টের পেল মেরা এসে ছোট ভাইয়ের কাছে শুয়ে পড়েছে। রকীবা চোখ মেলল না। একটা বোবা করুণা অবসাদের আকারে তাকে চেপে ধরে ঝিম লাগিয়ে দিয়েছে। সে নড়তেও পারল না।

একখানা হাত রকীবার পিঠে পড়ল। জায়গাটায় মেরা হাত বুলাচ্ছে। কাঁচের চুড়িগুলি টুন টুন করে বাজে। রকীবা নির্জীবের মতই চুপ করে রইল।

এই মা, ঘুমিয়ে পড়েছিস।

রকীবা চুপ।

খুব লেগেছিল, না'রে?

রকীবা উঃ করে শব্দ করল।

জানিস মা, ওই যে কপালে মোটা আচিলওলা সাদেক আর বনগ্রামের সুরেন্দ্র,—তারা বলেছে আমাদের কোন ভয় নেই। বিপদে আপদে তারাই দেখবে।

পেট্রলের মধ্যে জ্বলন্ত দেয়াশলাইর কাঠি ফেলে দিলে যে ভাবে দপ করে জ্বলে উঠে, রকীবার মগজও যেন সেই ভাবে জ্বলে উঠল। অন্ধকারে হাত নাড়ার সময় একটা আধ-পোড়া চেলার গায়ে হাত লেগেছিল—নিঃশব্দে তাই তুলে দমা দম মেরাজানের উপর চালাতে লাগল। চীৎকার করে মেরা অন্ধকারের ভিতর মিশে গেল। ঘুমন্ত বজলের উপরও দুই এক ঘা পড়েছিল, সেও কেঁদে উঠল। রকীবা সুর তুলে অশ্রাব্য ভাষায় মেরার উদ্দেশ্যে গাল পাড়তে লাগল। সোরগোলে লোকজন উঠে পড়েছিল, তারা এসে জোট পাকাল। রকীবাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

বাকী রাতটুকু রকীবা আর ঘুমাতে পারল না। বজলকে বুকের মাঝে চেপে ধরে পড়ে রইল। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল। কিসের দুঃখ তার। রকীবা নিজের মনকেই প্রশ্ন করে। যে মেয়ে মান-ইজ্জতের ধার ধারে না, তা'র সংগে কিসের সম্পর্ক? সে যেখানে খুশী যাক, রকীবা আর তা'র মুখ দেখবে না। মেয়ের ইজ্জত বন্ধক দিয়ে পয়সা রোজগার করবার আগে যেন তা'র মরণ হয়। মেরাজান তার মেয়ে নয় : কোন খান্‌কীর মেয়ে হয়ত ভুল করে তা'র পেটে এসে জায়গা নিয়েছিল কে জানে। ভোরের দিকে রকীবার চোখ দুটা জড়িয়ে এল।

চলতি গাড়ীতে বসে, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে সুখ দুঃখের কথা হয়। একদিন জামিলা বলে—মেরাকে কি সত্যি বিদায় করে দিলি নাকি? এ লাইনে এসব ধরলে চলে না। হাজার হোক পেটের মেয়ে ত'। বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া ধন।

গুম হয়ে থাকে রকীবা কিছুক্ষণ, তার পর শান্ত কণ্ঠে বলে—একটা কথা এত দিন তোকে বলিনি বু', মেরা আমার পেটের মেয়ে নয়। বিন্নার ঝোপে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম।

শেষের কথাগুলি খুব কষ্টে উচ্চারণ করে রকীবা। গাড়ী চলার খট খট শব্দে গলার আওয়াজের বিকৃতি হয় ত জমিলা ধরতে পারেনি।

শাড়ীর আঁচল দিয়ে রকীবা দু' চোখ চেপে ধরে। এক গাড়ী লোক। পায়ে পায়ে ঠাসা।

একটা কঁকিয়ে উঠার শব্দ জমিলার কানে যেতেই সে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল—কি হল রকীবা!

আঁচলের মধ্যেই মুখ রেখে রকীবা জবাব দিল—কিছু না, চোখে কয়লা পড়েছে।

তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দায় শুয়ে রাতের আঁধারে, বজলকে বুকে চেপে ধরে রকীবা চোখের পানি ফেলে। আঁচল আর চাপা দিতে হয় না। মেরা গেছে—যাক। বজল তা'র সোনা মাণিক। ঘুমন্ত বজলের মুখটা নিজের বুকের উপর চেপে ধরে। যেন কোলের শিশুকে দুধ খাওয়াচ্ছে।

একদিন বেনাপোলের ডিস্ট্যাণ্ট সিগনালের কাছে গাড়ীটা থামতেই হৈ হৈ একটা রব উঠল। একটি ছেলে কাটা পড়েছে। নীচের রডে বসে আরেকটি ছেলের সঙ্গে বিড়ি নিয়ে ঝগড়া করছিল। ফল যা হবার হয়েছে। এতগুলি লোকের মুখে মুখে ছেলেটার পরিচয় তালগোল পাকিয়ে হোঁচট খেতে খেতে রকীবার কানে যখন পৌঁছল তখন গাড়ী আবার চলতে শুরু করে দিয়েছে। শফিক, মনীন্দ্র না হয় বজল। এই তিন জনের মধ্যেই একজন। ঘটনা ঘটেছে দুই দেশের সীমানার পাথরটার কাছে। তেলের টিনটা হাতে নিয়ে রকীবা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। যে যা'র জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে উঠে পড়ল। চলন্ত গাড়ী থেকে কয়েকটি কণ্ঠ চীৎকার করে উঠল—ও রকীবা, তাড়াতাড়ি উঠ। জলদি কর।

রকীবা পাথর।

গাড়ীটা যখন অনেকখানি এগিয়ে গেল, রকীবা তখন হাতের টিনটা সেখানেই ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে লাইন ধরে বনগাঁয়ের দিকে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

শুধু রক্ত আর রক্ত।

মানুষ বলে চিনবার যো নেই। থেঁতলিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে বীভৎস আকার ধারণ করেছে।

মনীন্দ্রেরও হতে পারে, শফিকেরও হতে পারে। হঠাৎ নজরে পড়ল একখানা অক্ষুণ্ণ হাত আর সেই হাতের আঙ্গুলে পিতলের আংটি। রকীবা আর কিছুই টের পায়নি শুধু সমস্ত রেল লাইনটা যেন ঘুরতে ঘুরতে একটা রক্তের বন্যার মত এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

পাশের গ্রামের একটা পড়ো দালানের দাওয়ায় অসুস্থ অবস্থায় ক'দিন পড়ে ছিল রকীবা। হয়ত কোন সহৃদয় গ্রামবাসী লাইন থেকে উঠিয়ে এসেছে। টের পায়নি।

রকীবা ভাবে—মেরাজান খবর পেলে নিশ্চয়ই ছুটে আসত, কিন্তু পরমুহূর্তেই মনের গলাটা টিপে ধরে ভাবনাটার দম বন্ধ করে মারতে চায়। না, না, মেহেরজান বলে কেউ তার কোন দিন ছিলই না। ধুঁকে ধুঁকে মরবে—সেও ভাল।

এই ক'দিনেই যেন বয়স তার দশ পনের বৎসর বেড়ে গিয়েছে। পিঠটা বাঁকা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে গেছে। ভর না দিয়ে ভাল করে চলতে পারে না। রাস্তার পাশ থেকে একটা বাঁশের টুকরা কুড়িয়ে তাতেই ভর দিয়ে রকীবা কোণাকোণি পথে ভিক্ষা করে করে তিন দিনে সরসপুরে এসে পৌঁছাল।

নিজের ঘরটার শুধু ভিটির চিহ্ন আছে আর কিছুই নেই, শুধু একটা পোতা। ক্লান্ত রকীবা পোতার উপর বসে পড়ে বজলের মৃত্যুর পর এই প্রথম চোখের পানি ফেললল।

কাজ পাবার আশায় বাড়ী বাড়ী ঘুরে রকীবা। যেখানেই যায় সেখানেই প্রশ্ন হয়—বলি রকীবা, তোর মে'রা আর বজল কোথায়!

নোংরা ছেড়া আঁচল দিয়ে চোখ মুখে রকীবা উত্তর দেয়—মরে গেছে।

আহা-হা, কি করে ম'ল!

গাড়ীতে কাটা পড়ে।

সবাই আহা-হা করে, কিন্তু চাকরি দেয় না কেউই। হয়ত বা সাত কলস পানি আর দুটা ঘর লেপানোব বদলে দেয় আধ থালা পান্তা ভাত। মুখে রুচে না, তবু ভূতের মুখে জোর করে গিলে।

মজিদ একদিন বলে—ও চাচি, তুই যে বল্লি, মেহেরজান মারা গেছে—তা আমি যে সেদিন দেখে এলুম বনগাঁয়ে। কি সুন্দর যে লাগল—কি করে বোঝাই, যেন ভদ্দরলোকের মেয়ে। তা ব্যাপারখানা কি বল দিখি?

রকীবা ফ্যাল ফ্যাল করে চায় যেন সে ধরা পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর উত্তর দেয়—তা বাবা এতলোকের মাঝে কাকে কি দেখলে তার ঠিক নেই আব বলছ আমাব মে'রা। আমার মেরা যদি—

কথাগুলি বলতে বুকটা ফেটে যাচ্ছিল—হঠাৎ হাউ হাউ করে রকীবা কেঁদে উঠল।

মজিদ থতমত খেয়ে রকীবার পিঠে হাত দিয়ে বলে—কেঁদে কি হবে চাচি,—আল্লার মর্জি।

মজিদ ভাবে হয়ত তার নিজেরই ভুল হয়েছে। এত মেয়ে-ছেলের মাঝে কোথাকার কাকে দেখে দেখে সে হয়ত ভুল করে বসেছে।

শরীর কিছুটা সেরেছে কিন্তু আগের মত যেন আর বল পাওয়া যায় না। বড় ক্লান্ত মনে হয়।

শুধু দু'মুঠো পান্তাভাতের বদলে এত খাটনী আর রকীবার সহ্য হয় না। না খেতে পেলে শরীর সারবে কি করে। তবু মরি বাঁচি করে দিন কাটিয়ে দেয়। দীর্ঘ ক্লান্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা দিন।

শরীফ মোল্লাদের মস্ত বড় খামার। অর্ধেক রাত্রি জেগে রকীবা তাদের প্রায় পনের বিশ টিন ধান একা সিদ্ধ করেছে। পরদিন রোদ উঠতেই উঠানে মেলে দিয়ে লম্বা বাঁশে হাঁস মোরগ তাড়াচ্ছে। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়ে নি। তার উপরে ভ্যাপসা গরম। রকীবার একসময় ঝিমুনি এল।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রবল ধাক্কা অনুভব করে ব্যাপারটা বুঝবার আগেই টের পেল পেটে পিঠে লাথি পড়ছে। সংগে সংগে বাড়ীর মালিকের তৃতীয় বউয়ের গর্জন—

বুড়ী মাগী, কাইর কাইর ভাত খায় পড়ে পড়ে ঘুমায়। নাক ডাকায়। রাজ্যের সব মোরগ এসে আমার সব উজাড় করে দিল সে হুঁশ নেই।

রকীবার কপাল কেটে তখন রক্ত চুয়াচ্ছে।

শ্লথ পায়ে রকীবা বাড়ীর বাইরে এসে কাঠাল গাছটার নীচে স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। কেউ সমবদেনা জানাল না বা ফিরে যাবার জন্য ডাকলও না। তারপর এক সময় রকীবা রাস্তা ধরল। কপালের রক্তের ক্ষীণ ধারাটি যেন তাকে লোহার লাইন পাথর আর শ্লিপারের উপর ভেসে যাওয়া কোন বৃহত্তর রক্ত ধারার দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। বজল গিয়েছে—সেও যাবে। কিন্তু মেরা গেল না কেন? সে-ও হয়ত গিয়েছে কে জানে। কথাটার নৈশব্দিক উচ্চারণেই সে শিউরে উঠল। বালাই, ষাট, মরবে কেন--বেঁচেই বর্তেই থাক। ছিনাল বেশ্যার পেশা নিয়ে যদি পেট চালাতে পারে—তবে তাই করুক। রকীবার তাতে কি! মেয়ে বলে স্বীকার না করলেই হল। মে'রা তার কে! কিছু না। বিন্না ঝোঁপে পাওয়া—পালিতা মেয়ে।

প্রথম যৌবনের প্রথম পোয়াতি রকীবা মে'রাকে পেটে ধরে যে অস্বস্তি অনুভব করত তেমনি একটা উপলব্ধির স্মরণে তার চোখ ফেটে পানি ছুটল। কপালে হাত চাপা দিয়ে সে ইষ্টিশনের পথেই চলতে লাগল। নিশি পাওয়া পদক্ষেপ।

একটা পেট বইত নয়। না হয় মহাজনকে বলে কয়ে দু'তিন দিনে একবার খেপ দিবে। খোদার রাজ্যে বিচার যখন উঠেই গেছে, গতর খাটিয়েও যখন মানুষের মত মোটা ভাত মোটা কাপড়ে বেঁচে থাকা যায় না, তখন ওই চুরির পথই ভাল। যে পথে বজল গিয়েছে, সেই পথে সে-ও যাবে। পেট ভরা থাকলে লাথিটা চড়টাও খাওয়া যায়। রক্ত যদি ঝরে, তবে চুইয়ে চুইয়ে ঝরবে কেন---গল গল ধারেই ঝরুক। এক সংগে সব শেষ হয়ে যাক। কিন্তু এই অবস্থা দেখে মেরাজান যদি এগিয়ে আসে! বলে তোকে কিছু করতে হবে না, আমিই ত আছি। হাজার হোক পেটের মেয়ে ত'। না—না, মেরা সম্বন্ধে কোন দুর্বলতাই সে মনে স্থান দেবে না। মেরা তার কেউ না—কেউ না, কোন দিন কিচ্ছু ছিলও না।

এইবারে আর নাভারণের তালেব মিয়া মহাজনের বারান্দা নয়। সেখানে আর পা ফেলবার জায়গা নেই। নূতন লোক জুটেছে।

অনেক হাঁটা হাঁটি করে কলিমুদ্দিনের সংগে চুক্তি হল। তারই পড়ো গুদাম ঘরটার পিছনের একচালায় জায়গাও পেল।

নূতন মহাজনের ঘর থেকেই পাওয়া গেল মবিলের টিন। কিছুটা চট জোগাড় করে, সূচ সুতলি চেয়ে এনে থলেও তৈরি হল।

আবার সেই দশটার গাড়ী।

প্রথম দিনেই বেনাপোলে চোখে পড়ল মেরাকে। চেনা যায় না যেন। নূতন লাল-সবুজ চেক শাড়ী, ছাপার ব্লাউজ। এক্‌পোচ পাউডারও হয়ত লাগিয়েছে পুষ্ট মুখের উপর। চোখ ফিরানো যায় না। রকীবা চোরের মত সন্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চায়---বিদ্রোহ করা মনটা হয়ত পাহারা দিচ্ছে। কখন ধরা পড়ে যায় কে জানে।

পুরানো পরিচিতরা ছেকে ধরে।

ছিলি কোথায় এ্যাদ্দিন।

এমন হোল কি করে।

রকীবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জওয়াব দেয়—যাব কোন চুলায়। অসুখ করেছিল।

গাড়ীটা ছাড়ছে না। কাস্টমের চেকিং শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু কেন দেরী করছে কে জানে।

রকীবা প্ল্যাটফরমের পেছন দিকে— রেলিং-এর কাছে একটা নুড়ি পাথরের স্তূপের উপর একা একা বসে সুপারী চিবাচ্ছিল। পিছন থেকে মেরা এসে তার পিঠে হাত রাখল।

রকীবা নিরুদ্বিগ্নভাবে মাথা ঘুরাল।

এ্যাই মা।

প্রকম্পিত করুণ অথচ মিষ্টি দুটা শব্দ। বহু বছরের পরিচিত।

অন্তরের নিরুদ্ধ মণিকোঠার গলা টিপে রাখা অন্ধ মাতৃত্বটা যেন সশব্দে ঝলকিয়ে উঠে আত্মপ্রকাশ করল।

মেরা!

কিন্তু পর মুহূর্তেই ঝটতি বেগে উঠে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ল—ছিনালীর আর জায়গা পাস না! মা ডাক গিয়ে যে বেবুশ্যে তোকে পেটে ধরেছিল, তাকে। কোথাকার কোন আঁস্তাকুড়ের ময়লা- -আমাকে বলে কি না মা।

রকীবা একটা অদ্ভুত অংগ-ভংগী করে সামনের দিকে হন হন করে এগিয়ে গেল।

দু-একজন ব্যাপারটা দেখে কিছুটা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। পিছু ধাওয়া করে রকীবাকে জেরা শুরু করল। সে একটি প্রশ্নেরও জওয়াব দিল না। রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দশটার গাড়ীতে যাওয়া আর পাঁচটার গাড়ীতে ফিরে আসা। জীবন সংস্থানের দুরূহ পরিক্রমা।

শরীরে যথেষ্ট বল হয়েছে। আর কিছু না হোক, দু'মুঠো ভাত ও পেট ভরে খাওয়া যায়।

আজকাল সকলের মুখে মুখে একটা কথা ঘুরে ফিরছে। সেপাইরা নাকি গুলি করে চোরা কারবার বন্ধ করবে। কাগজে নাকি লিখেছে। কেউ বলে ধরে নিয়ে গুলি করবে। কেউ বলে গুলি করে ধরবে। নানা মুখে নানা কথা। তবে গুলি যে করবে এই সত্যটুকু সবার মুখেই এক—শুধু সময়ের তফাৎ। মহাজনেরা বলে করুক দেখি,—কত গুলি করতে পারে। বন্দুকের নলের মুখেও ছিপি আটা যায়--বুঝলি? চান্দির ছিপি। তোরা কিচ্ছু ঘাবড়াবি না।

রকীবার ভয় হয়, গুলির ভয়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবে - করুক না গুলি। চুইয়ে চুইয়ে ত রক্ত পড়বে না—বজলের মত হয়ত লহমার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাবে। ত'ছাড়া এত শ'তে বিশতে যদি ভয় না পায়, তবে সেইবা পাবে কেন। গুজবটা উঠার পর থেকে কমেছে নাকি কেউ! না লাইন ছেড়ে দিয়েছে?

কিন্তু সত্যই একদিন ঝামেলা বাধল। বেনাপোলে গাড়ী থামার সংগে সংগেই ধুম ধুম করে শব্দ হল। লোকজনের চিৎকারে প্ল্যাটফরম মুখরিত হয়ে উঠল। ছেলে-মেয়ে-বুড়া-বুড়ী যোয়ান সকলেই প্রাণ হাতে করে বিশৃঙ্খলভাবে ছুটাছুটি করছে। হাটের মধ্যে একটা পাগলা মহিষ ঢুকে পড়লে যে বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি হয় তেমনি যেন একটা কিছু হয়েছে। রকীবা গার্ডের গাড়ীর সংগে লাগানো একটা কামরায় ছিল। মাটিতে নেমে হতভম্বের মত গাড়ীটার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। সন্ত্রস্ত চিৎকার-কলরবের মাঝে গুলি গুলি শব্দের কাটা আওয়াজ। রকীবার বুকে আত্মরক্ষার আকুল মত্ততা। চোখে মৃত্যু-ভয়ের বিভ্রান্তি।

রেলিং যেখানে শেষ হয়েছে সেদিকে সেপাই সান্ত্রী যেন অপেক্ষাকৃত কম। লোকজনও যেন সে দিকে বেশি দৌড়াচ্ছে না। এই কি সুযোগ! ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালনে হঠাৎ রকীবার নজরে পড়ল ইষ্টিশনের পাশে প্ল্যাটফরমের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে মেরাজান এক সেপাইর সংগে হেসে হেসে কি আলাপ করছে। মুহূর্তে রকীবার মনে পড়ল মেরার সেই কথাগুলি—"তা'রা বলেছে, বিপদে আপদে তা'রা দেখবে। আমাদের কোন ভয় নেই।"

না, না, মরণ,—সেও ভাল। পেটের মেয়ের যৌবন বেচে-বেচে থাকতে চাই না।

ধুম ধুম করে আরও কটা শব্দ হল। কয়েকজন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পড়ে গেল। এমনিই কি সব লাল হয়ে যাবে! সীমানার পাথরের কাছে লাইন স্লিপার, পাথরের মত! রকীবা হাতের টিন ফেলে দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে রেলিং-এর শেষ মাথা পার হয়ে পাশের ঝোপের দিকে দৌড়াল।

একজায়গায় হোঁচট খেয়ে সে পড়ে গেল। না উঠে এই জায়গায় লুকিয়ে থাকলেও হয়। কথাটা মনে পড়তেই দেখল একজন সেপাই তা'রই দিকে ধাওয়া করেছে, হাতে লাঠি না বন্দুক কে জানে। রকীবা মরি-বাঁচি করে দৌড়াতে লাগল। পরনের কাপড় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন--কাঁটায় লেগে অনেক জায়গায়

রক্ত ঝরছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েক পা যেতেই ঝোপের ভেতর থেকে আরেকজন সেপাই তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত এগিয়ে এল। লহমার মধ্যে রকীবা চিনতে পারল—কপালে সেই মোটা আঁচিল—কি নাম যেন তার। হাতে কি বন্দুক?

রকীবা রুদ্ধ নিশ্বাসে অতিকষ্টে যেন চিৎকার করে উঠল "আমি, আমি মেরাজানের মা। চিনতে পারছ না!"

বিমল কর

জননী

আমরা ভাইবোন মিলে মার পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল। সবার বড় ছিল বড়দা, মার উনিশ বছর বয়সের ফল। প্রথম বলে বড়দা মার সেই বয়সের রূপ যতটা পেরেছিল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে জগতে এসেছিল। শুনেছি, ঠাকুরমা বলত, অত রঙ অমন মুখ চোখ নিয়ে যদি এলি, তবে দাদু, মেয়ে হয়ে এলি না কেন?

ঠাকুমার ক্ষোভ বছর দুয়েক পরে মা মিটিয়ে দিল। এবার এল বড়দি। পুরুষমানুষ বলে ওপর ওপর থেকে মার রূপ চুরি করেছিল, বড়দি মেয়ে বলে আমাদের মার অন্তর থেকে সব যেন শুষে নিয়ে ঠাকুরমার কোলে এসে পড়ল

নয়নের মণির মতন করে ঠাকুরমাবুড়ি বড়দিকে তিনটি বছর আগলে আগলে রেখে, লালন-পালন করে, ঝুলন পূর্ণিমাতে মারা গেল। বুড়ি মারা যাবার সময় আমাদের তিন বছরের বড়দিকে মরণের ঘোরে রাধাকৃষ্ণর গল্প শোনাচ্ছিল। শোনাতে শোনাতেই স্বর থেমে গেল।

আমরা এ-সব গল্প মা-বাবার কাছে শুনেছি। বাবাই বেশি বলত। বাবারই অতীত-মোহ অতিরিক্ত ছিল।

বড়দির পর আমাদের মেজদা। মেজদা বাবার মতন। অবিকল বাবার মুখের আদল তার। সেই রকম লম্বা লম্বা হাত। গায়ের রঙ একটু তামাটে।

ছোট আর আমি মাত্র দেড় বছরের এদিক ওদিকে জন্মেছি । ছোটকে আমি দিদি বলি নি কোনকালে, আজও বলি না। ছোট আমাকে ছেলেবেলায় 'কড়ে' বলত, মানে কনিষ্ঠ। তার খেপানো ডাক থেকেই আমার ডাক নাম কড়ি হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের সংসারে প্রথম শোক এল বড়দির বিয়ের পর। তার স্বামী খারাপ রোগে ভুগেছিল। বড়দির প্রথম ছেলেটা হল নাক ভাঙা, বিকলাঙ্গ। মরে গেল। পরে আরও একটা পেটে এসেই নষ্ট হয়ে গেল। স্বামীর রক্তে কোন রোগের পোকা বংশবৃদ্ধি করেছে ততদিনে বুঝতে পেরে গিয়েছে বড়দি। নিজেও ভুগছিল। একদিন স্বামীকে ঘরের মধ্যে পুরে বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিয়ে বড়দি চলে এল, আর স্বামীগৃহে যায়নি।

বড়দির পর, দ্বিতীয় শোক, মেজদার অন্ধ হওয়া। মেজদা দানাপুর যাচ্ছিল কাজে। ট্রেনে বড় ভিড়। যাত্রীরা ভেতরে ঢোকার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। মেজদা পান কেনার জন্যে জানলা খুলে পানঅলা ডাকছিল। এক দঙ্গল বেহারীকে আসতে দেখে গোলমালের ভয়ে কাঁচের জানলা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকল। তারা প্রথমে দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করল, পরে জানলার কাছে এসে ক্ষিপ্তভাবে কি বলছিল। কামরার লোক মেজদাকে জানলা খুলতে বারণ করল। তখন খুব আচমকা বাইরে থেকে

একটা লোক তার টিনের সুটকেস জানলায় ছুঁড়ে মারল। কাঁচ ভেঙে তার ধারালো ফলা মেজদার চোখে মুখে ঢুকে গেল, রক্তে তার সর্বাঙ্গ লাল হল।...হাসপাতালে একটানা ছ'মাস কাটিয়ে বেচারী ফিরে এল বাড়িতে ; তার দু'চোখ সেই নির্বোধ সুটকেসঅলা অন্ধ করে দিয়ে ভিড়েই মিশে থাকল।

আমাদের তৃতীয় শোক, বাবার মৃত্যু। বাবা সন্ন্যাস রোগে মারা গেল! মার কাছে বাবা স্নান করছিল। অল্প অল্প জ্বর ছিল গায়ে। মা ঈষদুষ্ণ জলে বাবার গা ধুইয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছিল ; বাবা মার কোলের ওপর হঠাৎ শুয়ে পড়ে কি বলতে গেল, পারল না ; মৃত্যু এসে বাবার মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা থামিয়ে দিল। বাবা তৈরি ছিল, চলে গেল।

বাবার মৃত্যুর বছর দুই পরে আমাদের চতুর্থ শোক এল। ছোট বড় জেদী। চিরকালই সে যখন যা ঝোঁক ধরেছে, করতে গেছে। আমি তাকে কত বলেছি, ওভাবে জেদ ধরে কাজ করতে যাস না। তুই সব পারবি এমন কোনো কথা নেই।...আমার কথা ছোট গ্রাহ্য করত না। তার ধারণা ছিল, সে চেষ্টা করলে সব পারে। ছোট এ-সব বুঝত না। বুঝতে চাইত না। অকারণে সে মেতে থাকত। তার কাজের অন্ত ছিল না, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের বালাই ছিল না। সকালে মিশনারীদের অনাথ-আলয়ে গৃহিণীপনা করত, দুপুরে বড়দির সঙ্গে শখের চাকরি করতে যেত স্কুলে, বিকেল আর সন্ধেবেলায় ফুলবাজারের সেই ঝুপসি ঘরটায় লণ্ঠনের টিমটিমে বাতির আলোয় বসে ওর দলের ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে রাজনীতির কাজ করত।...একদিন ছোট বুঝতে পারল তার বয়সে যতখানি জীবনীশক্তি স্বাভাবিক, তার অনেক বেশি সে অত্যন্ত হঠকারির মতন ব্যয় করছে। এখন তার জীবনের কলসি প্রায় ফাঁকা। ডাক্তার বাবু স্পষ্টই বলে দিল, আর ওঠা-চলা নয়, বেশি কথা বলাও না। বিছানায় শুয়ে থাকা। ইনজেকসান ওষুধ, ভাল ভাল খাওয়া আর চুপ করে পড়ে থাকা। ছোট বলল, তাহলে আমি মরে যাব। জবাবে ডাক্তারবাবু বলল, দেখা যাক.....।

সেই থেকে ছোট বিছানায়। বছর পুরো হয়ে গেছে। আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

আমার সংসারে পঞ্চম শোক এসেছে সদ্য। মা বাবা যাবার পর। এই ফাল্গুনের গোড়ায় মা চলে গেল। মার মাথায় চুল সাদা হয়েছিল, গালের চামড়া দুধের জুড়োনো সরের মতন কুঁচকে এসেছিল। কপালভরা দাগ আর আধপাকা ছানি চোখে নিয়ে মা বিদায় নিল। যাবার সময় দেখে গেল তার হাতের পাঁচটি আঙুলই একে অন্যের পাশে রয়েছে।

তখনও সকালে হিম পড়ে। আমাদের দোতলার বড় বারান্দা শিশিরে ভিজে রয়েছে। সূর্য ওঠেনি, রঙ ধরেছে সবে ; মার বিছানার চারপাশে আমরা পাঁচজনে দাঁড়িয়ে, মা চলে গেল।

বড়দা আগেই বলেছিল, আমরা বারোয়ারী শ্মশানে মাকে নিয়ে যাব-না, আমাদের বাড়ির বাগানে দাহ করব, পরে সেখানে একটা বেদী করে রাখব।

বিঘেখানেকের ওপর জমি নিয়ে আমাদের দোতলা বাড়ি। পাঁচ বিঘের বাগান। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। উত্তরের দিকে, যেখানে করবীর ঝোপ, স্থলপদ্মর বাশিকৃত গাছ, ঘাসের জঙ্গল—সেই দিকটা মাকে দাহ করার জন্যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম। ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করে কদমগাছটাকে মাথার কাছে রেখে মার চিতা তৈরি হল, পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা দাঁড়িয়ে থাকল—আমাদের বাবার মতন দেখাচ্ছিল তাকে। তারপর মার দাহ হল।

যখন আগুন তার অকলুষ শিখা বিস্তার করে মার শরীর আগলে রেখেছিল তখন আমি আমাদের পাঁচজনকে দেখছিলাম। বড়দা খানিক ছায়ায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চিতার দিকে তাকিয়েছিল, মাঝে মাঝে কি বলছিল ; বড়দি কদমতলায় মাটিতে গালে হাত দিয়ে বসেছিল ; মেজদা বড়দির পাশে আসন-পা করে বসে, দু'হাত বুকের কাছে,-তার অন্ধ চোখ চিতার দিকে ; কাঠচাঁপার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছোট ফোলা ফোলা মুখ করে বসে ; আমি ছোটর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

ছোট এক সময় বলল, 'এখন কি জল খেতে আছে রে, আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে।'

আমি কিছু জানতাম না। বললাম, 'এখন না। আর খানিকটা পরে খাস।'

এখন চৈত্র মাস। চৈত্রের শুরু সবে। মার শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেছে। যে জায়গায় আমরা আমাদের মাকে দাহ করেছিলাম, সেই জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারপাশটা যেন নিকোনো। শ্রাদ্ধর পরই আমরা

ওখানে সুন্দর করে বেদী করেছি। কাশীর সাদা পাথর দিয়ে বেদীটা মোড়া। এখনও যেন কাঁচা গন্ধ লেগে আছে ওর গায়ে। হাত রাখলে মনে হয় ঠাণ্ডা লাগছে ; নরম মসৃণ স্পর্শ।

মাসান্তে আমরা এই বেদীতে বসেছিলাম। বেদীর মাথার দিকে ছোট একটু কুলুঙ্গির মতন, বড়দি সেখানে প্রদীপ এবং ধূপ জ্বেলে দিয়েছিল। বাতাসের ঝাপটা লাগছিল না বলে দীপের শিখাটি জ্বলছিল, অগুরু-চন্দনের ধূপ পুড়ে পুড়ে খুব ফিকে একটা গন্ধ ভাসছিল। আর শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা বলে চাঁদের আলোয় সাদা বেদীটা ধবধব করছিল।

আমরা পাঁচজনে বেদীর ওপর বসে।

বড়দা বলল, 'আমরা যতদিন বেঁচে আছি, মাসের এই দিনটিতে সবাই একসঙ্গে এখানে এসে বসব।' বলে একটু থামল বড়দা, বড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আবার, 'এই পরিবারের এটাই নিয়ম হল। কি বলিস, অনু?'

অনু বড়দির ডাকনাম। পুরো করে অনুপমা। ছোট-র নাম নিরুপমা। বড়দির সঙ্গে মিল করে রাখা। বড়দি মাথা নেড়ে বড়দার কথায় সায় দিল ; বলল, 'বাবার বেদীটাও যদি আমরা করে রাখতাম!' বড়দির গলায় আক্ষেপের সুর।

বড়দির আক্ষেপ খুবই সঙ্গত। কিন্তু তখন ত আমাদের মাথায় এ-বুদ্ধি আসে নি। মাও কিছু বলে নি।

বড়দা কয়েক দণ্ড আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর নিশ্বাস ফেলল মুখ নামিয়ে। বলল, 'খুবই ভাল হত। তবে, মা রাজী হত কিনা কে জানে!'

'রাজী হত না!' বড়দি বেশ অবাক হয়েছিল যেন, 'কেন? মা কেন রাজী হত না?'

'হত না হয়ত।' বড়দা সন্দেহের গলায় বলল। 'সবাই এসব পছন্দ করে না। সংস্কার। আমরা বোধ হয় অনেক কিছু পুরোপুরি অগোচরে রাখতে চাই।'

মেজদা হঠাৎ কথা বলল। আমরা তাকালাম। তার অন্ধ চোখ একদিকে স্থির রেখে মেজদা বলল, 'শ্মশানে পুড়িয়ে আসার সময় আমরা কি ভাবি জান, দিদি?'

'কি?'

'অনেকের মধ্যে দিয়ে এলাম। যেন সঙ্গীসাথীর মধ্যে।'

'মরার পর আবার সঙ্গীসাথী কি?' ছোট বলল।

'কিছু না। মানুষ তবু ভাবে।' মেজদা উদাস গলায় বলল। 'তুই জানিস না ছোট, কত মানুষ মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থাকে তীর্থ-যাত্রা কল্পনা করে নেয়।'

আমরা সকলে মেজদার দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম। মেজদার গলার স্বর গোল ও নিটোল। বাঁশের আড়-বাঁশির মতন মেঠো। এই স্বর শুনলে অনুভব করা যায়, মেজদার গলার সবটুকু অন্তর থেকে এসেছে। মেজার কথাবার্তাও অন্যরকম। আমরা মনে অহরহ কথা বলি, মুখে নয়। মনের সেই শব্দহীন বাক্য স্রোত যদি শব্দময় হয়ে ওঠে এই রকম শোনাবে হয়ত, মেজদার কথার মতন।

বড়দি বলল, 'তুই স্বর্গের কথা বলছিস, দীনু।'

মেজদার নাম দীনেন্দ্র, ছোট করে দীনু! বড়দির কথায় মেজদা আলগা করে মাথা নাড়ল। বলল, 'না দিদি ; স্বর্গ ত শেষ কল্পনা। আমি এই মর্তের পর স্বর্গের আগে যে পথ তার কথা বলছি।'

'সেটা আবার কি?' ছোট বলল অবাক হয়ে, 'মাঝপথের কথাও মানুষ ভাবে?'

'ভাবে। যত ভাল করে ভেবে নিতে পারা যায় ততই ভাল রে ছোট।...আমি রাঁচির দিকে মুণ্ডা না মুণ্ডরীদের গ্রামে এক বাড়িতে ছবি দেখেছিলাম একটা।'

'ওদের কথা বাদ দাও।' ছোট বলল।

'বাদ কেন, শোন না।' মেজদা যেন অন্ধ চোখে জ্যোৎস্না মেখে সামান্য মুখ ফেরাল। বলল, 'মাটির বাড়ি, বাইরের দেওয়ালে রঙ গুলে একটা বাচ্চা ছেলের ছবি আঁকা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাচ্চাটা চলেছে, এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে লাগাম ; কাঁধে খাবারের পুঁটলি, মাথায় তেষ্টা মেটাবার জন্যে জলের ঘটি রাখা।...ওই ছবির মানে বলে দিল ফরেস্টবাবু। ও-বাড়ির ছেলে মারা গেছে, তাই ওই ছবি।'

'আ-হা—' বড়দি দুঃখ পেল।

মেজদা বলল, 'মানেটা তুমি শোন, দিদি। বড় অদ্ভুত লাগে ভাবতে। ওরা বিশ্বাস করে নিয়েছে মৃত্যুর পর তাদের ছোট ছেলেটিকে একা একা অনেক দূর যেতে হবে তাই তাকে বসিয়ে দিয়েছে ঘোড়ায়, হাতে দিয়েছে লাঠি, পুঁটলিতে বোধ হয় চিঁড়ে গুড়, আর মাথায় তেষ্টা মেটাবার জল।

স্নেহ-মমতা, ইহলোকের মায়া ও দুঃখ, পরলোকের দুর্ভাবনা—সব যেন এই ছবিতে মহৎ ও সুন্দর হয়ে কল্পিত ছিল। আমি অভিভূত হলাম। জ্যোৎস্নার ধারার মতন আমার কল্পনা সেই ছবির গায়ে আলো বর্ষণ করছিল।'

অনেকক্ষণ বুঝি কেউ কোনো কথা বলল না আর। চৈত্রের চঞ্চল বাতাস বাগানের তৃণ এনে আমাদের গায়ে-মাথায় ফেলে দিচ্ছিল। বেদীতে আমাদের পাঁচজনের ছায়া ; পরস্পরকে স্পর্শ করে যেন ছায়ার একটি আশ্চর্য রকম জাফরি তৈরি হয়েছে। চাঁদটা সমুদ্রের জলের মতনই নীল অনেকটা। পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না। মার বেদীর মাথার কাছে সেই বৃন্দাবনের কদম্ব গাছ। মার পাশে বুড়ো কাঠচাঁপা।

কদমগাছটার বয়স আমার সমান। বৃন্দাবন থেকে এনেছিল বাবা। এখনও বর্ষায় ফুল ফোটে।

বড়দি প্রথমে নিশ্বাস ফেলল। বড়দার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার গাটা একটু দেখ ত, দাদা।'

'কেন রে, কি হল?' বড়দা উদ্বেগের গলায় বলল, বলে বড়দির গা দেখল। 'কই না, ভালই ত!'

আমার গায়ে কেমন কাঁটা ফুটেছে!' নিজের গায়ের শিহরণ প্রশমিত করছিল। সামান্য চুপ করে থেকে মৃদু স্বরে বলল, 'আমায় যদি কেউ মার হাতে কিছু দিতে বলে কি দেব রে।' বড়দি আমাদের প্রত্যেকের মুখে একে একে তাকাল, তারপর কেমন করে যেন মাথা নাড়ল, বলল, 'জানি না। কি দেব মার হাতে কে জানে!'

কথাটা আমাদের কানের পাশ দিয়ে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ যেন ঘুরে দাঁড়াল। আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সহসা অনুভব করলাম আমরা বিহ্বল হয়েছি।

'মার হাতে কি দেব— ' এই প্রশ্ন আচমকা বড়দি আমাদের সামনে যবনিকার মতন নিক্ষেপ করল। আমার অসংবিৎ ও বিমূঢ় হয়ে বসে থাকলাম। তারপর ক্রমশ বড়দির কথার পরিপূর্ণ মর্ম আমাদের হৃদয়ে অনুভব করতে পারলাম।

সমূলে সচকিত হবার মতন আমরা শিহরিত ও কম্পিত হয়ে দেখলাম, এই প্রশ্ন যেন আমাদের সমস্ত বোধ অধিকার করেছে। আমরা কি দেব, কি দিতে পারি মাকে?...মনে হল, এই অদ্ভুত প্রশ্নে আমরা আমাদের সম্মিলিত বোধ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছি। যেন কোনো ভয়ঙ্কর পর্বতচূড়ায় এনে কেউ আমাদের পরস্পরের দেহের সঙ্গে বাঁধা দড়ি কেটে দিয়েছে, আর আমরা সবাই চূড়ান্ত অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি।

স্তব্ধ নিঃসাড় হয়ে আমরা বসে থাকলাম। চাঁদের আলো কদমগাছের ছায়াটিকে বেদীর সামনে শুইয়ে রেখেছে। করবীঝোপে বাতাস যেন ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে যাচ্ছিল, শব্দ হচ্ছিল পাতার। মরা আমাদের ছায়ার নকশা থেকে চোখ তুলে কখন যে শূন্যে দৃষ্টি রেখেছি কেউ জানি না।

বড়দাই প্রথমে কথা বলল। মার কোলে বড়দাই প্রথম এসেছিল, বড়দাকে দিয়েই মার মাতৃত্ব শুরু, হয়ত তাই বড়দা এই নীরবতা এবং অপেক্ষা প্রথমে ভাঙল, যেমন করে মার সন্তান কামনার অপেক্ষা ভেঙেছিল।

'অনু কিন্তু কথাটা মন্দ বলে নি।' বড়দা ধীরে-সুস্থে নরম গলায় থেমে থেমে বলতে লাগল, 'আমরা কেউ মৃত্যুর পরটর বিশ্বাস করি না, তবু ভাবতে ভাল লাগছে আমাদের মা দীনুর গল্পর মতন দীর্ঘ পথ হেঁটে যাবে। আমরা মার জন্যে কে কি দিতে পারি?'

আমরা প্রকৃতপক্ষে ওই একই চিন্তা করছিলাম। মার সেই দীর্ঘ পথ অন্তহীন পথ-যাত্রায় আমরা মাকে কি সম্পদ দিতে পারি?

বড়দা দীর্ঘ করে নিশ্বাস ফেলল ; কদম-ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক দণ্ড, তারপর মুখ তুলে বলল, তারপর মুখ তুলে বলল, 'কি যে দেব, আমিও ভেবে পাচ্ছি না।' বড়দার গলার স্বর বিষণ্ণ উদাস।

বড়দিকে দেখল বড়দা, কাঠচাঁপার বুড়ো গাছটাকে অন্যমনস্ক লক্ষ করল। 'মার অনেক দুঃখ ছিল, অনেক। আমি সব দুঃখর কথা জানি না। একটা দুঃখ জানি, আমায় নিয়ে।'

আমার মনে হল বড়দা ঠিক আমার মতন করেই ভাবছে। এ-সংসারে মা কি পায় নি, কি অভাব তার ছিল, কি পেলে মার সে-অভাব থাকত না, আমরা এখন তাই ভাবছিলাম। মার এই পরবর্তী যাত্রায় আমরা বোধ হয় মাকে সেই জিনিস দিতে চাইছিলাম যা এখানে দিতে পারি নি।

'সে-রকম দুঃখ ত আমার জন্যেও মার ছিল।' ছোট বলল বড়দাকে লক্ষ করে।

'আমাদের সবায়ের জন্যেই ছিল।' বড়দা জবাব দিল।

'তাহলে কি আমরা মার হাতে সেই দুঃখগুলো আর দিতে চাই না?' ছোট অসহায়ের মতন শুধলো।

'তা ছাড়া আমরা আর কি দিতে পারি...' বড়দা ছোটর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাল কলা জল আমাদের মার দরকার নেই। মাকে যদি আমরা সেই মনের জিনিসগুলো দিতে পারি, এখানে যা পারি নি—মার কাজে লাগবে।' 'কাজ' শব্দটা বড়দা টেনে বড় করে উচ্চারণ করল।

আমি মনে মনে বড়দার কথায় সায় দিলাম। মাকে আমরা অন্য কিছু দিতে পারি না।

'তুই ত জানিস, অনু—' বড়দা বড়দিকে লক্ষ করে কথা শুরু করল, 'আমি বিয়ে করি নি বলে মার মনে মনে বড় দুঃখ ছিল। অভিমানও। মার কি সাধ ছিল আমি জানি। কিন্তু আমার ইচ্ছে ছিল না।...আমার জন্যে মা মেয়ে পছন্দ করে রেখেছিল, বাবা সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবে বলে ঠিক করেছিল, আমি অমত করায় আর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গড়ায় নি।'

'তুমি অমত করলে কেন?' আমি বড়দার ওপর যেন অপ্রসন্ন হয়ে বললাম।

'কেন করলাম—!' বড়দা আমার দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল। পলক ফেলল না। তারপর অতিশয় স্নিগ্ধ হয়ে বলল, 'আমার বন্ধু অবনীর সঙ্গে সেই মেয়েটির ভাব ছিল।'

'তা হলে সন্দেহ?' ছোট যেন বিরক্ত হল।

'না রে, সন্দেহ নয়। মেয়েটিকে অবনী ভালবাসতো।' বড়দা শান্ত গলায় বলল, 'মাকে আমি বলেছিলাম। মা বলেছিল, কিন্তু কনক যে অপরূপ সুন্দরী। এ-মেয়ে এলে আমার বংশধররা কত সুন্দর হবে ভেবে দেখ।' কয়েক দণ্ড থেমে বড়দা যেন মার সঙ্গে তার কথোপকথন স্মরণ করল, তারপর বলল, 'আমি সৌন্দর্য ভালবাসি, কিন্তু ভালবাসা আরও বেশি ভালবাসি।' অনেকক্ষণ আর কথা বলল না, বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকল। 'মা এই কথাটা কেন বুঝল না!' বড়দা আক্ষেপের গলায় বলল। মনে হচ্ছিল তার কোনো পুরনো প্রদাহ সে আজ অত্যন্ত ব্যথার সঙ্গে আবার অনুভব করছে। অনেকটা চুপ করে থেকে বড়দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, মৃদু গলায় টেনে টেনে বলল, 'আমি মাকে আমার সেই ভালবাসার মন দিতে পারি।'

বড়দা নীরব হলে সাদা বেদীটার গায়ে চাঁদের আলো ছেঁড়া-মেঘের ফাঁকে মলিন হল সামান্য।

আমরা নির্বাক বসে থাকলাম। চৈত্রের বাতাস করবী ঝোপের তলা থেকে ধুলোর গুঁড়ো এনে মাখিয়ে গেল। রাস্তা দিয়ে একটা টাঙা যাচ্ছে, টাঙাঅলার পায়ে-টেপা ঘণ্টি বাজছিল। কদমগাছের ছায়া একটু যেন হেলে গেছে।

'তা হলে আমিও বলি'—বড়দি বলল। বড়দার পর বড়দিরই বলার কথা। আগে বড়দি দিশেহারা হয়ে বলেছিল, সে কি দেবে জানে না; এখন বড়দার কথার পর বড়দি মন স্থির করতে পেরেছে।

বড়দি কি দেয় শোনার জন্যে আমরা সকলে মুখ তুলে তার দিকে তাকালাম। জ্যোৎস্না আবার স্পষ্ট হয়েছে। চন্দ্রকিরণে বড়দিকে রেশমের মতন নরম মসৃণ দেখাচ্ছিল। হাঁটু ভেঙে একপাশে হেলে বসেছিল বড়দি, তার হাতে সরু দু'গাছা করে সোনার চুড়ি, সাদা হাতে মিনের কাজের মতন চুড়ি দুটো চিকচিক করছিল।

অল্প-সময় ইতস্তত করে বড়দি বলল, 'আমি অমন করে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি বলে মা কোনদিন খুশি হয় নি। তুই ত জানিস দাদা, মা তোকে কতবার সেই লোকটার কাছে যেতে বলেছে। কেন বলত! বলত যাতে তুই তাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনতে পারিস।' সোজা হয়ে বসে নিল বড়দি, বাঁ হাত গলার কাছে নিয়ে গিয়ে তার মটর হারে আঙুল রাখল। 'বাবাকেও মা বুঝিয়েছিল আমি

ওখান থেকে চলে এসে ভুল করেছি, অন্যায় করেছি। বরং চেপে বসে থাকলে তাদের জামাইকে শুধরে দিতে পারতাম।...মা আমায় বলত, এই তেজ দেখিয়ে তুমি তোমার ক্ষতি করলে। সারা জীবন পুড়বে।'

'তুমি ত আজও মাঝে মাঝে কাঁদ, বড়দি।' ছোট অচমকা বলল।

বড়দি ছোটর দিকে তাকাল। ভাবল যেন। বলল, 'কাঁদি—', আস্তে মাথা নাড়ল বড়দি, 'কাঁদি, মা কেন আমায় আবার বিয়ে করতে বলল না।'

'তোমার কি আবার বিয়ে করার সাধ ছিল?' আমি অবাক হয়ে বড়দিকে দেখছিলাম।

'হ্যাঁ, মা-বাবা যদি বলত, আমি আবার বিয়ে করতাম।...চামড়ার ব্যবসাদার সেই লোকটাকে ত্যাগ করে এসে আমি শুধু নিজেকে বাঁচিয়েছিলাম, কিন্তু আমার দরকারটুকু ত পাই নি।'

'তোমার আবার বিয়ে করা খুব সহজ ছিল না, বড়দি।' ছোট বলল।

'না হয় কঠিন ছিল। তাতে কি!...' বড়দি যেন দ্বিধা বোধ করে থামল, তারপর বলল, 'সংসারে এমন মানুষ ছিল যে আমায় বিয়ে করত।...মার সাহস হল না।...একদিন আমি মাকে বলেছিলাম, রোগ নোংরামি কষ্ট সব সহ্য করি তাতে তোমার আপত্তি নেই, আপত্তি সুখ পাবার ব্যবস্থা করতে। মা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল, বলেছিল—এ বাড়ির মর্যাদা নষ্ট হোক এমন কিছু করতে আমি দেব না।...মা মর্যাদা চাইত, আমি সাহস চাইতাম।' বড়দি সামান্য থামল, তাব সমস্ত শরীর রেশম দিয়ে মোড়া সাজানো পুতুলের মতন দেখাচ্ছিল, ভাঙা হাঁটু, মাটির ওপর ভর করা হাত ; নিশ্বাস ফেলে বড়দি বলল, 'ম াকে আমি মানুষের উচিত সাহস দিতে পারি নি। মা যেন সেই সাহস পায়।'

কথা শেষ করে বড়দি আকাশের দিকে চোখ তুলল। আমরা স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাস একে কদমের কয়েকটি শুকনো পাতা ফেলে গেল, চাঁদের আলোয় একটা কাঠবেড়ালি কাঠচাঁপার ডাল বেয়ে এগিয়ে এসে আবার ছুটে পালাল।

বেদীর কুলুঙ্গির মধ্যে প্রদীপটা অকম্পিত জ্বলছে। ধূপধুনো ফুরিয়ে গেছে। আমরা আর গন্ধ পাচ্ছিলাম না।

এবাব মেজদার পালা। আমরা মেজদার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মেজদা কিছু বলছিল না।

ছোট মেজদার গায়ে হাত দিল। 'মেজদা—তুমি?'

মেজদা মাথা নাড়ল। 'এখানো কিছু ভেবে পাইনি। তোরা বল। তুই বল, ছোট।'

ছোটর স্বভাবই আলাদা। তার অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবনা নেই। ছোট একবার প্রদীপের দিকে তাকাল, একবাব আকাশের দিকে। খুকখুক করে কাশল কবার, তারপর বলল, 'এত অল্প বয়সে আমার এমন একটা বিশ্রী অসুখ করল বলে মা বেচারী বড় কষ্ট পেয়েছিল। ভাবত, আমি আর বাঁচব না। আমিও প্রথম প্রথম সেই রকম ভেবেছি। মা বলত, তুই নিজে ইচ্ছে করে এই অসুখ বাধালি। কী বোকার মতন কথা বল ত বড়দি। অসুখ কি কেউ ইচ্ছে করে বাধায়—না অসুখে সুখ আছে—!' এক দমকে কথা বলছিল ছোট, বলতে বলতে থামল ; মনে হল সে কোন কিছু না ভেবেই কথা শুরু করেছিল, তারপর খেই হাবিয়ে ফেলেছে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। আমরা চুপ করে থাকলাম। ছোট একটু যেন অপ্রস্তুত হল। মাথার বেণী বুকের কাছে টেনে আঙুলে জড়িয়ে দু-চারবার দোলালো। ছোটর পরনে হালকা রঙের একটা শাড়ি, গায়ে অর্ধেক-হাত জামা। ছোটর কপাল ছোট ; দু-পাশের চুল তার প্রায় সবটুকু কপালই ঢেকে ফেলেছে। নাকটি লম্বা, চোখ দুটি খুব কালো। ছোটর হঠাৎ থেমে-যাওয়া, হঠাৎ অপ্রস্তুত বোধ-কবা এবং এই আপাত চাঞ্চল্য থেকে মনে হল ছোট যেন খেই খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে।

আরও একটু সময় নিল ছোট। সে তার কথা খুঁজে পেল। বলল, 'অসুখ কেউ ইচ্ছে করে বাধায় না, অসুখে সুখ নেই, তাও ঠিক। তবু আমি এই অসুখে পড়ে একটা সুখ পাচ্ছিলাম। তুমি ত জান বড়দি, অসুখের সময় আমার বন্ধুটন্ধুরা খোঁজখবর নিতে আসত। বেশি আসত সুশান্ত, প্রায় রোজই। অনেকক্ষণ থাকত। আমায় ভোলাবার চেষ্টা করত, বলত—এ অসুখ কিছু নয়, কিছুই না।...মা কেন জানি এটা পছন্দ করত না, একেবারেই নয়।' ছোট তার দীর্ঘ বেণী কাঁধের ডানপাশে রাখল, আকাশের দিকে তাকাল আবার, তাকিয়ে থাকল, বলল, 'একদিন মা আমার সামনেই সুশান্তকে বলল, তুমি ত

ডাক্তার নও ; কেন অযথা ওসব কথা বল। ওকে বকিয়ো না, বিরক্ত করো না...সুশান্ত তারপর থেকে আর আসত না। আমি মাকে বলেছিলাম, অকারণে তুমি ওকে অপদস্থ করলে। মা বলেছিল, 'ওরা আমার অনেক করেছে, তোমায় মাতিয়ে এই অসুখ দিয়েছে। তা দিক, আর আমার সুখ দরকার নেই।' ছোট আকাশ থেকে চোখ নামাল, তার গলা পাতলা, কাঁপছিল, চোখ যেন একটু চিকচিক করছে। ও বলল, 'মা আ মার অসুখটাই দেখেছিল, সুখ দেখে নি। মা জানত না, জগতে সব রোগ কেবল ডাক্তার দিয়ে সারানো যায় না। আশা পাওয়া অনেক ; ভরসা পাওয়ার কত শক্তি...' ছোট আমার দিকে তাকাল, 'আমি মাকে আর কিছু দিতে পারি না, মন ছাড়া, আশা ছাড়া, ভরসা ছাড়া। মা যেন তার মনে ভরসা পায়।'

ছোট নীরব হল। মার বেদীতে কদম-ছায়া উঠে এসেছে। বড়দার পাশ দিয়ে ছায়াটা বড়দির কোলে গিয়ে বসেছে। বাতাবি লেবুর গাছটা অনেক দূরে। তার মাথার ওপর দিয়ে ভাঙা দেওয়ালের ফাঁকে রেল লাইনের বাতি চোখে পড়োছল আমার। দশরথ ধোপার কুঠিতে ওরা গান গাইছে। গত সপ্তাহে দশরথের ছেলের বিয়ে হয়েছে, আজও থেকে থেকে সেই আনন্দের লহরী তোলে তারা।

খুব যেন ক্লান্ত হয়ে ছোট তার মাথা আমার কাঁধে রাখল। বলল, 'কড়ি, এবার তোর পালা—'

বড়দা বড়দি আমার দিকে তাকাল। মেজদা তার অন্ধ চোখ অনুমানে আমার দিকে ফিরিয়ে রাখল। সহসা অনুভব করলাম, ওরা আমার হৃদয়ে লুকোনো মাব ছবি দেখার জন্যে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে আছে। আমার ভয় করছিল। কাঠগড়ায় দাঁড়ানো কোনো সাক্ষীর বোধ হয় জবানবন্দী দেবার সময় এই রকম ভয় হয়।

এই মুহূর্তে সকলই স্তব্ধ। চৈত্রের বাতাসও শান্ত হয়ে আছে। দুধের ফেনার মতন জ্যোৎস্নায় আমার চারটি উৎকর্ণ আত্মীয় নিষ্পলকে আমায় দেখছে। বড়দার দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলা আযোজন করছিলাম। বড়দার পাশ দিয়ে বেদীর কুলুঙ্গিতে প্রদীপ চোখে পড়ছিল। শিখাটি স্থির। মার চোখেব মতন শিখাটি যেন আমায় লক্ষ করছিল।

'ভেবে পাচ্ছি না—' আমি বললাম। 'আমার মন স্থির নয়, নিঃসংশয় নয়। দ্বিধার গলায় জড়িয়ে আমি বললাম, 'কখনও মনে হচ্ছে অনেক কিছু দেবার আছে, আবার মনে হচ্ছে কিচ্ছু নেই।...আমি সব চেয়ে ছোট বলেই মা আমায় তার শেষ গচ্ছিত ধনের মতন করে সরিয়ে রেখেছিল। মানুষ যেমন করে সিন্দুকে অবশিষ্ট অলঙ্কার তুলে রাখে অনেকটা সেইরকম। ব্যবহার করত না, দেখত না।' কথা বলার সময় ক্রমশ আমার মনে হচ্ছিল আমি ভয় কাটিয়ে উঠতে পারছি। গলা কাঁপছিল তখনও, তবু আমার স্বর স্পষ্ট হয়ে এসেছে অনেকটা। 'তোমরা মাকে যত পেয়েছ, যেমন করে পেয়েছ, আমি তা পাই নি। আমায় মা আমাদের সংসারকে তেমন করে বুঝতে দেয় নি। ভাবত আমার এ-সবে দরকার নেই।...কিন্তু আমি কাকে দেখেছি।...একবার মার সঙ্গে আমায় কাশী যেতে হয়েছিল। তোর মনে আছে ছোট, বাবা মারা যাবার পর মা একবার আমায় নিয়ে কাশী গিয়েছিল পনেরো বিশ দিনের জন্যে। তোরা ভেবেছিলি মন ভাল নয়, বাবার অভাবে মন বড় কাতর—তাই মা কটা দিন তীর্থের জায়গায় মন জুড়িয়ে আসতে গেছে। হয়ত খানিকটা সেই উদ্দেশ্যেই মা গিয়েছিল, কিন্তু সবটা নয়।' আমার গলা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, আমি আর ভীত হচ্ছিলাম না ; আমার মনের সামনে সব স্থির হয়ে গিয়েছিল, যা খোঁজার আমি যেন তা পেয়ে গিয়েছিলাম। প্রদীপ শিখাটি শেষ বারের মতন দেখে আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মেজদাকে দেখছিলাম। 'কাশীতে বাবার এক বন্ধু থাকত। আমি কখনও তার নাম শুনিনি—'

'শচীন-জেঠামশাই?' বড়দা বলল অবাক হয়ে।

'হ্যাঁ। তুমি তাহলে জানো!'

'জানি বই কি। শচীজেঠাকে আমি কতবার দেখেছি। তুইও দেখেছিস, অনু।

'দেখেছি।' বড়দি মাথা নাড়ল।

'নানা জায়গায় ঘুরে শেষে তিনি কাশীতে গিয়েই শেষ জীবন কাটাচ্ছিলেন।' আমি বললাম। বলার সময় শচীন-জেঠামশাইয়ের কাশীর সংসার আমার চোখে ভাসছিল, স্পষ্ট অনাবৃত। 'বাঙালীটোলার *অন্ধকার গলিতে নরকের মতন ছোট ছোট খুপরি ঘরে ওঁরা থাকেন ; উনি স্থবির হয়ে পড়েছেন, স্ত্রী*

শ্বাসরোগে শয্যাশায়ী, বড় ছেলে হোটেলের গাইডগিরি করে, দুটি মেয়ে—একটির পা খোঁড়া হয়ে গেছে টাঙা থেকে পড়ে, অন্যটি কোন বাড়িতে যেন রান্নাবান্নার কাজ করে দেয়। ছেলের বউ মারা গেছে দুটি বাচ্চা-কাচ্চা রেখে।...কাশীর সেই অন্ধকার সরু নোংরা পাতকুয়োয় একটি অসহায় পরিবার গলা পর্যন্ত ডুবে। মা গিয়েছিল সেখানে বাবার পুরোনো কোন ব্যবসায় শচীনজেঠা কবে কাগজপত্রে বাবার অংশীদার ছিল সেটা নাকচ করিয়ে আনতে। উনি সে-কথা মনেও রাখেন নি, মনে রাখার কথাও নয়। তবু মা আইনের ফাঁক রাখতে রাজী নয়। কে জানে কবে এই গর্ত খুঁড়ে সাপ বেরুবে না।...একশো টাকার দু'খানা মাত্র নোট মা শচীন-জেঠার হাতে দিয়ে সেই পুরোনো অংশীদারী বাতিল করিয়ে নিল।...আমি মাকে বলেছিলাম, তুমি ত অনেক আগেই এটা ওঁদের ছেড়ে দিতে পারতে মা। বাবাও ত কাঠের ব্যবসাটা আর করত না।...জবাবে মা বলেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, বিষয়-আশয়ের কিছু বোঝ না। ওই ব্যবসা অন্যের তদারকিতে দেওয়া আছে, বছরে হাজার দুয়েক টাকা বাড়িতে আসে। টাকাটা আমি অকারণে খোওয়াব। অত স্বার্থত্যাগ আমি শিখিনি।' আমার গলার শিরা যেন কেউ আঙুল জড়িয়ে টানছিল, সেই যন্ত্রণায় আমি কিছুক্ষণ আর কথা বলতে পারলাম না ; আমার সামনে পিঁচুটিভরা শচীন-জেঠার চোখ দুটি ভাসছিল, কী দুর্গতি তাঁর। 'মা স্বার্থত্যাগ জানত না।' আমি চাপা গলায় বললাম, 'মা দীন ছিল, মার মন কৃপণ ছিল।...আমায় যদি কিছু দিতে হয় আমি মাকে স্বার্থত্যাগ দেব। আর কিছু না।'

আমি নীরব হলে বৃন্দাবনের কদমগাছ তার ছায়া আরও দীর্ঘ করল। বড়দির বুকে সেই ছায়া দেখলাম। কয়েকটি খড়কুটো এল দমকা বাতাসে। দশরথ ধোপাদের বস্তিতে গানের সুর থেমে গেছে। একটি রাত্রিগামী ট্রেন সাকোর ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে হুইসল্ দিচ্ছে পথের জন্যে। ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এখানে ভেসে আসছিল।

মেজদা কিছু বলে নি। এবার বলবে। মেজদার পালা ফুরালো আমাদের পাঁচটি আঙুলই গুটিয়ে যাবে।

আমরা কেউ কোনো কথা না বলে মেজদার দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মেজদা কিছু বলছিল না। মেজদা শূন্যপানে মুখ তুলে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। অধীর উৎকণ্ঠিত সেই অপেক্ষা দীর্ঘ মনে হচ্ছিল।

'ভানু—' বড়দা মেজদাকে ডাকল।

মেজদা স্থির, শান্ত। যেন আকাশের দিকে তার অন্ধ চোখ মেলে সে হৃদয় দিয়ে মাকে দেখছে।

ছোট ডাকল, 'মেজদা।'

আমি হাত দিয়ে মেজদার গা স্পর্শ করে বললাম, 'মেজদা, এবার তোমার পালা।'

মেজদা সামান্য নড়ল। আকাশের দিকেই তার মুখটি তোলা, অমন জ্যোৎস্না তার সমস্ত মুখ লেপে রেখেছে, তার দুই অন্ধ নয়ন নিবিড় করে সেই আলো মাখছিল।

মেজদা তার সাদামাটা মেঠো সুরেলা গলায় বলল, 'সৎকার শেষ হয়ে গেলে মানুষ আর কি দিতে পারে! তোমরা মার সৎকার শেষ করেছ। আমার কিছু দেওয়ার নেই।' কয়েক দণ্ড থামল মেজদা, তারপর বলল, 'আমাকে যেমন একটা নির্বোধ সুটকেসআলা অন্ধ করে দিয়ে গেল, তেমনি মাকে এই সংসারের শনিতে অন্ধ করেছিল।. মা যে কত অন্ধ আমি জানতাম।..এই অন্ধ চোখ মাকে আর দিতে ইচ্ছে করে না। মা আমার হৃদয়ের চক্ষু পাক।'

মেজদা আর কিছু বলল না। কাশীর সাদা পাথরে বাঁধানো মার বেদীর ওপর আমরা পাঁচটি সন্তান বসে থাকলাম। শব্দহীন সেই চরাচরে বসে অনুভব করলাম, আমাদের মার সৎকার যেন এই মাত্র সমাধা হল।

সর্বগ্রাস এই দুঃখেও আমরা মার নির্বিঘ্ন যাত্রা কামনা করছিলাম। আমাদের যা দেবার সাধ্যমত দিয়েছি। মা সেই অন্তহীন পথ অতিক্রম করুন।

রমাপদ চৌধুরী

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। বড় জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললো, নতুন, অত লজ্জা দেখাসনি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরি। বড় জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর-যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়সের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড় জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আর যেহেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, নতুন। তা বড় জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এর পর তো সারাটা জীবন আমাদের মতো হাঁড়ি ঠেলতে হবে। আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি-হাসি পায়। তাই বড় জা-র খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা করতো। কিন্তু বড় জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোট্ ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিন কয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি। তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে—না, আজকালকার মেয়েদের মতো ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরোনো দিনের বউদের মতোই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু সত্যি কথা বলতে কি মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে নামটা মুখে মধ্যে লোফালুফি করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড় জা-র সামনে তো আর নাম বলতে পারি না তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক, আমি যাবো না।' বড় জা রাগ দেখিয়ে বললে, 'ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই! যা বলছি, শোন নতুন, দুটিতে দিন কয়েক কোথাও গিয়ে—

ঠেলেঠুলেই একরকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনো দেখিনি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশির ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলেমানুষের মতো আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশি হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখ জোড়ার দিকে, চোখের তারা দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ দুটো যেন সমুদ্রের মতো নীল, সমুদ্রের মতো গভীর, সমুদ্রের মতো বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের দুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বললে, 'কি দেখছো অমন করে? ওর বোধ হয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দুর দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠে ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়ছে, সেখানে।

না, ঠিক অত দূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমাব কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখিনি। তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও

কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয় করে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলশয্যার রাতটার মতো। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশির গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয় ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমারই মতো তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক-একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু-একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালির ওপর, আর বালির ওপর বসে বসে বড় বড় জালগুলো মেরামত করছে জেলেরা।

—এই, ওরা কি কুড়োচ্ছে, কি? আমি জিগ্যেস করলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ও মা, তাই নাকি! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানারকমের, সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিকচিক করছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখ দুটো টানাটানা, আমার ঘাড়টা কি চমৎকার, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে খেপাতো, কলেজের মেয়েরা প্রশংসা করতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিলো না ওরা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলার হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিলো আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অনরকম অন্যরকম লাগে। তা ছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধ হয় একটু বেশি দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশি দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিলো বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিলো ঝিনুক কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। একসময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূর হয়ে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা—পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশি অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে! না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলো।—সমুন্দরে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের ওপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম! এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দুজনে। স্নান করতে করতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়ের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আর তারও ওদিকে, অনেক দূরের অথই জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা। পাড় থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বারবার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান করবে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

—আরে দূর, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে, দেখো। গৌতম বললে—এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে এত চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

—সমুদ্র।

বললাম, উঁহু। আমি জানি।

—কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্চে। কারো কাপড়চোপড়--

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাঁটক্যাঁট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ারকির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম।—এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মতো ওভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না হচ্ছিলো তা নয়। এক-একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা দু বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মতো নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এত দূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড় জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ রে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ? তারপরও অবশ্য ইয়ারকি-ঠাট্টা করবে তা জানি। বড় জা অবশ্য বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিলো একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড় জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কারো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেল। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মতো গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করলো।

আমি সায়ও দিলাম না, চলো, তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা আবার সেলাম করলে।—নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যেই। বললাম, থাক না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোনো আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলেত যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখোচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা—যে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও ঢেউয়ের কাছে যেতো না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পড়েছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়ে সুছন্দ বুকের ওপর দিকে, এক রাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিলোই বা কেন? না-হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশিই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেল। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেকবার মুখে।

গৌতম বললে, না না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে! প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মতো মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু আনা পয়সা তো, তার বেশি আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশি হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে—তার নবপরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেল, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিণ্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চীৎকার করে বললাম, এই! বেশি দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটেনি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিলো, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনো, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললা। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে। ও একা-একাই কত দূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো!

একটার পর একটা ঢেউয়েব মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চীৎকার করে ডাকলাম একবাব, বোধ হয় শুনতে পেলো না।

এ কি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এত দূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশেপাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো, উনি কত দূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মতো বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাই। হাত তুলে বারবার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চীৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অত দূর থেকে তার চীৎকাব এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মতো আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনো। অন্যমনস্কভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মতো হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে...

ঠিক কি বলেছিলাম, কিভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথাব ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে, তারপর সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কি উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেবই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি...

একটার পর এখটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আব আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখেব দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেল,

সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চীৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল...আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর?...বীভৎস একটা আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম, কিংবা...

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম এক রাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি, বাবু বাঁচ গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনো ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম, ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দুখানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমরা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়েছে, কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনো ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মতো শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মতো ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

একসময় সাজুন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে। কেমন আছেন?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তারপর মাথা নিচু করলে।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমরা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দুজনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেল। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখোচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো, সেলাম করলো। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। না থাকলে আজ কি যে হতো। গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলবো!

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাইনি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে, তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গত কালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মতো কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখোচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা দুগাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড় জা? বলবে হয়তো, 'দু দিনের জন্যে গেলি নতুন গিয়েই বালা জোড়া খুইয়ে এলি?' বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড় জা-র খুব পছন্দ হয়েছিলো। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেওয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা দুজনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মতো সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যাবাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার দিকে। আর তাদেব সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিলো, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়ে ছিলো। সেই দুটি টানা-টানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে চোখ প্রশংসায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিলো, 'দেখো, দেখো, উনি কত দূর গেছেন!' সেই চোখ জোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভালো লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হলো না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেল না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরের পরের দিন সকালে নিত্যদিনের মতোই সাজুন্তি আর তার স্বামী নেমে গেল আমাব চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওপর গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু স্নান করতে যাবো কি না সে প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওরা লক্ষ করেছে যে আমবা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে স্নান করতে যাইনি। শুধু কি লক্ষ করেছে? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলোই যদি আমাব চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি।—শুনেছেন? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাকে।..কেউ ডুবে গেলে বাঁচানোব কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেণ্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।.. আব আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো!

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেল বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেণ্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

-কই, শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি যে বললে। ওই সাজুন্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়িব প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ করেছিলো। দিদি! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে।

দিদির মতো আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকোরেটর ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর-আপ্যায়ন।—বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো। বলেছিলো, দেখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো—বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাঙ্ক আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তা হলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুন্তি যে বললে, ওরা গরমেণ্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তা ছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরিবও ওরা নয়। এক-একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হলো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তা ছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে! ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোনো দিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক-একসময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশি ভালোবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায়—আমি কিন্তু কোনো দিন লক্ষ করিনি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারেনি গৌতম আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো—তার পরই বলেছিলো ও বলেছিলো, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু দিন পরে, যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলেনি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন? আসলে ও বোধ হয় ভেবেছিলো আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর! প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কিনা, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা! ভাবলে আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলো গৌতম। বড় জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধে কেমন গম্ভীর গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম করছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেওয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর, তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেওয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহুড়ো হবে আমি কি ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেল। অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে,

কিন্তু অ্যালার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজেনি, ঘুমও ভাঙেনি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন আর একটা ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দুজনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম এ কদিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগলো।

আর এসব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব রিকশায় তুলে সবে রিকশাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

রিকশা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে একমুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা, সেলাম করলে। সেলাম করলো বোধ হয় বকশিশের লোভেই।

ছি ছি, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এত খারাপ লাগলো আমাব। রিকশাওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই দেখো তো তোমার ব্যাগটা, ওর বকশিশটা দেওয়া হয়নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপর সুন্দর নকশা-করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি—মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডার ছড়িদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার-পাঁচখানা, খুচরো মাত্র দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।

কি করি, স্টেশনে পৌঁছেই তো রিকশার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা এক টাকার নোট বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশি হয়ে সেলাম করলে। হাসলো। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড় জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ, এমন চমৎকার!

বড় জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভালো বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ও মা—আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলিনি, রীতিমতো একটা কাণ্ড।

—কি কাণ্ড? চোখ কপালে তুললো বড় জা।

আমি বললাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো। লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ, কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড় জা কি যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিলো? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমিই জানি! না, বালা টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তা ছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করে ছিলো নাকি নুলিয়াটা? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

চিরন্তন নারী

সমরেশ বসু

শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ

শুভ্রার কথা

আর কতদিন এভাবে চালাতে পারবো, বুঝতে পারছি না। এত বড় সংসারটা বাবার একলার ঘাড়ের ওপর। চটকলের কেরানী, সামান্য বেতন। আমরা ছ'টি ভাই বোন। আমিই সকলের থেকে বড়। আমার পরে এক বোন। তারপরে পর পর দুই ভাই। সকলের ছোট দুটিও বোন।

আমি কোনরকমে বি. এ. পাস করেছি। অনার্স ছিল—ইংরেজিতে। রাখতে পারি নি। পাস কোর্সেই পাস করেছি। কোনো প্রফেসারের কাছে প্রাইভেট পড়ার সুযোগ পাই নি। কলেজের মাইনে দেওয়াই কঠিন ছিল। প্রাইভেট পড়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। আমাব সহপাঠী সহপাঠিনীদের নোট দেখে, একলা পড়ে যতটা সম্ভব নিজেকে তৈরি করেছিলাম। স্বীকার করতেই হবে, আমার এতটা গুণ ছিল না, বন্ধুদের নোট দেখে, একলা পড়ে অনার্স পাস করি। অথচ অনেকেরই আশা ছিল, আমি নিশ্চয়ই অনার্স রাখতে পারবো।

আশার আর এক নাম বোধ হয় মরীচিকা। জীবনে আশা তো আমিও কম করিনি। অবিশ্যিই সে সব ছেলেবেলার জীবনে। তখনো পুরনো নারকেল কাঠির ঝাঁটার মতো সংসারটা ছড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে নি। বাবা মায়ের শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ছিল, হাসি ছিল দুজনের মুখে। মনে হয় তখন বাবা মায়ের চোখেও একটা সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল। বাবা বলতেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের আমি আলাদা করে দেখবো না। সবাইকে সমান ভাবে শিক্ষা দেবো।' দিয়েছিলেনও তাই। তবু, কিছুতেই নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সবদিকে তাল বজায় রেখে গড়ে তুলতে পারেন নি।

বাবাকে সে-জন্য কখনোই দোষ দিতে পারি না। দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেবো এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেবো আমাদের সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এই সব ব্যবস্থাই গরীবকে আরো গরীব করেছে, বড়লোকদের ভাণ্ডার আরো বেশি ভরে তুলেছে। আমাদের এ দেশটা স্বাধীন হবার আগে কেমন ছিল, জানি না। কারণ আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। জন্মের পরে, আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান বাড়তে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম, দেশের গোটা ব্যবস্থা আর পরিকল্পনার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের অসহায় অপমান ছাড়া আর কিছু নেই।

আমার বাবা এই ব্যবস্থারই শিকার। চটকলে বিস্তর চুরির সুযোগ নাকি আছে। তার প্রমাণও পেয়েছি। আমার বাবারই সহকর্মীদের কারো কারোকে যখন দেখি, বাড়ি ঘর-দোর করে বেশ ভালই আছে। আমার বাবার চুরির যোগ্যতা ছিল না। উন্নতির একমাত্র সোপান ছিল বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, তাও বছরে দশ টাকার বেশি না। অতএব, বাবা মায়ের স্বাস্থ্যের দীপ্তি আর মুখের হাসি নিভে যেতে খুব বেশি কাল সময় লাগে নি। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে, আমি সে-সব খুব ভাল করেই দেখেছি আর জেনেছি। এক হিসাবে বলতে গেলে, আমি আমার মায়ের থেকে কত বছরেরই বা ছোট। সতেরো আঠারোর বেশি না। ফলে আমি বাবা মায়ের একরকম বন্ধু আর সমব্যথী।

আমি জানি, আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে, আমার বাবা মা, আমাদের ভাইবোনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। এ বিষয়ে আমি কখনো তাদের সমালোচনা করতে পারবো না, সে-অধিকারও আমার নেই। তবে আমার কেন যেন মনে হয়েছে, এ বিষয়ে বাবা মায়ের কোথাও একটা অসহায়তা ছিল। এখন অবিশ্যি বাবা ভ্যাসেকটমি করেছেন। নইলে হয়তো আমাদের আরো কিছু ভাইবোনের জন্ম হত্।

আমার বাবা এ অবস্থাতেও, কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে, আমাদের সব ভাইবোনকেই লেখাপড়া শিখিয়ে যাচ্ছেন। এতে আমার মায়ের অবদান কোনো অংশেই কম নয়। খিদের সময়ে মাকেই তো

সকলের পাতে খাবার বেড়ে দিতে হয়। এখনো আমাদের কারোকেই মা উপোস করিয়ে রাখেন নি। আমাদের সংসারে অশান্তি যা, তা কেবল আমার ভাই দুটিকে নিয়ে। বিশেষ করে বড়টিকে নিয়ে। ওর বয়স এখন উনিশ চলছে। ওর চালচলন ভাব ভাষা, মেলামেশার সঙ্গীসাথী, কোনো কিছুকেই ভাল বলা চলে না। ওর ভঙ্গিও বেশ দুর্বিনীত। ও এই বয়সে পার্ট ওয়ান দিয়েছে। হায়ার সেকেণ্ডারিতে একবার ফেল করেছিল। সেই হিসেবে আমার পরের বোন পার্ট দু দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইউনিভারসিটি আর কলেজগুলো আমাদের জীবনে কত বড় অভিশাপ হয়ে উঠেছে, সে-কথা কারোরই অজানা নেই।

আমার এখন বাইশ চলছে। আমি সকালে সন্ধ্যায় দুটো টুইশানি করি। মাত্র দু সপ্তাহ হলো, টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখেছি। তিন মাসের কোর্স। টাইপরাইটিং শিখছি কয়েক মাস। স্পীড খারাপ তুলিনি। সেই সঙ্গে শর্টহ্যাণ্ডও শিখছি। কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে, আমাদের উপকণ্ঠেও আজকাল নানারকম কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উপকণ্ঠ থেকে কলকাতায় শেখাটাই আমি বেছে নিয়েছি। টেলিফোনের কোর্সটা তো কলকাতার বাইরে থেকে কোনোরকমেই সম্ভব না। টিউশনির টাকা থেকেই, কলকাতার মান্থলি টিকিট আর চায়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার সাকুল্যে পঁয়ত্রিশ টাকা উপার্জনের থেকে, মাঝে মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা মাকেও দিয়ে থাকি।

আমার খুব হাসি পায়, দুঃখও হয়, যখন বাবা আমার আর আমার ছোট বোন শিপ্রার বিয়ের কথা বলেন। বাবার কথাগুলো এইরকম : 'আমার মেয়ে দুটি তো দেখতে খারাপ না। রঙ ফরসা, চোখ মুখ ভাল, শাকপাতা খেয়েও, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ভগবান কিছু কিঞ্চিৎ রূপও দিয়েছেন। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, পাড়ার এরকম মেয়ে আর ক'টি আছে? তবু এত যে চেষ্টা-চরিত্তির করছি, কেউ ফিরেও তাকায় না। সবারই নজর মেয়ের বাপের ট্যাকের দিকে। এদিকে মুখে সব বড বড় কথা।'

বাবার কথাগুলো সর্বাংশে মিথ্যা না। অবিশ্যি নিজের কথা বলছি না। তবে হ্যাঁ, শাকপাতা খেয়েও একেবারে হাড় জিরজিরে নির্জীব হয়ে পড়িনি। এটা বয়সেরই ধর্ম কী না জানি না, নিজেরই এক এক সময় মনে হয়, শরীরটা যেন বড় বেশি চোখে পড়ার মত। আসলে এটা বাবা-মায়ের রক্ত মাংসের থেকে পাওয়া, তাই কুড়িতেই বুড়িয়ে যাইনি। আমার ছোট বোন শিপ্রার স্বাস্থ্য তো রীতিমত উদ্ধত। কিন্তু চাকুরিজীবী অবিবাহিত ভদ্রলোকের ছেলেদের ব্যাপারটা সত্যি লজ্জাজনক। এইসব মধ্যবিত্ত তরুণরা বড় বড় কথা বলে, অফিসে পাড়ার বিপ্লব করে, কিন্তু পণের টাকা, কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে·পারে না। সেইদিক থেকে আমাদের পাড়াব দিবাকর ছেলেটা অনেক ভাল।

না, দিবাকরেব সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, তবে দুর্বলতা বোধ হয় উভয় পক্ষেরই আছে। দিবাকর লেখাপড়ায়ও ভাল। কিন্তু বেকারির অভিশাপ ওর গলায়ও ফাঁস পরিয়ে রেখেছে। ওর একটা চাকরি হয়ে গেলে, আমার জীবনে কী ঘটতে পারে, কে জানে। তবে এসব আমি মনে আসতে দিই না। আশা যে মরীচিকা, তা ভালই জানি। পাড়ার বাকি ছেলেদের 'হিড়িক' কিছু শুনতেই হয়। ওসব নষ্টবুদ্ধি নিরুপায় ছেলেগুলোর বাঁদরামী এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে।

আমি সপ্তাহে পাঁচদিন, শনি রবি বাদে, খেয়ে-দেয়ে গড়ে এগারোটার গাড়িতে কলকাতা যাই। তার আগে সকালে একটি ক্লাস সিক্সয়ের মেয়েকে পড়াই। সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে, একটি ক্লাস এইটের মেয়েকে পড়াই। ট্রেনে আমি মেয়েদের নির্দিষ্ট কামরাতে যাতায়াত করি। বসবার জায়গা না পেলে দাঁড়িয়ে যাই। প্রায়ই তা ঘটে। পুরুষদের কামরা সম্পর্কে আমার কোনো কুসংস্কাব নেই বা ছুঁৎমার্গিতাও আদৌ নেই। তবে মেয়েদের কামরায় আমি অনেকখানি স্বস্তিবোধ করি। যদিও মেয়েদের কামরাটা কিছু স্বর্গ না, সেখানেও অনেক জটিলতা কুটিলতা নীচতা দেখা যায়। জায়গা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি তো সামান্য কথা। এর ওকে নানারকম ঠেস মারা কথা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আর মেয়েদের বিষয়েই নিন্দাচর্চার কোনো কিছু কমতি নেই। অনেক সময় এমন কথাও কানে আসে, মনে হয় কানে যেন অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। লজ্জায় মুখ তুলে তাকানো যায় না।

যাই হোক, এসব নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে কিছুদিন ধরেই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করছিল। নামটা আমি পরে জানতে পেরেছি। আমার ঠিক পরের

স্টেশন থেকেই সে ওঠে। চালচলনে, সাজগোজে সে খুব স্মার্ট। মেয়ে হয়ে বলতে সংকোচ হয়, তার যেন রূপের থেকে হার বালা কানের ফুল, আর রকমারি ব্যাগ, চোখের সান গ্লাস, সব মিলিয়ে মেয়েটি নজর কাড়ার মতই।

মেয়েটিকে আমি কলকাতায় যাবার প্রথম দিন থেকেই দেখেছি। একই গাড়িতে সে যায়, আর মেয়েদের কামরাতেই। দেখেছি, সে কামরায় উঠলেই, কিছু মেয়ে নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারা, ঠোঁট মুচকে হেসে নানারকম ভঙ্গি করে। কিন্তু সন্ধ্যা নামে মেয়েটির যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে কামরায় ঢোকে, আশেপাশে তাকিয়ে যদি জায়গা দেখতে পায়, বসে, তা নইলে দাঁড়িয়েই থাকে। ব্যাগ থেকে খুলে, রোজই কোনো না কোনো ইংরেজি পকেট বই পড়ে।

মেয়েটির সাজের উগ্রতা আছে বটে, তবে ওর স্মার্টনেস, বিশেষ করে অন্যাদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করা, আমার খারাপ লাগে না। একদিন, আমি দরজা থেকে, সীটের কাছে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। সন্ধ্যা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একজন মোটাসোটা মহিলা মাঝের একটা স্টেশনে নেমে যেতেই সন্ধ্যা ঝটিতি বসে পড়েছিল। তারপরে আমার দিকে তাকিযে কী মনে হতে, একটু সরে গিয়ে হেসে বলেছিল, 'বসুন না। আমাদের দুজনের হয়ে যাবে।'

আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা বারে বারে অনুরোধ করাতে, আমি বসেছিলাম। কথায় কথায় নাম ধাম জানা হয়ে গিয়েছিল। ওর নাম সন্ধ্যা তরফদার। আমার পরের স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি হলেও, পড়াশোনা করেছে কলকাতার কলেজে। বুঝেছিলাম, সেইজন্যই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তা না হলে পনর বিশ মাইলের মধ্যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে আমাদের কলেজেই পড়ে! সেই হিসাবে পরিচয় হওয়া উচিত ছিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই সন্ধ্যার সঙ্গে আমার মোটামুটি আলাপ হয়ে গিয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম, ও একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। মোটামুটি আলাপটাকে সন্ধ্যা নিজেই যেন একটু তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় করে তুলতে চাইল। কথায় কথায় এমন আশ্বাসও দিল, ও ওদের অফিসে আমার একটা চাকরির চেষ্টা করবে। যার মাইনে শুরুতেই, চার পাঁচশোর কম না। এরকম একটা অফার তো আমার কাছে হাতে চাঁদ পাবার মতো। সত্যি কি এমন ভাগ্য আমার হবে?

সন্ধ্যার সঙ্গে ট্রেনে মেলামেশার ফলে, লক্ষ্য করেছি, আমার দিকেও যেন কোনো কোনো মেয়ে একটু বাঁকা চোখে তাকায়। সন্ধ্যাকেও সে-কথা বলেছি। সন্ধ্যা বলে, 'এরা সব নীচ। ওদের কোনো কিছুর দিকে মন দেবে না। তুমি একটু সাজলে গুজলে, বা দুটো মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই, ওরা তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভেবে নেবেই। আমি তো ওদের দিকে ফিরেও তাকাই না।'

সেটা মিথ্যা কথা নয়, নিজেই অনেকদিন দেখেছি। তবে সন্ধ্যাকে আমার কেমন যেন মনে হয়, সর্বদাই জ্বলছে, ফুঁসছে, দুর্বিনীত কথাবার্তা। ওর এই ব্যাপারে আমি একটু অস্বস্তিবোধ করি। আবার ভাবি, হয়তো ওর জীবনেও অনেক জ্বালাযন্ত্রণা আছে। ওর মুখে শুনেছি, আমার মতই ওর অনেকগুলো ভাইবোন। ওর ওপরে দুই দাদাও আছে। বাবা রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। উপার্জন যা করার, সন্ধ্যা আর ওর এক-দাদাই করে।

অবিশ্যি এসব ভেবেও আমি কী বা করতে পারি। সন্ধ্যার দৌলতে যদি আমার একটা চাকরি হয়ে যায়, তবে ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সন্ধ্যার কথা

বাড়িটার কথা ভাবলে, থাকতে ইচ্ছা করে না। একবার বাড়ি থেকে বেরোলে, সেখানে আর ফিরতেও ইচ্ছা করে না। বাড়িটাকে বাড়ি বলে মনে হয় না, যেন একটা নরক। অথচ, যা-ই করি, যেখানেই যাই, বাড়িতে ফেরা ছাড়া জায়গাও নেই। কোনোরকমে যাও বা টিকে আছি, বাইরে থাকলে পশুরা আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। তবু বাবা মা ভাইবোন, সংসার, এই সব পরিচয়ের একটা আবরণ আছে। এই আবরণটাই এখনো আমাকে বাইরের হিংস্র থাবা থেকে আড়াল করে ফেলেছে।

অথচ বাড়ির চেহারাটাই বা কী? লোকের কাছে বলি, বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। আসলে বাবাকে আমি কোনোকালে কিছু করতেই দেখিনি। অন্তত লোকে যাকে 'কাজ' বলে, সেরকম কিছুই করতে দেখিনি। ভদ্রলোক জীবনে একটি কাজই কোনোরকমে করতে পেরেছেন। দেশ বিভাগের পরে কোনোরকমে করতে পেরেছেন। দেশ বিভাগের পরে কোনোরকমে কিছু জমি দখল করে, টালির চালের একটা কাঁচা বাড়ি করতে পেরেছেন। বাকি জীবনের সবটাই উঞ্ছবৃত্তি, আর প্রতি বছর একটা করে সন্তানের জন্ম দিয়ে গিয়েছেন। কলসী থেকে জল উপচে পড়ার মতো, আমাদের ভাইবোনগুলোর অবস্থা! কী করে যে আমরা বেঁচে থাকলাম, এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। ছেলেবেলাতেই আমাদের না খেতে পেয়ে মরে যাবার কথা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরেই নাকি আমার জন্ম। আমাকে কয়েক মাসের কোলে নিয়ে, দুই দাদাসহ বাবা মা পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। আমার একজন ঠাকুরমাও নাকি ছিলেন। তিনি এ দেশের জল হাওয়ায় বেশিদিন বাঁচেন নি। মরে বেঁচেছিলেন। সে-সব অবিশ্যি আমার কিছুই মনে নেই। সবই বাবা মায়ের কাছে শোনা কথা।

বাবা চাকরি না করুন, ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি, ভদ্রলোক রীতিমতো ডাকাবুকো। অনেকটা দস্যু রত্নাকরের মতোই, আশেপাশে ত্রাস সঞ্চার করে, যেখানে থেকে যখন যা পেয়েছেন, তাই সংগ্রহ করে এনে সংসার চালিয়েছেন। কিন্তু বাল্মীকি হবার কোনো লক্ষণই তাঁর চরিত্রে নেই। রাজনীতির দলাদলি বরাবর করে এসেছেন, এখনো করেন। ওটা একটা মুখোশ ছাড়া, আমার আর কিছুই মনে হয় নি। বরাবরই শুনে আসছি, আমার বাবা নগেন তরফদার একজন ডাকাত বিশেষ।

একদিক থেকে ভাবলে, বাবাকে দোষ দিতে পারি না। বাবা তো আর নিজে দেশ বিভাগ করতে যান নি। অথচ রাতারাতি আমাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়েছিল। শুনেছি, সেখানেও আমাদের সোনার মঠ ছিল না। তবু যা হোক খেয়ে পরে চলে যেত। এখানে এসে বাবার কিছুই করার ছিল না। ডাকাবুকো যাই যা হতেন, আমাদের বাঁচাতে পারতেন না, নিজেও বাঁচতেন না। মাকেও মরতে হত।

কিন্তু তিনি নিজে যা-ই করুন, আমাদের জন্য কী করেছেন? কেবল উঞ্ছবৃত্তি করে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই কি শেষ কথা? নিজের অবস্থা বুঝে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটাও করতে পারতেন। আমাদের ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারতেন।

আমার ভাই বোনের সংখ্যা আট। নেহাত মায়ের আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। তা না হলে বোধ হয় এখনো গুচ্ছের ভাইবোন প্রতি বছরই জন্মাতো। বাবা যদি বা কোনোরকমে আমাদের উদরপূর্তি করে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, লেখাপড়া শেখাবার কোনো চেষ্টাই ছিল না। বাবা যে-ভাবে দিন যাপন করতেন, সেই জীবনে সুস্থভাবে পরিবার গড়ে তোলার কথা চিন্তায় আসা সম্ভব না। নেহাত ভদ্রলোকের, ছেলেমেয়ে বলে পরিচয় দিতে হবে, তাই রিফিউজি ফ্রি ইস্কুলে অল্পসল্প লেখাপড়া শিখেছিলাম।

বাবার এখন বয়স হয়েছে। তাঁর জায়গা দখল করেছে আমার দুই দাদা। সমাজবিরোধী বলতে যা বোঝায়, ওরা তাই হয়ে উঠেছে। অথচ ওরা দুজন, আমাদের বাকি ছ' ভাইবোনের থেকে লেখাপড়া কিছু বেশিই শিখেছিল। তার পরিণাম যে এই হবে, তা বোধ হয় বাবাও ভাবেন নি। এখন তো বাবার সঙ্গেই দুই দাদার সব সময়ে খিটিমিটি ঝগড়াবিবাদ লেগেই আছে। বাবা আর দাদাদের কথাবার্তা এত খারাপ, নোংরা, বাবার ছেলে বলে মনে হয় না।

রাজনীতি আর সমাজবিরোধিতা এক কিনা, জানি না। আমার বাবাকেও দেখেছি, এখন দাদাদেরও দেখছি। দাদারা রাজনীতি করে, আবার ওয়াগন ভাঙে। দলাদলি মারামারি লেগেই আছে। আর তার ধাক্কা বাড়িতে এসেও পড়ে।

এ অবস্থায় বাড়ির আবহাওয়া যেমন হতে হয়, তাই হয়েছে। আমরা অন্যান্য ভাইবোনেরাও দাদাদেরই সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকেই জেনেছি, জীবনে এসব করেই বাঁচতে হয়। আর মেয়ে হিসাবে সুস্থ রুচিশীল জীবনধারণ? বারো বছর বয়স না পেরোতেই, দাদার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যে-খেলা খেলেছে, তারপরে আর সুস্থ জীবনের কথা চিন্তা করাই যায় না। মা যেন সে সব চোখে দেখেও

দেখতেন না। কিন্তু বাবা রেগে যেতেন। রেগে গেলেও বাবার কিছু করার ছিল না। দাদারা আর তাদের বন্ধুরা বাবাকে রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে দিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখছিলাম, আমি একলা না, একদল মেয়েকে নিয়ে, দাদারা আর ওদের বন্ধুরা নরক গুলজার করে তুলেছিল। আমিও আস্তে আস্তে ও-সবেই ভালো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কি, একটু আধটু মদ সিগারেট খাওয়াটা খুবই সহজ বলে মনে হত। কেবল আমার বয়সী না, আমার থেকে বয়সে বড় মেয়েরাও, আমাদের বেশ ভালো ভাবে হাতেখড়ি দিয়েছিল।

বাড়িতে তো পেট ভরে খাওয়া জুটতো না। জুটলেও, ভাতের পাতে বড় জোর উসুনি জলের মতো দুহাতা ডাল। খেতে হয় খাও, নয় তো পথ দ্যাখো। সেই তুলনায়, দাদার বন্ধুরা ভালো ভালো খাবার খাওয়াতো, ভালো শাড়ি জামা জুটতো। হাতে কিছু নগদও আসত। মা আবার তা থেকে ভাগ বসাতে আসত। না দিলেই, নোংরা গালাগালি।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন ষোল বছর বয়সে, প্রায় আধবুড়ি বাণীদি নামে একজনের সঙ্গে প্রথম কলকাতায় যাই খালিকুঠি বেশ্যালয়ে। বড়লোক লম্পট, মাতাল, মদের এত ঢেলখেল, মেয়েদের ভিড়, আগে আর কখনো দেখিনি। প্রথম দিনেই রোজগার করেছিলাম একশো টাকা, মাত্র দুটো লোকের কাছ থেকে। বাণীদি আর দালালের পাওনা আলাদা ছিল।

এই ভাবেই শুরু। তারপরে এই ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে অনেক দেখলাম। অভিজ্ঞতাও কিছু কম হয় নি। তবে উত্তর কলকাতার নামকরা পাড়ায় যাই না। রাস্তায় রাস্তায়ও ঘুরে বেড়াই না। আমার ব্যবসাটা একটু স্বতন্ত্র। সেই কারণে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমি চাকরি করি। তা একরকমের চাকরিই তো। বেলা বারোটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ। মাসে হাজার বারোশো টাকা অনায়াসেই রোজগার হয়। এখন দাদারাও আমার টাকায় ভাগ বসাতে চায়। বাবা মায়ের তো কথাই নেই। আমার দেখাদেখি, আমার ছোট বোন দুটোও এদিকেই পা বাড়িয়েছে। নিয়মই তাই। একবার চৌকাঠের বাইরে পা দিলে, এ পথ থেকে সহজে ফেরা যায় না।

এখন আমিও মাঝে মধ্যে দু চারটে মেয়েকে আমার পথে টেনে আনি। এতেও লাভ কিছু কম নেই। সম্প্রতি শুভ্রা নামে যে-মেয়েটিব সঙ্গে ট্রেনে আমার পরিচয় হয়েছে, ভাবছি ওকেও টোপ দেবো। মেয়েটার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি, গরীব, বাড়িতে অভাব। মেয়েটা অবিশ্যি ভালো। নানাভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একবার আমার জীবনের স্বাদ পেলে, টাকা আর আরাম পেলে, এসব ভুলে যাবে। তবে মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, একটু সাবধানে এগোতে হবে। মেয়েটার চেহারাটি বেশ মিষ্টি, চোখে পড়বার মতো। একবার হাত করতে পাবলে, কাজ ভালোই দেবে।

শুভ্রার কথা

সন্ধ্যার সঙ্গে ইদানিং আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। ও প্রায়ই বিকালে ওর অফিস ছুটির পরে আমার কাছে কমারসিয়াল ইনস্টিটিউটে চলে আসে। আমাকে টেনে নিয়ে যার রেস্টুরেণ্টে, খাওয়ায়। আমার ভারি লজ্জা করে। এক তরফা ও খাইয়ে যায়, আমি একদিনও খাওয়াতে পারি না। অথচ বাধা দিলেও সন্ধ্যা শুনতে চায় না। বলে, 'তোমার যখন চাকরি হবে, তখন তুমি খাইও, কিছু বলব না।'

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা না। সন্ধ্যাকে খাওয়াবার মতো আর্থিক যোগ্যতা আমার নেই। মেয়েটা সত্যি ভারি প্রাণখোলা। আমাকে ভালোবেসেই ফেলেছে। মাঝে মাঝে ও কেমন যেন এলোমেলো কথাবার্তা বলে। বাড়ির বিষয়ে, সমাজ পরিবারের বিষয়ে ওর কোনো টান নেই। ভাইবোনদের কথা কখনো ওর মুখে শুনি না। একদিন তো ফস করে বলেই বসল, 'ভদ্রলোকের মেয়েদের থেকে যারা শরীর ভাঙিয়ে খায়, তারা অনেক ভালো।'

কথাটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, 'না ভাই, তোমার এ কথাটা আমি কখনো মানব না।'

সন্ধ্যা হেসে বলেছিল, 'সত্যি সত্যি কী আর বলছি। জ্বালায় জ্বলে বলছি। তা ছাড়া শরীর ভাঙিয়ে বলতে তুমি কী বুঝেছ? খারাপ কিছু? মোটেই আমি তা বলি নি। চাকরি করাটাও তো শরীর ভাঙিয়ে রোজগার করাই, না কি?'

সে কথা হয়তো ঠিক। তবু 'শরীর ভাঙিয়ে' কথাটা যেন মেয়ে হয়ে কানে কেমন লাগে। শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্যে' যেন পড়েছিলাম, শ্রমজীবী পুরুষ ও দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কথাটা আমি মেনে নিতে পারি নি।

সন্ধ্যা কয়েকদিন ধরেই ওর এক বউদির বাড়ি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। বালিগঞ্জের দিকে কোথায় নাকি সেই বেলা বউদি থাকেন। মানুষ নাকি খুব ভালো। আমার যাবার ইচ্ছা থাকলেও সময় করে উঠতে পারি না। কারণ সন্ধ্যার সঙ্গে সন্ধ্যার সময়ে বউদির বাড়ি গেলে, ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আমার টুইশানি আছে। বিকেল পাঁচটা বাজলেই আমি কলকাতা থেকে পালাই পালাই করি।

সন্ধ্যা তবু জেদ করে। শেষ পর্যন্ত একদিন বেলা তিনটের সময় যাওয়া ঠিক হল। সন্ধ্যা ওর অফিস থেকে এসে আমাকে নিয়ে গেল। সেদিনটা আমার শর্টহ্যাণ্ডের ক্লাসটা করা হল না। গিয়ে দেখলাম, দক্ষিণ কলকাতার বেশ অভিজাত পাড়া, তিনতলায় বেলা বউদি থাকেন। আগেই শুনেছিলাম, বেলা বউদির স্বামী ব্যবসায়ী। গড়িয়াহাটে নাকি কাপড়ের দোকান আছে। তবে তিনি বাড়িতেই বেশিক্ষণ থাকেন। বিশ্বস্ত কর্মচারিররাই ব্যবসা দেখাশোনা করে।

সন্ধ্যার সঙ্গে বউদির দোতলার ফ্ল্যাটে গেলাম। বাইরের বসবার ঘরটি বেশ সুন্দর। শোফা সেট, বইয়ের আলমারি, আরো নানা কিছু দিয়ে সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই, বেলা বউদির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, কেমন একটা গন্ধ পেলাম। বেলা বউদি আমাকে জড়িয়ে ধরতেই গন্ধটা যেন বেশি করে নাকে লাগল। তাঁর চোখ দুটোও যেন লাল ছিল। অথচ তাঁর ঘাড় ছাটা চুল, লাল পাড় শাড়ি, চেহারাটি বেশ সুন্দর। একটু বেশি মোটা। তা হলেও হাসি খুশি। কিন্তু গন্ধটা কি মদের?

সন্ধ্যা আমাদে বউদির কাছে বসিয়ে দিয়েই ভিতরে কোথায় চলে গেল। তারপরেই এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর চোখও রীতিমত লাল আর ঢুলু ঢুলু। এসেই আমাদে দেখে বলে উঠলেন, 'বাঃ, এ যে দেখছি খাসা। ওকে কোথা থেকে যোগাড় করলে বেলা?'

বেলা বউদি চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'কী যা তা বলছ? এ আমাদের সন্ধ্যার বন্ধু, বেড়াতে এসেছে।' বলে বউদি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্বামী।'

কিন্তু ভদ্রলোককে আমার একটুও ভালো লাগল না। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে আছেন। এ আবার কী রকম পরিবার। পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বা কোথায়! লজ্জাই বা কোথায় গেল?

বউদি বললেন, 'বস শুভ্রা। কী খাবে বল। চা না কফি?'

বললাম, 'আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যা কোথায় গেল?'

বউদি বললেন, 'তুমি বস, আমি ডেকে দিচ্ছি। হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। তিন তলাটাও আমাদের। সেখানেও যেতে পারে।'

বউদির স্বামীটি ইতিমধ্যে শোফায় এলিয়ে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বউদি, আপনি যাবেন না।'

বউদি হেসে উঠলেন, 'আরে কোনো ভয় নেই। তোমার দাদা অতি ভাল মানুষ। শরীরটা তো ভাল নেই, তাই ওরকম করছেন।'

শরীর খারাপ হলেও কি কেউ ওরকম ভাষায় একটা নতুন মেয়ের সামনে তার প্রশংসা করে? খাসা, যোগাড় করা, এসব কথার মানে কি?...আমার এসব ভাবনার মধ্যেই সন্ধ্যা এসে ঘরে ঢুকলো। আমাকে বলল, 'চলো, তেতলায় যাই।'

আমি ভাবলাম, সেখানে বউদির ছেলেমেয়েরা আছে। সন্ধ্যার সঙ্গে তিনতলায় গেলাম। তিন তলার একটি ঘরে একজন যুবক বসেছিল। তার চোখ লাল, আর সেই গন্ধ। সন্ধ্যা আমাকে আলাপ করিয়ে দিল, 'বউদির ছোট দেওর।'

কিন্তু যুবকটির সামনে টেবিলে মদের বোতল ও গেলাস দেকেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। যুবকটি হেসে আমাকে ডেকে বলল, 'আসুন, বসুন। চলবে?' বোতল দেখালো।

সন্ধ্যা বলল, 'বীয়র তো, শুভ্রা একটু খাবে।'

আমি মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে বললাম, 'না না, এসব মদ টদ আমি খাই না। আমি এখুনি চলে যাবো।'

সন্ধ্যা হেসে বলল, 'বীয়র আবার মদ নাকি? ও তো জল!'

যুবকটি বলল, 'আরে এখানে একবার ঢুকলে কি সহজে বেরনো যায়?'

কথা শুনে, আতঙ্কে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমি এক নারকীয় ফাঁদে পা দিয়েছি। এই সময়েই সে ঘরে আরো তিন চারটি মেয়ে এলো। সঙ্গে দুজন পুরুষ! তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, হাসাহাসি করছিল। আমি সন্ধ্যার দিকে অসহায় ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বললাম, 'সন্ধ্যা, তুমি আমাকে এ কোথায় নিয়ে এসেছো? আমি তো তোমাকে কখনো এরকম ভাবতে পারি নি।'

সন্ধ্যা বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে জোর করে কিছু করবে না।'

আমি বললাম, 'সেসব আমি জানি না। তুমি এখুনি আমাকে এ বাড়ির বাইরে নিয়ে চলো।'

সন্ধ্যা বলল, 'আহা, এত তাড়া কিসের? আমরা দোতলায় যাই।'

আমি সন্ধ্যার সঙ্গে দোতলায় যেতে যেতে বুঝতে পারলাম, এই হচ্ছে সন্ধ্যার প্রাইভেট ফার্মের চাকরি। কিন্তু সে-কথা আমি ওকে মুখ ফুটে বললাম না। দোতলার বসবার ঘরে এসে দেখলাম, নতুন দুজন লোক [illegible] মেয়ে বসে আছে। বউদি তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন। সন্ধ্যার মুখে, আমি তখনই চলে যেতে চাই শুনে বউদি বিশেষ অবাক হলেন না। আলমারি থেকে ব্যাগ বের করে, পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে শুভ্রা, আবার তোমার ইচ্ছে হলে এসো। আমার এই সামান্য উপহার নিয়ে যাও।'

উপহার! তাও আবার টাকা? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, আমাকে টাকা দেবেন না।'

বউদি বললেন, 'কেন, তোমার টাকার দরকার নেই? যদ্দুর শুনেছি, তোমাদের অবস্থা ভাল নয়।'

আমি বললাম, 'নাই বা হল। তা বলে আপনার টাকা আমি নিয়ে যাবো কেন?'

আমার কথা শুনে বউদি রাগ করলেন না, হেসে বললেন, 'ঠি আছে। তবে তোমার যদি কোনোদিন দরকার পড়ে, আমার কাছে এসো। ভয় নেই, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।'

আমি কোনো কথা না বলে, সন্ধ্যার সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়িতেই সন্ধ্যাকে বললাম, 'তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারবো।'

কী ভাবে কথাটা বললাম জানি না। সন্ধ্যা আর এক পাও আমার সঙ্গে আসতে পারল না। আমার তখন দুচোখ ফেটে জল আসছে। সব ঝাপসা, রাস্তা, গাড়ি, আলো, সবই যেন কাঁপছে। কীভাবে যে স্টেশনে এসে বাড়ি ফিরলাম, নিজেই জানি না। আর এই প্রথম, আমি সন্ধ্যার টুইশানিতে যেতে পারলাম না।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, পরের দিন সকালবেলায় বাবার হঠাৎ শরীর খারাপ করল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দেখেই, হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। বাবার বুকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। মিউনিসিপ্যালিটিতে ছুটলাম, যদি অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়। পাওয়া গেল না। ভোরবেলাতেই একজন রুগী নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছে। অগত্যা বাবাকে নিয়ে সেই সাড়ে এগারোটার গাড়িতেই আমরা চার ভাইবোন হসপিটালে নিয়ে চললুম।

পরের স্টেশন থেকে সন্ধ্যা উঠল। আমি অন্য কামরা থেকে দেখলাম, কিন্তু কোনো কথা বললাম না। বাবাকে নিয়ে শিয়ালদায় নেমে, একটা ট্যাক্সি ডেকে মেডিকেল কলেজ হসপিয়ালে গেলাম। বাবাকে এমারজেন্সিতে ভর্তি করিয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দেখি সন্ধ্যা এসে সেখানে হাজির।

আমি মুখ শক্ত করে অন্যদিকে ফিরে তাকালাম। সন্ধ্যা আমার কাছে এসে বলল, 'শুভ্রা, জানি, এখন তুমি আমাকে ঘেন্না করছো।'

বললাম, 'তা করছি।'

সন্ধ্যা নিচু গলায় ঢোক গিলে বলল, 'করতেই পার। কিন্তু তোমার বাবার অসুখের কথাটা শুনে না এসে পারলাম না।'

আমি বললাম, 'কোনো দরকার ছিল না। আমার বাবার অসুখ, আমরাই দেখব। তোমার কিছুই করবার নেই। তুমি যেতে পার।'

সন্ধ্যা কালো মুখ করে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, বলল, 'আচ্ছা শুভ্রা, বলতে পার, অত অভাবে দুঃখে, তুমি কী করে এমন শক্ত থাকলে, আর আমি নর্দমার জলে ভেসে গেলাম?'

আমি অবাক চোখে সন্ধ্যার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর কাজল পরা চোখের কোণে জল। আমি রেগে বলতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। বললাম, 'সন্ধ্যা, এ কথার জবাব আমার সত্যি জানা নেই। আমার কাছে জীবনের চেহারাটা অন্য রকম। সুখ আমিও চাই, কিন্তু তার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিতে পারব না।'

সন্ধ্যা কোনোরকমে বলল, 'বুঝেছি। চলি ভাই শুভ্রা।'

সন্ধ্যা ভেজা চোখে, মুখ নামিয়ে বলে গেল। খাবার জল। উদ্বেগ সত্ত্বেও সন্ধ্যার জন্য আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার কথা

জীবনে এরকম হোঁচট আর কখনো খাই নি। আজ বউদির বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে না। বাড়ি ফিরে যাব, না কি গঙ্গার ধারে যাব, বুঝতে পারছি না। কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছে। শুভ্রা এত শক্তি কোথা থেকে পেল? অথচ আমাদের মধ্যে সমাজ সংসারের তফাত কতটুকু? জানি না, ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন কী না। থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে কি শুভ্রার মতো শক্তি দিতে পার না?

মহাশ্বেতা দেবী

চোলি কা পিছে

কী আছে, তাই ছিল সেই সালের জাতীয় সমস্যা। যে সময়ে এটি ন্যাশনাল ইসু হয়ে ওঠে, সে সময়কার অন্যান্য ভ্যানতাড়াই, যথা শস্যহানি—ভূমিকম্প চতুর্দিকে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী ও রাষ্ট্রশক্তির সংঘর্ষ ও হত্যা—হরিয়ানায় বেজাতে বিয়ে করার অপরাধে তরুণ-তরুণীর মুণ্ডচ্ছেদ—নর্মদা বাঁধ দিয়ে মেধা পাটেকার ও অন্যদের অবুঝ আবদার, শত শত ধর্ষণ-হত্যা লকাপ নির্যাতন ইত্যাদি নন্ ইসু স্বাভাবিক নিয়মেই সংবাদপত্রে উচ্চালোকিত হতে গিয়েও হয়নি,—এ সব নন ইসুই থেকেই যায়। এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল চোলি কা পিছে।

জাতীয় জীবনে ইসু নন্ ইসুকে মাড়িয়ে চলে যাবে—চলে যায়, এটাই নিয়ম। এজন্যই 'কী আছে' এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রমাণ হয়ে যায় ভারত শুধুই ঘুমোয়ে রয় না, দরকারে জেগেও ওঠে।

তাই কী আছে তা জানার জন্যে জাতি-মিডিয়া-সেন্সারবোর্ড- ব্রা-বিরোধী মুক্ত মেয়েরা—রাজ্যে বহু সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদি ইত্যাদি—দূরদর্শনের মালটি চ্যানেল—চোখের পাতায় সবুজ শেড লাগানো লেডি ভোটারিয়ার সংস্থা—ধর্মীয় দলসকল—রাজনীতিকরা ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, যেজন্য সে সময়ে 'খলনায়ক' ছবির ক্যাসেট গোপনে দেখাই হয়ে ওঠে 'নর্ম অফ দি ডে'।

এমত চিন্তায় নেশনকে ব্যস্ত দেখেই শুভচিন্তকরা জাতির মগজকে ঘরে ফেরাবার জন্য বোম্বাই ও কলকাতায় বিস্ফোরণ ঘটায়,—যেজন্য ভারত সহসা আবিষ্কার করে যে চোলির পিছনে মধ্যপ্রাচ্য আছে। এ আবিষ্কারও আরেক বিস্ফোরণ, কেননা ইমারত ধসল বলে সহসা জানা গেল মিডল ইস্ট-ই চোলি পরা ও খোলা এবং গুটুর গুটুর ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। যে পাওয়ারফুল লবি, বোম্বাইয়া ফিল্মকে ভারতীয় লোকসংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী সংস্কৃতিমাধ্যম বলে তরুণ প্রজন্মের মগজে মেসেজ পাঠাতে নিরত, সে লবি এতে খচে যায়। এদের কাউন্টারলবির (অতীব সংখ্যাগরিষ্ঠ) অধিকর্তা (অবৈতনিক, ইনি সেমিনারে যেতে পারলেই খুশি হয়ে যান) হ্যাণ্ডবিল ছাপান যা প্রত্যেকের খবরের কাগজের ভাঁজে ঢুকে যায় ও বলে, প্রতি বছর বোম্বাইয়া ফিল্ম-এর স্টক ফুটেজের দৈর্ঘ্য, যা দিয়ে জননী বসুন্ধরাকে আঠারো প্যাঁচে বেঁধে ফেলা যায়, তার পিছনেও অনুরূপ কোনো রাষ্ট্র থাকবে যারা দূরে বসেই ভারতীয় জনগণকে হাসায়, কাঁদায়, নাচায়, গানায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ খবর পড়ে পাগলা হরিপদ টাটা বিলডিঙের ছাদে উঠে পড়ে চেঁচায় 'ইনভেশান! ইনভেশান!' ও সত্বর এ টি টি এ ডি এফ এ্যাকট, অ্যান্টি টেররিস্টিক ট্যাকটিকস অ্যানড ডিসরাপটিভ ফোর্সেস অ্যাকটে বন্দী হয়ে কারগারে নিক্ষিপ্ত হয়। কোন কারাগার, কারা বন্দী করে, তা জানা যায় না। 'ইনভেশান' শব্দটি জাতিকে দুশ্চিন্তায় ফেলে। ১০৬ বর্ষীয় স্বাধীনতাসংগ্রামী গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন, ইংরেজ আবার ভারতের ভাষা না জানা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা রাজধানীতে এক গোপন সেমিনারে মিলিত হন এবং এ সুধী সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। কালচারাল রেভল্যুশনের চেয়ে কালচারাল ইনভেশান অনেক বিপজ্জনক। তাই তো রোখার জন্য ভারতকে যা করতে হত ভারত তাই করছে। এ হল যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহার। বোম্বাই ফ্যাকটরি মেড গণসংস্কৃতিই প্রকৃত ভারতীয় সংস্কৃতি যা ক্যাসেটমাধ্যমে আধখানা দুনিয়ায় জেটগতিতে চলছে আর চলছে। রাশিয়া নেই। মার্ক্স লেনিন-মাও জে দং ব্যর্থ। প্রকৃতির শূন্যস্থান পাইরেটেড ক্যাসেট দিয়েই ভরে ফেলতে হবে। 'চোলি কা পিছে' সে অর্থে এ সময়ের মৃতসঞ্জীবনী। এত কিছুর পরেও শৈলীর মা তার বৃহদায়তন ও ক্রমবর্ধমান বপু শুধু একখানি কাপড়ে জড়িয়ে বলে যায়, জীবনে বেলাউজ পল্লাম না, চোলি পরব কি গো! এ সব ব্যাপারে নেশান ব্যস্ত ছিল বলেই উপীনের খবর কাগজে দেড় ইঞ্চি জায়গা পায়। জাতির চক্ষু এড়িয়ে যায়।

দুই

উপীনের খবর উপীনেরই খবর হিসেবে কাগজে বেরোয়নি। ঝারোয়া ও সেওপুরার মাঝামাঝি জায়গায় রেলের চাকায় পিষ্ট এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির মৃতদেহ যে উপীনের দেহ, তাও আগে জানা যায়নি। তার আগেই উপীনের বন্ধু ও পেড়েদার উজান পোস্টকার্ড পেয়েছিল, কাম টু ঝারোয়া। ভেরি আর্জেন্ট—উপীন। এই চিঠিই উজানকে উপীনের পরিণাম জানতে ঝারোয়া নিয়ে যায়। পোস্টকার্ডে উজান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এখন ওর মনে পড়ে উপীনের নিরুদ্দেশ হবার প্রথম পর্ব। স্বভাবতই ও শীতল মালিয়ার কাছে যায় চিঠিটি নিয়ে। সল্ট লেকে এক কানা রাস্তা, যার দক্ষিণে বড় বড় গাছ এবং তারপর চিরপ্রবাহিনী কেষ্টপুর খাল,—পথের উত্তরে কতিপয় অসামান্য বড়ি,—সেখানেই শীতল তার নিজস্ব ফ্ল্যাটে এসেছিল। এ রকম সুন্দরী, শক্তপোক্ত, তেত্রিশেও কিশোরী রমণীর নাম শীতল কেন, তা উজান জানে না। উপীন ও শীতল স্বামী-স্ত্রী,—কিন্তু উপীন এক ভ্রাম্যমাণ এস-ফটোগ্রাফার, শীতল এক বিখ্যাত হিমালয় চড়িয়ে,—দুজনে বছরে এক-দেড়মাসও একসঙ্গে থাকে না,—অথচ দুজনে প্রেমাসক্ত থেকে যায় কেন, তাও উজান জানে না। উজান খুব না-জেনে থেকে যেতে পারে। উজানের আনুগত্য শুধউ উপীনের প্রতি। উপীন সময় থেকে সময়ে, ছবি তোলার জন্যে বিগত পাঁচ বছর কলকাতা থেকেই বিহার-ওড়িশা যাচ্ছে, এবং উজানকে নিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু উপীনের ছবি বিদেশে স্বদেশে টপ দামে বিকোয়, সেহেতু উজানও লাভবান হয়েছে। সল্ট লেকের ফ্ল্যাটটি উজানের পছন্দ নয়। কেউ থাকে না, অসম্ভব ঝকঝকে একটি ফ্ল্যাট। কখনো ক্কচিৎ শীতল আসে, সব যেন গোলমেলে। উপীন অবশ্য বলে, ভেবে কী হবে? শীতল প্রকৃতিনন্দন। এই কানা রাস্তা, এই সবুজ—এই নিঃশব্দ সরু খাল, এগুলো ওর দরকার।

শীতল না কি দুটো মানুষ। হিংস্র ও অ্যাগ্রেসিভ শীতল বারবার হিমালয়কে আক্রমণ করে। শান্ত, কোমল শীতল এই জল-গাছ নৈঃশব্দ্যে ডুবে বসে থাকে। হিমালয় ও সল্ট লেক ব্যতীত ভারতে কত না প্রাকৃতিক শোভা আছে। শীতল সেসব ল্যাণ্ডস্কেপ সহ্য করতে পারে না। শীতল, মনে মেজাজে ২০৯৪ সালের মেয়ে, অথবা শীতলের শতাব্দী এখনো আসেনি।

উপীন এ সব কথা হ্যাঁ হ্যাঁ হেসে বলে। উপীনের বয়স পঁয়ত্রিশ না পঞ্চান্ন বোঝা যায় না। তার চেহোরা চৌকো গড়নের, মোটা, মুখে দাঁড়ি গোঁফ, চোখ অত্যুজ্জ্বল। সে কয়েক দিনে একবার স্নান করে, মাংস ও বিয়ার খায়, বিড়ি ফোঁকে উজানের শরিকি বাড়ির একানে ঘরে এবং দিল্লির বড় হোটেলে সে একই রকম অ্যাট হোম,—এক এস্পেরেন্টো মানুষ।

এখন শীতল বহমান খালের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল বসেছিল। এমন পাথর পাথর বসে থাকতে ওকে নগাধিরাজ হিমালয় না কি শিখিয়েছে।

উজান পোস্টাকার্ডটি শীতলকে দেয়।

—ও, ঝারোয়া।

—তাই লিখেছে।

—আমাকে লেখেনি।

—আপনি তো এ সময়ে কদমকুরি থাকেন।

—বাট, ঝারোয়া থেকেই তো ও দিল্লি গেল।

—হ্যাঁ।

—তোমাকে বলেছিলাম, ওর সঙ্গে লেপটে থাকবে। তুমি জানো এ সময় অ্যাপট-এস্টেটে কত কাজ! তোমাকে আমি টাকা দিয়েছিলাম...

—আপনি টাকা না দিলেও আমি উপীনদাকে আগলে রাখতাম! কী করে জানব, দিল্লি গিয়ে অমন পাগলামি করবে? আমি বিড়ি কিনতে গেলাম, পুলিশ ওকে...

উজানের গলা ভেঙে গেল।

—হ্যাঁ...কাগজে ছবি...কেচ্ছা! কেচ্ছা!

হ্যাঁ, একটা ব্যানারের ছবি। তাতে ইংরেজিতে লেখা, "ওড়িশার অধনগ্না পীনধ্বস্তনা নারীমূর্তিগুলি ধর্ষণ হতে চলেছে। সেভ দেম! সেভ দি ব্রেস্ট!"

—আমি দিল্লি যাইনি আগে। শহরে চিনি না কিছু। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শেষে ফিরে এলাম।

—সুন্দর!

উজান সহসা দুঃসাহসে বলে, জানতাম আমাকেই খবর দেবে। তাই দিয়েছে। ফিরে এসে অপেক্ষাই করছিলাম।

—কিছু বেশি করোনি।

শীতল রেগে গেলে বা উত্তেজিত হলে নিজেকে শাসনে রাখে ঘনঘন শ্বাস টেনে ও ছেড়ে। এক মিনিটে নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিয়ে বলে, হোআই ঝারোয়া, উজান?

—আপনি তো জানেন!

—শুধু এটা জানি না গতবার গেল কেন? হ্যাঁ,—হাতি মাইগ্রেট করছিল সেবার,—

—তারপর খরা,—

—নদীর জলে পেস্টিসাইড,—

—দুর্ভিক্ষ-অবস্থা, সেমিফেমিন কণ্ডিশান,—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! সে সবের ছবি ন্যাশনাল প্রেসেই বেরিয়েছে। 'লেনস' ম্যাগাজিনেও। সে তো চার বার হল। পাঁচ বারের বার?

উজান চুপ।

—পাঁচ বারের বার?

—আমি জানি না। আমি বেতলা চলে গিয়েছিলাম...উপীনদা যায়নি।

—ওগুলো কার ছবি?

উদ্ধতস্তনা এক দেহাতি যুবতী শিশুর মুখে স্তন গুঁজে দিয়ে এলিয়ে বসে আছে। আঁচলে স্তনটি আড়াল করা। সেই মেয়েটিই অনেক মেয়ের সঙ্গে মাথায় জল নিয়ে যাচ্ছে। ভরা কলসের মতো উছলানো বুক।

সেই মেয়েটিই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে আখ কামড়াচ্ছে। প্রস্তর মূর্তির মতো বক্ষ। মুখে অনাবিল আনন্দ।

—কার ছবি, উজান?

—উজান বলে, গাঙ্গোর। গাঙ্গোর কী...তা জানি না।

শীতল বেশ বিস্মিত। গাঙ্গোর? ইউ মিন গাঙ্গোর? গণগৌরী?

—তার মানে?

—তুমি ফ্রি-লান্স কলামনিস্ট উজান! নাম তোমাকে কৌতূহলী করে না?

—না। নামে কী আছে?

—শীতল নিমেষে একদার 'ভারতীয় উৎসর ডকু-মেকার' শীতল মালিয়া হয়ে যায়। রানিং কমেন্টারি দেবার গলায় বলে, রাজস্থানে গাঙ্গোর উৎসব হয়। গঙ্গাপূজা, গঙ্গাদেবী। আশ্চর্য! রাজস্থানে গঙ্গা কোথায়? বড় নদীও তো...

—রাজাগজার দেশ, হয়তো গঙ্গা ছিল।

—সুজান! ও নো, উজান! উজান! তুমি ডিভাইন! কালচারাল অ্যাওয়ারনেস এত কম! উপীনও বলে, বাঙালিরা ডিভাইন! ওরা মনে করে অন্য রাজ্য সম্পর্কে কিছু জানার দরকার নেই।

—এ ছবি আপনি পেলেন কোথায়?

—উপীন লুকিয়ে রেখেছিল। গাঙ্গোরের সঙ্গে উপীনের কি...?

—না।

সেমিফেমিন কণ্ডিশন...গাঙ্গোররা কাজের খোঁজে ঝারোয়া চলে এসেছিল। হালকা ইট আর টালি তৈরির ভাঁটায় ফুরনে কাজ করবে। উপীন আর উজান যখন যায়, তখন ওদের দুতিন মাস ওখানে থাকা হয়ে গেছে। গাঙ্গোরের স্বাস্থ্য দিব্যি ছিল...বাচ্চা দুধ খাচ্ছে দেখে উপীন ছবি তোলে,—গাঙ্গোর কোনো আপত্তি করেনি। তবে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল...পইসা বাবু, টাকা? ফটো খিঁচবে তো টাকা লিব! উজান যেন শক খেয়েছিল। উপীন পকেট খামচে যত ওঠে সব দেয়।

পি ডবলিউ ডি বাংলোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে উজান বলেছিল, ষাট-সত্তর টাকা দিয়ে দিলে? মেয়েটাই-বা কী নির্লজ্জ!

উপীন বলেছিল, নাউ, নাউ উজান! শকিং লাগল তোমার? আরে বাবা, আমি তো ছবি বেচব...ও টাকা নেবে না কেন? ওরা ঘাস খায় না উজান, বোঝে, যে বাবুরা যখন রিলিফও দেয়, পিছনে কোনো মতলব থাকে।

তারপর বলেছিল, স্ট্যাচুর মতো বুক মাইরি! ম্যামাল প্রোজেকশান দেখেছ?

—আমি তাকাইনি।

—হয়, এ রকম হয়। আমার চেনা এক বন্ধুর কাকা স্বাধীনতার পর দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিল। অ্যানথ্রোপলজিস্ট। আদিবাসী মেয়েদের খোলা বুক দেখে...

—ছি ছি ছি!

—তিনিও ছি ছি ছি বলেছিলেন, আর ওদের ব্লাউজ পরতে বলেছিলেন। এখন পরে। তখন তো পরত না। ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেলেন ক্রমে ক্রমে।

—যাকগে, অন্য কথা বলো।

—আমি ওর বুক দেখে..

—ছি উপীনদা! তুমি না বিবাহিত?

—সুন্দর জিনিসকে তারিফ ও শ্রদ্ধা করতে শেখো।

উপীনদার মাথায় গাঙ্গোর ঢুকে যায়। না, সে সব ছবি এখানে নেই। রাতে ঘুঁটের আগুনে লিট্টি সেঁকছে গাঙ্গোর ঈষৎ সামনে ঝুঁকে। ময়লা লাল আঁচলের নীচে কোনারক বুকের স্তনমধ্যরেখা উদ্ভাসিত।

ট্রেন চলে যাচ্ছে, গাঙ্গোররা সে দিকে চেয়ে আছে। আকাশের পটে অজন্তার গুহাচিত্রের বুক। ময়লা চোলি। ময়লা লাল কাপড়, মাথায় উকুন, নোংরা...নোংরা...

দ্বিতীয়বার তো গাঙ্গোর বলেছিল, একেক ছবি একশো টাকা।

উপীন নিজের ঘড়ি খুলে দেয়।

গাঙ্গোর ঘড়ি ফেলে দেয়। ঘড়িতে বেজেছিল এগারোটা দশ। কাঁটা, থেমে যায়। কাঁটা থেমে আছে, থাকবে। উপীন সে ঘড়ি সারায়নি।

মন্ত্রমুগ্ধ উপীনকে জঘন্য গাল দিয়ে চেঁচিয়েছিল গাঙ্গোর। কোথাকার হারামি বেজন্মা বদমাশ তুমি? এক হাতে ঘড়ি দেবে, আবার থানায় গিয়ে লিখাবে ঘড়ি চুরা লি? দূর হ, দূর হ বুডঢা!

গাঙ্গোরের মরদ এসে চড়চাপড় মেরে নিয়ে চলে যায় ওকে।

সেদিনই উপীন চুল্লুর ঠেকে গিয়ে বসে। না, ওই ম্যামাল প্রজেকশান ভুলতে পারছে না ও। ওর মগজে লাতুর হয়ে গেছে। উজান! দেয়ার লাইজ্ অল দি মিস্ট্রি। কী করে এমন হয়?

উপীনকে নিয়ে আসবে বলে উজান কিছু দূরে একটা জমাট সিমেন্টের বস্তার ওপর বসেছিল।

গাঙ্গোরের ওপর ওর ভীষণ রাগ তখন।

আর গাঙ্গোর ওর কাছেই এসেছিল।

বাবু! বাবু! ও লোকটা মরদ নয় আমার! আমাদের ঠেকেদার, কাজ করাতে এনেছে। আমার মরদ...ঘরে থাকে না বাবু...চোর বলে পুলিশ বহোৎ মারে...দেশঘর খুব খারাপ জায়গা বাবু...

উজান বলেছিল, বেরিয়ে যাও! চলে যাও!

গাঙ্গোর কাঁদছিল বিনবিন করে, মুখে আঁচল গুঁজে...কামরাবাবুকে বলো না, নিয়ে যাবে আমাকে? কাপড়লতা...খাইদাই দিও...মা আর ছেলের শোবার জায়গা...কা করে বাবু...ন খেতি, ন জমিন্, বহোৎ হি মুশকিল জিনা...বাসনবর্তন...চুলাচাক্কি....কামরা সাফা...কাপড়া সাফা...সব করে দেব বাবু...

—আঃ! স্বামী তো আছে তোমার!

—ঘরে আসতে পারে না বাবু...রাতে লুকিয়ে আসে...আমি টাকা দিই...ঠেকেদাররা ভালো নয় বাবু...

—চলে যাও। নইলে পুলিশ ডাকব।

উজান হনহনিয়ে চলে আসে। উপীনকে টেনে নিয়ে যেতে খুব ঝামেলা। উপীন গাঙ্গোর! গাঙ্গোর! বলছিল। পরদিন উজানরা চলে আসে।

উপীন গুম হয়ে গিয়েছিল। রাখতে পারবে না...রাখতে পারবে না উজান...ও রকম বডিলাইন রাখতে পারবে না...কিচ্ছু থাকবে না,—জানো কি, যে ইলোরার মেয়েদেব স্তন ক্ষয়ে যাচ্ছে? গাঙ্গোর ইজ ফ্যান্টাস্টিক!

—উজান!

—ইয়েস শীতল, বলুন!

—উপীন কি...

উজান কলকাতায় ফিরে এল। বলল, না। উপীনদা বারবার বলে, কাণ্ট্রি লিকার ও-কে! কান্ট্রি উইমেন রিপেল মি!

শীতল ঈষৎ হাসল।

—এ মেয়েটার বিষয়ে আর কিছু জান না?

—না। জানতে চাইও না।

—যাক গে, দিল্লি যাবার আগে কী হল?

জানে না, উজান জানে না। উপীন যে অরুণাচল না গিয়ে কলকাতায় এসেছে, তাও জানে না।

—অরুণাচল যায়নি। কলকাতায় এল, তাও জানি না। ঝারোয়া গেল, তাও জানি না। আমার কাছে হঠাৎ হাজির হুড়তে পুড়তে,—

—হোআট?

—টিপিকাল বেংগলি এক্সপ্রেশান।

—ডোন্ট বি সো টিপিকাল। আমি বাংলা অত বুঝি না। উপীনের জন্যে যা শিখেছিলাম! অফ কোর্স, আমাদের ক্লাবে অনেক মাউন্টেনিয়ার বেংগলি। উপীন তো বাংলা একেবারে...

—পাঞ্জাবি তো নামেই। কলকাতাতেই তিন পুরুষ।

—উপীন আঠারো বছর বয়সে কলকাতা ছেড়েছিল।

—সে কথা বলত।

—তারপর?

—ভীষণ যেন কিছু হয়েছে, এমনি মনে হল। বলল, খুব দৌড়ে বেড়িয়েছি কদিন...

উপীন বলেছিল, হেল! হেঁটেছি, ট্রাকে চেপেছি, থানার জিপে ঘুরেছি,—গাঙ্গোররা নেই। কেউ কিছু বলেও না কোথায় গেছে। বাংলোর চৌকিদার বলল, ওকে ঝারোযা আসতেই হবে...খুব খারাপ কাজ করে গেছে গাঙ্গোর...কোনো খোঁজ পেলাম না। একটা কন্স্পিরেসি অফ সায়লেনস্!

উজান বলেচিল, পেলে কী করতে উপীনদা?

—নিযে আসতাম।

—কোথায়?

—যে কোনো জায়গায়।

—কী জন্যে?

—বুঝবে না উজান.. ওকে বাঁচাতাম।

—একটা ম্যারেড মেয়েছেলে...

—আমি কি ওকে. .না উজান, না। যাক গে, আমি ঘুমোব।

—তোমাব ব্যাগট্যাগ?

—আমি ঘুমোব।

—আপনি তো জানেন শীতল। ঘুমোল তিন চার দিন,—তারপরই বলল, দিল্লি যাব। অ্যানড .

—এখন কী করবে?

—কেন, ঝারোয়া যাব? আপনি যাবেন না?

—না। আমি ওর জন্যে অপেক্ষা কবব।

—কোথায়?

—কদমকুরিতে!

—তাহলে আমি চলি। আজই যাব।

—ইয়েস।

—আপনার যাওয়া কি উচিত ছিল না? আপনি তো স্ত্রী...

—না। আমাদের তেমন সম্পর্কই নয়। উপীন হারিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। ও এবং ক্যামেরা,—আমি এবং হিমালয়,—কোনো সুদূর ভবিষ্যতে হয়তো...

—কদমকুরিতে থাকবেন?

—হয়তো।

—যদি এক-সঙ্গেও থাকতেন। এমন একটা মানুষ....একা থেকে থেকে খ্যাপাটে হয়ে গেল।

—খ্যাপামি দেখলে কোথায়?

—সেভ দি ব্রেস্ট একটা খ্যাপামি নয়?

—উপীন নিশ্চয় তা ভাবে না। আচ্ছা উজান! এই টাকাটা রাখো। ওকে পেলে সিধা ফোন করবে আমাকে।

—টাকা লাগবে না।

শীতল ছবিগুলো অভিনিবেশে দেখল। বুক, ব্রেস্ট। বুক কী? ফ্যাট, টিসু, হেনতেন ঝুটঝামেলা।

উপীন এত উদ্বিগ্ন হল কেন?

উজান বেরিয়ে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে শীতল নিজের লিকুডি সিলিকন ইঞ্জেকটেড বক্ষে হাত রাখল। শীতলের চোলির পিছনে সিলিকন বক্ষ। উপীন বলেছিল, এ স—ব, কৃত্রিম, শীতল?

উপীন কী জানবে এর রহস্য,—এ স্তন চিরকাল উদ্ধত থাকে। উপীন বলত, প্লাস্টিকের ফুল যেমন, শীতল?

'বলেছিল,'—'বলত',—না না, উপীন 'ছিল' হয়ে যায়নি নিশ্চয়। শীতল ঘন ঘন নিশ্বাস টানল। শান্ত হও, শান্ত হও মন। উপীনের সব ছবি তোলা হয়ে যাক, শীতলের হিমালয় আরোহণ ফুরাক, কোনোদিন কদমকুরিতে স্থির হয়ে বসা যাবে।

সুজান কবীর ঘরে ঢুকল। ছবিগুলো ছেটানোই আছে। দেখে বলল, চোলি কা পিছে ক্যা হ্যায় নিয়ে উপীন ব্যস্ত কেন?

শীতল নিরুত্তর। উজান টাকা নিল না।

তিন

গাঙ্গোর এবং তার স্বাভাবিক, অতীব জটিল স্বেদগ্রন্থি বা পয়োধব উপীনকে কেন পাগল করছিল তা সে জানে না।

স্তন একটি জটিল স্বেদগ্রন্থি বলা চলে। চর্বি তাতে অনেক। গ্রন্থিসংস্থানটি খুব মনোগ্রাহী। সতেরোটি দুগ্ধদায়িনী ইউনিট থাকে। গ্রন্থিগুলির গন্তব্য স্তনবৃন্ত। শিশু জন্মালে দেহের রক্ত দুধে পরিণত হয়।

উপীন এ সব জানত। লিকুইড-সিলিকনধন্য বক্ষ নয়, স্বাভাবিক, তাই অনন্য। মনে হচ্ছিল গাঙ্গোর ও তার বুক বিপন্ন।

দিল্লি যাবার আগে ওর অরুণাচল যাবার কথা, মাঝপথে ওর ধারণা জন্মায় ডেস্টিনেশান ঝারোয়া। কলকাতায় নেমে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে ট্রেনে গোমো,—অতঃপর বাস,—ইত্যাদি পথে সেওপুরা। আবার ট্রেনে মাধপুরা হলটে নেমে ঝারোয়া।

কিন্তু ঝারোয়াতে মধ্যাহ্ন রোদেও সবাই নিঃশব্দ থাকছিল, রাত নেমেছিল যেন। ঝারোয়াতে রাত নিঃশব্দ থাকে, দিন শব্দতরঙ্গিত। এবার দিনও নিঃশব্দ। গাঙ্গোরদের ঝোপড়ি ঝোগগি, টালিব গোদামঘরের আশেপাশে তাদের কাপড় মেলা নেই পুটুস ঝোপে,—কুয়োতলায় নেই গোলমাল।

—কোথায়, কোথায়, কোথায়?

চৌকিদার বলল, চা এনে দেব দোকান থেকে?

—গাঙ্গোররা কোথায়?

—স্নান করবেন?

—ওরা কোথায়?

ঠেকেদার বাজারে ঘুরছে, উদাস। সে জানে না, দোকানি বাজারি কেউ জানে না।

হেসেগোড়া, লামডি, গ্রামে গ্রামে গিয়েছিল উপীন। লামডিতে বিকালেই চুল্লুচুরচুর গাঙ্গোরের স্বামী 'গাঙ্গোর' শুনে মাটিতে থুথু ফেলে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল।

হতাশ, হতাশ উপীন শুনেছিল এক শিশুর কান্না। একটি বছর বারোর প্যাকাটে রোগা কালো মেয়ে একটি বছরখানেকের ছেলেকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটা কাঁদছিল।

হঠাৎ উপীনের মস্তিষ্কে সংবাহন চালু হয়ে যায়। উপীন বুঝতে পারে, এ গাঙ্গোরের ছেলেই হবে। আর ভয়ংকর কোনো ষড়যন্ত্র ঘটে গেছে কোথাও তাই মানুষগুলি পাথরের মতো নিশ্চুপ।

চৌকিদাব বলেছিল, ওকে ঝারোয়া আসতেই হবে। খুব খারাপ কাজ করে গেছে গাঙ্গোর।

ঝারোয়াতে পুলিশ ঘুরছিল।

উপীন চলে আসে। ভীষণ কিছু ঘটে গেছে কোথাও। নেশান তা জানে না। উপীনের মাথার ভিতর ভূমিকম্প হচ্ছিল, ফেটে যাচ্ছিল মাটি, গরম বালি উগরে দিয়ে ফাটল জুড়ে যাচ্ছিল, ফেটে যাচ্ছিল, উজান! ট্রেনে ঝকরঝকর চলতে চলতে উপীন বুঝতে পারছিল, আবার ওকে ঝারোয়া আসতে হবে।

চার

উপীন যখন পৌঁছায়, তখন ঝারোয়া তার মৌনব্রত ভেঙেছে। উপীনের মনে হয় এই সে প্রথম আসছে। সেই দোকানঘরগুলো, সেই বাসের ধুলো খাওয়া অকথ্য গজা ও কাঠি ভাজার দোকান। হাটবারে বকরি গরু বেচাকানাও হচ্ছে। ঝোপরি ও ঝোগগিগুলি দেখা যায় না আর। কিন্তু উপীনের মনের ভিতরের মন ঠিক টের পায়, গাঙ্গোর আছে, এখানেই আছে। চৌকিদার ওকে দেখে এবার কপাল কুঁচকে তাকায়। কোথাও 'চোলি কা পিছে' বাজে।

—সেবার ব্যাগ ছেড়ে চলে গেলেন?

ব্যাগটা রেখেছ?

—আমার ঘরে। গাঙ্গোরের খোঁজ করতে করতে গেলেন কোথায়?

—সে কোথায়?

—সে. .

চৌকিদার বলতে থাকে, আপনি ছবি তুলে তুলে ওর মাথা বিগড়ে দিলেন বাবু...নইলে ওর অত সাহস হয়?

—কী করেছে গাঙ্গোর? মরে গেছে?

—গাঙ্গোররা মরতে আসে না বাবু, মারতে আসে. বেশরম গাঁওলি মেয়ে...যখন তখন গা নাচাবে. .বাজারিয়া লোককে বলবে, তোদের ফটো খিঁচেনি, আমার ফটো খিঁচত। দেখ!

—তারপর?

—সব ধরমনাশ করে দিল গাঙ্গোর।

—কি করল?

—পুলিশের নামে নালিশ করল। তখন এলেন, তখন তো ও সেওপুরাতে ছিল।

—কেন?

—কেন নয় বাবু?

সেওপুরাতেই ফাটক, বড় থানা, আদালত। মহকুমা টাউন নয় সেওপুরা? সেখানেই তো যেতে হচ্ছে ওকে এখন।

—এখন সে সেওপুরাতে?

—আর কি। হপ্তায় হপ্তায় যাও—এসো,—যাও—এসো,—পুলিশ তো এত পিছে লেগে গেছে যে টেকেদারের লেবার আসাও ঘুচে গেল। বাবুজি! শিউজির দুনিয়াতে ঔরতকে বুঝেসমঝে চলতে হয়। যে বোঝে না, সে শাস্তি পায়। একটা মেয়ের জন্যে পুলিশ এখানে এতবার এল..এতবার এল...ঔরত যখন বোঝে না যে পুলিশও মরদ, আর তাকে খেপালে সে খেপে যাবে।

—কেন, কেন, কেন খেপে যাবে?

—পুলিশের নামে নোংরা কলঙ্ক লাগাবে, তাকে ছেড়ে দেবে পুলিশ? কখনো দিয়েছে? পালাতে পারতিস টেরেনে চেপে...নালিশ করতে গেলি...হাজিবা তোকে দিতেই হবে, আর পুলিশ তোকে...

—গাঙ্গোর কোথায়? তার বাচ্চা-বা কোথায়?

—বউ তুই একজনের!

—সে কোথায়, গাঁয়ে?

—গাঁয়ে তাকে ঢুকতে দেবে কেউ? সেখানে ঠাঁই নেইষ ঝারোয়াতে কথা বলে না কেউ,—সেওপুরা থেকে আসে—আর যা করবার কথা, তাই করছে।

—কোথায় সে?

—সাঁঝ লেগে গেলে বাজারে দেখবেন। চুল্লু খেয়ে খেয়ে...

—গাঙ্গোর চুল্লু খাচ্ছে?

—আর কী করবে!

—আমি ওকে নিয়ে যাব।

—ছি ছি বাবু। আপনি নামী-দামি লোক! কে জানত ঝারোয়াকে? আপনি বারবার ছবি উঠালেন। অখবরে দিলেন,—আপনি ওকে নিয়ে যাবেন?

—ওকে বাঁচাতেই হবে।

উপীনের মাথা কাজ করছিল না, চৌকিদার কী বলছে তা বুঝতে পারছিল না।

—কিন্তু পুলিশ....

—কী করবে সেওপুরার পুলিশ? বিহারে পুলিশের সঙ্গে আমি অনেক টকরা নিয়েছি। ছবি তুলে অখবরে দেব।

—নিন, ব্যাগ দেখে নিন। পুলিশ দেখলে ব্যাগ মেরে দিত। আস্নান করুন। হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি। বিকাল সন্ধ্যার আগে তো সে আসবে না।

স্নান করে না উপীন, ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ে। বিকেল সন্ধ্যা অবধি ঘুমোয়। উজান থাকলে জোর করে খাওয়াত। বলত, নার্ভাস এনারজিতে চলছ কতদিন,—কোলাপ্‌স করে যাবে।

উপীন অনেকদিন ধরেই কোলাপস করে যাচ্ছে উপীন। উপীন ফেলিওর। ঝারোয়ার এত ছবি উঠাল এত বারে, লাভ হল কী? জলে বিষ খেয়ে কতজন মরল, শস্যহানিতে মাইগ্রেট করে চলে গেল,—সেবার তো উপীন বনাম রাজ্যসরকার,—না, একে দুর্ভিক্ষাবস্থা বলা যায় না। সব কিছুর পরেও দেখো হাটে শীর্ণ গরু ছাগল, ধুলো ও মবিলগন্ধি খাবার,—ভেরি বিজি ভিডিও প্যালেস, ভেরি লাউড চোলি কা পিছে, এ সময়ের জাতীয় সংগীত—পিছনে কী আছে তা গাঙ্গোর জানে। কিছু তো পরিবর্তন এল না। কিছু গোদামঘর বেড়েছে। একটা পুলিশচৌকি বসেছে, তারা মেয়েদের হ্যাটা দেয়। অশ্লীল হাসে, দোকান থেকে মিনিমাগনা খাবার খায়। সাধে কি কোলাপ্‌স করে যাচ্ছে উপীন? এখন শীতলের বীজাণুমুক্ত ঝকঝকে আবাসে ঢুকলে উপীনের দমবন্ধ হয়ে আসে। না, জীবনটা ঢেলে সাজাতে হবে।

উপীনের ঘুম ভেঙেছিল সন্ধ্যার মুখে। কোথাও একটা বিপন্নতা বোধ, বেশ কিছুকাল একটা অবসেশান তাকে লাট্টুলাটিম করে ঘোরাচ্ছে। সহসা মনে হয় এমন জায়গায় সে একা—সর্বত্রই সে একা। এত একা থাকা, এত জীবনের স্বাভাবিক দাবি অস্বীকার করে চলা ঠিক হয়নি। গাঙ্গোরের উন্নত বক্ষ তো স্বাভাবিক, তৈরি করা নয়। কেন সেটা প্রথমে ছবিতোলার বিষয় মনে হল? কেন মনে হল সে বক্ষ বিপন্ন।—কী পাগলামো করছ বাবু, চলে যাও, তোমার ঘর নেই? চৌকিদারের ঘর আছে, বউ-বাচ্চাকাচ্চা আছে। উপীনের জন্য অপেক্ষমাণ কোনো গৃহকোণ সেই, বন্দোবস্তির বিবাহ,—যেমন বিয়ে হরদম দেখা যায়। কিন্তু এখন তো গাঙ্গোরকে বাঁচাতে হয়। বিপন্নতা বোধ ওকে নিয়ে যায় চুল্লুর ঠেকে যেখানে ন্যাড়িভুঁড়ির ঝালচচ্চড়ির গন্ধ, চুল্লুর উগ্র গন্ধ, পায়োরিয়া আক্রান্ত মাড়ির গন্ধ, নালার থকথকে বুড়বুড়ি কাটা নোংরার গন্ধ, নালার ওপাশে পায়খানার গন্ধ। উপীন নাককান বুজে বসে যায়। সহসা চোলি কা পিছে গান বাজতে থাকে।

আর সেখানেই গাঙ্গোর আসে। এখন কাপড় লালে হলুদে নাইলন, যাতে ময়লার চিমসে গন্ধ, আর এখনো, ভয়ে ভয়ে চোখ তোলে উপীন,—অতীব প্রগাঢ় চোলি, অতি উদ্ধত বক্ষ, মাথায় তেল ও বেণী, চোখ সততসন্ধানী।

উপীন ও গাঙ্গোর এ-ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। গাঙ্গোরের ঠোঁটে ফুটে ওঠে ধারালো অভিজ্ঞ হাসি। কোনো পুরুষের হাত সে ঠেলে দেয়। বলে, কামরাবাবু বহোৎ দিন আমার জন্যে ঘুরছে আব ঘুরছে ঠেকেদার! আজ, বাবু আমার গাহক, কি বাবু?

উপীন নিজেকে সমর্পণ করে, ছেড়ে দেয়।

—ঠেকেদার গাঙ্গোর?

—কা করে বাবু? ও তো ঠেকেদারি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু ভূষণ! তোকে তো হম পোমোট কর দি? এ বেওসায় সবই নাফা।

সবাই হাসে, সবাই। একজন বলে, গাঙ্গোর তোহরা চোলি কা পিছে কা হ্যায় রে।

—চলিও বাবু।

গাঙ্গোর উঠে পড়ে। উপীনকে আঙুলের ইশারায় যেন বলে, মামনুসর!

তারপর ভাঙাচোরা রাস্তা, পুটুস ঝোপ, রেললাইন বিছিয়ে পড়ে থাকে, একটা বাস সাইডে রাখা ভাঙাচোরা,—সবাই বিক্রি হয় এখন চলক্ষণ বাস, বা ভাঙাচোরা 'মহাবীর'। তারপর জীর্ণ গোদামঘর, সারসার, গাঙ্গোর দ্রুত চলে। একটি ঘরের টিনের দরজায় লাথ মারে।

ঘরে আর কী আছে, দেখতে পায় না উপীন। গাঙ্গোর লণ্ঠন উসকে দেয় ও নিজস্ব রানিং কমেণ্টারি নিজেকে বলে যায়।

সেওপুরাতে চলে গেলে এর চেয়ে টাকা বেশি। কিন্তু থানা তো গাঙ্গোরকে ঢুকতে দেবে না। ওকে ঝারোয়া থাকতে হবে ও সেওপুরা যেতে হবে,—কেসের ডেট পড়বে, পুলিশ ডেট নেবে। এত টাকাও জমছে না যে কোথাও পালায় গাঙ্গোর। পালাবে-বা কোথায়,—সবাই তো জেনে গেছে গাঙ্গোর ওদের চিনেছিল, ঔর থানায় সে কথা বলেওছিল, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছিল, তাতেই সব তছনছ হয়ে গেল।

—গাঙ্গোর!

—অনে‍শ, ...ক দিন তুমি আমার ছাতির ফটো খিঁচো বাবু। কিন্তু আমি তো জানতাম তোমার মতলব। নইলে অত অত টাকা দিতে?

—গাঙ্গোর!

—কাপড় খুলবে, না শুধু ওঠাবে গাঙ্গোর? কাম সারো, বিশ টাকা। রাত কাটাও, পঞ্চাশ টাকা, ঝটপট বলে ফেল।

—তুমি রেন্ডি কাজ করছ গাঙ্গোর?

—তোমার তাকে কী, রেন্ডির বাচ্চা?

—তুমি...জামাটা...খোলো...

গাঙ্গোর নিশ্বাস ফেলে ঘনঘন। ক্রোধে খনখনে গলায় বলে, শুনতে পাচ্ছ? সব সময়ে বাজাচ্ছে, গাইছে, পিছনে লেলিয়ে দিচ্ছে ছেলেদের.. .চোলি কা পিছে...চোলি কা

—না গাঙ্গোর....

—তুমিও বহোৎ হারামি বাবু...আমার ছাতির ফটোক উঠাতে, না? বেশ....দেখাচ্ছি...কিন্তু পকেটে যা আছে সব নেব, স—ব...

লণ্ঠনের শিল্যুয়েটে গোদামের দেয়ালে দুটি ছায়ার ভায়োলেণ্ট আচরণ। গাঙ্গোর চোলি খুলে ফেলে সেটা উপীনকে ছুঁড়ে মারে। দেখ, দেখ, দেখ, খড়—ভূষি নেকড়া,—দেখ কী আছে।

স্তন নেই। দুটি শুকনো ঘা, কুঁচকানো চামড়া, একেবারে সমতল। আগ্নেয়গিরির ক্রুদ্ধ ক্রেটার দুটি গাঙ্গোরের গলায় উপীনকে গলন্ত লাভা ছুঁড়তে থাকে,—গ্যাংরেপ...কামড়ে ছিঁড়ে গ্যাংরেপ... পুলিশ...আদালতে কেস...আবার লকাপে গ্যাংরেপ...এখন ঝারোয়া থেকে সেওপুরা...সেওপুরা থেকে ঝারোয়া....ঠেকেদার গাহক ধরে...পাবলিক সাতায়...গানা বাজায় গানা...

উপীন টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়।

গাঙ্গোর ক্ষিপ্র হাতে ওর পকেটে হাত ঢোকায়, প্যাণ্টের পকেট হাতড়ায়, কী হিংস্র ক্ষোভের গন্ধ ওর গায়ে...তারপর লাথ মারে মাটিতে।

উপীন বেরিয়ে আসে, তখনো গাঙ্গোর চেঁচাচ্ছে, কথা বলছে, দমাদম লাথ মারছে কারোগেটেড টিনের দেয়ালে। উপীন ছুটতে থাকে। চোলির পিছনে কোনো নন ইস্যু নয়, পিছনে গ্যাংরেপ থাকে,—কোনো নন্ ইস্যু নয়, গণধর্ষণ থাকে, উপীন জানতে চাইলে জানতে পারত, জানতে পারত।

উপীন রেললাইন ধরে দৌড়য়।

পাঁচ

উজান তার অনেক পরে পৌঁছেছিল। তখন ঝারোয়া শান্ত। গোদামঘরগুলির জায়গায় নয়া বাসডিপো। ঝারোয়াতে নতুন থানা। একটি মৃতদেহের ফোটো পেয়েছিল, যা কয়েক মাসের পুরোনো।

গাঙ্গোর নামে ঝাবোয়াতে কেউ থাকে না।

নিরুদ্দিষ্ট উপীনপুরীর সন্ধান জারি আছে কাগজেকলমে। এ সব ফাইল বড় তলিয়ে যায় অন্যান্য ফাইলের নীচে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মাসি

এক শুখার দিনের পড়ন্তবেলায় দোহানিয়ার উষর মাঠ পেরিয়ে দুটিতে এল। দুটিতেই খুব ক্লান্ত। রোদে আর লু হাওয়ায় ক্রোশের পর ক্রোশ নাক বরাবর সিধে হেঁটে এসে হাইওয়ের পিচে আস্তে পা ঠুকে ওরা ধুলো ঝাড়ল। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে টিউবেল খুঁজে পুরুষটি ডাকল, আ যা রি!

পুরুষটির চেহারায় রুক্ষতা, সম্ভবত প্রকৃতির মুহুর্মুহু আক্রমণ তাকে হিংস্র করে তুলেছে উত্তরোত্তর। কিন্তু মেয়েটি অদ্ভুত বিপরীত। যুবতীর লাবণ্য ঘন হয়ে তাকে ঘিরে প্রাকৃতিক উপদ্রবগুলি থেকে রক্ষা করেছে। তার কোমলতায় ক্লান্তির ছাপও যেন বা যৌবনের কারুকার্য। সে এক প্রাচীন টেরাকোটা। তার পুরুষকে সে টিউবেলের হাতল চেপে যখন জলদান করছে, তখন তাকে এইসব আধানাগরিক পার্শ্ববর্তী লোকজনের চোখে নর্তকী ভ্রম হয়। দমকে ভূ-গর্ভের ঠাণ্ডা জল দিয়ে সে তার পুরুষকে যেন প্রহার করতে করতে খিলখিল করে হাসে।

পুরুষের মেজাজ খারাপ। ভিজে শরীর থেকে ক্লান্তি গিয়েও যায় না বুঝি। ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলে, কুত্তিনকা মাফিক হাসিস না রি। শরম কর জেরাসে। এ তোর বাপের গাঁও না ছে। দোহানিয়া টোন।

টোন শুনে গাঁয়ের বধূ ত্রস্ত চাউনিতে একবার প্রেক্ষাপট জরিপ করে নেয়। তার কোমল মুখখানিতে এতক্ষণে ছায়া পড়ে। নিজের পুরুষের প্রতি যতটা নয়, পার্শ্ববর্তী কুতকুতে চাউনিগুলির প্রতি ক্ষোভে সে আলতো হাতে আঁচল টেনে বুক এবং চুলের কিয়দংশ ঢাকে। তারপর নিজেই নিজের পায়ে, হাতে ও মুখে পর্যায়ক্রমে জল ছেটায়। পুরুষটি গ্রাহ্য করে না। জ্বলজ্বলে চোখে হাইওয়ের দুধারে ছোট্ট বাজারটি দেখতে থাকে। এতক্ষণে অবিশ্বাস তাকে ঝাপটা মারে। বুঢ়া ছেদীলাল একেই টোন বলে ধোকা দিয়েছে! এখানে তার করার মতো কী কাম ঢুঁড়ে পাবে সে?

মেয়েটি আস্তে পা ফেলে শিরিষতলায় গিয়ে দাঁড়ায়। আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে তার পুরুষকে নিরীক্ষণ করে। এ মুহূর্তে ধরতিয়াবুড়ির ছেলেকে তার কেমন অসহায় লাগে। ধরতিয়া বেঁচে থাকতে এতোয়ারিকে টোনবাজি করতে দেয়নি। এখন এতোয়ারি স্বাধীন। যথেচ্ছ টোনবাজি করবে। ব্যাপারটা ভাল হবে না মন্দ হবে, ভেবে কুল পায় না এতিয়ারির বউ।

চায় পিবি রি? একবার ডেকেই এতোয়ারি সামনের চায়ের দোকানে যায়। তার বউ চা খাবে না, সে ধরেই নিয়েছে। খেতৌউরিতে চায়ের রেওয়াজ কম। মেয়েরা এখনও খেতে শেখেনি। শুধু মুনিমজীর বাড়ির মেয়েরা বাদে। তো তারা পড়হালিখা করতে যায় স্কুলে। তারা খেতেই পারে। খেতিকার ঘরের মেয়েদের অত বিলাস শোভা পায় না।

তবু এই টোনে এসে একবার চা খেতেই না হয় সে। অভিমানে একটু ক্ষুব্ধ হয় এতোয়ারির বউ।

এদিকটায় 'টৌন' শেষ হয়েছে এক বৃদ্ধ ভুজাওয়ালির দোকানে। ছিটেবেড়ার ঘর, ওপরে তেরপল। সামনে দিব্যি বাঁশের বাতা দিয়ে তৈরি একটুকরো বেঞ্চি। টিন, মাটির হাঁড়ি, ডালা ইত্যাদিতে সাজানো ছাতু, মুড়ি, নানারকম ভুজা। উনুনে কড়াই চাপানো। নাকমুখ সিঁটকে ভুজাওয়ালি ভুট্টার খৈ ভাজছে। গন্ধে জিভে জল আসে এতোয়ারির বউয়ের।

চোখে চোখ পড়লে বৃদ্ধা ভুরু-কুঁচকে তাকায়। কৌন গে? ভারুয়ার বহু?

এতোয়ারির বউ হেসে ফেলে। নাহিক রি মোসি!

তবে তুই কে আমাকে মাসি বলছিস? ভুজাওয়ালিও হাসে। তোকে তো কখনও দেখিনি দোহানিয়ায়, কোথায় থাকিস তুই?

এতোয়ারির বউ বাঁশের বেঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বসবে কি না ভাবতে ভাবতে বলে, আমরা এসেছি খেতৌরি থেকে।

খেতৌরি? বৃদ্ধার হাতের কুচির গোছা স্থির হয়ে যায় কয়েক মুহূর্ত। তোর মরদের বাড়ি? কৈ? কোথায় সে?

মরদকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চা খেতে দেখিয়ে খেতৌরির বহু বলে, ও মোসি, তুমি চেনো খতৌরি?

ভুজাওয়ালি একটু হাসে। তারপর ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলে, আমার বাপের গাঁও রি বহু! বিশ-পঁচিশ বছর আগে সেই শেষ হবার গেছি। আর কেউ নেই। তাই আর যাইনি। খোলার শেষ ভুট্টাব ঝাঁক কুচির গোছা দিয়ে নাড়তে নাড়তে বৃদ্ধা নরম স্বরে ফের বলে, বৈঠ্ না রি! শরম করছিস কেন? তুই আমার বাপের গাঁওয়ের বহু। তো হ্যাঁ রি বহু, তোর বাপের গাঁও কোথায়?

পিঁড়া—সেই খের্জুরিয়া ঘাটের কাছে।

তব্ তুঁ পিঁড়ার মেয়ে? বৃদ্ধা কপালে চটাস করে থাপ্পড় মারে বাঁহাতে। খোলার খৈগুলিকে দ্রুত নাড়াচাড়া করে খোলা নামিয়ে রাখে। তারপর কষ্ট করে ওঠে। নড়বড়িয়ে বেরিয়ে এসে এতোয়ারির বউয়ের পাশে বসে পড়ে। তাব পিঠে হাত রেখে ধরা গলায় বলে, হা ঠাকুরবাবা! কতকাল পরে পিঁড়ার নাম শুনলাম! পিঁড়ার লোক দেখলাম!

এতোয়ারির বউ অবাক হয়ে তাকায়। বৃদ্ধাব চোখের কোণে জল দেখে সে মমতায় বলে, তু রো গৈলি মোসি!

হাঁ। বৃদ্ধা আস্তে বলে। তব্ তু আমার আপনা আদমি। মা মরে তো মাসি জিয়ায়। তু আমাকে মোসি বলেছিস। আর শুন্ বহু, পিঁড়া ছিল আমার শশুরাল।

সাচ?

হাঁ। তেরি নাম ক্যা রি বেটিয়া?

দুলারি।

মেরা নাম সরস্বতীয়া। ভুজাওয়ালি শেষ বেলাব ঊষব প্রান্তরের দিকে চোখ মেলে দেয়। আস্তে বলতে থাকে তার স্মৃতিকথা। প্রথমে খেতৌড়ি তাবপর পিঁড়ার কথা। ঠাকুরবাবার ভরা ওঠা সাধুর কাহিনী, ঠাকুরবাবার দুই যমজ মেয়ে 'ভারি' ও 'ভুবিব' পৌরাণিক বৃত্তান্ত। সৃষ্টিকর্তা ঠাকুরবাবা গেছেন গঙ্গায় নাহান করতে। নাহান করে এক হাত ঝাড়লেন, জন্ম নিল ভাবি। অন্য হাত ঝাড়লেন, জন্ম নিল ভুরি। ঠাকুরবাবা বললেন, ভারি, তুই থাক মাটির ওপরে। আর ভুরি, তুই যা মাটির তলায়। ভারি হল আনাজপাতি—লাউ শিম বেগুন কুমড়ো আদি। আর ভুরি হল শকরকন্দ, মূলা, সরবতি, আলু আদি। পিঁড়া গঙ্গার কিনারে। ভারি-ভুরির করুণায় ঘরে ঘবে সুখ উপচে পড়ে। তো মানুষ বড় লোভী। ভারি-ভুরিকে বেচে আসতে লাগল টৌনবাজারে। ঠাকুরবাবার মনে দুঃখ বাজল। ভারিভুরিকে লুকিয়ে ফেললেন। তখন লোকেরা বেরিয়ে পড়ল ভারি-ভুরির খোঁজে গঙ্গার কিনারে কিনারে। যতদূর গঙ্গামা যায়, তা ভি যায়। ক্লান্ত হয়ে একদল বসে পড়ে। একদল যায়। তো দুলারি বেটিয়া, গঙ্গার-কিনাবা বরাবর তুই চলে যা এই মুর্শিদাবাদ জিলা ছাড়িয়ে। চলে যা সেই কাটোয়া। কাটোয়া ছাড়িয়ে কতদূর—গঙ্গার দুই কিনারে পিঁড়ওয়ালাদের বংশ-পিঁড়ি। কেত্তা বছর—হাজাব সাল কেটে গেল, বেটি। এ সেই পুরানি কহানি। তো তুই যদি পুছিস, তারা ভারিভুরিকে পেল ঢুঁড়ে---

ভুজাওয়ালি হাসে উজ্জ্বল মুখে। পেয়েছিল। গঙ্গার দুই কিনারে তুই দেখবি দুধের মতো মাটিতে দুই দেবীর কত দয়া। তো তুই বলবি, আমি কেন তাহলে এই রুখাশুখা দোহানিয়ায় হাড়মাস কালি করছি? আমার বরাত, বেটি! এমনি শুখার সালে আমার মরদ আমাকে নিয়ে কাম ঢুঁড়তে এল এখানে। আর আমাদের গঙ্গামায়ের কাছে ফেরা হল না। পিছলি সাল বুঢ়া মরে গেল। সে ভি গঙ্গা পেল না, আমিও ভি পাব না। গঙ্গা ইঁহসে বহত দূর। বিশ কোরোশ।

দুলারি আস্তে বলে, আমার মরদভি এখানে কাম ঢুঁড়তে এসেছে।

ডাক, ডাক। তোর মরদকে ডাক। দেখি। হ্যা ঠাকুরবাবা। কতকাল খেতৌরির মানুষ দেখি না।

মরদ ডাকার আগেই এসে যায়। ঠোঁটে সিগারেট। ঝটপট বলে, তব্ তু বৈঠকে র। আমি আসছি। আর ছাতু-ভুজা খেতে খাস তো এই ভুজাওয়ালি মোসির কাছে খেয়ে নে। আমি ফিরে এসে পয়সা দিচ্ছি।

সরস্বতীয়া হাঁ করে দেখছিল তার শশুরাল গাঁওয়ের যুবকটিকে। বাত করবার আগেই তুরন্ত সে লম্বা পা ফেলে চলে গেল। দুলারি গলার ভেতর কিছু উচ্চারণ করলে বৃদ্ধা হাসে। খেতৌরিবালা মরদলোক এইরকমই। তুই কি নানকু নামে কারুর কথা শুনেছিস?

দুলারি মাথা দোলায়। সরস্বতীয়া আঁচল নেড়ে হাওয়া টানে। অবেলায় হাওয়াটা থেমে গেছে। আবার গুমোট গরম। দিকসীমাহীন ধূসর আকাশ পাথর হয়ে আছে। দোহানিয়ার মাঠের শেষে দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। গাছগাছালির মাথায় পাখিদের চাপা কলরব। নয়ানজুলির শুকনো বুকে একপাল শুয়োর ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে।

নানকুর কাহিনী শোনাতে গিয়ে খদ্দের এসে গেছে। রোজকার খদ্দের এরা। রতুয়া মুচি, কৈলাস হাজাম, চানাওয়ালা রামভগত, ইটখোলার মজুর কয়েকজন। এদের কারুরই বহু নেই সঙ্গে। সারাটাদিন খাটুনির পর হাতপুড়িয়ে রান্নার আলস্য বড়। সরস্বতীয়ার ছাতু দিয়ে চালিয়ে নেয়। আর সরস্বতীয়া নিজেই যব ছোলা ভেজে নিজেই জাঁতায় পিষে উৎকৃষ্ট ছাতু তৈরি করে। এনামেলের সরা রাখে একগুচ্চের। এনামেলের ঘটি আর গেলাসও দেয় যত্ন করে।

বেঞ্চ থেকে দুলারি সঙ্কোচে উঠে দাঁড়ালে সরস্বতীয়া বলে, ইধার আ যা বেটিয়া। তু ভি কুছ খা লে।

দলটা চারপাশে ছড়িয়ে বসে ধূসর আলো-আঁধারিতে তারিয়ে তারিয়ে ছাতু মাখে এবং গপ গপ করে খায়। খেতে-খেতে অল্পস্বল্প রসিকতাও করে ভুজাওয়ালি মাসির সঙ্গে। আড়চোখে দুলারিকে তারা বারবার নিরীক্ষণ করে। দুলারি ৩ত আড়ষ্ট হয়ে গায়ে কাপড় জড়াতে থাকে। সরস্বতীয়া বলে, আমার বোনঝি। আশ্বস্ত দুলারি ছাতুর সুন্দর গন্ধে আবিষ্ট হতে থাকে। সরস্বতীয়া আবার ঘোষণা করে, পিঁঢ়া আমার শশুরাল। আর পিঁঢ়া-এর বাপের গাঁও। খেতৌরি আমার বাপের গাঁও, আর এই মেয়ের শশুরাল। তখন দুলারি মৃদুস্বরে বলে, মৌসি, হামরে থোড়া শ ছাতু দে। খাই।

দলটা ছাতু শেষ করে টিউবেলের দিকে চলে যায়। তখনও মৌসির ছাতু দেবার নাম নেই। দুলারি একটু ইতস্তত করে। শেষে মুখ ফুটে ফের বলে, মৌসি!

সরস্বতীয়া হেরিকেন জ্বালতে বসেছে। মিষ্টি হেসে বলে, অবেলায় ছাতু খেয়ে কী করবি বেটি? একটু সবুর কর। একমুঠো ভাতই খাবি আমার সঙ্গে। তুই কি আমার পর? এখনই ভাতের জল চাপাচ্ছি।

দুলারির ইচ্ছে ছিল যবের ছাতু খাবে। যবের ছাতু দুর্লভ তার জীবনে। পয়সা তো তার মরদ এসে দেবে বলে গেল। বুড়ি তাকে ভাত দেখাচ্ছে। ভাতও দুর্লভ খাদ্য তার কাছে। সপ্তায় কবেলাই বা সে ভাত খেতে পায়! কিন্তু সেই নিশিভোব পোহাতে দু মুঠো ভুজা চিবিয়েছে, তারপর পথের মাঝে এক মন্দিরতলায় সঙ্গে আনা মাসকলাইয়ের আটার একটা রুটি পেঁয়াজ-নুন-লঙ্কাবাটা দিয়ে খেয়েছে। এখন পেটে খিদের কামড়ানি।

মরদের প্রতিশ্রুতির কথা তুলবার আগেই সরস্বতীয়া সস্নেহে বলে, চায় পিব আমরা। চায় পিতে-পিতে গপসপ করব। হাঁ ঠাকুরবাবা. তুই আমার আপনজন! বলে সে চড়া গলায় হাঁক ছাড়ে, এ বেটা মধু! মধুয়া রে! দো গেলাস চা ভেজে দে জলদি।

টাটের মাথায় হেরিকেন ঝোলে। হাইওয়েতে মোটরগাড়ির জোরালো আলোর হলকায় বারবার ঝলসে ওঠে দুই মেয়েমানুষ, শিরিষ গাছের গুঁড়ি, ছোট্ট দোকান। মাটি কেঁপে ওঠে। পাশে বসে বৃদ্ধা তার জীবনের ঝাঁপি খোলে। দুলারি ফু দিয়ে চা খায়। এখন চা জিনিসটা তার মন্দ লাগে না। মাসির কথা তার কানে ঢোকে না। মন গরম চায়ে।

কিন্তু এতোয়ারির পাত্তা নেই।

খেতৌরির পিপ্পল গাছের ডাকিনীবৃত্তান্ত শেষ হতে হতে ভাত নেমে যায়। তবু এতোয়ারি আসে না। ছোট্ট বাজারের জুগজুগে আলো ধীরে অন্ধকারে মুছে যেতে থাকে। দুধারের মুক্ত প্রান্তর ক্রমশ হাওয়ার জাগরণে স্পন্দিত, আর গাছগাছালির মাথায় চাপা আলোড়ন। হেরিকেনের ছটায় বেঞ্চের ওপরে বসে দুই মেয়েমানুষ ভাত খায় এনামেলের থালায়। মাঝেমাঝে মুখ তুলে মরদকে অন্ধকার রাস্তায় প্রত্যাশা করে দুলারি। বৃদ্ধা বলে খা। খেয়ে ফেল্। মরদলোকের জন্য শোচিস না। ওরা ওইরকমই। দেখবি পেটপুরে খেয়ে তারপর শাহজির আস্তানায় মদ-উদ গিলে টলতে টলতে এসে চোখ রাঙাচ্ছে। তুই খেয়ে শুত কর আরামসে।

ঝাঁপ ফেলে ছাঁচতলায় খোলা আকাশের নিচে মাদুর বিছায় সরস্বতীয়া। বারবার বলে, শোচিস না। শুত কর।

মন মানে না দুলারির। অমন করে কোথায় গেল তার মরদ? কাম ঢুড়তে গিয়ে আর সে ফিরে আসছে না কেন? তবে কি তাকে এমনি করে ফেলেই পালিয়ে গেল ধরতিয়াবুড়ির বেটা? হা ঠাকুরবাবা!

সরস্বতীয়া চমকে ওঠে। কা রি? রোতি কাহে? কাঁদছিস কেন? ছি ছি! তুই কি ছোটি লড়কি যে কাঁদছিস? মরদলোকেরা এমনি হয় জানিস নে? শুত কর বেটিয়া! পোঁহাতে দেখবি তোর মরদ গায়ে ধুলো নিয়ে শাহজির ডেরা থেকে এসে যাবে। কিন্তু খবর্দার, মরদকে ছুঁবি নে। ওর গায়ে কুত্তার দুর্গন্ধ লেগে থাকবে।

বৃদ্ধার হাসিতামাশা তাকে আর আশ্বস্ত করতে পারে না। দুলারি খুঁ খুঁ করে কাঁদে।...

পোঁহাতকাল এল। সূর্য উঠল দোহানিয়ার খরাক্লিষ্ট পুবের মাঠে। ধুলিয়ান থেকে প্রথম বাস এসে গেল। দোহানিয়ার বাস ছেড়ে গেল মোতিহারির দিকে। প্রদেশ-সীমান্তের এই জনপদ এখন দুই প্রদেশের মানুষের ভিড়ে এক হাট। বাঁশের বেঞ্চে বসে দুলারি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে আবার। কাল শেষ বেলায় দোহানিয়াকে সে ঠিক চিনে উঠতে পারেনি। এখন খুব ভয় পেয়ে গেছে দেখে। এত মানুষজন, এত হট্টগোল। চারিদিকে খালি অচেনা মুখ।

থানার সেপাই তেওয়ারিজী এল খৈনি টিপতে টিপতে, বগলে লাঠি। হেই মাসি। বলে হাঁক মেরে সে বেঞ্চি মচমচিয়ে দুলারির পাশেই বসে পড়ে। দুলারি ত্রস্তে উঠে যায়। তেওয়ারিজী খৈনিতে থাপ্পড় মেরে গালে ঢুকিয়ে বলে, মাসি, তোর খেতৌরির বোনপো কেউ আছে এতোয়ারি নামে? সে শালা এক চোট্টা!

বৃদ্ধা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

তেওয়ারিজী হাসে। শালেলোক চোট্টা আছে রি! পরমাদজীর আড়তে কাম ঢুঁড়তে গিয়েছিল। রাতে আড়তে শুতে দিয়েছিল তাকে। খন্দের বস্তা নিয়ে ভেগে যাবার সময় পাকড়েছে। তো ভুজাওয়ালি মাসির কথা বলল। যা রি, বোনপোর জামিন লিয়ে আয়। আমি জামিন করিয়ে দেব বড়বাবুকে বলে। তু আমার ভি মাসি।

সরস্বতীয়া চিলচিৎকার করে ওঠে।. হারামী চোট্টার-বাপের মাসি আছি। বলে সে রাক্ষুসী চেহারায় দুলারির দিকে ঘোরে।...এই হারামীর বহু। পাকাড়কে লে যাও ইসিকো ভি। হা ঠাকুরবাবা! সে ব্যস্ত হয়ে তার টাটে ঢোকে। দ্রুত জিনিসপত্র দেখে নেয়, কিছু চুরি গেছে কি না। ফের ক্রুদ্ধস্বরে বলে, হা ঠাকুরবাবা! খেতৌরিবালার এইসা হি হালত হয়ে গেছে তাহলে! হা রি পিঁড়ার বেটি, খেতৌরির বহু! তাহলে তোরা এইরকম হয়েছিস?

দুলারি বৃদ্ধার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথা কুটে বোঝাতে চায়, তার মরদ তেজী বটে, তবে চোর

নয়। সে ঠাকুরবাবার নামে, তাঁর দুই কন্যা ভারি-ভুরির নামে কিরে করে বলে, মাসি, তোমার বোনপো চোর নয়। হুয়া থা কুছ গড়বড়। ও মাসি, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে এস। এই আমার হাঁসুলি দিলাম। এই দিচ্ছি আমার বাজু। কানের বালি। পায়ের মল রূপোর গয়নাগুলো দু'হাতে তুলে ধরে সে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তার পাতলা ঠোঁট থরথর করে কাঁপে, ভেজে।

বৃদ্ধা বিস্ফারিত চোখে তার গয়নার দিকে আর তার মুখের দিকে তাকায়। তেওয়ারিজী হঠাৎ উঠে কৈলাস হাজামের দিকে এগিয়ে যায়। বৃদ্ধা ভাঙা গলায় ডাকে, তেওয়ারি বেটা!

কনস্টিবল বলে, তু রেডি হো যা মোসি। আমি হাজামত করে লিই।

বৃদ্ধা আস্তে বলে, তু খেতৌরির বহু পিঁঢ়ার বেটি। তো টাট পাহারা দে। খন্দের এলে বলবি, মৌসি ফিরে আসুক। আর বেটি, তুই ঠিকই বলেছিস। গহনা গেলে গহনা হবে। মরদ গেলে মরদ হবে না।

সে গহনাগুলো আঁচলে বেঁধে নিয়ে কৈলাস হাজামের দিকে থপথপ করে হাঁটতে থাকে। দুলারি শ্বাস ফেলে টাটে গিয়ে বসে। তার মুখে দোহানিয়ার শুখা মাঠের রঙ ঝলমল করে।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

কয়েকটি কমলালেবু

ওই খান সাহেবের গলি থেকে বেড়িয়ে সেণ্ট্রাল জেলের প্রাচীর ঘেঁষে রমনার দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটায় যখন এসে পড়ল মুর্তাজা হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসরির দেয়ালঘড়িটায় দেখে চারটা বাজে প্রায়। সে জোরে পা চালিয়ে দিল। সাড়ে চারটেয় হাসপাতালের দরোজা খুলে দেয়া হয় দর্শনার্থীদের জন্য, একটু আগে গেলে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার সুযোগ পাওয়া সম্ভব। ডান পায়ের স্যাণ্ডেলের বুড়ো আঙুলের ফিতাটা গেছে ছিঁড়ে, হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু তবু পথচলার গতি এতটুকু কমায় না। গত রাত্রে তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকায় চোখজোড়া লাল হয়ে আছে চশমার কাঁচের ভিতরে, চুলগুলো উড়ুউড়ু, গতকাল থেকে গোসল করার সুযোগ হয়নি। কাপড়চোপড় ও সারা চেহারাটা মলিন। কিন্তু ঘামে ভেজা মুখে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি। কেননা সে তার কথা রাখতে পেরেছে, এখন তার ডান হাতে রুমাল বাঁধা কয়েকটি তাজা কমলালেবু।

এই কমলা কয়টি যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে। এখন সে কষ্টের কথা আর মনে নেই। ভিতরটা ঝলমল্ করছে খুশিতে।

গত পরশু নাইট ক্লাসে কাজ করবার সময় পাশের বন্ধুর মুখে একটা নাম শুনে ও জিগগেস করছিল, 'সত্যি, ছাড়া পেয়েছেন? তুমি কার কাছে শুনেছ?'

'ছাড়া পাননি'। শুধু চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে থাকবার অনুমতি পেয়েছেন। ছ'মাসের জন্যে।'

'অসুখটা খুব সিরিয়াস নাকি?' ওর বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা।

'ডাক্তাররা বলছেন বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। পেপটিক আলসার, পাকস্থলীতে ঘা হয়েছে। এর একমাত্র রেমিডি হচ্ছে অপারেশন। কিন্তু শরীরে মোটেই রক্ত নেই, অপারেশন করবেন কি করে?'

তুলিতে রং নিয়ে মুর্তাজা সাগ্রহে বলল, 'কাল দেখতে যাব।'

পরদিন সকাল ন'টায় ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে চলল। অনেকদিন তাঁর নাম শুনে আসছে, কিংবদন্তীর মত। তাঁর সাহসের কথা ভেবে বিস্মিত হয়েছে। এখন তাঁকে দেখবার এমন সুযোগ হারানো যায় না।

এসে দেখে, তাঁর বেডের কাছে লোকের ভিড়। চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে, আর একজন একটু

ঝুঁকে কি আলাপ করছেন। দু'জনের ফাঁক দিয়ে মুর্তাজা চেয়ে দেখল, মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে। রক্ত নেই বললেও হয়। শরীরে হাড় কখানা সার। কোটরে বসে যাওয়া বড়ো বড়ো চোখজোড়া মেলে কথা বলছেন মৃদু গলায়।

পিছন দিকের বারান্দায় রেলিঙের কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। একে একে সবাই চলে যাওয়ার পর এগিয়ে এল বেডের কাছে। কোনো কথাই ওর মুখে আসে না। অথচ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না কোনো। দেখতে যখন এসেছে, দু' একটা কথা না বলে গেলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে। সংকোচ কাটিয়ে এক সময় সে জিগগেস করল, 'আপনার শরীর এখন কেমন?'

'ভাল নয়। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ি।'

'ডাক্তার কেমন কেয়ার নিচ্ছেন?'

'মোটামুটি ভালই। তবে শরীর খুব দুর্বল কিনা, অপারেশন চলবে না।'

একটু ভাবল, তারপর জিগগেস করল, 'আপনার ডায়েট কি?'

'কিছুই পেটে সহ্য হয় না। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি হয়ে যায়।'

'কিছুই খেতে পারেন না?' কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন তবু যেন প্রশ্নে আশার রেশ।

'কমলালেবুর রস খেতে পারি একটু একটু।' উনি বললেন আস্তে করে।

'আপনার কষ্ট হচ্ছে বিশ্রাম নিন্। আমি কাল আসব।' কথাটা বলে চলে আসার সময় মুর্তাজা দেখতে পেল তাঁর পাণ্ডুর মুখে একটা করুণ ম্লান হাসি।

বাড়ি ফেরা পথে ও ভাবতে থাকে, এখন পয়সা কোত্থেকে জোগাড় করা যায়? হালি দু'য়েক কমলালেবু না নিয়ে যাওয়া যায় না। গতকাল রং আর তুলি কেনার জন্য বাসা থেকে দশ টাকা নিয়েছে। আব্বা কিংবা আম্মার কাছে কোন অজুহাতেই টাকার কথা আর তোলা যাবে না। ওরা রেগে উঠবেন। সংসারটা কিভাবে চলছে তার ভাবনা নেই বলে গালাগালি করবেন। অবশ্য আগে জানলে রং-তুলি কেনার টাকা থেকে কিছু বাঁচান যেত। আপাতত দু'এক পদ রং না কিনলেই চলত।

বাসায় এসে মুর্তাজা নিজের কামরাটায় এসে ঢুকল। কোনো সময় কোথাও পয়সা রেখেছে বলে মনে পড়ে না , তবু একবার খুঁজে দেখা যাক, ভুলে হয়তো রেখেও থাকতে পারে কোনো জায়গায়।

প্রথমত সে একটা একটা করে শার্টের পকেটগুলো খুঁজতে লাগল। আশায় ওর বুক দুলছিল। হয়তো পেয়েও যেতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনটে ফুটো পয়সা ছাড়া কিছুই মিলল না। শার্টগুলো বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে টেবিলের ড্রয়ার টেনে হাতড়াতে থাকে অসহিষ্ণুর মত। কাটা পেন্সিল রবার প্যাস্টেল ছেঁড়া কাগজ সবই সেখানে আছে, শুধু একটা পয়সাও লুকিয়ে নেই। এরপর আর কি দেখব? আরে বিছানাটা রয়েছে যে, তার মাসিক বরাদ্দ টাকা থেকে কিছু বাঁচলে বিছানাটা উলটিয়ে তা ফেলে রাখা ওর অভ্যাস। মাঝে মাঝে অনেক দিন চলে যায়, পয়সাগুলো মোটেই চোখে পড়ে না। আবার হঠাৎ কোনদিন পেয়ে যায়। পেয়ে যায় এমন সময়ে যখন এক টাকাই লাখ টাকার শামিল। তখন অমনোযোগিতার জন্যে নিজের প্রতি খুশি হয়ে ওঠে নিজেই। কিন্তু আজ কী হলো? বিছানার নিচটা একেবারে খালি। তার দরকার আছে জেনেই যেন পয়সাগুলো জোট বেঁধে পালিয়েছে।

বিরক্তিতে পানসে হয়ে যায় মুর্তাজার মুখটা। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নতুন কোনো উপায় উদ্ভাবনার জন্যে চিন্তা করতে থাকে। তাকে দমে গেলে চলবে না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো চেয়ারে। একটা ভালো বুদ্ধি খেলেছে ওর মাথায়। আজকে বাজার করার অনুমতিটা যদি কোনপ্রকারে আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারে, তা'হলে অতি সহজেই সমস্যার সামাধান হয়ে যায়। সঙ্গে অন্য কাউকে না নিলেই হল।

'আম্মা আমি আজ বাজার করতে যাব।' রান্নাঘরে বসে বলল, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে।

তিনি মুখ তুলে জিগগেস করলেন, 'কিসের বাজার রে?'

'কিসের আবার। বাসার?' মুর্তাজা বলল, 'নিজেরা বাজার না করলে ভাল খাওয়া যায় না কি?'

উনি একটু হেসে বললেন, 'এখন ক'টা বাজে খেয়াল আছে? এক্ষুনি খেতে বসবি, আর এখন বারোটার কম নয়। আজ শুক্রবার কিনা? আর্ট ইস্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি, তাই বুঝতে পারেনি।

ফরিদার কাছে একটু খোঁজ নিলে কেমন হয়? মায়ের কাছ থেকে আসার সময় কথাটা মগজে খেলতেই মাঝখানকার কামরাটার উদ্দেশে সে চলল। ফরিদা ওর পিঠোপিঠি। এজন্যই হয়তো সামান্য কারণে ওর সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে যায়। এখন বয়স কিছু বেড়েছে বলে ফরিদা অনেকটা গম্ভীর হয়েছে, কিন্তু তবু মনকষাকষিকে অনেক সময় ঠেকানো যায় না। ফলে এমনো হয়, চার পাঁচদিন কথা বলে না দু'জনে। মুর্তাজা ফাইনাল ইয়ারে পড়লে কী হবে, ও এখনো ছেলেমানুষ থেকে গেছে। বিশেষ করে ছোটভাইবোনদের কাছে। বয়সের দাবীতে সে ওদের কাছে মোটেই পাত্তা পায় না। গতবার একজিবিশনে অয়েল পেইণ্টিং-এ গবর্নর্স প্রাইজ পেয়েছিল, কাগজে কাগজে ছাপা হয়েছিল ওর নাম ; কিন্তু ফরিদা তাকে আমলই দেয়নি।

ওর ওখানে যেতে ইতস্তত করে। ছোটবেলা থেকে তার যেমন ছিল ছবি আঁকার শখ তেমনি ফরিদার ছিল গানের। ওর জন্যে একজন টিউটর রাখতে হয়েছিল। এতদিনে মোটামুটি দখল এসেছে ওর। মুর্তাজার বিবেচনায় একেবারে মন্দ গায় না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শহরে একটা সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু যত প্রশংসা করা হয়, ততটুকু পাওয়ার যোগ্য মোটেই নয়। সেদিন সকালে উঠে হারমোনিয়ামের সঙ্গে একটা গান রেওয়াজ করছিল ফরিদা, প্রান্তিক পরিষদেক নববর্ষ দিবসে গাইতে হবে। মুর্তাজা একটা কম্পোজিশনে হাত দিয়েছিল, কাজ শুরু করার পর নতুন নতুন কল্পনা জাগতে থাকায়, তখন রীতিমত রোখ চেপে গেছে ওর। পাশের কোঠায় হারমোনিয়ামের পোঁ পোঁ, ও গট্ গট্ করে এসে গলা ফাটিয়ে বলল, 'বন্ধ কর, বন্ধ কর। কি আমার মিষ্টি গলারে, আবার গান শেখা হচ্ছে।'

রাগে ফরিদার চোখ ফেটে পানি পড়ার যোগাড়। কিন্তু এ অপমান ও নীরবে সহ্য কববে কেন? ও মাথা ঝাড়া নিয়ে বলল, 'করবো মা, তোমার কী?'

'আমার কি? হারমোনিয়ামটা ছুঁড়ে ফেলব বাইরে।'

'ইস্, ফেলো তো দেখি। কেমন বুকের পাটা।' রোখ করে তাকায় ফবিদা।

মুর্তাজা ভ্রুকুটি করে ফিরে যেতে যেতে বলে, 'ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু এখন ফেলব না, ছবি আঁকছি।'

'এমন ছবি আমি বাঁহাতে আঁক্‌তে পারি।' ফরিদা ছাড়বার পাত্রী নয়।

সেদিন থেকে ওদের মধ্যে যে কথাবার্তা বন্ধ হয়েছে এরপর আর বোঝাপড়া হয়নি। মুর্তাজা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে থাকে। ওর কাছে পয়সাকড়ি থাকার সম্ভাবনা অনেক। শত্রু হলেও মেয়ে তো! ওর ইস্কুলের মাইনে ও বাসের টাকাটা বাবা নিজে দিয়ে আসেন, কাজেই সেখান থেকে হাতসাফাই করতে পারে না। কিন্তু টিফিনের পয়সা? টিফিনের জন্যে অবশ্য রোজ পাঁচ ছ' আনার বেশি পাওয়া যায় না, তবু এই পাঁচ ছ' আনার ওপর অন্য কারো হাত নেই একথা ঠিক। মুর্তাজার মনে হয়, টিফিনের জন্যে একটি পয়সাও খরচ করে না ফরিদা, খিদের পেটে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে। আর এভাবেই না সেলাইয়ের কাসকেটটা কিনেছে।

মুর্তাজা ঘরে ঢুকে ছোট টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখে ফুটেছে তখন দেখনহাসি। এতদিন্ যেন ওর ওপর বিনা কারণে অন্যায় করে এসেছে। রাফখাতায় এলজাবরার একটা সলিউশন করছিল ফরিদা, মুখ নিচু করে। কে এসেছে টের পাওয়া সত্ত্বেও চেয়ে দেখবার প্রয়োজন বোধ করলো না। মুর্তাজা তাকে খুশি করতে চায়, 'একটা ভাল খবর আছে ফরিদা।'

ও জবাব দেয়না কোনো। নিচু হয়ে পেনসিল দিয়ে লিখতেই থাকে।

মুর্তাজা আবার বলল, একজনের মুখে তোর গানের প্রশংসা শুনলাম। খুব গুণীলোক। পারতপক্ষে কাউকে আমল দেননা। অথচ উনি আমাকে ডেকে বললেন, তোর গলার কাজ বেশ সুন্দর।'

'তাতে তোমার কি হয়েছে?' ফরিদা ফোঁস্ করে উঠল।

'তোর রাগ এখনো পড়েনি দেখছি।' অজুহাত দিতে চায়। সে বলল, 'না হয় ভুলই করেছি। এজন্য এমনভাবে থাকতে হবে? বড় ভাইয়ের সামান্য কথাটা মাফ করতে পারছিস্ না?'

ফরিদা বলল, 'থাক্ আর বড়ভাই ফলাতে হবে না।'

'আমাকে মাফ করে দে। আর শোন্, একটা জরুরী কথা আছে।'

ওর খাতার ওপর হাত রেখে মুর্তাজা বলল, 'তোর কাছে গোটা দেড়েক টাকা হবে?'

এতক্ষণ কেন ও তোয়াজ করছিল, এইবার বুঝতে পারল ফরিদা। খাড়া জবাব দিল, 'না!'

'আমার নিজের জন্য নয়। তুই বুঝতে পারছিস না কত দরকার।'

মুর্তাজা টাকা চাওয়ার কারণটা বিশদভাবে বুঝিয়ে বলে। খুব কম সময়েই ছোটবোনের কাছে সত্য কথা কয়, কিন্তু আজকে একটি কথাও বাড়িয়ে বলল না। কথাগুলো শোনার পর রাগ-অভিমান সব ভুলে যায় ফরিদা, তার মুখে ফুটে উঠে গাম্ভীর্য। চিন্তিতভাবে বলল, 'কিন্তু আমি যে আজকে উল্ আনিয়ে ফেলেছি।'

'একটা টাকাও নেই?' পানসে মুখে শুধা, 'একটিও না?'

ফরিদা বলল, 'না।'

হতাশায় মুর্তাজার চেহারাটা নিভে যায়, বলল, 'তা'হলে কি হবে? আম্মার কাছ থেকে আদায় করতে পারিস না কিছু?'

'কিভাবে? অনর্থক গালাগালি শুনতে পারব না।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফরিদা উৎসাহিত হয়ে বলল, 'এক কাজ করলে হয়। সুতো দিযে আমি যে পাখাটা তৈরি করেছি তা বিক্রি করতে পারলে—।'

চশমাটা খুলে শার্টের খুট্ দিয়ে মুছতে মুছতে ভাবে মুর্তাজা। ফরিদা জিগগেস করে, 'পারবে তুমি?'

'তা চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।' চিন্তিতভাবে বলল, 'নিশ্চয় পারব। দে পাখাটা!'

মুখে বললেও মন সায় দিচ্ছে না। নকশাটা দেখতে ভালই লাগে, সদরঘাটে নিয়ে গেলে হয়তো বেশিক্ষণ লাগবে না বিক্রি করতে! কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব? যদি জানাশোনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাহলে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে না? খোলা রাস্তায় জিনিস বিক্রি করতে যাওয়াটা গ্লানিকর লোকে চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে, সে ফেরিওলা নয়, অথচ কেন একটা সুতোর পাখা বিক্রি করতে এসেছে তার আসল কারণটা জানতে পারনো। ভাববে, অভাবে পড়েই বোধ হয়ে বাড়ির জিনিস বেচতে এসেছে।

ফরিদা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ততার সঙ্গে শোবার ঘরে গিয়েছিল। মাকে লুকিয়ে বেতের বাক্স থেকে পাখাটা এনে খবরের কাগজ দিয়ে মোড়াল। মুর্তাজার হাতে দিয়ে বলল, 'সাবধানে বেরিয়ে যাও।'

মুর্তাজার মুখটা তখন দ্বিধায় দ্বন্দ্বে চূর্ণ হয়ে আছে। তার মনে হচ্ছে, মাথায় বাড়ি দিলেও এ কাজ সে করতে পারবে না। ফরিদা যখন পাখাটা হাতে এনে দিল, সে আপত্তি জানাতে পারল না। যাতে বাসার অন্য কেউ দেখতে না পায়, তেমনি সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

অনেকদিন খেটে ফরিদা পাখাটা তৈরি করেছিল বাবার জন্যে। তিনি আপনভোলা লোক, নিজের সুখ-সুবিধের দিকে মোটেই খেয়াল রাখেন না। এমন কি অসুখ হলেও, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে, তাঁর অসুখ করেছে। দিনরাত পড়াশুনা নিয়েই পড়ে থাকেন। তিনি বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ যারা, সেই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনাটা হেলাফেলার কাজ নয়। ওদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজটা ঠিকমতো ঢুকিয়ে দিতে হবে, আর সেজন্য প্রফেসরের হওয়া চাই রীতিমতো কর্মী। যে মালী চারাগাছকে মহীরুহে পরিণত করতে চায়, তাকে ঢিলেঢালা হলে চলে না। অবশ্য অধ্যাপনা করে ক'শ টাকাই আর পাওয়া যায়। সে টাকায় ছয়-সাতজন খোরপোষের একটা সংসার চালানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবু পয়সাটা চরম জিনিস নয়, যদি হোত, তা'হলে হয়তো এতদিনে দুনিয়াটা শেয়াল-কুকুরের রাজ্য হয়ে দাঁড়াত। আব্বার এসব মতামতের জন্যে তাঁকে খুব ভাল লাগে ফরিদার। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, আম্মা সব সময় তাঁর দিকে নজর রাখতে পারেন না। তাই উনি যতক্ষণ বাসায় থাকেন ফরিদা যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে। ডাক শুনলেই ছুটে যায় তাঁর কাছে মাঝে মাঝে তিনি ভীষণ চটে ওঠেন, কিন্তু এ নেহাত বাইরের ব্যাপার।

দু'দিন আগে পাখাটার কাজ শেষ হয়েছে। ফরিদা ভেবে রেখেছিল সুস্থির সময়ে সেটা নিয়ে গিয়ে আব্বাকে একদম অবাক করে দেবে। কিন্তু তা আর হল না।

তবু ভাবনার কারণ নেই। আরেকটি নতুন পাখা সে তৈরি করবে শিগগিরই।

ছোট ভাইবোন নিয়ে গোসল করতে যাওয়ার জন্য ফরিদা তৈরি হচ্ছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল মূর্তাজা। ও জিগগেস করে ওঠে, 'এত শিগগিরই বিক্রি হয়ে গেল? কত পেয়েছ?'

মূর্তাজা চেহারা বিমর্ষ। পাখা সমেত হাতটা তুলে বলে, 'বিক্রি আর হলো কোথায়, এই তো।'

'কেন, কেউ কিনতে চাইল না?'

'আমি বিক্রি করতে চাইনি।' মূর্তাজা ব্যাখ্যা করে জানায় বাইরে গিয়ে মনে হল আমার এক বন্ধুর কাছে গেলে টাকা পেতে পারি। তোর এত কষ্টের জিনিসটা বিক্রি করবার দরকার নেই।'

ফরিদা বুঝল, এ বাজে অজুহাত মাত্র। ভাইটির চরিত্র ওর নখদর্পণে আঁকা। এত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিসটা বিক্রি করতে লজ্জা হচ্ছে, এছাড়া ফিরে আসার কোনো কারণ নেই।

'যদি পাও তবে তো ভালই।' ফরিদা পাখাটা হাতে নিয়ে বলল, 'তা'হলে ওখানে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ এক্ষুণি যাচ্ছি।' ছোট বোন ওর মনের ভাবটা বুঝে ফেলেছে ভেবে খারাপ লাগে ওব। বাইরে থেকে ফিরে আসার সময় ভেবেছিল গোসল করে খেয়েদেয়ে বেরুবে। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। এক গেলাস পানি খেয়ে ও বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

বন্ধুবান্ধব কম নয়। সম্ভব হলে সবার কাছে গিয়েই একবার করে ঢু মারতে হবে। প্রথমেই মনে পড়ল, আখতারের কথা। খোশমেজাজী দিলখোলা ছেলে। ওর কাছে থাকলে কয়েকদিনের জন্যে তিনটি টাকা ধার দেবেই। কিন্তু যে হারে সিগারেট ফোঁকে তাতে ওর পকেটে কিছু থাকাটাই বিচিত্র। বিবেচক ছেলে হয়ে এমন উচ্ছৃঙ্খল চলাফেরায় কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তিরস্কার করলে ও শোনে আর হো হো করে হেসে ওঠে। ও বলে দুনিয়াতে আকবর বাদশাকেও মরতে হয়েছে, হেসে খেলে জিন্দেগীটাকে সিগারেটের ধোঁয়ার মত উড়িয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য এজন্য কর্তব্যকে অবহেলা করবে না, কেননা মনের মতো কাজের মধ্যে রয়েছে আনন্দ আর আনন্দই জীবন। মা বাড়িতে আছেন, ছোটভাইটা ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিকসে অনার্স পড়ছে, নিজের কথা না ভেবে ওদেরকে দেখাশোনা করার মতো যোগ্যতা অর্জনের জন্যেই সে আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ল্যাণ্ডসক্যাপ আর পটারীতে ওর হাত ভালো।

আস্তানাটা অনেক দূরে, শান্তিনগর বাজারের কাছ দিয়ে যে রাস্তাটা বেইলী রোডের দিকে চলে এসেছে, তারই ধারে। টায়ার ফেটে সাইকেলটা অচল হয়ে আছে, মূর্তাজাকে হেঁটেই যেতে হবে এতদূর।

কড়া দুপুর রোদ মাথায় নিয়ে ও যখন ভার্সিটি স্টুডেন্টস লজের বারান্দায় এসে উঠল তখন তার সারা শরীর বেয়ে দর্‌দর্‌ করে ঘাম ঝরছে। কাঠের বেড়া দেওয়া টিনের একটা চৌচালা। সে হিসেবে নামটা বেশ ভারিক্কি চালের। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ছাত্র থাকে না। কয়েকজন কেরানী, আর আখতার, এরাই হচ্ছে এই ঘরের বাসিন্দা। রান্নাবাড়ার জন্যে একটা চাকর রাখা হয়েছে।

মূর্তাজা ঘরে ঢোকবার আগেই দক্ষিণ দুয়ারের কাছে শুনল আখতারের গলা, 'আমার ভাত কোথায় হ্যা, আমার ভাত?'

'আপনার চাল দেওয়া হয়নি' বাবুর্চি জানাল।

'দেওয়া হয়নি মানে? আমি উপোস থাকব নাকি?'

'তার আমি কিছু জানি না।' বাবুর্চি বলল, 'ম্যানেজার সাবকে বলেন।'

মেসের ম্যানেজার সাহেবকে জিগগেস করার পর বলল 'কদ্দিন আর চালাবো বলুন! সাতদিন আগে আপনার টাকা দেয়ার কথা ছিল।'

'আমি পালিয়ে যাব টাকা নিয়ে?' আখতারের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ।

'পালাবেন না। কিন্তু আমাদেরও তো একটা সাধ্যি আছে। কত টাকা আর মাইনে পাই।'

মূর্তাজা ঘরে ঢুকে ওর খাটের ওপর গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল। ওখান থেকে ফিরে এসে তাকে দেখতে পেয়ে অন্য সবকিছু ভুলে যায় আখতার। নিমেষে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে।

তার বন্ধুদের অনেকবার অনুরোধ করেছে আসতে, কিন্তু দূরের পথ বলে কেউ আসেনি এ পর্যন্ত। মূর্তাজারও এখানে প্রথম পদার্পণ। আখতার ওর সামনে সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে দেয়। পা দুলিয়ে জিগগেস করল, 'তারপর হঠাৎ কি ভেবে শুভ পদার্পণ?'

'এমনি, আজকে তো ছুটি।' মুর্তাজা বলল, 'তোকে মনে পড়ল।'

'ওহ্ গ্রেট।' আখতার একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'কতকগুলা নতুন পট করেছি, দেখবি?'

'নিশ্চয় নিশ্চয়। মুর্তাজা একটু থেমে বলল, 'একটু জিরিয়ে নিই।'

ওদের কথাবার্তা শুনে আগেই মুর্তাজার মনটা দমে গিয়েছিল, ভাবছিল এখানেও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চশমাটা খুলে রাখার পর সিগারেট ধরিয়ে সে ধোঁয়ার রিং বানাতে লাগল মুখের উপর।

এরপর কি করা যায়? বন্ধুদের একটা একটা নাম ধরে সম্ভাবনার কথা সে চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু কেউ দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। তা হলে?

'শাজাহানপুরের ওদিকটায় কয়েকটি ভাল জায়গা দেখে এসেছি। স্কেচে বেরুবি বিকেলে?' কথাটা জিগগেস করে আখতার ওর মুখের দিকে তাকাল।

'রাখ্ তোর স্কেচ।' এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে মুর্তাজা বলল ঠাণ্ডাগলায়, 'ছবি আঁকার চাইতে জীবনটা অনেক মূল্যবান।'

'হঠাৎ এ কথা কেন?' আখতার বিব্রত নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

'এমনি বললাম আর কি। যদি আঁকতেই হয়, ছবি আঁকতে হবে মানুষের। ন্যেচারের নয়। দিনের পর দিন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকছে, বেঁচে উঠছে, তাই ফোটাতে হবে রঙে রেখায়। ন্যেচার আসবে সেখানে, তবে মুখ্য হয়ে নয়।' বিছানা থেকে উঠতে উঠতে মুর্তাজা বলল, 'এখন চলি!'

'চলি মানে?' বিস্মিত হয় আখতার, এক সঙ্গে এসে মিললে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেখানে কাটিয়ে দেয, এখন এত শিগগির উঠে পড়ার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পায় না।

'একটা জরুরী কাজ আছে।' মুর্তাজা বলল, 'শিগগির যেতে হবে।'

'কি কাজ একটু শুনতে পারি? গোপনীয় কিছু নয় নিশ্চয়ই?'

'তোকে জানালে বিশেষ ফায়দা হবে না।' মুর্তাজা বলল সংক্ষেপে।

'কেমন করে বুঝলি।' আখতার জিগগেস করে ক্ষুন্ন গলায়।

'এমনি, অনুমানে।' মুর্তাজা বলল, তবু যখন পীড়াপীড়ি করছিস, বলছি। গোটা দু'য়েক টাকা ধার দিতে পারিস্? বিশেষ দরকার।'

'ও, এই কথা?' শার্টটা গায়ে দিতে আখতার বলল, 'চল্।'

'কোথায় যাব?' জিগগেস করল মুর্তাজা, 'তুই কোথাও টাকা পাস্ নাকি?'

'হ্যাঁ, পাই।' হাত ধরে টেনে আখতার বলল, 'চলনা জলদি।'

রাস্তার ওপাশে চালাঘরে একটা ছোট চায়ের দোকান। শুধু চা বেচে বোধ হয় পোষায় না, তাই মনোহরি জিনিসপত্রও রাখা হয়েছে। দোকানদার ছোকরাটাকে অর্ডার দেয় আখতার, 'এই কি খাওয়ার আছে, দে। আর চা দে দু'কাপ।'

ছোকরাটা চালাক কম নয় জিগগেস করল, 'আগের টাকা এনেছেন?'

'এনেছি বাবা, এনেছি। এখন যা বলছি দে।' হঠাৎ ওর মেজাজ বিগড়ে গেল, বলল, 'উহ্ অসহ্য, অসহ্য।'

ওর কথা পুরাপুরি বিশ্বাস না হলেও, ছেলেটা একটা বাসনে করে কতকগুলা নোনতা বিস্কুট ও কুকিস নিয়ে ওদের সামনে বেঞ্চিতে রাখল। এরপর চুলোতে পাখা করতে গেল। ওরা বাইরের দিকে চেয়ে বিস্কুট চিবোতে থাকে চুপচাপ।

আধ ঘণ্টার মধ্যে চা খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল ওরা। রুমালে মুখ মুছে ছোকরাটার কাছে এগিয়ে যায় আখতার। জিগগেস করে, 'আমার আগে না কত হয়েছিল?'

পাওনা অঙ্কটা ওর মুখস্ত। বলে, 'আট টাকা স্যার।'

'আট টাকা আর এখন হল আট আনা। সাড়ে আট টাকা। তা' হলে দে, দেড়টাকা আমাকে। দশটা টাকা পুরো হয়ে যাক্।'

'ছেলেটা হাত নাড়িয়ে বলল, 'নোটটা দ্যান্।'

ব্যস্ততার সঙ্গে পকেট হাতড়িয়ে ও বলে, 'ও তাইতো। ভুলে ফেলে এসেছি। অন্য শার্টে রয়ে গেছে। দেড়টা টাকা দিয়ে দে, একেবারে দশ টাকা নোট দিতে আমার সুবিধে হবে।'

'আগে নোট না দিলে আমি পারব না। তা'হলে মালিক এসে মারবে।'

রাস্তায় এসে আখতার জিগগেস করে, 'তোর টাকার খুব দরকার, নারে?'

'দরকার না হলে কি দুপুর বেলায় এদ্দুর হেঁটে আসি?'

'তা'হলে এ ব্যাপারেই এসেছিলি আমার কাছে?'

মূর্তাজা জানাল, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারেই।'

'চল তো দেখি।' বিপরীত পাশে একতলা দালানটার দিকে চলতে চলতে বলে আখতার, 'ইন্সপেক্টর সাব দুটো পট কিনেছিলেন। দাম দেননি। পেলে সুবিধে হবে।'

কিন্তু ইন্সপেক্টরের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি করার পর একজন এসে বলে গেলো, 'খেয়েদেয়ে উনি ঘুমিয়ে আছেন। এখন আসতে পারবেন না।'

এরপব আখতারকে বিদায় দিয়ে মূর্তাজা হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এল শহরে। চা খাওয়ার পর খিদেটা মবেছে। কিন্তু এসেছে একটা অসহ্য ক্লান্তি। শার্টের পিছনটা ভিজতে ভিজতে পিঠের সঙ্গে আটকে গেছে। ঘাম জমেছে সারামুখে, গলায়, তার মধ্যে রাস্তার ধুলো লেগে ঘিনঘিন করছে শরীরটা।

এইভাবে বিকেল হলে সদরঘাটে গিয়ে পশ্চিমদিকের একটা পাকায় বসল মূর্তাজা। সূর্য ডুবেছে বুড়িগঙ্গার পানিতে আলতা ঢেলে দিয়ে, নৌকাগুলো পড়ে যাচ্ছে ছায়ায়। দেখবার ইচ্ছে থাকলে আরো অনেক দৃশ্য রয়েছে, ভালো ছবি আঁকবার মতো, স্টাডি করার মতো। সেদিকে ওর মন নেই। এখন ভাবছে, টাকা না হলে মানুষের গোটা অস্তিত্বটাই যেন নিরর্থক। অথচ কোনদিন একে এত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শেখেনি।

নদীর ঝিলিমিলি স্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে এক সময় মহবুব কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কথা ওর মনে পড়ল। ম্যানেজার তিনদিন আগে বাসায় এসে বলেছিল, তাদের নতুন তেলের লেবেলটা এঁকে দিতে। মূর্তাজা ভূমিকা না করেই জবাব দিয়েছিল, 'আমি কমার্শিয়াল কাজ করি না।'

কেবল মুখের কথা নয়, গোড়া থেকেই এ ছিল তার প্রতিজ্ঞা, কমার্শিয়াল করবে না। ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ পর্যন্ত যদি দু'তিনদিন একনাগাড়ে না খেয়েও থাকতে হয়, তবু সে ওই ধরনের শিল্পচর্চার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এগুলো কবলে সৃজনী-প্রতিভা দিনে দিনে কেমন করে নষ্ট হয়, তা মোটেই টের পাওয়া যায় না। ব্যবহারিক শিল্প নয়, সৃজনী শিল্পকেই করতে চায় পেশা, যদিও এদেশে এখনও তা আকাশ-কুসুম কল্পনা। এ ব্যাপারে ওর মত হচ্ছে, আত্মত্যাগে না করলে পরবর্তী জেনারেশনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

কিন্তু সে যেন তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারবে না। ওব মন বলছে, এখন গেলেও সে কাজটা পাওয়া যেতে পারে। বাড়ন্ত ফার্ম, পয়সা নেহাৎ কম পাওযা যাবে না।

এতক্ষণে যেন সমস্যার সত্যিকারের সমাধান খুঁজে পেল। মূর্তাজা উঠে দাঁড়িয়ে চলতে থাকে তাড়াতাড়ি। ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তার জন্যে এত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

চকবাজার ছাড়িয়ে একটা গলিতে এসে দেখল, দোকানটা খোলাই আছে। ম্যানেজার তাকে দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? এত রাত্রে যে?'

'আপনাদের লেবেলের কাজটা আমি করব।' কোন ভূমিকা ছাড়াই বলল মূর্তাজা।

'তাতো দিয়ে দিয়েছি অন্যজনকে। আপনি তখন আপত্তি করলেন।'

মূর্তাজা জিগগেস করে প্রায় খ্যাপার মত, 'কাকে দিয়েছেন?'

নাম বলতেই সে দেখল ও লোকটি তার বন্ধু। একটু ভেবে নিয়ে জানতে চাইল, 'আচ্ছা, আমি যদি ওর কাছ থেকে কাজটা নিতে পারি তা হলে আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

'আমার আর কি আপত্তি। কাজ হলেই হলো।'

'কাল সকালে এসে দিলে টাকা দেবেন তো?'

'জিনিস পেলে কেন দেবোনা?'

ওখানে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সে যখন রশিদের কাছে এলো, তখন রাত নয়টা বাজে।

ওখানে হাজির হলো, জিনিসটা বুঝে নিল, এরপর বেরিয়ে এল। রশিদকে একটা কথা বলার সুযোগ দিলো না।

ফরিদা উদ্বিগ্ন হয়ে একেকবার দরজার দিকে চাইছিল। এখনো সে বাইরে থেকে ফেরেনি কেন? বাবা-মা রেগে গেছেন। এই রাগের পিছনে একটা গভীর কারণ আছে। বড় ছেলে মুনীব রাজনীতি করতো, গত ভাষা-আন্দোলনের সময় জেলে গেছে। গত দু'বছব ধরে ও কোথায় থেকেছে, কখন বাড়িতে এসেছে, কখন আসেনি, বাপ-মা কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারতেন না। যেদিন ধরা পড়ল, সেদিন ওরা বুঝতে পারলেন, তলে তলে এই ব্যাপার। এরপর বিশেষ করে ছেলেদের ওপর হুকুম বিকেলে যেখানেই যাক, সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরতে হবে। নইলে মারের চোটে পিঠের চামড়া থাকবে না।

কথাটা যে মূর্তাজার মনে ছিল না এমন নয়, কিন্তু এব্যাপাবে সে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয় না। কেননা, এ পর্যন্ত অনেকবারই বাধ্য হয়ে এই আদেশ অমান্য করতে হয়েছে। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোন ভদ্রলোকের পক্ষে বাড়িতে থাকা সম্ভব না কি?

ও ঘরে ঢুকতেই ফবিদা জিগগেস কবল, 'কি হল? এনেছ?'

'না, তুই শুনে যা।' মূর্তাজার হাবভাবে একটা রহস্যময়তা।

কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি বলতেই ফরিদা চলে গেল অন্য ঘরে। মূর্তাজা হারিকেন হাতে নিজের কোঠায় এসে ঠিক করতে থাকে রং তুলি কাগজ।

ডাল তরকারি দিয়ে রান্নাঘর থেকে এক থালা ভাত আর এক গেলাস পানি নিয়ে হাজির হল ফবিদা। বলল, 'নাও, আগে দুটো মুখে দিয়ে নাও।'

সাড়াপেয়ে মা এসে জিগগেস কবলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?'

'এখনেই তো। কাজ কবছিলাম।'

'এখানেই কাজ কবছিলি? মায়েব সামনে মিথ্যা কথা বলতে বাধলো না? তুই আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কবছিস্। সাবধান হ। নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

আম্মা চলে যাওয়ার পব তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে মূর্তাজা কাজ করতে বসলো, হারিকেনের একটা দিক খাতা দিয়ে আড়াল করে রেখেছে। অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলছে দেখলে বাবা চটাচটি করবেন।

আম্মাকে দেখাবার জন্য বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ছিল ফবিদা। কিন্তু তাব চোখে ঘুমের আঁশটুকুও নেই। জেলের ঘণ্টায় একটা বাজতেই সে আস্তে আস্তে উঠে এল। এমন ভাবে দরজা খুলল যাতে কেউ টের না পায়।

শোযার আগে সে স্টোভ ও অন্যান্য সবঞ্জাম ঠিক করে রেখে ছিল . স্টোভটা জালিযে জিগগেস করল 'কদ্দুর হয়েছে?'

'আরো ঘণ্টা দুই লাগবে।' মূর্তাজা বলল, শিগগিবি চা দে তো।'

তিনরঙা লেবেলটা এঁকে শেষ করার পর বাত তিনটে বাজল। এর মধ্যে তিন কাপ চা পান করতে হয়েছে। ফরিদা আর বসে থাকতে পারছেনা, চোখের পাতাদুটো একেকবার বুজে যায়। তুলিটা ধবে টেবিলের ওপর রেখে মূর্তাজা বলল, 'তুই যা। ঘুমিয়ে পড়গে।'

আজ সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে কখন দোকান খুলবে তার জন্য অপেক্ষা করল না। ম্যানেজারের বাসার ঠিকানাটা ও টুকে এনেছিল। লেবেলেব আঁকাটা হাতে নিযে চলল মূর্তাজা। ওখানে জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়ে পাঁচ টাকার নোটটা হাতে নিল এই টাকাতেই অনেকক্ষণ বেছে বেছে ফলের দোকান থেকে বেশ তাজা দুই গণ্ডা কমলালেবু কিনে এনেছে।

সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠে ফিমেল ওয়ার্ডে চাব নম্বর বেডটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মূর্তাজা। জোরে হেঁটে আসায় শরীর দিয়ে ঘাম ছুটছে। যাক্, তবু সময় মত আসতে পেরেছে সে। এখনো লোকজন এসে ভিড় জমাযনি।

'আমাকে চিনতে পারছেন তো?' একটু ঝুঁকে বিনয়ের সঙ্গে প্রশ্ন কবল।

'হ্যাঁ কালকে এসেছিলেন না?' কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর আবার নারীকণ্ঠের ক্ষীণ আওয়াজ, 'মাথাটা

বড্ড ঘোরে। হঠাৎ কাউকে দেখলে চিনতে পারি না। বুকটাও ভীষণ জ্বালা করে। আজকে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

মূর্তাজা কমলালেবু বাঁধা রুমালটা সামনে রাখল। সেগুলো দেখে তার রক্তহীন পাণ্ডুর মুখে আবার সেই করুণম্লান হাসি ফুটে উঠল। এই হাসির পেছনে কি লুকিয়ে আছে কেউ জানে না, মূর্তাজাও নয়। সে কি দীর্ঘ কারাবাস ও নির্যাতনের বেদনা, না অন্যকিছু? মূর্তাজা একদৃষ্টে চেয়ে দেখে, তার দুই চোখের কোণ বেয়ে মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এসেছে, সে যেন নিজের রক্তের স্পন্দনে শুনতে পাচ্ছে তারই অস্পষ্ট পদধ্বনি। সে মনে মনে শিউরে ওঠে। কী বলবে খুঁজে পায় না কিছুই। কী বলবে? কী বলতে পারে?

'তবু একথা ঠিক, আমি মরব না।' জানালার বাইরে অনেকদূরে চলে যায় ইলা মিত্রের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি স্থির, অচঞ্চল। গলার আওয়াজটা আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়, 'আর বেঁচে উঠলে আপনাদের কথা আমার মনে থাকবে।'

'আমাকে আপনি বলবেন না।'

মূর্তাজা আর কোন কথা বলতে পাবে না। বিদায় নিয়ে ফিরে আসার সময় একটা ছবির পরিকল্পনা ওর মাথায় খেলল। ও মনে মনে ঠিক করে নেয়, আজকে বাসায় ফিরে গিয়ে রাত্রেই একটা স্টীল লাইফ কম্পোজ করবে। কম্পোজ করবে মানুষের মাথার একটা খুলির সঙ্গে কয়েকটি টস্‌টসে তাজা কমলালেবুর রক্তিম স্তবক।

মতি নন্দী

সুখী জীবন লাভের উপায়

কদিন খটাং খটাং করে অবশেষে পাখাটা মাঝরাতে বন্ধ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণটা বুঝে সুধীন খিঁচিয়ে উঠল। "মনে করে একটা পাখা মিস্ত্রিও ডাকতে পারনি? সারারাত এখন ছটফট করি!"

'মিস্ত্রি কি আমি গিয়ে ডেকে আনব? পাঁচদিন আগে বলেছি পাখাটা কিরকম বিদঘুটে শব্দ করছে, একবার দেখ।" যতটা চাপা স্বরে নিঝুম রাতে ঝাঁঝ দেখানো যায়, সুধা দেখাল।

"খোকাকে দিয়েও তো ডাকাতে পারতে, না সেটাও আমার জন্য তুলে রেখেছ।" বিড়বিড় করতে করতে সুধীন মেঝেয় নেমে শুল। হুল ফুটিয়ে পাশের ঘরের টেবল পাখাটা বোলতাব মত শব্দ করে যাচ্ছে। ওটাকে নিয়ে এলে খোকার কষ্ট হবে এই ভেবে সুধা রান্নাঘর থেকে হাতপাখা এনে সুধীনকে বাতাস শুরু করল। বাইরে ফটফটে জ্যোৎস্না, সুধার মনে হল, এর বদলে হুহু হাওয়া দিলে দুর্ভোগ কত কমে যেত।

সকালে বাজার থেকে ফিরে সুধীন বলল, "ইলেকট্রিক দোকানটা এখনো খোলেনি, কলেজ যাবার আগে খোকা যেন অবশ্যই মিস্ত্রিকে খবর দিয়ে আসে।" ওবা দুজন বেরিয়ে গেলে সুধার আর কিছু করার থাকে না। খাওয়া সেরে দিনরাতের ঝি বঙ্কুব মা দুপুরটা মেয়ের বাড়ি কাটাতে যায়। সুধা দরজা-জানলা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে মেঝেয় শুয়ে থাকে, আজ শুয়েছে খোকার ঘরে। ঘুমটা সবে জমে উঠছে, তখনই কড়া নাড়ার শব্দ হল।

দরজা খুলে দেখল শীর্ণ দেহ, আধবুড়ো একটা লোক, পরনে খাঁকি ট্রাউজার্স আর নীল হাওয়াই শার্ট, দুটোই ময়লা , কানের পিছন দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। কাঁধ তুলে জামায় ঘাম মুছে বলল, "পাখা খারাপ হয়েছে বলে কি দোকানে খবব দিয়েছিলেন?"

"আমার ছেলে দিয়ে এসেছে, আসুন।" মিস্ত্রিকে ঘরে নিয়ে এল সুধা। গায়ে ব্লাউজ না থাকায় খুব

অস্বস্তি হচ্ছে, তবে লোকটা মিস্ত্রি আর ছেলে-ছোকরা নয় সুতরাং আঁচলটা শুধু এধার ওধার টেনে দিল।

মিস্ত্রি সুইচ টিপল, পাখা ঘুরল না। সেলাই কলের টুলটা টেনে নিয়ে বলল, "একটা চেয়ারও লাগবে।"

খোকার ঘর থেকে নিজেই চেয়ার আনবে কিনা ভেবে সুধা ইতস্তত করল। এ সব কাজ তো মিস্ত্রিদেরই করার কথা।

"পাশের ঘরে আছে।"

সুধা সঙ্গে করে মিস্ত্রিকে নিয়ে এল। খোকা কলমটলম ফেলে যায় টেবলে। চেয়ার এনে তার উপর টুলটা রাখল। রাখার জায়গা নেই বললেই হয়। একটুল সরে গেলেই টুলটা পড়ে যাবে। সুধা অবাক হয়ে গেল, অদ্ভুত কায়দায় মিস্ত্রিকে উপরে উঠতে দেখে। তাড়াতাড়ি সে টুলটা দু হাতে আঁকড়ে ধরল। মিস্ত্রি পাখার ব্লেড খুলতে খুলতে বলল, 'আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনি ছেড়ে দিন।"

"তবু যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়।"

সুধার ভয় হল, তাহলেই তো পুলিশ টানাহ্যাঁচড়া করবে। অবশ্য অ্যাকসিডেন্ট মানেই অনিচ্ছাকৃত, তাতে দোষ নেই। মিস্ত্রি পাখার ব্লেডগুলো খোলে আর সুধা সেগুলো নিয়ে মেঝেয় রাখে, তারপর সিলিং-এর আংটা থেকে হাঁড়িটা চাড় দিয়ে তুলে খুলল। কাঁধে রাখল, সিধে অবস্থায় উবু হয়ে বসল, একটা পা সাবধানে টুলের নিচে চেয়ারে রাখল, তারপর অন্য পা। মেঝেয় নামল টুক করে লাফিয়ে। সুধা সারাক্ষণ টু- আঁকড়ে রইল।

পাখার হাঁড়িটা দেখে সুধার মনে হল, ব্লেড সমেত যখন ঘোরে তখন বোঝা যায় না, কিন্তু এখন দেখাচ্ছে ঠিক সুধীনের মুন্ডু। দুটো চোখ একটু গোঁফ, টাক মাথা। শুধু যা টিকিটাই সুধীনের নেই। এটা ওরই কেনা, খোকা হবার দু'মাস পর। মিস্ত্রি স্ক্রুগুলো খুলে মুন্ডুর খুলিটা ফাঁক করল। বাসি রক্তের মত চিটচিটে কালো তেল, ভুষি ইত্যাদি। সুধীনের মাথার মধ্যেটাও এরকম কিনা—এই ধরনের একটা সন্দেহ সুধার মনে দেখা দেওয়ার উপক্রম করতে না করতেই মিস্ত্রি বলল, "এখানে সারানো যাবে না, নিয়ে যেতে হবে।"

"কেন!"

"কম্যুটেটারের মাইকা গেছে।" বলে মিস্ত্রি একটা জায়গা দেখাল সুধার যেটাকে দাঁতের পাটি মনে হল।

"কদিন লাগবে?"

"চার পাঁচ দিন।" মিস্ত্রি খুলিটাকে স্ক্রু আঁটতে আঁটতে বলল।

"এই গরমে অদ্দিন পাখা ছাড়া! তাহলেতো মরেই যাব।"

মিস্ত্রি হাসল, খুব গূঢ় ধরনের। শিশুরা আপন মনে যে ভাবে হাসে বা শিশুদের হাসি দেখে বয়স্করা। "হাতে এখন প্রচুর কাজ। পাঁচ দিনে হয় কিনা কে জানে।"

"কত লাগবে?"

"আঠারো টাকা।" বলল যেন হিসেব কষে, কিন্তু সুধার মনে হল, আগেই যেন ঠিক করে রেখেছিল। তবে পাখা হাতছাড়া করা চলবে না। লোকটা চোর-ছ্যাঁচড় কিনা কে জানে। মিস্ত্রি সেজে এ-রকম তো অনেকেই আসে। তাছাড়া আঠারো টাকার মত ব্যাপার, সুধীনকে না জানিয়ে কি করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

"উনি বরং আসুন, পরে জানাব।"

দু-দিক রেখে সুধা বলল। পাখার মুণ্ডুটা ঘরের একধারে সরিয়ে চেয়ারটা পাশের ঘরে রেখে মিস্ত্রি বেরিয়ে যাচ্ছে। সুধা সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। দরজাটা পার হয়েই মিস্ত্রি হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনাকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। বেশ মোটা হয়ে গেছেন। গলার জড়ুলটা দেখে চিনলাম, আপনি প্রফুল্লর বৌ।"

সুধার একটু সময় লাগল মাথাটা ঘুরে উঠতে। ঝাপসা হয়ে গেল দেয়াল, সিঁড়ি, এবং সামনের লোকটি। অস্ফুটে বলল, "আপনি কার কথা বলছেন? আপনি কে?"

"আমার নাম হরিশঙ্কর দাঁ। আপনার বিয়েতে আমি একজন সাক্ষী ছিলুম। এত দিন হয়ে গেল আমাকে অবশ্য চিনতে না পারারই কথা। কতক্ষণই বা দেখেছেন। আমি আর বলাই চন্দ সাক্ষী ছিলুম। আপনি ট্যাক্সি করে এলেন, চটপট সই করলুম আমরা। বাড়ি থেকে লুকিয়ে এসেছিলেন তাই তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতেই চলে গেলেন। আমার বৌ কাগজে মুড়ে সিঁদুর দিয়েছিল। মনে আছে, আপনার সিঁথির একটুখানি লাগিয়ে দিয়েছিলুম তাইতে আপনি খুব ভয় পেলেন!"

সুধা একদৃষ্টে হরিশঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে। চোখে যে অবিশ্বাসটুকু ছিল তা ঘুচে গেছে। কিন্তু এতদিন পর কীভাবে কোথা থেকে লোকটা হাজির হল! এটা যদি অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাছাড়া আর কি, তাহলে ওর আসাটা ইচ্ছাকৃত নয়। সুতরাং ওর কোনো দোষ নেই। এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সুধীনের মুণ্ডুর মত পাখাটা। কেন যে খারাপ হয়, কোম্পানীটাই জোচ্চোর। কিন্তু কি আশ্চর্য—দড়াম করে সুধা দরজাটা বন্ধ করে দিল—এতদিন পর ও চিনতে পারল আর আমি পারলাম না। লোকটা তাহলে মনে করে রেখে দিয়েছে, তার মানে মতলব আছে।

অস্থির হয়ে খুব পায়চারি করল সুধা ঘর, বারান্দা, দালান ঘুরে। শেষে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বুকটা ভার হয়ে আসছে। কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করল। খুলতেই সিলিং পাখার আংটা দেখল। জায়গাটা খালি-খালি লাগল। তাইতে ওর মনে পড়ল এই রকম খালি কিংবা আর একটু বেশিই হবে, লেগেছিল প্রফুল্লর মৃত্যুর খবর পেয়ে। তার আগে অবশ্য বিয়ের ব্যাপারটা বাড়িতে জানাজানি হয়ে যাওয়ায়, দোতলা থেকে একতলায় নামা বন্ধ হয়ে গেছল। খুব খুশি হয়েছিল বাড়ির সবাই। একে বেজাত, তায় চটকলের সামান্য কেরানী, ইউনিয়ন করে, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, মেসে থাকে, এমন ছেলের সঙ্গে বিয়েতে কে অখুশি না হয়! খোকা যদি মেয়ে হত, আর অমন একটা ছেলেকে যদি ঝোঁকের মাথায় বিয়ে করে বসত! এই পৃথিবীতে, ব্যাপারটাকে বিরাট এবং জোরালো করার জন্য সুধা ভাবল,—কোন বাপ-মা রাজী হবে? ধানবাদের কাছে জি টি রোডে প্রফুল্ল লরী চাপায় মারা গেল বিয়ের পনেরো কি ষোল দিন পরই। প্রফুল্ল টেঁকুর তুলত, অম্বল ছিল। মাকুন্দও ছিল। বেশ কচি-কচি একটা ভাব ছিল ওর মুখে। ছোট কাকা বলল, যে গেছে তার জন্য দুঃখ করতে হয় কর, আমরা বুঝতেই পারছি। পাঁচমাস ছ'মাস যত সময় চাস নে। কিন্তু কতবড় ভবিষ্যৎ তোর সামনে, বয়স তো মোটে বাইশ। একটা ভাল পাত্তর হাতে এসেছে। বিধবা হয়ে না থেকে বিয়ে করে ফেল। আমরা চারজন ছাড়া কেউ জানতেও পারবে না। চারজন মানে বাবা মা কাকা কাকী।

বাবা মারা গেছেন। তা হলে রইল তিনজন। হঠাৎ এই সাক্ষীটা এসে আবার চারজন হয়ে গেল। তাই বা কি করে হয়! সুধা বিরক্ত হয়ে উঠল, বলাই-চন্দ নামে একটা লোকের নাম করল। সেও তো জানে! তা হলে পাঁচজন। কোনদিন দরজি কিংবা ছাতাসারাইওলা কিংবা বাস-কন্ডাক্টার বলবে, আপনি মোটা হলেও রঙটা ময়লা হলেও গলার জড়ুলটা দেখে ঠিকই চিনেছি। আপনার বিয়েতে আমি সাক্ষী ছিলুম, চিনতে পারছেন না, আমি বলাই চন্দ! এই যে একটা চিহ্ন—শরীরের এত জায়গা থাকতে ভগবান কেন যে গলায় দেগে দিল।

সুধা গলায় হাত বুলোতে লাগল। জীবনের প্রথম চুমুটা এখানেই। প্রফুল্লই দিয়েছিল বেলুড়ে গঙ্গার ধারে বসে। এর কোনো সাক্ষী-টাক্ষি নিশ্চয় হাজির হয়ে বলবে না, আপনিও তো চুমু দিয়েছিলেন। বলা যায় না! কে ভেবেছিল এতদিন পর এই লোকটা হাজির হবে?

এটাও অ্যাকসিডেন্ট, অতএব-সুধা একটু অসুবিধা বোধ করল—কাউকেই তো দোষ দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই হরিশঙ্কর যদি সুধীনকে বলে দেয়, মশাই আপনার বৌয়ের আগে একটা বিয়ে হয়েছিল, তা জানেন কি? শোনামাত্রই রগচটা সুধীন হাতের কাছে যা পাবে দমাস করে কষিয়ে দেবে। যদি হরিশঙ্করকে কষায় তা হলে ও মরে যাবে।

সুধা মৃত হরিশঙ্করকে দেখে ভয় পেল। এর জন্য সুধীনের নিশ্চয় ফাঁসি হবে। তবে সুধীন এম এ পাস, একটা ব্যাঙ্কের সাড়ে ন'শো টাকার দায়িত্ববান কর্মচারী। বি এস-সি পড়া ছেলের বাবা, বৌয়ের নামে সল্ট লেকে তিন কাঠা জমি কিনেছে, সে কি এমন হঠকারিতা করবে! নিশ্চয় প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। কাতর হয়ে পড়বে। একটা আঘাত তো বটে! শয্যাশায়ীও হতে পারে। সুধার মনে পড়ল, পাঁচ

দিন কি চার দিন সে শুয়েছিল। চোখ দিয়ে খালি জল ঝরত। সুধীন যদি ওইভাবে কাঁদতে শুরু করে। আর একটা সম্ভাবনার কথাও ভাবা যায়। তখন মরতে ইচ্ছে করেছিল। এক্ষেত্রে সুধীনের কাছে এই খবরটা স্ত্রীর-মৃত্যু-সংবাদ তুল্যই। সুতরাং সে আত্মহত্যা করলেও করতে পারে। তবে যতদূর মনে হয়, সুধা আশা করল, তা করবে না। তা হলে কি করতে পারে? অর্থাৎ এই কথাটা শোনার পর?

ভেবে ভেবে সুধা গোটা দুপুরটাই নাজেহাল হয়ে গেল।

শোনামাত্র সুধীন চীৎকার করে উঠল।

"পাঁচ দিন গরমে পচতে হবে? আঠারো টাকা গচ্চা দিতে হবে যখন, দিয়ে দিলেই পারতে। কালকে দেওয়া মানে দু' দিন গরমে পচা! সাধে কি আর বলি—" পাশের ঘরে খোকা আছে তাই থেমে গেল।

"লোকটা খাঁটি কি না জেনেই দিয়ে দেব? যদি ঠগ-জোচ্চোর হয়!" এই বলেই সুধার মনে হল, সাক্ষী ছিলুম বললেই তো হয় না, প্রমাণ দিতে হবে। সুধীন যখন বলবে, মুখের কথায় এত বড় একটা ব্যাপার কি মেনে নেওয়া যায়—হরিশঙ্কর তখন কিভাবে প্রমাণ করবে? সেই বলাই চন্দকে ডেকে আনবে? ও রকম সাক্ষী তো ভাড়া করেও আনা যায়। আসলে অকাট্য প্রণাণ চাই।

"খোকাকে বলে দিও মিস্ত্রিকে বলে আসে পাখাটা নিয়ে যাবার জন্য। আর, একটা পাখা যেন ভাড়া করে আনে।" এই বলে সুধীন বাসি খবরের কাগজ পড়তে শুরু করল। এই তো কত সহজেই ভাড়া করা যায়, সুধা ভাবল। মানুষ ভাড়া করা কি এর থেকেও শক্ত।

রাত্রে ঘুম এল না। সুধা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কাল পূর্ণিমা গেছে! খুব জ্যোৎস্না হয়েচে। হাতটা সে বাড়িয়ে দিল। বেলুড় থেকে নৌকোয় পার হওয়ার সময় এই রকম জ্যোৎস্না ছিল। হাতটা এগিয়ে ধরে প্রফুল্ল বলেছিল, ঠিক যেন বৃষ্টির মত হাতে পড়ছে।

কিছুক্ষণ হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে বিরক্ত হয়ে সুধা টেনে নিল। বৃষ্টি না আর কিছু, হলে তো বেঁচে যাই। তারপর ঘরে এসে গা আদুড় করে সুধীনের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন দুপুরে হরিশঙ্কর একটা পুরনো কালো পাখা নিয়ে এল। হাঁড়িটা মস্ত বড়। তাতে গোটা দশ-বারো গর্ত। সুধা মিষ্টি গলায় ওকে ভেতরে আসতে বলল। খুব ঘেমে গেছে দেখে আরো মিষ্টি করে বলল, 'এত ভারী একটা জিনিস বয়ে এনেছেন, আগে জিরিয়ে নিন।"

তাইতে নিরাসক্ত পেশাদারী গলায় হরিশঙ্কর বলল, "এ সব অভ্যেস আছে।" এবং তাইতে সুধার মনে হল, লোকটা সুবিধের নয়।

হরিশঙ্কর পাশের ঘর থেকে চেয়ার আনল। টুলটা তার উপর রেখে কালো পাখাটা কাঁধে নিয়ে উঠতেই কালকের মত সুধা আঁকড়ে রইল টুল।

"আপনি খুব এক্সপার্ট, কতদিন এ কাজ করছেন?" সুধা আলাপ জমাবার চেষ্টা শুরু করল।

"আনেক দিন।"

"আগে তো কারখানায় কাজ করতেন।"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে!"

ঘাড় নিচু করে হরিশঙ্কর তাকাল। গায়ে ব্লাউজ আছে, তবুও কেমন যেন করে উঠল সুধার সর্বাঙ্গ।

"আপনি জানেন না?" হরিশঙ্কর নিথর গলায় প্রশ্ন করল।

"কি?"

"প্রফুল্লের জন্য আমরা ছাঁটাই হই।"

"না তো, কেন?"

ব্লেডগুলোর দিকে আঙুল দেখাল হরিশঙ্কর। সুধা এক-এক করে সেগুলো ওর হাতে তুলে দেবার সময় আবার বলল, "কেন?"

"আমাদের স্ট্রাইকটা ভেঙে গেল ওর জন্যই। কোম্পানী ওকে ভাল চাকরি দিয়ে বদলী করে দেবে বলেছিল। ও টোপ গিলল। আমি, বলাই আরও দুজন ছাঁটাই হয়ে গেলুম।" হরিশঙ্করের ভঙ্গি বা স্বরে রাগ নেই। ভগ্নিপতির ইলেকট্রিকের দোকান ছিল, ঢুকলুম। তারপর নিজে এক মুসলমানের সঙ্গে

দোকান করলুম। আড়াই বছর আগে যে দাঙ্গা হল তাতে দোকানটা লুট হয়ে গেল। সেই থেকে এই দোকানে কাজ করছি।"

"আর সেই ভদ্রলোক!" সুধা বলতে যাচ্ছিল "সেই সাক্ষী"। শেষ মুহূর্তে 'ভদ্রলোক' বেরিয়ে এল।

"বলাই? সে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।"

"অ্যাঁ।" সুধা বজ্রাহত হল পুলকে, "মরে গেছে?"

টুল থেকে নেমে এল হরিশঙ্কর। সুইচ টিপল। পাখা ঘুরতে লাগল।

"কে চাকরি দেবে বলুন। বড় সংসার ছিল। বহু চেষ্টা করেও কিছু পারল না। একদিন বলল 'হরিদা, কারুর উপর আর আমার বিশ্বাস নেই। সবাইকে ঘেন্না করতে ইচ্ছা করে। আমি তবে বাঁচব কি করে।' দু দিন পর শুনলুম ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে।"

সুধা ধীরে ধীরে খাটে বসল। তা হলে পাঁচ নয়, চারজনই রয়েছে। একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়েই তার মনে হল বলাই লোকটা বোধহয় সৎ। বিশ্বাস, ঘেন্না এ সব নিয়ে মাথা ঘামানো কি আর বাজে লোকের কর্ম! এই লোকটা বাজে তাই গলায় দড়ি দেয়নি। দিলে চার নয় তিনজন হয়ে যেত। মা, কাকা, কাকী। মা বুড়ি হয়েছে শিগগীরই মারা যাবে, তাহলে থাকবে দুই। ওরা দুজনই তো বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। সুতরাং জীবনে মুখ খুলবে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে ওরাও মৃত। শুধু জ্যান্ত রয়েছে এই হরিশঙ্করটা।

"প্রফুল্ল ছেলে খারাপ ছিল না।" হরিশঙ্কর সান্ত্বনা দিচ্ছে কিনা সুধা বুঝে উঠতে পারল না। লোকটার হাবভাব এখন মোটেই মিস্ত্রির মত নয়। এটা তার পছন্দ হচ্ছে না।

"ওর পতন ঘটে আপনার সঙ্গে মেলামেশা হয়ে। অন্তত আমাদের তো তাই ধারণা। বিয়ে করে বৌকে সুখে রাখবে বোধহয় সেই জন্যই—"

"না না, আমি তো ও রকম কিছু চাইনি। আমি তো বলেছিলাম তুমি যেভাবে রাখবে সেই ভাবেই থাকব। সুখে রাখবে এমন ছেলে কি তখন আমি পেতাম না? এই তো নিজের চোখেই এখন দেখুন না। তবুও তো প্রফুল্লকে বিয়ে করেছিলাম।" সুধা কিছুটা ব্যস্ত হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করল। লোকটা যেন তাকেই দায়ী করতে চাইছে। এটা খুবই অন্যায়। আসলে প্রফুল্লকে তো আর পাচ্ছে না তাই দোষটা এখন আমার ঘাড়ে চাপাতে চায়। সুধা দুঃখও বোধ করল। কতখানি ত্যাগ সে করেছিল, লোকটা তা নিয়ে একটা কথাও বলল না! সুধা রেগেও উঠল। কৃতকর্মের জন্য প্রফুল্লর এই মহৎ দিকটা একদমই দেখছে না লোকটা। দেখিয়ে দেওয়া উচিত বিবেচনায় সুধা বলল, "কত অন্যায় কাজ করে কত লোক বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রফুল্লও তো আত্মহত্যা না করে থাকতে পারত।"

"আত্মহত্যা?" অদ্ভুতভাবে হরিশঙ্কর তাকাল ওর দিকে। স্বরে চিড় ধরিয়ে বলল, "কে বলল আপনাকে?"

"কে আবার বলবে। শুধু প্রফুল্লরই পতন হয়েছিল আর আপনাদের কারুর হয়নি কতটা সত্যি যে। অকাট্য কোনো প্রমাণ তো আর এখন পাওয়া যাবে না।"

"পাখাটা তাহলে নিয়ে যাচ্ছি।"

হঠাৎ হরিশঙ্কর আলোচনায় ছেদ টেনে পেশাদারী গলায় বলে উঠল, "দিন পাঁচেক পরে পাবেন।"

দরজার কাছে এসে আগের দিনের মত ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনার বিয়ের অকাট্য প্রমাণ ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা কিন্তু আমার কাছে রয়ে গেছে। প্রফুল্ল আমার কাছে রেখেছিল আর ফেরত দেওয়া হয়নি।"

সুধা দাঁড়িয়ে রইল আর পাখাটাকে মেরামত করার জন্য নিয়ে চলে গেল হরিশঙ্কর। অন্যের বিয়ের অকাট্য প্রমাণটা আজও রেখে দিয়েছে। কেন? নিশ্চয়ই মতলব আছে। সুধা এই চিন্তায় সারা দুপুর-বিকেল তোলপাড় হয়ে গেল।

খুশি হল সুধীন। এই পাখাটায় হাওয়া যেন বেশিই লাগছে। চটপট সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুধার ঘুম এল না। না আসারই কথা, কেননা বুকে পাষাণভার চেপে বসেছে। সার্টিফিকেটটা খুবই সর্বনেশে হয়ে উঠতে পারে। এই বয়সে যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে—সুধার মনে হল, পাখাটা সুধীনের

ঠিক পেটের উপর পড়বে। বেশ দুলছে মুন্ডু নাড়িয়ে। গর্তগুলো দিয়ে বিদ্যুৎ চিড়িক দিচ্ছে। যদি খুলে পড়ে। নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে। অ্যাকসিডেন্টই বলা হবে, কিন্তু হরিশঙ্করকে কি পুলিশে ধরবে না? যদি ধরে তাহলে বাঁচা যায়। তাহলে অবশ্য টেনে সংসার চালাতে হবে। একশো তিরিশ টাকা বাড়িভাড়া আর দেওয়া চলবে না। অফিস-ইনসিওরেন্স মিলিয়ে হাজার পঞ্চাশেক, সেদিনই তো হিসেব করে সুধীন কত যেন বলল, পাওয়া যাবে। খোকা না দাঁড়ানো পর্যন্ত, ওইতেই চলে যাবে। তা ছাড়া জমিটাও আছে। খোকা চাকরি হলে মেয়ে দেখতে হবে। ভাল মেয়ে পাওয়াও মুশকিল।

এই সময় বিড়বিড় করে সুধীন পাশ ফিরল। সুধা আন্দাজে হিসেব করে দেখল পাখাটা যদি পড়ে ঠিক পেটে নয়, পিঠ ঘেঁষে পড়বে। তাতে মারাত্মক কিছু নাও ঘটতে পারে। এতে সে খুব আশ্বস্ত বোধ করল। গ্লানিও হল। সুধীন একটু রগচটা, খিটখিটে, কিন্তু মানুষ ভাল। এত বছর বিয়ে হলে কোন স্বামী-স্ত্রীর না ঝগড়াঝাটি হয়। সুধা হাত বাড়িয়ে সুধীনের পিঠে বোলাতে লাগল। একটা-দুটো ঘামাচিও মেরে দিল। এখন তার মায়া হচ্ছে।

দুপুরে দরজায় তালা দিয়ে সুধা বেরোল। বাস স্টপের কাছেই ইলেকট্রিকের দোকান। রাস্তা থেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাউন্টারের পিছনে বসে লাটাইয়ের মত একটা জিনিসে হরিশঙ্কর তার জড়াচ্ছিল। সুধা বলল, "পাখাটা একটু তাড়াতাড়ি করে দিন।'

"বলেছি তো দিন পাঁচেক লাগবে।" রুক্ষ স্বরে হরিশঙ্কর বলল। হঠাৎ পিছন থেকে সুধার গলা শুনে চমকে উঠেছিল। সেই অপ্রতিভতার জন্য যে রেগেছে সুধা তা বুঝতে পেরে, কাকুতি করে বলল, "ইচ্ছে করলেই ... তাড়াতাড়ি পারেন। যেটা লাগিয়ে দিয়েছেন," স্বরটা আদুরি করে, "এমন বিচ্ছিরি দেখতে আর এমন দুলছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে যে ভয় হয় বুঝি খুলে পড়বে। উনি আবার ঠিক পাখার নিচেই শোন।"

'ও সব পাখা একটু দোলেই।' হরিশঙ্করের নিস্পৃহ ভঙ্গি লক্ষ্য করে সুধা আহত হল। ভাবল, একটু পাষাণভার চাপিয়ে দিই।

"ধরুন, যদি খুলেই পড়ে, তাহলে কাজে অবহেলার জন্য তো আপনাকেই পুলিশে ধরবে।"

'আমাকে?" হরিশঙ্কর ঘাড় বেঁকিয়ে তীব্র চোখে তাকাল। "পুলিশ আমার কি করবে? তা ছাড়া—" সিনেমার খল চরিত্রাভিনেতার মত ঠোঁট মুচড়ে, চোখ সরু করে, "পাখাটা যে আপনিই আলগা করে রাখেননি তার প্রমাণ কি?"

যৎপরোনাস্তি চমকে উঠে সুধা বলল, "কেন?'

'তাতে তো আপনারই লাভ।'

কিছুক্ষণ দুজনে তাকিয়ে রইল।

"প্রমাণ?"

"সার্টিফিকেট।"

'ওটা আপনার কাছে কেন? যার জিনিস তাকে ফেরত দেননি কেন?"

"সে তো মরে গেছে।"

"আমি তো বেঁচে আছি।"

আপনি তো এখন আর প্রফুল্লর বৌ নন।'

"হ্যাঁ, আমি ওর বৌ, আমিই।

'প্রমাণ?"

"সার্টিফিকেট।

'ওটা কি আপনি ফেরত চান?'

নিশ্চয়। আমার জিনিস আমি রাখব না? আপনি কেন রেখেছেন? নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।"

ওরা দুজন চাপা হিংস্রস্বরে কথা বলে যাচ্ছে যেহেতু দোকানটা রাস্তার উপর পথচারীরা কয়েক হাত দূরেই। হরিশঙ্কর মুঠ-করা হাতটা কাউন্টারে আঘাত করে বলল, "কি মতলব? যদি তাই ই থাকত তাহলে ওটা ভাঙিয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা কি আদায় করতে পারতাম না?"

হরিশঙ্কর অতঃপর অট্টহাসি করল না অর্থাৎ সে অভিনয় করছে না। সুধার ক্রোধ ভেস্তে গেল এই শুনে। এ রকম হয় বলেই সে শুনেছে। যদি টাকা চেয়ে বসে, তাহলে? সোজা পা জড়িয়ে ধরব। নিশ্চয় দয়া হবে। বলব আমি অবুঝ, না ভেবেই বিয়েটা করেছিলাম। আসলে প্রফুল্লই ফুসলেছিল। খবরের কাগজে মামলার কবরে দেখেন না?

"তা ছাড়া আর যে মতলব থাকতে পারে তা আপনার মত থলথলে মুটকি আধবুড়িকে দেখে মোটেই ইচ্ছে হয় না।"

সুধা হাঁফ ছাড়ল। বয়স হওয়ার এই এক সুবিধা। কিন্তু সুধীনকে যদি প্রমাণটা দেখায়! এখনো তো অনেক দিন বাঁচব। সুধার মনে হল, অনেক দিন বাঁচার লোভ আগে হয়নি, এখন হচ্ছে। ওই সার্টিফিকেটটা পেলেই আয়ু বেড়ে যাবে। কিন্তু পাওয়া যায় কি করে! হরিশঙ্কর একদৃষ্টে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। কিছু একটা গভীর হয়ে ভাবছে। সুধা গলা খাঁকারি দিল। হরিশঙ্কর নিথরভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলল, "আমি জানি আপনি এখন কি ভাবছেন। ভাবছেন, লোকটা মরে গেলেই আপদ চোকে।"

"সে কি, মোটেই তা ভাবিনি।" সুধা ক্ষুব্ধ তো বটেই, বিস্ময়ও বোধ করল।

"ভাবছেন, যদি না মরে তাহলে খুন করব। এই রকমই মনে হয়। আপনি অস্বীকার করবেন করুন। কিন্তু প্রফুল্লর জন্য আমাদের অনেকের সর্বনাশ হয়েছে, তাদের পরিবার ছারখার হয়েছে, এক-আধজন তো নয়। ওই কাগজটা চাইছেন, প্রফুল্লর বৌ এই দাবিতে, তাই না?"

"না, না, আমার স্বামী প্রফুল্ল নয়। এই দেখুন, আপনি খোকার বাবার কথাটা ভুলেই যাচ্ছেন। আসলে ওটা রেখে আপনার কি লাভ। দিয়ে দিলে একটি মেয়েব--" শুধরে নিয়ে সুধা একই স্বরে, "একটি মায়ের যদি উপকার হয়, তাহলে দিয়ে দেওয়াই উচিত।"

কথাগুলো হরিশঙ্কর শুনল কিনা কে জানে, তবে অন্যমনস্কের মত বলল, "আপনি এখন যান। পাখাটা সারানো হলেই দিয়ে আসব।"

সুধা দু-চারবার কথা বলে জবাব না পেয়ে বাড়ি ফিরে এল রাগ নিয়ে। লোকটা কীভাবে বলতে পারল ওকে খুন করব ভাবছি! তাই কি সম্ভব?

বিছানায় শুয়ে অনেক রকম করে ভাবল তার পক্ষে হরিশঙ্করকে খুন করা আদৌ সম্ভব কি না। যেদিন পাখা লাগাতে আসবে এক কাপ চা দেবো বিষ মিশিয়ে। গন্ধ পাবে না এমন বিষ। তবে বিষটা যোগাড় করতে হবে। চোটকাকার বন্ধুর এক ডাক্তার ছেলে আছে। ভাল ভাল বিষ নিশ্চয় তার কাছে থাকে। কিন্তু চাইলেই তো সন্দেহ করবে। আর হয় গলা টিপে মারা। তা পারা যাবে না, ওর গায়ের জোর বেশিই হবে। গঙ্গার ধারে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যদি ঠেলে দেওয়া যায়? সাঁতার জানে কিনা কে জানে। আর এক হয় দরজা খুলে পাশে দাঁড়াব। যেই ঢুকবে কয়লা ভাঙা লোহাটা দিয়ে মাথায় কষাব। তিন চার ঘা দিলেই মরবে। কিন্তু লাশটা কিভাবে পাচার করা যায়!

সারা দুপুর সুধা ভাবল। রাতে এবং পরদিন দুপুরেও ভাবল। প্রায় বারো-তেরোটি উপায় পেল খুন করার। গুণ্ডা দিয়ে বোমা মারার কথাও ভেবেছিল। কিন্তু কোনোটিই তার পক্ষে করা সম্ভব হবে না। বুঝে খুব বিমর্ষ হয়ে বিকেলেও বিছানা থেকে উঠল না। বন্ধুর মাকে বলল, শরীর খারাপ। শুনে বন্ধুর মা মুচকি হাসল।

সন্ধ্যার পর সুধীন বাড়ি ফিরল মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায়। জামায় রক্তের ছিটে। দেখামাত্রই সুধা হাউমাউ করে উঠল, 'ও মা কে মারল, কি করেছিলে?"

"বাস থেকে পড়ে গেছি।" সুধীন পাত্তা দিল না সুধার উদ্বেগকে।

"কি করে পড়লে, নামতে গিয়ে না ওঠার সময়? যদি বাসের তলায় যেতে!" বলেই সুধার মনে হল, তাহলে হরিশঙ্করের জারিজুরি আর চলত না।

"ওই এক কথা। পড়ে গেলেই যেন বাসের তলায় যেতে হবে। কেন, গেলে কি তোমার সুবিধে হয়?"

এই শুনে সুধা বিনিয়ে কাঁদতে শুরু করল। বিরক্ত হয়ে সুধীন একটু পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে

গেল। রাতে বিছানায় সুধা অভিযুক্ত করল সুধীনকে, "তখন ওকথা বললে কেন। তুমি মরলে আমার কি সুবিধে হবে শুনি?"

সুধীন নিরুত্তর রইল। নাড়া দিয়ে সুধা পুনরাবৃত্তি করতেই সুধীন উত্তেজিত হয়ে বলল, "সব আগে ওই কথাটাই বা তোমার মনে এল কেন যে আমি বাসের তলায় যেতুম। নিশ্চয় মনে মনে তাই ভাবছিলে।"

শুনে সুধার মাথাটা গরম হতে শুরু করল। আমি কি ভাবছি তাই নিয়ে সকলেই ভাবছে দেখছি। কেন, এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি, তা কি হরিশঙ্কর বা সুধীন মনে করে না? এতই কি আমি খারাপ।

"আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?"

"কি আবার, কিছুই না।"

"ভাল-মন্দ কিছুই না?"

"না।"

"আমি মরে গেলে তোমার দুঃখ হবে না?"

সুধীন মিনিট খানেক চুপ থেকে বলল, "কি জানি।"

সুধার মনে হল, সুধীন সত্যি কথাই বলছে। তবে খুব কম সময় নিল এতবড় একটা কথার জবাব দিতে।

"তোমার কি মনে হয়, আমাকে বিয়ে করে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে? ভেবে উত্তর দাও।"

"ভাবাভাবির আর কি আছে।" সুধীন ক্লান্ত-স্বরে বলল, "যেমন বরাবর ছিলুম তেমনই আছি।"

"যদি বলি তোমাকে ভালবাসি না, শুনে কষ্ট হবে না?"

জবাব না দিয়ে সুধীন পাশ ফিরল।

"যদি বলি, কোনদিনই বাসিনি।"

জবাব পেল না।

"যদি বলি, অন্য একজনকে ভালবাসতুম।"

"তাকেই বিয়ে করলে না কেন, তাহলে একটু ঘুমোতে পারতুম এখন।" সুধীন পাশ বালিশটাকে আরো জোরে আঁকড়ে ঘুমের মহড়া দিল। অপ্রতিভ হয়ে সুধা সরে এল নিজের জায়গায়। আজ দেরিতে চাঁদ উঠেছে। মেঝেয় অল্প একটু জ্যোৎস্না পড়ে। সুধার ইচ্ছা হল হাত বাড়াতে, বাড়িয়ে দিল। তারপর অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে যতবার মনে পড়ল রাতের কথাবার্তা, সুধার মন ভার হয়ে উঠল, অভিমান হল। ভাল করে কথা বলল না কারুর সঙ্গে। অবশ্য তার জন্য কেউই ব্যস্ত হল না বা কারণও জিজ্ঞাসা করল না। শেষে সুধা ভাবল, কি দরকার ছিল এই বয়সে ওইসব কথা তোলার। দিব্যি তো চলে যাচ্ছে। তারপর মনে পড়ল, চলার উপায় নেই হরিশঙ্করের জন্য। অকাট্য প্রমাণ নিয়ে ও হাজির হয়েছে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুধা উপায় ভাবতে ভাবতে ঠিক করল একবার হরিশঙ্করের বাড়িতে যাবে। দরকার হলে কেঁদে ওর বৌয়ের পা জড়িয়ে ধরবে। সিঁদুর পাঠিয়েছিল যখন নিশ্চয় ভাল লোক। চাপ দিয়ে সার্টিফিকেটটা আদায় করিয়ে দেবে, মেয়েমানুষ হয়ে কি সে আর একজনের বিপদে, সুধা সংশোধন করে ভাবল, দুঃখ শব্দটা ব্যবহার করতে হবে, ওতে মনটা অনেক গলিয়ে দেয়। একটি মেয়ের দুঃখে বা একটি মায়ের দুঃখে কি আর এক মা পাশে এসে দাঁড়াবে না!

দুপুরে সে ইলেকট্রিকের দোকানে গেল। হরিশঙ্কর ~রী ডাক পেয়ে বেরিয়েছে, এখুনি আসবে। একটা অল্পবয়সী ছেলে দোকান আগলাচ্ছে। তার কাছ থেকে জানল হরিশঙ্করের বাড়ি কাছেই মিনিট পাঁচেকের পথ।

ঠিকানা এবং নির্দেশ নিয়ে সুধা রওনা হল। মিনিট দুয়েক পর পৌঁছল খাল ধারে। এইবার ডানদিক। একটুখানি গিয়েই কাঠের ব্রিজ। এ পারে এসে দুধারে শুধু কাঠের গোলা আর কাঁচা কাঠের চড়া গন্ধ। তাতে মাথা ঝিমঝিম করে, নেশার মত লাগে। দুটো গোলার ফাঁকে একটা সরু রাস্তা আছে, তাই দিয়ে কিছুটা এগোলেই দোতলা মাঠকোঠা। কিন্তু সরু রাস্তাটাই সুধা বার করতে পারছে না। ওকে খোঁজাখুঁজি

করতে দেখে অনেকেই তাকাচ্ছে, তাতে অস্বস্তি হয়ে লাগল। শেষে ঠিক করল একজনকে জিজ্ঞাসা করা যাক। জীবনের এতবড় একটা ব্যাপার লজ্জা করলে চলে না।

ছুতোর শ্রেণীর তিনজনকে সে জিজ্ঞাসা করল। কেউ বলতে পারল না, কারণ তারা এই অঞ্চলের লোক নয়। তখন ভাবল, বিড়ির দোকানদার নিশ্চয় জানে। মাঝবয়সী লোকটা বিড়ি বাঁধছিল দুলে দুলে। লুঙ্গিটা তাড়াতাড়ি হাঁটুর নিচে নামিয়ে বলল, "কালো, রোগাপানা, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি তো!"

"হ্যাঁ, ওপারে দোকানে কাজ করে।"

"বুঝেছি, এই গলিটা দিয়েই ওর বাড়ি। কিন্তু ওকে কি দরকার আপনার?"

সুধা বিরক্ত হল, তা দিয়ে তোমার কি দরকার। এই লোকগুলোর কৌতূহল বড় বেশিই হয়।

"ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।"

বিড়িওলা তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে থাকল। সুধা বলল, সম্ভ্রান্ত কেউ যে এমন জায়গায় আসতে পারে তা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না।

"কিন্তু ওর বৌতো বেরিয়ে গেছে।"

"ও কখন আসবে?"

"বেরিয়ে গেছে মানে বছরখানেক আগে এখানকারই এক ছোকরার সঙ্গে পালিয়ে গেছে।"

সুধা বিমূঢ় হয়ে বলল, "মিস্ত্রির বৌয়ের বয়স তো কমপক্ষে পঞ্চাশ হবেই।"

"কি যে বলেন ওর তো দ্বিতীয়পক্ষের বৌ। জোর পাঁচিশ বয়স।"

"প্রথম বৌ কি মারা গেছল?"

"হ্যাঁ, শুনেছি গলায় দড়ি দিয়ে।"

ফিরে চলল সুধা। কাঠের ব্রিজে উঠেই দেখল হন্তদন্ত হয়ে হরিশঙ্কর আসছে।

"আমার বাড়িতে গেছলেন, কেন কি দরকার?"

উত্তেজিত তো বটেই চোখে ভয়ের ছাপও।

"আপনার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব। বাড়িটা ঠিক চিনতে পারছি না।"

"কি দরকার অ্যাঁ, তার খুব অসুখ, দেখাটেখা হবে না। আর তার কাছে গিয়েও খুব সুবিধে হবে না বলে রাখছি।" হরিশঙ্কর রীতিমতো শাসালো।

"কেন সুবিধে হবে না কেন? আপনি ভেবেছেন আমায় খুব জাঁতাকলে ফেলেছেন, আর আমি বুঝি আপনাকে ফেলতে পারিনা?" থেমে গেল সুধা, কারণ একটা লোক ওদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। হরিশঙ্কর বিস্ময়াহত! লোকটা কণ্ঠস্বরের পাল্লা ছাড়াতেই সুধা শুরু করল, "আপনার বৌকে গিয়ে বলব আপনি নাম ভাঁড়িয়ে আমায় বিয়ে করেছিলেন। অল্প বয়স ছিল, অতশত বুঝতে পারিনি। এখন, এতদিন পরে সেই দাবিতে আপনি আমায় ফেরত চাইছেন।"

সুধা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল, লোকটা নিশ্চয় বলবে যান বলুন গিয়ে। আমার বৌ নেই তো কাকে বলবেন!

খুবই আশ্বস্ত দেখাল হরিশঙ্করকে।

"মিথ্যে কথা, কেউ বিশ্বাসই করবে না।"

"প্রমাণ আছে, অকাট্য প্রমাণ। আপনার কাছেই সেই বিয়ে সার্টিফিকেট রয়েছে। নিজের না হলে কেউ কি ওটা রেখে দেয়?"

"কিন্তু ওতে প্রফুল্লর নাম লেখা!"

"আপনি তো নাম ভাঁড়িয়েছিলেন, প্রমাণ করতে পারবেন আপনি নাম ভাঁড়াননি? আমি ছোট কাকাকে সাক্ষী মানব।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হরিশঙ্কর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সুধা ভাবল, এইবার নিশ্চয় বুক চিতিয়ে বলবে, কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমার বৌ মরে গেছে, আবার বিয়ে করেছিলুম সে বৌ পালিয়ে গেছে। কাকে বলবেন ওসব কথা?

কিন্তু ক্রমশ কুঁজো হয়ে গেল হরিশঙ্কর। অবশেষে ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়াতে হল। "এসব কথা মিথ্যে হলেও, ওকে বলবেন না, খুব আঘাত পাবে। বড় ভাল মানুষ। হয়তো গলায় দড়ি দিয়ে বসবে। আমার তো আর কেউ নেই ও ছাড়া।"

সুধা আর কথা বলার দরকার বোধ করল না। বাড়ি ফেরার সময় খুব হাল্কা লাগল নিজেকে। মানুষ যে কতরকম মনের বাতিক পুষে রাখে আর তাইতেই কিভাবে আটকা পড়ে। সুখী হতে হলে এসব বাতিক থাকা উচিত নয়—সুধা মনে মনে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল। অতঃপর, পাখি হয়ে এখন আকাশে উড়তে পাবি, এমন কথাও সে ভেবে ফেলল।

দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বয়ম্বর সভা

তারপর অখিল শুরু করল, 'তোদের মতো অবিশ্যি নয়। তবু ঘটনাটা ভোলা গেল না। আমাদের বাড়ির রাস্তায় একটা শিবমন্দির পড়ত। মন্দিরটার চাতালে দুধ আর বেলপাতার বেশ পুজো পুজো গন্ধ ছিল। চরণামৃত খেতে আমার খুব ভালো লাগত। যাবার সময় আর ফেরার পথে নিঘঘাৎ একটা পেন্নাম ঠুকে যেতাম। সেদিন চাতাল থেকে নেমেই দেখি একটা আমার থেকে ছোট-ছেলে অন্ধকারে রাস্তায় একটুখানি জায়গায় ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছে আর হেঁচকি তুলে কাঁদছে। ছেলেটার পয়সা হারিয়ে গেছে। আমি বললাম, দাঁড়া খুঁজে দিচ্ছি। কিন্তু পয়সাটা নজরে পড়বার আগের মুহূর্তেও জানতাম না, ওটা মেরে দেব। নিচু হয়ে তুলতেই ছেলেটা খুশি হয়ে চাইল। তারপর পয়সাটা মুঠো বেঁধে হাঁটতে শুরু করতেই ছেলেটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে দৌড়ে এসে আমার জামার পেছনটা ধরল। আমি তখন ওর গালে কটা চড় মেরে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথ ধরলুম। তার পরের দিন টিফিনের সময় সেই পয়সা দিয়ে আমসত্ত্ব কিনে খাইয়েছিলুম।"

তিনজন খানিক অন্যমনস্কের মতো তিনটে গল্পই আর একবার ভেবে নিয়ে যার যার পাপের গুরুত্ব অনুভব করার চেষ্টা করল। সুধাংশু উঠে বসতেই সামনেই দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারটা চোখে পড়ল। বিরক্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা বেশ, কার কি রকম পুণ্য শুনি'?

বিনয় চিবুকের নিচে একটা ব্রণ খুঁটতে খুঁটতে বলল, 'কই, তেমন তো কিছু মনে পড়ে না। ধরো, ভিক্ষে দেওয়া বা অসুখে একটু—না, সেবা-টেবাও বিশেষ করিনি। আসলে সুযোগ পেলাম কই'।

সুধাংশু চারমিনারে শেষ টানটা মেরে খুক খুক করে কেশে বলল, 'ধুৎ পাঁচু। জিভেও মর্চে পড়ে গেছে, কোনো টেস্ট নেই'।

অখিল বলল, 'চালাকি চলবে না, বলো'।

সুধাংশু উদাসীন ভাবে শুরু করল, 'সেদিন দুপুরবেলা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে ট্যাক্সি করে যাচ্ছিলুম, দূর থেকে দেখি এক বুড়ো, পুরো ঘিয়ে ভাজা চেহারা, হাতে একটা লাঠি, সামনে এলোমেলো ঠুকতে ঠুকতে ফুটপাত ধরে নামছে। বুঝলাম অন্ধ, রাস্তা পার হবে। আমি হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে দৌড়ে তার হাত ধরে ওপারে পৌঁছে দিলুম। আশ্চর্য যে বুড়োর থেকে তার লাঠিটা বেশি চোখ টানে। রুপোর বাঁধানো বাট আর হরিণের শিঙের মতো বাঁকা বাঁকা। গায়ে সূর্যের আলো পিছলে যাচ্ছিল। লোকটা হাত তুলে আমায় সময়োপযোগী কথাবার্তা বলল। দেখলাম হাতটা অবিকল না ফোলানো বেলুন। আর তাতে নীল উল্কি দিয়ে কি যেন লেখা। আমার খুব ইচ্ছে হল চামড়াটা টান করে লেখাটুকু পড়ি। খানিকটা প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল বলতে পারো। কিন্তু প্রাচীন মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে

কৌতূহল হঠাৎ শ্রদ্ধায় পরিণত হতে দেখেছ? বুড়োর সামনে আমার সেই দশা হল। কেন, তা আজও জানি না। দৌড়ে ফিরে এলুম।'

অখিল বলল, 'আমি একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরছিলাম। মনুমেণ্টের তলায় দেখি ফ্ল্যাগ-ট্যাগ উড়িয়ে মিটিং হচ্ছে। গুটি গুটি গিয়ে দাঁড়ালাম। এ পাশে দরজার সামনে মাইকের ডায়নামোটা ভটভট করে চলছিল। একটা ঠেলাগাড়ি পাশে কাত করে রেখে দিয়েছে যাতে মানুষজন গিয়ে না পড়ে। ওদিকে সিঁড়ির তলায় তেরপল বিছিয়ে বই-টই নিয়ে দোকান বসেছে। আর এধার ঘেঁষে ফুচকা, আলুকাবলি, ঝালমুড়ি, চা, পান। আমি এক আনার ফুচকা খেয়ে সবে রোমালে মুখ মুছেছি, এমন সময় ঝনাৎ করে বাক্স নেড়ে সামনে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। একটি খুব কুচ্ছিত, আর একজন—চলে। ফুচকাওয়ালার বাকি তিনজন খদ্দের দ্বিতীয় জনার বাক্সে দুটো-একটা পয়সা দিল। আমি তখন বাধ্য হয়ে প্রথম মেয়েটির কৌটোয় ফেরত আনিটা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলুম। পরে যখন মিছিল-টিছিলে যাচ্ছি, তখন মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।'

বিনয় বলল, 'চ্চালিয়ে যা—চ্চালিয়ে যা—'

সুধাংশু বলল, 'এই যে অখিল এখনও নিজের মধ্যে কতগুলো পৌবাণিক ব্যপার কিভাবে টিকিয়ে রেখেছে—আমার না মাইরি, আচ্ছা, যে মেয়েছেলে সুন্দর নয় তার পথে বাক্স নেড়ে বেড়াবার কি দরকার? যে মেয়েছেলেটা সুন্দর, তাকে এভাবে উপেক্ষা কবার রাইটই বা তোমায় কে দিয়েছে'?

অখিল বলল, 'হ্যাঁবে, ভদ্রমহিলা, নিদেন মহিলা উচ্চারণ করতেও কি খুবই কষ্ট'?

বিনয় অখিলের থুতনি নেড়ে বলল, 'মাস্তু'।

সুধাংশু বলল, 'আমরা ওসব গ্রীক-ফ্রিক বুঝি না। তাহলে তো প্রেমই করতে পাবতুম'।

বিনয় বলল, 'জানোয়ারেব মতো বলেছে। কোনো মার নেই'।

অখিল বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, এবার কে কি আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছি শোনা যাক।'

বিনয় বলল, 'তারপর যে বলবে এস্‌সো প্রোথোম প্রেমেব গপপো হোক—সেটি চলবে না।'

সুধাংশু বলল, 'জাতিস্মর তো নই। আর জানো কি থিয়োরেটিকালি আমরা সকলে ডেড? তোমার বয়েস কত হে ছোগ্‌ড়া? আমাদের দেশের অ্যাভারেজ আয়ু কাগজ খুলে দেখেছো কখনো'?

বিনয় বলল, 'আচ্ছা, দৃস্য-ফৃশাই চলুক। বেশ চাটনিগোছের লাগবে'।

সুধাংশু বলল, 'ভালো, একটু খুচরো flok হয়ে যাক। ক্লাসিক ব্যাপারগুলো তো পড়েই রয়েছে। ঈশ্বর, তুমিই শুরু করো বাপ'।

অখিল বলল, 'না তুমি'।

বিনয় বলল, 'হায়! বাঙালী কোথায়'?

সুধাংশু বলল, 'কেন? বাঙালী পাঁঠার দোকানে, আর অখিলদের মগজে। বলো পাঁচু, বলে ফেলো'।

অখিল বলল, 'আমি সমুদ্র ছাড়া কিছু ভাবতেই পাবি না। আব জানো, প্রতি মুহূর্তে সমুদ্রে নিজেকে বদলায়। আলোয়-অন্ধকারে প্রদোষে, আহ্‌ সমুদ্র'!

সুধাংশু অন্যমনস্কের মতো অখিলের দিকে তাকিয়ে শুরু করল, 'শ্মশানে বাবাকে পুড়িয়ে আমবা ভাইয়েরা আগে ফিরলাম। শাঁখা ভেঙে, কপাল আর সিঁথিব সিঁদুর তুলে মা জেঠিমার সঙ্গে এল তার অনেক পরে। মা চোরের মতো লুকিয়ে বাড়ি ঢুকেছিল। মাকে দেখার জন্য আমরা সকলেই অস্থির ছিলাম, কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে পারিনি। কারণ বাবা মরে যাবাব পর দ্বিতীয় ভয়ঙ্কব দৃশ্যের জন্য আমরা মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আর মা সম্পূর্ণ অপরিচিত চেহারায় আমাদের চমকে দেবে না বলেই কি বাইরে, অন্ধকাবে, দাঁড়িয়েছিল? নাকি সমস্ত গৌরব নিশ্চিহ্ন হওয়ার বেদনায়, অভিমানে মুখ দেখাতে চাইছিল না? মা অন্যদিকে মুখ ফিবিয়ে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল। জেঠিমা মাকে তেমন ভাবেই ধরে রেখেছিল, প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময় মেয়েকে মা যেভাবে ধরে, যেভাবে বাড়ির বড়বৌ বিসর্জনের জন্য প্রতিমা তুলে দেয়। আর মার সাদা থান দেখে দিদি ফিট হয়ে গেল। মা এসে দিদির মাথাটা কোলে তুলে নিল। সেই প্রথম মার মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হলাম। চল্লিশ বছরের অভ্যস্ত কপালে ঘষে ঘষেও কিছুতেই সিঁদুরেব চিহ্ন নিকেশ করা যায়নি। কপালে দুটো

ছোট্ট আঁচড়ের দাগও দেখলাম। ঝামা দিয়ে ঘষার ফলে হয়েছে, নাকি কপাল ছেঁচে রক্ত বার করার কোনো আচার আছে, তা আজও জানি না। শূন্য সিঁথি, শূন্য হাত, সাদা থান মার সেই কপালে সিঁদুরের মৃদু আভাসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। লক্ষ্য করে দেখেছি সে চিহ্ন উঠতে মার দিন চারেক সময় লেগেছিল।'

বিনয় অস্ফুটে বলল, 'ভাল্‌লাগে না'।

অখিল টেবিল থেকে একটা বই টেনে তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে গিয়ে লজ্জিত ভাবে নামিয়ে রাখল। বিনয় কিছু একটা বলার জন্যই যেন শুরু করল, 'যাই বলিস, ময়দানে সূর্যাস্তের কোনো তুলনা হয় না। আর কৃষ্ণপক্ষে কেল্লার দিকটা? আমি তো বাতাসেও অন্ধকারের গন্ধ পাই। একদিন—'

সুধাংশু বলল, 'ময়দানের কথায় একটা ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনে পড়ল। রাত্রিবেলা গঙ্গার ধার থেকে ফিরছি। ইডেন গার্ডেনের সামনে ফুট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ অকারণে নিচু পাঁচিলটার ওপর বসে পড়লাম। সামনে মাঠ, অন্ধকার প্রথমে তরল তারপর গাঢ় তারপর ফিকে হয়ে একেবারে চৌরঙ্গীর আলো ছুঁয়েছে। ওখানে বসলে মোড় থেকে যাদুঘর পর্যন্ত লম্বা ফুটের উঁচু নিচু বাড়ি, আকাশ আর আলোগুলো সব মিলিয়ে অলীক মনে হয়। জায়গাটা নির্জন ছিল। মাঝে মাঝে দুটো-একটা গাড়ি, দুটো-একটা যুগল, দুটো-একটা পুলিশ। হঠাৎ পেছনের বাগান থেকে একটা মেয়েমানুষ বেরিয়ে এসে সেই পাঁচিলের ওপর দাঁড়াল। মেয়েমানুষটা বেঁটে, মোটা, কালো। টকটকে লাল জামা পরেছিল, মুখের একটা পাশ দেখতে পেলাম, আমার কেমন যেন মনে হল মেয়েমানুষটা ইবার শিষ দেবে আর পেছন থেকে নেকড়ের মতো একটা কুকুর লাফিয়ে এসে ওর পায়ে মুখ ঘষবে। কিন্তু মেয়েমানুষটা যেমন এসেছিল তেমনই ফিরে গেল। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ছোট একটা ঝোপ হঠাৎ তাকে গিলে নিল। দু-এক মুহূর্ত নানান সম্ভাবনা ভেবে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনার তাড়ায় না উঠে পারলাম না। পাঁচিলের পর কয়েক হাত চওড়া ঘাস জমি। তারপর কিছু ঝোপ। তারপর আবার ঘাস-জমি গিয়ে মিশেছে ক্রিকেট মাঠের বেড়ায়। রাত্রিবেলা অসমাপ্ত আধো-অন্ধকার স্টেডিয়ামটার দিকে তাকালে বরাবরই আমার পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথের কথা মনে হত। দু-পা এগিয়ে ঝোপটার পাশে এসে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে সিমেন্টে বাঁধা শুকনো নালা। মেয়েমানুষটা তার ওপর একটা ঢাউস নৌকোর মতো শুয়ে আছে। একটা দোহারা গোছের সুন্দর ছোকরা—এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যেন বাতাসে নোয়ানো শরগাছের উপমা। ছোকরা আমায় দেখেনি। মেয়েমানুষটা আমাকে বললে, এই, এই! এমনভাবে বলল, যেন আমি এসে পড়ায় কোনো ক্ষতি নেই, তবে না এলে ভালো হয়। আমি জবাব না দিয়ে ঠিক ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম। ছোকরাটা ততক্ষণে বুঝেছে তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে। তবু সে মরিয়ার মতো সময়কে কয়েকবার চোখ পিটপিট করতে দিয়ে, তারপর উঠে দাঁড়াল। ছোকরার পরনে কাচা লুঙ্গি, ফর্সা গেঞ্জি। মেয়েমানুষটাও উঠল। আমি তার জামাটা পেছন থেকে চেপে ধরার আগের মুহূর্তেও জানতাম না এইবার আমাকে দণ্ডদাতার অভিনয় করতে হবে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আমার সেই বয়েসে, ভয় বা ঘেন্নায় সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে আসাই স্বাভাবিক হত। আমি কিন্তু হঠাৎ বাঁ হাত দিয়ে সেই ছোকরার গেঞ্জিটা চেপে ধরলাম, বললাম, কি হচ্ছিল? বাঙালী পুরো নার্ভাস। বললাম, কি করিস? হিন্দিতে বলল, জাহাজে চাকরি। বুঝলাম নৌকোর বৈঠা-ফৈঠা ধরে। বললাম, এখানে কেন এসছিলি? বলল, হাওয়া খেতে। আমি বললাম, ঠিক আছে, চল। ও কিছুটা ভয়ে, কিছুটা জেদে আমার পরিচয় জানতে চাইল। বললাম, থানায় গেলেই টের পাবি। উত্তরে মেয়েমানুষটা তার মিশিমাখা দাঁতে কেমন করে যেন হেসে উঠল। আর হাসিটা শুনেই আমার মনে হল এইবার ওর কাঁধে একটা শকুনের ছানা এসে বসে আমার দিকে কটমট করে তাকাবে। বুঝলাম মেয়েমানুষটা তখনকার মতোই এখনও আমাকে দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি। কিন্তু ওর অভিজ্ঞ চোখ কি করে বুঝতে পারল আমার পক্ষে এমন-কি ছদ্মবেশী পুলিশ হওয়াও সম্ভব নয়? ধমকে বললাম, চোপ। ওর জামাটা আরও জোরে ধরলাম। ফলে মেয়েমানুষটার পিঠে আমার হাত বসে গেল। ও আবার তেমনি করে হাসতে লাগল। আর মেয়েমানুষটার হাসি যেন আমার সামনে একটা স্বচ্ছ বড় আয়নাকে কুড়মুড় করে ভেঙে দিল। সেই টুকরোগুলোয় আমি নিজেকে দেখলাম। আমার শক্ত আঙুলকটাকে সাদা শেকড়ের মতো অসংখ্য

আর জটিল হতে দেখলাম। সেই অবস্থায় ছোকরাটা গেঁজে থেকে একটা দুআনি বের করে আমায় দিয়ে বলল, কসুর হয়ে গেছে, যেন মাপ করি। আমি যে সত্যিই পুলিশের লোক অগত্যা তা প্রমাণ করার জন্য দুআনিটা নিয়ে ক্ষমা করে চলে এলুম'।

একটু চুপ করে থেকে বিনয় বলল, 'একবার আমিও ময়দানে খুচরো কারবারে পড়েছিলুম। আচ্ছা, সে কথা পরে বলছি। তার আগে কালীঘাটের'—

অখিল হেসে উঠে বলল, 'বিনয় ধর্মের লাইন কিছুতেই ছাড়বে না। শুনি কি হয়েছিল'?

সুধাংশু বলল, 'ছুটির দিন কোথাও যাবার ছিল না। সন্ধ্যেতক মেমেদের বাস্কেট খেলা দেখে হাঁটতে হাঁটতে কেল্লা পৌঁছবার আগেই অন্ধকার হয়ে গেল। একটা কাঠের বেড়ার ওপর অনেকক্ষণ বসেছিলাম আর নানা কথা মনে হচ্ছিল। ধরো, এত জায়গা থাকতে আমি মেমেদের বাস্কেট খেলা দেখছিলাম কেন? পয়সা থাকলে আমি কি করতাম—মদ খেতাম? অ্যাংলো পাড়ায় যেতাম? পয়সা-পেলে আর কিছুই কি আমার করার ছিল না? আমি তো শিশিরবাবুর থিয়েটার দেখতে পারতাম, টুক করে ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসতে পারতাম, বই কিনতে পারতাম, আগে তো এইসব ইচ্ছেই হত। আর ধরো, ছেলেবয়েসেও তো ভেবেছি টাকা পেলে বড় হয়ে কি করব ; আমার মার একটা দাঁত ছিল না, একবার একটা চীনে মেমের সোনা-বাঁধানো হাসি দেখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বড় হয়ে সোনা দিয়ে মার দাঁত বাঁধিয়ে দেব। আসলে এক-একটা বয়েসে আমাদের আকাঙক্ষা পাল্টে যায় কেন? আর ধরো, আমি মোটামুটি যুবক, চাকরি করছি, মন এবং যৌনতার দাবি স্বাভাবিক। সুতরাং আমি ভালোবাসা চাইতে পারি, বিয়ে করতে চাইতে পারি, হয়তো চাইও। কিন্তু কেন আস্তে আস্তে তার জোর মরে আসছে? কেন আমি ক্রমশ নিজের সম্পর্কে, পরিবার সম্পর্কে একটু বড় ভাবে বললে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ক্রমশ সাময়িকভাবে উদাসীন অথচ সচেতনভাবে নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি! আসলে আমার মধ্যে এই যে অতৃপ্তি ও অস্থিরতা, মানে অখিলের ভাষায় চোঁয়া ঢেকুরের মতো ফিকে অথচ বিস্বাদ এই যে সো-কলড অতৃপ্তি বা অস্থিরতা—এর মূল কি? হঠাৎ মনে হল আমার তো কোনো বিশ্বাস নেই। ধরো, ছেলেবেলায় জানতাম আমি কিছু একটা হব। অথচ আজ বুঝেছি আসলে যা হয়েছি তা হল কোনোদিন কিছু না হওয়া। তারপর ধরো ছেলেবেলায় জানতাম আমার মা আছে, বাবা আছে, ভগবান আছে—এখন দেখছি বাবা হঠাৎ মরে যায়, মা রোজগেরে কাকার দাসীবৃত্তি করে, আর চাঁদে রকেট ধাক্কা দেয়। তারপর ধরো ইয়োরোপ আমেরিকা আমাদের বৈঠকখানায় এসে পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে। কিন্তু বস্তুত তাকে এক কাপ চা খাওয়াব, সে সামর্থ্য নেই। আমাদের ফ্যাশন, আমাদের হ্যাবিটস, আমাদের ভাবনা তাই আধা ইয়োরোপীয়ান, আধা গ্রাম্য। অথচ অখিলের মতো কোনো পুঁথিতে আমার আস্থা নেই যে ইচ্ছে আর প্রাপ্তি, কল্পনা ও রিয়েলিটির এই বিশাল ফাঁকটা তা দিয়ে ভরব। তাই দেশের কোথায় একটা কারখানা হল, কোথায় চারটে ব্রীজ এবং এখনকার সমস্ত বঞ্চনা আর ব্যর্থতার মধ্যেও এতে করে ভবিষ্যতের কি বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে ; কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের ধর্মঘটে বা পঞ্চায়েৎ ইলেকশনে তার প্রমাণ মিলছে ; কোথায় বাইরের রাজনীতির কি প্রভাব দূর-নক্ষত্রের আলোর মতো আমাদের দেশেও এসে পৌঁছেচে—সে সব থিয়োরি আমাকে বিন্দুমাত্র দোলায় না। বিনয়ের মতো ভগবানেও'—

বিনয় বলল, 'খাও খাজা। এ যে বক্তৃতা শুরু করলি? ভাল্‌লাগে না'।

সুধাংশু সিগারেট দরিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে মুচকে হেসে বলল, 'বাগাপ বাঙ্গালী। নিজেকেই বলছি। ময়দানের চুটকি ছেড়ে একেবারে জগৎ-দর্শন। দ্যাখো, আমাদের অর্ধশিক্ষিত মনটাকে সময় কি রকম পুতুলনাচ নাচায়। মাইরি, আমার আদি ও অকৃত্রিম শত্রু দেখি একটাই—এই সময়। চরিত্রবান থাকতে দেয় না, চরিত্রহীন হতে দেয় না, ছুঁতে পারি না অথচ প্রতি মুহূর্তে নানা ছদ্মবেশে দেখি। অতএব ভাইসব, এসো, একসঙ্গে আমার শত্রুটিকে বলা যাক, তোর হবে'।

বিনয় বলল, 'হ—বে—এ'।

অখিল হেসে ফেলে বলল, 'মাথা খারাপ'।

সুধাংশু বলল, 'যাক। রীতিমতো ভাবনা-টাবনা করে কোনাকুনি ময়দানটা পেরোচ্ছিলাম। রাত্রিবেলা একা ময়দানে ঘুরলে তোমার মধ্যেকার জানোয়ারটা ছায়া হয়ে তোমার আগে-পিছে যাবে। মনে হচ্ছিল,

ভবিষ্যতে ইতিহাসে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই লিখবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কৃত্রিম চাঁদ যখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল, ঠিক তখনই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ তার অকৃত্রিম তন্ত্র-সাধনার পীঠভূমিরূপে যে বিশাল শ্মশানটি পেয়েছিল, তার নাম কলকাতা গাঁয়ের ময়দান। বেশ চটকদার গোছের ভাবনাটার জন্য যখন নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছি ঠিক তখন দূর থেকে একটা ক্ষীণ গোলমাল হাউইয়ের মতো জ্বলে উঠে উড়ে এসে পায়ের কাছে পড়ল। একটি সুন্দরী বাচ্চা মেয়ে তার ওড়নাটা বাতাসে ঝাপটে দৌড়তে দৌড়তে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে, কথা নেই. তার পেছন পেছন জনা তিনেক মারোয়াড়ী যুবক—প্যান্ট ট্যান্ট পরা। বাঙালীকে বাঙালী না দেখিলে কে দেখিবে গোছের মনোভাব মুহূর্তে চিতিয়ে দাঁড়ালাম। আসলে তখন একটা মারামারি করতে পারলে আমার নিজেরই ভালো লাগত। কিন্তু যুবকবৃন্দ আমাকে শুইয়ে দিল। সুন্দর সুকুমার চেহারা—একটা নিষ্পাপ কিশোরী ভেবে যাকে কতগুলো স্কাউন্ড্রেলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমার পৌরুষ হঠাৎ নিজেকে মহাকাব্যের নায়ক ভেবেছিল, তার দিকে সেই-আমি ভয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। ছেলেটা কথাও বলে মেয়েলী ঢঙে। কাঁদতে কাঁদতে শোনাল—পার্টিশান, ছেলেবেলা থেকে যাত্রার দলে সখীর পার্ট করত, কলকাতায় যাত্রা নেই, কেউ ভিক্ষেও দেয় না, ইত্যাদি।'

অখিল বলল, 'একবার রাত দুটো নাগাদ গানের জলসা শেষ হল। হাঁটতে হাঁটতে শেয়ালদা স্টেশনে গেলাম। দেখি প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার কোলাপসিবিল গেটগুলো তালা মারা। বাইরের চত্বরে অজস্র রিফিউজি- সংসার অল্প অল্প জায়গার ভেতর মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। আলো জ্বলছে। কিন্তু চাপা দুর্গন্ধ যেন আলোটাকেও ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এক কোণে একটা কাঠের টেবিল ছিল। বোধহয় দিনের বেলা ওখানে কাগজ সাজিয়ে হকাররা বিক্রি করে। আমি র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়লুম। বিলায়েত খাঁর ভঙ্গিটা ভাবছিলাম। বাজাতে বাজাতে সেতারটি আঁকড়ে ওপর দিকে উদ্‌ভ্রান্ত মুখ তুলে আধচোখে চেয়ে হঠাৎ যেন সুর খুঁজে পেয়ে একই সঙ্গে নিজের শরীর আর কানাড়ার আলাপে কোমল ধৈবতের বিলম্বিত মীড় তোলার সে কি আশ্চর্য ছবি। কোনাবকের মূর্তি ফূর্তির মতো। সুরটা যেন শরীর নিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল সামনে দিয়ে কে হেঁটে গেল। তাকিয়ে দেখলাম একটা লোক নিচু হয়ে কাঁথার ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর পাশ থেকে উঠে একটি বৌ চারদিকে তাকাতে তাকাতে ফিরে এসে কাঁথার ভেতর ঢুকে গেল। মনে হল স্বামী-স্ত্রী। কাঁথার বিস্তার দেখে ভেতরে আরও দু-একজন বাচ্চাগোছের আছে ধারণা হল। খানিক বাদে বৌটিকে কাঁথার বাইরে মুখ বার করতে দেখলাম। সে দু-হাতের ভরে মাথাটা উঁচু করে সমস্তক্ষণ ক্রমাগত তিন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল কেউ জেগে আছে কিনা। বৌটি জানত না পেছনে আমি ছিলাম আর আমিও প্রথমে লক্ষ্য করিনি কোণের দিকে একটা কিশোরী মেয়ে উঠে বসে এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে মাথায় চুলটা কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। তখন আমার পেছনে একটা সুরের জাল ছিল। আর সামনে সেই নাটক। বিধাতার মতো সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে হল। বড় করুণ লাগল, বড় নিষ্ঠুর মনে হল। অথচ হলফ করে বলতে পারি বৌটির চাউনিতে নিশ্চয়ই তৃপ্তি-লজ্জা-আশঙ্কা আর বেদনা ছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিলাম জীবন কি অনিবার্য এবং তাকে কিছুতেই মূল্য না দিয়ে উপায় নেই।'

সুধাংশু ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যাক। একটু অশ্লীলতার ধার ঘেঁষে গেলেও অখিল এর মধ্যে থেকে বড় বড় পৌরাণিক ব্যাপারগুলো ঠিকই আবিষ্কার করতে পেরেছে।'

বিনয় অস্ফুটে জানাল, 'ভাল্‌লাগে না'। তারপর যেন কিছু করার নেই বলেই সিগারেট ধরাল।

সুধাংশু বলল, 'দেখি একটা ফোর ক্যাসল'।

বিনয় চারমিনারের প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিল। সুধাংশু সিগারেট বার করে দেখল এক দিকের খানিকটা তামাক পড়ে গিয়ে চারমিনারটা নেতিয়ে আছে। দুর্বোধ্য হাসি হেসে সুধাংশু সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'হঠাৎ ঘাড়ের ওপর ঝড়মুড় করে বৃষ্টি নামল। আমি দৌড়তে দৌড়তে একটা ক্লাবের অন্ধকার টেন্টের সামনে পৌঁছলাম। সবুজ তাঁবু, সামনে ছোট বাগান, লোহার গেট। অগত্যা পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে একটা পাগলী বসে ছিল। পরনে ছেঁড়া পায়জামা আর গেঞ্জি, মাথার চুল বব করা, অথচ মুখটা অবিকল হিন্দু ঘরের প্রৌঢ় বালবিধবা। পাগলীটা বিড়ি টানছিল, মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছিল। একটা দালদার টিন আর ছোট পুঁটলি পাশেই রাখা ছিল। পাগলী আমাকে পাত্তা দিল তখন,

যখন আমি দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরিয়েছি। আমার সামনে এসে নীরবে হাত পাতল। একটা সিগারেট দিলাম। পাগলী সেটা কিছুক্ষণ কানে গুঁজে রেখে আবার নামাল, তারপর সিগারেটটা ধরাল। অগত্যা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাগলীকেই লক্ষ্য করতে লাগলাম। কারণ আমার সামনে অন্ধকার আর বৃষ্টি ছাড়া কিছু দেখার ছিল না। পাগলী হুস হুস করে সিগারেট টানছে। সিগারেটের মাথাটা যখনই জোরে জ্বলে উঠছে তখনই তাঁর ভাঁজ পড়া মুখটা কেমন লালচে, চেনা হয়ে উঠছে। তারপরই আবার ধোঁয়ায় তা আবছা হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ ভাবলুম পাগলীটা বাঙালী অথচ মাথার চুল বব কেন, পায়জামা কেন, গেঞ্জি কেন? তারপর লক্ষ্য করলুম পাগলীর মুখটা বড্ড বেশি ফ্যাকাশে, যেন ব্ল্যাডব্যাঙ্কে প্রচুর রক্ত দিয়েছে। তারপর মনে হল এই ধরনের মুখ কোথায় যেন দেখেছি, কাগজে বা সিনেমায় বা স্বপ্নে। ডাকলাম, হেই? পাগলীটা ভুরু কুঁচকে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তারপর বলল, চার আনা পয়সা দিবি? আমার কাছে কেউ চার আনা ভিক্ষে চায়নি। অবাক হয়ে বললাম, কেন? দু-হাতে গেঞ্জিটা তুলে বলল, দেখবি? চকিতে এবং সেই প্রথম অনাত্মীয়া আর জ্যান্ত মেয়ের বুক দেখলাম। সেদিন জল মাথায় করে দৌড়তে দৌড়তে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম। অন্ধকারে বৃষ্টি চমকায়'।

অখিল বলল, 'তোদের দুজনেরই দেখছি ময়দান সম্পর্কে অবসেশান'।

সুধাংশু বলল, 'নিশ্চয়ই। কার নেই? কলকাতার মানুষগুলো তো সারাদিনের ক্রীতদাস। সন্ধ্যে হলে স্বাধীনতা পায়। তখন তার আশ্রয় কি আছে? আসলে ময়দান সেই প্রাসাদ আর চৌরঙ্গী সুস্তা নদী। তোদের মতো একদল মেহেরালি মনুমেন্টের চারপাশে নিশান-ফিশান উড়িয়ে ঝুটা হ্যায় ঝুটা হ্যায় বলে চেঁচায়। আমাদের মতো একদল ট্যাক্স-কালেকটার বাতাসে মাথার টুপি হারিয়ে অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে কখনো কটাক্ষ দেখে, কখনো চিবুকের ঢৌলে হাসি। কখনো চুড়ির নিক্কণ শোনে, কখনো ক্রীতদাসীর বুক চাপড়ানো আর্তনাদ। দু-ভাবে হলেও আসলে আমরা সকলেই অবসেশড'।

বিনয় বলল, 'আর পারি না। তোর পাগলীর কথায় আমার এক পাগলীর গপ্পো মনে পড়ছে। আমরা তখন অক্রুর দত্ত লেনে থাকি। যুদ্ধ-ফুদ্ধ চলছে। কলকাতা ফাঁকা অন্ধকার, অথচ আবার ফানুস হয়ে উড়ছে। আমি তখন সিকসে পড়ি। কিছুই প্রায় মনে নেই। বড় হয়ে লোকমুখে শুনে বা বই-ফই পড়ে কিছু কিছু স্মৃতি যেন আসে। কিন্তু পাগলীটাকে লাইফে এড়ানো যাবে না। চেহারা ভুলে গেছি, কথা ভুলে গেছি, গলার স্বর ভুলে গেছি। শুধু এইটুকু মনে আছে আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে একটা বাড়ি উঠতে উঠতে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পাগলীটা কিভাবে সেখানে এসে জোটে। সারাদিন চুপচাপ থাকত! এখানে ওখানে খাবার খুঁজত। রাত হলেই হঠাৎ চিৎকার করে মুখে সাইরেন বাজাত। তারপর খিলখিল হাসি। ভাবলে মাইরি গায়ে কাঁটা দেয়। এখনও কাগজে কোথাও যুদ্ধের খবর পড়লেই আমি যেন কানে সাইরেন আর পাগলীর হাসি শুনতে পাই'।

সুধাংশু বলল, 'মেরে ফ্যাল মুর্গিওয়ালা। অখিলের মতো তোর গপ্পের শেষেও দেখি একজন ঈশপের দাড়ি উঁকি দিচ্ছে র‍্যা'।

অখিল বলল, 'এইতো কয়েক বছর আগে। আমরা তখন শেয়ালদার সেই গলিটায় থাকি। আমাদের রকেই একটা পাগলী এসে জুটল। ন্যাচারালি বাবা বিরক্ত, মা আতঙ্কিত। পাড়ার অনেকে উদাসীন, অনেকে আবার মজাও পেয়েছে। পাগলী দিনের বেলায় চলে যায়, সন্ধ্যে নাগাদ ফেরে। বাইরের ঘরটায় আমি শুতাম, রোয়াকে মহিলাটি। ফলে পুবের জানালা বন্ধ করে শুতে হত। পাগলীর কয়েকটা স্পেশালিটি ছিল। মাঝে মাঝে সিঁদুর পরত, এক হাতে শাঁখা ছিল, আর সবসময় ছোট্ট একটা কোলবালিশকে বাচ্চা নেওয়ার ঢঙে বুকে করে ঘুরে বেড়াত। পাগলী কথা বলত না। তার চোখ বা পোশাক না দেখলে তাকে পাগল বলে বোঝা শক্ত হত। একদিন রাত্তিরে শুনি গুন গুন করে গান গাইছে। ভাঙা ভাঙা সুন্দর গলা, বাঙালদেশী গান। খুব অবাক হয়ে গেলাম! এর আগে মহিলাটির কণ্ঠ কখনো শুনেছি মনে পড়ে না। কয়েকদিন পরে হঠাৎ কানে এল মহিলাটি কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছে। অত্যন্ত কৌতূহলে, খানিকটা সন্দেহও বলতে পারো, জানলা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম। রকে তো কেউ নেই-ই, রাস্তায়ও কাউকে দেখলাম না। মহিলাটির ভাষা বুঝি না, উচ্চারণও স্পষ্ট নয়। মনে হল যেন অভিমানভরে কিছু সোহাগের কথা বলছে। হঠাৎ একটা ব্যাপার আন্দাজ করে আমি চমকে উঠলাম। মহিলাটি কি আস্তে আস্তে তাঁর স্মৃতি ফিরে পাচ্ছেন? বিশ্বাস করো, উত্তেজনায় কৌতূহলে

অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হল না। মাত্র একটা জানলার ওপাশে কয়েকটা দিন যে আছে, একটি মানুষ, এক মহিলা—তার সম্পর্কে বাড়িসুদ্ধ আমরা কেউই কোনো আগ্রহ বা কৌতূহল বোধ করি না। পথের কোনো জানোয়ার ওখানে আশ্রয় নিলে আমরা যেমন সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারি, অনেকটা সেই গোছের ব্যাপার। গ্লানি হল। তোমরা জানো আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিতে আস্থা রাখি। সে-রাতে আমি বারবার ফিসফিস করে বললাম, ভদ্রমহিলা যেন তাঁর স্মৃতি ফিরে পান, আমি দেখি। কয়েকদিন পরে আরও এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। মানে, প্রকৃতির নিয়ম যে পাগলের শরীরেও অলঙ্ঘ্য, নিজের চোখে তা দেখলুম। মা অত্যন্ত বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে তাকে একটা কাচা পুরনো শাড়ি দিলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলেও যেতে বললেন। বাড়িতে আমরা কয়েকজন বড় বড় ছেলে মেয়ে আছি, তাঁর লজ্জা তাই বুঝতে পারি। আবার মহিলাটির জন্য তিনি যে কিছু দুঃখ এবং ভাবনা বোধ করছেন, তা-ও আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়। সে বড় পিকিউলিয়ার ব্যাপার হল। কিন্তু যথারীতি মহিলাটি সন্ধ্যে হতে ফিরে এলেন। তারপর মধ্যরাতে হঠাৎ শুনি চিৎকার। যার মর্মার্থ হচ্ছে আমায় ছুঁয়ো না, আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, ধর্মে পাতক হবে, ইত্যাদি। ওপর থেকে বাবা দৌড়ে এলেন, দরজা খুলে আমি। আশে পাশের কয়েকটা বাড়িতেও আলো জ্বলে উঠল। অথচ রক ফাঁকা, রাস্তায় কেউ নেই। তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কল্পনা করতে পারো? একজন ভদ্রমহিলা গাঁয়ের সচ্ছল ঘরের বৌ, দীর্ঘকাল স্মৃতিভ্রংশ এবং মাথার গোলমালে ভুগে আস্তে আস্তে স্মৃতিতে ফেরার পথে হঠাৎ টের পেলেন অচেনা শহরের অন্ধকার এক রকে শুয়ে আছেন। স্বামীর নাম বললেন না, আধখানা ঠিকানা বলে আছে। বালিশটা দু-হাতে তুলে বললেন অন্তত এই ছেলেটাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে। বাড়িতে আগুন লাগার পর বিছানা থেকে একে কোলে নিয়ে তিনি সোয়া মাইল দৌড়তে দৌড়তে স্টেশনে গাড়ি ধরে কোনো রকমে কলকাতা পৌঁছেছেন। অন্তত ছেলেটাকে পৌঁছে দিতে। পরদিন আমি নিজে সেই ভদ্রলোকের খোঁজ করে কিনারা করতে পারলুম না। তারপর বিশ্বাস করো, আমার কেমন মনে হতে লাগল—ভদ্রমহিলার বাকি স্মৃতিটুকু যেন আর না ফিরে আসে'।

সুধাংশু হঠাৎ বলল, 'আমি পাগল হয়ে যাব না তো রে'?

বিনয় বলল, 'নাও ঠ্যালা'।

সুধাংশু বলল, 'আসলে আমাদের ভাইটালিটি এত কম, হ্যাঁরে, কেমন যেন আজকাল, আমি—'

অখিল বলল, 'কি যা তা বকছিস'।

সুধাংশু শুরু করল, 'আমার তো অনেক রাত অব্দি ঘুম হয় না। শুয়ে শুয়ে আমি সব অদ্ভুত সাউণ্ড শুনি। দূরে হয়তো কয়েকটা কুকুর ডেকে উঠল। প্রথমেই আমার মনে হবে কে যেন গুমরে কাঁদছে, চমকে উঠেই বুঝতে পারব আসলে কুত্তা চেঁচাচ্ছে। কাল কি হল শোনো, পাশের ঘরের মুক্তিবাবু বোধহয় পড়ছিলেন, শুতে যাবার আগে টেবিলটা টেনে সরিয়ে উঠলেন। টেবিল সরানোর আওয়াজটা তীক্ষ্ণ, কর্কশ। প্রথমেই আমার মনে হল, গলা টিপে ধরায় কেউ আর্তনাদ করে উঠেছে। তারপর বুঝলাম। এক-একটা সাউণ্ডের আয়ু দু-তিন সেকেণ্ড। আবার তার ভগ্নাংশে প্রথমে ধাক্কা খাই, পরে ব্যাপার বুঝি। ফলে আমার যাবতীয় সেন্স, মানে একজিসটেন্স এমন ঝাঁকুনি খায়, কারণ আমি তো জানি জীবনে কোনো নিরাপত্তা নেই। মানুষ নিজেই সমস্ত ভাবে নিজেকে মারার আয়োজন করে রেখেছে। তার ওপর নিয়তি-ফিয়তি গোছের কি একটা আছে। চিঠি এলেই বুকটা ধ্বক করে ওঠে, যদি দেশ থেকে মা-র মৃত্যু সংবাদ আসে? মা তো মরবেই। ঠিক এই মুহূর্তে, এই এখন মা মরে গেল কিনা আমি কেমন করে বুঝব? কেউ ঘুমিয়ে থাকলে আমার ভয় হয়, জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। তীব্র সন্দেহের চোখে তার বুকের দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাসের ওঠা পড়া দেখে তবে নিশ্চিন্ত হই। খবরের কাগজ খুলেই আমি দুর্ঘটনা, বিপর্যয়ের খবরগুলো দেখে নি। আমার যে বিনয়ের মতো ভগবানে বিশ্বাস নেই, প্রার্থনা করতে পারি না। আমার যে অখিলের মতো মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে আস্থা নেই, জোর করে কিছু চাইতে পারি না। সব সময় একটা হাই টেনসনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি, যেন কি একটা হবে, অথচ কিছুই হয় না। আমি জানি প্রতি মুহূর্তে একটা বিপর্যয়ের আশঙ্কায় কোটি কোটি মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে শেষে একদিন বুঝব, Thus he lived and this is life. আর ভবিষ্যৎ বলতে

সভ্যতা জীবনের জন্য কি বিপুল ঐশ্বর্যের আয়োজন করেছিল, করতে পারত। অথচ অভিজ্ঞতা মানুষের মনে সামান্যতম নিরাপত্তার বোধটুকু পর্যন্ত জাগাতে পারে নি। তাই তারা হারিয়ে গেল।'

বিনয় বলল, 'সত্যি। সবই আমাদের নাগালের বাইরে। কাগজ পড়ো, তুমি ভগবানে বিশ্বাসী হবে। আমরা কোথায় আছি রে'?

সুধাংশু বলল, 'জানিস, রাত্তিরবেলা যদি চোখ মেলে চলিস, চারদিকে দেখবি নানা ধরনের ছায়া এক-একটা আশ্চর্য ছবি হয়ে আছে। জলে, ডাঙায় ছায়া মাত্রেই শিল্প। কজনেই বা দেখে, বোঝে। আসলে আমাদের জীবন এই ছায়াশিল্প। অ্যাকসিডেন্টে জন্মায়, ক্ষণস্থায়ী, আলো ফুটলেই মিলিয়ে যায়। ভেবে দ্যাখো, আজ আমি মেসে বসে ছুটির দুপুরে তোমাদের সঙ্গে গল্প করছি ; অখিলের সঙ্গে কতদিন পরে দেখা। আসলে আমি যে শেয়াল না হয়ে সুধাংশু নামে একটা মানুষজন্ম পেয়েছি, তার পেছনেও কি নেহাতই অ্যাকসিডেন্ট কাজ করেনি'?

অখিল হেসে বলল, 'তোরা প্রচুর ভাবার সময় পাস। কারণ শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না। তাছাড়া যুদ্ধের পর আমাদের দেশে বদহজম, অনিদ্রা আর ফ্রি-থিংকিং—এই তিনটে মারাত্মক অসুখ দেখা দিয়েছে। অফিস, মেস, চৌরঙ্গী এবং কাগজের আইন-আদালত বিভাগ, কি. বিশেষ কটা দেশের উত্তেজক খবর—এর বাইরেও জীবন আছে রে'।

সুধাংশু চটে উঠে বলল, 'গ্যাঁজাস না। আমি প্রমাণের অভাবে যেমন ভগবান মানি না, তেমনই কোনো শোনা অভিজ্ঞতা বা পড়া থিয়োরিও অন্ধভাবে বিশ্বাস করব না'।

অখিল উত্তেজিত ভাবে বলল, 'সূর্য স্থির আর পৃথিবী ঘুরছে—এ আমরা বই পড়েই জেনেছি। তোমার বাপ-মা যে তোমার জন্ম দিয়েছেন, তোমার কাছে তারও তো কোনো প্রমাণ নেই। আশা করি এ-ঘটনাও তুমি বিশ্বাস করো না'।

সুধাংশু বলল, 'করি না-ই তো। কে জানে হাসপাতালে অন্য কোনো শিশুর সঙ্গে আমি বদল হয়ে গেছি কিনা'।

অখিল বল, 'তবু ভালো, নিজের বাবা-মাকে এখনও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করতে শিখিস নি। আসলে বাঙালী রক্ত, মাথায় ঘুরছে ফ্রান্স নিউইয়র্ক'।

বিনয় বলল, 'ভাললাগে না। পকেটে পয়সা নেই। মেয়েছেলে বন্ধু নেই। অফিস ছুটি। কাজ করে যে সময় কাটাব, সে-পথ বন্ধ। এখন যত তত্ত্ব-কথা'।

সুধাংশু বলল, 'এস্‌সো, লাইনে এসো। আসলে বুঝলি অখিল, মেয়েছেলের কথা যখন ভাবি—মানে গোটা শরীর-ফরির নিয়ে একটা আস্তো মেয়েছেলে মানে তো উপনিষদ-ফুপনিষদ গোছের ব্যাপার। যাতে সব প্রফেসি করে দেওয়া আছে। বুঝিসই তো, জীবনে কিছু পেলাম না। তাই এই ফাঁকটাকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটা ফালতু ফিলজফি গড়ে রেখেছি'।

বিনয় বলল, 'পাঁচু। আমাকে বলিস হ্যাংলা। নিজে তোর এভাবে বলতে লজ্জা করল না'?

সুধাংশু বলল, 'শিশু অথবা যীশু—এদের কাছে লজ্জা কিরে? তো বাদ দাও। হয়ে যাক এক হাত'।

বিনয় সায় দিল, 'হয়ে যাক'।

সুধাংশু জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আর একজন? এ মহাত্মা তো তাসই চেনে না'।

বিনয় বলল, 'ঠিকাছে। ওরও লাকট্রাই হয়ে যাক। আমরা বলে দেব'।

অখিল বলল, 'না রে'।

সুধাংশু বলল, 'চেপে যা। চুপ করে বসে থাকলেই হবে। নইলে আত্মহত্যা করার পদ্ধতি সম্পর্কে কার কি রকম জ্ঞান, এ-নিয়ে আলোচনা শুরু করব, তা কি চলবে'?

অখিল বলল, 'পয়সা-কড়ির ব্যাপার কিন্তু চলবে না'।

সুধাংশু হাসল, 'এ বাবা অন্য স্টেক। বাজি রেখে বলতে পারি পৃথিবীতে এমন জুয়ো কেউ খেলে নি'।

তাস এল। কাগজ আর কলম। বিনয় নিপুণ কৌশলে শাফল করে অখিলকে বলল, 'কেটে দে'। সুধাংশু কাগজে তিনজনের নামের আদ্যক্ষর লিখতে লিখতে বলল, 'কমলাকে দিয়েই শুরু হোক'।

অখিল চমকে তাকাল। সুধাংশু বলল, 'ফ্লাশবোর্ডে কোনো মরালাইসিং চলবে না'। বলতে বলতে তাস ভাগ করে দিল। তিন তাসের খেলা।

বিনয় নিজের তাস তুলে দেখল। সুধাংশু নিজের তাস দেখল। অখিলও অন্যমনস্কের মতো নিজের ভাগের তাস তিনটে তুলে দুর্বোধ্য রঙ আর নম্বরের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল।

বিনয় বলল, 'টেক্কা টপ'। চোখে হাসি ফুটিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, 'তোর'?

সুধাংশু হাস, 'বিবির জোড়'।

বিনয় অখিলের তাস তুলেই চিৎকার করে উঠল, 'ইয়্যাও। ভাবা যায় না। ট্রায়ো'।

সুধাংশু অখিলের গালে ধমাস করে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'জবাব নেই'।

অখিলের ঘরে লেখা হল, 'কমলা'।

বিনয় বলল, 'ভালো করে শাফল করো'।

সুধাংশু বলল, 'কাটো'।

আবার তাস বিলি করতে করতে সুধাংশু বলল, 'দুলালী হোক'।

অখিল বলল, 'তোদের কি মাথা খারাপ হয়েছে'?

বিনয় বলল, 'চোপ, বলো'!

সুধাংশু হাসল, 'তুমি আগে বলো'।

বিনয় বলল, 'আছি। বলোই না'।

সুধাংশু বলল, 'গোলাম টপ'।

বিনয় বলল, 'গোলাপ জোড়া'।

সুধাংশু বলল, 'পাঁচু। দেখি তোরটা'? তারপর অখিলের তাস দেখে বলল, 'পাগলি, শেষে এমন করে চলে গেলি'?

বিনয়ের ঘরে দুলালীর নাম পড়ল।

বিনয় বলল, 'এবার সন্ধ্যা হোক'।

সুধাংশু বলল, 'না। কণিকা'।

বিনয় হাসল, 'আচ্ছা। হলেই হল'।

আবার তাস বিলি হল। বিনয় চিৎকার করে উঠল, 'রান'। কণিকা বিনয়ের ঘরে গেল।

সুধাংশু বলল, 'ভালো করে সাফল করো'।

বিনয় বলল, 'কাটো। এবার সন্ধ্যা'।

তাস বিলি হল। দুজনের কেউ আর তোলে না। শেষে বিনয় একটা একটা করে তাস তুলে দেখল, যেন একটা একটা করে শেষ মাইনের টাকা গুনে নিচ্ছে। তারপর ভুরু কোঁচকাল।

সুধাংশু হঠাৎ তিনটে তাস এক ঝটকায় তুলে নিয়ে দেখল। যেন মধ্যরাতে টেলিগ্রাম রিসিভ করছে। তারপর ভুরু কোঁচকাল।

বিনয় অখিলের তাস তিনটে দেখে মেলে ধরল। সুধাংশুকে বলল, 'ফেলো। সুধাংশু নিঃশব্দে নিজের তাস কটা মেলে দিল। বিনয় অস্ফুটস্বরে বলল, 'বাগাপ। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে'। নিজের তাস-কটাকে চুমু খেয়ে বলল, 'পাগলি কিছুতেই ছেড়ে যাবি নে মা? পরপর তিন রাত এই গরিবের সঙ্গে ঘর করছিস' আচ্ছা অখিল, সন্ধ্যাকে তোর মনে পড়ে?

অখিল অন্যমনস্কের মতো বলল, 'আবছা। দুলালীর চেহারাটা তো কিছুতেই মনে করতে পারলুম না'।

বিনয় বলল, 'আমিও রে'।

সুধাংশু বলল, 'এবার বেণু হোক। শালা ওর শাপেই আমার ঘর ফেঁসে যাচ্ছে'।

বিনয় বলল, 'তাহলে চার জায়গায় তাস দিলাম'।

অখিল প্রশ্ন করল, 'মানে'?

বিনয় বলল, 'বা। বেণুর বরাবর একটু বাবু বদলাবার ঝোঁক ছিল না? দু-বছরে আমরাই তো অন্তত আটটা কেস দেখেছি, না কি বলো? ওর দানে তাই আমরা আজও বাবুর নামে একটা করে তাস দি'।

সুধাংশু বলল, শুনলে বিশ্বাস করবি না, প্রথম দিন বেণুকে কিন্তু বাবুর তাসই পেয়েছিল। চা-ফা খেয়ে বাবুর কপালকে গ্রীট করলাম। আমরা এত নারী আসক্ত হলে কি হয়, বেণুকে কেউই চাই না। তবু মাঝে মাঝে দুজনের কপালেই'—

অখিল বলল, 'কিন্তু ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে শুনেছি।

সুধাংশু বলল, 'তাতে কি হল? অনেকেরই বিয়ে হয়েছে, বাচ্চা হয়েছে। কেউ কেউ চাকরি করে। কিন্তু আমরা তো ঠিক আছি'।

চার ভাগে তাস পড়ল। এবং তুমুল চিৎকারের মধ্যে বিমূঢ় অখিল শুনল, আজও বেণু বাবুর ঘরে গেছে।

সুধাংশু বলল, 'ঠিক আছে। এইবার নতুন করে শুরু হোক। ঝর্ণা মিত্র'।

'ছিছিছিছিছি', অখিল বিবর্ণ মুখে বলল, 'সুধু, তুই না'—

সুধাংশু হঠাৎ চমকে উঠল। যেন সে নিজেই ভুলে গিয়েছিল। তারপর স্মার্টলি জবাব দিল, 'হুঁ, বাসতুম। এখন তো একা শুয়ে গা তাতলেও মুখটা মনে করতে পারি না'।

অখিল উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি রে'।

সুধাংশু বলল, 'খুন করে ফেলব। বোর্ড ছেড়ে ওঠা'?

অখিলের তাস ঝর্ণাকে পেল। অখিল সেই বোবা-কালা আসামীর মতো তাস-কাটার দিকে তাকিয়ে রইল, যে এমনি করে বিচারকের দিকে চোখ মেয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ শুনেছিল।

অখিস শুয়ে পড়ে বলল, 'তোরা খেল। আমার মাথা ধরেছে। চা-টা নেই'। ওরা অখিলের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝল আর জোর চলবে না, তখন বাধ্য হয়ে দুজন তিন জায়গায় তাস দিয়ে খেলে যেতে লাগল।

বিনয় আর সুধাংশুর কলিগদের নামে খেলা হল, অখিল তাদের অনেককেই দেখেনি এবং জীবনে এই প্রথম নাম শুনছে। তারপর ট্রামের সেই মেয়েটি, চৌরঙ্গীব পথে-ঘোরা সেই বেশ্যা, পাড়ার সেই কলেজ-যাওয়া ছাত্রী, রেস্তোরাঁয় সেই বিশেষ ওয়েট্রস, দেশী বা বিদেশী ফিল্মেব সেই সেই মেয়ে—যাদের কাউকে দুজনে একসঙ্গে দেখছে, কাউকে শুধু বিনয় বা সুধাংশু—তাদের নামেও খেলা হল।

আস্তে আস্তে ঘরের হাওয়া থমথমে হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বিনয় এবং সুধাংশুর চোখ-মুখের চেহারা পাকা জুয়াড়ীর মতো হয়েছিল। অখিল লক্ষ্য করল একসময় তাস তোলার আগে বিনয় জামার ভেতর চুলকোবার ছলে হাত ঢুকিয়ে পৈতে ছুঁয়ে নিল। আর সুধাংশুর ধূর্ত চোখদুটো কেমন কুঁচকে ছোট হয়ে গেল, যখন সে গর্জন করে বলল, 'জোচ্চুরি করলে খুন করে ফেলব কিন্তু'। তারপর একটা সময় এল, যখন আর কোনো মেয়ের স্মৃতি মনে আসছে না। সুধাংশু বলল, 'ঠিক আছে। স্রেফ নামের ওপর হোক। কানে শোনা, বইয়ে পড়া'।

অখিল হঠাৎ উঠে বসে সাজেস্ট করল, 'দ্রৌপদী'।

সুধাংশু আর বিনয় পরস্পরের মুখের দিকে চমকে চাইল। তারপর অখিলের দিকে। আর তিনজনের চোখেই কেমন নিষ্ঠুর উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

সুধাংশু বলল, 'ভালো করে শাফল করো'।

বিনয় ফিসফিস করে বলল, 'কাটো'।

তিন ভাগে তাস পড়ল। ওরা দুজন নিজেব নিজের তাস তুলে নিল। বাকি তিনটে তাসের দিকে তাকিয়ে সুধাংশু ভাবল, সময়. বিনয় ভাবল, নিয়তি ; অখিল ভাবল, আমি।

তারপর দ্রৌপদীর জন্য শেষ বাজি আরম্ভ হল।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

দখল

কলকাতা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার গিয়ে রেল লাইন শেষ। তারপর কয়েকখানা লঞ্চ আছে। সেসব না-থাকারই মত। কেননা, এদিকটায় এত নদী, এত খাল, তারই ফাঁকে ফাঁকে এখানে সেখানে এত ঘরগেরস্থালি যে, সব জায়গায় লঞ্চ যায়ও না। জায়গাগুলোর নানা রকমের নাম। লাট অঞ্চল। কেউবা বলে বাদা এলাকা। কেউ বলে আবাদ। বর্ষাকালে ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যায়। শীত এলে চলাচলের পথ নিরাপদ হয়ে ওঠে। কেনার লোক নেই—তাই ওখানে দুধ সস্তা। নতুন ধান উঠলে দর খুব কম থাকে। সেই একই কারণ। কেনার লোক নেই। বলা দরকার, ডাঙা মানে যেখান থেকে রেললাইনের শুরু। তা যাই হোক, বাদা হোক—যাই হোক—ওদিকটায় এখন পশারের আশায় ডাক্তারও গিয়ে বাসা বাঁধছে। সরকারী পরিবার পরিকল্পনার তাঁবুও পড়ে মাঝে মাঝে। এমন কি সিনেমাও যাচ্ছে।

ডাঙায় গোলমাল করে ওদিকটায় গিয়ে লোকে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। ফেরার সময় কারও বউ বা বোন ভাগিয়ে ফেরে। পথে এক একটা নদী পড়ে যায়। বেশীর ভাগই ভাঁটার সময় বুজে আসা বুক তুলে লঞ্চ কোম্পানির বাবুদের ভাবিয়ে তোলে—আর খানিক খানিক স্মৃতি মুছতে মুছতে মেয়েমানুষেরা পিছটানের সবটুকু ঝেড়ে ফেলে ডাঙায় পা দেয়। রেলে চড়ে। তারপর আস্তে আস্তে কলকাতার পথে ভিখারী হয়। ঝি হয়। তেমন সুযোগ সুবিধা থাকলে চাইকি কেউ কেউ রক্ষিতাও হয়।

ছেলেছোকরারা এদিকটায় বসে ব্যবসা বলতে ট্রেনের কামরায় কামরায় পাউরুটি বেচে। কদিন পরে তারাই প্ল্যাটফর্মে তক্কে তক্কে থেকে ছিনতাই করে। দু'একজন বেরিয়ে গিয়ে ওয়াগন ব্রেকার হয়েছে। নয়ত বেশির ভাগই ভোরবেলা পানজাবি হোটেলের ঢাউস ঢাইস চুলোর ছাই ঘেঁটে কয়লা খোঁজে। তারপর আস্তে আস্তে বয়স হতে দেখা যায় এরাই কেউ পুরনো কাগজ কিনে বেড়ায়। কেউবা পুরনো গ্রামোফোন, টাইপরাইটার, টায়ার।

ন্যাশনালাইজেশনের পরে আমাদের এদিকটায়ও একটা ব্যাংক হয়েছে। তার বাবুরা দশটা দশের ট্রেনে এখানে এসে নামে। ডিপোজিট বিশ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাওয়ার একজন অ্যাকাউন্টান্ট আসবেন শোনা যাচ্ছে। এখানে এত টাকা জমা পড়ার কারণও আছে। আবাদের সস্তার দুধের ছানা নিয়ে আমাদের গাঁয়ের উপর দিয়ে ট্রেন ভোরে কলকাতায় যায়। ফিরতি ট্রেনে এখানকার নতুন কলেজের মাস্টারমশাইদের নিয়ে ফেরে। আসলে আমাদের হল গিয়ে কেনাবেচার জায়গা। আটজন এম বি বি এস, সতেরোজন উকিল, একুশজন প্রাইমারি টিচার, একজন করে পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার, স্টেশনমাস্টার থাকায় আমাদের এই স্টেশনবাজার এলাকার বিরুদ্ধে অনেকেরই হিংসে। তাছাড়া একটি হেলথ সেন্টার আছে, আছে পঞ্চানন অপেরা পার্টি। উপরন্তু ফি শনিবার গোহাটা বসে। তাতে দাড়িঅলা কাবলি ছাগলও আমদানি হয়।

বলতে গেলে অনেক কথা আছে আমাদের। শুধু এইটুকু বলি, আমাদের এখান থেকেই মাছ, মুড়ি, তাড়ি, ঠিকে ঝি, ভিখারি, ঢেড়স ফার্স্ট লোকালে কলকাতায় যায়। কলকাতা থেকে লরিতে গম এলে এখানকার একান্নটা দশঘোড়ার গমকল গোঁ গোঁ আওয়াজ করে তাকে আটা বানায়। আবার এখানেই লোকের ওপর ভর হলে মাথায় ভরা-কলসি নিয়ে পঞ্চাননতলায় আসে। বিয়ের বাজারে একটা পার্টিই সব কটা রিক্সা সাইকেল ভাড়া নিয়ে ফেলে। তখন আর উপায় কি! হাঁটো একা একা। রবিবার ভাগা দিয়ে মাংস বিক্রি হয়। আমাদের এখানে কসাই তিনজন। থানা এখান থেকে পাঁচমাইল। ফাঁড়িতে একজন জমাদার থাকে। তার নাম তারাপদ মালাকার। বয়স কম। দিনে দুপুরে পরিষ্কার ঘুষ খায়, কোন ছাপাছাপি নেই।

একটা খাল আছে আমাদের এখানে। তা ঘুরে ঘুরে মগরমপুর পর্যন্ত গেছে। জল নোনা বলে চাষে লাগে না। মাছ হয়। লোকে সারাদিন ঘাঁটাঘাঁটি করে চাবলি, চিংড়ি, ট্যাংরা—যাহোক কিছু পায়। এই খালটাই তবু এখানকার কিছু আদি দৃশ্য ধরে রেখেছে। জায়গাটা নতুন হয়ে যাচ্ছে। তার ভেতর

এখানকার যা-কিছু পুরনো—তা এই খালেরই গায়ে। যেমন, বয়স্ক বিষধর সাপেদের গর্তগুলোর বেশির ভাগ এই খালেরই তোলা মাটির বাঁধে। বাঁধটার নাম অবশ্য কোমপানির বাঁধ। কেন যে তা কেউ বলতে পারে না।

দূর থেকে দেখা যাবে—বিশাল মাটির বাঁধ আকাশের সঙ্গে মিশে থেকে পেছনটা আড়াল করে আছে। তা এই খালেরই গায়ে রেল কোম্পানির একেবারে গোড়ার দিককার ইট বানানোর পুকুরমার্কা সব গর্তগুলো জলে বোঝাই হয়ে পড়ে থাকে। এখানেই এত লতাপাতা, জঙ্গল যে চরতে বেরিয়ে পাতিহাঁস শেয়ালের পেটে যায়। এই পথেই রেলের স্লিপার চুরি হয়ে জলে জলে ভাসিয়ে নিয়ে লোকে রাতারাতি করাতকলে চেরাই করে নির্দোষ তক্তা বানিয়ে ফেলে।

এখানে দিনের বেলা ছ' সাতশো বিঘা জুড়ে রোদ্দুর হাসে। বেশি রাতে চাঁদ এখানেই আলাদা রকমের তেরছা জ্যোৎস্না ফেলে। শান্ত স্তব্ধ গম্ভীর চৌকো জ্যোৎস্না। তার ভেতরে গভীর রাতের বাতাসে বুনো লতার ডগাগুলো তিব তির করে কাঁপে। তখন মালগাড়ি শান্টিংয়ের আওয়াজ ইটখোলার জলেও কাঁপানি তোলে। গাছপালা ছাড়া এসব দেখার কোনো সাক্ষী থাকে না তখন। দিনের বেলা হলে গরু চরাতে এসে রাখালরা তবু দেখে।

তা এখানে ভবেন এল। লোকটাকে লোকে ভবেন বলেই ডাকতে লাগল। মাথার টাক জুড়ে কিছু কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। নোনাজলের পোড়খাওয়া গর্ত গর্ত মুখ। নাকের পাটা বাঁকানো বাঁকানো। গায়ে একটি রংচটা গলাবন্ধ গেঞ্জি। পরনে হাঁটুঝুলের ঢোলা হাফপ্যাণ্ট। খালি পা। তার দুটি আঙুলে আবার নখ নেই। চওড়া হাত জুড়ে জেগে ওঠা শিরার লাইন। চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। তা এই ভবঘুরে প্যাটার্নের লোকটি এক শনিবার দুপুরে আবাদের দিক থেকে ট্রেনে এসে ডাউন প্ল্যাটফর্মে নামল।

সঙ্গে একটি মেয়েছেলে। কাপড়ের পুঁটুলিতে কিছু বরবটি। আর একটি মাটির হাঁড়ি। সবাই বলল, ও হল গিয়ে ভবেনের ভাগানো মেয়েমানুষ। দ্যাখো গিয়ে লাট অঞ্চলের কারো বউ টউ হবে। সেখানে নাকি আইন, সভ্যতা এখানো পাকাপাকি শেকড় নামাতে পারেনি। সবই শোনা কথা। এদিককার বেশির ভাগ ভদ্দরলোক-ক্লাশের লোকজন ভোর ভোর জুতোপায়ে কলকাতায় চাকরি-বাকরি করতে যায়। সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে সকালের কাগজ মন দিয়ে পড়ে। আর খালি পায়ের লোকজন জনখাটে। পাঁচ মাইল হেঁটে মেলায় যায়।

ক'দিনই কলকাতার ডেলি প্যাসেঞ্জাররা দেখলো, ডাউন প্ল্যাটফর্মে হাফ-প্যাণ্ট পরা একটা লোক ইঁটের চুলোয় কাঠকুটো গুঁজে ভাত সেদ্ধ করছে মাটির হাঁড়িতে। তার পাশে ঘোমটা টেনে একটি মেয়েছেলে ঘট হয়ে বসে থাকে।

ক'দিন বাদেই প্ল্যাটফর্ম আবার ফাঁকা। ওদের আর দেখাই গেল না। আমাদের এখানে আগের মতই লোকাল ট্রেনগুলো নিয়মিত লেট হতে লাগলো। সূর্য টাইম মত উঠতে লাগল। ফাল্গুন চৈত্রে আমাশার প্রকোপ কম বলে লোকাল ডাক্তারদের মুখগুলো শুকনো। পেশেন্ট কম।

ওদের দেখা আবার যে প্রথম পেল বছর তিনেকের তফাতে সেদিনই সবে সে এখানে ফিরছে। আমাদের এখানকার সবেধন আধা-ডাকাত আধা-চোর। এমনি দেখতে মিনমিনে। চাদ্দিক আঁধার করা বর্ষার রাতে এই মানুষই সড়কি হাতে গোলা কেটে ধান সরায়। আমাদের আদরের সন্তোষ টাকি। মাথা-মুখ ছোবড়া ছাড়ানো পুজোর নারকেলটি। দু'টি ফিকে ভ্রূ ছাড়া ও তল্লাটে কোথাও একগাছি চুল নেই। তাই সন্তোষ টাকি।

আলিপুরে খালাশ পেয়েছিল ভোরবেলা। দশটা দশের ট্রেনে এখানে নেমে দেখে অনেক কিছু পালটে গেছে। তিন বছর আগে জেলে যাবার সময়কার স্টেশনমাস্টার, পোস্টমাস্টার, হেডমাস্টার—তিনজনই বদলি হয়ে গিয়ে নতুন লোক বসেছে। একটা ব্যাংকবাড়ি হয়েছে। লোকে সেখানে টাকা রাখে। একটা কলেজও বসেছে। হাতে ঘড়ি দিয়ে ছেলেরা পড়তে যায়।

তখন দুপুর বেলা। জুতো পায়ের লোকজন সব তখন কলকাতায়। জনখাটার লোকজন যে যার বাড়িতে খেতে গেছে। বিড়ি তামাকের দোকানদাররা ভয়ে ভয়ে একটা দুটো বিড়ি এগিয়ে দিল সন্তোষ টাকিকে।

কেউ বলল, এ-বেলাটা এখানে শুয়ে থাকো।

কেউ বলল, আর ওসব পথে না গিয়ে এবার খাটাখাটি করে খাও।

আরও অনেক কথা ঘুগনি খেতে খেতে সন্তোষ টাকি শুনলো। যেমন :

এবার একটা ঘুরদোর বানিয়ে থিতু হও। বয়স তো বসে নেই।

তুমি তো ঝাড়া হাত পা। একটা পেটের জন্যে এত ঝামেলায় জড়ানো কেন? বেশ তো দোকান ঘরটর করে থেকে যেতে পারো।

আমি তো অন্য কোন কাজ জানিনে। লেকচার না দিয়ে একটা গ্লাস জল দে তো। গলায় আটকে যাচ্ছে ঘুগনি। জেলের সাঙাতরা বোধ হয় মনে নিচ্ছে।

বেলাবেলি নিজের কাজের জায়গায় রওনা দিল সন্তোষ টাকি। শীতে ভুগে ভুগে রোদটা এখন সবে কড়া হতে শুরু করেছে। মাটি এই সময় ফেটে ফেটে নুন তুলে দেয়। সেই গুঁড়ো মাটি ঝিনুক দিয়ে চেঁছে মাটির মালশায় তুলে নিয়ে বাড়ি গিয়ে জলে ফোটালে নুনটা তলানি হয়ে জমে। সেই নুন ভাতের পাতে খায়। আবার অভাবে পড়ে মুদি দোকানে দিয়েও আসে লোকে। তাতে পঞ্চাশ ষাট পয়সা যা আসে তাই লাভ।

খাল কাটার সময়কার কোন্‌কালের সেই তোলামাটি লোকের মুখে কোম্পানি বাঁধ। রাখালরা গরু চরাতে এসে বলে—খালধার কিংবা খালপাড়। বিশাল ঢাল তুলে এবড়োখেবড়ো সে-মাটি সিধে দ্বারিকপোতার দিককার আকাশে উঠে গেছে। সেখানটায় খালটা দু' ফাঁক হয়ে দু' দিকে চিরে গেছে। এখানটা নির্জন। লোকে বলে খালের তেমাথানি। এখানেই জানাশুনো গর্তে সন্তোষ টাকি যন্ত্রপাতি রাখে। দু' একবার সাপখোপ তাড়িয়েও যন্ত্রপাতি রাখতে হয়েছে। জিনিসপত্র পেলে ওখানকারই আশপাশের ঝুপসিজঙ্গলে দিনে দিনে সেঁধিয়ে রেখে রাতারাতি হাবিশ করতে হয়েছে তাকে। এই কোম্পানি বাঁধেরই প্রায় আধাআধি অব্দি লোক নুনমাটি কুড়োতে আসে। জ্যোৎস্নারাতেও পায়েচলতি পথটাকে নুন ফুটে উঠে শাদা করে রাখে। বর্ষার জল দাঁড়ায় না। কিন্তু এঁটেল মাটি বলে পা ভীষণ হড়কায়।

কোম্পানি বাঁধে উঠে সন্তোষ টাকি তো অবাক। সেই সে প্রায় তেমাথানির কাছাকাছি গিয়ে কে এখন নুনমাটি কুড়োচ্ছে। কার বুকে এত সাহস? এই অবেলায়। অমন নির্জনে? সূর্য সবে কাৎ হয়ে পড়েছে। বাঁধের আধাআধি পৌঁছে বুঝলো মেয়েছেলে। দিব্যি বসে পড়ে মাটি কুড়োচ্ছে।

আরও এগিয়ে সন্তোষ টাকি বুঝলো, মাটি কুড়োচ্ছে না। আসলে ঝোড়ায় করে মাটি বয়ে দিচ্ছে। প্রায় চল্লিশ হাত রাস্তা হেঁটে গিয়ে মাটির ঝোড়া মাথা থেকে নামিয়ে দিল : আর সেখানে হাফপ্যান্ট পরা একটা লোক খালের জল দিয়ে সে-মাটি পায়ে মাড়িয়ে জাব করছে। একটা ঘরের দেওয়াল উঠেছে অনেকটা। পাশেই তালপাতার ঝুপড়ি। তার গা দিয়ে লাউচারা সবে সিধে হচ্ছে। কোত্থেকে দু'টো বাবলা গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে খালের জলে ঘাটলাও তৈরি। সেখানে মাটি মাখানো ভাতের হাঁড়ি উপুড় করে বসানো। ভালো করে তাকালে গোড়ালি জলে আরো দু' একখানা জিনিস ভেজানো অবস্থায় দেখতে পেত সন্তোষ টাকি। কিন্তু সে তখন অনেক জিনিস একসঙ্গে দেখছিল। জাব মাটি চড়িয়ে চড়িয়ে দেওয়াল তোলা, লাউচারা, মেয়েছেলেটির মাটি বয়ে আনা, বিকেলবেলার কোম্পানি বাঁধ।

জায়গাটি ভালো বেছেছো।

ভবেন কোন জবাব দিল না। শুধু একবার মেয়েছেলেটির দিকে চেঁচিয়ে বলল, এই দাক্ষী! ঢেলা ভেঙে গুঁড়ো মাটি আনবি বলে দিলাম।

সন্তোষের এই প্রথম একটি নতুন কথা জানা হোল। মেয়েছেলেটির নাম- -দাক্ষী। পুরুষটার নাম তো জানা গেল না এখনো। ঢেলা মাটি মাড়িয়ে জাব বানাতে পায়ে তো লাগবেই। পুরুষ লোকটা, সন্তোষ টাকি ভালো করে দেখে বুঝলো. হাফ-ভিখারী, হাফ-গুণ্ডা। তেড়েমেড়ে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারে। এক একবার খরচোখে তার দিকে তাকিয়ে ঠেকে রাখছে। এখানে তালপাতার ঘরে থেকে ঘর বানাচ্ছে যখন—সাহস আছে নিশ্চয়। সন্তোষ নিজে এদিকটায় রাতবিরেতে চলাফেরা করেছে। কিন্তু রাতে থাকেনি কখনো।

লোকটা জাব মাটি চড়াচ্ছিল দেওয়ালে। এইভাবেই খানিক গেঁথে জিরেন দিয়ে দিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে আবার গেঁথে তুলতে হয়।

সন্তোষ হা হা করে ছুটে গেল। কী হচ্ছে? মাটির ভেতর ছন দিলে না? বর্ষায় তো দ্যাল গলে যাবে—

একটা বর্ষা তো।

বাঃ! বছরে দুটো বর্ষা আসে নাকি। কী ধারার লোক বাপু তুমি?

ঝোড়া ফেলে দাক্ষীও কাছে এগিয়ে এল। আমিও তাই বললাম। তা কানে নেবে নাকি। শুধু বলে একটা বর্ষা তো মোটে!

নদীর নোনা বাতাস খেয়ে খেয়ে লোকটায় সারা গা তামাটে। ক্ষয়া দাঁতে বুজ-বুজ করে হাসি কেঁপে উঠতে লাগলো। এক বর্ষার বেশি কুথাও তো থাকিনি। সন্তোষ টাকি দেখল, লোকটা হাসিমুখ, মাথায় পেছনে বিকেলের বাড়তি রোদ মাখানো ঝাঁকড়া খিরিশ গাছটা খালের ওপারেই দাঁড়িয়ে। তার ওপাশে দ্বারিকপোতা পড়ে আছে। ওরা তিনজন এখন আকাশে উঠে যাওয়া কোম্পানি বাঁধের ওপর।

একটা হেঁসো দাও তো দেখি। ছন ঘাস কেটে এনে দিচ্ছি। কুটি কুটি করে জাব মাটিতে মিশিয়ে নেবে। তারপর গাঁথো। ছ' বর্ষাতেও দ্যাল কাবু হবার নয়।

বেশ খেলা খেলা লাগছিল সন্তোষের। কোম্পানি বাঁধে হাফ-ভিখারী হাফ-গুণ্ডা একটা লোক হাফ-প্যান্ট পরে দ্যাল গাঁথছে। দাক্ষী তার হয়ে ঝোড়ায় মাটি বয়। বিকেলের রোদ্দুরে মায়া ছিল। বাঁধের ঢাল বেয়ে সন্তোষ টাকি হেঁসো হাতে ঘাস কাটতে নেমে গেল। বেশ মজা তো। সন্তোষ টাকির এমন আরাম আগে কোনদিন হয়নি।

তারপর কিছু দিনের ভেতর জুতো পায়ে দেওয়া ভদ্দরলোকক্লাশের লোকজনদের বৌ-ঝিরা বিকেল বিকেল বেড়াবার অছিলায় কোম্পানি বাঁধে পায়চারি করতে আসতে লাগল। স্টেশনমাস্টারের বউ পোস্টমাস্টারের বৌকে বলল, চলুন না দিদি—দু'জন পুরুষ একজন মেয়েছেলের দখল নিচ্ছে কি করে, দেখে আসি একবারটি—

এইভাবে কোম্পানি বাঁধে ক্রমে ক্রমে লোক সমাগম হয়। বেশির ভাগই মেয়েলোক। তারা এদিক-ওদিক নিরামিষ চোখে তাকিয়ে বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না। মাটির দেওয়ালে বাঁশের দরজা। ওপরে খড় চাপানো। একজন আরেকজনের কাঁধে ধাক্কা দিয়ে আঁচল ঢেকে হাসে। এ মাগো! একখানা ঘর। দু'জন পুরুষ। ঘেন্না! ঘেন্না!

দাক্ষী হয়ত তখন উবু হয়ে ন্যাকড়ার ওপর বড়ি শুকোতে দিচ্ছিল। কিংবা কোম্পানি বাঁধের যে জায়গাটা একেবারে আকাশে উঠে গেছে—সেখানে দাক্ষী বিকেলের মোলায়েম রোদে চুল মেলে দিয়ে শুকোবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে। তখনই দ্বারিকপোতার আকাশে একখানা মেঘ ঝুলে পড়ে। এ সব দেখার মত চোখ ভবেনের নেই। এ সব দেখার মত চোখ সন্তোষ টাকি কোত্থেকে যেন ফিরে পাচ্ছিল। বাবুদের বৌ-ঝিরা এ সব দেখে শুনে আঙুল মটকে মুখে বলেছে ঢঙ! আমরা কিছু আর বুঝি না? হেডমাস্টারের সূতিকায় সারা বউ মনে মনে তিনবার বলেছে গতর! গতর!! গতর!!! যেদিন থাকবে না?

পুরুষদের সময় কম। তারা যাওয়া আসার পথে যেটুকু দেখতে পেল, তা হল : হাফ-প্যান্ট ভবেন সাড়ে পাঁচ টাকা রোজে জয়াধানের বীজ ভাঙছে। রোয়া কেমন এখনো জানা যায়নি। কিছু ন্যালা ক্ষ্যাপা আছে। লোকে এইটুকু যা বলল।

ভদ্রেশ্বর পরামানিক বাবুদের গাল কামাতে কামাতে হেসে বলে, সন্তোষ টাকি এখন কোম্পানি বাঁধে ঘর সারে। সারাদিন ঠুক্‌ঠাক। খানে খড় চাপাচ্ছে। ওখানে মাটি লাগাচ্ছে। দিনে একবার মোটে বাজারে হাজিরে দেয়। বিড়ি, দেশালই, আলুটা, মুলোটা! এই আর কি!

বাবুরা আর ভদ্রাকে ঘাঁটায় না। কি বলতে কি বলে বসবে। মুখের তো কোন লাগাম নেই। সবাই জানে, ডাকাতির সুলুক-সন্ধান ভদ্রা গিয়েই সন্তোষকে দিত। দিয়ে ভাগা পেত।

তোর না গুরু?

সে ছিল এককালে! এখন কী আর পুরুষমানুষ আছে? তারপর ক্ষুরখানা চেটোয় মুছে গুনগুন করে

তান দিল আর দাড়ির দানা দেখে দেখে ক্ষুর বোলাতে লাগল। কোম্পানি বাঁধের বাইরে আর বেরোচ্ছে কোথায়!

ভবেন মানুষ না পাথর বোঝার উপায় নেই। জনখাটুনির মাঝে হন হন করে হেঁটে গিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ পাউরুটি আর আলুর দম খায়। সঙ্গে ছেলেছোকরাদের টিটকিরি থাকে। আজ গিন্নি রাঁধেনি। না! বড় জামাই নে আছে!

ভবেন সোজা আকাশের দিকে তাকিয়ে পাউরুটি চিবোয়। কাজের সময় কথা বলে না। হাফ-প্যান্টটা কোমরে নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা। কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার চারদিকে কাঁচাপাকা চুলের রেলিং। নাকের পাটা বাঁকানো বাঁকানো। লম্বাপানা লোক। রাস্তায় হাঁটবে ঠিক সোজা তাকিয়ে। গুঁতো খেলে ব্যথায় কাতরায় না। চোখ কুঁচকে একবার মোটে পায়েব দিকে তাকায়। আবার লম্বা পা ফেলে ফেলে হাঁটে। রিলিফের আটা বিলির সময় লাইনেও অমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ধাক্কা খেয়ে এগোয় পিছোয়। কিন্তু কোনো কথা বলে না। পা মাড়ালে গালমন্দ দেয় না। কালচে মুখের ওপর শাদাটে গোঁফ চকচক করে। সবসময় ভাবছে। ভাবছে। বাঁশি দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রেন গেলেও চমকায় না।

সন্ধ্যেবেলা বিড়ি দেশলাই যোগাড় করতে এসে সন্তোষ টাকি তুলসীর দোকান থেকে একখানা সাবান সরালো। তারপর সরকার অয়েল মিলে গেল খানিকটা সরষের তেল চাইতে। ওদের টিনের তলানি ঝরিয়ে নিতে দিলেই একটা শিশি ভরে যাবে। বেরোবার সময় দাক্ষী বলেছে, খালের মাছ তো সবাই ধরতে পারে। তেল কোথায়?

কেরোসিনটা ভুট্টা, আটটা ভবেন কষ্টেসৃষ্টে জুটিয়ে আনে। মাছ, আনাজপাতি—সে যেরকমই—সন্তোষ টাকি যোগাড় করে ফেলে। কাঠকুটো দাক্ষী সবসময়েই কুড়িয়ে এনে রাখে। কিন্তু সরষের তেলটা আর হয়ে ওঠে না। সন্তোষ টাকি দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সরকার অয়েল মিলের বড়জন বলল, তুই কেন পলা পেতে নিবি। ইদিকে আয়। পাত্র এনেছিস—

বড়বাবু। আমার হাতে কিন্তু পয়সা নেই।

তাতে কি। তুই এট্টা দেশের লোক। তাতে কি। তারপর বাড়তি তেলটা হাতের পাতায় মুছে খুব অন্তরঙ্গ গলায় বড়বাবু বলল, হ্যাঁরে তোদের ওই মেয়েছেলেটার নাম যেন কি?

দাক্ষী। নাম দিয়ে কী হবে আপনার?

নাম না হলেও হোত বটে। তবে কিনা, শুনেছি ডাকিনী মন্ত্র জানে। তুকতাক করে। কি বলিস। হ্যাঁ—

তা করে! মজা পেয়ে সন্তোষ বলতে লাগল। বেশ করে—

কিরকম? গান-টান গায়।

শুধু গান! পূর্ণিমে রাতে কোম্পানি বাঁধে একা একা নাচে। চুল আলায়ে দে—

সন্তোষ জানতো, এই লোকটির দু'টি সরকারী বউ। তাছাড়া শেয়ালদায় পৃথক বাসায় একটি মেয়েমানুষও আছে। তার জন্যে শনিবার শনিবার বৈঠকখানা বাজার থেকে পৃথক বাজার করে। বড় বড় টমেটো। বড় বড় কই। এখানকার অনেকেই দেখেছে।

এট্টু দেখাবি?

তেল তো নেওয়া হয়ে গেছে। সন্তোষ দোকান থেকে রাস্তায় নেমে বলল, বাঁধে উঠলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

তা দিস বাপু। এ ঠ্যাং আর রেখে লাভ কি। একবারটি দেখাস। কাছ থেকে। কথা বলব না। দেখব একটু। গান শুনবো। নাচ হয় তো নাচ দেখাস খানিক কি বলিস। হ্যাঁরে বাপু।

এ যে একদম গুড়ের মাছি। বলতে বলতে সন্তোষ সটকে এল।

ভবেনকে কেউ বিশেষ ঘাঁটায় না। দেখেছে ঘাঁটিয়ে। কোন লাভ নেই। কথা কয় না। চুপচাপ শূন্যে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যে সন্ধ্যে সেদিন তিনজনই খেয়ে নিল। দাক্ষীর রান্না। অনেকদিন পরে ভাত। রিলিফের চালের গরম গরম ভাত। সঙ্গে খালের মাছ। খাওয়া হতেই দাক্ষী এক ফুঁয়ে কুপিটা নিবিয়ে দিল। নয়ত এতক্ষণ খেতে বসে একজনের মুখে কাঁকড় পড়লেই আরেকজন কুপিটা এগিয়ে দিচ্ছিল। মুখে কোন কথা

নেই। ভবেন দেয় সন্তোষকে। সন্তোষ ভবেনকে। দাক্ষী খেতে বসেছিল একটা কলাই বাটি নিয়ে। আর সবই এখানে মাটির। নয়ত পাতা। কাণ্ড দেখে বাটির উঁচু কানাত দিয়ে মুখ ঢেকে ভাতের গরাসের ফাঁকে ফাঁকে দাক্ষী মিটির মিটির হাসছিল। তারই জন্যে দু'টো জ্যান্ত মানুষের কথাবার্তা কমে গেছে। একি কম মজার!

সেদিন আকাশের গায়ে ফোস্কা পড়েছিল। থেকে থেকেই কালচে মেঘে বিদ্যুৎ ঝলকে যাচ্ছিল। ভবেন খালের তেমাথানির ঢালের দিকে বসে বিড়ি ধরাচ্ছিল আর নিবে যাচ্ছিল। সন্তোষ ঘরের সামনের উঁচু ঢিবিটায়। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেই দাক্ষী যে জায়গায়টায় বসলো—সন্তোষ টাকি জানে, অনেকদিনই জানে, ওখানে তেনারা থাকেন। মাঝে মাঝে ছানাপোনা হয়। বংশ বাড়ে। তবু বুড়ো বুড়ি জায়গা পালটায় না। মাঝে মধ্যে বুড়োটা বেরোয়। কখনো বুড়িও বেরোয়। বয়স হয়েছে। মাথা হাতের চেটোর চেয়েও চওড়া। ঠেলে দাঁড়ালে চিক চিক করে।

সরে বোস জায়গা ভাল না।

কাটে কাটুক বলেই অন্য কথায় চলে গেল দাক্ষী। তোমাদের এখানে নদী নাই কেন?

সব জায়গায় কি নদ হয়!

আমাদের দেশে—সব জায়গায়। বলতে বলতে দাক্ষী একটা বুনো সুর তুলে নিল গলায়। সেই গানের ভেতরেই চাঁদ উঠে এল আকাশে। ভবেন দু'বার কাশলো। দু'বারই বিড়ি ধরানোর শুকনো কাশি। দাক্ষী বলল, আমাদের আবাদে ভাঁটায় জল সরে যায়। তখন নদীগুলো মাঠ। সেখানে জোলোঘাস খেতে গুরু নেমে আসে। আবার জোয়ারের তাড়ায় গরুগুলো পাড়ে ফিরে আসে। এ নিত্যিকার কাণ্ড—

ভবেন হন হন করে ঘরে ঢুকে গেল।

কোথায় যাওয়া হচ্চে শুনি?

আমি ঘুমোবো না?

তা ঘুমোও এখন। তবে ঘুম পেলে জায়গা ছেড়ে দিও।

ভবেন ভেতরে যেতে যেতে বলল, তুমি তো দিনি দিনি ঘুমোও। সারাদিন মাঠে খাটুনি। এখন একটু শোব না?

দাক্ষীর এসব ভালই লাগছিস। কে তার সঙ্গে শোবে তাই নিয়ে রোজ এরকম কাণ্ড।

কাছাকাছি থাকে সুধন্য। জিপিও-তে সর্টার। ভোরে বেরিয়ে সন্ধে রাত ফেরে। সে তামাক খেতে বসে সন্তোষের চড়া গলা পরিষ্কার শুনতে পেল। তা সন্ধে রাতে শুয়ে নাও। পরে উঠে গেলেই হোলো।

দিনি খেটে ভাত যোগাবো! আর রাতে রাতে বাইরে বসে পাহারা দেব?

তা গরমের রাতে না হয় বাইরে শুলে—

রাতভোর শিশির পড়ে। ঘুম হয় নাকি? এভারে ভবেন দাক্ষীর দিকে ফিরে তাকালো। অন্ধকার সন্ধ্যা। কেউ কারও চোখ দেখতে পায় না। সুতরাং মনও দেখা যায় না। গলার স্বর শুনে যে যেটুকু পারে ভেবে নিতে পারে। তুই কিছু বলবি না দাক্ষী? রোজ চুপ করে থাকবি?

দাক্ষী এবার সত্যিই ডাকিনীর মত খ্যা খ্যা করে হাসলো। অনেকক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ চমকে মাঝে মাঝেই দাক্ষীকে একটা আটোসাটো বড় সাইজের শুয়োর লাগছিল। হাসি থামিয়ে বলল, আমি বাপু কারও দিকে নাই। যে পারো জিতে লও! আপত্তি নাই। কেউ তো দুধের খোকাটি নও। দাঁতের পরিচয় আমি পাই নাই?

কথাটা খুবই সত্যি। ভবেনের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষও মিইয়ে যায়। আস্তে আস্তে বলে, ভবেনদা তুমি একটা ভাত ঘুম দিয়ে নাও। এখন তো আমাদের ঘুম নাই চোখে-

তা থাকবে কোত্থেকে। সারা দুপুর ঘুমাইলে—বলতে বলতে ভবেন ঘরে ঢুকে গেল। মাটির নিকানো মেঝে। কোণে মেঝে খুঁড়ে চুলো। এক দেওয়ালের গায়ে লম্বালম্বি বাঁশের চৌকি। সন্তোষ টাকির রাতে রাতে কেটে আনা বাঁশে তৈরি। ভবেন শুতেই ক্যাচকোচ শুরু হল ... আড়মোড়া ভেঙে ভবেন ডাক ছেড়ে চেঁচাতে লাগলো। দাক্ষী—দাক্ষী—

উত্তর দিল সন্তোষ টাকি। এখন দাক্ষী ঘুমোবে না। তোমার ঘুম পেয়েছে—তুমি ঘুমিয়ে নাও।

বাঁশের চৌকিতে উঠে বসল ভবেন। ঘুমোবোই তো। সারাদিন তো আঁচল ধরে থাকি না। জন খাটি।

ক'দিন ধরেই চারদিকের মাঠগুলো সদ্য রোয়া ধান চারায় জুড়ে যাচ্ছিল। আর ফাঁক নেই কোথাও। যেটুকু আছে—তাও থাকবে না। দিনেব আলোয় এ-ছবি আর ভবেনের দেখতে ভাল লাগে না। অথচ একটা চিন্তা তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরছে। তার থেকে কোন মুক্তি নাই। রোয়া শেষ হলে দেশ-গাঁয়ে কাজ খতম। তখন কোথায় জন খাটবে? কি খাবে? সন্তোষটা আজকাল ডাকাতি দূরে থাক—চুরিটা পর্যন্ত করে না। তিনটে প্রাণীর আহার জোটাবে কোত্থেকে? সারাদিন যদি ঘরেই থাকে। এই দাক্ষী—

দাক্ষী ছুটতে ছুটতে ঘরে গেল। কেন?

দুয়ারটায় হুড়কো দে—

দরকার নাই। এখন আঁধার—

দে হুড়কো। বলছি দে। একটা হায়া নাই। কী রকমের মেয়েমানুষ তুই!

মুখের ওপর দরজা বন্ধ হওয়াতে সন্তোষ গজরাতে লাগল। এইমাত্র দেখতে পেল, দ্বারিকপোতার আকাশে একজোড়া তারা খসে পড়ছে।

ভবেন তখন দাক্ষীকে জানবার চেষ্টা কর্বছিল। সন্তোষ কেমন রে? আমার মত?

দাক্ষী বলতে যাচ্ছিল, খারাপ কি! কিন্তু মুখে এসে গেল, তোর চেয়ে অনেক ভাল।

ভবেন চোক গিলে বলল, তাতো হবেই। ওর তুলনায় আমার যে বয়সটা অনেক বেশি। আমি কি করে ওর মত—

নাও কথা বাড়িয়ো না। যা করছ কর।

খানিক পবেই ভবেন নিজের হাতে হুড়কো খুলে ধাই ধাই হাঁটতে লাগল কোম্পানি বাঁধে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তহশীলদারের খাতায় খাড়ুপাতাল মৌজায় এই বাঁধের জমির পরিমাণ একাশো একাশি বিঘে। এতটা জায়গা এখন ওই তিনজনের বৈঠকখানা।

দাক্ষী বেরিয়ে এসেও সন্তোষকে খুঁজে পেল না। তখন সেই সুরটা তুলে নিল গলায়। কিছু বুনো। বেশিদূর যেতে হল না। খালের জলে সন্তোষ আটল বসিয়েছিল। সেখানে খুঁটিয়ে দেখছিল, কোন মাছ পড়েছে কি না। কোম্পানি বাঁধে দাক্ষী এসে দাঁড়াতেই সন্তোষ টাকি হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল। তুই কে দাক্ষী? তুই আসলে কে?

দাক্ষী হাসলো না। কাঁদলো না। আমরা নদীর ওপারের লোক। আয় ঘুমোবি চল—

গলার বুনো সুরটার ফাঁস পরিয়ে সন্তোষকে ওপরে তুলে নিয়ে এল দাক্ষী। আমি কি একটুও ঘুমবো না? সারাদিন লোকে দেখতে আসে। আমি ঘট হয়ে বসে থাকি। এখন আমার ঘুম চাই।

তুই আসলে কে দাক্ষী?

কাল বলব।

দুয়ারে হুড়কো দেওয়া হল না। ওরা ঘুমোলো। ভীষণ ঘুমোলো। অর্ধেক রাতে বাইরে এসে সন্তোষ ভবেনকে পেল। সন্ধেরাতে দাক্ষী যেখানটায় বসেছিল—সেখানটায় বসে ভবেন অন্ধকারের ভেতর মাটিটাকে দু'ভাগ করার তাল খুঁজছে। সন্তোষকে দেখে বলল, ঠিক এখানটায়—পরিষ্কার বোঝা যায়—মাটির নিচি কারা চলাফেরা করে—

তেনারা করেন। সরে বোস।

ভবেন জায়গা না পালটে বলল, কাটে কাটুক।

এবপর বাবান্দায় বসে কাশতে কাশতে সুধন্য শুনলো, ফাঁকা কোম্পানি বাঁধে দু'দুটো পুরুষলোক যাচ্ছেতাই খিস্তি করে একজন আরেকজনকে তাড়া করছে। জানে, একজন ভবেন। অন্যজন সন্তোষ টাকি। কিন্তু অন্ধকাবে ছুটন্ত ছায়া থেকে কাউকেই আলাদা করে চেনা যাচ্ছিল না। সেই সঙ্গে রোয়া তোলা হুলো বেড়ালের ঝগড়া।

এর ভেতর দাক্ষী একবার উঠেছিস। বেশিরাতের কাঁচা জ্যোৎস্নায় একমেটে দু'টো অসুর তখনো হুটোপাটি করে কোম্পানি বাঁধটাকে জাগিয়ে রেখেছে। চোখে ভীষণ ঘুম ছিল দাক্ষীর। তাই দুয়ারের হুড়কো তুলে আবার বাঁশের চৌকিতে গিয়ে টান টান হয়।

ভোর ভোর তিনজনেরই যে ঘুম ভাঙালো—তাকে চেনে শুধু সন্তোষ টাকি। সে নিজে ছাড়া আর যে কোম্পানি বাঁধের আগানেবাগানে ঘোরাঘুরি করে—সে হল আশু বৈদ্য। বাড়ি কেশপুর। ফি বছর এ সময়টায় এদিকে এসে হানা দেয়। তার শিকার—বিষধর সাপ। পুষে পুষে বিষ বেচে। মরে গেলে ছাড়িয়ে চামড়াটা বেচে দেয়। ধড়টা এক ঝটকায় পগার পার। ধরা অভ্যেস গড়বেতার ওদিককার শাল-জঙ্গলের কেউটে। এ সময়টায় শুধু এদিকে আসে। ভিজে মাটির সাপদের স্বভাব চরিত্র তখন ওর অনেকখানি জানা।

দ্বারিকপোতার শেষে আকাশ জুড়ে আলতা। সেখান থেকে সূর্য উঠবে। সেদিকে তাকিয়ে আশু বলল, ঘর বানালে কবে?

এমন সময় দাক্ষী এসে দুয়ার খুলে দাঁড়াল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে আড়ামোড়া ভাঙলো দাক্ষী! তখনই আশু খলবল করে বলল, বে করলে কবে! বলবে তো—

দাক্ষী কটমট করে তাকালো। সেখান থেকে চোখ সরাতেই ভবেনের ওপর চোখ পড়ল। ছেঁড়া হাফপ্যান্ট। এই লোকটাইতো কোম্পানির বাঁধে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল। তার পাশে তেরছা হয়ে চোখ বুজে পড়েছিল সন্তোষ টাকি।

সন্তোষদা। এই তোমার শউরো?

আঃ সক্কালবেলাতেই কি মুশকিল। শ্বশুর কেন হবে। ও তো আমাদের ভবেনদা। আগে দ্যাখোনি তো। নতুন এসেছে। ওই তো তার বউকে দেখলে। এখানে সন্তোষ টাকির মুক-ফসকে বেরিয়ে এল ভাগানো বউ।

ভবেন একটা চড় তুললো। তার আর সন্তোষের মাঝে আশু বৈদ্যের মাথাটা পড়েছে। হাত নামিয়ে নিতে হল। আশু তাই দেখে বলল, এখন তো চড় তুলেছিলে। কিন্তু সারারাত কোথায় শুয়ে কাটালে ঠিক আছে?

কোথায়?

ওদের পুরো ফেমিলির ওপর শুয়েছিলে—! নড়াচড়া টের পাওনি? কি ঘুমরে বাবা!

টের পেছিলাম একবার-। কিন্তুক কোথায় খোন্তা। কোথায় শাবল।

না খুঁড়ে ভাল করেছো। খুঁড়লে আর রক্ষা পেতে না। বুড়োবুড়ি একসঙ্গে ছুবলে দিত। তারপর সকালবেলার বাতাসে রূপকথার মত পাতলা পাতলা গল্প ছড়িয়ে দিতে লাগল আশু। এখন ছানাপোনায় ওনাদের ডেরা বোঝাই। বুড়োবুড়ি ওদের এখন বড়ো করে যাবে। আরেকটু বড়ো হলে ওদের দিয়েই জল খাবার করবে—

দাক্ষী তো অবাক। নিজের ছেলেমেয়ে! নাতিপুতি?

হ্যাঁ গো। এখন বড়ো করে যাবে। খাবার মত হলে খেতে শুরু করবে।

তাও ওদের বাঁচানো যায় না?

সাপ কেউ বাঁচায়? হাসালে।

ধাড়ি দু'টোকে ধরতে পারলে—

সেজন্যিই তো আসা আমার—

তা তুমি ছোটগুলোকে নিয়ে গিয়ে পুষে বড়ো করতে পার।

অতগুলো সামলাবো কি করে! তুমি তো দু'টোর মোকাবিলায় আছ। কেমন লাগে?

তারপর ওদের চারজনের এক নতুন কাজ হল। সারা কোম্পানি বাঁধ জুড়ে বুড়োবুড়ি সন্ধান। এক-একটা গর্ত এত নির্দোষ দেখতে। তাতে খোঁচাতেই একদিন বুড়ি তার লেজগুটিয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। আর একদিন দুপুরে মাথা ভাঙা ঘাসের ডগা দেখে আশু বলল, বুড়োর তো বয়স হল। এখন ওজনও বেশ। এই পথে খালে নেমে ওপারে খাবারের সন্ধানে গেছে। যাবার বেলায় ঘাসের ডগাগুলো ভেঙে দিয়ে গেছে। এপথে ফিরলে নির্ঘাৎ ধরে ফেলবো।

বুড়ো সেদিন ওপথে ফিরলো না। ফিরলো বুড়ি। কিন্তু বড় চালাক। আশুবৈদ্যের কলকাঠি বানচাল করে দিয়ে দিব্যি বাসায় ঢুকে গেল। ঢোকা কি মনোহর। মাথাটা ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে দিব্যি ভেতরে চলে গেল।

আশু আজ গোসাপ ধরে। কাল ঘুঘু মারে। পরশু খালের জল থেকে দু'কেজির শোল মাছ তোলে। বুড়োবুড়ি এই দঙ্গলে যোগ দিতে না পারলেও পরিষ্কার বোঝা যায়—ওরা কাছাকাছি এই চারজনের ওপর নজর রেখেছে। এর ভেতর আবার দাক্ষীর সঙ্গে কে কখন শোবে—তাই নিয়ে রীতিমত লড়াই বাঁধে এক এক রাতে। তখন সুধন্যর কাশিটাও বাড়ে।

এর ভেতরেও আশুর বাণিজ্য খারাপ হচ্ছে না। নুন বেচা পয়সার আড়াই টাকা দিয়ে দাক্ষী আশুর কাছ থেকে একটা ছ-কোণা ফল কিনেছে। ফলটির নাম শিবলিঙ্গ। হাতে থাকলে সাপ মাথা নত করে।

ভবেন কিনেছে একখানা শঙ্খলাগা বস্ত্র। জনখাটুনির এগারো টাকা দিয়ে। বিক্রি করবার সময় আশু ফিস ফিস করে বলেছে, একবাব দাক্ষী ঠাকুরণকে এই বস্ত্রের ওপর বসিয়ে দেখো—কী ধারার বশ হয়ে যাবে ভাবতে পারবে না—

সে বস্ত্রে দাক্ষীকে বসাবার তাল খুঁজে বেড়াচ্ছে ভবেন। সন্তোষ টাকি আছে নতুন আমোদে। একটা কোম্পানি বাঁধ। চারটে মানুষ। ফেমিলিসুদ্ধ দুটো বুড়োবুড়ি। দ্বারিকপোতার আকাশ। সব নিয়ে একটা বড় সাইজের ছবি। যেদিকে ইচ্ছে ছুটে চলে যায। জেলখানায অত লোকের সঙ্গে থেকেও এ-জিনিস সে পায়নি।

আশুর৫ ম-, -াগে না জাযগাটা। আগে এখানে দিনে দিনে ধরতে এসেছে। এখন এখানে রাতেও থাকাব আস্তানা আছে। প্রথম দিককাব তালপাতার ঘরখানা এখন লাউডগায় ঢেকে ফেলেছে। কটকটে দুপুবে এক একদিন আশু তাব ভেতব চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। তখন গর্ত খোঁড়ার খোন্তা দিয়ে নাড়াচাড়া করে দাক্ষী।

সকাল সকাল বেবোতে গিয়ে বুড়োবুড়ি একদিন আশুর চোখে পড়ে গেল। কিন্তু ধরা অত সহজ নয়। অনেকদিনেব জিনিস। খেলাধুলোও জানে নানারকমের। ওরা তিনজনে মিলে এই ওদের দু'জনকে পায় পায়—আবার হারায়।

বেলাবেলি কোম্পানি বাঁধে উঠে দাক্ষী দেখলো ভবেন, সন্তোষ আর আশুকে এই এতটুকুন দেখাচ্ছে। ওরা তিনজনে মাটির ওপর পড়ে কি যেন করছে। তখন দাক্ষী আশুর খোন্তাখানা নিযে তেনাদের জায়গাটা খুঁড়তে বসল।

বেশিক্ষণ লাগল না। একদম কিলবিল কবছিল। অনেকগুলো। সবে মাথা তুলতে শিখছে। কী তেজ এক একটার। ধামা পেতে সব কটাকেই তুলে নিল দাক্ষী। তার ওপব কুলো চাপা দিয়ে ঘরের কোণে ধামাটা রাখল। শেষে মাটি চাপা দিযে গর্তটা বুজিযে দিল।

গর্তের আসল চেহারা আজ দেখতে পেয়েছে দাক্ষী। দেখে তার বুক কেঁপে উঠেছে। মাটির নিচে বুড়োবুড়ির কত সুড়ঙ্গ। তেলতেলে সরু পথ। এরকম একটা পথ দাক্ষীর ঘরেও চলে গেছে।

বুড়োবুড়ি ওদের তিনটেকে এলোপাথাড়ি দৌড় করিয়ে সন্ধে সন্ধে ফেরত আনলো। তখন অন্ধকারে আশুর চোখেও পড়ল না—ফেমিলিসুদ্ধ জায়গাটার মাটি আগাগোড়া খোবলানো। আশু কোম্পানি বাঁধে কাঠকুটোর উনুন ধরিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকমা আমাদের খুব রসিক। এই ধরা দেয়। আবার পালায়। কী দৌড়টা করালো সারাদিন। কি দাক্ষী ঠাকরুণ। একবার বাইরে আসবে নাকি!

ভেতর থেকেই জবাব দিল দাক্ষী। নাগো নাতি শরীরটে বড় খারাপ।

সে-খবর শুনে ভবেন অন্ধকাব ঘবে আবেকটু হলে পা দিয়েছিল আর কি। শঙ্খলাগা বস্ত্রখানা তো তার কোমরেই আছে। একবার তার ওপর দাক্ষী বসলেই হোল।

বাঁশের চৌকির ওপব থেকে চেঁচিয়ে উঠলো দাক্ষী। একদম ঝাঁ ঝাঁ করে।

ভবেন পেছিয়ে এল। তখন আশু গল্প জুড়েছিল। নৈহাটির শ্মশানে অমাবস্যার রাতে এক কোপে মড়ার মুণ্ডু কেটে নিয়ে বন্ধাবন্দী করতে হবে। তখন চারদিক থেকে কত লীলা এসে ঘিরে ধরবে। তাতে ভুলেছো কি মৃত্যু। পাখানা লাগানো অজগর উড়ে যাবে। যে-পুকুরের ওপর দিয়ে

উড়বে—নিমেষে তার জল শুকিয়ে যাবে। চোখের সামনে গাছপালাসুদ্ধ আকাশখানাকে শতরঞ্জি করে গুটিয়ে দেবে। পাহাড়ের চোখে জল।

শুয়ে শুয়ে বেশ শুনতে লাগছিল দাক্ষীর। এর ভেতর সন্তোষের গলা পেল। সন্তোষ বলছে, রান্না করে কী হবে! তার চেয়ে ভাল মাছ এনে পুড়িয়ে খাই—

ভবেন বলল, সেই ভালো।

সন্তোষ টাকি দোরগোড়ায় এসে বলল, মশলাপাতিগুলো একটু এগিয়ে দেবে—

দাক্ষী তখন টের পেয়েছে। পরিষ্কার টের পেয়েছে। তাই বাঁশের চৌকিতে ক্যাচকোচ তুলে চেঁচিয়েই সন্তোষকে ভাগালো।

সন্তোষ পিছিয়ে আসার সময় বাঁশের দুয়ারটা টানতে টানতে বলল, তুই কে দাক্ষী? তুই কে আসলে?

দাক্ষী কোন জবাব দিল না। ঘরের ভেতর টানা অন্ধকার। তার ভেতরে বুড়োবুড়ি ফেমিলিব লোকজন খুঁজতে বেরিয়েছে। খুঁজতে? কে জানে! যারা আজ সারাদিন ওদের দুজনকে দৌড় করিয়েছে—তারা এখন বাইরে একটা বড় বান মাছ লম্বালম্বি আগুনে ধরে পোড়াচ্ছে। একটু পরে নুন লঙ্কা মাখিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

ঘরের ভেতর দাক্ষী একটা মিঠেন গন্ধও পাচ্ছিল। ঢাকা দেওয়া ধামার ভেতরটা নড়ে চড়ে গেল। সাবধানে শিবলিঙ্গ ফলটা মুঠোয় নিল। কোথায় কি! বুড়োবুড়ি দিব্যি তাদের পথ দিয়ে ঘরে চলে এসেছে। এখন দাক্ষী পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, ধামার চারদিকে ওরা দু'জন পাক দিয়ে ফিরছে। দাক্ষী বুঝলো, ওদেরও তো খিদে পায়। পা ঝোলানো ছিল। এখন বাঁশের মাচায় তা তুলে বসল দাক্ষী।

তখন বাইরে থেকে আশুর গলা আসছিল। এক এক মন্ত্রের এক এক জোর। তুমি যারে ইচ্ছে চাও—তারে পাও। কাঠকুটোর আগুনে ওদের তিনখানা মুখ এখন তিনটে বাঘ।

বর্ষা চলে গেছে অনেকদিন। যাবার সময় একটা বড় বান মাছকে পাঁক মত মাটিতে রেখে গিয়েছিল। সেটা সামনের বর্ষার জন্য এতদিন ধুকপুক করে বেঁচে ছিল। আজ সন্তোষের হাতে ধবা পড়ে এক রাত্তিরের খাবার হয়ে গেল।

খাওয়াদাওয়ার পর আর আশুর দম ছিল না। সে নিজেই ঢলে পড়ল।

তখন শুরু হল নিত্যিকারের মত। এই সময়টাতেই সুধন্যর কাশি বাড়ে। একখানা চৌকো জ্যোৎস্না নেমে এসে জায়গাটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিসে কি হবে। সন্তোষ টাকি চেঁচিয়ে উঠলো, আজ আমি আগে ঘুমাবো। চোখ ভেঙে যাচ্ছে—

ভেতর থেকে দাক্ষীর গলা এল, যে যার মত আকাশের নিচি ঘুমোও। আজ রাত্তিবটে অন্তত। বলছিল, আর দাক্ষী দেখতে পাচ্ছিল, ফেমিলিসুদ্ধ ঢাকা ধামাটাকে দু'জনে কীভাবে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। আর পিছলে পিছলে মেঝেতে ধমাস করে পড়ছে। ওদেরও তো খিদে পায়।

সন্তোষ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, তুই কে দাক্ষী? তুই কে?

ভবেন ফোড়ন দিল। ডাকাতি দূরে থাক—একদিন চুরি পর্যন্ত করে না। নে সর। এট্টু ঘুমোবো আর উঠে আসব। দরজায় চাপ পড়তেই অন্ধকার বাঁশের চৌকির ওপর থেকে দাক্ষী ফেটে পড়ল। আজগের রাত্তিরটা আকাশের নিচি শো—

আশু জেগে থাকলে দেখতে পেতে—একবার ভবেন সন্তোষকে, আরেকবার সন্তোষ ভবেনকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। সুতো পরানো দুটো পুতুল তেরছা চৌকো জ্যোৎস্নায় এরই ভেতব এক একবার বন্ধ দরজার কাছে যায় আর ছিটকে পিছিয়ে আসে।

ওরা দু'জন জানেও না—তখন দাক্ষী পা গুটিয়ে অন্ধকাব মেঝের ওপরকার ধামাটা দু চোখে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর ধামা থেকে পিছলে পড়ার একটা জোড়া শব্দ প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছিল।

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

জাগো, মসৃণ ত্বক

—কেউ এসে পড়বে ত?

—কে আসবে?

—তোমার বউয়ের অসুখের খবর পেয়ে কেউ যদি এখানে খোঁজ নিতে আসে?

—কে আসবে? সবাই ত জানে তোমার দিদি নার্সিং হোমে। সেখানে যাবে।

—না। তেমন কেউ, যে জানে ওর খুব অসুখ, কিন্তু কোথায় আছে জানে না!

—তুমি তোমার বর পার্থর কথা ভাবছ ত? আমি ল্যাচ-কী-র ওপর একটা ছোট্ট নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছি · উইল বী ব্যাক অন মানডে ইভিনিং।

- আমি আবার বর পার্থর কথা ভাবছি না। তোমার ছেলে পুনপুনের কথাও ভাবছি না।

—তাহলে?

—ধরো, এমন কেউ এল যে নিরক্ষর। যে দেখতে পায় না। কানে শুনতে পায় না। যে বোবা। আমি তার কথা ভাবছিলাম।

—আমাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তেমন কেউ নেই।

'আছে গো', মুখ ফিরিয়ে অমিয়র কপাল থেকে চুল সরিয়ে দেয় নীরা, 'আছে একজন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়..'

অমিয় বলতে চেয়েছিল, 'নারী, তুমি কে, কার কথা বলছ বল ত?' কিন্তু তাকে 'নারী তুমি কে' পর্যন্ত বলতে গিয়ে, ঠোঁটে হাত চাপা দিয়ে, 'চুপ করো। আর একটাও কথা বোলো না' বলে সে অমিয়র ঠোঁটে হাতের তালু ঘষতে থাকে।

অমিয়র গায়ের চামড়া পীতাভ শাদা। সে রোগা। পার্থর পেশিবহুল খর্বতার তুলনায় তার শরীর লম্বাটে ও নরম। অথচ, তুলনায় তার ঠোঁট-জোড়া কী অবিশ্বাস্য কালো এবং কর্কশ—মনে হয় যেন ঠোঁটের চৌকো, তেকোনা, ডিম্বাকার অনবরত পাউটিং, সে ত একটা দেখার জিনিস।

দিদির নিজের হাতে পেতে-যাওয়া বিছানায় নীরা উপুড় হয়ে শুয়ে। তার পিঠে পোড়ামাটির অ্যাশট্রে। পাশ আধশোয়া অবস্থায় অমিয় অনেকক্ষণ ধরে তার পিঠে ছাই ঝাড়ছে আর কথা বলছে। অথচ, সে তার ওষ্ঠলীলা দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে অমিয়র ঠোঁট চাপা দেয়।

ওদিকে, সিংভূমের দিকে, অদিবাসীদের হাটে পিদিমপুতুল খুব বিক্রি হয়। যদিও পিঠে নয়, মাটির মেয়েরা সাধারণত তিন থেকে পাঁচটি প্রদীপ মাথার ওপর দুই হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। চাইবাসার মধুটোলার অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কাঠুরে গোরাচাঁদ মুখার্জির বাড়িতে অমিয় একবার দেখেছিল এক যুবতী পিদিমপুতুলের মাথায় অর্ধচন্দ্রকারে একসঙ্গে বারটি প্রদীপ, সবকটা জ্বলছে! অমাবস্যার অন্ধকার রাতে—অন্ধকার বন পেরিয়ে, অন্ধকার মাঠ পেরিয়ে, পেরিয়ে অন্ধকার নদী—গোঁরাচাদবাবুর আটচালা বৈঠকখানায় ঢুকেই আগুনমাথায় সেই আজানুলম্বিত চুল দাউ-দাউ নারী—হোক মাটির—মনে হয়েছিল, তার এলো চুলগুলিই বুঝি লকলকিয়ে উঠে আগুনের শিখা হয়ে জ্বলছে। জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে তার মুণ্ডু। সেদিন পার্থ হাটে মহুয়া খেয়েছিল খুব। ভয় পেয়েছিল সে-ই সবচেয়ে বেশি। হেন সময় সেই প্রলয় আলোয় গোরাচাঁদবাবুর দুই মেয়ের প্রবেশ। প্রথমে ছোটমেয়ে নীরা। পরে বড়বোন যমুনা।

১৯৭২ সালের কালীপুজোর আগের দিন। সেটা ছিল ভূতচতুর্দশীর রাত। যাক সে কথা। সে অনেক দিন আগের কথা। তখন বিপ্লব শেষ। তখন চারিদিকে অন্ধকার। পুলিশের তাড়ায় তারা দুই কমরেড সিংভূমের বনে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন ভয় পেত। ভালবাসা পেত। নিজের দেশকেও, এমনকি, ভালবাসা যেত। আজ ভয়ভীতি নেই। ভালবাসা নেই।

ল্যাচ-লক ভিতর থেকে টেনে শুধু দরজা নয়, ঘরের জানলাগুলিও সব একে-একে বন্ধ করে,

অমিয় ঘর, ডাইনিং স্পেস মায় বাথরুমের সবকটি জানালার পরদা নিশ্ছিদ্রভাবে টেনে দিয়েছে। বাইরে শরৎকাল। আকাশের অনুমেয় নীলে ভাসমান শাদা শাদা মেঘ...ওদের এয়ার-হোস্টেস ভাবলে ভাবা যেতে পারে। শুধু বাংলাদেশের এ-সব কেন, পরদার পর পরদা টানতে টানতে অমিয় যেন বাইরের গোটা পৃথিবীটাকেই প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছে। এ-ভাবে পৃথিবী-প্রত্যাখ্যান না করতে পারলে যথার্থ একা হওয়া যায় কী? অবশ্য, সে একা বললে সবটা ঠিক বলা হয় না। কিছুটা ভুলই বলা হয়ে যায়। কেননা, নীরা রয়েছে।

—ভিজিটিং আওয়ার্স কটা থেকে?

—পাঁচটা। দিদিকে দেখতে যাবে?

নীরার কোমরে কালো শার্টিনের সায়া। হাতে টাইটান। ওদের বিয়ের সপ্তম বার্ষিকীতে অমিয়-যমুনার উপহার। নীরার কবজি উলটে অমিয় দেখল, এখন বেলা দেড়টা।

টিভি-তে বোধহয় রবিবার দুপুরের আঞ্চলিক ছবি শুরু হবে। একের-পর এক বিজ্ঞাপন দিয়ে যাচ্ছে। 'নিরমা ডিটারজেন্ট টিকিয়া' শুরু হতে নীরা বলল, 'একটু সাউণ্ড দাও না।'

—না।

— দা-ও-না। গানটা কিন্তু ভারি মজার। যাই বলো ওই একটাই ত জিনিস, যা এখনো পুবনো হয় নি।

—না। কেউ যদি এসে পড়ে? বুঝতে পারবে ভেতরে কেউ আছে।

—কে আবার আসবে?

নাচতে নাচতে নিরমার ছেলে শাদা স্কার্ট পরা নিরমা মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়েছে। এইখানেই আছে 'একশ গ্রামকা টিকিয়া

নে যাদু কর দিযা...'

পরদার মেয়েটার লিপে প্লে-ব্যাক দিতে দিতে নীরা বলে, তোমার হল!'

অর্থাৎ, সিগাবেট। অমিয় ওর পিঠের অ্যাশট্রেতে গুঁজে সিগাবেট নেবার। অ্যাশট্রেটা তুলে নেয়। এই যে সিগারেট নেবানো, এখানেও অমিয়ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সে সবসময় সিগারেট নেবাব বাঁ হাতে। ডান হাতে নেবাতে নীরা একবারও দেখে নি। নেবাবার আগে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে নেবেই। ঘোরানো মুখে জ্বলন্ত সিগারেটসুদ্ধ তার কাঁপা-কাঁপা বাঁ হাত অ্যাশট্রে খুঁজবে। তাবপব অ্যাশট্রের মুখটা খুঁজে পাওয়ামাত্র শরীরসর্বস্ব সেদিকে হেলিয়ে যে-রকম মৌলিকভাবে সে সেই অগ্নিমুণ্ড ক্রমাগত অ্যাশট্রের মধ্যে পিষতে থাকে---আব কারুকে ঠিক অমনভাবে আগুন নেবাতে দেখতে নীরার এখনো বাকি। পার্থ ত টুসকি মেরে আগুনসুদ্ধ বাইরে ফেলে দেয়।

টিভির পরদা থেকে চোখ সরিয়ে নীরা এবার অমিয়র বুকের পীতাভ চামড়ার দিকে তাকায়। সেখানে হাত বোলায়। ঠিক যেন চীনেম্যানের বুক। লেপাপোঁছা। পার্থর বুক-ভরা চুল। তবু আজ সাত-বছরে ত কিছু হল না। এদিকে দিদি এই নিয়ে তিনবার অ্যাবোর্ট করালে। ডাক্তারে বলে, দোষ নাকি নীরার।

ছাই জানে ডাক্তাব। আসলে সব দোষ ওই মধ্যরাতের মাতাল পার্থর। কোনো রিয়েল ইন্টারেস্টই নেই। নীরা প্রমাণ করে দেবে যে যত দোষ, নন্দ নয়, পার্থ ঘোষেব।

—হঠাৎ কী হল বল ত দিদির?

—দাদাব বাড়িতে পরশুদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে হঠাৎ পেটে ভীষণ যন্ত্রণা! নীল হয়ে লুটিয়ে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে যেতে ওটা ফেটে গেল। আমি যখন গেলাম, তখনও ও টি-তে অপারেশন চলছে।

— অপারেশন কতক্ষণ ধবে হল?

— পেট ভবা অত পুঁজরক্ত। ধুতে-মুছতে ঘণ্টাখানেক লাগল।

— পুনপুন কোথায়?

—ওকের মামাব বাড়িতে বেখে এসেছি।

—স্কুলে যাচ্ছে?

—ওখান থেকে যাবে।

খাটের ছত্রিতে নীরা পাট করে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার প্রিণ্ডেড চাইনিজ সিফন শাড়ি। পাশের খাটের ধারে যমুনার বাড়িতে পরার লাল মখমলের চটিজোড়া ইংরেজি 'L' অক্ষর রচনা করে মেঝের ওপর পড়ে আছে। ছত্রি থেকে ঝুলছে যমুনার দুটি ক্লিপে আঁটা ব্লাউজও, সেই থেকে শুকোচ্ছে।

ইংরেজি 'এল' অক্ষরটি মাথায় এলে আজও 'লাভ' শব্দটি প্রথমে মনে আসে। অমিয় ভাবে, অসুখ, নার্সিং হোম এ-সব প্রসঙ্গ এনে লাভ কী। বরং, এখন চুপচাপ ভালবাসা যাক নীরাকে। চুমু খাওয়া যাক তার গ্রীবায়। হাত রাখা যাক স্তনে।

যা ভেবেছিল।

'এই ওকি হচ্ছে', বরাবরের মত ঝটকা মেরে স্তন থেকে অমিয়র হাত সরিয়ে দেয় সে। পরমুহূর্তে তার প্রত্যাখ্যাত হাত সস্নেহে তুলে নিজের জঘনদেশে রাখে। এই প্রথম যে এ-রকম, তা নয়। স্তনমর্দন দূরে থাক, সে অমিয়কে কখনো স্তন স্পর্শই করতে দেয় না। শিউরে উঠে ছিটকে সরে যায়। বারবার। অথচ, বুকে জড়িয়ে থাকলে কিছু বলে না। শুধু হাত দিয়ে ছুঁতে যাও, বলবে, না। শিউরে সরে যাবে।

দূরে সায়ার ফ্রিলের নিচে, তার প্রগলভ নিতম্ব পেরিয়ে, অমিয়র দৃষ্টি নীরার পায়ের কঠিন তে-কোনা অ্যাঙ্কল-বোন পর্যন্ত চলে যায়। একই চাহনি দিয়ে যমুনার পিঙ্ক-হলুদ ব্লাউজ ও ফেলে যাওয়া মখমল চটি-জোড়ার দিকে সে তাকিয়ে থাকে। বিষয়-বদলের জন্য অনুভূতিতে কোনো হেরফের তার চোখে পড়ে না।

—কী হল?

—বলেছি ত, হাত দেবে না ওখানে।

—কেন?

কোথা থেকে যে কী? অমিয়র সহসা মনে পড়ে যায় বা তার অতীত থেকে, ধুলো ঝেড়ে, স্মৃতি নিজেই উঠে আসে।

কোনার্কের সেই প্রখর অপর-দুপুর। চৈত্রমাস। মন্দিরের দোতলার অলিন্দে উঠে নিছক কৌতূহলবশে মৃদঙ্গবাদিনীর বাম স্তনে সে একবারটি হাত রেখেছিল। রাখকেই তার হাতের তালুতে উঠে এসেছিল নারী স্তনের সেই আশ্চর্য নবম ত্বকবোধ, বজ্রাঘাত হোক তার মাথায় যদি না মৃদঙ্গ বাদিনীর রক্তমাংসময় স্তনের স্পর্শ সে সেদিন না পেয়ে থাকে! তা নইলে, শরীর জুড়ে কেন তখনি সেই তা-তা-থেই মৃদঙ্গ-বোল—আত্মরক্ষার শেষ ধরাতই ছেড়ে, সব ভুলে, দুহাত তুলে, সূর্য বালিসমুদ্রের সেই অসহ্য দুপুরে—যখন গরম বালি উড়ে এসে পড়ছে মুখে-চোখে বুকে—অমন উন্মাদ আবেগ ভরে সেই নারী-পাথরকে, না হলে, সে ওভাবে আলিঙ্গন করতেই বা যাকে কেন। তখনো ভাল করে গোঁফ ওঠে নি, মুখে ব্রণ ফোটে নি সবকটি। কিশোরবয়সি সেই জীবনে প্রথম মৃত্যু-অভিজ্ঞতা আজও তার গায়ে কাঁটা দেয়। মনে পড়লে, নিজেকে জাতিস্মর মনে হয় আজও। বস্তুত, অত উঁচুতে সেদিন পা ফস্কে গিয়েছিল তার। কার্নিশ ধরে কোনোমতে ঝুলে পড়েছিল ভাগ্যিস।

তারপর বেশ কবার কোনার্কে গেছে। আর কখনো স্তনে হাত রাখে নি। মন্দির-চাতালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে শুধু স-সম্ভ্রমে দেখে গেছে। কে জানে, দিনে দিনে আরো কত নরম হয়েছে ওই প্রস্তরীভূত কুচযুগল—অহর্নিশি সমুদ্রের নুন মেখে মেখে।

সেদিন চৈত্রমাস। সেদিন দুপুর বেলা। সেদিন পাথর গরম। মৃদঙ্গবাদিনীর লাল বেলে-পাথুরে স্তন ত্বকের সেই ছ্যাঁকা-লাগা গরম, জীবনের পরমপ্রাপ্তির মত আজও তার হাতের তালুতে লেগে আছে।[১]

১। ত্বক মনুষ্যদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কোটি কোটি কোষে ত্বক শরীরের উপর বিছানো রয়েছে। এপিডার্মিস ও ডারমিস এই দুই প্রধান স্তরে কোষগুলি ছড়িয়ে আছে। এই সব কোষ নাড়া খাওয়া ক্যালাইডোস্কোপের মত যখন যেমন অননুমেয় ছকে পরস্পরের সঙ্গে দূর ও নিকট সম্পর্কে জড়িয়ে থাকে। এদের গতিবিধির হদিশ পাওয়া ভার এরা সর্বস্বীকৃত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি মানে না। টেস্ট টিউবে রেখে লক্ষ করে দেখা গেছে উপরের এপিডার্মিস স্তর মৃত কোষগুলি শরীর থেকে যত বের করে দেয়, নিচের স্তর ওপরের দিকে জীবন্ত কোষ তত্তই পাঠাতে থাকে।

আঞ্চলিক ফিল্ম শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শব্দহীন, সুরহীন। বোবা ও নিরক্ষর। ডাব-করা না হলে সাব-টাইটেল পড়ে হয়ত বোঝা যেত কিছুটা। যে, কারা কাকে কী বলছে।

—বোধহয় মালয়ালম ছবি।

নীরা উত্তর দেয় না। গা ঘেঁষে আসে। অমিয় এবার সক্রিয় হবে আশা করা যায়। এখুনি নিশ্চয় নয়। আগে ফোর-প্লে। 'সেক্স ফর দা ইউজার্স' বইটিতে যেমন লেখা আছে। বইটি তাকে পড়তে দিয়েছিল অমিয়। বলেছিল, 'আমি পড়ি নি। কিন্তু, তুমি পড়ে দ্যাখো। এতে সোজাসুজি সব লেখা আছে।' নীরাও পড়ে নি। তার জরায়ু কেন শুকিয়ে পাথর হয়ে যাচ্ছে, ওভাম কেন সে-পথ আর মড়ায় না, সে-সব কথা নিশ্চিত এই বইতে লেখা নেই? কেন রে নটে মুড়োলি। না, গরুতে কেন খায়। নিঃসন্দেহে, এতেও সেই বৃত্তান্ত।[২]

—নার্সিং হোমে কদিন রাখবে?

—দিন পনের ত বটেই।

—দিদি কেমন আছে?

—আজ ডুস দিতে হয় নি। নিজেই পায়খানা করেছে।

—তুমি আমার অফিসে একটা ফোন করলে পারতে। তাহলে আজ আসতাম না।

—বারণ করার সময় পেলাম কই। এসে ফিরে যাবে। তাই সোজা নার্সিং হোম থেকে চলে এলাম।

—বিকেলে নার্সিং হোমে যাব।

—হ্যাঁ। একটু আগে-পরে।

—নার্সিং হোম কত করে নিচ্ছে?

—আড়াইশ।

—রোজ?

—না ত কী মাসে?

—সার্জন?

—তিন হাজার।

—টাকা লাগলে নিও।

ছবিটা বেশ সিরিয়াস। ভাষা নেই, সুর নেই, শব্দ নেই। তবে রঙিন। অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও সবাই অচেনা। ধানখেতে হাঁটুজলে চারা পুঁতছিল যে আদিবাসী মেয়েটি, সে এখন ধানকলে চালের ডাঁই-এর ওপর শুয়ে। কাঁপছে। চালগুদামের দোতলায় দরজা বন্ধ হচ্ছে। মেয়েটির মুখ ভয়ে নীল। রেপ সীন।[৩]

'আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি' বলে নীরা উঠে গেছে। রেপ শুরু হবার আগে অমিয় উপুড় হয়ে শোয়।

বেলা কত? প্রায় তিনটে হবে। যদি পাঁচটায় নার্সিং হোমে পৌঁছতে হয়, তাহলে নীরা ফিরে এলে বিনা ভূমিকায় সঙ্গম শুরু করে দিতে হবে। এ নয় যে, তার প্রয়োজনীয় উত্তেজনা নেই। আদৌ তা নয়। আসলে, তার সমস্যা হচ্ছে পূর্ব-ক্রীড়া নিয়ে। 'সেক্স ফর দা ইউজার্স' বইটি সে যে দেখা মাত্র কিনে

২। ত্বককোষের প্রধান কাজ বায়ু থেকে আর্দ্রতা গ্রহণ ও শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণ। পৃথিবীর বাতাস থেকে গৃহীত আর্দ্রতা এরা শরীরময় পাঠাতে পারে। তবে এই কাজে তাদের কোনো নিয়মিত ছন্দ নেই, পর্বভাগ নেই। যদিও সর্বতোভাবে দেখলে আপাতদৃষ্টিতে ছন্দোময় বলে প্রতীতি জন্মায়। ত্বকের গতিবিধি ও সময়প্রণালী তার সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার।

৩। কবি সাহিত্যিকরা, যাঁদের নাকি নর-নারীর প্রেম-ভালবাসার ব্যাপারে সহজাত জ্ঞান আছে, তাঁরা প্রায়ই লেখেন, প্রণয়পর্বে নায়িকার মুখে রক্তাভার কথা। তাঁরা এই রঙ বদলের মধ্যে প্রেমের ভাষা খুঁজে পান। ডার্মাটোলজিস্টরা এ কথা মানতে চান না। তাঁরা বলেন, সে ত রোদ লেগেও মানুষের মুখ লাল হয়। আসল ব্যাপার হল, ত্বকের তাপমাত্র নিয়ন্ত্রণ। এপিডারমিস স্তরে তাপমাত্র বাড়লে, তা সে রোদ বা আবেগ সে কারণেই হোক, ডারমিস স্তর লোহিত কণিকা পাঠাতে থাকে। প্রচণ্ড শীতে বা ভয়ে মুখ নীল হয়ে যায়। তার কারণ ত্বককোষের লোহিত কণিকাগুলি তখন নিশ্চল।

ফেলেছিল, তার কারণ বইটির ওই স্ট্রেট-ফরোয়ার্ড টাইটেল ; কী, না, 'সেক্স, যারা করে।' কত সোজাজুজি। বাংলা ভাষাতেই যত নেকু-নেকু বই : ওগো বর, ওগো বধূ! কিন্তু এমন অব্যর্থ নামের বইতেও, সে দেখল, ফোর-প্লে সম্পর্কে ঝাড়া একটি চ্যাপ্টার। এ -সব ভ্যানতাড়া তার ভাল লাগে না। বিশেষত, এক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও নেই। নীরা কেন আসে, সে জানে। শী নীডস্ মাই সীড।

তা বলে কি নীরাকে চুমু সে খাবে না? তার গাঢ় মেরুন লিপস্টিকে (ষাঁড়ের মড়ি থেকে তোলা বাঘিনীর ঠোঁট যেন) পিছলে যেতে যেতে তার ঠোঁট থেকে চামড়া তুলে আনবে না? নারী-ঠোঁটের রঙ চুষে এই চামড়া খোঁজা—একেই ত যথার্থ চুম্বন বলে? আর, এইসব আদানপ্রদানের সময় অনুভূতিদেশ থেকে কিছু আলোও এসে পড়ার কথা। পড়বে না?[৪]

ফরসা, বলশালী নারীশরীরের শাটিনের কালো সায়া পরে নীরা যখন বাথরুম থেকে এল—বুকে পিটার প্যান—তখন তার মাথায় অর্ধচন্দ্রকারে বারটি প্রদীপ, সবকটি জ্বলছে। আসলে, নীরা যখন ঘরে ঢুকল, আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের ধানকলে ঠিক তখনই লেগে গেল নিঃশব্দে আগুন। এখন, ওই, দাউ-দাউ করে জ্বলে যাচ্ছে। তারই হল্‌কা এসে লেগেছে নীরার মুখে-চোখে। চুলে।

অমিয়র পাশে এসে শুতে গিয়ে নীরা থমকে দাঁড়ায়।

—আর-এ, আর-এ, একী। তোমার কোমরে এটা কী?

—কোমরে কী, তা আমি জানব কী করে?

—না-না। তুমি আমার পিঠের হুকটা খুলে দাও। খোলো শিগগির। বলে কী মেয়েটা। ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আগুনের আভা, আলোয় আলো, এমন প্রকাশ্যে নীরা ব্রেসিয়ার খুলবে!

—এই দ্যাখো, ঠিক এইরকম। ঠিক আমার মতন।

নীরা সগৌরবে নিজের বামস্তন তুলে নিচের দিকটা দেখায়। অমিয় লক্ষ করে বেলেপাথুরে রঙের একটা লাল প্যাচ সেখানে। 'ঠিক এইরকম একটা প্যাচ তোমার কোমরে। এই রঙের', অমিয়র কোমরে অ-দেখা প্যাচে তর্জনী টিপে নীরা বলল, 'আমারটাও ঠিক এইরকম। শক্ত।'

অনভিজ্ঞ ভয়ে অমিয়র শেকড় সরসর করে ওঠে। তার মুখেও আগুনের আভা, তাই তাকে আরো ভীত দেখায়। তার মাথার চুলগুলি পর্যন্ত ভয় পেয়েছে, সে টের পায়। সে একবার নিজের কোমরে হাত বুলিয়ে দ্যাখে। খুঁজে পায়। তারপর নীরার স্তন ছুঁতে গিয়ে, না ছুঁয়ে, সে সভয়ে হাত গুটিয়ে আনে।

ধানকল জ্বলছে ত জ্বলছেই। আগুন-আভার ঢেউয়ের মধ্যে ওরা দুজন পাশাপাশি চিৎ হয়ে শুয়ে। দেওয়ালে, সিলিঙে, জানালার পরদায়, সর্বত্র আগুন। ঘুরন্ত পাখার অগ্নিস্রাবী ব্লেডগুলোর দিকে তাকানো যায় না।

—এই শুনছ। তুমি কোনো জিওলজিস্টকে চেনো।

—জিওলজিস্ট?

—আ-হ্যাঁ। জিওলজিস্ট!

—?

—জিওলজিস্ট ছাড়া পাথর কে চিনবে?

—পাথর?

—পাথরই ত।

—একবার লুথেরান-এ গেলে হয় না। হয়ত কুষ্ঠ...

—কবে দেখিয়েছি লুথেরানে!

—ওরা কী বলল?

—কী আবার বলবে! বলল, পাথর। বলল, পাথর হচ্ছে যাচ্ছি। আমার থেকেই রোগটা তোমার হয়েছে বাপু, যাই বলো!

৪। ত্বক বা চামড়ার কাজ আর্দ্রতা গ্রহণ ও বিতরণ। কিন্তু, সে নিজে চিরতৃষিত।

সারা শরীর দুলিয়ে নীরা হাসছে। তার মুখ নিচু। চুলে-চুলে ঢাকা। সহসা, মাত্র একটা ঝটকায় মুখের সব চুল সে সাফল্যের সঙ্গে পিঠে তুলে নেয়।

'একজন ভাল জিওলজিস্ট দেখাব দুজনে, বুঝলে। গ্রানাইট হলে গ্রোথ রেট কী ওরা বলে দেবে। স্যান্ড-স্টোন যদি হয়' ছোট্ট হাই তুলে ও মুখে তুড়ি মেরে সে বলে, 'ফার্দার গ্রোথ নাকি অ্যারেস্ট করা যায়। আর চায়না ক্লে-ফ্লে হলে ত কোনো ব্যাপারই না...'

নীরা বলে চলেছে। কী বলছে, সে এখন আর জানে না।

সভয়ে, সন্তর্পণে অমিয় একবার নীরার বাম-স্তনে হাত রাখে। মৃদঙ্গবাদিনী-অভিজ্ঞতার ঠিক উলটো। নরম। কিন্তু মূলত পাথর। মন্দির উঁচু কার্নিশে। দাঁড়িয়ে সহসা সে মূলত নরম, গরম পাথুরে স্তন-ত্বক থেকে হাত তুলে নেয়।[৫]

তার মাথা টলে যায়। খুলি না ফাটা পর্যন্ত সে সবেগে মন্দির-চাতালের দিকে পড়ে যেতে থাকে।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নীলপদ্ম

এই শুনছো!

—কি।

—কিছু বলছ না কেন?

—কি বলব?

—কেমন লাগছে! এতদিন পর দেখছ, এতদিন পর দেখলে কেমন লাগে কিছু বলছ না তো!

—খুব সুন্দর লাগছে। এমন একটা সুন্দর বাড়িতে, কি বড় আর ছিমছাম, তুমি ভীষণ সুখে আছ পদ্ম।

—ভীষণ সুখ। ভীষণ সুখ বলেই তো শেষ পর্যন্ত ওকে না বলে পারলাম না, অজুর পৈতায় নীলদা আসবে। নীলদাকে যে করেই হোক আনতে হবে। তুমি তো বিয়ের পর আর আমার বাড়িতে কিছুতে এলে না। ও কতবার তোমার কথা উঠলেই বলেছে, তোমার নীলদাটা কেমন যেন।

নীল হাসল। সে দেখল বেশ আকাশভরা তারা। পদ্মর বাড়ির এখানটায় বসে অনেক কিছু দেখা যায়।

পদ্মর ছেলের নাম অজু। ভাল নামটা মনে আসছে না। পদ্মর শ্বশুর অজুর কম বয়সে পৈতা দিয়েছে!

তখন নীল দেখল, সামনে বড় রাস্তা। মাঝখানে সুন্দর সুন্দর সব ফুলের গাছ। কলকাতায় এমন একটা সুন্দর রাস্তা হয়েছে সে জানত না। এসব ফুলের গাছের জন্য পদ্মর বাড়িটা আরও সুন্দর লাগে। নীল রঙের বোর্ডে রাস্তার নাম। বড় কবির নামে রাস্তা। এমন রাস্তার নাম কবিদের নামে না হলে যেন মানায় না। পাশে সল্ট লেকে নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে। এদিকের বাড়িগুলো ফাঁকা। চার পাশে এখনও সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে খুব সবুজের সমারোহ। পদ্মকে এমন একটা বাড়িতে খুব মানায়।

৫। ত্বকের তৃষ্ণা অনিবারণেয়। মানুষের সাময়িকভাবে মেটে। ত্বকের তৃষ্ণা মেটবার নয়। ত্বক শুধু জীবিতের শরীরেই বেঁচে থাকতে পারে। যারা মৃত, তাদের জন্য ত্বক কাজ করে না। জীবিত ত্বক মৃতের শরীরে সংস্থাপন করা যায় না।

নীল খুব বেশি দূরে থাকে না। শহরের এদিকটায় তবু সে কোনদিন আসেনি। পদ্মের সঙ্গে শহরের কোথাও দেখা হয়েছে দু একবার! দেখা হলেই পদ্ম বলত, নীলদা কবে যাচ্ছ। একবারও গেলে না। তুমি বড়মানুষ বলে যাও না।

নীল তখন হেসে দিয়েছে। সব কথাতেই নীলদা এ-ভাবে হেসে ফেলে। আসলে নীলদা সেই যে কষ্টের ভিতরও ভীষণ হাসতে শিখেছিল, সেটা আর কিছুতেই ভুলে যায়নি। নীলদা দুঃখেও হাসে, সুখেও হাসে। নীলদাকে সে কখনও মুখ গোমড়া করে থাকতে দেখেনি। এমন কি ওর বিয়ের দিনেও নীলদা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত একটানা খেটেছে। দেখা হলে বলেছে, বিয়েতেও রেহাই দিলে না। খাটিয়ে নিলে।

সারারাত পদ্ম ঘুমোতে পারেনি। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে একবার উঠে খুঁজেছে। পায়নি। বিয়ে বাড়ি, কে কোথায় আছে ঠিক যেন কেউ বলতে পারে না। সে আবার উঠে এসেছিল, নীলদা কোথায়। সে দেখেছিল দক্ষিণের বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে নীলদা ঘুমোচ্ছে। বেশ শীত। অথচ কেমন শীতে সে চুপচাপ শুয়েছিল। পদ্ম চুরি করে ওর চাদরটা দিয়ে শরীর ঢেকে দিয়েছিল। নীলদা টের পেয়েছিল কিনা সে জানে না। পদ্ম শুধু মনে মনে বলেছিল, আমি কি করব নীলদা, তুমি তো আমাকে কিছুই করতে দিলে না।

পদ্ম এবং নীল এ-ভাবে মুখোমুখি চুপচাপ বসে কত কিছু ভাবছে। উৎসবের বাড়িটা এখন নিঝুম। কিছুক্ষণ আগেও সুধাময় পাশের চেয়ারে বসে পদ্মের কাছে শোনা সব গল্পের কথা বলে হৈ চৈ করে গেছে। সুধাময় বলেছিল, আপনি ভীষণ নিষ্ঠুর নীলদা, এভাবে আপনার শৈশব কেটেছে পদ্মর সঙ্গে আর বিয়ের পর এত পর পর হয়ে গেলেন।

তারপর সুধাময় বলেছে, আপনাদের কথা এখন শেষ হবে না। ক'দিন খাটাখাটনি গেছে খুব। পদ্ম, আমি উঠি। তুমি নীলদার সঙ্গে গল্প কর।

নীল বুঝতে পারল, পদ্ম সুধাময়কে ওর শৈশবের কথা সব বলেছে! সুধাময় ওর চেয়ে বয়সে বেশ বড়। তবু নীলদা ডাকে। পদ্ম যে-ভাবে ডাকে, সেও সে-ভাবে নীলকে নীলদা বলতে বোধ হয় ভালবাসে। নীল বলেছিল, এমন মানুষ যার পদ্ম, তার আর কি দুঃখ থাকতে পারে।

পদ্ম কিছু বলেনি। বরং এখন যেন পদ্ম চুপচাপ থাকতেই পছন্দ করছে। এতদিন পর দেখা, কত কথা বলার আছে, অথচ পদ্ম একটা কথাও গুছিয়ে বলতে পারছে না। বোধ হয় পদ্মের সব কিছু থেকেও কি নেই যখন মনে হত, যখন মনে হত তার কিছু ভাল লাগছে না, একটা অসহায় দুঃখ ভিতরে ভিতরে বাজতে থাকল, পদ্ম সুধাময়কে কেবল শৈশবের গল্প শুনিয়েছে হয়তো। এবং এ-ভাবেই গল্প শুনে শুনে তাকে ঠিক চিনে ফেলেছে সুধাময়। আর যখন সে মানুষ নিজেই এসে গেছে নিভৃতে একটু কথা বলতে না পারলে আর কি থাকল। সুধাময় বুঝতে পারত হয়তো পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক থাকে যারা মরে গেলেও নিজের ইচ্ছের কথা বলতে পারে না।

যেমন পদ্ম বলত সুধাময়কে, নীলদা, সেই যে-বারে পিসেমশাইর সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল কি বোকা বোকা চোখ! কি খাটো খাটো চুল! আর পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। হাফসার্ট গায়। একটা পুঁটুলি মাথায়। পুঁটুলিতে নীলদার পড়ার বই অঙ্কের খাতা ভাঙ্গা পেনসিল। আমার পিসেমশাই কেন যে সহসা গরিব হয়ে গেছিলেন, জানি না। নীলদাকে দেখে সেদিনই আমার কি যে মায়া! এমন চোখ আমি কোথাও দেখিনি। গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটে গেলে নীলদাকে ভীষণ ভাল লাগল। তারপর একটু থেমে বলত, মা ভীষণ কষ্ট দিত নীলদাকে।

—কেন?

—মার ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাদু নীলদাকে স্কুলে পড়াবে বলে এনেছিল। পেটভরে খেতে দিত না পর্যন্ত।

সুধাময় বলত, যা, কি যে বলছ!

—সত্যি বলছি। বাবা তখন কলকাতায়। খিদিরপুরে বোমা পড়তেই বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

সুধাময় তখন চুপ করে থাকত। আর ভাবত তবে সেটা যুদ্ধের শেষ দিকে। তখন দুর্ভিক্ষ হয়তো

চলেছে। সুধাময় এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পদ্মর শৈশব কোথায় কিভাবে কেটেছে জানতে চাইত। তারপর জড়িয়ে ধরার সময় বলত আচ্ছা, নীলদা তোমাকে কিছু করেনি।

—ছিঃ কি যে বলছ! সে তেমন মানুষই না।

নীল এখন কি কথা বলবে—ভেবে পাচ্ছে না। তবু কিছু বলতে হয়, এত আলো রাস্তায় আর গাড়ি ঘোড়া যখন ক্রমে কমে আসছে, এবং এক নিভৃত আকাশ মাথার ওপর, তখন কিছু বলতে না পারলে কেমন সংকোচ লাগে। সে ফের এক কথাতেই বলল, সুধাময় লোকটি বেশ।

—খুব ভাল মানুষ। ফিস ফিস করে পদ্ম বলল।—তবে একটা দৈত্য।

নীল জানে সুধাময় খুব স্বাস্থ্যবান মানুষ। যেমন হাসতে পারে তেমন খাটতে পারে। সে বলল, সুধাময়কে বিয়ের পর এই দেখলাম। প্রায় এক যুগ হবে। চেহারার হেরফের বিশেষ হয়নি! ফুর্তিবাজ মানুষের চেহারা সহজে পালটায় না। সুধাময়কে আমার খুব ভাল লাগে।

পদ্ম বলল, আমার ভাল লাগে না।

—কেন এ কথা বলছ, পদ্ম! এ-কথা বলা তো ঠিক না।

পদ্ম বলল, আমার কিছু ভাল লাগে না নীলদা। এত থেকেও আমার কিছু নেই মনে হয়। তারপর পদ্ম বলল, আচ্ছা নীলদা তোমার লেখা খুব খুঁজে পেতে পড়ি। কিন্তু, তুমি তোমার শৈশবের কথা লেখ না কেন। কত না আমাদের মজার মজার ঘটনা। ও তো বলে, নীলদা কেন যে এমন সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা লেখে না!

নীল বলতে পারত, আমি যে কি চাইতাম পদ্ম! শৈশবের পরে যত বড় হয়েছি, তোমাকে যেন আমার কত কিছু বলার ছিল। অথচ একটা কথাও বলতে পারিনি। লিখলে সে-সব কথা লিখতে হয়। তবে যে তুমি আমাকে কখনও আর সুন্দর ভাববে না। সে শুধু বলল ও সব পুরোনো ঘটনা, পাঠক নতুন ঘটনা চায়।

পদ্ম কেমন অবাক হয়ে বলল, ঝড়ের দুপুরে তুমি আর আমি চিনি পাতা গাছটার নিচে পালিয়ে থাকতাম, কখন টুপ করে আম পড়বে, আমরা কুড়িয়ে নেব...

—তাও লিখে গেছেন কেউ কেউ। আর লিখে কি হবে!

পদ্ম চুপ করে গেল। মানুষটা এই রকমের। কোন কিছুতেই গুরুত্ব দিতে চায় না। সে এবার কেমন দুঃখের সঙ্গে বলল, আচ্ছা নীলদা, তুমি তো পুকুরে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে। ডুব দেবার আগে বলতে পদ্ম কি মাছ চাই? বলতাম, শোল মাছ, ঠিক ধরে আনতে। কিন্তু যেই বলতাম পুঁটি মাছ, তুমি বলতে পুঁটি মাছ ধরা যায় না। খুব সাঁতার কাটে। মরে গেলেও কাঁদায় ঢুকে যায় না। অর্থাৎ পদ্মের বলার ইচ্ছা এমন গ্রামবাংলা অথবা সবুজ গ্রীষ্ম এবং টলটলে জলে সাঁতার কাটার ভিতর আমাদের এক আশ্চর্য মহিমা ছিল—তোমার লেখাতে এ-সব কোথোও নেই। এবং বোধ হয় এভাবে পদ্ম আরও চায়, সেই যে একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখত, পদ্ম, নীলপদ্ম খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা পাচ্ছে না, কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছে, নীলদা, আমরা কোথায় পাব নীলপদ্ম, তুমি কিছু বলছ না কেন —এ সব কোথাও লেখা তো নেই।

নীল মনে করতে পারে সব। এ-সব লিখলে কেউ না কেউ ভীষণ কষ্ট পাবে ভেবেই সে লেখে না। যেমন নীলের মনে আছে, বাবা তাকে রেখে এলে, তার বয়স কত তখন, দশও হয়নি, বাবা তাকে ছ ক্রোশ পথ দূরে রেখে গেলে কেবল পূজার আর গ্রীষ্মের ছুটিতে সে যেতে পারবে,—আর সব দিন, এই বাড়ি মামীমা এবং দাদু, পদ্ম, পদ্মর দাদা নীলের বয়সী এবং নীল এসেই বুঝতে পেরেছিল সে এ-বাড়িতে বাড়তি লোক। কেবল দাদু আর পদ্ম ছিল নিজের লোক। এবং বাবা যখন বিকেলে তাকে রেখে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন হয়তো মার কথা ভেবে, কারণ সে প্রথম মাকে ছেড়ে থাকছে, একা থাকবে, রাতে একা বিছানায় শোবে, কেউ থাকবে না পাশে—এমন ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। বাবা যত গাছপালার ভিতর দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছেন, চোখের জল তত সে রোধ করতে পারছিল না। তখনই পদ্ম এসে বলেছিল, নীলদা যাবে?

—কোথায়?

—এই কোথাও। নীল বুঝতে পেরেছিল, কোথাও পদ্ম তাকে নিয়ে যাবে। অথবা এখনও মনে হয়

পদ্ম যেন সব সময় বলছে, নীলদা যাবে?—কোথায়? কোথাও। আর এভাবে বোধ হয় সবাই কোথাও যেতে চায়। নীল বলেছিল, যাব। চল। সে আর কাঁদতে পারেনি। কি যে সহজে পদ্ম, মার কথা, তার প্রিয় গাছপালা পাখির কথা ভুলিয়ে দিল। সে আর পদ্ম সোজা দৌড়ে দত্তদের আমবাগান পার হয়ে চৌধুরীদের যে ঘোড়াটা কেবল নিশিদিন ঘাস খায়, সেখানে এসে বসেছিল। সে আর পদ্ম। লালরঙের ঘোড়াটা ঘাস খাচ্ছে। ওরা ঘাসের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে ঘাস খাওয়া দেখছে। পদ্ম বলেছিল, ঘোড়াটা নীলদা আমাকে খুব ভালবাসে। কিছু করে না। পদ্ম ইচ্ছা করলে নীলকে নিয়ে ঘোড়ার শরীর ছুঁয়ে দিতে পারে। এমন একটা ঘোড়া যখন ঘাস খাচ্ছে, সামনে যখন আদিগন্ত মাঠ এবং ছাড়া বাড়িতে কত সব বিচিত্র পোষা জঙ্গল তখন পদ্ম বলেছিল, নীলদা যাবে?—কোথায়? পদ্ম বলেছিল, এই একটু দূরে। তারপর ছুটতে ছুটতে ওরা দেখেছিল হিজলের ফুল শতরঞ্চের মতো পাতা। পদ্ম সেই ফুলের ওপর দাঁড়িয়ে বলেছিল, হিজল ফুল আমার খুব ভাল লাগে। এখানে দাঁড়ালেই দূরের কাছারি বাড়ি, টিনের চাল, বাতাবি লেবুর গন্ধ! কি মজা! টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ—কি মজা! পদ্ম একদিন টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্য বড় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছিল। পদ্মর মার কি রাগ! যুদ্ধের জন্য কলকাতা ছেড়ে এসেচে। এখানে এসে মেয়েটা কি যে হয়ে যাচ্ছে। তারপরই পদ্ম বলত, যাবে নীলদা?—কোথায়?—এই দূরে কোথাও। ওরা এ-ভাবে কখনও পালিয়ে রমজান ফকিরের দরগায় চলে যেত। চারপাশে কি নিবিড় গাছপালা। গা ছম ছম করত। তবু কি যে আকর্ষণ, পদ্ম আর নীল হাত ধরাধরি করে ছুটত। কেউ দেখলে বলত, নীল-পদ্ম যাচ্ছে। দরগার ফকিরসাব বলত, নীলপদ্ম ফুটছে। কত সব বিচিত্র পাখি আসত দরগায়। নীল আর পদ্ম রঙবেরঙের পাখি দেখলেই ধরতে যেত। পদ্মর বড় পাখি পোষার শখ ছিল। তারপর নীল বলত, পদ্ম, কোথাও যাবে?—কোথায়?—এই দূরে। পদ্ম বলত, আমি স্কুলে যাব। তোমার স্কুলে। নীলের কষ্ট হত তখন। পদ্মকে এত দূরের স্কুলে নিয়ে যাবে কি করে। পদ্ম বড় হয়ে উঠছে। পদ্মকে সে নিয়ে যেতে পারত না। নিয়ে যেতে পারত না বলে, বাড়ি ফিরে স্কুলের গল্প করত। রাস্তার গল্প। খেতখামার থেকে চুরি করে জাম-জামরুল আখের দিনে আখ, বর্ষাকালে সাপলা শালুক তুলে নেওয়ার গল্প। পড়তে পড়তে গল্প শোনা ছিল পদ্মর বাতিক। সেই স্কুলে যাবার রাস্তাটা কত যে লম্বা, পদ্ম না গিয়েও তখন শুনে শুনে সব বলে দিতে পারে—এই যেমন নীলদা এবং আরও সব গাঁয়ের ছেলেরা মাঠ পার হয়ে যখন যায় তখন শীতের বটগাছ, বসন্তের দেবদারু দেখলেই বসে পড়ে। বড় বেশি দূর, প্রায় দু কোশের কাছাকাছি। রোজ রোজ এতটা পথ হেঁটে যায় নীলদা, ফিরে আসে, ফিরে এলেই পদ্ম কোন পাতাবাহারের ঝোপ থেকে উঁকি দিতে বলত, নীলদা যাবে? কোথায়? এই একটু দূরে। নির্জন জায়গায় ঝোপের ভিতর ওরা দুজনেই লুকিয়ে পড়ত। পদ্ম উবু হয়ে বসে ফ্রকের নিচ থেকে বের করত খাবার। কি সুন্দর গন্ধ। ক্ষীরের পুলি। পদ্ম বলত, তোমার জন্য চুরি করেছি। নীল চুপচাপ খেয়ে যেত। পদ্ম দেখত শুধু। পদ্মর ইচ্ছা হত নীলদা বলুক, তুই একটা খা। কিন্তু নীলদা কিছু বলত না। ওর ভীষণ অভিমান হত। সে তখন বলত, নীলদা যাবে?—কোথায়?—এই একটু জ্যোৎস্নায় ঘুরে বেড়াব। কোজাগরি লক্ষ্মীপূজোর দিনে পদ্ম নীলকে নিয়ে এ-বাড়ি পূজোর প্রসাদ খাবার নামে হেমন্তের গাছপালার ভিতর হারিয়ে যেত।

পদ্ম বলল, নীলদা তোমার এ-সব মনে পড়ে না?

—পড়ে।

—তবে তুমি লেখ না কেন?

—ভাল লাগে না লিখতে।

এবং এ-ভাবেই বলতে পারত নীলদা তুমি বিয়েও করলে না। আচ্ছা মানুষ তুমি। এখানে সেখানে ঘুরলে, একবার এখানে এলে না। এলেই বুঝি ধরা পড়ে যাবে। তারপর আরও কি যেন বলতে চায় পদ্ম। পদ্ম এখন এ সব বলছে কেন। শৈশবে পদ্ম এবং সে তারপর আরও বড় হলে অর্থাৎ কৈশোরে পদ্ম আর সে এভাবে দরগার মাঠে অথবা কবিরাজ মশাইর দালান পার হলে যে সুন্দর গাছপালার ফাঁকে আকাশ দেখা যায় দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে, সে সব তারা দেখত। তারপরও সে যখন বড় হয়ে যায়, পদ্ম যখন বড় হয়ে যায় দেশ ভাগের পর ওরা যখন ভাগ হয়ে যায়, তখনও পদ্ম কলকতার বাসায়

নীলদার জন্য অপেক্ষা করত জানলায়। নীলদা আসবে। পদ্মের স্কুল ছুটি হলে, পদ্ম তখন উঁচু ক্লাশের ছাত্র, পদ্ম ফ্রক পরে না, শাড়ি পরে, বাড়ি ফিরে এক বিকেলে নীলদাকে দেখে অবাক। চার বছরে নীলদা কত বড় হয়ে গেছে! কি সুন্দর হয়েছে দেখতে! কি লম্বা হয়ে গেছে আশ্চর্য নীল রঙের নরম গোঁফ। পদ্ম কিছুতেই চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সে টুপ করে প্রণাম সারতে গিয়ে পায়ের কাছে যে বসে পড়েছিল আর বোধ হয় উঠতে ইচ্ছা হয়নি। নীল হেসে বলেছিল, পদ্ম ওঠো। কি হচ্ছে। খুব ভক্তি দেখছি।

এ-সব মনে পড়লেই পদ্মর বোধ হয় কিছু ভাল লাগে না। পদ্ম বলল, নীলদা, বেশ ছিলাম।

—এখনও বেশ আছ। সুধাময় কি সুন্দর মানুষ!

পদ্ম বলল, সবাই ভাল। সবাই ভাল নীলদা। আমি কেবল ভাল না।

—তুমি কি এ-সব শোনাবার জন্য সুধাময়কে পাঠিয়েছিলে!

পদ্ম বলল, এখন এমন বয়সে সবই বলতে পারি। আগে যে পারিনি কেন!

নীল তেমনি হাসল, বলল, না-বলে ভালই করেছ। আমি এখনও তোমার কাছে ভীষণ দামী মানুষ। আমার ভীষণ ভাবতে ভাল লাগে! আমার ভীষণ অহংকার হয়। এখনও একজন আমাকে রাজার মতো ভাবে।

পদ্ম বলল, তা রাজার মতো, রাজার তো কথা ছিল সে একজনকে নীলপদ্ম এনে দেবে। কোথায় দিলে।

নীল দেখল তখন আকাশে সেই অপরূপ বর্ণমালা। কত সব নক্ষত্র এবং আলোর ভিতর রাস্তার সব ফুলের গাছে সাদা এক সৌন্দর্য, যা দেখতে দেখতে কেমন হতবাক হয়ে যেতে হয় এবং দূরে যে-সব সল্ট লেকের বাড়ি উঠছে, তার ও-পাশে মরুভূমির মতো মাঠ, জোরে হাওয়া উঠে আসছে, পদ্মর ঘন চুলে ওর মুখ ঢেকে যাচ্ছে। পদ্মকে ভীষণ দুঃখী লাগছে। সে বলল, নীলপদ্ম কোথাও নেই। থাকলে সত্যি চেষ্টা করতাম।

নীল কিছু বলতে পারছে না। শৈশবে ওরা সুর করে রামায়ণ পড়ত। এ-ভাবে তারা নীলপদ্মের কথা জেনেছে—কখনও কখনও ওরা ভেবেছে, দূরে কোথাও গেলে কি সেই ফুল এরা পেয়ে যাবে! এবং এ-জন্যই বোধ হয় ওরা শৈশবে রমজান ফকিরের দরগায়, অথবা দূরে কোথাও বিলের জলে, কোন নীল রঙের ফুল দেখলে ভাবত, এই সেই ফুল, আসলে শালুক আর পদ্মে কি তফাৎ মানুষের জানা না থাকলে যা হয়, ওরা এ-ভাবে অনেক বড় হতে হতে খুঁজেছে একটা ফুল, যা ভিতরেই ফুটে থাকে, যা তুলে আনা যায় না, যত দূরে ফুলটা সরে যায় তত তার সৌরভ বাড়ে।

নীল বলল, পদ্ম এই তো বেশ। তোমার আমার এই সৌরভ আমাদের কখনও ক্লান্ত করবে না।

ওরা তারপর কেউ কোন কথা বলল না। পদ্ম এবং সে পাশাপাশি বসে থাকল। হাওয়ায় চুল উড়ছে। পদ্মর আঁচল উড়ছে। ওরা এভাবে বসে থাকল। বসে থাকতে কি যে ভাল লাগল! যেন সেই সকাল থেকে ওরা বসে রয়েছে, সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখবে বলে, কিন্তু সেই সূর্য আর উঠছে না। তবু বসে থাকতে ভাল লাগছে। সূর্য উঠুক না উঠুক ফুল ফুটুক না ফুটুক কিছু আসে যায় না। ওরা যেখানে যেভাবে থাকুক আসে যায় না। এমন মনে হলে পদ্ম বলল, আমার আর কোন কষ্ট নেই নীলদা। তুমি এস। মাঝে মাঝে এস। এলে ভাল লাগবে।

নীল বলল, আসব। তারপর ওরা উঠে গেল। ওরা দু-ঘরে শুতে চলে গেল। ওরা দু-ঘরে দুজন, তবু ওরা কাছাকাছি। পদ্ম দেখল সুধাময় ঘুমোচ্ছে। পদ্ম ইচ্ছা করেই ওকে জাগিয়ে দিল না। ওর ক্ষুধা নিবারণ হলে আর কিছু লাগে না। সরল সহজ বালকের মতো খাই খাই স্বভাবের। পদ্ম নিজের জানালায় পাশ ফিরে শুল। কি যে নিঃসঙ্গতা ভিতরে—আর তেমনি সেই আকাশে অজস্র নক্ষত্রমালা এবং এ-ভাবে কত হাজার লক্ষ নক্ষত্র রাজির মতো এমন সুন্দর সুন্দর ঘটনা পৃথিবীতে কতভাবে না ঘটে গেছে। নীলদা এখন কিভাবে শুয়ে আছে, ওর চুরি করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, না নীলদাও জানালায় তার মতো জেগে বসে রয়েছে! এখন ওর ভারি কষ্ট হচ্ছে, যেন এখানে এনে নীলদাকে ভীষণ একটা দুঃখের ভিতর ফেলে দিয়েছে। বরং না নিয়ে এলেই সে ভাল করত। পদ্ম সারারাত কিছুতেই ঘুমোতে পারল না।

আর এ-ভাবেই থেকে যায় মানুষের ভিতরে এক আকাঙ্ক্ষা, তার সব কিছু পাবার পরও থেকে যায় দুঃখ, সেটা নীলের জন্য হতে পারে, পদ্মের জন্য হতে পারে, অথবা নীলপদ্মের জন্য হতে পারে। কেউ দুঃখটা বাদে বেঁচে থাকতে পারে না। আর দুঃখটা না থাকলে বাঁচার ভিতরেও কোন সৌরভ থাকে না, তা নীল বুঝতে পারে। পদ্মকে অনেকদিন পর দেখে এ-সব মনে হচ্ছিল তার। আর সে বুঝতে পারে শুধু এ-জন্যই পদ্মর মুখ এমন পবিত্রতায় ভরা। সারা আকাশের বর্ণমালা যেন পদ্মের মুখে। পদ্মকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না।

প্রফুল্ল রায়

নরক

দুপুরবেলা নেকীপুর টৌনে বা টাউন থেকে সাগিয়া যখন বেরিয়ে পড়েছিল, আকাশের গায়ে দু-এক টুকরো নিরীহ ভবঘুরে মেঘ এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে। চারপাশে নরম মায়াবী রোদের তখন ছড়াছড়ি।

ভাদ্রমাস শেষ হয়ে এলো। গোটা বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে আজকাল আকাশ আশ্চর্য নীল হয়ে উঠেছে। মনে হয়, মাথার ওপর এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্ত পর্যন্ত অলৌকিক একখানা আর্শী কেউ আটকে রেখেছে। একটু আধটু কালচে মেঘ যে রোজ চোখে না পড়ে, এমন নয়। কিন্তু সেগুলো ঘন হতে না হতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়।

সেদিক থেকে আজকের দিনটা একেবারে আলাদা। দুপুরের সেই মেঘের টুকরোগুলো হাওয়ায় তো উড়ে গেলই না, বরং এক কোণে জমাট বাঁধতে লাগল। শুধু তাই না, দিগন্তের তলা থেকে নিরেট পাথরের চাংড়ার মতো আরো অজস্র মেঘ দ্রুত উঠে এসে ভাদ্রের উজ্জ্বল নীলকাশকে ক্রমশ ঢেকে ফেলতে শুরু করল।

সাগিয়া আসছে নেকীপুর টৌন থেকে, যাবে আরেক টৌন জনকপুরে। নেকীপুর থেকে খাড়া দক্ষিণে সে সরু পাকা সড়ক অর্থাৎ পাক্কীটা চলে গেছে সেটা ধরে মাইল চারেক হাঁটলে নৌহর নদীর পারঘাটা। নৌহর বিখ্যাত কোশী নদীর মূল ধারা থেকে বেরিয়ে অনেকটা ঘুরপথে আবার কোশীতেই গিয়ে মিশেছে। খেয়া নৌকোয় নদী পেরিয়ে ওপারে নামলে ফের পাকা সড়ক। সেখান থেকে সাইকেল রিকশায় মাইল সাতেক গেলে জনকপুর।

কিন্তু জনকপুর টৌন অনেক দূরের কথা, নেকীপুর থেকে বেরিয়ে মাইল দুই যেতে না যেতেই সাগিয়া টের পায়, দিনের আলো দ্রুত নিভে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ তুলে তাকায় সে। কোথাও নীলাকাশের চিহ্নটুকু নেই। ভারী ঘন কালো মেঘের স্তর ছাড়া মাথার ওপর কিছুই চোখে পড়ে না।

এখনও অনেকটা রাস্তা সাগিয়াকে যেতে হবে। তা ছাড়া মাঝখানে রয়েছে একটা মাঝারি নদী। সে যে নেকীপুরে ফিরে আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে আবার জনকপুর রওনা হবে, তারও উপায় নেই। কেননা জগনাথজি আজ সকালে তার মজুরি মিটিয়ে দিয়ে সাহারসা চলে গেছে। জগনাথজি ছাড়া নেকীপুরের দু-একজনকে সে যে চেনে না তা নয়, কিন্তু তার মতো জঘন্য মেয়েমানুষকে কেউ

ঘরে ঢুকতে দেবে না। কেননা সাগিয়ার মুখ দেখাও পাপ, তার ছায়া মাড়ালে দশ বার নাহানা করে শরীর শুদ্ধ করতে হয়।

একেবারে মরিয়া হয়েই সাগিয়া হাঁটার গতি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়। এখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি, তবে যে কোনো মুহূর্তে আকাশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। সমস্ত চরাচর জুড়ে যা মেঘ জমেছে তাতে একবার শুরু হলে সে দুর্যোগ কবে থামবে, আদৌ থামবে কিনা, কে জানে। তার আগেই তাকে নৌহর নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছুতেই হবে।

সাগিয়ার দিকে এবার ভালো করে তাকানো যেতে পারে। পৃথিবীর সব চেয়ে গুঁচা রাণ্ডিটুলি বা বেশ্যাপাড়া যদি কোথাও থাকে, সেটি হল জনকপুরে। সাগিয়া সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা।

তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কিন্তু এখনও ততটা দেখায় না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জানোয়ারের পাল সাগিয়ার শরীরটাকে ময়দা ডলার মতো ডলে চলেছে। তারপরও সে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি।

লম্বাটে মুখ সাগিয়ার। গায়ের রং মাজা তামার মতো। চোখের তলায় কালির ছোপ পড়েছে ঠিকই, লক্ষ করলে গালে ছিট-ছিট মেচেতাও দেখা যাবে, চেহারায় ফুটে উঠতে শুরু করেছে কর্কশ কাঠিন্য। সবাই ঠিক, তবু রাতের পর রাত কুত্তার পালের কামড়াকামড়ি এবং ধামসানোর পরও সাগিয়ার শরীরে খানিকটা চটক এখনও থেকে গেছে। এর একটা বড়ো কারণ তার প্রায়-অটুট স্বাস্থ্য।

সাগিয়ার শরীরে এখনও চর্বি জমতে শুরু করেনি। হাত-পায়ের হাড় বেশ পুরু আর মজবুত। সরু কোমর তার, মাংসল ভরাট বুক, কোমরের তলায় বিশাল অববাহিকা, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ফুঁড়ে বেরোয়নি। ছোট কপাল, ঘন কালো চুল খুলে দিলে কোমর ছাপিয়ে নেমে যাবে।

এই মুহূর্তে সাগিয়ার পরনে খেলো রঙচঙে সিল্কের শাড়ি আর লাল টকটকে ব্লাউজ। পায়ে কাঁচা চামড়ার সস্তা স্লিপার। দুই হাতে রুপোর কাংনা, কানের ঝুটো পাথর বসানো চাঁদির করণফুল, গলায় চাঁদিরই চওড়া হার, নাকে নাকফুল। চুলগুলো প্রাকাণ্ড খোঁপায় আটকে একটা রুপোর পাত বসানো কাকই বা চিরুনি গুঁজে দেওয়া হয়েছে। হাতের আঙুলে গোটা তিনেক চাঁদির আংটি, পায়ের আঙুলে চুটকি। দুই ভুরুর মাঝখানে উল্কিতে আধখানা চাঁদ, থুতনিতেও উল্কি রয়েছে- -সেটা ফণাতোলা ছোট একটা সাপ।

সাগিয়ার ডান হাতে ঝুলছে ফুললতাপাতা-আঁকা টিনের একটা সুটকেস। সেটার ভেতর রয়েছে কিছু জামা-কাপড়, খেলো স্নো-পাউডার, কজরৌটি (কাজললতা), আলতার শিশি, এমনি সব কাজের জিনিস।

দিন চারেক আগে নেকীপুরে এসেছিল সাগিয়া। জগনাথই লোক পাঠিয়ে তাকে জনকপুর থেকে নিয়ে যায়।

জগনাথ হলো 'লালদাসিয়া' কায়াথ। বয়স পঞ্চাশের ওপর। কিন্তু এই বয়সেও মেয়েমানুষের জন্য তার শরীরে সারাক্ষণ আগুন জ্বলছে। তার কারণ পার্বতী।

পার্বতী জগনাথের স্ত্রী—অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে-করা বিশুদ্ধ ধর্মপত্নী। কিন্তু এই মেয়েমানুষটির জন্য জগনাথের প্রাণে সুখ-শান্তি বলতে কিছু নেই, তার 'তনমন' একেবারে ছারখার হয়ে গেছে। বিয়ের বছরখানেক বাদেই এক দুর্ঘটনায় কোমরের তলার দিকটা পড়ে যায় পার্বতীর। তারপর প্রায় তিরিশ বছর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী হয়ে আছে সে। একসময় সুন্দরীই ছিল, কিন্তু একনাগাড়ে বছরের পর বছর ভুগে এবং বিছানায় শুয়ে থেকে শরীরে শাঁস বলতে এখন আর কিছুই নেই। চোখ এক আঙুল ভেতরে ঢুকে গেছে, চুল হেজে হেজে পাটের ফেঁসো। হাড়ের ওপর শুকনো ঢিলে চামড়া খোলসের মতো আটকে আছে। বুকের ধুকপুকুনিটুকু না থাকলে মনে হতো, সে বেঁচে নেই।

জগনাথ আরো একবার বিয়ে করতে পারত, পারেনি পার্বতীর বাপুজি অর্থাৎ তার শ্বশুরের ভয়ে। শ্বশুর রামধারীজি বিরাট জমিমালিক, প্রচণ্ড দাপট তাঁর। জগনাথ যে জীবনে দাঁড়াতে পেরেছে, সমাজে সে যে একজন পয়সাওলা 'সরগনা আদমী' (মান্যগণ্য ব্যক্তি) সেটা রামধারীজির কারণেই। তিনি চোখ

লাল করে হাতের আঙুল উঁচিয়ে শাসিয়েছিলেন, দুসরা শাদি করা চলবে না জগনাথের। মেয়ের ঘরে সৌতিন ঢুকবে, এতে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি।

কাজেই দ্বিতীয় বার বিয়েটা করা হয়ে ওঠেনি জগনাথের। কিন্তু শরীর বলে তো একটা ব্যাপার আছে। রুগ্ন রতিশক্তিহীন গিধের মতো স্ত্রীকে নিয়ে সে কী করবে? ধর্মপত্নীর জন্য তো আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য পালন করা যায় না। তাই লুকিয়ে চুরিয়ে ধুরন্ধর বিল্লির মতো তাকে খিদে মেটাতে হয়।

জগমোহন বিরাট কাঠের কারবারী। সাহারসায় তার আসল গদি। বাড়িও সেইখানেই। তবে নেকীপুরেও তার একটা গোলা আছে। এখানকার গোলা চারপাশের যাবতীয় ভালো টিম্বার যোগাড় করে সাহারসায় পাঠায়। সাহারসার গদি থেকে সে-সব চালান যায় বড়ো বড়ো শহরে—পাটনায়, ধানবাদে, কলকাতায়, এমন-কি সুদূর বোম্বাইতেও।

জগনাথ সময় পেলেই নেকীপুরের গোলায় চলে আসে। আসার কারণ দুটো। এখানকার কাজকর্ম তদারক করা আর জনকপুর থেকে সাগিয়াকে আনিয়ে কয়েকটা দিন একটু আনন্দে কাটানো। এতে তার পরমাত্মার শান্তি। অটুট স্বাস্থ্যবতী, চটকদার আওরতটাকে তার খুব মনে ধরেছে। প্রায় বছর দশেক ধরে জগনাথের জন্য বছরে অন্তত সাত-আটবার জনকপুর থেকে নেকীপুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে সাগিয়াকে।

সাগিয়া যখন নৌহর পারঘাটায় পৌঁছল, তখনও বৃষ্টি শুরু হয়নি, তবে মেঘের ভারে আকাশ অনেকখানি নেমে এসেছে। দিগন্তকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ছুরির ফলার মতো বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড তোলপাড় করে থেকে থেকেই বাজ পড়ছে। সেই সঙ্গে চলছে একটানা মেঘের গর্জন। খোলা নদীর ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া সাঁই সাঁই ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

ক'দিন আগে যখন ওপার থেকে এপারে এসে সাগিয়া নেমেছিল, নৌহর তখন আশ্চর্য শান্ত। বর্ষার জলে যদিও সে ভরে ছিল পূর্ণ যুবতীর মতো, কিন্তু এতটুকু অস্থিরতা ছিল না তার। সেই নৌহরকে এখন আর চেনা যায় না। তার নীলাভ জলে সীসার রং ধরেছে, চারিদিক উথাল-উথাল করে বড়ো বড়ো ঢেউ উঠছে।

আয়োজনটা যেভাবে হয়েছে তাতে উত্তর বিহারের এই অঞ্চল পৃথিবী থেকে একেবারে মুছে যাবে কিনা, কে জানে।

পারঘাটে একটি মাত্র নৌকোই রয়েছে। চেনা নৌকো। এটাই যাত্রী নিয়ে এপার ওপার করে।

মাল্লা নৌকোটা ছাড়তে যাচ্ছিল, সাগিয়াকে দেখতে পেয়ে হেঁকে ওঠে, 'ওপারে যাবে?'

নদীর চেহারার দিকে তাকিয়ে রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিল সাগিয়া। পলকা খেয়া নৌকোয় ওপারে যাবে কি যাবে না ভাবতে একটু সময় লাগে তার।

মাল্লা তাড়া লাগায়, 'কা, যাওগী? এরপর আর কিন্তু নৌকো পাবে না।'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবার মতো সময় নেই। উর্ধ্বশ্বাসে সাগিয়া নৌকোয় গিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মাল্লা বৈঠার ধাক্কায় নৌকোটাকে পার থেকে দূরে নিয়ে যায়।

নদী এখন প্রবল তোড়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে। বিশাল বিশাল ঢেউ তীব্র আক্রোশে সাগিয়াদের নৌকোটাকে মোচার খোলার মতো ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে।

মাল্লা লোকটা যেমন দুর্ধর্ষ তেমনি হুঁশিয়ার এবং একজন চতুর যোদ্ধাও। উত্তর বিহারের এই নদী, তার স্রোতের টান সম্পর্কে বিপুল অভিজ্ঞতা তার। এই মুহূর্তে হালের বৈঠাটাকে ঢালের মতো ধরে রেখে দাঁতে দাঁত চেপে সে শুধু ঢেউ কাটিয়ে যাচ্ছে।

সাগিয়া এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি, নিজের অজান্তেই এবার তার চোখ অন্য যাত্রীদের ওপর গিয়ে পড়ে। লোক বেশি না, সবসুদ্ধ জন পাঁচেক। সবাই নৌকোর মাঝখানে খোলা পাটাতন আঁকড়ে বসে আছে। ওদের চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। তারা জানে না নৌকোটা শেষ পর্যন্ত নৌহর পেরিয়ে ওপারে পৌঁছতে পারবে কিনা।

যাত্রীদের মধ্যে চারজন নিরীহ চেহারার সাদাসিধে দেহাতী। পঞ্চম যাত্রীটির দিকে তাকিয়ে রীতিমতো অবাকই হয় সাগিয়া। দেখামাত্র বোঝা যায় উঁচু জাতের, বড় বংশের মানুষ। বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ। গায়ের রঙ টকটকে, মসৃণ ত্বক, লম্বাটে ভরাট মুখ, ভাসা চোখ, টান টান চেহারা। কাঁধের গলায় বা চিবুকের তলায় সামান্য মেদ অবশ্য জমেছে। তাঁকে দেখে মনে হয়, অত্যন্ত শুদ্ধ এবং নিষ্পাপ।

এই মুহূর্তে তার পরনে সাদা ধবধবে ধুতি আর পাঞ্জাবি, পায়ে ভারি চপ্পল। সঙ্গে মাঝারি মাপের একটি চামড়ার সুটকেস ছাড়া আর কিছুই নেই।

সাগিয়া নিজে যথেষ্ট ভয় পেয়েছে, কিন্তু ঐ মানুষটির আতঙ্কের শেষ নেই। তাঁর চোখের তারা স্থির। ভয়ার্ত মুখ থেকে পরতে পরতে রক্ত নেমে গিয়ে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। শুকনো ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়ছে তাঁর। অস্পষ্ট কাঁপা গলায় বিড়বিড় করে কিছু বলছেন। বেশ কিছুক্ষণ পর সাগিয়া চারটি মাত্র শব্দ শুনতে পায়, 'ভগোয়ান রামচন্দ্রজি, আপহী ভরসা—' তিনি হয়তো ধরেই নিয়েছেন মেঘের চাপে নুয়ে পড়া আকাশের তলায় নৌহরের প্রচণ্ড জলস্রোতে মৃত্যু অবধারিত।

কড়-কড় শব্দে আকাশটাকে করাতের মতো চিরে দিয়ে কাছাকাছি উদোম নদীর ওপর কোথায় যেন বাজ পড়ে। পলকের জন্য ঝলসে যায় চারপাশ। চমকে সেই ভীত নিষ্পাপ মানুষটির দিক থেকে মুখ ফেরায় সাগিয়া। তার চোখ কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধিয়ে যায়।

দেহাতী চারজন ভীরু চাপা গলায় গোঙানির মতো অদ্ভুত সুরে অনবরত আওড়াতে থাকে, 'হো কিষুণজি, তেরে কিরপা—' তাদের কণ্ঠনালী থেকে শব্দ বেরুতে না বেরুতেই হাওয়াব ঝাপটা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

মাল্লাটা বিপুল পরাক্রমে নদীর সঙ্গে যুঝে যাচ্ছে। তার ধ্যানজ্ঞান এখন একটাই। বৈঠাটাকে জলের ভেতর আড়াআড়ি রেখে যেমন করে হোক কোনাকুণি নৌকোটাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া। সে গলুইর কাছ থেকে সাহস যোগাতে থাকে, 'ডরো মাত ভেইয়া। বারীষ শুরু হবার আগেই তোমাদের ওপারে পৌঁছে দেব।'

নৌহর খুব একটা বড় নদী নয়। কোথাও সেটা আধ মাইলের বেশি চওড়া হবে না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক একটানা লড়াইয়ের পর নৌকোটা যখন নদীর মাঝামাঝি এসে পড়েছে সেই সময় বাতাস যেন হঠাৎ খেপে উঠল। সেই সঙ্গে মেঘের স্তরগুলো গলে গলে শুরু হলো বৃষ্টি। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, তারপর প্রবল তোড়ে। চরাচরের ওপর লক্ষ কোটি সীসার ফলা যেন আকাশ থেকে ছুটে আসছে। আচমকা নদীর ঢেউগুলো পাহাড়ের মতো ফুলে ফেঁপে চারিদিক তোলপাড় করে ফেলতে থাকে। জলস্রোতে এখন কয়েক লক্ষ বুনো হাতির শক্তি।

একটানা মেঘের ডাক, থেকে থেকে বিজলী চমক, বাজের গর্জন, উল্টোপাল্টা ঝড়ো হাওড়া আর নদীর বেপরোয়া উন্মত্ত স্রোত, সব মিলিয়ে আজকের এই বিকেলটা পৃথিবীর আদিম দুর্যোগের দিনে যেন ফিরে গেছে।

যে-দিকেই তাকানো যাক, এখন সমস্ত কিছু ঝাপসা। উজ্জ্বল সূর্যালোক, শরতের স্নিগ্ধ নীলাকাশ, ঝিরঝিরে সুখদায়ক হাওয়া—পৃথিবীতে কোনোদিন এসব ছিল বলে মনে হয় না।

নৌকোটা একবার ঢেউয়ের মাথায় উঠছে, পরক্ষণে অতল খাদে যেন নেমে যাচ্ছে, আবার তখনই তিরিশ হাত উঁচুতে উঠে আসছে।

শরীরের সমস্তটুকু শক্তি দিয়ে সবাই পাটাতনের কাঠ আঁকড়ে ধরে আছে। হাওয়া এবং নদীর ঘা জোর, যে কোনো মুহূর্তে এক ঝাঁকুনিতে তাদের নৌকো থেকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। একবার স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়লে কে কোথায় ভেসে যাবে, কে জানে!

এখন দু'হাত দূরের কোনো কিছুই স্পষ্ট নয়। তবু সাগিয়া টের পায় অন্য সকলে পাটাতনের কাঠ ধরে বসে থাকলেও সেই শুদ্ধ মানুষটি একেবারে উপুড় হয়ে শুয়ে দু'হাতে নৌকোর কানাত জাপটে ধরে পড়ে আছেন।

দেহাতীরা এখন সমানে বলে যাচ্ছে, 'মর গিয়া, মব গিয়া—' কিছুক্ষণ আগেও কিষুণজির ওপর

তাদের অটুট আস্থা ছিল। তারা ভেবেছিল তাঁর কৃপায় নিরাপদে নদীর ওপারে পৌঁছে যেতে পারবে। এখন সেই বিশ্বাসটা আগাগোড়া টলে গেছে।

মেঘ এবং একটানা বৃষ্টিতে চারিদিক ঝাপসা হয়ে গেলেও বোঝা যাচ্ছে নৌকোটা পারের কাছাকাছি চলে এসেছে। কিন্তু এই দুর্যোগে নদীর অলৌকিক শক্তির সঙ্গে একটা মানুষ কতক্ষণ আর যুঝতে পারে? হঠাৎ এতক্ষণ পর জলস্রোতের মারাত্মক চাপে মাল্লার হাতের বৈঠা কাঠির মতো মট করে ভেঙে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা গোঁত খেয়ে দু'পাক ঘুরেই সটান উল্টে গিয়ে স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে থাকে।

নৌকোটা পাক খাওয়ার সময় দেহাতীদের শেষ চিৎকারটা শোনা গিয়েছিল, 'বিলকুল খতম হো গিয়া। বঁচাও—'

বৈঠা ভেঙে গিয়া নৌকোর উল্টে যাওয়াটা এতই আকস্মিক যে আগে থেকে কেউ তা আন্দাজ করতে পারেনি। জলের টানে ভেসে যেতে যেতে সাগিয়া ভেবেছিল, আর বাঁচবে না। পরক্ষণেই স্বয়ংক্রিয় কোনো পদ্ধতিতে মনে পড়ে যায়, সে সাঁতার জানে। তৎক্ষণাৎ তার রক্তের ভেতর দিয়ে বিজরী চমকের মতো কিছু খেলে যায়। যদিও শাড়ি এবং জামা ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপ্টে বসে গেছে এবং তার ফলে সাঁতরাতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে, তবু জলের ওপর প্রাণপণে ভেসে থেকে সাগিয়া পারের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

খানিকটা যাবার পর হঠাৎ তার চোখে পড়ে, ডান পাশে প্রায় কুড়ি হাত তফাতে কিছু একটা ভেসে যাচ্ছে। বৃষ্টির তোড় এখনও কমেনি, দিনের আলোর ছিটে ফোঁটাও আর নেই, তবু তারই ভেতর বোঝা যায় ওটা একটা মানুষ। নিজের অজান্তে, হয়তো কোন অপার্থিব শক্তি সাগিয়াকে ডুবন্ত লোকটার দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু জলস্রোতে তাকে এত জোরে টেনে নিয়ে চলেছে যে সাগিয়া কোনোভাবেই তার কাছে পৌঁছতে পারে না। লোকটা ক্রমশ দূরে, আরও দূরে ভেসে যেতে থাকে।

সাগিয়ার ওপর অলৌকিক কিছু একটা যেন ভর করে। এই খ্যাপা নদীর মারাত্মক স্রোত থেকে কাউকে বাঁচাতে যাওয়া যে কতখানি বিপজ্জনক, তার খেয়াল থাকে না। মরিয়া হয়ে দু'হাতে জল কেটে সে এগিয়ে যায় এবং অনেকক্ষণ যুঝবাব পর শেষ পর্যন্ত লোকটার কাছে এসে তার কাঁধের কাছটা জামাসুদ্ধ ধরে ফেলে। সাগিয়া বুঝতে পারছিল তার নিজের নাকমুখ দিয়ে গল গল করে জল ঢুকে যাচ্ছে, পায়ের শিরায় টান ধরে গেছে। কিন্তু এখন কোনো কিছু ভাবার সময় নয়। নিজেকে এবং লোকটাকে স্রোতের ওপর ভাসিয়ে রেখে এবার সে পারের দিকে যেতে থাকে। মাঝে মাঝে চোরা ঘূর্ণি উঁচু উঁচু ঢেউ লোকটাকে ছিনিয়ে নিতে চায় কিন্তু সাগিয়া হাতের মুঠি মুহূর্তের জন্য আলগা করে না, তার হাত সাঁড়াশির মতো লোকটার কাঁধ চেপে ধরে থাকে।

জলস্রোতের ওপর দিয়ে ভাসিয়ে ভাসিয়ে এক-সময় লোকটাকে যখন নদীর পারে তুলে আনে তখন সাগিয়ার জীবনী শক্তি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

নৌহর নদীর পার ধরে পঞ্চাশ হাত চওড়া বাদামী বালির ডাঙা চলে গেছে। লোকটাকে তুলবার পর বালির ওপর হাঁপায় সাগিয়া। এতক্ষণ জলে থাকার কারণে তার হাত পা সিঁটিয়ে গেছে। শীতে গায়ের চামড়া কেঁপে কেঁপে ওঠে।

বৃষ্টির দাপট এবার কমে এসেছে, তবে একেবারে থামেনি, ঝির ঝির করে পড়েই যাচ্ছে। আকাশে মেঘ খানিকটা পাতলা হয়ে এসেছে। কিছুক্ষণ আগেও সমস্ত চরাচর মেঘে এবং বৃষ্টিতে এত ঝাপসা হয়ে ছিল সে কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না। এখন মেঘের স্তর ফাটিয়ে ফ্যাকাসে আলোর একটু আভা ফুটতে শুরু করেছে।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসে সাগিয়া এবং দু'হাত দূরে পড়ে থাকা সেই লোকটার দিকে চোখ পড়তে চমকে ওঠে। লোকটা আর কেউ না—উঁচু জাতের বড় বংশের শুদ্ধ নিষ্পাপ মানুষ বলে সাগিয়া যাঁকে মনে করেছিল—তিনিই।

কয়েক পলক মানুষটির দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে সাগিয়া। তারপর হঠাৎ কোনো যান্ত্রিক নিয়মে তাঁর দিকে ঝুঁকে ডাকে, 'শুনিয়ে—শুনিয়ে—'

মানুষটি সাড়া দেন না, নড়াচড়ারও লক্ষণ নেই তাঁর।

দ্বিধান্বিতের মতো বসে থাকে সাগিয়া। হঠাৎ তার মনে হয় মানুষটি বেঁচে আছেন তো? আরো ঝুঁকে দ্রুত একটা হাত তাঁর নাকের তলায় নিয়ে আসে। অনেকক্ষণ পর পর তিরতির করে একটু নিঃশ্বাস পড়ছে।

দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ অনেকটা কেটে যায় সাগিয়াব, ভেতরে ভেতরে সে আরাম বোধ করে। মানুষটি বেঁচেই আছেন। সে আবার ডাকতে থাকে, 'শুনিয়ে—'

এবারও উত্তর নেই।

হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হয় সাগিয়ার। মানুষটির কাঁধের কাছটা ধরে আস্তে আস্তে ঝাঁকুনি দিতে থাকে, 'ইধর দেখিয়ে—' বলতে বলতে মুখটা আরো নামিয়ে আনে। মানুষটির চোখ পুরোপুরি বোজা। সাগিয়া টের পায়, একেবারে বেহুঁশ হয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে সে। একবার ভাবে, এই মানুষটি সম্পর্কে তার আর কোনো দায় নেই। প্রবল দুর্যোগের মধ্যে খ্যাপা নদী থেকে তাঁকে উদ্ধার করে পারে তুলে দিয়েছে। এরপর আব কী করতে পারে সে? পরক্ষণেই অসীম দায়িত্ববোধ সাগিয়ার মাথায় চেপে বসে। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিয়ে ভাবে, এই অবস্থায় মানুষটাকে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। জ্ঞান ফেরার পর সুস্থ না হয়ে ওঠা পর্যন্ত সাগিয়াকে তাঁর কাছে থাকতেই হবে।

এখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। আকাশেব যা চেহারা, মেঘ কিছুটা হাল্কা হলেও নতুন উদ্যমে আবার ধ্বংসের বাকি কাজটুকু যে-কোনো মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে।

মানুষটি জলে কাদায় এবং বালিতে মাখামাখি হয়ে আছেন। এভাবে খোলা আকাশেব নিচে পড়ে থেকে অনবরত ভিজতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যাবে কিনা সন্দেহ। যেমন কবেই হোক তাঁকে নিরাপদ জায়গায় নিযে যেতে হবে কিন্তু কীভাবে?

ভালো করে চারপাশ দেখে নেয় সাগিয়া। এই অঞ্চলটা তার অচেনা নয। সে আন্দাজ কবে নেয, জনকপুরের দিকের পারঘাটা থেকে স্রোতের টানে প্রায় মাইনখানের দক্ষিণে চলে এসেছে।

জায়গাটা ভয়ঙ্কর নির্জন। একটা মানুষও কাছে-দূরে কোথাও চোখে পড়ছে না। মানুয দূবেব কথা, পাখি-টাখি, জন্তু জানোয়ার, এমন-কি পোকামাকড় পর্যন্ত নেই। অসময়ের এই প্রচণ্ড দুর্যোগে সবাই নৌহরের আশপাশ থেকে উধাও হয়ে গেছে।

একটা লোক পাওয়া গেলেও ধরাধরি করে মানুষটাকে পারঘাটা পর্যন্ত যাওয়া যেত। কিন্তু তার আর উপায় নেই। যা করার সাগিয়াকে একাই করতে হবে।

মানুষটার হাতে-পায়ের আঙুল, এবং ঠোঁট সিঁটিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ জলে ভেজাব কাবণে তাঁর গায়ের চামড়া অত্যন্ত সাদা আর রক্তশূন্য দেখায়।

সাগিয়া বুঝতে পারছে, মানুষটি প্রচুর জল খেয়েছিলেন। প্রথমেই তাঁর পেট থেকে জলটা বার করে দেওয়া দরকার। পিঠের দিকটা ধরে তাঁকে আস্তে আস্তে বসিয়ে দেয় সাগিযা, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ে, দুই হাত দু'দিকে এগিয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই তাঁকে ঝাঁকাতে থাকে সাগিয়া। বাব কয়েক ঝাঁকুনি দিতেই মুখ দিয়ে খানিকটা নীলচে জল বেরিয়ে আসে। এবপব তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপ দিতে থাকে সাগিয়া। এবার হড হড় করে নাকমুখ দিযে আরো জল বেরোয়।

গায়ে হাত ঠেকাতেই টের পাওয়া গিয়েছিল মানুষটির গা ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে। যেমন করে হোক এঁর শরীরে উষ্ণতা ফিরিয়ে আনতে না পারলে বাঁচানোর আশা নেই। সাগিযা মনস্থিব করে ফেলে, মানুষটাকে পারঘাটায নিয়ে যাবে। যত দুর্যোগই হোক, ওখানে পৌঁছে গেলে লোকজন পাওয়া যাবেই। এরকম বেহুঁশ একটি মানুষকে দেখলে কেউ নিশ্চয়ই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না, সবাই হাত বাড়িয়ে দেবে।

একটাই বাঁচোয়া, নদীর পারটা এবড়ো-খেবড়ো বা জলে কাদায় থকথকে নয়, ঝোপঝাড জঙ্গলও নেই এখানে। মাইলের পর মাইল মসৃণ বাদামী বালি পাটির মতো পড়ে আছে।

সাগিয়া মানুষটিকে আবার তুলে বসিয়ে দেয়। আগের মতোই ঘাড় ভেঙে মাথাটা বুকের ওপর নেতিয়ে পড়ে, হাত দুটোও শরীর থেকে আলগা হয়ে ঝুলতে থাকে। সাগিয়া মানুষটির দুই বগলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরে।

মাথার ওপর মেঘের ভারে নেমে আসা আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, পাশে ফুঁসতে থাকে খতরনাক নদী—এর মধ্যেই জেদী, একরোখা, অনমনীয় এক মেয়েমানুষ সম্পূর্ণ অচেনা এক বেহুঁশ পুরুষকে বালির ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলে।

খানিকটা যাবার পর মানুষটিকে বালিতে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ জিভ বার করে কুকুরের মতো হাঁপায় সাগিয়া। তারপর আবার টানতে থাকে। এইভাবে জনকপুরের দিকের পারঘাটায় যখন পৌঁছয়, তার জীবনীশক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পারঘাটের পাশে অনেকগুলো ঝাঁকড়া মাথা পিপর গাছ। সেগুলোর তলায় বেশ কয়েকটা দোকান। তার কোনোটা চায়ের, কোনোটা পান-বিড়ি-খৈনির, কোনোটা লিট্টির, কোনোটা জিলাবি-গুলাবজামুন আর নমকিনের। দোকানগুলোর গা ঘেঁষে বয়েল গাড়ি আর সাইকেল রিকশা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সারা দিন এবং বেশ খানিকটা রাত পর্যন্ত মানুষজনের ভিড়ে জায়গাটা গমগম করে।

কিন্তু এই মুহূর্তে দোকানগুলোর ঝাঁপ বন্ধ। একটা সাইকেল রিকশাও চোখে পড়ছে না। লোকজনও নেই। দুর্যোগের চেহারা দেখে সব উধাও হয়ে গেছে। পারঘাট এখন একেবারেই নিঝুম। শুধু দুটো বয়েল গাড়ি এখনও চলে যায়নি। নির্জন সুনসান পারঘাটে ওরা কি আশায় দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে।

মানুষটাকে বালিতে শুইয়ে প্রায় ধুঁকতে ধুঁকতে পিপর গাছগুলোর তলায় চলে আসে সাগিয়া। সাইকেল রিকশা নেই, বয়েল গাড়িতেই মানুষটিকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তিনি কোথায় থাকেন— কোন টৌনে বা গাঁওয়ে, কী তাঁর নাম, সাগিয়া জানে না। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত জানার উপায়ও নেই।

সাগিয়া ঠিক করে ফেলেছে, মানুষটিকে জনকপুরের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে সে তাদের টোলিতে চলে যাবে। কিন্তু বিনা ভাড়ায় বয়েল গাড়ির প্রাণীদুটো এক কদমও নড়বে না। এতক্ষণে সাগিয়ার মনে পড়ে নৌকোটা গোঁত খেয়ে উল্টে যাবার পর তার টিনের সুটকেসটা জলে ডুবে যায়। তবে জগনাথ চারদিনের মজুরি যে আশিটা টাকা দিয়েছে সেটা কোমরে শাড়ির খুঁটে বেঁধে রেখেছিল। দ্রুত তার হাত সেখানে চলে যায়। টের পায় টাকাগুলো ওখানেই আছে।

একটা গাড়োয়ানের সঙ্গে দশ টাকায় ভাড়া ঠিক করে সাগিয়া। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে বেহুঁশ মানুষটিকে গাড়িতে তুলে ফেলে। চার চারটে দিন তার হাড়মাংস ডালে পিষে জগনাথ যা দিয়েছিল সেই কষ্টের মজুরি থেকে দশটা টাকা চলে যাবে। রীতিমতো আক্ষেপই হয় সাগিয়ার। কিন্তু এখন আর কিছুই করার নেই।

জনকপুর নোংরা নগণ্য শহর। একধারে আরো নগণ্য, আরো নোংরা অতি হতচ্ছাড়া চেহারার হাসপাতালে পৌঁছে দেখা গেল, সেখানকার একমেব ডাক্তারটি নেই। পঞ্চাশ মাইল দূরে বিয়ের বরাত নিয়ে গেছে। আজ তো ফিরবেই না, কবে ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই। হাসপাতালে যারা আছে, ডাক্তারের হুকুম ছাড়া কাইকে ভর্তি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এদিকে বৃষ্টির দাপট কিছুক্ষণের জন্য কমে এলেও আবার প্রবল তোড়ে পড়তে শুরু করেছে। হাওয়ার জোরও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ।

পারঘাটে বয়েল গাড়িতে ওঠার সময় সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছিল। এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। মেঘের কারণে অন্ধকার এত ঘন যে মনে হয়, চারিদিকে কালো কালো নিরেট দেওয়াল খাড়া হয়ে আছে।

সাগিয়া ভেবে রেখেছিল, কোনোরকমে হাসপাতালে পৌঁছুতে পারলে তার দায়িত্ব শেষ। কিন্তু এখন সে কী করবে? এই সম্পূর্ণ অজানা মানুষটিকে নিয়ে কোথায় যাবে? দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে তার মাথার ভেতর যেন আগুনের চাকা ঘুরতে থাকে।

এদিকে বয়েল গাড়ির গাড়োয়ান ভাড়া চুকিয়ে তাকে ছেড়ে দেবার জন্য অনবরত তাড়া দিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়েই সাগিয়া স্থির করে ফেলে, মানুষটিকে তাদের টোলায় নিয়ে যাবে। ভাড়ার ওপর আরো দু'টাকা বাড়তি দেবার কড়ারে গাড়োয়ান তাদের সেখানে পৌঁছে দেয়।

বেশ্যাপাড়াটা শহরের শেষ মাথায়। খান দশ বারো ধসে-পড়া টিনের চালের ফুটিফাটা ঘর নিয়ে এই টোলা। দু'সারিতে ঘরগুলো মুখোমুখি কোনোরকমে খাড়া হয়ে আছে, মাঝখান দিয়ে সরু প্যাচপেচে দমচাপা গলি। ঘরগুলোর হাল এমনই ঝরঝরে, যে-কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

জনকপুরের পয়সাওলাদের মহল্লায় বিজলী এসে গেছে, কিন্তু এদিকে তার চিহ্নমাত্র নেই।

বয়েল গাড়ির মাঝখানে ছইয়ের তলা থেকে সাগিয়া দেখতে পায় তাদের টোলার মুখে একটা ভাঙাচোরা টালির চালের তলায় সেজেগুজে বসে আছে মেয়েরা। বিজরী, শুগা, লছিমা, পঞ্ছী, এমনি আট দশজন। দু-তিনটে কালি-পড়া লণ্ঠন তাদের সামনে।

অন্যদিন এই সময় চিটেগুড়ের গায়ে মাছির মতো একটা থিকথিকে ভিড় যেন এখানে আটকে থাকে। এই নরকে যারা আসে তারা হলো মাতাল, গাঁজাখোর, চোর-জোচ্চোর, খুনী এবং গরমী বা ক্ষয়রোগী। দুনিয়ার একেবারি নিচের স্তরের এই সব জঘন্য কৃমিকীটেরা ছাড়া রাণ্ডিটোলার ছায়া আর কেউ মাড়ায় না। কিন্তু আজ তারাও আসেনি।

বয়েল গাড়ি দেখে মেয়েগুলোর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এই দুর্যোগের মধ্যেও হয়তো একটি খদ্দের এসেছে। কিন্তু ছইয়ের তলা থেকে সাগিয়ার গলা শুনে তাদের উৎসাহ পুরোপুরি নিভে যায়। সাগিয়ার ডাকতে শুরু করেছে, 'এ শুগা, এ লছিমা—তোরা জলদি এখানে আয়।'

কারো ওঠার লক্ষণ নেই। কর্কশ গলায় শুগা শুধু বলে, 'কায়?'

'একগো আদমীকে ধরে নামাতে হবে-পুরা বেহোঁশ।'

এবার মেয়েমানুষগুলোব চোখে-মুখে সামান্য ওৎসুক্য ফুটে ওঠে। তারা পাযে পায়ে উঠে আসে। ভাঙাচোরা চোয়াড়ে মুখ তাদের। রাতজাগার কারণে চোখের নিচে স্থায়ী কালির ছোপ। কোনোকালে এদের চেহারায় ছিরিছাঁদ এবং সামান্য লালিত্যও ছিল বলে মনে হয় না।

তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে বেহুঁশ মানুষটিকে দেখিয়ে সাগিয়া মেয়েমানুষগুলোকে বলে, 'ধর—'

একজন জিজ্ঞেস করে, 'এ কৌন রে?'

সাগিয়া বলে, 'পরে বলব।'

দু'জন লণ্ঠন তুলে ধরে। বাকি ক'জন সাগিয়ার সঙ্গে ধরাধরি করে মানুষটিকে টোলার ভেতরে নিয়ে আসে।

সাগিয়ার ঘরের দেওয়াল মাটির। এক দেওয়ালে ছোট ছোট দুটো জানালা, সে দুটোর পাল্লা পেটানো টিনের। আরেক দেওয়ালে খেলো ক'টা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, সেগুলোতে গণপতি, দুর্গা, রামচন্দ্রজি, বজরংবলী এবং শিবের ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া ছবি। তার পাশাপাশি খবরের কাগজ এবং পুরনো ক্যালেণ্ডার থেকে কেটে ফিল্মের প্রায়-উদোম লাস্যময়ী নায়িকাদের কিছু ছবি সেঁটে দেওয়া হয়েছে। দেব-দেবী এবং হিরোইনদের এই সহাবস্থানে কোনো পক্ষেরই বোধ হয় আপত্তি নেই। এক কোণে পুরনো ঘুণে-কাটা তক্তাপোষের একটি পায়া নেই, সেখানে ইঁট পেতে কাজ চালানো হচ্ছে।

তক্তাপোষে ময়লা বিছানা। দিন কয়েক সাগিয়া এখানে না থাকায় তার ওপর প্রচুর ধুলোটুলো জমেছে। তক্তাপোষটার তলায় এনামেলের তোবড়ানো হাঁড়িকুঁড়ি, টিনের তোরঙ্গ, শিশি বোতল, কৌটোবাটা, কাঠের বাক্স, সিলভারের কিছু বাসন-কোসন, এমনি নানা টুকিটাকি জিনিস ডাঁই হয়ে আছে। কোণের দিকে একটা কেরোসিন কাঠের আলনায় দু-চারটে শাড়ি ঝুলছে।

বেহুঁশ মানুষটিকে মেয়েমানুষগুলোর হাতে রেখে দ্রুত বিছানাটা ঝেড়ে, বাক্স থেকে পরিষ্কার চাদর

বার করে পেতে দেয় সাগিয়া। বলে, 'শুইয়ে দে।' কথা বলতে বলতে ক্ষিপ্র হাতে তক্তাপোষের তলা থেকে লণ্ঠন বার করে ধরিয়ে নেয়।

মেয়েগুলো মানুষটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। শুগা বলে, 'বিলকুল ভিজে গেছে আদমীটা। কাপড়া উপড়া বদলে না দিলে বুখার ধরে যাবে।'

'হাঁ— 'বলতে বলতে অসহায় চোখে এদিক সেদিক তাকায় সাগিয়া। তার ঘরে পুরুষের পরার মতো জামাকাপড় নেই।

লছিমা তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, 'তোর শাড়িই পরিয়ে দে। এখন ধোতি ওতি কোথায় পাবি?'

সাগিয়া দ্রুত আলনা থেকে দুটি শাড়ি নামিয়ে আনে।

লছিমা একপাশ থেকে বলে, 'কাপড়া উপড়া খুলে নাঙ্গা করে শাড়ি পরা সাগি—' বলে অশ্লীল ভঙ্গি করে চোখ টিপে দাঁত বার করে হাসে। দশ বছর বয়েস থেকে নিয়মিত বিড়ি ফোঁকা এবং খৈনি খাওয়ার কারণে তার দাঁত এবং মাড়ি হেজে গিয়ে চিরস্থায়ী কালো ছোপ ধরে গেছে।

অন্য মেয়েমানুষগুলো কুৎসিত শব্দ করে হাসে। সাগিয়া তাদের দিকে তাকায় না। প্রথমে একটা শাড়ি মানুষটির পেট থেকে নিচের অংশে চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে ভেজা ধুতির গিঁটটা খুলে তলার দিক থেকে টেনে নামিয়ে দেয়।

এতক্ষণ, মেয়েগুলো ভালো করে মানুষটাকে লক্ষ করেনি। এবার তার মুখের দিকে চোখ পড়তে থমকে যায়। ফিস ফিস করে নিজেদের ভেতর বলাবলি করে 'বহোত খুবসুরত আদমী।'

আসলে এমন সুপুরুষ চেহারার মানুষ দুনিয়ার এই ওঁচা রাণ্ডিটোলায় আসে না। এমনিতেই সাগিয়ার সম্পর্কে এখানকার মেয়েমানুষগুলোর প্রচণ্ড ঈর্ষা। কারণ এখনও তার চেহারায় অনেকটাই চটক থেকে গেছে। বাজারে সাগিয়ার শরীরের প্রচণ্ড চাহিদা। এখানে যে-ই আসুক, সাগিয়ার জন্য সর্বস্ব দিতে রাজি। অন্য মেয়ে দু'টাকা পেলে সে পায় পাঁচ গুণ। সাগিয়া আবার সবাইকে তার বিছানায় তোলে না। 'বগুলা চুনি চুনি খায়'-এর মতো সে বেছে বেছে পছন্দমতো লোককে ঘরে ঢোকায়। কিন্তু অন্য মেয়েমানুষগুলোর পছন্দ অপছন্দই নেই। পোকায়-কাটা, পচা-গলা ঘেয়ো চেহারার লোক এলেও বাছাবাছির ব্যাপার থাকে না। যে-ই আসুক খাতিরদারি করে ঘরে ঢোকাতে হয়। সব দিক থেকেই তারা সাগিয়ার কাছে মার খাচ্ছে। এমন-কি আজও বয়েল গাড়ি করে যাকে সাগিয়া নিয়ে এসেছে তার মতো সুন্দর আদমী তারা সারা জীবনে আদৌ আর দেখেছে কিনা মনে করতে পারে না। সাগিয়ার নতুন সৌভাগ্যে তাদের বুকের ভেতরটা হিংসের পুড়তে থাকে।

পঞ্ছী বলে, 'আদমীটা বহোত পাইসাবালা, না রে?'

মানুষটার পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে সাগিয়া বলে, 'জানি না।'

'ঝুট।'

'কা ঝুট?'

'আদমীটাকে টানতে টানতে নিয়ে এলি, আর বলছিস জানিস না! বাতা না, বাতা। আমরা কেউ ভাগ চাইব না, একগো পাইসা ভি নহী।'

সাগিয়া সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে, 'বিশোয়াস কর, আমি আদমীটাকে আগে দেখিনি। একই নাওয়ে নদী পেরুবার সময় দেখেছি।'

কিন্তু তার কথার একটি বর্ণও কেউ বিশ্বাস করে না। ঈর্ষায় জ্বলতে-জ্বলতে লছিমা বলে, 'তুই কি আর এই পচা নালিয়ায় পড়ে থাকবি? জরুর আদমীটা তোকে এখান থেকে নিয়ে পাকা কোঠিতে তুলবে, সোনাচাঁদিতে গা মুড়ে দেবে।'

সাগিয়া উত্তর দেয় না। হাজার বললেও এরা বুঝবে না। সে নিচু হয়ে লেপ্টানো পাঞ্জাবি এবং গেঞ্জি মানুষটার গা থেকে খুলে ফেলে।

ওধার থেকে শুগা আর বিলাখী কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চাপা গলায় লছিমা চেঁচিয়ে ওঠে,

'হো রামচন্দজি, এ কাকে নিয়ে এসেছিস—বামহন! এই নরকে বমহনকে নিয়ে এলি!' বলে মানুষটির খোলা গায়ে সাদা ধবধবে পৈতার মোটা গোছা দেখিয়ে দেয়।

সাগিয়া চমকে ওঠে। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে আজন্মের সংস্কার তাকে মারাত্মক পাপবোধে কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। অজান্তে সে কাকে রাণ্ডিটোলায় এনে তুলেছে।

ঘরের অন্য মেয়েগুলোও চুপ। সবারই ধারণা, এখানে একজন ব্রাহ্মণকে টেনে আনাটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

একসময় তোহরি নামের আওরতটা বলে, 'বামহন হলে কী আর করা! বেহুঁশ আদমীটাকে এখন তো আব বাইবে ফেলে দেওয়া যায় না। যা বারীষ, হুঁশ ফিরলে আর বারীষ থামলে রিকশা ডেকে তুলে দেওয়া যাবে।'

মোটামুটি তোহরির কথাটাই সবাই মেনে নেয়। এ-ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দুর্যোগের রাতে অভাবনীয় একটি মানুষ সম্পর্কে আরো কিছুক্ষণ আলোচনা করে দারুণ অস্বস্তি নিয়ে মেয়েমানুষগুলো চলে যায়। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে রাণ্ডিটোলার এ জঘন্য বেশ্যার বিছানায় আবিষ্কাব করে মানুষটির কী প্রতিক্রিয়া হবে, সেটা ভাবতেও কারোর সাহস হয় না।

সবাই যাবার পর ঘরের এক কোণে গিয়ে ভেজা শাড়িটাড়ি বদলে নেয় সাগিয়া। তারপর আরেকটা শুকনো কাপড় নিয়ে তক্তাপোষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ঘরের বায়ুস্তরে এবং প্রতিটি জিনিসে লক্ষ কোটি পাপের বীজাণু থিক থিক করছে। কিন্তু একবার যখন মানুষটিকে এখানে এনে তুলেছে তখন তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। শুকনো শাড়ি দিয়ে মানুষটির মাথা এবং গা মুছে দিয়ে, আরেকটা চাদব বার করে গলা পর্যন্ত ঢেকে দেয় সে।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি চলছে। ঝাঁঝরা টিনের চাল যেন চুরমার হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে ঝড়ের দাপটও বাড়ছে, মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ার আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। তা'ছাড়া বাজের গর্জন এবং মেঘের ডাক তো আছেই।

সেই দুপুরবেলা নেকীপুর থেকে চার মাইল হেঁটে পারঘাটায় এসেছিল সাগিয়া। তারপর মাঝ নদীতে নৌকোডুবির পর থেকে যা যা ঘটেছে তাতে ক্লান্তিতে শরীর একেবারে ভেঙেচুরে আসছে। কাঁধেব কাছ থেকে হাতদুটো আর কোমরের তলার দিকটা একেবারে খসে পড়বে যেন। সেই সঙ্গে ঘুমে চোখ জুড়ো আসছে, খিদেও পেয়েছে মারাত্মক। এখন চুলা জ্বেলে মাড়ভাত্তা বা দু-চাবখানা বাজবার রোটি যে বানিয়ে নেবে সেটুকু শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই। একটা কৌটোয় চারটি শুকনো চিড়ে আছে। তাই চিবিয়ে এক পেট জল খেয়ে শুয়ে পড়বে।

চিড়ে বার করতে যাবার আগে আস্তে আস্তে ডাকে সাগিয়া, 'শুনিয়ে-শুনিয়ে—'

নাঃ, মানুষটির জ্ঞান এখনও ফেরেনি। চোখ তাঁর আগের মতোই বোজা। কী ভেবে কপালে হাত রাখে সাগিয়া। বেশ গরম লাগছে। জ্বর আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

সাগিয়া আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। কোনোরকমে দুটি চিড়ে এবং জল খেয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়তে পড়তে অদ্ভুত একটা কথা মনে হয়। এই ঘরে কোনো পুরুষ ঢুকেছে আর তার সঙ্গে সে এক বিছানায় শোয়নি, এটা ভাবা যায় না। একজন সুপুরষ ব্রাহ্মণ তার নোংরা তক্তাপোষে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে এবং সে রয়েছে মেঝেতে, এমন অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম ঘটল। ভাবতে ভাবতে একসময় চোখ বুজে আসে তার।

হাঠৎ দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা পড়তে চোখ মেয়ে সাগিয়া। ঘুমন্ত গলায় বলে, 'কৌন?'

বাইরে দুর্যোগ চলছেই, টিনের চালে হাজারটা বুনো ঘোড়া দাপিয়ে বেড়াচ্ছে—এমনই বৃষ্টির তোড়।

ঝড়বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে জড়ানো মাতালের গলা ভেসে আসে, 'তোহরকা বাপ শালী রাণ্ডি। দরবাজা খোল—'

চেনা গলা, নাম তরজুলাল। লোকটা জনকপুবে টাঙা চালায়। খুব বদমেজাজী এবং খতরনাক।

রোজ একটা না একটা ঝামেলা পাকিয়েই যায়। সারাদিন দারু খেয়ে টং হয়ে থাকে। কথায় কথায় ছুরি চালিয়ে দেয়। এই সব কারণে বার কয়েক জেলও খেটেছে।

সাগিয়া চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'আজ চলা যাও—'

শরাবীর গলা কয়েক পর্দা উঁচুতে চড়ে, 'খোল বলছি রাণ্ডি, না হলে লাথ মেরে দরবাজা তুড়ে ঢুকব।'

একপলক ইতস্তত করে সাগিয়া। তক্তাপোষে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঘরে আদমী আছে। আজ যাও—'

কিছুক্ষণ বিপুল তোড়ে খিস্তি করে যায় তরজুলাল। তারপর বলে, 'এই বারীষে কুত্তা বিল্লি বেরুতে পারে না, আর তুই শালী পাসিঞ্জার ঢুকিয়ে ফেললি! ভুচ্চরকা ছৌরী।' এরপর নতুন উদ্যমে অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে সে চলে যায়।

আরো কিছুক্ষণ পর আবার দরজায় ধাক্কা। এবার এসেছে গাঁজা-ভাংয়ের দোকানের মালিক ভৈরোনাথ। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে কুকুর-বেড়াল বেরুতে না পারলেও রাণ্ডিটোলায় খদ্দেররা ঠিকই বেরিয়ে পড়ে। মানুষের চেয়ে নোংরা জানোয়ার পৃথিবীতে জন্মায়নি।

ভৈরোনাথকেও ভাগিয়ে দেয় সাগিয়া। এমন দুর্দান্ত দুর্যোগের রাতটা বিলকুল বিফলে যাবে, এটা ভাবতে পারেনি সে। তরজুলালের মতো ভৈরোনাথও অকথ্য খিস্তি দিতে দিতে চলে যায়।

তারপর কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল, সাগিয়ার খেয়াল নেই। আচমকা গোঙানির শব্দে যে ধড়মড় করে উঠে বসে। শোওয়ার আগে লণ্ঠনটা নিভু নিভু করে রেখেছিল, চাবি ঘুরিয়ে আলোর তেজ বাড়াতেই চোখে পড়ে তক্তাপোষে সেই মানুষটি ছটফট করছেন, আর মাঝে মাঝেই কাতর শব্দ করে উঠছেন।

দ্রুত উঠে গিয়ে তক্তাপোষের পাশে দাঁড়ায় সাগিয়া। অনেকটা ঝুঁকে ডাকতে থাকে, 'শুনিয়ে, শুনিয়ে--'

মানুষটি চোখ মেলে তাকান, কিন্তু উত্তর দেন না। ঘোর-লাগা লাল টকটকে চোখ তাঁর। বিড় বিড় করে কী বকে যান। তাঁর কপালে হাত দিয়ে চমকে ওঠে সাগিয়া। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু কী করবে, ভেবে পায় না সাগিয়া। শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে বাইরে এসে পাশের ঘরের তোহরির ঘুম ভাঙিয়ে মানুষটির নতুন উপসর্গের কথা জানায়। তারপর উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করে, 'অব্ কা করে?'

মাঝরাতে ঘুম ভাঙাবার জন্য প্রথমটা খেপে গিয়েছিল তোহরি। তারপর সবটা শুনে একটু নরম হয়ে বলে, 'তোর কাছে পাইসা আছে?' পরক্ষণে ফের কী ভেবে বলে, 'আছেই তো। নেকীপুরের লকড়িবালার কাছ থেকে বহোত কামাই করে এসেছিস।'

জগনাথের দেওয়া মজুরি থেকে বারোটা টাকা এর মধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। সাগিয়া ভেবেছিল কোনোরকমে হুঁশ ফিরলেই মানুষটিকে রিকশা ডেকে তুলে দেবে। কিন্তু এখন সে অথৈ দরিয়ায় গিয়ে পড়ল। প্রথমত, ক'দিনে জ্বর সারিয়ে মানুষটিকে চাঙ্গা করতে পারবে তার ঠিক নেই। দ্বিতীয়ত, এঁর জন্য হাতের পুঁজি কিছুই খুব সম্ভব আর থাকবে না। তা ছাড়া আর একটিমাত্র ঘর। একটা লোক তক্তাপোষ জুড়ে পড়ে থাকলে খদ্দের ঢোকানো যাবে না। মানুষটা যত দিন থাকবেন, তার কামাই বন্ধ।

সাগিয়ার মনোভাব খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিল তোহরি। সহানুভূতির গলায় এবার বলে, 'বৈদ ডাকতে হবে। নইলে জলদি জলদি বাম্হনকে সারিয়ে বাড়ি পাঠানো যাবে না।'

সাগিয়া তার একটা হাত ধরে বলে, 'চল, বৈদকে ডেকে আনি।'

তোহরি অবাক, 'এত্তে বারীষমে!'

'হাঁ। আদমীটার বহোত বুখার—'

তোহরি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। এই ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টিতে এবং এত রাত্তিরে বৈদ বা ডাক্তারকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বার করে আনা যাবে না।

পরদিন সকালে দুর্যোগ অনেকটা কেটে যায়। বৃষ্টি যদিও অল্প অল্প পড়ছে, আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাতলা, ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু মেঘ অবশ্য এখনও চোখে পড়ে।

কাল বাকি রাতটুকু আর ঘুমোয়নি সাগিয়া। কাছে বসে অসহায়ভাবে মানুষটির একটানা গোঙানি শুনে গেছে। রোগকাতর বেঁহুশ মানুষটিকে নিয়ে সে কী করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। তারপর দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই বৈদ সহায়জিকে ডেকে এসেছে।

পাওনলাল সহায় জাতে কায়াথ বা কায়স্থ হলেও রাণ্ডিটোলার বাসিন্দারা ডাকলে চলে আসে। এই কারণে জনকপুরের উঁচা জাতের লোকেরা রোগ-বীমার হলে তার কাছে যায় না, তাকে একরকম একঘরে অচ্ছুত করে রেখেছে। কিন্তু পাওনলাল প্রচণ্ড বেপরোয়া, দুর্জয় সাহস তার। সে বলে, বৈদের কাছে যে রোগীই আসুক, তার চিকিৎসা না করাটা পাপ। বেশ্যা আসুক, ধাঙড় আসুক, চামার আসুক, কাউকেই ফেরায় না পাওনলাল। ডোম-দোসাদ-মেথর, চোর-ডাকু, অসুস্থ হয়ে যে-ই ডাকুক সে ছুটে যায়। এতে কে কী ভাবল, কে কী বলল, গ্রাহ্যই করে না।

মাঝবয়সী পাওনলালের গায়ে শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস থাকে ধুসো আলপাকার কোট। পরনের ধুতিটা এতই খাটো যে হাঁটুর আধ হাতের বেশি নামেনি। কাঁচাপাকা চুল চামড়া ঘেঁসে ছাঁটা, পায়ে কাঁচা চামড়ার ভারী জুতো। কোটের বুক পকেটে কালো কারে বাঁধা পুরনো আমলের গোল ঘড়ি। দাড়ি কামানোর সময়-টময় বিশেষ পায় না। তাই গালে আট-দশ দিনের খামচা খামচা দাড়ি প্রায়ই জমে থাকে। কোথাও বেরুলে তার হাতে একটা ঢাউস টিনের বাক্স ঝোলে। পাওনলালের চিকিৎসার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই। কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথি—তিন রকম নিয়মই দরকার মতো কাজে লাগায়, তার বাক্সে কবিরাজি বড়ি যেমন আছে, হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের কাঁড়ি কাঁড়ি শিশি এবং অ্যালোপ্যাথিক ট্যাবলেট আর ইনজেকশনের সরঞ্জামও তেমনি রয়েছে। রোগ সারানোটাই আসল কথা, কোন নিয়মে, কী পদ্ধতিতে সারানো হল, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর আদৌ দরকার নেই।

সাগিয়ার ঘরে ঢুকে তক্তাপোষে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে পাওনলাল বৈদ। বলে, 'সর্বনাশ, এ কাকে এনে তুলেছিস?'

পাওনলাল আসার খবরটা এখানকার ছোট্ট রাণ্ডিটোলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সবাই এসে সাগিয়ার ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ায়।

সাগিয়া ভয়ে-ভয়ে শুধোয়, 'কাকে এনেছি!'

পাওনলাল বলে, 'ইনি শাস্ত্রীজি—রামসীতা মন্দিরের বড়ো পুরোহিত শিউশঙ্কর শাস্ত্রী।' তারপর একটানা যা বলে যায় তা এইরকম, শিউশঙ্করের মতো আজীবন ব্রহ্মচারী, এমন সৎ, পবিত্র এবং শাস্ত্রজ্ঞ ভূভারতে আর একজনকেও পাওয়া যাবে না। জনকপুরে, শুধু জনকপুরে কেন, আশেপাশে একশো মাইলের মধ্যে তাঁর মতো শ্রদ্ধেয়, তাঁর মতো সম্মানিত মানুষ দ্বিতীয় কেউ নেই। শাস্ত্রীজীর পা থেকে মাথায় চুল পর্যন্ত সব কিছু শুদ্ধ। এমন একটি মানুষকে এই নরকে টেনে এনে তাঁর মারাত্মক ক্ষতি করা হয়েছে। খবরটা জানাজানি হলে শিউশঙ্করের সুনাম এবং মর্যাদা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। তা'ছাড়া জনকপুরের মানুষ সাগিয়াদের ছেড়ে দেবে না। রামসীতা মন্দিরের মাননীয় পুরোহিতকে রাণ্ডিটোলায় টেনে এনে ভ্রষ্টাচারের পথে ঠেলে দেবার কারণে তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে।

সাগিয়ারা শিউশঙ্করকে আগে না দেখলেও তাঁর নাম প্রচুর শুনেছে। জনকপুরের হাওয়ায় ভেসে ভেসে তাঁর মহত্ত্ব এবং ব্রহ্মচর্যের নানা খবর এই নরক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

সাগিয়া শিউরে ওঠে। দরজার বাইরে অন্য মেয়েমানুষগুলো ভয়ে কাঁপতে থাকে।

সবার প্রতিনিধি হিসেবেই যে হাতজোড় করে করুণ মুখে সাগিয়া বলে, 'হামনিকা কোই কসুর নহী পাওনজি— ' তারপর কীভবে, কোন অবস্থায় নিতান্ত নিরুপায় হয়েই নৌহর নদী থেকে শিউশঙ্করকে তুলে এনেছে, সব কিছু কাঁপা ভয়ার্ত গলায় বলে যায়।

কঠোর মুখ করে তাকিয়ে ছিল পাওনলাল। সব শোনাব পর তাঁর কাঠিন্য অনেকটা কেটে যায়। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ, ঐ অবস্থায় ফেলে আসা যায় না। পরে শাস্ত্রীজিকে এর প্রায়শ্চিৎ

করে নিতে হবে।' বলতে বলতে শিউশঙ্কর কপালে একটা হাত দিয়েই সরিয়ে নেয়। টিনের বাক্স থেকে থার্মোমিটার, স্টেথোস্কাপ ইত্যাদি বার করে প্রথমে জ্বরটা দেখে দেয়, তারপর স্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষা করে বলে, 'জ্বর তো অনেক। সুই (ইনজেকশন) দিতে হবে' বলে, তক্ষুনি সিরিঞ্জ এবং ওষুধের অ্যাম্পুল বার করে শিউশঙ্করের ডান হাতে ইনজেকশন দেয়। তারপর এক গাদা বড়ি দিয়ে বলে, 'হুঁশ ফিরলে সকালে, দুপুরে আর সন্ধ্যায় তিন বার দুটো করে খাওয়াবি।'

'জি'—ঘাড় হেলিয়ে দেয় সাগিয়া।

'দুপুরের মধ্যেই হুঁশ ফিরে আসবে। তখন গরম দুধ খাইয়ে দিস। রাতে এসে আমি আরেকটা সুই দিয়ে যাব।'

'লেকেন পাওনজি—'

'কী?'

'শাস্ত্রীজিকে কি আমার খাওয়ানো ঠিক হবে।'

পাওনলাল বুঝতে পারে, নিজের ছোঁয়া দুধ খাওয়াতে চাইছে না সাগিয়া। বলে, দুঃসময়ে উপায় না থাকলে খাওয়াতে দোষ নেই। তবে দুধ ছাড়া অন্য কিছু, যেমন ভাত, রোটি একেবারেই যেন দেওয়া না হয়। এমনিতেই পূর্বজন্মের কোনো পাপের কারণে এই নরকে আসতে হয়েছে শিউশঙ্করকে। ছোঁয়া অন্ন তাঁর পবিত্র শরীরে ঢুকলে মৃত্যুর পর তাঁর যে নরকবাস হবে তা অনন্ত। সে-পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই।

সাগিয়া আঁৎকে উঠে বলে, 'নহী নহী, মরে গেলেও ভাত খাওয়াব না।'

'আর একটু সুস্থ হলেই শাস্ত্রীজিকে পাঠিয়ে দিবি। দেখিস কেউ যেন এখান থেকে তাঁকে বেরুতে না দ্যাখে।'

'হাঁ।'

'এবার দশটা টাকা দে। আমার ফী, রিকশাভাড়া, দাওয়া আর সুঁই-এর দাম।'

পাওনলাল লোকটা যেমন হিসেবী তেমনি হুঁশিয়ার। নিজের পাওনাকড়ি বুঝে নিয়ে সে চলে যায়।

তারপর রাণ্ডিটোলার বাসিন্দাদের মধ্যে একটা গোপন পরামর্শ-সভা বসে। প্রথমে তারা এটুকুই জেনেছিল, বেহুঁশ মানুষটা ব্রাহ্মণ। তাতেই তাদের আজন্মের সংস্কার ধাক্কা লাগে। কিন্তু পাওনলালের কাছে যখন জানতে পারল মানুষটি শিউশঙ্কর শাস্ত্রী—তখন থেকেই উৎকণ্ঠা, শঙ্কা এবং চাঞ্চল্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। পাওনলালেব কথামতো তারা ঠিক করে ফেলে, শাস্ত্রীজি যখন এখানে এসেই পড়েছেন, তাঁর মর্যাদা এবং সম্মান যাতে এতটুকু নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখবে। সন্ধে নামতে না নামতেই এখানে চোর বজ্জাত শরাবী ইত্যাদি ইত্যাদি যত হারামজাদের ছৌয়ারা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে থাকে। যে-ক'দিন শাস্ত্রীজি থাকবেন, তাদের কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাইরের লোক এখানে আসা মানেই শাস্ত্রীজির খবরটা চারিদিকে চাউর হয়ে যাবে। তাঁর মুখে চুনকালি লাগে, এমন কাজ তারা হতে দেবে না।

দুপুরবেলা মেঘ কেটে টলটলে সোনালী রোদ বেরিয়ে পড়ে। ঝির ঝির করে হাওয়া বইতে থাকে। আজ আকাশের দিকে তাকালে কে বলবে, কাল ঐ রকম একটা মারাত্মক দুর্যোগ এই অঞ্চলটার ঘাড় মুচড়ে সব কিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে।

তোহরি আর লছিমার দুটো বড় বোতলে গঙ্গাজল ছিল। কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে তাতে গঙ্গাপানি মিশিয়ে মেয়েমানুষগুলো প্রথমে পুরো রাণ্ডিটোলাটা ধুয়ে ফেলে।

শুধু তাই না, কয়েক মাস আগে দুটো স্টীলের ঢাক্‌নাওলা বড়ো বাটি কিনেছিল সাগিয়া। সে দুটো আনকোরা নতুন রয়ে গেছে। বাক্স থেকে একটা বাটি বার করে কাছাকাছি এক খাটাল থেকে টাটকা দুধ এনে জ্বাল দিয়ে রাখে। শাস্ত্রীজীর হুঁশ ফিরলে খাওয়াতে হবে।

পাওনলাল বৈদ যা বলেছিস, অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। দুপুরের কিছুক্ষণ বাদে জ্ঞান ফিরে আসে শিউশঙ্করের। লালর টক্‌টকে চোখ মেলে সাগিয়ার দিকে তাকান। ঘোরলাগা জড়ানো গলায় বলেন, 'তুমি কে?'

বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে সাগিয়ার। আবছা গলায় বলে, 'আমাকে চিনবেন না।'
আর কোনো প্রশ্ন করেন না শিউশঙ্কর। আস্তে আস্তে আবার তাঁর চোখ বুজে আসে।
ফিসফিস করে সাগিয়া ডাকে, 'শুনিয়ে, দুধ পী—' এই পর্যন্ত বলে থেমে যায়।
শিউশঙ্কর সাড়া দেন না, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। সেই ঘুম সহজে ভাঙতে চায় না।

একসময় বিকেল পেরিয়ে সন্ধে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শরাবী জানোয়ারেরা ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে থাকে। তোহরি, লছিমা, শুগা এবং আরো কয়েকটি মেয়েমানুষ তাদের ভাগিয়ে দেয়। ফুর্তি করতে যারা এসেছিল, আশাভঙ্গের কারণে খিস্তি করতে করতে তারা চলে যায়।

একজন বলে, 'কা রে, সতী পার্বতী বন গয়ী? শালী রাণ্ডি—'

আরেকজন বলে, 'বেওসা বন্ধ্ কর দিয়া? ইধরি মন্দির বনেগা—কা?'

যাদের উদ্দেশ্যে বলা, তারা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে না।

রাতে পাওনলাল আবার আসে। রোগী সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আরেকটা ইনজেকশন দিয়ে চলে যাবার কিছুক্ষণ বাদে জ্বরটা অনেক নেমে যায় শিউশঙ্করের, বিকেলের সেই ঘুমটাও ভাঙে। তার চোখে সেই ঘোর ঘোর ভাব অতটা আর নেই। তিনি দেখতে পান তক্তাপোষের পাশে নিচের ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকজন মেয়েমানুষ বসে আছে। তাদের চোখেমুখে ভয়, উদ্বেগ এবং গভীর দুর্ভাবনার ছাপ। তিনি জানেন না, এই মেয়েমানুষেরা আজ প্রায় সারা দিনই এখানে পালা করে বসে আছে। মাঝে মাঝে দু-একজন উঠে গিয়ে কোনোরকমে দুটো চালডাল ফুটিয়ে, খানকতক রোটি সেঁকে নাকেমুখে গুঁজে এসেছে। আর শরাবীরা যখন সদর দরজা ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছিল তখন শুধু বার কয়েক উঠে গিয়ে ভাগিয়ে এসেছে।

শিউশঙ্কর অবাক নির্জীব চোখে প্রতিটি মেয়েকে দেখতে দেখতে বলেন, 'তোমরা কারা?'

সাগিয়াই উত্তর দেয়, 'আমরা কেউ না দেওতা।'

'আমি এ ঘরে এলাম কী করে? এখানকার কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

সাগিয়া বলে, 'ঝড়তুফানে কাল তৌহর্র নদীতে নৌকাডুবি হয়েছিল—মনে আছে?'

আস্তে মাথা হেলান শিউশঙ্কর, 'হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?'

'আমি সেই নৌকায় ছিলাম।'

'আমি খেয়াল করিনি।'

সাগিয়া এবার বলে তুফানে নৌকো উল্টে যাবার পর সে কীভাবে শিউশঙ্করকে এখানে নিয়ে এসেছে।

কৃতজ্ঞ চোখে সাগিয়ার দিকে তাকান শিউশঙ্কর। '—তুমিই তাহলে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। ভগোয়ান রামচন্দ্রজি তোমার কল্যাণ করবেন।'

সাগিয়া এবার ভয়ে ভয়ে জানায়, বৈদজিকে ডেকে শিউশঙ্করকে দেখানো হয়েছে। তাঁকে দু-দু'বার সুই দেওয়া হয়েছে। বৈদ প্রচুর দাওয়া দিয়ে গেছে, এবং বলেছে রোগীর হুঁশ ফিরলে যেন দুধ খাওয়ানো হয়। নইলে শরীরে তাগদ আসবে না। তিনি কি এখন দুধ খাবেন?

মাথা নাড়েন শিউশঙ্কর, অর্থাৎ খাবেন।

সাগিয়া ভয়ে ভয়ে বলে, 'লেকেন—'

'কী?'

'আমি—আমাদের ছোঁয়া কি খাবেন?'

মৃদু হাসেন শিউশঙ্কর, 'খাব না কেন? নিয়ে এস। ভুখ লাগছে।'

'আমরা—আমরা নরকের পোকা দেওতা। আর এটা দুনিয়ার সব চেয়ে নোংরা জায়গা।' বলতে বলতে সাগিয়ার ঠোঁট কাঁপতে থাকে।

এতক্ষণে শিউশঙ্কর বুঝে ফেলেছেন, তাঁকে কোথায় এনে তোলা হয়েছে। প্রথমটা শিউরে ওঠেন তিনি। আবহমান কালের সংস্কারে তাঁর চোখমুখ এবং শরীরের মাংসপেশী কুঁকড়ে যেতে থাকে। অসহ্য কষ্টে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

শিউশঙ্করের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মারাত্মক ভয় পেয়ে যায় ঘরের সব ক'টি মেয়েমানুষ। রুদ্ধশ্বাসে তারা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যান শিউশঙ্কর। স্নিগ্ধ হেসে বলেন, 'তুমি আমার জীবন দিয়েছো। দুধ নিয়ে এসে।'

সাগিয়া এবং অন্য মেয়েমানুষগুলোর রক্তের ভেতর দিয়ে বিজরী চমকে যায়। সাগিয়া দৌড়ে দুধের বাটিটা নিয়ে এসে আস্তে আস্তে তাঁর মুখে ঢেলে দিতে থাকে। অন্য মেয়েগুলো হাতজোড়া করে বসে থাকে।

দুধ খাওয়ার পর ওষুধ খেয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েন শিউশঙ্কর।

পরদিন সকালে অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন শিউশঙ্কর। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে সাগিযাকে বলেন, 'একটা রিক্‌শা ডেকে দাও, এবার আমি যাব।'

সাগিয়া আঁতকে ওঠে, 'লেকেন—'

'কী হলো?'

'এই দিনের বেলা আপনাকে এই নরক থেকে বেরুতে দেখলে জনকপুরের আদমীরা কী বলবে!'

'কে কী বলল, কে কী ভাবল, এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। তোমরা, বিশেষ করে তুমি আমার প্রাণ দিযেছ, এটা মৃত্যু পর্যন্ত মনে থাকবে।'

সাগিয়া বলল, 'কিরপা করে এই নরকের কথা মনে রাখবেন না।'

কিছুক্ষণ পব বাণ্ডিটোলার বাইরের রাস্তায় একটা সাইকেল রিক্‌শায় গিয়ে ওঠেন শিউশঙ্কর। সাগিয়া এবং অন্য মেয়েমানুষগুলো হাতজোড় করে দাঁড়িযে থাকে।

একটু পবে রিক্‌শা চলতে শুরু করে।

মেয়েমানুষগুলো ভাবে, একটি দিনের জন্য এখানে স্বর্গের পবিত্রতা নেমে এসেছিল। এরপর আহ্নিক এবং বার্ষিকগতির নিয়মে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আসবে—যাবে, কিন্তু এই দিনটি আর কখনও ফিরে আসবে না। হয়তো গুছিয়ে এইভাবে তারা ভাবতে পারছে না, তবে ভাবনাটা মোটামুটি এই রকমই।

আর চলতে চলতে সাগিয়ার মুখটাই শুধু মনে পড়ছে শিউশঙ্করের। সে বার বার নরকের কথা বলছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে স্বর্গ এবং নরকের মাঝখানের সীমারেখাটা যেন ধরতে পারছিলেন না শিউশঙ্কর।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ছদ্মবেশিনী

খানিকটা আগে এক পশলা জোর বৃষ্টি এসে পথ-ঘাট খালি করে দিয়ে গেছে। রাত প্রায় সওয়া দশটা। রাস্তায় গাড়ি খুব কম। কাছাকাছি কোথাও ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে না। চেম্বার থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ডাক্তার দত্ত চলে এলেন চৌরঙ্গীতে।

দুটো একটা ট্যাক্সি আসছে, কিন্তু হাত তুললেও থামছে না। আবার বৃষ্টি আসতে পারে। ডাক্তার দত্ত ভুরু কুঁচকোলেন। তাঁর গাড়িটার এঞ্জিন বোর করার জন্য দেওয়া হয়েছে, এক মাসের আগে পাওয়া যাবে না। এই একটা মাস খুব দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কলকাতা শহরে ট্যাক্সির ওপরে নির্ভর করা যায় না।

একটা বাসে উঠতে পারলেও হত। বাসেরও দেখা নেই। ট্যাক্সি না পেলে বাসেই উঠবেন ঠিক করে তিনি রাস্তাটা পেরিয়ে দাঁড়ালেন ময়দানের দিকে। তাঁকে যেতে হবে উত্তরে।

কাছেই ময়দানের অন্ধকারে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। তার পরনে একটা লাল শাড়ি তাই এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায় তাকে। কিন্তু ডাক্তার দত্ত তাকে দেখতে পেলেন না। যদিও তিনি অস্থির ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন।

মেয়েটি তখন এগিয়ে এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। ডাক্তার এবার লক্ষ্য করলেন তাকে। ভাবলেন, মেয়েটিও বোধহয় বাসে উঠবে।

কিন্তু বাস আসছে না। আবার বৃষ্টি নামল ছিরছির করে। মহাজ্বালাতন তো! ডাক্তারের সঙ্গে ছাতা নেই। তিনি দেখলেন, মেয়েটিও ভিজছে। মেয়েটির সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। সে সোজা তাকিয়ে আছে ডাক্তারের মুখের দিকে। সে মিটিমিটি হাসছে।

একটা ট্যাক্সি উল্টো দিকে আসতে আসতে গতি মন্দ করল। ডাক্তার সাগ্রহে এগিয়ে যেতেই ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, কোনদিকে?

ডাক্তার বললেন, আমহার্স্ট স্ট্রিট।

ড্রাইভার আর উচ্চবাচ্য না করে হুস্ করে জোরে বেরিয়ে গেল। ডাক্তার এত রেগে গেলেন যে সম্ভব হলে তিনি ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজাটা খুলে ফেলতেন। কিন্তু সম্ভব হল না। তাকে পিছিয়ে এসে আবার বাস-স্টপেই দাঁড়াতে হল। সেই সময় মেয়েটি খুব আলতো গলায় জিজ্ঞেস করল, যাবেন?

ডাক্তার শুনলেন যে মেয়েটি যেন তাঁকে জিজ্ঞেস করছে, আপনি কোথায় যাবেন?

তিনি বললেন, আমি যাব আমহার্স্ট স্ট্রিট আর বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে।

আপনি কোথায় যাবেন?

মেয়েটি মুচকি হেসে বলল, আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন।

ডাক্তার বিস্মিত হয়ে মেয়েটিকে দেখলেন ভাল করে। তার খোঁপায় ফুল গোঁজা। পায়ে সবুজ রঙের প্লাস্টিকের চটি। এই চটিটাতেই মেয়েটির জাত চিনিয়ে দেয়। কিন্তু ডাক্তার সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, অনেকদিন তিনি এরকমভাবে একা বেশি রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন নি। ঠিক ব্যাপারটা তিনি তখনো বুঝলেন না। তিনি ভাবলেন, ওর মাথায় কিছু গোলমাল আছে।

আপনি ছেড়ে তুমিতে নেমে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখানে একলা কী করছ?

মেয়েটি বলল, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

—এত রাত্রে? কেন?

মেয়েটি একবার ইচ্ছে করে বুকের আঁচলটা ফেলে দিয়ে আবার সেটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর বলল, রোজই তো দাঁড়িয়ে থাকি। যাবেন তো চলুন। ঘর না থাকে, আমার চেনা ঘর আছে।

এবার আর ডাক্তারের বুঝতে কোন অসুবিধে হল না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মতন একজন ব্যস্ত সম্মানিত লোককেও রাস্তায় মেয়েরা এরকম কুপ্রস্তাব দিতে পারে? ডাক্তারের বয়েস পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে যুবকের মতন দেখায়। যদিও সব সময় তিনি মুখে একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকেন। ব্যস্ত ডাক্তারদের যেমন থাকতে হয়।

তিনি কড়া গলায় বললেন, তোমাকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে শব্দ করে হাসল। সে ডাক্তারের ব্যক্তিত্বকে কোন গুরুত্বই দিচ্ছে না।

—তোমাকে আমি কোথাও দেখেছি আগে?

—দেখতে পারেন! আমি তো রোজ এখানেই দাঁড়াই।

—কিন্তু আমি তো এখানে আগে কোনদিন দাঁড়াই নি।

—তাহলে কে জানে।

ডাক্তার হঠাৎ একটু শিউরে উঠলেন। এবার মনে পড়েছে। মাস ছয়েক আগে তাঁর চেম্বারে এইরকম সময়ই একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে বলেছিল, ডাক্তারবাবু, শিগগির একবার চলুন।

সেটা ছিল গায়ে আগুন লাগার কেস। অফিস পাড়ার মধ্যেই একটা ফ্ল্যাটে রাত্তিরবেলা একটা মেয়ে নিজেই আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল নিজের শাড়িতে। চিকিৎসার বিশেষ কিছু ছিল না, পাঠাতে হয়েছিল হাসপাতালে। সে মেয়েটি বাঁচেনি। সেই মেয়েটির মুখখানা ছিল যেন ঠিক এই মেয়েটির মতন।

ডাক্তারের পক্ষে মৃত রোগীদের মুখ মনে করে রাখলে চলে না। কিন্তু ডাক্তারের মনে আছে ওই মেয়েটির একটা কথা। মেয়েটি যন্ত্রণায় দারুণভাবে ছটফট করছিল। তাকে একটা সিডেটিভ দেবার আগে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি এরকম করলেন কেন? শাড়িতে আগুন লাগিয়ে...

মেয়েটি মুখ বিকৃত করে বলেছিল, ঘেন্না ধরে গেছে। পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

মৃত্যুপথযাত্রিণী সেই মেয়েটির মুখে ফুটে উঠেছিল তীব্র ঘৃণা। সেই কথাটাই ভোলা যায়নি।

সেই মেয়েটিই যেন ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিশোধ নিতে। ডাক্তারের মনে হল, স্বয়ং মৃত্যুই যেন লাল রঙের ওপর শাড়ি পরে দাঁড়িয়েছে রাস্তার ওপরে।

মেয়েটি বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, যাবে কিনা বল।

ডাক্তার খপ করে মেয়েটির একটা হাত চেপে ধরে বললেন, চল!

মেয়েটি বলল, কতক্ষণ? একঘণ্টা?

ডাক্তার বললেন, ওসব জানি না, চল আমার সঙ্গে!

—অত জোরে হাত ধরেছেন কেন? যাচ্ছিই তো। কতদূরে যেতে হবে? সেই আমহার্স্ট স্ট্রিট পর্যন্ত যেতে পারব না!

ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না, হাতও ছাড়লেন না মেয়েটির। আবার রাস্তা পেরিয়ে হনহন করে হাঁটতে লাগলেন নিজের চেম্বারের দিকে।

যে দু-একটা লোক চলছিল পথ দিয়ে, তারা অবাক হয়ে তাকাল।

ডাক্তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

চেম্বারে তাঁর সহকারী এবং কম্পাউণ্ডার আগেই বাড়ি চলে গেছে। রয়েছে শুধু দারোয়ান, সে রুটি পাকাতে বসেছিল।

হঠাৎ ডাক্তারকে একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে টানতে ফিরে আসতে দেখে সে বিস্মিত এবং তটস্থ হয়ে উঠল।

ডাক্তার বললেন, দরজার তালা খুলে দে।

ভেতরে এসে সব ক'টা আলো জ্বেলে তিনি পেসেন্টের-চেয়ারের দিকে আঙুল দেখিয়ে হুকুমের সুরে মেয়েটিকে বললেন, বসো।

মেয়েটি আলগা ভাবে বসে কনুইতে থুতনি ভর দিল।

আলোতে তিনি মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন ভাল করে। বছর তিরিশেক বয়েস মেয়েটির, রোগা, মুখে সস্তা পাউডার। চোখের নীচে রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির কালি।

তিনি আবার হুকুম করলেন, উঠে দাঁড়াও।

বিনা প্রতিবাদে সে উঠে দাঁড়াল। তিনি আঙুল দিয়ে তার থুতনি উঁচু করে দেখলেন গলা। দেখলেন হাত দুটো। তারপর মেয়েটিকে ঘুরিয়ে দিলেন। দেখলে লাগলেন পেছন দিকটা।

মেয়েটির পিঠে, কোমর আর ব্লাউজের মাঝখানটায় একটা ক্ষত। বেশ পুরনো। তিনি আঙুল দিয়ে তার ব্লাউজটা একটু উঁচু করে তুলে দেখলেন, ওরকম ক্ষত আরেকটা রয়েছে!

—কতদিন এ লাইনে এসেছ?

—এই তো সেদিন। একমাসও হয় নি। আমি এ লাইনে নতুন।

—মিথ্যে কথা বলো না।

—মাইরি বলছি, রাস্তায় দাঁড়িয়েছি বলে খাস্তা মাল নই।

—চুপ করো! পিঠের ঐ ঘাগুলো কতদিনের?

—ওগুলো ঘা নয়। দেয়ালে পিঠ ছড়ে গিয়েছিল। এক মুখপোড়া নিয়ে গিয়েছিল এক ভাঙা বাড়িতে।

—কতদিন ধরে ওরকম হয়ে আছে?

—কে জানে। না, না, এই দুতিন দিন।

—ফের বাজে কথা! কতজন পুরুষের সর্বনাশ করেছ এর মধ্যে?

—আ মরণ! সব সর্বনাশ তো আমারই! যাক এত কথা দিয়ে কী হবে? শুধু শুধু রাত হয়ে যাচ্ছে।

রুগীদের পরীক্ষা করার জন্য যে উঁচু বেঞ্চের ওপর বিছানা পাতা আছে, সেটা দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, ওখানে শুয়ে পড়।

মেয়েটি ছোট্ট একটা হাই তুলল। তারপর হাসল চওড়া ভাবে। বুকের আঁচল ফেলে দিয়ে সে ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগল।

ডাক্তার বললেন, জামা খুলতে হবে না। যেমন আছ, তেমনি শুয়ে পড়।

মেয়েটির আঙুল থেমে গেল ব্লাউজের বোতামে। তারপরই ঝট করে খুলে ফেলল শাড়িটা। তার শায়াটার রং ক্যাটকেঁটে সবুজ।

—এ কী করলে?

—বাঃ, শাড়ি খুলে রাখব না? ভাঁজ নষ্ট হয়ে যাবে।

ডাক্তারও হেসে ফেললেন এবার। গলার আওয়াজ নরম করে বললেন, আমি তোমায় পরীক্ষা করে দেখব। তোমার শরীরে অসুখ আছে। চিকিৎসার দরকার।

তিনি শাড়িটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন মেয়েটির গায়ে। মেয়েটি উঠে বসে বলল, আমার চিকিৎসার দরকার নেই। এত রাতে উনি আমার চিকিৎসা করতে এলেন! ভারী আমার ইয়ে!

—আমি ডাক্তার, রুগী দেখলে আমি চিকিৎসা না করে পারি না।

—কে বলেছে আমি রুগী? বাজে কথা বলবে না। বেশি ডাক্তারী ফলাতে এসেছে! তোমার মতন কত রকম ডাক্তার আমি পার করে দিয়েছি। আর ফষ্টি করতে হবে না, এবার আলো নিভিয়ে দাও।

—আমি সে জন্য তোমাকে এখানে ধরে আনি নি। তুমি রোজ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকো...তুমি...মানে, তুমি রোজ ক'জন পুরুষ মানুষের সঙ্গে...

—তা জেনে তোমার লাভ? ওসব কথা বলে কি রাত কাবার করবে নাকি?

জিজ্ঞেস করছি, কারণ আমার দরকার আছে।

দু'জন তিনজন....কোনদিন একজনও যেমন জোটে না। আজ যেমন তুমিই প্রথম।

ডাক্তার মনে মনে আবার শিউরে উঠলেন। মেয়েটির খুব সম্ভব সিফিলিস আছে। প্রতিদিন দু'তিনজন পুরুষের মধ্যে সেই রোগের বীজাণু ছড়িয়ে চলেছে। এই কি প্রতিশোধ? সেই আগুনে-পোড়া মেয়েটি যেমন তীব্র ঘৃণা দেখিয়েছিল পুরুষ জাতের ওপরে। যেন সেই মেয়েটির আত্মা এসে প্রতিশোধ নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি আবার বললেন—শোন, তুমি যে এই রোগ অন্যদের মধ্যে ছড়াচ্ছ তাই নয়, তোমার নিজেরও সাঙ্ঘাতিক বিপদ হবে, শরীরটা পচে যাবে—

এই কথাটা শুনেও হাসতে লাগল মেয়েটি। যেন একটা চমৎকার ঠাট্টা। সে ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। তারপর শাড়িটা সরিয়ে ফেলে নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—আমায় দেখতে খারাপ? তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ডাক্তারের মুখটা ধরে ফেলে বলল—এসো না, বাবা! দেরি করছ কেন?

ডাক্তার চমকে পিছু হটে ছাড়িয়ে নিলেন নিজেকে। তাঁর মায়া হল। মেয়েটি বড় সরল। ও জানে না, মৃত্যু কত ভয়াবহ। ওকে অন্তত আর একবার বাঁচবার সুযোগ দিতে হবে।

তিনি বললেন—শুয়ে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি।

চেম্বারের পাশেই আর একটি ঘরে ডাক্তারের নিজস্ব প্যাথোলজিক্যাল ইউনিট। সেখান থেকে তিনি সিরিঞ্জ আর টেস্টটিউব নিয়ে এলেন।

মেয়েটি শুয়ে শুয়েই দেয়ালে ঝোলানো একটা ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখছিল পাতা উল্টে উল্টে। জার্মানির রাইন নদীর পাড়ের দৃশ্য। কালো অরণ্য। নীল রঙের তুষারের ওপর হলুদ স্কার্ট পরা এক দেবদূতীব মতন তরুণী।

ডাক্তার বললেন—দেখি, তোমার হাতটা।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিল।

—তোমার রক্ত নেবো একটু। ভয় পেয়ো না!

মেয়েটি কোন আপত্তি করল না এবার। চুপ করে রইল।

ডাক্তার স্পিরিট ভেজানো তুলো দিয়ে হাত ঘষলেন মেয়েটির। তুলোটা ময়লা হয়ে গেল। মেয়েটি নিয়মিত সাবান মাখে না। যেখানে সেখানে শোয়। তার হাতে তো ময়লা থাকবেই।

তাবপর তিনি শিরাটা খুঁজে নিয়ে সিরিঞ্জের সূঁচটা ঢুকিয়ে দিলেন। মেয়েটি কোন ব্যথার শব্দ উচ্চারণ করল না। ববং সে পাশ ফিরে ডাক্তারের চুলের মধ্যে অন্য হাতটা ডুবিয়ে দিয়ে বলল এত বড় বড় চুল, তুমি অনেকদিন চুল কাটো নি বুঝি?

ডাক্তার একটু হকচকিয়ে গেলেন। এরকম কথা তাঁকে কেউ বলে না কক্ষনো। তাঁর স্ত্রীও ডাক্তার, দু'জনেই সর্বক্ষণ ব্যস্ত। পয়সা রোজগারের মহোৎসবে দু'জনে মেয়ে আছেন, কথা বলারও সময় নেই।

ডাক্তার বললেন—হাত সরাও।

মেয়েটি তবু হাত সরাল না। খুক্‌খুক্ করে হাসতে লাগল।

সিরিঞ্জটায় রক্ত ভরে ডাক্তার সরে এলেন। চলে গেলেন পাশের ঘরে। একটা স্লাইডে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে সলিউশান মিশিয়ে সেটা ধরলেন মাইক্রোসকোপের নীচে। তাঁর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

পরে ভাল করে ডব্লু আর দেখতে হবে। কিন্তু এখনই তিনি নিঃসন্দেহ হয়ে গেছেন যে মেয়েটির সিফিলিস আছে।

চেম্বারে ফিরে এসে তিনি বললেন দিনে দুবার পাঁচ লাখ করে অন্তত দশ দিন পেনিসিলিন ইঞ্জেকশান নিতে হবে তোমাকে। সকালে, বিকেলে। ইচ্ছে করলে আমার এখানে এসে ইঞ্জেকশান নিয়ে যেতে পার। আমার কম্পাউণ্ডারকে বলে দেব।

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে শুনল। কোন উত্তর দিল না।

—এবারে উঠে পড়ো, আর শুয়ে থাকার দরকার নেই।

—হয়ে গেল?

মেয়েটি উঠে পা ঝুলিয়ে বসল। খোলা শাড়িটা সরিয়ে রাখল পাশে। অকারণেই একবার শায়ার দড়িটা খুলে আবার বাঁধল। ব্লাউজের একটা বোতাম খোলা ছিল, টিপে দিল সেটা। দু'হাত তুলে চুল ঠিক করল। তারপর মুচকি হেসে নেমে দাঁড়াল মাটিতে। শাড়িটা পরতে লাগল এবার।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় থাকো তুমি?

—বেলেঘাটায়।

—এত রাত্রে সেখানে ফিরতে পারবে?

—কেন পারব না? রোজই তো ফিরি। আমার তো গাড়ি ঘোড়া লাগে না, আমি হেঁটে যাই। দাও।

—কী দেব?

—বাঃ, আমার টাকা দেবে না?

ডাক্তার আপাদমস্তক চমকে উঠলেন। এ মেয়েটা টাকা চাইছে? তাঁর কাছে কেউ কখনো টাকা চায় না। সবাই দেয়। এ মেয়েটা অকৃতজ্ঞ এমন? তিনি বিনা পয়সার ওপর পরীক্ষা করলেন। অন্য রুগী হলে, অন্তত পঞ্চাশ টাকা চার্জ করতেন।

তিনি বললেন—কিসের টাকা?

—বাঃ, আমার টাকা দেবে না? আমার সময়ের দাম নেই?

ডাক্তার চটে গেলেন এবার। একটা সামান্য রাস্তার মেয়ে, সে বলে কিনা তার সময়ের দাম! সে জানে না, কত বড় ডাক্তারের সঙ্গে সে কথা বলছে। সন্ধ্যেবেলা লাইন দিয়ে রুগীরা বসে থাকে। এক একদিন রুগীরা ফিরেও যায়। তাঁকে এই মেয়েটা বলে কিনা সময়ের দাম!

—যাও, বাইরে যাও। আমি দরজা বন্ধ করব।

—আ-হা-হা, যাও মানে? আগে আমার টাকা দাও। এতক্ষণ ফুর্তি করলে!

—ফুর্তি?

—আলবৎ! কেউ শুয়ে শুয়ে ফূর্তি করে, কারুর শুধু জড়াজড়ি আর চুমু খেয়েই ফুর্তি পুরো হয়ে যায়। তোমার ফুর্তি দেখাদেখিতে। তুমি ছুতো করে এতক্ষণ আমায় দেখলে। আরও কিছু দেখতে চাও তো বলো, দেখিয়ে দিচ্ছি।

—চুপ! এসব কথা আমি একদম শুনতে চাই না।

—চোখ রাঙিয়ো না। আমিও রোজগার করতে বেরিয়েছি। তুমি না ডাকলে আমি অন্য লোকের সঙ্গে যেতুম। দাও, আমার টাকা দাও।

—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

মেয়েটি এবার অন্য মূর্তি ধরল। কোমরে হাত দিয়ে বেঁকে দাঁড়াল সাপের মতন। বিষাক্ত চোখে তাকিয়ে বলল—আমার টাকা দেবে না? আবার চোখ রাঙাচ্ছ? দেখবে আমি টাকা আদায় করতে পারি কিনা? আমার ন্যায্য পাওনার টাকা। আমার একঘণ্টার দাম! বাড়িতে কি আমি শুধু হাতে ফিরব? তোমার মতন লোক ঢের দেখেছি আমি। টাকা দেবে না, ফুর্তি করবে? এঃ! মামার বাড়ি!

—চুপ, চুপ!

—কেন চুপ করব! পকেটে নেই কানাকড়ি, দরজা খোল বিদ্যেধরী! কেন ডেকে এসেছিলে আমায়? আমার হক্কের টাকা না পেলে আমি পাড়া মাথায় করব।

মেয়েটি ক্রমশ গলা চড়াচ্ছে। ডাক্তার সন্ত্রস্ত হলেন। দারোয়ান আছে বাইরে। এ ছাড়া পাশের বাড়ির লোকজন শুনে ফেলতে পারে। রাত দশটার পর ডাক্তার কোনদিন চেম্বারে থাকেন না। এখন যদি লোকজন টের পায় যে তিনি এত রাত্রে একটা খারাপ মেয়েছেলের সঙ্গে খালি চেম্বারে রয়েছেন—

পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তিনি মাথা নীচু করে জিজ্ঞেস করলেন—কত?

—আমার একঘণ্টার রেট পনেরো টাকা!

থরে থরে সাজানো নোটগুলোর মধ্য থেকে দুখানা দশটাকার নোট আলগোছে তুলে নিয়ে তিনি মেয়েটির দিকে এগিয়ে দিলেন।

মেয়েটি বলল—আমার কাছে খুচরো নেই।

—থাক!

মেয়েটি খপ করে দশ টাকার নোট দুটো নিয়ে আট ভাঁজ করে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর তার রাগ করা মুখেই ফিকে হাসি ফুটিয়ে বলল—চলি।

ডাক্তার তার দিকে ফিরেও তাকালেন না।

মেয়েটি বেরিয়ে যাবার পরও তিনি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন চেম্বারের মধ্যে। তিনি আরও পরে বেরুবেন। যাতে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর আর দেখা না হয়। রাগে তাঁর শরীর জ্বলছে। কুড়িটা টাকা এমন কিছু নয়। কিন্তু মেয়েটি বেইমানের মতন তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিল।

রক্ত নেবার সময় মেয়েটিকে স্পর্শ করতে হয়েছিল বলে তিনি ঘৃণা বোধ করলেন এখন। বেসিনে গিয়ে হাত ধুতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই মেয়েটির কথা, যে নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়েছিল। তার ঝলসানো মুখেও ফুটে উঠেছিল তীব্র ঘৃণা। পুরুষদের সম্পর্কে। হাসপাতালে গিয়েও মেয়েটি বাঁচেনি। মেয়েটির স্বামী সেদিন তাঁকে ফি দিয়েছিল বত্রিশ টাকা। তিনি একটু আপত্তি করেছিলেন, ঠিক নিতে চাননি। তবু ওরা জোর করে দিল। রোগের চিকিৎসা করাই ডাক্তারের পেশা, জীবন-মৃত্যুর ভার তার হাতে নয়। তিনি এরকম ভেবেছিলেন।

মৃত্যু আজ ছদ্মবেশে এসে তাঁকে একটু শিক্ষা দিয়ে গেল।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ

বিজু বলল—আমি যাচ্ছি মা।

সুচেতা বিজুর থুতনিতে আঙুল ছুঁইয়ে ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুক করে শব্দ করে বলল—এসো। দেরি কোনো না! টিফিন খেয়ো। জলের বোতল নিয়েছো তো ভরে।

বিজু বিরক্ত হয়ে বলে—আজ ম্যাচ আছে। বোতল টোতল কেন একগাদা দিলে? কত বই, টিফিন বাক্স! রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় আমি গাধার মতো মোট বয়ে নিয়ে যাই।

—দূর পাগল! সবই কাজে লাগে। কিচ্ছু ফেলনা নয়।

—একদিন সব হারিয়ে আসবো দেখো।

ছেলের লম্বাটে ছিমছাম চেহারা, সতেজ মুখের দিকে চেয়ে সুচেতা কয়েক পলক মুগ্ধ থাকে। এই তার রক্তের ডেলা, তার আপন সৃষ্টি, তার গাছের মহার্ঘ ফল। ফের ভাবে, নজর লাগল বুঝি!

তাই বিজুর বাঁ হাত টেনে নিয়ে দাঁতে একটু কামড়ে গায়ে থুঃ থুঃ করে বলে—সাবধানে যাবে। খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ো না।

বিজু পিঠে ব্যাগ নেয়, কাঁধে বোতল ঝোলায়। তারপর বুটের শব্দ তুলে সতেজ পায়ে বেরিয়ে যায়।

২

সারাদিন হাওয়া বয় তিনতলার ঘরদোরে। খুব হাওয়া। টুকটাক কাজ আর সুচেতার শেষ হতে চায় না। কোলের মেয়েটা জ্বালায় বড়। হাম হয়েছে। সারা বাড়ি হামা টেনে বেড়াচ্ছে। মেঝেয় পেচ্ছাপ করে সেই জলে থাপুর-থুপুর করে দুই হাতে।

—এই রে! দেখেছো! বলে উনুন থেকে কড়া নামিয়ে রেখে সুচেতা ছুটে যায়। হামে যদি ঠাণ্ডা লাগে তবে বিপদ। অরুন্ধতীর ছেলেটা হাম বসে মরতে চলেছিল।

মেয়েকে কোলে নিয়ে আঁচলে তার হাত পা মোছায়, জাঙ্গিয়া পাল্টে দেয়। পেচ্ছাপের জায়গাটা মোছে। মেয়েকে খেলা দিয়ে আবার গিয়ে চাপড়ঘণ্টের কড়া চাপায়।

এইভাবেই যৌবন শেষ হয়ে আসে বুঝি! এই তিনতলার ঘরে সংসারে আবদ্ধ জীবন। বেড়ানো, খেলানো নেই, কলেজ জীবনের আড্ডা নেই, রোমাঞ্চ নেই।

শমীক সন্ধে পার করে এল।

সুচেতা তাকে চা দিয়ে কাছে বসে বলল—কী ভেবেছো বলো তো?

—কী ভাবলাম? শমীকের ভীতু গলায় জবাব।

—এইভাবে আমাকে নিঙড়ে শেষ করবে? এর চেয়ে যে ঝি-গিরি অনেক সম্মানের। খাটাচ্ছো, কিন্তু শখ-আহ্লাদও পূর্ণ করবে তো। স্বার্থপর কেন বলো তো?

৩

বিজু ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে কলেজে ভর্তি হল। মেয়ে চন্দা সিক্স থেকে ফার্স্ট হচ্ছে। ভাল নাচে, গায়।

এক-আধদিন আজকাল শমীক বলে—বড্ড টায়ার্ড লাগে।

—কেন?

—কী জানি। লো প্রেশারটা তো আছেই।

—আমারও মাথা ঘোরে। হজম হয় না।

শমীক বলে—চলো তো দুজনেই ডাক্তারের কাছে যাই আজ।

পাড়ার চেনা ডাক্তার দুজনকেই দেখে বলেন—তেমন কিছু নয়। মিসেস চ্যাটার্জিকে নিয়ে একটু ঘুরে-টুরে আসুন কোথাও।

সুচেতা বলে—ওঁকে ভাল করে দেখুন।

—দেখেছি।

—কী?

—কিছু নয়। চল্লিশের পর শরীরে ক্ষয় শুরু হয়। ও সব একটু-আধটু অসুবিধে এখন থেকে হবে। একটু একসারসাইজ দরকার।

সুচেতা ভাবল চল্লিশের ওপর? এই সেদিনও তার বরটি মাত্র চব্বিশের ছিল যে! হিসেবে অবশ্য তাই হয়। সে নিজেও আটত্রিশ ছুঁল।

৪

বরপক্ষ চন্দনাকে একবারে পছন্দ করল।

ছেলের বাবা বললেন—দেনা-পাওনার কথা ওঠে না। যা দেওয়াব মেয়েকে দেবেন। ছেলেব কিছু চাই না, শুধু লক্ষ্মীমন্ত বউ চাই।

শমীক অলক্ষে সুচেতার দিকে তাকায়। সুচেতার মুখেচোখে মেয়ের জন্য অহংকার। শমীক অতটা খুশি নয়। মেয়ে তার প্রাণ। মেয়ের বিয়ে হলে থাকবে কী করে?

রাত্রিবেলা শুয়ে জনান্তিকে সুচেতাকে বলল—তুমি তো বিয়ের নামে টগবগ কবছো। আমি থাকবো কী করে?

—আমিও তো মা।

—আমার বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে।

—টাকার কথা ভাবছো?

— সে ভাবনাও আছে। কিন্তু চন্দিকে ছেড়ে থাকা।

—ভেবো না। সয়ে যাবে।

—মেয়েরা বড় নিষ্ঠুর।

—মেয়েরা নয়, তোমবাই। আমাকে যখন আমার বাপ মার কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছিলে তখন এত মায়া কোথায় ছিল?

শমীক চুপ করে থাকে। অনেকক্ষণ বাদে বলে—কিন্তু চন্দির কথা আলাদা।

—সকলের কাছেই নিজের মেয়ে আলাদা।

—তুমি হার্টলেস।

—জানোই তো।

শমীক ঘুমোলো। কিন্তু সুচেতা জেগে রইল। একবার উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ঘুমন্ত মেয়েটাকে দেখে এল। মাঝরাতে নীরবে চোখের জল ফেলল কিছুক্ষণ। বিজু বিদেশে। মেয়েও চলল শ্বশুরঘর।

৫

বাথরুম থেকে ঘরে আসতে পারছিল না শমীক। কী দূর হয়ে গেছে ঘর! কত দূর! তার গলার স্বর পৌঁছোয় না ঘরে সুচেতার কাছে। তবু সে প্রাণপণে ডাকে—সুচেতা! ডাকটা ফোটে না। অস্ফুট গোঙানির শব্দ হয়।

শেষ রাতে সুচেতা টের পেল, শমীক বিছানায় নেই। অনেকক্ষণ নেই। চমকে ওঠে বুক। বয়সটা ভাল নয় তো! উঠে সে স্বামীকে খোঁজে।

বাথরুমে যখন খুঁজে পায় তখন শমীকের জ্ঞান নেই। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। হাত পায়ে খিঁচুনি।

ডাক্তার বলল—মাইলড্ স্ট্রোক। এরপর থেকে কিন্তু খুব সাবধান।

খবর পেয়ে দুর্গাপুর থেকে কর্মব্যস্ত বিজু এল। মুখ থমথমে, গম্ভীর।

চন্দনা এল তার তিন বছর আর দু মাসের দুই বাচ্চাকে নিয়ে। বাবার শিয়রে বসে রইল ভাইবোনে। সুচেতা নাতি নাতনী সামলাতে লাগল।

শমীক বলল—তোরা অমন ভেঙে পড়িস না। আমি এখন ভাল আছি।

চন্দনা কাঁদতে থাকে। বিজু ছুটি বাড়ানোর দরখাস্ত পাঠায়।

শমীক সেরে ওঠে।

যাওয়ার আগে বিজু একদিন আড়ালে মাকে বলে—সব সময় তো বিয়ে-বিয়ে করে মাথা খারাপ করে দিচ্ছো। ভাল পাত্রী পেয়েছো তো বলো করে ফেলি।

—[illegible] হাতে রেখেছি। এবারই দেখে পাকা কথা দিয়ে যা।

বিজু খুব লাজুক স্বরে বলল—আর একটা দেখাত' আছে, বলো তো তোমাদের দেখিয়ে দিই।

—ওমা! তাই বলি— বলে সুচেতার গালে হাত।

৬

বিরক্ত হয়ে শমীক বলল—সবই কি আর মনের মতো হয়? মানিয়ে নিতে হবে।

সুচেতা বলে—তুমি পুরুষমানুষ আত্মভোলা শিবের জাত। মানিয়ে নিতে পারো। মেয়েরা পারে না।

শমীক মৃদু হেসে বলে—পারো না কে? মেয়েরা বড় জেলাস, কারো সঙ্গে কারো বনে না। ছেলের বউ তো শাশুড়ির চিরকালের শত্রু।

—না মশাই, আমি আমার শাশুড়ির শত্রু ছিলাম না। তুমি কি ভাবো তোমার ছেলে যে বউটি ধরে এনেছে সে আমার নখের যুগ্যি?

—তা বলছি না।

—তাই বলছো। জানো না বলেই বলছো। অত দেমাক কিসের ওর? গায়ের রংটা একটু কটা আর এম-এ পাস—যোগ্যতা তো এটুকুই। এম-এ পাস নই বলে আমরাও কম যাই নাকি?

—ঐ তো জেলাসির কথা। তোমাকে কম কে বলছে?

—অনেকে হয়তো ভাবে। তুমিও বউকে আশকারা দাও, বউকে কিছু বললে ছেলেরও মুখ ভার। না বাপু, দুর্গাপুরে আর নয়। কলকাতা চলো। ছেলের সংসারে ঢের হয়েছে।

৭

জামাই রবীনের পাতে আরো একটু মুরগি দিয়ে সুচেতা হাসিমাখা মুখে বলে—বলছেই না যখন—

রবীন মুখ তুলল না। চিন্তিতভাবে চুপ করে রইল।

চন্দনা টেবিলের অন্য ধার থেকে বলে—বলবে কী করে? একা ওই-ই তো সংসারের সব খরচ চালায়। ভাইরা কিছু দেয় নাকি? যাও যা দেয় শাশুড়ি তা ব্যাংকে জমা করেন। বড় ছেলেই চক্ষুশূল।

শমীক এসব কথা পছন্দ করে না। সে প্রাচীনপন্থী মুখখানা বিভীষণ করে খাচ্ছিল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেল কিছু না বলে।

সুচেতা লক্ষ্য করে ব্যাপারটা। তবু মেয়ের স্বার্থ তাকে তো দেখতেই হবে। সে মৃদুস্বরে বলে—সংসারের শান্তি চাইলে কিছু অপ্রিয় কাজও করতে হয়। আমি বলি কি, একটা আলাদা বাসা করে চলে এসো তোমরা। আমার কাছাকাছি চলে এসো, ছেলেমেয়ে আমিও দেখতে পারব'খন।

রবীন জবাব দেয় না। কিন্তু কথাটা ভাবে।

চন্দনা বলে—আমিও তো কবে থেকে তাই বলছি। ও কেবল বাপ মায়ের প্রতি কর্তব্যের নামে থাকতে চায়।

সুচেতা বলল—কর্তব্য দূরে থেকে করা যায়! বরং বেশিই করা যায়। থোক টাকা দেবে মাসে-মাসে।

রবীন একবার চন্দনার দিকে রাগ-চোখে চায়। কিছু বাদে সেও প্রায় ভরা পাত ফেলে ওঠে।

রাতে শমীক সুচেতাকে বলে—এসব প্রশ্রয় দিচ্ছো! পরে ভুগবে।

—আহা, কী কথা! জামাই তার সব রোজগার সংসারে ঢালছে, মেয়েটার ভবিষ্যৎ নেই? দুটো পয়সা রাখতে পারছে না।

শমীক রাগ করে পাশ ফিরে শোয়।

৮

মস্ত প্রোমোশন পেয়ে বিজু বদলি হয়েছে কলকাতায়। বউ হাসনু আর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে হইহই করে এসে হাজির হল একদিন।

সুচেতার আনন্দ ধরে না। শমীকের গম্ভীর মুখে খুশির বেলুন ফাটল।

সুচেতা বলল—বলতে নেই বৌমা, তোমার শরীরটা একটু সেরেছে। বিয়ের সময় যা রোগা ছিলে!

—দুর্গাপুরের জল ভাল মা।

—কলকাতায় এলে তো। এবার বুঝবে।

—তা হোক, মা, দুর্গাপুরে লাইফ নেই। এখানে কত লোকজন, আলো। ওখানে যেন মৃত্যুপুরী। কতদিন থেকে আসবো আসবো করছি।

খুব সাবধানে সুচেতা জিজ্ঞেস করে—এ বাড়িতেই থাকবে তো! নাকি—?

হাসনু মাথা নত করে বলে—ওকে তো অফিস থেকে আলাদা ফ্ল্যাট দেবে।

সুচেতা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। হাসনু বলে—ওর অবশ্য আপনাদের কাছেই থাকার ইচ্ছে।

—শুধু ওর ইচ্ছেয় তো হওয়ার নয় মা, তোমারও ইচ্ছে থাকা চাই।

হাসনু জবাব দেয় না।

৯

পর্দার আড়াল থেকে সুচেতা শুনল, হাসনু বিজুকে বলছে—অফিসের ফ্ল্যাটের কী হল?

—নিচ্ছি না। এই তো বেশ আছি। মা বাবার কাছে। ছেলে-মেয়ে দুটো দাদু ঠাম্মু বলতে অস্থির।

বাইরে থেকে তো ভালই লাগছে। এদিকে যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। চন্দনা আর রবীন কাছেই ফ্ল্যাট নিয়েছে, রোজ আসে।

—তাতে কী?

—কী আবার। মায়ে মেয়েতে দিনরাত গুজগুজ ফুসফুস। কী বলে কে জানে! বিয়ের পর মেয়েদের বাপের বাড়ির সঙ্গে অত মাখামাখি কেন থাকবে? ওর বরটাও ম্যাদাটে মার্কা। শ্বশুরবাড়ি বলতে অজ্ঞান।

—বাদ দাও।

—কেন বাদ দেবো? অশান্তির শুরু এইভাবেই হয়। আমি কিছুতেই এখানে থাকবো না। তুমি ফ্ল্যাটে চলো। মাসে মাসে বরং থোক টাকা দিও।

—মা বাবা যে বড্ড একলা হয়ে পড়বেন।

—সে ভাবতে হবে না। মেয়ে কাছে এসে উঠেছে। একলা কিসের? বরাবরই দেখেছি মার টান তোমার চেয়ে চন্দনার ওপর বেশি। আমার ছেলেমেয়েদের চাইতে চন্দনার ছেলেমেয়েরা এ বাড়িতে ঢের বেশি আদর পায়।

—যাঃ, ও তোমার মনের ভুল।

—আমি খুকী নই। তুমি স্নেহে অন্ধ বলে দেখতে পাও না। নইলে ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

আড়ালে সুচেতা চোখের জল মোছে। ওরা থাকবে না।

১০

জয় বলল—আমি যাচ্ছি মা।

হাসনু জয়ের মাথাটা দুহাতে ধরে একটু আদর করে বলল—এসো গিয়ে। টিফিন খেয়ো কিন্তু। ওয়াটার বটলটা ভুলে যেয়ো না।

জয় বিরক্ত হয়ে বলে—নিয়েছি নিয়েছি।

হাসনু ছেলের লম্বাটে ছিপছিপে চেহারাটা একটু দূর থেকে দেখে। মুখখানায় বুদ্ধির ঝিকিমিকি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়, ওরকমভাবে দেখতে নেই। আজকাল সে এসব সংস্কার মানে। ছেলের চোখের আড়ালে সে একটু হাতজোড় করে ঠাকুরের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করে—ভাল রেখো।

বিজু অফিসে, জয় স্কুলে। মেয়েটা এক মনে ছবি আঁকছে। আবোল-তাবোল ছবি। জ্বর থেকে সদ্য উঠেছে।

হাসনু মেয়েকে বলে—ধিয়া, দুধ খেলি না?

—না। বমি পায়।

সারাদিন হাসনুর কাজের শেষ নেই। কিছুই তাকে নিজের হাতে করতে হয়। আয়া, চাকর, রাঁধুনি আছে। তবু সবদিকে চোখ রাখতে হয়। সারা বাড়ি ছুটতে হয়।

সন্ধে পার করে বিজু এল। হাসনু তার মুখোমুখী বসে বলে- কী ভেবেছো বলো তো।

—এরকম ডাল সন্ধে কাটানো যায়? এর চেয়ে ঝি-গিরি ভাল ছিল। তোমার সংসার দেখছি, আমারও তো কিছু সাধ আহ্লাদ তোমাকে দেখতে হবে!

বুদ্ধদেব গুহ

বাবা, মা, আমি এবং পরমা

মিনিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় অবেলাতে ঘুমোলো।

বিষ্ণুপুরে আসার পর থেকেই খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটির দিনে বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিটুকুতে বসি একটু। এখনও গরম পড়েনি। বসন্ত এখন। চারপাশে অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়া গাছ। লালে লাল হয়ে আছে। সারা দুপুরে এবং রাতভর কোকিল ডাকে।

বই-টইও এখানে বিশেষ পাই না। রবিবারের কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়ি। অফিস থেকে শনিবার আসার সময়ে কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে আসি। শনি-রবিবারে পড়ে আবার সোমবারে ফেরত নিয়ে যাই অফিসে।

দূরে ছিন্নমস্তার মন্দির, রাঠীর বাগানের দিকের ঝুপড়ি-ঝুপড়ি গাছগুলো চোখে পড়ে। লালবাঁধের জল চিক্‌চিক্ করে দুপুরের রোদে। তার পাশে বনবিভাগের উক্যালিপটাস প্ল্যানটেশান। ভারী সুন্দর দেখায় ওদিকটা। কোনো কোনো রবিবার পরমা আর মিনিকে নিয়ে হাঁটতেও যাই ওদিকে। অবশ্য এখানে আমাদের সকলেরই প্রচুর হাঁটাহাঁটি হয়। সকালে বাজার যাওয়া-আসাই তো প্রায় মাইল তিনেক। ফিরেই, মিনিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে চান করে খেয়ে নিয়ে অফিসে যাই। পরমাই স্কুল থেকে নিয়ে আসে মিনিকে। হেঁটে যায়; হেঁটে আসে। সাইকেল রিকশা নিয়েও যেতে-আসতে

পারতো, কিন্তু তাতে রোজ এক টাকা করে খরচ। আমার আয়ে এতো বড় বিলাসিতা পোষায় না। তাও তো এখন গরম পড়েনি। গরম ও বর্ষার দিনে পরমা আর মিনির দুর্যোগের একশেষ হবে। কিন্তু করার কিছুই নেই।

হঠাৎ পরমা একটা পান হাতে করে এসে বললো, খাবে নাকি?

হঠাৎ পান? বললাম আমি।

পরমা বিরক্ত গলায় বললো, অত জেরার উত্তর দিতে পারবো না। খেলে খাও।

পানটা মুখে দিয়ে বললাম, বসবে? চেয়ার আনবো ঘর থেকে?

পরমা বলল, না।

তারপর বলল, সময় মতো বাস স্ট্যান্ডে যেও কিন্তু।

বাস স্ট্যান্ডে কেন? আমি শুধোলাম।

তারপর বললাম, রবিদা-বৌদি তো গাড়িতেই আসবেন লিখেছেন।

পরমা বিরক্তির স্বরে বলল, লিখেছেন ; কিন্তু যদি বাসেই এসে পড়েন।

বাঃ তা কেন করবেন? আমি বললাম।

পরমা বলল, অত তর্ক কোরো না।

তারপরই বলল, আমার দাদা বৌদি তো। তোমার গা থাকবে কেন? তোমার বাড়ির কেউ হলে তো সকাল থেকে কতবার গিয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে খোঁজ-খবর করে আসতে।

আমি এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, তা হয়ত করতাম। কারণ আমার আত্মীয়স্বজনদেব তো গাড়িতে করে আসার কথা থাকত না।

পরমা চলে গেল।

বলে গেল, ইচ্ছে হলে যেও ; নইলে যেও না। আমার আর কিছু বলার নেই।

পবমা কারো সঙ্গেই মানিয়ে থাকতে পারল না বলেই কলকাতা ছেড়ে বিষ্ণুপুরে আসতে হয়েছিল। আমাদের বসু-পরিবারতন্ত্রে আমার স্থানটা সবদিক দিয়েই এত নিচুতে ছিল যে ঐ ব্যাপারে অশান্তি পাওয়া ছাড়া আর কিছুই কবার ছিল না। বন্ধু-বান্ধবরা বলত, জয়েন্ট-ফ্যামিলির দিন চলে গেছে। শুনতাম, কিন্তু যার একা থাকার সামর্থ্য নেই, তার সকলের সঙ্গে না থেকেই উপায়ই বা কি?

একসঙ্গে থাকতে হলে, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই" একমাত্র উপায়।

পুতুল খেলার দিন থেকেই প্রত্যেক মেয়েই মনে মনে একটি নিজের নিজস্ব সংসার চায়। যেখানে সে-ই সম্রাজ্ঞী। সে সাম্রাজ্য যতই সামান্য ও দারিদ্র্যময় হোক না কেন। তার স্বাদই আলাদা। অন্তত আমার স্ত্রী এবং অন্যান্য পরিচিতা ও আত্মীয়াদের দেখে আমার এ-কথাই বার বার মনে হয়েছে।

আমি সাধারণ। অতি সাধারণ সরকারী চাকুরে। কোলকাতার বাড়িতে মা-বাবা, নিঃসন্তান কাকা-কাকীমা ; দুই দাদা। সকলের ও আমার রোজগারে মিলেমিশে রীতিমত সচ্ছলভাবেই দিন কেটেছে। কিন্তু সচ্ছলতাই সংসারের একমাত্র কাম্য বস্তু নয়। বিশেষত পরমাদের মতো মেয়েদের কাছে। সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে, পুজোর খরচ নিয়ে, মায়ের ঠাকুর ঘরে বাতি দেওয়া নিয়ে, ছোট বোনের বাচ্চা হওয়ার সময়ে বোন-ভগ্নীপতির আমাদের অপরিসর বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা নিয়ে অনেকই অশান্তি, মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক রাজনীতির অনেক স্রোত, উল্টোস্রোত, সব মিলে-মিশে এবং বিশেষ করে কাকার গর্ব ও কাকীমার দেমাক নিয়ে পরমার মনের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও টেনসান ক্রমশই এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল যে বদলীর অর্ডারটা আসায় হাতে যেন চাঁদই পেয়েছিলাম আমরা।

পরমা এই প্রথম আলাদা সংসার পেলে বিষ্ণুপুরে এসে। আমাদের একমাত্র মেয়ে মিনিকে নিয়ে আমাদেব দু'ঘরেব আড়াইজনের সংসার পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছিল পরমা।

অফিস যাওয়ার আগে যখন থলে-হাতে বাজারে যেতাম, পরমা তাড়াতাড়ি চা কবে দিয়ে বলতো, আজ একটু সজ্‌নে খাড়া এনো। সঙ্গে এক ফালি কুমড়ো। কুচো মাছ পেলে এনো।

ওব ছেলেমানুষ, স্টোভের-আঁচে লাল মুখে এসব গিন্নিবান্নি কথা শুনে অবাক লাগত আমার।

এখানে কুচো মাছ বড় একটা পাওয়া যায় না। বেশিই ছোট পোনা কিন্তু টাটকা। যা মাইনে পাই তাতে বোজ মাছ খাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পবমার গিন্নিপনাতে ধোঁকার বা ছানার ডাল্‌না, ধনেপাতা দিয়ে

লাউবড়ির তরকারি, চরু নারকোল-ভাত এসব নতুন নতুন নিরামিষ পদ খেয়ে মাছের শোক প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম।

কোলকাতার এজমালী সংসার ছেড়ে এসে নিজের সংসার পাততেই মায়ের হাতের রান্নার কথা বড় মনে পড়ত। পরমা একে একে তাদের বাড়ির সমস্ত স্পেশ্যালিটি রেঁধে এবং খাইয়ে আমাকে দত্তবাড়ির রন্ধন-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী করে তুলল। বোস-বাড়ির রান্নার স্বাদ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি এখন আমি।

মাঝে মাঝে আমার মন কেমন করত। মায়ের পেটে একটা টিউমার আছে। এক্স-রে করার কথা ছিল। হলো কিনা কে জানে। দাদারা যেহেতু কৃতী, এসব কাজ ছিল আমার। দাদাদের সময়ই হতো না মাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে যাওয়ার। বড়দা অফিস থেকে গাড়ি পেত। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কাজে সেই গাড়ি ব্যবহার করতে বড়দার সততায় বাধত অথচ শালা-শালীদের নিয়ে সেই গাড়ি চড়েই পিকনিকে বা মেসাঞ্জোরে যেতে সেই সততা বিঘ্নিত হতো না।

বাবার ব্লাড-সুগারটা খুব বেড়েছিল। আসার আগে দেখে এসেছিলাম খাওয়ার পরে রক্ত নিয়ে, দুশো কুড়ি। গুড় খেতে খুব ভালবাসেন বাবা। মায়ের কথা কানেই নেন না। এখনও গুড় খেয়ে যাচ্ছেন কি না, তা দেখবার লোক কেউ নেই এ-কথা ভেবেও চিন্তা হতো।

নিজের পরিবার ছেড়ে এসে প্রায়ই মনে হতো যে সুখ আর আরাম বোধহয় এক নয়। আরো মনে হতো যে আমরা যতই ইংরিজি শিখে থাকি না কেন, স্বতন্ত্র সংসারে বিশ্বাস করি না কেন ; আমাদের অস্তিত্ব, যৌথ-পরিবারের অনেকই গভীরে প্রোথিত আছে। নিজের সংসারের সব সুখ-স্বাধীনতা দিয়েও বোধহয় সেই দুঃখমিশ্রিত আনন্দের সমান হয় না নিক্তি। কিন্তু কিছুই বলতে পারতাম না মুখে, পরমার খুশি সুখোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে। মিনিটা তার দাদু-দিদাকে বড়ই মিস্ করত। বাবা প্রত্যেকদিন, ও যতদিন না স্কুলে ভর্তি হয়, ওকে নিয়ে সকালে বসতেন। বাবাই ওকে অক্ষর পরিচয় করান। ইংরিজী ও বাংলা। মা, ভক্ত প্রহ্লাদের কথা বলতেন মিনিকে, ঠাকুমার ঝুলি থেকে গল্প পড়ে শোনাতেন। কখনও বা অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী', রবি ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ'।

বর্ষার রাতে রান্নাঘর থেকে ভেসে-আসা খিচুড়ির ফোড়নের গন্ধ, কাকার সিগারের ধুঁয়োর উগ্র গন্ধ, চান করে আসা পরমার গায়ের সাবানের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা ও শুকনো লংকা ভাজার নাক-সুড়সুড় করা গন্ধের মধ্যে আমার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমাদের সেই যৌথ পরিবারের যৌথ গন্ধগুলো আমার সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত। সেঁধিয়ে থাকত।

মিনি যখন আরও ছোট ছিল, একদিন সন্ধ্যাবেলায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেছিল। আজও মনে আছে, দাদা অফিস থেকে ফিরছিলেন তখন। দারুণ ইস্ত্রি-করা একটা দামী বাদামী-রঙা স্যুট পরে। দাদা দৌড়ে এসে ছাদের ফুলের টবের জন্য শুকোতে দেওয়া গোবর-মাখা জুতো সুদ্ধু মিনিকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন ভয়ার্ত চিৎকার করে। আমি সিঁড়ির মুখে দৌড়ে গিয়েই দেখেছিলাম বাবা-মা কাকা-কাকীমা দাদা-বৌদিরা সকলে ভিড় করে আছেন। কাকা, পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জী পরে বারান্দায় লম্বা হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারে বসে সিগার খাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই মিনিকে দাদার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছিলেন। কাকার সঙ্গে মেজদা ও পরমাও গেছিল। তখন সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎই মনে হয়েছিল যে, আমার মাত্র পাঁচ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স থাকলেও আসলে আমার এবং আমার স্ত্রী ও কন্যার জীবন দারুণভাবে সুরক্ষিত। সে রাতে একা ঘরে বসে বড় অপারগ মনে হয়েছিল নিজেকে। আমাদের বাসস্থানের মালিক যে-কাকাকে দাম্ভিক, যে-বড়দাকে হৃদয়হীন চালিয়াৎ, যে-মেজদাকে স্বার্থপর বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলেন, তাদেরও চরিত্রের যে অন্য বহুদিক আছে, কোনো মানুষকেই যে আমরা প্রাত্যহিকতার বিচারে সঠিক বিচার করতে পারি না ; এ-কথা ভেবেই বার বার নিজেকে একদিকে কৃতজ্ঞ, অন্যদিকে ছোট বলে মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম, বড়দার ছোট ছেলে তুমু, যে মিনির বয়সী, সে সিঁড়িতে পড়ে গেলে আমি কি করতে পারতাম? আমি কি আমার অফিস-যাওয়ার সবচেয়ে দামী পোশাকে গোবরলাগা জুতোসুদ্ধু তুমুকে কোলে তুলতাম? তুমুর জন্যে সে রাতে কি ওষুধ ইনজেকশান করে একশো টাকা খরচ করে ফেলতে পারতাম?

তারপরই মনে হয়েছিল যে, না, তা পারতাম না সত্যি কিন্তু আমি সারা রাত জেগে তুমুকে সেবা করতে পারতাম। আমার শরীর দিয়ে সামর্থ্যের অভাব পূরণ করতাম। আমি প্রমাণ করতাম অন্যভাবে যে, আমি দাদার ছেলে তুমুকে আমার মেয়ে মিনির চেয়ে একটুও কম ভালবাসি না।

কিন্তু....। যাকগে এসব কথা।

পরমার মামাতো দাদা-বৌদি আসবেন আজ আমাদের এখানে বেড়াতে। আজ মাসের পঁচিশ তারিখ। কাল মানিব্যাগে দেখেছিলাম, তিরিশটি টাকা আছে।

ওঁরা বড়লোক। ডাক্তার দুজনেই। কোলকাতায় নিজেদের গাড়ি-বাড়ি আছে। পরমার নিজের দাদাদের সামর্থ্য ছিল না। ছোটবেলায় ওর বাবা মারা গেছিলেন। এই দাদাই পরমার বিয়ের সময় বেশি খরচ দিয়েছিলেন। সে বাবদে পরমার কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতি স্বাভাবিকই।

আমি আজ বাজারে যাওয়ার সময় পরমা কিছু বলেনি। অন্যদিন ফর্দ করে দেয়। আজ বলেছিল হেসে, আমি কি বলব? তোমার যা-খুশি তাই-ই এনো।

বাজারে গিয়ে কুড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল তেল টেল নিয়ে, কিন্তু বাড়ি ফিরে থলে উপুড় করে রান্নাঘারের বারান্দাতে ঢেলে দিলাম যখন, তখন পরমার মুখটা কালো হয়ে গেল। বেশি কিছু বলল না। শুধু বলল, অনেক বাজার করেছ দেখছি আজ!

কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝলাম যে, ওর দাদা-বৌদির জন্যে আমি আরও অনেক কিছু বাজার করব বলে ভেবেছিল ও।

আমার বড় লজ্জা হয়েছিল। দুঃখও।

একটা হাওয়া উঠেছে মাঠে, খোয়াইয়ে ; বনে বনে। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা ও লাল ফুলে ভরা ডালগুলো নৌকার পালের মত ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে। খবরের কাগজটাকে একটু নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়লাম। বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তবুও সময় মত উঠলাম। ঘরে গিয়ে পায়জামার উপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিলাম।

পরমা জানালার পাশে চেয়ারে বসে উক্যালিপটা বনের দিকে চেয়েছিল। কী যেন ভাবছিল ও। ওর চোখের দৃষ্টি বহু দূরে নিবদ্ধ ছিল। কেমন উদাস দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ও বলল, অমন হাভাতের মত যাওয়ার দরকার কি? হাওয়াইন শার্ট প্যান্ট বের করে দিচ্ছি, পরে যাও।

আমি কথা বললাম না। একবার ফিরে তাকালাম।

পরমা বলল, চা খেয়ে যাও। পাঁচ মিনিটে করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না থাক। বাস স্ট্যান্ডেই খেয়ে নেব।

পরমা বলল, তোমার মত পয়সার অপচয় আর কেউ করে না। কত যেন বড়লোক! ভাব দেখলে হাসি পায়।

আমার গা জ্বলে উঠল। আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাস প্রায় ঘণ্টাখানেক লেট করে এল। অনেকক্ষণ পায়চারী করলাম। লাভের মধ্যে রাবারের চটির স্ট্র্যাপটাই ছিঁড়ে গেল। কাল সকালে বাজারে গিয়ে সারানো ছাড়া উপায় নেই। এক পায়ে চটি পরে হাঁটা যায় না। চটি-জোড়া হাতে করে যখন সন্ধের অন্ধকারে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখি, বাড়ির সামনে একটি ঝকঝকে কালো ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন গাড়িতে বসে আছে। ড্রাইভার হবে বোধহয়।

ভিতরে ঢুকতেই বৌদি বললেন, কী হে জয়ন্ত, আমরা তো লিখেইছিলাম যে গাড়িতে আসব।

পরমা বলল, বাস কখন এসে গেছে! আমার উপর রাগ দেখাবার জন্যে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ফিরলেন।

তারপর ওর বৌদির দিকে ফিরে বলল, তোমরা তো আমারই দাদা-বৌদি। ওর তো কেউই নও।

ববিদা হঠাৎ আমার হাতে-ধরা চটির দিকে চোখ পড়ায় বললেন, ওকি, হাতে ওটা কি?

মিনি হাততালি দিয়ে বলল, এমা, বাবা চটি হাতে হেঁটে এলো।

পরমা চকিতে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, সং এর মত দাঁড়িয়ে থেকো না তো! চটিটা রেখে এসো।

চটি রেখে আসতেই, ববিদা বললেন, আর এক কাপ করে চা খাওয়া পরমা।

চরমা চা করতে গেল ভিতরে।

বৌদি বললেন, আমাদের সঙ্গে কিন্তু ড্রাইভার আছে! ও-ও খাবে বুঝলে জয়ন্ত। পরমাকে বলে দিও।

পরমা ভিতর থেকে বলল, বলতে হবে না। পরমার চোখ আছে। আমি কি আর রাম সিংকে চিনি না?

বৌদি বললেন, জয়ন্ত, এখানে কেন এসেছি বলো তো?

আমি বোকার মত বললাম, পরমার সংসার দেখতে।

বৌদি বললেন, তাতো বটেই! তবে সেটা আসল কারণ নয়। আসল কারণ বালুচরী শাড়ি। নিয়ে যাবে তো দোকানে?

আমি বললাম, নিয়ে যাব না কেন? কিন্তু তার তো শুনেছি অনেকই দাম। হাজার টাকা পনেরোশো টাকা এক-একটা শাড়ি।

রবিদা হাসলেন। বললেন, তোমার বৌদিও কি আর কম দামী হে?

আমি হাসলাম। বললাম, তাতো বটেই!

তারপর বললাম, থাকবেন ক'দিন?

বৌদি বললেন, বেশিদিন থাকলে তোমার আপত্তি?

আমি আবারও হাসলাম। বোকারা অকারণেই হাসে।

বললাম, না, না। কি যে বলেন!

রবিদা বললেন, পরশু ভোরে ব্রেকফাস্ট খেয়েই চলে যাবো। আমার আবার বিকেলে একটা অপারেশন আছে বেলভ্যূতে। খুব বড় মাড়োয়ারি ব্যবসাদারের একমাত্র মেয়ের অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন। কাজ কিছু নয়। কিন্তু ভালো মাল-কড়ি আছে। ফোকটে লাভ, বুঝলে না?

ভালো ছাত্র না হলে ডাক্তার হওয়া যায় না জানতাম। জানতাম, ডাক্তারের প্রফেশান সবচেয়ে নোব্‌ল প্রফেশান। কিন্তু রবিদার কথা শুনে, হাব-ভাব দেখে বোঝা যায় না উনি লোহা-ঢালাইওয়ালা, না ডাক্তার। অবাক লাগল।

ওঁরা চা-টা খেয়ে বললেন, এখানে আমার এক বন্ধুর ভাই আছেন এস-ডি-ও। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাই একবার দেখা করে আসি। গেলে অবশ্য বিপদ আছে। নাও ছাড়তে পারে, খাইয়ে তো ছাড়বেই ; ওখানে রেখেও দিতে পারে।

তারপর বললেন, তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

আমি বললাম, না, না উনি কতবড় অফিসার। এ সব ছোট জায়গায় আমাদের অনেক প্রোটোকল মেনে চলতে হয়। উনি যদি আমার কথা শুনে আমাকে দেখতে চান বা আলাপ করতে চান, সে অন্য কথা।

আমার কাছ থেকে ডিরেকশান নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন ড্রাইভারের চা খাওয়া হয়ে গেলে।

ওঁরা চলে যেতেই পরমা বলল, তোমার মত ছোটলোক দেখিনি। অমন করে কেউ অতিথিকে শুধোয় যে, ক'দিন থাকবেন? কথাটা কি অন্যভাবে বলা যেতে না? তোমার জন্য আমার মাথাকাটা যায় লজ্জায়।

কী বললে তুমি খুশি হতে?

বলতে পারতে যে, বেশ কয়েক দিন থাকতে হবে কিন্তু। তা হলেই জানতে পেতে যে ক'দিন থাকবেন।

তোমার মত আমার বাড়ি তো শান্তিপুরে নয়। অত সুন্দর করে কথা বলতে শিখিনি।

শেখোনি তো অনেক কিছুই। কিন্তু শিখতে আপত্তি কি?

আমি আর কিছু না বলে, আবার বাইরে গিয়ে বসলাম অন্ধকারে।

মিনি, বারান্দা থেকে তোতা পাখির মত বলল, বাবা অন্ধকারে বোসো না। মা বলেছে, বিছে কামড়াবে।

পরমা এসে বলল, রাম সিং অনেক দিনের ড্রাইভার আমাদের। ওকে খাতির যত্ন না করলে হবে

না। একটু পরই ভিতর থেকে আবার ফিরে এসে বলল, শুনছ, দাদা বৌদি আর আমি আমাদের ঘরেই শোব। মিনিকে নিয়ে তুমি বারান্দার চৌকিতে শুয়ে মিনির ঘরের খাটটা রাম সিংকে ছেড়ে দাও।

আমি বললাম, তাই-ই হবে!

রবিদা বৌদি প্রায় এগারোটায় ফিরলেন এস-ডি-ওব বাড়ি থেকে।

পরমা রান্না-বান্না সেরে বসে বসে হাই তুলতে-তুলতে মিনিব পাশে শুয়ে পড়েছিল। ওঁরা আসতে আবার খাবার-টাবার গরম করে সকলে মিলে খেতে বসা গেল।

পরদিন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দুশো টাকা ধার নিলাম। সকালে বাজার করলাম পাশের বাড়ির মুখার্জীবাবুব কাছ থেকে ধার করে।

সকালে বৌদি বলেছিলেন যে, তোমার দাদাব ক্লোবোস্টোল বেড়েছে। লীন্ মীট ছাড়া কিছু খান না। পাঁঠার মাংস এনো না কিন্তু। চিকেন এনো জয়ন্ত।

তাবপর বললেন, এখানে অ্যাসপারাগাস্ পাওযা যাবে? গেলে, তোমাব দাদাকে সঙ্গে একটু অ্যাসপাবাগীসের স্যুপ করে দেওয়া যেত।

পবমা বলল, কাকে কি বলছ বৌদি? ও এসবেব নামই শোনেনি। তবে হ্যাঁ, চিকেন আনবে। আব মাছ?

বৌদি বললেন, বড় কই মাছ পেলে এনো। অনেক দিন মুড়ি-ঘণ্ট খাই না। কলকাতায় তো পার্টি-ফার্টি লেগেই আছে? রোজই। আজ কক্‌টেল। কাল ডিনার। দিশি রান্না খেয়ে যে একটু সুখ করব তার উপায় নেই।

বাজাব সেরে, কোনোক্রমে খেয়ে আমি অফিসে গেলাম। পবমা আমাকে বলল, তোমায নিয়ে যেতে হবে না। আমরা আস্তে-সুস্থে খেযে দেয়ে, শাড়িব দোকানে যাব। আমি তো চিনিই।

বললাম, মিনির স্কুল?

পরমা বলল, মেয়ে আমাব এমন কিছু এম এস সি পডছে না। সবে তো কে-জি ওয়ান। ক'দিন কামাই করলে কিছু হবে না। মামা-মামী এসেছে। ওকেও নিয়ে যাব সঙ্গে।

অফিস থেকে ফিবে দেখলাম পবমা গলদঘর্ম হযে বান্না কবছে। আব মিনিটা ভবসন্ধেয় ঘুমোচ্ছে।

আমি বললাম, চা খাওয়াতে পারো এক কাপ!

পবমা বলল, মুখ হাত ধোও। কবে দিচ্ছি।

পরমার গলার স্বরটা অন্য বকম শোনালো।

পবক্ষণেই বলল, ঢের ঢেব ছোটলোক দেখেছি। এমনটি দেখিনি। খালি বড় বড কথা আব চালিয়াতি। চক্ষুলজ্জা বলেও কোনো ব্যাপাব নেই। দেখছে লোক নেই, জন নেই, বান্না করেছি, নিজে বাসন মাজছি, একটু সাহায্য কবতেও তো পাবত বউদি। মেয়েটাকে সঙ্গে নিযে গেল একটা চকোলেট তো কিনে দিতে পারত। তিন-তিনটে বালুচরী শাড়ি কিনল জানো? কত দাম বলো তো? তিনটেব দাম আড়াই হাজাব টাকা।

আমি বুঝলাম, কোথায় লেগেছে পরমাব? ঐ দোকানে আমাব সঙ্গে গিয়ে বহুবার ও শাড়ি নেড়ে-চেড়ে দেখে এসেছে। ওর বহু দিনেব শখ একটা লাল পাড গবদেব শাড়ির। দাম প্রায় দেড়শো মত। আমার কাছে তাইই অনেক। ঠিক কবেছিলাম, একজন জানাশোনা তাঁতীর কাছ থেকে নিয়ে মাসে-মাসে কুড়ি টাকা করে শোধ কবে দেব। যে মেয়েব পক্ষে দেডশো টাকার শাড়িও স্বপ্ন তারই সামনে অন্য মেয়ে আড়াই হাজার টাকাব শাড়ি কিনলে তা কি সহ্য হয়?

আমি কিছু বলার আগেই পবমা আবাব বলল, এই যে বড কই মাছ আর চিকেন কিনলে, টাকা পেলে কোথায়? এত টাকা কোথায় লুকিয়ে বেখেছিলে?

বললাম, পবমা তোমাব মনটা বড় ছোট হয়ে গেছে। এই দাদাই না তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন? এঁরা আসবেন বলেই না তুমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন। আর আসতে-না-আসতেই তুমি এত সব কথা বলছ?

পবমা প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, তুমি বুঝবে না। আমাব জন্যে আমার ভাবনা নেই। ভাবনা ছিল

না। কিন্তু তুমি গরীব বলে ওঁরা তোমার কাছে বড়লোকী দেখাতে এসেছেন। এস-ডি-ওর বাড়িতে উঠলেই তো পারতেন! গরীবের বাড়ি উঠে যদি তাদের কোনো রকম কনিসিডারেশন না থাকে তাহলে কি বলতে পারি?

বললাম, ওরকম কোরো না। ওঁরা তোমার কত আপন লোক! আমি তো আনন্দই পেলাম। আমি তো যা করার করছি হাসিমুখেই। তুমি এতে অন্য রকম ভাবছ কেন? আমি যদি তোমাকে কিছু বলতাম, তা হলে তুমি লজ্জা পেতে পারতে। আমি তো কিছুই বলিনি। তোমার এত আপন জনের জন্যে আমি কিছু করতে পারছি বলে কত ভালো লাগছে আমার। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, তোমার জন্যে বা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে তো কিছুই করিনি, করতে পারিনি। এইবার যখন সুযোগ এল তখন হাসিমুখে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করো।

পরমা মুখ তুলে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল চোখ বড় বড় করে।

ওর মুখ দেখে মনে হল, ও আমাকে চেনে না।

তারপর বলল, যাও! শীগগিরী মুখ-হাত ধুয়ে এসো, চা জলখাবার খেয়ে নাও।

বাথরুম থেকে এসে চা জলখাবার খেতে খেতে আমি বললাম, ওঁরা কোথায় গেলেন?

পরমা বলল, বাঁকুড়ায়। পোড়া-মাটির ঘোড়া কিনতে।

তারপরেই আমার সামনে এসে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, তুমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার করেছো, না?

আমি [illegible] দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, হ্যাঁ।

ওর ডান হাতে খুন্তি ছিল। আমার নাকের সামনে খুন্তি নেড়ে বলল, কত?

বললাম, দুশো।

দু শো! বলেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরমা।

ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। খুন্তিটাকে খাওয়ার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আমার একেবারে কাছে এসে বলল, তোমার উপর বড় অত্যাচার হলো গো! আমি খুব অবিচার করলাম তোমার উপর।

আমার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে এল।

আমি বললাম, ওরকম করে বোলো না। ওঁরা তোমার কত আপনার জন। তোমার জন্যে যাঁরা এত করেছেন, তাঁদের জন্যে আমি করব না? তা কি হয়? পরমা বলল, খুব পাপ হল। নিজের উপর খুবই অন্যায় করছ তুমি!

রবিদা-বৌদি চলে যাবার ক'দিন বাদেই অফিসে বাবার হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ড পেলাম। বাবা লিখেছেন .

"রমেনের পীড়াপীড়িতে আমি ও তোমার মা এই মাসের তিরিশ তারিখে বিষ্ণুপুরে যাইতেছি। রমেন তাহার অফিসের গাড়ি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। সেই গাড়ি আমাদের সহিতই থাকিবে। আমরা তিন দিনের জন্যে যাইতেছি। সাক্ষাতে আর সমস্ত খবর দিব। আশাকরি তুমি ও পরমা কুশলে আছ। মিনিকে আমার আদর জানাইও।"

বাবা মা আমার কাছে আসছেন এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কি হতে পারে? কিন্তু এ যে কত বেদনাদায়ক তা অযোগ্য ছেলে মাত্রই জানে। নিজের অযোগ্যতার কারণে বাবা মায়ের জন্যে যা করার, মন যা করলে খুশি হয় , তা না করার যে কী দুঃখ তা আমি সেই মুহূর্তে প্রথম অনুভব করলাম।

যোগ্য হইনি, হতে পারিনি বলে ; নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম।

পরমা গত দু'দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেশ অসুস্থই হয়ে পড়েছে। ওর একটা অ্যালার্জির মত হয়। হাঁপানির টানের মত ওঠে। সেইটা উঠেছে। পাছে আমার খরচ বেশি হয় তাই কিছুতেই অ্যালোপাথিক ডাক্তারের কাছে যায়নি। হোমিওপ্যাথের কাছ থেকে ওষুধ এনে খাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই বাবা মা এবং বড়দার অফিসের ড্রাইভার! এ-খবর আমি পরমাকে দিতে পারবো না। তার চেয়ে ওঁরা আসুন। যেন আচমকা এলেন। আমি মিথ্যে করে বলব যে, চিঠি পাইনি।

সে-রাতে পরমা খুবই কষ্ট পেল। আমি ওর বুকে পিঠে হাত বোলাতে গেছিলাম রাতে উঠে। আমাকে খুব বকল। বলল, কালকে তোমার অফিস নেই? আমার কি কাজ? আড়াই জনের জন্যে একটু রান্না। আর সারাদিন তো বাড়িতেই শুয়ে থাকি। আমি ঠিক হয়ে যাব। তুমি ঘুমোও তো দেখি গিয়ে।

চলে যেতে যেতে মিনির ঘুমন্ত মুখে চোখ পড়ল আমার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলেই বড় কষ্ট হয়। বুকের মধ্যে মুচড়ে ওঠে। বড় কষ্ট দেওয়ার জন্যে ভুল করে ওকে আমরা পৃথিবীতে এনেছি। এতটুকু শিশু! ওর কি দোষ? আমার অযোগ্যতাব জন্যে ওকো ভালো খাওয়াতে পারব না, পরাতে পারব না, ভালো শিক্ষা দিতে পারব না, পারব না ভালো বিয়ে দিতেও। কিন্তু যোগ্যই হই বা অযোগ্যই হই ; বাবা তো বাবাই! বড়লোক বা গরীবই হোক, সব বাবা মায়ের কাছেই সন্তান তো সন্তানই! গরীব বাবা মায়ের বুকের মধ্যের চাপা কষ্ট যে কতখানি তা কি সন্তানরা কোনদিনও জানতে পারবে, বুঝতে পারবে? তাদের বাবা মায়েরা তাদের যা দিয়েছিল তা কি মনে রেখে যা দিতে পাবেনি সেই কথার ক্ষোভ ভুলে যাবে বড় হলে? ক্ষমা কি করবে মিনি আমাদের? অন্তরের, বোধের দাম কি ও বুঝবে ভবিষ্যতে? এ-কথা কি জানবে যে ওকে জাগতিক কষ্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মা-বাবা তাদের অক্ষমতার কারণে মানসিক কষ্ট কত পেয়েছে প্রতিটি ক্ষণ?

বাবা মায়ের যেদিন আসার কথা সেদিন আমি ইচ্ছে করেই দেরী করে বাড়ি ফিরলাম। কারণ জানতাম যে, ওঁরা নিশ্চয়ই সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে বেরুবেন এবং বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাবেন। আজ আমার ভূমিকা অযোগ্য বাবার নয়, অযোগ্য ছেলের। অযোগ্য ছেলের বুকে সেই অযোগ্যতার গ্লানি যে কতখানি বাজে তাও কি বৃদ্ধ বাবা-মা বোঝেন? হয়ত বোঝেন। কাবণ, তাঁরাই যে জন্মদাতা। তাঁরাও আমাকে না বুঝলে আর কে বুঝবেন?

বাড়ির সামনে দূর থেকে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হাসি, গল্প, হৈ-হৈ শুনতে পেলাম। বাড়ি ঢুকেই অবাক হওয়ার ভান কবে বললাম, একি? তোমবা?

বাবা বললেন, চিঠি পাসনি?

মিথ্যে কথা বললাম। কিসের চিঠি?

বাবা বললেন, না, এ দেশের কিস্যু হবে না। কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর আসতে চিঠির সময় হলো না। তেলাপোকা হেঁটে এলে এর চেয়ে আগে পৌঁছে যেত।

আমার ভয় ছিল মাকে নিয়ে। বিয়ের পর থেকে এক দিনের জন্যেও মাযের সঙ্গে পবমার বনিবনা হয়নি। কারণটা আমার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। স্ত্রী চরিত্র নাকি দেবতারাই জানেন না। তাই আমার পক্ষে এর রহস্য আবিষ্কারও অসম্ভব ছিলো। মায়ের এই হঠাৎ-আগমন পরমা কিভাবে নেবে এবং তাঁব সবচেয়ে অযোগ্য এবং সে কারণেই সবচেয়ে আদরের ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে পরমার এখানে সংসার পাতার অপরাধ মাও যে কি ভাবে নেবেন আমার জানা ছিল না তা।

কিন্তু ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, তাতে নারীচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আমার যতটুকুও বা আছে বলে জানতাম সেটুকুরও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হলাম।

দেখি, মা রান্না করছেন। পরমা তাঁর পাশে বসে তরকারি কাটছে। মিনি বাবাব কোলে বসে গল্পে মশগুল। বাবা বলছেন, আমার কোলটা যে কতদিন ধরে মিনির জন্যে কাঁদছিল তা আমিই জানি।

মিনি ছোট ছোট হাত নেড়ে বলল, আমার কোলও যে দাদু তোমাব জন্যে কী কাঁদছিল কী বলব!

মা বললেন, ওরে আমার পাকুনী রে!

সবাই হাসছেন, সবাই গল্প করছেন। পরমা খুশি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। যে মায়ের সাংসারিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিল সেই মাযের হাতেই হাতা-খুন্তি তুলে দিয়ে এই মুহূর্তে সে যেন পবম নিশ্চিন্ত বোধ কবছে।

মাকে বললাম, কি রাঁধছ মা?

মা বললেন, তুই কতদিন আমার হাতের খিচুড়ি খাস না। তাই এসেই তোর জন্যে খিচুড়ি রাঁধতে বসেছি।

বাবা ফোড়ন কাটলেন, বুঝলে পরমা, এবার আমরা দুজনে নোয়্যোয়ার। খিচুড়ি-ভক্ত মা-ছেলে একসঙ্গে হয়েছে। এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি।

মা বললেন, জানিস খোকন ; তুই কড়াইশুঁটির চপ খেতে ভালোবাসিস, তাই বড়-খোকা টিনের কড়াইশুঁটি দিয়ে দিল আমার সঙ্গে। বড় বউমা বলল, মা আপনি গিয়েই খোকনকে খিচুড়ি আর কড়াইশুঁটির চপ রেঁধে খাওয়াবেন। বলল, দুটো ছেলেমানুষ যে কী করছে সেখানে, কী খাচ্ছে, কী রাঁধছে ; ভগবানই জানেন।

বাবা বললেন, তোর আর পরমার জন্যে রাধু দুটো ফোল্ডিং ইজিচেয়ার দিয়ে দিয়েছে রে। তোরা দুজনে বসে গল্প করবি, খবরের কাগজ পড়বি। তুই যে চেয়ারটায় বারান্দাতে বসে খবরের কাগজ পড়তিস রাধু সেই চেয়ারটা দেখে রোজ বলত, খোকনের বিষ্ণুপুরের কোয়ার্টারে ইজিচেয়ারের অভাবে নিশ্চয়ই ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। চেয়ারটাই পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ির মাথায় করে!

রাধু অর্থাৎ কাকা যে আমার মত অপদার্থ কেরাণী ভাইপোটিকে নিয়েও এতখানি ভাবতে পারেন তা আমার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

কত যে জিনিস এনেছেন বাবা-মা। পরমা কই মাছ ভালোবাসে তাই মেজবউদি হাঁড়ি করে কই মাছ পাঠিয়েছেন। বলেছেন বিষ্ণুপুরে নাকি কই মাছ পায় না ওরা?

মেজবউদি হয় জানেন না, অথবা জানলেও মানতে চান না যে, কই মাছ বাজারে উঠলেও তা কিনে খাওয়ার [illegible], [illegible] নেই।

পরমা বলল, মা তিনদিন থাকলে কিন্তু হবে না। বড়দার গাড়ি পাঠিয়ে দিন কালই। ও চিঠি লিখে দেবে ড্রাইভারের সঙ্গে। আপনি আর বাবা, আমাদের সঙ্গে এক মাস থাকবেন কম করে। এসে যখন পড়েছেন না বলে-কয়ে তখন এক মাসের আগে ছাড়ছি না। কোনো কথাই শুনছি না আমি।

বলেই, বাবার দিকে ফিরে বলল, কি বাবা?

বাবা বললেন, এখন তো আমার কোন মত নেই, তোমার সংসারে এসেছি ; তুমি যা বলবে তাইই শুনব।

কতদিন, কত বছর পরে সে-রাতে যে কত আনন্দ করলাম তা কী বলব! মিনিটা রাত বারোটা অবধি জেগেই রইল। খাওয়া-দাওয়ার পর মা ওকে নিয়ে প্রহ্লাদের গল্প বলে ঘুম পাড়ালেন।

পরমা, বাবা মা আর মিনিকে ওর ঘর ছেড়ে দিল জোর করে। কোনো কথা শুনল না। বড়দার অফিসের ড্রাইভারকে মিনির ঘরের খাটে আদর যত্ন করে বিছানা করে শোওয়ালো। নিজে, বোধহয় বহুদিন পর মিনি হওয়ার পর এই প্রথম, আমার সঙ্গে শুলো ঢাকা বারান্দায়।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গেছিল একটু। উঠে দেখি, মা চায়ের জল চাপিয়ে বাইরে নতুন ইজিচেয়ারে বাবার পাশে বসে আছেন। আমাকে দেখেই চা করে দিলেন। বললেন, তোর সঙ্গে আরেক কাপ খাই।

পরমাকে দেখলাম না। ভাবলাম, সকাল সকাল চান করে নিতে গেছে বোধহয় বাথরুমে।

চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দেখি গাড়িটা নেই। বাবাকে শুধোতে, বাবা বললেন, পরমা নিয়ে গেছে। বলল, এক্ষুনি আসছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পরমা? এত সকালে ওর কি কাজ?

মা বাবা দুজনেই চিন্তান্বিত গলায় বললেন, তা তো আমরা জানি না। কেন? তুইও জানিস না কিছু?

আমি উত্তেজনা না দেখিয়ে বললাম, এলেই জানা যাবে।

মা বললেন, পরমাটার চেহারাটা যা খারাপ হয়ে গেছে তা বলার নয়। লোকজন নেই, সব একা করতে হয়। অভ্যেস নেই। পারে নাকি এতটুকু মেয়ে? তার উপর মিনিকে দেখা। সব একা হাতে।

একটু পর পরমা ফিরল। এক চ্যাঙ্গাড়ি গরম জিলিপী সিঙাড়া নিয়ে। বাবাকে বলল, বাবা খান। আপনি গরম জিলিপী ভালোবাসেন। তারপর একটা ছোট ঠোঙ্গা বের করে বলল, মা, এটা আপনার। আপনি ভালোবাসেন।

মা বললেন, কি রে ওটা?

দেখুন। বলে পরমা হাসল।

মায়ের সুন্দর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা বললেন, বৌদে?

ভিতরে যাওয়ার সময় পরমা আমাকে ডাকল।

বলল, চা খেয়ে একটু শুনে যেও।

ভিতরে যেতেই শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে পরমা আমার হাতে অনেকগুলো একশো টাকার নোট আর অনেকগুলো খুচরো নোট দিলো। ফিসফিস করে বলল, সাড়ে বারো শো টাকা আছে। তার মধ্যে পাঁচ টাকা খরচ হয়েছে জিলিপী-টিলিপীতে।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত টাকা বহুদিন দেখিনি একসঙ্গে। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমি।

বললাম, এত টাকা? কোথায় পেলে তুমি এই সকালে?

পরমা বলল, আমার একটা গয়না বেচে দিয়ে এলাম মধু স্যাকরার কাছে?

আমি বিশ্বাস না-করে বললাম, দোকান তো এখনও খোলেনি!

দোকান নয়, বাড়িতে গেছিলাম।

সে কি? কী সাংঘাতিক কাণ্ড! সাতসকালে! গয়না বিক্রী করলে সংসারে অলক্ষ্মী আসে জানো না তুমি?

কি লক্ষ্মী আর কী অলক্ষ্মী আমাকে শেখাতে হবে না তোমার। এখন স'রে তাড়াতাড়ি দরজা খুলি, নইলে বাবা মা কি মনে করবেন?

বললাম, ছিঃ ছিঃ কেন এমন করলে? তুমি জানো, কত ছোট করলে আমাকে তোমার কাছে?

পরমা তখন হাসছিল।

বলল, বাবা মাকে এক মাস রাখবোই আমি। হয়ত তুমিও একদিন বড় অফিসার, বড়লোক হবে, কিন্তু বাবা মার জন্যে কিছু করার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। বাবা মার জন্যে যা করবে, ভগবান তার দশগুণ তোমাকে ফেরত দেবেন।

হেসে ফেলে বললাম, তাহলে দশগুণ ফেরত পাবার জন্যেই এই কাণ্ডটা করলে?

কিন্তু হাসলাম যে কী করে ; জানি না।

পরমা এবার পরিপূর্ণ হাসল। হাসলে, ওর গালে ভারী মিষ্টি টোল পড়ে একটা। বলল, আজ্ঞে না স্যার। তোমাকে হারাবার জন্যেই করলাম। তুমি কি ভেবেছ তুমি জিতে যাবে? আমিও কি জিততে জানি না?

কিন্তু মিনি? মিনির ভবিষ্যৎ? এইভাবে চললে ওর কি হবে?

পরমা রেগে উঠল। বলল, সরো দরজা খুলতে দাও।

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নিজের মা বাবার কারণে কারো ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় এ-কথা আমি মানি না ; বিশ্বাস করি না। আমি যা করেছি, বেশ করেছি। আমার গয়না আমি যা-খুশি করব। আমি তা বিক্রী করি, দিয়ে দিই, ফেলে দিই তোমার তাতে কি?

বলেই, দরজা খুলে রান্নাঘরে গেল।

আমি বাইরে এসে বাবার পাশে বসলাম।

মা ভিতরে গেলেন পরমাকে রান্নায় সাহায্য করতে।

কৃষ্ণচূড়া গাছের শিকড়গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। আমার বাবার পাশে আমি .

বাবাকে-আজকাল বেশ বুড়ো বুড়ো দেখায়। চুলগুলো সবই সাদা হয়ে গেছে। দাঁড়ালে কুঁজো লাগে। হাতের শিরাগুলো দেখা যায় গাছের শিকড়ের মত।

বাবার পাশে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হয় যে, প্রত্যেকটি দূরত্বের লাটাইএই নৈকট্যের সুতো গোটানো থাকে সব সময়ই এবং শিকড়ের মধ্যেই থাকে গাছের প্রাণ, লতায়, অর্কিডেও।

বাবা, মা, আমি, পরমা এবং মিনি...

দেবেশ রায়

জীবনানন্দের মুখ

'দিদি, দেখাচ্ছে, তাড়াতাড়ি', দুজোঁ চিৎকার করে ওঠে, আর ভিতরের ঘর থেকে আনন্দ দৌড়ে আসে—হাতে নখের রঙ তোলার তুলিটা, সেই স্পিরিটের গন্ধে জায়গাটা ভরে যায়। দুজোঁ ঘাড় ঘুরিয়ে দিদির দিকে তাকিয়ে হেসে আবার টিভিতে চোখ দেয়, 'তোকে কি এ-রকম চুল বাঁধতে হবে নাকি?'

টিভিতে তখন বাড়ির গিন্নি তাড়াতাড়ি চুলের ফিতেটা দাঁত দিয়ে চেপে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'আমার বাপু শনিবারের সিনেমাটা না দেখলেই নয়।' চুল বাঁধার ফিতে দাঁত দিয়ে চাপলে কেমন চোখটা একটু টেরিয়ে কথা বলতে হয়, ছবিতে অবিকল সে-রকমই দেখাচ্ছিল। তারপরই ঐ মহিলার এক ঢাল চুল আর পাশে একটা তেলের শিশি।

দুজোঁ তার ঠিক পেছনে দাঁড়ানো দিদির দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে তুলে বলে, 'তুই চুল বাঁধবি কী রে, তোর ত চুলই নেই!'

টিভিতে ততক্ষণে আর-একটা বিজ্ঞাপন এসে গেছে। সেদিকে একবার একটু তাকিয়ে আনন্দ নিজের আঙুলের ওপর ঐ ব্রাশটা বোলাতে-বোলাতে বলে, 'ধুত, আমার ত কাপড়কাচা সাবান!'

'কী করবি? কাপড় কাচবি, না মেলবি, নাকি দোকানে যাবি?' দুজোঁ তার দেখা ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপনগুলো থেকে বলে।

'সে দেখতেই পাবি', আনন্দ তার নখে ব্রাশ বুলিয়ে যায়। টিভির আলো ভাইবোনের মুখে আবছা রঙিন পড়ে। ঠিক তখনই একটা গম খেতে দেখানো হয় আর একজন বেশ গোঁফওয়ালা কৃষক। এটা একটা সারের বিজ্ঞাপন। দেখেই দুজোঁ খিলখিল করে হেসে ওঠে, 'দিদি, একদিন একটু সার কিনে আনিস ত, খাব।'

ওদের মা গোপা রান্নাঘর থেকে মেয়ের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন যেতে-যেতেই বলে যান, 'ও আবার কী কথা, সার কি কেউ খায় নাকি?'

'তাহলে দেখায় কেন মা?' গোপা প্রশ্নটা শুনেছিলেন কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকে গিয়েছিলেন বলে জবাব দেন না।

আনন্দ দুজোঁকে বলে, 'জানিস ভাই, আমাকে না শুভমদা ঐ লিরিলের মেয়েটার মত হাসতে বলেছে।'

দুজোঁ বলে, তুই যে বললি তোর কাপড়কাচা সাবান।'

'সাবান না, ডিটারজেন্ট পাউডার, আনন্দ বেশ টিভির মত উচ্চারণ করে বলে।

'লিরিল ত গায়ে মাখায় সাবান।'

দুজোঁ টিভির দিকে পেছন ফিরে সোফার পিঠে বুক ঠেকিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে, 'মা, দিদি বলছে ওকে নাকি লিরিলের মত হাসতে হবে।'

গোপা দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটা আবার কে বলল?'

নিজের নখ পরিষ্কার করতে-করতেই আনন্দ বলে, 'আঃ, তুমি আবার এর মধ্যে কি বলছ?'

'কী বলছি মানে? দুজোঁ যে বলছে লিরিলের মত করতে বলেছে।'

দুজোঁ বোধহয় এটা চাচ্ছিল যে মার সঙ্গে দিদির একটু ঝগড়া হোক। সে কথা বলে না, কিন্তু মার দিকে তাকিয়ে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। আনন্দ দাঁড়িয়ে ছিল দুজোঁর মুখ ঘেঁষে সোফাটার ঠিক পেছনে একটু কোনাচে হয়। সে তার ভঙ্গি অপরিবর্তিত রেখেই বলে, 'করতে বলেনি, হাসতে বলেছে।' বেশ ধীরে ধীরে, একটু জোর দিয়ে বলে।

দুজোঁ হাততালি দিয়ে ওঠে, 'দিদি, তুই পনছিতে কর। একেবারে অর্চনা যোগেলকারর মত করলি ত!'

টিভিতে বিজ্ঞাপনের পর বিজ্ঞাপন হযে যাচ্ছিল—তিনজনের কেউই দেখছিল না। কিন্তু টিভির আলোর রঙ এই তিনজনের মধ্যে বদলে-বদলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা মিউজিক শুনেই দুজোঁ সোফার ওপরই লাফ দিয়ে টিভির দিকে ঘোরে ; আনন্দ নখ পরিষ্কার করে তাকায়। গোপা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনিও 'দুজোঁর জন্যে সোফাগুলো আর থাকবে না', বলে টিভির দিকেই তাকান। একটা টায়ার তার সমস্ত খাঁজখোঁজসহ তীব্র বেগে ক্রমবর্ধমান সঙ্গীতের সঙ্গে ছুটে আসছে ক্রমেই দৃশ্যত বড় হতে-বতে। এর পরই একটা প্রমাণ সাইজের ডল পুতুল টায়ারটার সামনে এসে থামবে আর তখনই টায়ারটা আটকে গিয়ে মিউজিক বদলে যাবে। প্রতিদিন দেখা এ-দৃশ্যটা প্রতিদিনের প্রতীক্ষা নিয়েই ওরা দেখে, প্রত্যাশার একই পরিচিত ওঠাপড়ার উদ্বেগ নিয়ে দেখে মধ্যচল্লিশের মা, মধ্যকুড়ির মেয়ে ও এখনও টিন-এজার না-হওয়া ছেলে। তারপরই একটা সিনেমাব দৃশ্যের মত দৃশ্য—বহু পুরনো দিনের রাস্তার মত রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ি, মনে হয় প্রাচীন কোনো ফোটোগ্রাফ, একটি অত্যন্ত নবীন ছেলে অত্যন্ত আধুনিক পোশাকে পর্দার ডানদিকের তলার পর্দা জুড়ে। তার কোনাকুনি বাঁ দিকের ওপরের দিকে আবছা পটভূমিকায় একটি সম্পূর্ণ মেয়ে দাঁড়িয়ে, গল্পের বইয়ে দেখা যায় এমন একটা ল্যাম্পপোস্টের কাছাকাছি। পেছনে একটা মিউজিক আছে কি নেই। আলোটা অদ্ভুতভাবে রাস্তার কিছু-কিছু অংশ, ঘোড়াটার পা, কেশর এই সবকিছুর ওপর পড়েছে কিন্তু সেই আবছা আলোর মধ্যে কাছের ছেলেটি ও দূরের মেয়েটি একেবারে স্পষ্ট। প্রায় অচল ছবি। শুধু মেয়েটির হাতেব আঙুলের নড়াচড়ায় আর চোখের পাতার ওঠাপড়ায়, আর ছেলেটির ঘাড় মেয়েটির দিকে অতি ধীরে ঘোরানোয়, গতি। সেই আছে-কি-না-আছে মিউজিকের সঙ্গে ছবিটি চলে যায়।

'কী দারুণ', প্রত্যেক দিন দেখা এই ছবিটা নিয়ে, আনন্দ বলে।

'এ আবার দারুণ কী?' দুজোঁ আবার সোফাতে বুক ঠেকিয়ে হাঁটুর ওপব ভর দিয়ে দিদির দিকে ঘোরে।

'চোখ সরাতে পারলি না ত টিভি থেকে', আনন্দ বলে।

'বাবলি, শুনে যা', গোপা রান্নাঘরে ঢুকতে-ঢুকতে বলেন। আনন্দ যেন জানে মা কেন ডাকছে এমনভাবে ঠোঁটটা মচকাল। দুজোঁ চেঁচায়, 'মা, দিদি তোমাকে ঠোঁট ভেঙাল।' তাবপর এক লাফ দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় দিদির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখে গোপা হেসে ফেলেন, 'তুই এসেছিস কেন? তোকে ডেকেছি?' আনন্দর কোমর দুজোঁ জড়িয়ে ধরে। আনন্দ ডান হাতটা ভাইয়ের মাথার ওপর রাখে। দুজোঁ স্পিরিটের গন্ধে মুখ ছুঁচলো করে নাক কোঁচকায় কিন্তু কিছু বলে না। মা দিদিকে কী বলে, সেটা শুনতে চায়। বসার জায়গায় টিভিতে মিনিটে-দেড়মিনিটে মিউজিক বদলায়, গলার স্বর বদলায়, আলোর রঙ বদলায়, হাসি বদলায়, কান্না বদলায়, শিশু বদলায়, বৃদ্ধ বদলায়, ভাষা বদলায়। এত দ্রুত এত সব পরিবর্তনের কোনো দর্শন থাকে না।

গোপা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আনন্দ একটু অধৈর্য হয়েই বলে, 'ডেকে আনলে, এখন চুপ করে আছ!'

গোপা নিজের অপ্রস্তুতি ঢাকতে না-তাকিয়ে বলেন, 'পরে বলব। দুজোঁ, পড়তে বস্।'

'খেতেই দাও নি ত!'

হাতমুখ ধুয়েছিস? পার্ক থেকে এসেই ত টিভির সামনে বসে পড়লি। আটটা বাজতে না-বাজতেই ত চোখ ঘুমে ঝিমিয়ে আসবে। সামনের বছর থেকে দুপুরে ইস্কুল।'

'দুপুবে ইস্কুল হলে ত ভাল, সারা দিন খেলা যায়।' দিদিকে জড়িয়ে ধবে দুজোঁ বলে।

'ছাড়, ঘরে যাব,' আনন্দ কোমর থেকে দুজোঁর হাত খোলে।

'বাবা দিদি, এখনই যেন টিভি স্টার হয়ে গেছিস, এবপর ত কথাই বলবি না।' দিদির কোমব থেকে দুজোঁ হাত খোলে।

'দেখ্ ভাই, অত পাকামো করিস না', আনন্দ ঘরে যেতে-যেতে বলে, বোঝা যায় সে তার মায়ের ওপর বিরক্ত হয়েছে। দিদির চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দুজোঁ বলে, 'আমি ত আমার ক্লাসের সবাইকে বলে দিয়েছি আমার দিদি টিভি স্টার।'

'বেশ ভাল করেছ। এখন টিভিটা বন্ধ করে, হাতমুখ ধুয়ে টেবিলে এসো। খাবারটা খেয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে বসো।

মা-দিদির বকুনি খেয়ে দুজোঁ হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসে। সে চিৎকার করে বলল, 'আমি টিভি বন্ধ করব না', তারপর বাথরুমে ঢুকে দরজাটা বেশ আওয়াজ তুলে বন্ধ করে। দুজোঁ অবিশ্যি এ-ভাবেই বন্ধ করে থাকে। ছিটকিনিটা দরজার মাথার দিকে, দুজোঁ হাত পায় না। কিন্তু এখন সে রাগ দেখানোর জন্যে প্লাস্টিকের বড় বালতিটা উপুড় করে তার ওপর দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে ছিটকিনি আটকায়। আগে একটা ওরকম বড় বালতির তলা দুজোঁ ঐ পদ্ধতিতেই ভেঙেছে। রান্নাঘর থেকে গোপা গলা তুলে বলেন, 'দুজোঁ, আবার বালতি ভাঙছ? ছিটকিনি লাগাচ্ছ কেন?'

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে দুজোঁ তার কচি গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'আমিও দরজা লাগিয়ে বাথরুম করব।'

গোপা বোঝেন, ছেলে রেগেছে। তিনি বাথরুমের দরজার কাছে এসে দরজাটা ঠেলতে-ঠেলতে বলেন, 'দরজা বন্ধ করো, ছিটকিনি লাগিও না।'

'না, লাগাব। ছিটকিনি লাগাব।'

'দুজোঁ, বাবা, কথা শোনো', বলে দরজাটা একটু ঠেলতে পারেন গোপা কিন্তু জোরে ঠেলেন না, তাহলে দুজোঁ বালতির মাথা থেকে পড়ে যেতে পাবে। দরজার ফাঁক দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দুজোঁর বাঁ-বাহুটা ধরে ফেলতে পারেন নিজের ডান হাতে। দুজোঁ বাধা দেয় না। গোপা বাথরুমের ভিতর ঢুকে গিয়ে বালতির ওপর থেকে দুজোঁকে নামিয়ে তার হাত-পা ধোয়াতে শুরু করেন। দুজোঁর রাগ দেখানো হয়ে গিয়েছিল— সে আর তাতে আপত্তি করে না। শুধু বলে, 'মুখে সাবান দেবে না।'

হাতমুখ ধোয়ার পর পাউডার মেখে, একটা পাজামা আর ফতুয়া পরে দুজোঁ এসে খাবার টেবিলে বসে। গোপা তাকে একগ্লাস কমপ্ল্যান আর একটা টোস্ট দিয়ে যান। দুজোঁ তাড়াতাড়ি খেয়ে পারে না— একটু বিরক্তিকর বেশি সময় ধরে খায়। টোস্টের চিনিগুলো আগে ডিশের মধ্যে ঝরিয়ে নেবে। তারপর টোস্টটা একটু একটু করে ভিজিয়ে খাবে। টোস্ট খাওয়া শেষ হতে-হতে কমপ্ল্যানটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। যদিও কমপ্ল্যান ঠাণ্ডা করার ছুতোয় সে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকে। কমপ্ল্যানটা খাওয়া শুরু করলে বেশি সময় লাগে না—অতটা তরল সে একবারেই গিলে ফেলে এক চুমুক জল খায়। তারপর ডিশ থেকে চিনির দানাগুলো কুড়িয়ে-কুড়িয়ে খেতে থাকে। তাতেও নেহাত কম সময় যায় না। কিন্তু তার এই বার বছর বয়সের মধ্যে এটাই তার খাওয়ার ধরন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। দুজোঁ যখন চিনি খাচ্ছিল তখনই তার ঘর থেকে আনন্দ বলে উঠল, 'ভাই, তাড়াতাড়ি করো, তোমার টাস্ক দেখিয়ে আমাকে অন্য কাজ করতে হবে।'

খাওয়ার পর উঠে দুজোঁ আবার মুখ ধোয়, তার এ-সব বাতিক খুব। তারপর নিজের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে দিদিকে জিজ্ঞাসা করে, 'কী, আমি বই নিয়ে আসব, না, তুই আসবি?'

'তুই বোস, আমি যাচ্ছি।'

বাইরে বেল বাজে, শুনেই বোঝা যায় অরিন্দমবাবু ফিরলেন। তিনি জুতোর জায়গায় জুতো খুলে রেখে, খালি পায়ে আগে ছেলেমেয়েদের ঘরে যান। তাঁর পায়ের আওয়াজ দিদি, ভাই দুজনেই পেয়েছিল। দিদি আর ফিরে তাকায় না, দুজোঁ একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আবার চোখ নামিয়ে নেয়। দিদি খাতায় অঙ্ক দেখাচ্ছিল, এরপর ভুল করলে চড় খেতে হবে। দিদি ভীষণ কড়া মিস। আর, দিদি মারলে মা-বাবা কেউই বাঁচাতে পারবে না, আসবেই না এদিকে। তাই দিদিকে আড়াল করে বাবা আর ছেলের একটা গোপন দৃষ্টিবিনিময়মাত্র হতে পারে।

অরিন্দমবাবু জামাপ্যাণ্ট পরেই বাথরুমে যান, হাতে পাজামা, ফতুয়া আর তোয়ালে নিয়ে। ঠিক

স্নান করেন না কিন্তু খুব ভাল করে গা না-ধুয়ে শান্তি পান না। জানুয়ারিতে কয়েকদিন একটু গরম জল লাগে, তাছাড়া সারা বছর ঠাণ্ডা জলেই।

টিভির সামনে বসে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী তখন চা খান আর দু-একটা বিস্কুট। টিভি চলতেই থাকে, গোপাকে একটু-আধটু উঠতে হয় কিন্তু অরিন্দম ঠায় বসেই থাকেন। আনন্দর জানা আছে, কখন কী প্রোগ্রাম। সেটা এসে দেখে চলে যায়। দুর্জোর অতটা মনে থাকে না কিন্তু গোপা বা অরিন্দমবাবু জানেন, কোনটা দুর্জো দেখে—এখান থেকেই তাকে ডাকেন।

দুর্জো তার ঘরে দিদির কাছে টাস্ক করতে-করতে বলে, 'দিদি, তুই ত কাল থেকে টিভি করবি রোজ সন্ধ্যাবেলায়, তখন আমার টাস্ক করে দেবে কে?'

আনন্দ হেসে ফেলে, 'তোর মাথা খারাপ! রোজ টিভি করব মানে?'

দুর্জো বলে, 'তুই ত বললি কাপড়কাচা সাবানের বিজ্ঞাপন করবি। বিজ্ঞাপন ত রোজই হয়, সিরিয়্যাল না-হয় সপ্তাহে একদিন হয়। দিদি, তুই সিরিয়্যালই কর রে। নইলে আমাকে স্কুলে শাস্তি পেতে হবে।'

আনন্দ আরো হেসে বলে, 'যারা বিজ্ঞাপন করে তারা কি রোজ টিভি স্টেশনে গিয়ে করে নাকি?'

'তবে?'

'সিনেমার মত তুলে রাখে, তারপর দেখায়।'

'মানে, তুইও দেখতে পারবি?'

'পারবই ত! তোলার সময়ই নাকি বারবার দেখা হয়। ভাল না হলে ক্যানসেল। কাল ত আমার স্ক্রিন টেস্ট।'

'স্ক্রিন টেস্ট মানে? ক্রিকেটের স্ক্রিন? যেটা গাভাসকার সরাতে বলত সব সময়?'

'কী করে?'

আনন্দ এটা একটা জানা দৃশ্য দেখার জন্যেই বলেছে। আনন্দ বসেছিল চেয়ারে। দুর্জো যে-খাটে শোয় সেই খাটের উপর বসে পড়ছিল। দিদির কথায় সে মুহূর্তে উঠে দাঁড়ায়। গাভাসকারের ভঙ্গিতে ব্যাট স্টান্স করে আর ফিরে-ফিরে তাকায় যেন দূরের কোনো স্ক্রিনের দিকে। চোখ কুঁচকে নয়, ভুরু দুটো টানটান রেখে আর বাঁ হাতটা একটু ডাইনে সরায়, একটু বাঁয়ে সরায়।

আনন্দ হেসে ওঠে, 'তোকে মাইম শেখাব।'

'আচ্ছা দিদি বল ত এটা কার বোলিং?' দুর্জো মেঝেতে নেমে গিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দৌড়ের ভঙ্গি করে যেন রান আপ নিচ্ছে। শার্টের ওপরের বোতাম খোলা, চওড়া কাঁধ পাখির মত ছড়ানো, এদিক-ওদিক করতে-করতে ছুটে আসছে, মুখটা চেতানো, উইকেটের কাছে এসে বলটা ছোঁড়ে। তারপর ঐ এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ক্যাপটেনের কাছ থেকে বলটা নিয়ে প্যান্টের সামনে মুছতে-মুছতে রান-আপের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়।

'বল্ দিদি কে?'

আনন্দ স্মিত মুখে বলে, 'মার্শাল।'

'আচ্ছা, এবার এইটা বল্।'

'দুর্জো, এরপর তোমার ঘুম পাবে। টাস্ক না হলে কাল কিন্তু ব্যাড মার্ক পাবে।'

'দিদি, প্লিজ, একটা, একটা দেখাব।'

আনন্দেরও ত ইচ্ছে করে দেখতে। বলে, 'আচ্ছা, তোরটা দেখালে দেখব।'

'না, না, ওটা দেখাব না।'

'তা হলে দেখব না।'

'ওটা ত তুই জানিসই দুর্জোর। তা হলে মজা হবে কী করে?'

'দুর্জোর উইকেট কিপিং আমার অত ভাল লাগত বলেই ত তোর নাম দিয়েছিলাম দুর্জো।' আনন্দর কথা শেষ হওয়ার আগেই দুর্জো, দুই পায়ের পাতার ওপর উবু হয়ে বসে দুলতে থাকে আর হঠাৎ বাঁ হাতটা সামনে বাড়িয়ে সাঁ করে স্লিপ খেয়ে সর সর করে চলে যায় দিদির ঘরের ভিতর।

আনন্দ হেসে উঠেও বলে ওঠে, 'এই, দুজোঁ, লাগবে!'

দিদির ঘর থেকে দুজোঁ বেশ বাহাদুরির ভঙ্গিতে ফিরে এলেই আনন্দ বলে, 'এই, ব্যস, এবার বসো।'

দিদির সামনে টাস্ক শেষ করার জন্যে বসতে-বসতে বলে, 'আচ্ছা দিদি, টিভিতে ত দেখায় প্লেয়ারদের মা, বাবা, বউ, ছেলে সব গ্যালারিতে আছে। তা হলে দুজোঁ ধর এ-রকম একটা বডি থ্রো দিয়ে বলটা বাঁচাচ্ছে, তখন কি ওর দিদি বলে উঠবে, এই দুজোঁ, লাগবে।'

'দিদি বলবে হয়ত, কিন্তু দুজোঁই শুনতে পাবে না।'

'কেন?'

'গ্যালারি থেকে মাঠটা অনেকটা দূর। অত দূরে কী করে দিদির গলা পৌঁছবে?'

'বাঃ, তুমি কিছু জানো না। গ্যালারির আওয়াজ খেলোয়াড়রা শুনতে না পেলে ওরকম গ্যালারির দিকে ফিরে মাঝেমধ্যে হাতজোড় করবে কেন? গ্যালারির আওয়াজ শোনার জন্যেই ত খেলোয়াড়রা খেলে। আচ্ছা, দিদি তুই আমাকে দুজোঁ নাম দিলি কেন? দুজোঁ কি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট? মানে ফুটবলের পেলের মত?'

'ধুত, আমার দুজোঁকে ভাল লাগত তাই আমি আমার ভাইয়ের নাম দিলাম দুজোঁ। তোর ভাল লাগে না?'

'তোর কী মজা দিদি। তোর ভাই আছে তাই নাম দিতে পারলি। কিন্তু আমার ত ভাই নেই, আমার দিদি।'

'তুই তা হলে তোর দিদিরই নাম দে।'

'সে ত তোর নাম আগে থাকতেই ঠিক হয়ে আছে-- কী করে দেব?'

আনন্দকে যে কথাটা বলার জন্যে গোপা ডেকেছিলেন, সেটা আনন্দকে বলার আগেই অরিন্দমবাবুকে বলে ফেলেন— 'দেখো, সন্ধেবেলায় বাবলি দুজোঁকে কী বলছিল, ওকে নাকি লিরিলের মেয়েটার মত করতে হবে।'

'লিরিলের মেয়েটার মত মানে?'

'লিরিল সাবানের সেই মেয়েটা, স্নান করছে দেখায় না? তার ত সুইমিং কস্টিউম মাত্র পরা থাকে।'

'ও? লিরিল? সেই গায়ে মাখা সাবান? আরে না, না।'

'কী? না না? সন্ধেবেলায় বলছিল ত ভাইকে।'

'আরে কী শুনতে কী শুনেছ? শোনো, ইচ্ছে হলেই সুইমিং কস্টিউম পরে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানো যায় না। তার জন্যে অন্য ট্রেনিং, অন্য ব্যাকগ্রাউণ্ড দরকার। তোমার মেয়ে তা পারবে না। আর স্নানের দৃশ্যে সুইমিং কস্টিউম পরা খারাপ দৃশ্য হবে কেন? পুরীতে শাড়ি পরে বাঙালি মেয়েরা স্নান করে আর সেটা ঢেউয়ে মাথার ওপর উঠে যায়, সেটা বুঝি খুব ভাল দৃশ্য?'

'তুমি শুভমের সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে পারো।'

'আরে, কাল ত মোটে স্ক্রিন টেস্ট। আর এ-সব কথা কারও সঙ্গে বলা যায় না। তুমিই ত পারমিশন দিলে বাবলিকে, আমি ত প্রথমে কিছু বলিই নি।'

'না, তুমি আমাকে ত বলেছিলে যে এ-রকম টিভি-অ্যাড করলে তোমার আপত্তি নেই।'

'আমার ত নেই-ই। কিন্তু তুমি ত তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ভিতর ওপিনিয়ন পোল করেই শুভমকে মত দিয়েছ?'

'না, আমি ত তোমার কাছে কিছু লুকোইনি। আমার ভালই লাগে মেয়েরা এ-রকম সব কাজ করলে। ওদের এক ধরনের মুখ দরকার, শুভমের মনে হয়েছে বাবলির সে-রকম মুখ আছে, তাতে আর আপত্তির কী আছে? কিন্তু ও সব সুইমিং কস্টিউম আমার ভাল লাগবে না। তাতে সমাজে সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। এখন যেমন স্ক্রিন টেস্টের কথাতেই মেয়ের প্রেস্টিজ বেড়ে গেছে। মিসেস সেনগুপ্ত, আজ দুপুরে এসে আমাকে ত অস্থির করে তুললেন, কী ভাবে বাবলি চান্স পেল। আমি যত বলছি— এটা আমাদের এক আত্মীয়ের ব্যাপার, সে এই সব ফিল্ম তুলে থাকে, তার মনে হয়েছে বাবলির কথা,

তাই বাবলিকে স্ক্রিন টেস্ট করাবে, এখনও চান্স পায়নি। কিন্তু উনি কি আর সে-কথা শোনেন? শুভমের ঠিকানা চান, ফোন নাম্বার চান।'

এই পর্যন্ত বলে গেপো খিলখিল করে হেসে ওঠেন, টিভিতে এক ঘরপোড়ানো অগ্নিশিখা তখন ধীরে-ধীরে ক্লোজ-আপে আসছিল, পেছনে আগুনের আওয়াজ বোঝানোর মত একটা ধ্বনিও ক্রমোচ্চ হচ্ছিল। সেই ক্রম-ক্লোজ-আপ আগুনের শিখা শাদা দেয়ালে, মোজাইক মেঝেতে ও স্বামী-স্ত্রীর মুখে-অবয়বে লেলিহান হয়ে উঠছিল। আগুনসমর্থক ধ্বনি চাপা পড়ে যায় গোপার নিভৃত হাস্যধ্বনিতে, 'কার জন্যে জিজ্ঞাসা করলে না?'

'ওঁর মেয়ের জন্যে নিশ্চয়ই।'

'ওঁর নিজের জন্যে।'

'বল কী?'

'আমি ত বিশ্বাস করতেই পারিনি। বলছেন-কেন বয়স্কা মহিলার পার্ট ত সব সিরিয়্যালেই থাকে। উনি নাকি ইন্দোনেশিয়ায় অভিনয় করে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন।'

'ইন্দোনেশিয়া কেন?'

'ওঁর স্বামী ফরেন সার্ভিসে ছিলেন।'

'তা হলে ত একেবারে বিলেত ফেরত।'

'কাল ত ঐ টেস্ট, কী বললে, সেটাতে কী দেখবে?'

'আমি ঠিক জানি না-তবে ক্যামেরায় নাকি সবার মুখ একরকম আসে না। সেই সব পরীক্ষা কবে বোধহয়, স্ক্রিনে কাকে কী রকম দেখাবে?'

'তা হলে আমরা যে এই সব ছবি দেখি, আসলে এরা এ-রকম দেখতে নয়? বাবলিকেও অন্য রকম দেখাবে?'

'এগুলো ত যন্ত্রপাতির ব্যাপার। আলো আছে, ক্যামেরা আছে, আরো কী সব আছে। সে-সব টেস্ট করে নেবে হয়ত!'

'তারপর যদি না হয় তা হলে ও ত মেয়ের মন খারাপ। এত জনকে না জানালেই হত-সবাই ত আবার খবর শুরু করবে।'

'সে ত একটু মনখারাপ হতেই পারে। ছেলেরা যে চাকরির জন্যে এত ইণ্টারভিউ দেয়, সবাবই চাকরি হয় নাকি?'

'এটা কি একটা চাকরির ব্যাপার নাকি? এরপর ও এইসব বিজ্ঞাপনের ছবিই করবে?'

গোপার কথায় অরিন্দম এবার একটু বিরক্তই হন হয়ত। টিভির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতক্ষণ যে তাঁরা কথা বলছিলেন, তার মধ্যে টিভির একটা প্রোগ্রাম বোধহয় শেষ হয়েছে। ঘোষিকা খুব ঠাণ্ডা গলায় স্পষ্টস্বরে পরবর্তী প্রোগ্রাম ঘোষণা করছিলেন। এই মেয়েটিকে দেখতে খুব ভাল লাগে, হাসিটা মুখের সঙ্গে লাগানো যেন। বাড়িতে কেউ এলে দরজা খুলে যে-রকম স্বাভাবিক উৎসাহের সঙ্গে একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয় মেয়েটির কথা ও হাসি অনেকটা সে-রকমই।

'এ-রকম অ্যানাউন্সারের কাজ পেলে বেশ ভাল হত। বিজ্ঞাপনে কখন কী করতে হয় কিছু ঠিক নেই।' গোপা টিভির দিকে তাকিয়ে বলেন।

'আরে, তুমি এতটাই ভেবে ফেলেছ নাকি? তা হলে ত শুভমকে না করে দিলেই হত। এখনো না করে দিতে পারো ত—। জিজ্ঞেস করো বাবলিকে।'

'না, না। না করার কী আছে? চান্স একটা পেয়েছে যখন চেষ্টা করাই উচিত। তা ছাড়া টিভিই ত। এ ত আর সিনেমা নয়, মানে, সিনেমায় যে-সব বিজ্ঞাপন দেয়।'

'শুভম এসে বলল ওরা একটা লোক্যাল ডিটারজেন্ট কোম্পানিকে বোধহয় বুঝিয়েছে, টিভিতে বিজ্ঞাপন দিলেই 'নিরমা'র মত বিক্রি বেড়ে যাবে। সে একটা ছোট বিজ্ঞাপন দেবে। শুভমরা বন্ধুবান্ধব মিলে করছে। আমাকে কী সব বোঝাল জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে ডিটারজেন্টের বিজ্ঞাপন করবে। সেই কবিতাটার সঙ্গে নাকি বাবলির মুখ মিলবে ভাল। এইসব!'

'জীবনানন্দের কবিতা দিয়ে কাপড় ধোয়া হবে?'

'ঐ শাদা দেখাবে বোধহয়, শাদা হাঁসটাস দিয়ে,' অরিন্দম ডাকেন, 'বা-ব-লি।'

আনন্দ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পারার পর অরিন্দম বলেন, 'শুভম কী লিখে দিয়ে গেছে না, দে ত!'

'ঐ ত কবিতার দুটি লাইন।'

'দেখি, দে ত।'

আনন্দ খুক করে একটু হাসে, 'ও আবার দেখবে কি বাবা? কবিতার দুটো লাইন, জীবনানন্দের—'

'তোর মনে আছে?'

'হ্যাঁ-আ।'

'সামনে আয়, বল না।'

বাবার কথায় মেয়ে সামনে আসে বটে কিন্তু মেঝেতে একটু পা ঘষে, 'ধুত, ও আবার বলার কী? নিশ্চয়ই মা তোমাকে বলেছে।'

গোপা একটু হেসে বলেন, 'সবই মায়ের দোষ!'

অরিন্দম বলেন, 'আচ্ছা, তুই কোন কবিতাটা বল্, দেখি আমার মনে আছে কী না।'

'কবিতার ত নাম নেই।' তারপর মা-বাবার খুব কাছে দাঁড়িয়ে, টিভিতেও একটা পারিবারিক নাটকে স্বামী-স্ত্রী কোনো ভুল বোঝাবুঝির চাপা উত্তেজনার সংলাপ ও চাপা আলোক-বিচ্ছুরণের মধ্যে আনন্দ একটু সুর দিয়ে বলে যায়, 'দেখিবে মেয়েলি হাত সকরুণ— শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে/শঙ্খের মত কাঁদে; সন্ধ্যায় দাঁড়াল সে পুকুরের ধারে,/খইরঙা হাঁসটিরে নিয়ে যাবে যেন কোন্ কাহিনীর দেশে '

আনন্দ থামার সঙ্গে-সঙ্গে টিভির মেয়েটি একটা চাপা বিদ্রোহে কথা বলে ওঠে, ওদের ভুল বোঝাবুঝির কোনো নিষ্পত্তি ঘটল না এবং অমীমাংসিত থেকে যেন বেড়েই গেল। ছেলেটি হঠাৎ একটা কাচের গ্লাস টেবিল থেকে তুলে মেঝেতে ছুঁড়ে মারে। মেয়েটির, 'মেঝেতে কেন, আমাকে মারলেই পারতে, তোমার বীরত্ব ঠিকভাবে প্রকাশ পেত', এই হিন্দি সংলাপটা সহজেই বোঝা যায়। সেই সংলাপের শেষে গোপা বলেন, 'তোকে কি কবিতাটা বলতে হবে নাকি?'

'না, না, ঐ ত কতকগুলো মুভমেন্ট শুধু। দেখো, কাল পাশ করি কিনা, তার পরে ত!'

'এর ভেতর কাপড় কাচার কথা এল কোথায়?'

'সেটা যারা বানাবে তারা জানে, আমাকে জিগগেস করছ কেন? মা, ভাইকে খেতে দাও, ঘুমিয়ে পড়বে।' আনন্দ চলে যায়। গোপা ওঠেন-ছেলেকে ভাত দিতে। খুব সকালে স্কুল—তাড়াতাড়ি না ঘুমোলে সকালে উঠতে পারবে না। গোপার দিকে মুখ তুলে অরিন্দম বলেন, বলতে গিয়ে হেসে ফেলেন, 'শুভম বলছিল বাবলির মুখ নাকি জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে মিলে যাবে, তাই বাবলির কথা মনে হয়েছে।' গোপা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, 'সেটা আবার আলাদা কোনো মুখ নাকি? তাহলে কাল চীনে বিউটিসিয়ানের কাছে নিয়ে যাচ্ছে কেন? তারা জীবনানন্দের মুখ বানায় নাকি?' পেছন থেকে অরিন্দম বলেন, 'আসলে, ওদের ত পয়সা নেই, বাবলিকেও অত পয়সা দিতে হবে না। তবে ছেলেদের উৎসাহ খুব। ঐ সব শাঁখা, শঙ্খ, হাঁস দিয়ে ঐ সাবানে কাপড় কত শাদা হয় দেখাবে।'

রান্নাঘরে ঢোকার আগে দরজা থেকে মুখটা ঘুরিয়ে গোপা বলেন—'ডায়ালগটা বাবলির মুখে দিলেই পারত। ডায়ালগ ছাড়া কী রকম খালি-খালি লাগে।' গোপা রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

দুজোর সঙ্গে গোপা আনন্দকেও ভাত দিয়ে দেন। আনন্দ বলে, 'সে কী, আমি খাব কেন? আজ ত অস্‌কার দেখাবে, মাইকেল জ্যাকসন গাইবে।'

'আমিও দেখব, দিদি', দুজো বলে।

'সে কী? তুই জানিস নাকি মাইকেল জ্যাকসন কে?' অরিন্দম ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

বাবা যে কী বলে-না। মেয়েদের মত ত। গান গায়। দিদি, একটা শোনা না বাবাকে!'

'সে কী? বাবলি কি মাইকেল জ্যাকসনের গানও জানে নাকি?' অরিন্দমের বিস্ময়ে বাবলি হাসে।

অনেক রাতে, গোপা বিছানা থেকে নামেন। অরিন্দম একটু আগেও গল্প করছিলেন। এখন বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। বা হয়ত ঘুমুচ্ছেনও না। কোনো কোনোদিন এ-রকম হয়—কিছুতেই ঘুম আসতে

চায় না। তাঁদের এই ফ্ল্যাটটায় এই একটাই অসুবিধে। একটু বারান্দামত কোনো জায়গা নেই। বসার জায়গায় গিয়ে খাওয়ার টেবিলে বোতল থেকে গলায় একটু জল ঢালেন গোপা। তারপর, আঁচল দিয়ে গলার ওপর পড়া জলের ফোঁটা মোছেন। মোছার পরও আঁচলটা ওখানেই থাকে। পা-পা করে মেয়ের ঘরের পর্দাটা একটু তুলে ভিতরে ঢোকেন। আগে পাশের ঘরে যান। ছেলে হাত-পা মেলে উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। মশারির তলা দিয়ে গায়ে হাত দেন। তাবপর হাত বের করে নিয়ে মশারিটা গুঁজে দেন। মেয়ের ঘর দিয়ে বেরবার মুখে একটু দাঁড়িয়ে মেয়ের মশারির কাছে দাঁড়ান। মশারির জালের ওপাশে বাবলিকে সুখস্বপ্নশয়ান মনে হল। ঠিক কাত হয়ে নেই—মুখটা সোজা, শরীরটা একটু এদিকে কাত। গোপা ওখানে দাঁড়িয়ে দেখতে চান—তাঁর চব্বিশ-পঁচিশ বছরের মেয়ের কোন মুখটাকে জীবনানন্দের মুখ বলে ওরা চিনে নিল? কাল সকালেই ত 'ফেসিয়াল' করতে নিয়ে যাবে। ওরা যে মুখটা চায়, ফেসিয়ালে নাকি সেই মুখটা আবো ফুটে বেরবে। সেই ফুটে বেরনো মুখটাই ত তখন সবাই দেখবে। কিন্তু সে-মুখটা ত এই মুখের ভিতবেই কোথাও লুকনো আছে—সেই মুখটা কি এখন দেখতে পাবেন গোপা? তাব মেয়ে ও চব্বিশ বছরের সঙ্গিনীর সেই আদি মুখটা?

গোপা নিঃশব্দে সরে আসেন। আবার এক ঢোক জল খান। আবার গলায় জলের ফোঁটা মোছেন। আনন্দব পনের-ষোল বছর বয়সে দুজোঁ গোপার পেটে আসে—মেয়ের কাছে সে কী লজ্জা গোপাব! কিন্তু ভাই হওয়ার আনন্দে বাবলি তাব লজ্জা কোথায় দূর করে দিল। দুজোঁকে বাবলি ত মায়ের মতই দেখে। বরাবার। সেই বয়স থেকেই।

এইসব এলোমেলো ভাবতে-ভাবতে গোপা সোফায় গিয়ে বসেন। অন্ধকার হলঘবে টিভির পর্দায় একটু পিচ্ছিলতা। ওখানেই জীবনানন্দের মুখ হয়ে তাঁব মেয়েব ও সঙ্গিনীর মুখ ভেসে উঠবে, কবিতার চরণ বলা হবে।

আর, গোপা তখন ভাবতে চাইলেন না কাপডকাচা পাউডারের কথাটাও থাকবে।

সে ত থাকবেই—এটা ত বিজ্ঞাপনেবই ছবি।

শওকত আলী

রঙ্গিনী

নটবর সাহাব দোকানে সারাদিন বসে রয়েছি। ইচ্ছে ছিলো, বৃষ্টিটা ধরে এলে পীরগঞ্জে চালকলের মালিকেব কাছে যাবো। যদি মওকা পাই তো পঞ্চাশ যাট বস্তার একটা ব্যবস্থা করে আসবো। মালিক আশা দিয়ে গেছে, নিজের বুদ্ধিতে যদি বর্ডার থেকে কিছু বেশি মুনাফা আনতে পারি তাহলে তাতে আমারও আধা শেয়ার থাকবে।

সেই আশায় বসে আছি দুদিন ধরে। সেই মঙ্গলবাব বেরিয়েছি, আজ বৃহস্পতিবাব। দুদিন ধরে গাড়িটা খোঁটায় বাঁধা বেওয়ারিশ গরুর মত খোলা মাঠের মাঝখানে জবুথবু হয়ে ভিজছে। বনেটের ওপর যদিও তিরপাল ঢাকা, তবু নিশ্চিত জানি দুদিন বৃষ্টিতে ভিজে ইঞ্জিনেব গায়ে লালচে রঙের মবচে ধববে। গরুব যেমন বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ করে, গাড়িরও তেমন অসুখ কববে। কিন্তু উপায তো কিছু নেই। কি আর করা যাবে।

এক উপায় ছিলো। সোজা পীরগঞ্জে গিয়ে হলট্ কবা। তারপর ফাঁক বুঝে চালের বস্তা নিয়ে এক পথে এসে রাতারাতি বর্ডার পেরুনো। উপায় ছিলো, কিন্তু সাহস হয়নি। বাইরেব গাড়ি, ফুল-লোড

চাল নিয়ে এপথে আসবে হাটুয়ে মানুষের চোখের ওপর দিয়ে তা কি আর মানুষের চোখে পড়বে না! দু দুখানা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাট পার হয়ে যেতে হবে, তখন যদি কেউ পিছু নেয়! তখন তো রাজ্যের ঝামেলা। ফুড-ইন্‌সপেক্টর, থানা, পুলিশ, উকিলের পেছন পেছন দৌড়াদৌড়ি তার ওপর আবার মালিকের মুখ-খিস্তি।

সেই জন্যেই সাত পাঁচ ভেবে এমনি বসে রয়েছি।

যদি গাড়ি ভালো থাকতো, যদি কারবুরেটরটা অমন ট্রাবল না দিতো। কিম্বা গীয়ার বক্সটা অমন জখম না থাকতো তাহলে চেষ্টা করে দেখতাম, অন্তত ভয়টা কম হতো। ঝড়-বৃষ্টি জল-কাদা মানতাম না। রাতারাতি যেতাম, রাতারাতি চলে আসতাম। কিন্তু খোঁড়া গাড়ি নিয়ে সে সাহস করতে যাওয়াই তো বোকামী! বসে বসে অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি!

বুঝতে পারছি অন্যান্য বার যা হতো এবার তা হচ্ছে না। অন্যান্য বার এমনি কপাল হাতে করে আসমানের মুখ চেয়ে বসে থাকতে হতো না। একদিন কি জোর দুদিন, এরই মধ্যে নটবর সাহার মুদীখানার পেছনের খুপড়িতে বসে বসে শলা পরামর্শ হতো, সুযোগ সন্ধান চলতো, দেনা পাওনা মিটতো। তারপর সোজা পীরগঞ্জ। সেখান থেকে ট্রাক বোঝাই চাল নিয়ে রাতারাতি পাড়ি। রানী সংকৈল-হরিপুর বর্ডার দিয়ে নয়তো আরো উত্তরে পুর্ণিয়া রোড ধরে। এবার তা হচ্ছে না। হয়তো, যদি বৃষ্টি না নামতো, যদি গাড়ি জখম না থাকতো।

এখন আমি শালা আলসে বড়লোকের মত নটবার সাহার গদিতে বসে আয়েস করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। দোকানটা যেন আমারই, যেন আমার অন্য কোন কাজ নেই।

নটবর কাল থেকে বিরক্ত হতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝেই বলছে, এ বিষ্টি ছাড়বে না হে। চলে যাও। দেরী করে লাভ কি?

কিন্তু আমি কেমন করে যাই। যতো বিরক্তই হোক, ও-শালা কি বোঝে গাড়ির! মাঝপথে গাড়ি কাদায় আটকালে ও তো আর আসবে না গুড়ি তুলে দিতে। মরবো তো আমিই।

আমি জানি ওর অমন উসখুশির কারণটা কি। কেন ও অমন ভেতরে ভেতরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারণ জানি বলেই আমার মজা লাগছে লোকটার অবস্থা দেখে। তাই জুৎ করে গদীতে এসে বসছি। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবেলা এসেছি, আর বুধবার সকাল থেকেই তেল-কালি মাথা প্যাণ্ট আর গোলগলা গেঞ্জী ছেড়ে পাজামা সার্ট পরছি। হাতের কব্জীতে ঘড়ি বাঁধতে ভুলি নি। অনেকক্ষণ ধরে নিখুঁত করে দাড়ি কামিয়েছি। মাথার চুল আঁচড়াচ্ছি পরিপাটি করে। তাক বুঝে খুশবুদার সিগ্রেট ফুঁকছি।

অন্যান্যবার নটবর দিল-খোলা আলাপ করে। বছর দুয়েক হলো ছেলেবউ হিন্দুস্থানে রেখে এসেছে। অন্যান্যবার আমি এলেই মেয়ে মানুষের গল্প করতো। নতুন কোন মেয়ের সঙ্গে ফূর্তি জমবার চেষ্টায় আছে, কার বউ রাতের বেলা স্বামীর বিছানা ছেড়ে ওর বিছানায় এসে শুয়েছে, কোন বিধবা যুবতী কখন ওকে কী ইঙ্গিত করেছে—এইসব আজগুবি গল্প শোনাতো। বলার সময় ওর কেমন গর্ব হতো। দেখতাম, ওর চোখে মুখে অশ্লীল গর্বের জৌলুস জ্বলজ্বল করছে।

এবার কিন্তু তেমন দেখিনি। পয়লা রাতে ও কারুর গল্প করলো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল উসখুশ করলো। ঘুমলো না। আমি দেখলাম, অবাক হলাম। পরে অবশ্যি ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে। বুঝেছি ওর উস্‌খুশির কারণটা কি।

নটবরের চুলে পাক ধরেছে। ভুঁড়িটা দেখতে বিশ্রী রকমের লাগে। গোলগাল নয় ঠিক, সামনের দিকে কিছুটা ঠেলে বেরিয়ে আসা। একটা মাংসপিণ্ড যেন প্রবল শক্তিতে পেটের ভেতর থেকে সুমুখের দিকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ হলো। কিন্তু তাতে কি নটবর বয়সের কথা ভাবতে চায় না। রসালো আলাপের আসরে এখনো সে হাসতে হাসতে গলে যায়। এখনো ওর মনের ভেতরে রসের চুসকুঁড়ি বুড়বুড়ি কাটে। বেহাটের দিনে কোন সাঁওতাল যুবতী ওর দোকানে সওদা করতে এলে ফাঁক বুঝে গালে টোনা মেরে হাসতে সে ভুল করে না।

এসব আমার নিজের চোখে দেখা। কেষ্টদাস বাবাজির আখড়ার মেয়েরা এপথে হেঁটে যাবার সময়

নটবরের কৃষ্ণপ্রেম উথলে ওঠে। ভাবে আত্মহারা হয়ে চণ্ডীদাসের পদ গেয়ে উঠতে তার ভুল হয় না, 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব'। যদি মেয়েদের মধ্যে কেউ অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়েছে তো নটবর সাহা চোখের ইশারা করতে দেরি করে নি। আশেপাশের গ্রামের সব বাড়িতে ওর অবাধ গতি। যুবতী বিধবা মেয়েদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক পাতানো চাই। কারুর মামা, কারুর কাকা, কারুর পিসে, কারুর মেসো। সধবা মেয়ে ছাড়া কারুর সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্ক পাতায় না। এসব দিকে খুব হুঁশিয়ার নটবর।

আমি ওর এসব ব্যাপার ভালো করে জানি। ভেবেছিলাম, একই রকম দেখবো ওকে এবারও। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। হাসিখুশি অমন ফুর্তিবাজ লোকটা বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। গত দুদিনে মেয়ে খদ্দের এসেছে তার দোকানে, কিন্তু নটবরের সেদিকে যেন খেয়ালই নেই। মেয়ে মানুষ দেখলেই যেমন আগে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে যেতো এখন আর তেমন দেখলাম না।

মনে হচ্ছে, মনের ভেতরে ভেতরে মানুষটা কোথায় একরোখা হয়ে রয়েছে। বুড়ো জেদী ঘোড়াব মত দেখতে লাগছে। একেক সময় সর্বক্ষণ বুকের ভেতরকার অস্থির একটা দাপাদাপি অতিকষ্টে চেপে রাখছে আর থেকে থেকেই উসখুশ করে উঠছে। আমি রয়েছি বলে স্বস্তি পাচ্ছে না একবিন্দু।

ওর এই অস্বস্তির কারণটা আমার কাছে এখন পরিষ্কার। আর সেজন্যেই মজা লাগছে। আধবয়সী মানুষটা কেমন অস্থির ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে অথচ মুখে কিছুই বলতে পারছে না দেখে আমার সময় সময় হাসি পাচ্ছে। জুত করে বসে বসে সিগ্রেট ফুঁকছি আর মনে মনে হাসছি।

এবার এসে নতুন জিনিস দেখলাম। আব তাই দেখে পরিস্কার বুঝতে পারছি ওব এখনকাব উসখুশির কারণ কোথায় লুকনো, আমি এখানে রয়েছি বলে কেন ও বিরক্ত হচ্ছে। অন্যান্য বার এমন হতো না। অবশ্যি অন্যান্য বার এমন দুতিন দিন ধরে ওর ঘাড়েব ওপর চেপে বসে থাকিনি। সন্ধে বেলা এসে একটা রাত থেকে পরের দিন বিকেলে পথে নেমেছি। ঐ এক রাতের মধ্যেই দেখেছি মেয়ে মানুষের দরকার হলে আমাকে গদিতে এসে শুতে হতো। আমার কাছে লুকোত না। লুকোবাব প্রয়োজন বোধ করতো না হয়তো। যেসব মেয়ে মানুষ ওর ঘবে এসে শুতো, তাদেরকে পাবার জন্যে তার কোন ভাবনা ছিলো না, খবর দিয়ে পাঠালেই এসে রাত কাটিয়ে যেতো।

নটবরের কী ভব্যতা জ্ঞান! আমাকে ও বলেছে কতোবার, মিস্তিরি তোমার দবকার থাকে তো বলো।

আবাব এও দেখতাম, একেকদিন ক্লান্ত আর বিবক্ত হয়ে পড়তো মানুষটা। নিজেকেই গালাগাল দিতো। বলতো, দ্যাখো মিস্তিরি কী বাজে নেশায় মজে নিয়েছি। মেয়ে মানুষগুলো কাদাব মতো গায়ে গায়ে লেগে থাকতে চায়। একটু লজ্জা থাক। বাজারের হলেও, মেয়ে মানুষ তো, কাঁহাতক ভালো লাগে, দিনের পর দিন একই রকম।

আমি তখন শুনেছি শুধু, কিছু বলিনি। লোকটা দিনের পর দিন ঐ একটা নেশাতেই মেতে আছে, বিরক্তি লাগবারই কথা। আমাব নিজেবই মদের নেশার জন্য কতো খারাপ লাগে সময় সময়। একই ঝাঁঝ ঝাঝ উত্তেজনা, শরীরেব ভেতরে ভেতরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে, মাথার ভেতবটা ভাবী হয়ে উঠছে, তাব পরের দিনে তেতো স্বাদের ভোরবেলা। একই রকম—একই রকম, দিনের পরদিন শুধু একই রকম ও কি ভালো লাগে?

তবে নতুন কিছু হলে মন্দ লাগে না। যেদিন মালিক বিলিতী জিনিস খাওয়ায় সেদিন নতুন স্বাদ মেলে, তেষ্টা নিভতে চায় না বুকের ভেতরে কী যেন হা হা করে ওঠে। বুঝতে পাবি, নটবরেরও হয়েছে সেই অবস্থা। একটা কিছু নতুন ব্যাপার ঘটেছে। যেখানে দিনের পব দিনেব পুরনো আর বিরক্তিকর অভ্যাসের বাইরে নতুন কিছু উত্তেজনার স্বাদ পেয়েছে লোকটা।

সেটা যে কি বস্তু প্রথম দিনেই চোখে পড়েছে আমার। হাটের কাছে গাড়ি থামিয়ে নামতেই দেখি নটবব দোকানে একটা রসবতী যুবতী মেয়ের সঙ্গে মস্করা কবছে। হ্যাঁ, বসবতী কথাটি তখনই মনে পড়েছিলো আমার। কথাটা শোনা ছিলো, কিন্তু তখনই প্রথম মনে হয়েছিলো বসবতী মেয়ে এইরকমই হবে। দোকানেব কাছাকাছি দ্বিতীয় প্রাণী ছিলো না। মেয়েটা খোলা রাস্তায় রাখা নুন হাতে নিয়ে

ছিটোচ্ছে নটবরের গায়ের ওপর আর খিলখিল করে হেসে যাচ্ছে, নটবর ধমক দিচ্ছে, কিন্তু সেদিকে কোন পরোয়া নেই মেয়ের।

অজ পাড়াগাঁয়ে বেহাটের দিনে হাটের মাঝখানে যে একখানা মোটর গাড়ি এসে থামলো, একজন শক্তসমর্থ পুরুষ মানুষ যে সে গাড়ি থেকে নামলো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত করলো না মেয়েটা। সে তখন হাসছে আর দেখছি শাড়ির আঁচল-ঢাকা আদুল গায়ের ওপর দিয়ে পুরুষের বুকে জ্বালা ধরানো ঢেউ দুলে যাচ্ছে। পুরুষ মানুষের বুকের ভেতরকার যতো থরথর অস্থির পিপাসা—তাই যেন হাসির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার শরীর ঘিরে ঢেউয়ের মতো দুলছে।

একবারে দোকানের ঝাঁপের নীচে গিয়ে দাঁড়ালে তবে মেয়েটা মাথায় কাপড় তুলে ধীরে ধীরে সরে গেলো। তারপর আমাকে দেখতে পেলো নটবর। ডাকলো, আরে মিস্তিরী যে—এসো, এসো, তা কেমন আছো।

আমি তখন পেছন ফিরে লক্ষ্য করছি। মেয়েটা কোথায় যায় দেখি। দেখলাম হাটের পাশে রামদাস ঝাড়ুদাবের বাসা ছিলো, সেই বাসায় গিয়ে ঢুকলো।

নটবরের কুশল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, রামদাসের মেয়ে নাকি?

না রামদাসের মেয়ে নয়, নটবর পরিচয় দেয়, একমাস হলো রামদাস হরিপুর হাটে ডেরা বেঁধেছে। নগেনদাস এসেছে নতুন ঝাড়ুদার, তারই বউ।

তা ভালো, আমার হাসি মুখে হাসি ফুটেছে তখন। জানতে চেয়েছি, নগেনদাসও কি বুড়ো হাবড়া নাকি?

আরে না না, নটবর আশ্বস্ত করতে চেয়েছে, বুড়ো হবে কেন সুস্থ জোয়ান তাগড়া মানুষ পালকী বয়ে বেড়ায় রাত বিরেতে, মাঝে মাঝে একদিন বাড়ীতে ফেরেই না, মেয়েটা একলা একলা ঘরে থাকে। কথা বলার লোকজন নেই, বুঝতেই পারো কী অবস্থা। মেয়ে মানুষ হলেও মানুষ তো, সেজন্যেই মাঝে মাঝে আসে, অন্য কিছু না।

তা আসুক, আসবে না কেন, কিন্তু নটুদা, তুমি শালা মুফোতে ফূর্তি লুটছো মনে হচ্ছে!

আরে না না, কীযে বলো তার ঠিক নেই। সবারই সঙ্গে সবকিছু হয় নাকি? যা দেখলে ওই পর্যন্তই। আসলে জানো মেয়েটার মাথাটাও খারাপ। হেসে হেসে যতো খুশি, যা খুশি কথা বলো, বাড়ীতে গেলে খাতির যত্নও করবে। কিন্তু একটু বেচাল হয়েছো কি টাঙি নিয়ে ছুটে আসবে।

এসব কথা পরশুদিন নটবরের মুখে শুনেছিলাম। দেখছিলাম একখানা কালো চোয়াল-তোলা চৌকোনো মুখ নিঃশব্দে কী করে মনের ভেতরকার লোভটাকে লুকোচ্ছে। ঘষা কাচের মত ঘোলাটে আবিল চোখ দুটোতে কী ভালোমানুষী স্বচ্ছতা আনতে চেষ্টা করছে।

আমাকে বিশ্বাস করাবার জন্যেই কি না কে জানে, শেষটা বললো, জানো আমাকে মেয়েটা ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।

তখন আবার পেছন ফেরে তাকিয়েছি। দেখছি শাড়ির আঁচল লুটছে আমগাছের আড়াল দিয়ে। আমি তখন নটবর সাহার কথা শুনছি, আঁচল দেখছি আর হাসছি।

তুমি বিশ্বাস করো মিস্তিরি, শালী কী হারামী, নটবর তখনও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। আমার কম পয়সা খেয়েছে! একেক সময় মনে হয় ওর পাগলামিটা একটা মস্ত চালাকী, লোক ঠকাবার কায়দা।

এ সবই সেই প্রথম দিন, যেদিন গাড়ি থেকে নেমে দোকানের ঝাঁপের নীচে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর দুদিন ধরে দেখছি। দেখে এখন বুঝে ফেলেছি। এখন বুঝি এখান থেকে শিগ্‌গির সরে না গেলে নটবর স্বস্তি পাচ্ছে না। আমার নজর দেখে এখন ওর বড় ভয়। বড়শিতে গেঁথে মাছকে লম্বা সূতোয় অনেক খেলিয়ে পাড়ে এনে ডাঙায় তুলতে ভয়। যদি এখন অন্য কেউ এসে মাছটাকে আবার ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

দেখেছি মেয়েটা যুবতী। হাটের ঝাঁড়দারের বউ হলে কি হবে। মেয়েটার শরীব পাকা ফলের মতো টসটসে। চামড়ার ওপর ছিলছিলে চেকনাই। আর অমন ঠোঁট, অমন চোখ কোথাও দেখিনি আমি।

কতো শহর বন্দর ঘুরেছি কিন্তু অমন উঁচু বুক, অমন গোলগোল হাত পা আর অমন উরুর গোছা—শালা আমি জীবনে দেখিনি। আমাকে ছোট মালিক বে-সোডা এক গেলাস বিলিতী মদ খেতে দিয়েছিলো একবার। সেই গেলাস খাওয়ার পর আমার আরো খেতে দিয়েছিলো একবার। সেই গেলাস খাওয়ার পর আমার আরো খেতে ইচ্ছে করেছিলো। বুকের ভেতর জ্বালা ধরেছিলো আগুনের মতো, তবু বোতলটার দিকে তাকিয়ে দারুণ লোভ হচ্ছিলো।

এ মেয়েও যেন টলমল কানা-ছলকানো একটা বিলিতী মদভর্তি গেলাস। যা প্রাণভরে খেয়ে নেবার পরও বুক জোড়া পিপাসা হা হা করে ওঠে।

বুঝতে পেরেছি মেয়েটাকে এই হারামজাদা নটবরই নষ্ট করেছে। এতোদিন ধরে নানান কায়দায় ফাঁদে ফেলে এখন ফুর্তি করতে চায়।

সবচাইতে অবাক লাগলো, নগেন দাসকে একবারও দেখলাম না। রঙ্গিনীকে সেদিনও জিজ্ঞেস করেছি, তোর বাড়ির মানুষটা কি এখানে নেই!

আছে তো, রঙ্গিনী জবাব দিতে একটুও দেরী করেনি।

তবে দেখি না কেন?

ওকে দেখার কিছু নাই। আমাকেই তো দেখছেন, কেন আমাকে পছন্দ হয় না?

কথাটা শেষ করতে না করতেই খিলখিল করে হাসিতে ভেঙে পড়েছে রঙ্গিনী।

এমনি মনে হয় মেয়েটা বাচাল। কিন্তু ও যখন চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলে, ওর চোখের ভেতরকার বুনো অন্ধকার তখন পুরুষ মানুষকে ডাক দিতে থাকে। যখন এ অবস্থায় নটবরের মতো মানুষেরা বেতাল মাতাল হয়ে ওঠে, ঠিক সেই সময়ই মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠতে পারে। এমনি অবস্থায় সেদিনও নটবরের কাছে বলতে শুনেছি, কি মহাজন, ভুতু ডাকা কুওার মতোন দেখছো কি গো!

আমি শুনেছি। শুধু শুনিনি। দেখেওছি। অমন চোখা চোখা কথা বলার পরও ফাঁক বুঝে মেয়েটা দোকানঘরের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নটবরকে নিজের নরোম শরীরে হাত বুলোতে দিয়েছে। মিটি মিটি হেসে বলছে, তুমি আমার বুড়ো কেষ্ট গো মহাজন।

নটবর কিন্তু সজাগ, চোখ সজাগ, কাঁন সজাগ। কখন আমি রঙ্গিনীর সাথে কোন কথা বলি।

তবে নটবরকে আমার থোড়াই পরোয়া। ও আমায় কি করবে? ওর সামনেই রঙ্গিনী আমাকে এসে বলেছে, তুমার এ বন্ধুটা বড় বর্কখিল হে, তুমি ওর মতো নহে তো?

না না আমি কেন ওর মতো হতে যাবো। একটা খুশবুদার সিগ্রেট সুমুখে এগিয়ে ধরেছি। নাও খাও।

খুশি হয়েছে মেয়েটা। দামী জিনিস খাও হে তুমি। সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে টানতে তৃপ্তির ভঙ্গী এসেছে মুখে। একটু পর কি ভেবে জিজ্ঞেস করেছে, কি খবর মিস্তিরি। তুমিও কি আমার পিরিতে ফাঁসলে, আমাকে এতো খাতির করছো ক্যানে?

আরে রাম বলো, আমি আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করছি নটবরের দিকে তাকিয়ে। বলেছি, কী যে বলো, তুমি হলে গিয়ে আমার বন্ধুর পিরিতের মানুষ। তোমার সঙ্গে তো আমার ঠাট্টা মাজাকের সম্পর্ক। আমি নটবরকে শুনিয়েছি কথাটা। আমিও কম ছেলে নই বাবা হুঁ, বুঝতে বাকী নেই, এ দফা মাছটা আর নটবরের হাতে উঠবে না। ওর কপাল খারাপ তো আমি কি করবো।

নটবর এসবই দেখেছে, ওরই সুমুখে কথাবার্তা। না দেখে করবে কি। চোখ কান বুজে তো আর বসে থাকতে পারে না।

এসব দেখেই আসলে মানুষটার মাথার কল বিগড়েছে। যতই দেখছে ততই মাথার কল বিগড়ে যাচ্ছে লোকটার। পষ্ট বুঝতে পারছি লোকটা ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠছে। ওর জ্বলুনী দেখে আমার মজা লাগছে। দেখেছি ওকে, আয়েস করে ওর দোকানের গদীতে বসে বসে ধোপ ধোয়া জামা কাপড় পরে সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে। দেখছি আর, অতিষ্ঠ, অধৈর্য স্থূলাঙ্গ মানুষটাকে দেখতে দেখতে আমার কেবলই হাসি পাচ্ছে। ও সর্বক্ষণ ভাবছে, কোন সময় আমি নগেন দাসের বাড়ীতে ঢুকি। চোখে চোখে

রাখছে আমাকে, ওর ভোগের জিনিস শেষটায় আমিই না খেয়ে ফেলি। যতক্ষণ এখানে থাকবো, লোকটা নিজেকে গুটিয়ে রাখবে একদিকে আর অন্যদিকে সন্দিগ্ধ চোখ রাখবে আমার ওপর। আমাকেই এখন ওর সবচাইতে বড় ভয়। একমাস ধরে শরীরের ভেতরে যে পিপাসাটা ধিকিধিকি জ্বলছে, সেই পিপাসার এবার বিমুখ হয়ে ফিরে আসার ভয়।

বৃষ্টি কিন্তু থামছে না। একটুখানি যদিবা থামছে কয়েক মিনিটের জন্যে। তারপরই আবার নামছে দ্বিগুণ জোরে। আমি বসে বসে নটবরের দোকানদারী দেখছি, আর সিগ্রেট খাচ্ছি। নটবর বারে বারেই বলছে, এবার রওনা দাও হে, এ বৃষ্টি আর ছাড়বে না।

ও যতোই বলুক, যতোই বিরক্ত হোক, আমি ওর কথামতো রওনা দিতে পারছি না। মেটে রাস্তায় নতুন মাটি দেওয়া হয়েছে, বৃষ্টিতে ভিজে সেই রাস্তায় এখন হাঁটু সমান কাদা। কে মরতে যাবে সে পথে গাড়ি নিয়ে। তার চাইতে এই তো বেশ আছি।

বিকেলের দিকে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করলো নটবর। তারপর জিজ্ঞেস করলো, যাবে নাকি মিস্তিরি?

কোথায়?

চলো তো আগে, পরে বলছি। যমুনাকে মনে আছে?

আমি মাথা নাড়লাম সাধু সেজে। বললাম, না ওসব খারাপ জায়গায় আর যাবো না। আর ভালো লাগে না [illegible], ছেড়ে দিয়েছি।

যমুনাকে আমার পষ্ট মনে আছে। বলরাম মুচীর মেয়ে যমুনা। একবার সেই মেয়েকে নিয়ে খুব মেতেছিলো নটবর সাহা। দোকানটা পর্যন্ত রেগুলার খুলতো না। তুমি বিয়ে শাদী করেছো নাকি? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো নটবর।

হ্যাঁ, গম্ভীর গলায় জবাব দিলাম, বউ-এর ছেলেপুলে হবে এবার।

তাহলে ছেড়ে দিয়েছো, নটবর কেমন ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো।

হ্যাঁ, আর কতো, ছেড়ে দিতে হলো। আমি কিছুটা উদাস হতে চেষ্টা করলাম।

আমি টের পেলাম, নটবর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভেবে তারপর বললো, আমারও একেক সময় ওসব ভালো লাগে না। বয়েস হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে এবার। তোমার জন্যেই যাচ্ছিলাম, দুদিন ধরে এখানে উপোস মেরে পড়ে আছো।

আরে আমার কথা ছেড়ে দাও, নটবরের জন্যে যেন দরদ উথলে উঠলো আমার। বললাম, তুমিই বরং একটা কিছু করো। ঝাড়ুদারের বউকে ডাকলে আসবে না?

লোকটা স্থির হয়ে গেলো আমার কথা শুনে। চোখে চোখে তাকালো। তারপর নজর ফিরিয়ে নিয়ে হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠলো, কী যে বলো তার ঠিক নেই। ও মেয়ে মানুষের ঠিক আছে কিছু? মাথা খারাপ মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস করা যায় কখনো? মিস্তিরি, তোমারও দেখছি ভুল হয়।

রঙ্গিনী এলো ভর সন্ধ্যায়। ডেকে বললো, কইগো মহাজন, কেরাচিনের তেল দাও।

মেয়েটা বৃষ্টিতে ভিজেছে খুব। ভেজা কাপড় সুগোল উচুবুকে সেটে লেগে আছে। আমি তাকিয়ে রয়েছি দেখে আমার চোখে চোখ রেখে হাসলো। কাপড় টেনে টেনে লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করলো।

ওর হাতে তেলের বোতল ফিরিয়ে দিতে দিতে নটবর জিজ্ঞেস করলো, আজ দু আনার তেল নিচ্ছো?

আর বলো না, আমার কপাল গো মহাজন। মানুষটা কি আজ আর ঘরে থাকবে! সারা রাত কুপী না জ্বালিয়ে রাখলে ডর করে আমার।

কথাটা বলেই সে আমার দিকে তাকালো। হাসলো একটু। আমার মনে হলো, এটা ইশারা। ইশারায় জানিয়ে দেয়া, তুমি এলে আসতে পারো।

বুঝলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়। এ মেয়ে জাঁহাবাজ, পাকা খেলোয়াড়। রঙ্গিনী চলে যেতেই আমি

রাস্তায় বার হলাম। বৃষ্টিটা থেমেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। আকাশের গতিক একেবারে খারাপ নয়। শেষ রাতের দিকে বেরিয়ে পড়লেও ভোর ভোর নাগাদ বর্ডার পার হওয়া যাবে।

বাইরে কিছুক্ষণ খোলা মাঠে বেড়ালাম। আমার নিজেরই ভেতরে কী যেন একটা অস্বস্তি চাপা রয়েছে। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যে ডুবে থাকলাম অনেকক্ষণ। ফিরে এসে দেখি নটবর মুখ হাত ধুয়ে ফর্সা জামা কাপড় পরছে। ধুতিটা ধবধবে পরিস্কার লাগছে দেখতে। নিশ্চয়ই ওপারের ধোলাই কাপড়।

কি ব্যাপার, রাতে কাপড় পরছো যে, জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

চৌধুরীদের বাড়ি নেমন্তন্ন আছে, তুমি খেয়ে নিও, চৌকির নীচে আম আছে, টিনে মুড়ি। দুধটা উনুনের উপরেই থাকলো।

নটবর কাপড় পরছিলো আর কথা বলছিলো। চেষ্টা করছিলো যাতে কথা বলার সময় সহজ আর স্বাভাবিক ঢঙটা আসে। যেন আমি বুঝতে না পারি ও কিছু গোপন করছে।

আমার তখন মানুষটার ওপর রাগ লাগলো। জিজ্ঞেস করতে ছাড়লাম না, নেমন্তন্নটা চৌধুরী বাড়ি না অন্য কোথাও নটুদা।

নটবর কি বলতে যাচ্ছিলো। না বলে কেমন থতমত খেলো। একটু সামলে নিয়ে শেষটা হেসে ফেললো। বললো, যখন বুঝেই ফেলেছো, তখন লুকিয়ে আর লাভ কি। শোন, তোমাকে খুলেই বলি তাহলে। পাগল টাগল কিছু না, মেয়েটা হচ্ছে এক নম্বরের শয়তান। গত এক মাস ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি, তা শালী কেবলই এড়িয়ে যায়। ইদিকে আমি অন্যদিকেও কোথাও নজর দিতে পারছি না। জানোই তো কোনও মেয়ে মানুষ চোখে ধরলে আর অন্যদিকে নজর যেতে চায় না। আমার এখন রোখ চেপে গেছে। দেখা যাক, কতো ক্ষমতা ওর।

তা আজ এতো সহজে রাজী হয়ে গেলো, আমার অবাক লাগে।

মিস্তিরি, টেনে টেনে কথা বললো নটবর, মেয়ে মানুষকে চিনলে না। এমনি কি আর রাজী হয়েছে। রীতিমত গচ্চা দিতে হচ্ছে। তা যাক, যে ফুলে যে দেবী তুষ্ট থাকে।

নটবর ব্যাখ্যা করেই বোঝাতে চাইলো ব্যাপারটা। বললো, আমার কাছে একখানা লাল শাড়ি চেয়েছিলো। শাড়ীর দাম ধরো কমসে কম পঁচিশ টাকা। একমাস ধরে ঐ শাড়ীখানার জন্যে কেবলই আমাকে খেলাচ্ছে।

তুমিও শেষ পর্যন্ত রাজী হলে?

হ্যাঁ হলাম, না হয়ে উপায় কি, নন্দ বৈরাগী আর ফসিউল্ল্যা দুপেটি কাপড় নিয়ে এসেছিলো ওপার থেকে। যাবার সময় একখানা দিয়ে গেছে। ভাবছি ওটাই দিয়ে দেবো।

একটু থেমে আবার বললো নটবর, আমার এই নেশাটার জন্যেই কিছু করতে পারলাম না হে। খালি টাকা ওড়ালাম। এ শালা চৌদ্দ পুরুষের রক্তেরই দোষ। আমাকে জানোয়ার বলে ডাকতে পারো। ইচ্ছে করলে ভাদুরে কুত্তার নাম দিতে পারো। আমার কিছুই বলার থাকবে না। শত্তুরেরও যেন এই অবস্থা না হয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার মুখে নটবর ফের জিজ্ঞেস করলো, তুমি ঘরেই থাকবে, নাকি কোথাও বেরুবে।

না, ভাবছি এবার রওনা দেবো। বিষ্টি বোধহয় আর নামবে না।

আজ আর গিয়ে কি লাভ, নটবর সাহা উদার হয়ে গেলো হঠাৎ। বললো, আজ থেকে যাও। কালই যেও। রোববার শহরে গিয়েছিলাম, দুটো বোতল এনেছি। যদি চাওতো যমুনাকে খবর পাঠাই, রাতটা কাটিয়ে যাও।

ও কথা বলছিলো, আমি শুনছিলাম। বুঝছিলাম, এই হাড়কঞ্জুষ, নোংরা, লুচ্চা, মাঝবয়সী লোকটা প্রথমে আড়াল করতে চেয়েছিলো নিজেকে। এখন তাতে কোন লাভ নেই দেখে খোলাখুলি কথা বলছে। তাই আমার জন্যে দয়া উপচে পড়ছে এখন। বুঝে বসে আছে রঙ্গিনীর ওপর ওর অধিকার আমি স্বীকার করে নিয়েছি। এখন আর ওর ভোগের জিনিসের ওপর হাত বাড়াবো না।

এই মানুষ সহজে হাতের মুঠো খোলে না, সহজে ওর চিতানো হাত উপুড় হয় না। সাজ হলো। দেখলাম লোকটার দুচোখে কী রকম সবুজ আলো ধিকি ধিকি জ্বলছে। ভগবান জানে কতদিন থেকে। সে ভেবেছিলো অন্যান্য মেয়েদের বেলাতে যা হয়েছে, এবারও তাই হবে। খবর দিলেই ঝাড়ুদারের বউ ঘরে এসে যাবে। খরচ যদি হয়ই তবে দুচার টাকার ওপর দিয়ে যাবে। তাই ধীরে সুস্থে অপেক্ষা করছিলো। এখন আর বুড়ো হাড়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন জোয়ার এসে ধাক্কা মারে না। অনেক হুঁশিয়ার সে। তাকে টাকা চিনতে হয়েছে অনেকদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলো না। সেই যে লোকটা ভয় পেয়েছে। বড় ভয় তার। এতো খেলিয়ে ডাঙার কাছে আনা মাছটা কখন হাতছাড়া হয়ে যায়। এতো করে সাজিয়ে তোলা ভোগের থালাটা কখন অন্যে ছোঁ মেরে নিয়ে পালায়। এতোদিনের উস্কে উস্কে তোলা আগুনটা গনগনে হয়ে ওঠার মুখে কেউ পানি ঢেলে দিয়ে না যায়।

তাছাড়া আব কত সহ্য হবে! দাঁতে দাঁত চেপে অনেকদিন সহ্য করেছে কত ফাঁদ পেতেছে, কিন্তু মেয়েটাকে কোনদিন বাগে পায় নি। হয়তো আরো অপেক্ষা করতো। কিন্তু এখন বোকা বনে যাবার ভয়ে চেপে ধরেছে তাকে। একরকম মরিয়া হয়েই সে পঁচিশ টাকা দামের শাড়ী দিতে চেয়েছে ঝাড়ুদারের বউকে।

মেয়েটার তারিফ করতে হয়। বাহাদুর মেয়ে বটে। কী পাকা খেলোয়াড়। শরীর দেখিয়ে আমার সামনে দুচারবার বেরিয়ে, দুটো কথা বলে নটবরের মত এ লাইনে পোক্ত মানুষকে পর্যন্ত অস্বস্তি আর হিংসায় নাজেহাল করে দিয়েছে। হাড়কৃপণ মানুষটা টাকার মায়া পর্যন্ত ভুলে গেছে।

এসব ব্যাপার দেখে কার না হাসি পায়।

আমি হাসছি নটবরেব অবস্থা দেখে। দ্যাখো, কি নাজেহাল অবস্থা বুড়োর। ওর দিকে দেখছি আর নিজেব দিকে তাকিয়ে, নিজেব কথা ভেবে, মনের ভেতরে গর্ব হচ্ছে। এক গোঁয়ার বেপরোয়া পাকা খেলোয়াড় মেয়ে মানুষ, যাব পায়ের কাছে অন্য অনেক পুরুষ মানুষের রক্তমাংসের বাসনা, অনেক রাতের ঘুম, অনেক দিনের ঈর্ষা আর লোভ মাথা কুটে মরেছে, সেই মেয়ে মানুষ আমাকে দেখে মজেছে, রাতেব বেলা তার ঘরে যাবাব নেমন্তন্ন জানিয়ে গেছে। একথা ভাবলে কার না গর্ব হয়।

তবু ঝুট্ করে হাত বাড়িয়ে দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কে জানে বাবা, ও মেয়ে মানুষের মনে কী আছে।

যাবো কি যাবো না—এ ভাবনা সন্ধ্যেবেলা থেকেই ভাবছি। বারবার করে বিচার করে দেখছি মেয়েটা সত্যি সত্যি ডাক দিয়েছে না এটাও ওর ছলাকলা।

আমার দরাজ হাতের পয়সা খরচও গত দুদিন ধরে দেখছে। দেখছে আমি ফর্সা জামাকাপড় পরে থাকি। খুশবুদার সিগ্রেট খাই। বয়স আমার অনেক কম, আমার দুহাতের কব্জী, টান টান ঘাড়ের চামড়া—সবই দেখেছে মেয়েটা। তাই কেরোসিন তেল কিনতে এসে ইশারায় যে নেমন্তন্ন করে গেলো তা আর কার জন্যে হতে পারে, আমি ছাড়া?

নাকি এটাও একটা চাল। দুজনকেই লোভ দেখিয়ে ঘরে নিয়ে তুলতে চায়। দুজনের মধ্যে বিবাদটা বেধে উঠলে তখন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাততালি দেবে।

নটু'দা, এক সময় আমি নিজের থেকেই ডাকলাম। সে তখন পুরনো খবরের কাগজে রঙীন একখানা শাড়ী জড়াতে ব্যস্ত। কাপড় জড়াতে জড়াতে মাথা না তুলেই সাড়া দিলো, কিছু বলবে?

আজ তুমি রঙ্গিনীর ঘরে যেও না। বরং চলো বর্ডার পার করে দিয়ে আসি তোমাকে, বউ ছেলেমেয়েদের দেখে এসো।

আমার কথা শুনে লোকটা সাড়া দিল না। লক্ষ্য করে দেখলাম কোন ভাবান্তব হয় কি না। লোকটা মাথা তুলে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখে আবার উবু হয়ে শাড়ী জড়াতে ব্যস্ত হলো।

শোন, আমি আবার ডাকলাম। বললাম, আমার সঙ্গে থাকলে বর্ডার পুলিশ কিছু বলবে না। পরশু তো আরেকবার যাবো, তখন আবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো।

না না, কি দরকার হত হ্যাঙ্গামে। বাড়ির খবর পরশু দিনই পেয়েছি। সবাই ভালো আছে, নটবর আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইলো।

তুমি শালা বুড়ো শালিক, ঘাড়ে রোঁয়া উঠেছে তোমার! আমার তখন রাগ হয়েছ, বিড় বিড় করে গালাগাল করছি ঘাড়ের রোঁয়া না ছাড়ালে তুমি কি আর এমনি এমনি শায়েস্তা হবে।

কিছু বলছো নাকি মিস্তিরি, নটবর হাসে।

হ্যাঁ, বলছি তুমি শালা বুড়ো শালিক ঘাড়ে রোঁয়া গজিয়েছে তোমার।

তা তুমি ভাই যাই বলো। আমার স্বভাব নষ্ট হয়েছে তা আমিও বুঝি। কিন্তু কী করবো বলো, যে মেয়েকে চোখে লাগে তাকে যতক্ষণ কাছে না পাই ততক্ষণ যে কী জ্বালা তা তুমি বুঝবে না, নটবর আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

আমার তখন রোখ চেপে গিয়েছে। গম্ভীর হয়ে উঠেছি। রাগী মালিক যেমন হুকুম করে চাকরের ওপব, তেমনি হয়ে গেছে আমার গলার স্বর। তাব চোখে রেখে বললাম, তুমি যেতে পারবে না, আমি যাচ্ছি আজ রঙ্গিনীর ঘরে।

কি বললে, হতভম্ব নটবর ঠিক বুঝতে পারে না।

আমার নিজের ভেতরে তখন কী একটা সূক্ষ্ম জ্বালা কাজ করে চলেছে। রক্তেব ভেতরে পুরনো একটা উত্তেজনা কবে থেকে যেন দোঁয়াচ্ছিলো। আমি নিজেই পষ্ট করে টের পাই নি। এখন বুঝতে পারছি তা কী। এখন সেই অস্পষ্ট ধোঁয়ানো উত্তেজনাটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে, অস্থির হয়ে দপদপ করছে। ড্রাইভার মানুষ আমি, অল্পেতে রাগলে, কি বিরক্ত হলে আমার চলে না। কিন্তু এখন আর ধীরস্থির হয়ে যে নিজেকে শান্ত রাখবো সে অবস্থা নেই। রক্তের সেই জ্বালা এমন মন অবধি পৌঁছচ্ছে। রঙ্গিনীর শরীরের গরম আর নরম উত্তাপ এই ঘরের অন্ধকারেও যেন ছড়ানো। চোখ বুজলেই এখন রঙ্গিনীকে দেখতে পাচ্ছি। মেয়েটাকে কাপড় ছাড়িয়ে কুপীর লালচে আলোয় কেমন দেখাবে সেই ছবিটা মনে মনে ভাবতে ইচ্ছে করছে।

নটবরও সম্ভবত আমার অবস্থা লক্ষ্য কবে থাকবে। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে। তার মুখের ওপর বললাম, রঙ্গিনী আমাকে ডেকেছে আজ বাতে, তুমি কেন যাবে।

না, তুমি যেতে পারবে না, ছোট ছেলের মতো কাঁদ কাঁদ গলায় কথা বললো নটবর।

আমি তখন কিছুই বুঝতে চাই না। বললাম, দ্যাখো নটুদা, আমিই যাবো আজ ওর ঘরে। মাঝরাতে ওকে নিয়ে বর্ডার পাব হয়ে চলে যাবো ওপারে। দিন দুই থাকবো সেখানে। দরকার হলে দুদিনের জন্যে দুশো টাকা খরচ কববো, মালিকের মালশুদ্ধ বেচে লোপাট করে দেবো। পারবি তুই, অমন হিম্মত আছে!

নটবর তখন হাতের মুঠো শক্ত করছে আর খুলছে। বলছে দ্যাখ, গণ্ডগোল পাকাস না, এমনি বেচাল দেখলে জান নিয়ে নেবো।

আমি তখন হাসছি। চামচিকের তড়পানি দেখে হাসছি। বললাম, দেখ চেষ্টা করে। কতদূর পারিস। কিন্তু তার আগে? তার আগে তুই কি বেঁচে থাকতে পারবি? পুলিশের হাতে তোকে ফাঁসিয়ে দিতে কতক্ষণ!

নটবার সাহা এতক্ষণে রাগে আপসাচ্ছিলো। এবার যেন কিছুটা মিইয়ে গেলো। ওর ভয় দেখে আমার আরো হাসি পেতে লাগলো। বেদম হাসিতে ফেটে পড়লাম ঘরের বাইরে এসে।

আমি নিজে তো শালা পয়লা নম্বরের লুচ্চা। বাপ যদি বা দু'কলম লিখতে পড়তে শেখাতে চেয়েছিলো—আমি তো বাপের সে ইচ্ছেটাকে বিড়ির ধোঁয়ার ফুঁকে দিয়েছি। অমানুষ হয়ে রয়ে গেলাম। এখন বেপাড়ায় যাই, রোজগারের টাকা জুয়োর টেবিলে উড়িয়ে দিই। গলা অবধি মদ টেনে মাঝরাতে রাস্তার ধারে উদোম হয়ে পড়ে থাকি। আমি হলাম গিয়ে এক নম্বরের না-চিজ। কিন্তু মজা দ্যাখো, আমার চাইতেও এই নটবার শালা দুগুণ বেশি ফালতু। যে মানুষ বুজদিল, তার কি দাম আছে সংসারে।

নেশার জিনিস খাইনি। কিন্তু তবু যেন মাতাল হয়ে গেছি। চিন্তা ভাবনাগুলোও কেমন ঘোলাটে হয়ে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে তখন, নটবব সাহা নোংরা জানোয়ারের চাইতেও অধম জীব। তাব মতো মানুষের সঙ্গে লাগতে যাওয়া ছোট কাজ করে হাত ময়লা করার শামিল।

একটু পর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। মাথার ওপরে মস্ত আসমান ঘোলাটে হয়ে রয়েছে। দু একটা তারা চোখে পড়ে। গাড়িব কাছে গেলাম। সেল্ফস্টার্টার কাজ করছে না পরশু দিন থেকে। এক্সিলেটরের ওপর ইটের ঠেস রেখে হ্যাণ্ডেল মারলাম। ঘুমন্ত ইঞ্জিন ডাক ছেড়ে জেগে উঠলো।

জিতা রহো বেটা, মনে ফুর্তি এসে গেলো।

ড্রাইভারের জিন্দগীতে গাড়িই হলো আসল। গাড়ির তন্দুরস্তি থাকলে ড্রাইভারও ফুর্তিতে থাকে। দরাজ দিলে তখন সে হাসতে পারে।

গাড়িতে উঠতে যাবো, লক্ষ্য করলাম নটবর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। বোধ হয় ভেবেছে, ওকে মিছিমিছি ভয় দেখিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

চিৎকার করে ডেকে বললাম। কোথাও যেওনা নটুদা। গাড়িটা দুদিন ধরে ভিজছে। একবার ট্রায়াল দিয়ে দেখে নিই।

গাড়িতো নয়। পঙ্খীরাজের বাচ্চা। আমার মালিক শিউনারায়ণ নাম দিতে চেয়েছিলো জয় লছ্মী। আমি নাম বদলে রেখেছি পঙ্খীরাজ। পঙ্খীরাজের মতোই গাড়ি যেন উড়ে উঠতে চাইলো।

বড় রাস্তায় কিছুক্ষণ গাড়ি দাবড়ে ফিরলাম। গাড়ি ঠিক আছে। হাতের ঘড়িতে ন'টা বাজে এখন। নটবরের দোকানে ফিরে এসে দেখি সে ঝাঁপ বন্ধ করে চলে গেছে। তালা লাগায় নি। বোধ হয় ভেবেছে, যদি আমি ফিরে আসি তাহলে দরজা খোলা পেয়ে ওকে আর খুঁজতে যাবো না।

নিঃশব্দ রাত। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। আমার এখন বেরিয়ে পড়া উচিৎ। চলে যাওয়ার কথাটা ভাবতেই মনে পড়লো নটবর সাহার কথা। আর সেই সঙ্গে মনে পড়লো রঙ্গিনীকে। চলে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। শরীরের ভেতরকার সেই অস্থির ভাবটা আবার নতুন করে জেগে উঠছে। আসলে রক্তের ভেতরকার জ্বালাটা শান্ত হয় নি। সেই জ্বালাটাই এতোক্ষণ ঘরের বাইরে খোলা রাস্তায় টেনে এনেছে আমাকে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়েছে এলোমেলো। কিন্তু তবু শান্ত হয় নি। জ্বালাটা এখন আবার প্রখর হয়ে উঠেছে। রঙ্গিনীর চেহারাটা বারবার দেখতে পাচ্ছি মনের ভেতরে। কুপীর লালচে আলোয় রঙ্গিনীর ভরাট উপচেপড়া শরীরটা কেমন লাগবে দেখতে! বারবার সেই ইচ্ছে দাপাদাপি করছে মনের ভেতরে।

আমার রাগ হতে লাগলো। হিংসায় জ্বলতে লাগলো সারা শরীর। নটবর নিশ্চয়ই এতোক্ষণে ফূর্তি জমিয়ে ফেলেছে। কথাটা মনে হতেই মাথায় কেমন রক্ত উঠে এলো। আর কোনকিছু ভাববার মতো অবস্থা থাকলো না। দরকার হলে খুন করে পালাবো। অমন মেয়ে মানুষের জন্যে একটা কেন, দশটাও খুন করা যায়। গাড়ির সিটের তলা থেকে হ্যাণ্ডেলটা বার করে হাতে নিলাম।

আমি জানি না, কেন এমন হয়। মেয়ে মানুষের শরীরের ভেতরে কী আছে ভগবান জানে। সব নেশার চাইতে বড়ো নেশা হলো এই মেয়ে মানুষ। যখন পুরুষ মানুষকে এই নেশা টানে তখন বিচার, বুদ্ধি, বিবেচনা কোন কিছু করার শক্তি থাকে না। তখন জানোয়ার আর মানুষের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। আমার কাজ, আমার ভবিষ্যৎ, আমার সাধ, সুখের চিন্তা, মুনাফার লোভ—সবকিছু তখন তালগোল পাকিয়ে গেছে। চোখের সামনে একাকার অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে একটা কুপী জ্বলছে, আর সেই কুপীর আলোয় একটা মেয়ে মানুষের উদোম শরীর কেবলই ঝলমল করছে। তখন মগজের ভেতরে কোথায় যেন তীর বিঁধে গেছে। আর আমি তখন টালমাটাল হয়ে সামনের দিকে ছুটছি।

রঙ্গিনী কোন ঘরে থাকে জানি না। পাশাপাশি তিনখানা ঘর। এক ঘরের পাশে কান পেতে দাঁড়ালাম। কারা যেন কথা বলছে ভেতরে। ঘরে বাতি নেভানো, জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে ফেললাম। দেখলাম, হ্যাঁ, দুজনেই বসে রয়েছে বাঁশের তৈরী খাটের ওপর। আমার সাড়া না পেয়েও রঙ্গিনী চিনতে পারলো কেমন করে, ভগবান জানে। ঘরের ভেতরে বসে থেকেই ডাকলো, এসো মিস্তিরি। তোমার বন্ধু আমার ঘরে এসে ঢুকেছে, দ্যাখো শখ কতো বুড়োর।

ঘরের ভেতরে গেলাম। আমাকে দেখতে পেয়েও নড়লো না লোকটা। ডাকলাম তো শালা সাড়া পর্যন্ত দিলো না।

দু' পা এগিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে হাত রেখে বললাম, যাও এবার চলে যাও।

নটবার স্থির, যেন শুনতেই পায় নি।

দ্যাখো মিস্তিরি, রঙ্গিনী কুপী জ্বালাতে জ্বালাতে বললো, তোমার বন্ধু ঘরে ঢুকেই কুপী নিভিয়ে দিলো।

কুপীর শিখা লালচে আভা ছড়িয়ে জ্বলে উঠলো। সেই আলোয় দেখা গেলো মেঝের ওপর নতুন শাড়িখানা পড়ে। রঙ্গিনী সেদিকে নজর ফিরিয়ে আবার বললো, একখানা শাড়ি দিয়ে নাগর আমার সঙ্গে রাত কাটাতে চায়। বলে, তোকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

নটবরের বৃত্তান্ত বলে হেসে উঠলো। সে কী হাসি। হাসি তার সর্বাঙ্গে ঢেউ দিয়ে যেতে লাগলো।

আমার রক্তে তখন ঘোর লেগেছে। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটার হাত ধরলাম। শরীরের ভেতরকার সেই ঝাঁ ঝাঁ প্রখর উত্তেজনাটা এখন আর নেই। পাহাড়ে আছড়ানো প্রখর ঝর্ণার স্রোতটা এখন যেন বড় দরিয়ার ঘোলাটে পানির সঙ্গে মিশেছে। কেমন বোবা আর এলোমেলো হয়ে গেছে মনের ভেতরটা। উত্তেজনা যখন শরীর মনকে কাঁপাতে কাঁপাতে একসময় ভোঁতা করে দেয় মানুষকে। আমারও এখন হয়েছে সেই অবস্থা।

নটবর তখনও একনজরে তাকিয়ে দেখছে রঙ্গিনীকে।

খাটের একপাশে মৃতসঞ্জীবনীর বোতল। সেদিকে নজর ফিরিয়ে বললো রঙ্গিনী, জানো হে মিস্তিরী, আমাকে নেশা করতে বলছিলো একটু আগে, এমনিতে তো গায়ে হাত দিতে পাবতো না, তাই মদ খাইয়ে বোতল করে তবে গায়ে হাত দিতো। রঙ্গিনী কথা বলতে বলতে হাসলো। বললো, বুড়োর গতরে বড় বেশি গরম। কতো বলি, আমার পেছনে না ঘুরে, বউ ছেলেমেয়ে আনিয়ে রাখো, তা শুনবে না। রোজগার করবে এখানে মজা লুটবে এখানে আর ঘর সংসার সাজিয়ে রাখবে হিন্দুস্থানে, কীরকম ঘোড়েল লোক, দ্যাখো।

আমি দেখলাম নটবরের চোখের দৃষ্টি স্থির, পাথরের মতো। তার স্থির ভাবলেশহীন মুখেব ওপরে শীতল আর কঠিন কেমন একটা ভাব জমছে বলে মনে হলো। আমি এক পা এগিয়ে রঙ্গিনীকে ডাকলাম চলো।

কোথায়! মেয়েটা যেন আকাশ থেকে পড়লো।

আমার সঙ্গে যাবে, আমার ভারী গলায় তখন অধীর উত্তেজনা কাঁপছে।

শরীর মুচড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে উঠলো মেয়েটা। এক লহমার জন্যে বুকেব কাপড় আলগা হয়েছিলো, সামলে নিলো ত্রস্ত হাতে। ও হাসছে, আর আমার ভেতরে ভেতরে কেউ যেন আগুনের আঁচ দিয়ে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। অতিকষ্টে হাসি থামিয়ে বললো, তোমার তো ঘরটাও নাই। এ বুড়োর তবু যাহোক একটা ঘর আছে, তোমার তো কিছুই নাই। শুধু গতরের গরম মেটাবার জন্যে গাড়িতে নিয়ে তুলতে চাও।

ওর কথার জবাব না দিয়ে হাত ধরে টেনে আনতে গেলাম কাছে আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো নটবর।

এমন অবস্থায় জীবনে বহুবার পড়েছি। একটু সামলে উঠে দাঁড়িয়ে গাড়ির হ্যান্ডেল তুলে ঘা দিতে দেরী হলো না। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা গাড়িয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

রঙ্গিনীর গলা দিয়ে অস্ফুট চিৎকার বেরুলো। বললো, লোকটাকে মেবে ফেললে!

মরে যায় তো যাক, ওর বেঁচে থাকা উচিত নয়।

রঙ্গিনীকে টেনে রাস্তায় বার করলাম।

আমি বুঝতে পারছিলাম নটবর মরে নি। অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। একটু পরেই ওব জ্ঞান ফিরবে। রঙ্গিনীকে নিয়ে গাড়িতে উঠলে আমি ততক্ষণে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবো। নটবর যে পুলিশে খবর দিতে পারবে না সে তো ভালো করে জানা।

মেয়েটা কথা বলছে না, আমার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে আমাকে লক্ষ্য করছে শুধু। আমি কি করি দেখছে।

গাড়িতে উঠতে বললাম তো বেঁকে দাঁড়ালো, কোথায় যাবো তোমার সঙ্গে।

আমি যেখানে যাই, দুদিন পর রেখে যাবো। দুদিনের জন্যে পঞ্চাশ টাকা দেবো।

রঙ্গিনী আমার কথা শুনে আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। হেসে হেসে গড়িয়ে পড়তে চায়। বললো, নটবর সাহা বুড়ো হাবড়া আর তুমি ছেলে মানুষ মিস্তিরি।

আমার ভেতরে তখন একটা প্রচণ্ড জেদ রুখে উঠেছে, ধৈর্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়েছি তখন। মেয়েটার গলা চেপে ধরতে ইচ্ছে করছে। বুকের কাছে টেনে আনলাম। গলার শব্দ খসখসে আর নিষ্ঠুর শোনালো। বললাম, ওঠো না হলে জোর করবো।

সেই অন্ধকার আকাশের নীচে মেয়েটা খান খান হাসিতে আরেকবার ভেঙে পড়লো। বললো, তুমি একেবারে দুধ খাওয়া বাচ্চার মতো করছো। আমার ঝাড়ুদারকে দেখেছো তুমি? দ্যাখো নি, দেখলে এমন জোর তোমার থাকতো না। রাত বিরেতে সে পালকী বয় না, ডাকাতি করে।

আমার হাতের বাঁধন তখন শিথিল হয়ে গেলো হঠাৎ তবু রঙ্গিনী সরে গেলো না। কী যেন ভাবলো একটুখানি। তারপর নিজের মনে বলতে লাগলো, মানুষটা কতো রাতে ঘরে ফেরে না, আমার এসব ভালো লাগে না। খুন, জখম, ডাকাতি, পুলিশের ভয়—এসব দেখে দেখে থ'কে গিয়েছি। আর সহ্য হয় না। ভাবছিলাম পালাবো। যদি মনের মতো মানুষ পাই। এখন দেখছি তুমি তো ঝাড়ুদারেরও বাড়া। সে তবু ঘরে রেখেছে। তুমি তো আমায় বিনি পয়সার মাল ভাবছো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গাই বকরির সমান ভেবে বসে আছো—

আরো কিছু হয়তো বলতো, কিন্তু আমি ততক্ষণে আবার অধৈর্য হয়ে উঠেছি। বললাম, ওসব কথা রাস্তায় শুনবো, এখন গাড়িতে ওঠো।

নাঃ, কোথায় যাবো। পথ ছাড়ো ঘরে যাই।

উঠবে কিনা বলো, আমার গলা হিস হিস করে উঠলো।

না মিস্তিরি আর দিক করো না, আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘরে ঘুমোও গিয়ে।

আমি এবার জোর করবো, জেদী একরোখা গলা আমার কেঁপে উঠলো।

করো জোর, রঙ্গিনী হঠাৎ রুখে দাঁড়ালো। তারপর শান্তগলায় বললো, নগেনদাসের বল্লম নিশান ভুল করে না। তার শহরের মেয়ে মানুষ পুষ্পবালার গায়ে হাত দিয়েছিলো এক শহরের ধনী লোক। নগেনদাস খবরটা জানার পার লোকটাকে আর খুঁজে পায় নি কেউ।

একবার মনে হলো, মেয়েটা মিছিমিছি আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। ও এখন দরাদরি করতে চায়। কিছু টাকা বেশি দিলে হয়তো বা খুশি হবে। বললাম, আরো কিছু টাকা দেবো, নাও ওঠো গাড়িতে।

টাকা নিয়ে কী করবো মিস্তিরি। যদি ঘর বাঁধতে আমাকে নিয়ে তাহলে অন্যকথা ছিলো। তুমি হাসালে মিস্তিরি।

কথায় কথায় এক পা দু পা করে একটু দূরে সরে গিয়েছিলো মেয়েটা! এগিয়ে গেলাম, হাত ধরে শরীরটা কাছে টানলাম। কোন বাধা দিলো না। ওর নরোম আর উঁচু বুকের ওপর হাত পড়লো। হাত সরিয়ে দিলো। বললো, কেন দিক্ করছো। তুমি ভুল বুঝেছো মিস্তিরি আমি পয়সা দিয়ে গতর বেচি না।

আমি তোকে বিয়ে করবো। সহ্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁতে চেপে কথা ক'টা উচ্চারণ করলাম।

রঙ্গিনীর হাসি আর থামেনা। হাসিটা এখন তীব্র তীক্ষ্ণ আর নিষ্ঠুর। হাসি থামলে বললো, আর সেসব হয় না মিস্তিরি। এখন এসব কথা বলে কোন লাভ নেই, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। এই দেহটা দেখে তোমার মন উল্সে উঠেছে। এখন কতো কথা শোনাবে তুমি। সবাই তোমরা একরকম। শুধু শরীরটার জন্যে ছোঁক ছোঁক কাছে আসো। কিন্তু মন? মনের কথা ভাবতে পারো না। সেটার কথা ভাবতে ভয় লাগে।

অনেক সহ্য করেছি আর নয়। জোর করে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম, তারপর বললাম, ওঠো গাড়িতে।

মেয়েটার সর্বনাশা হাসি ফুরোতে চায় না। বললো, ছেড়ে দাও মিস্তিরি, কী ছেলেমানুষী করছো। এখন যদি চিৎকার করি তো ঝাড়ুদার ছুটে আসবে। নটবর সাহার দোকান এতোক্ষণে সাফ হয়ে যাবার কথা।

মেয়েটার কথা আমার তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। রঙ্গিনী বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলো। বললো, আমাকে ছেড়ে দিয়ে ভাগো এবার। আমিই তোমাদের দুজনকে ইশারা করে ঘরে এনেছিলাম। নটবরের দোকানে দুপেটি হিন্দুস্থানী মাল এসেছে। তুমিও নড়ো না, সেও নড়ে না। সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা। যতক্ষণ তোমরা দুজনে আমার ঘরে লড়াই করবে ষাঁড়ের মতো, ততক্ষণে ঝাড়ুদার কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে আসবে।

একটু থেমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো মেয়েটা। আমার দুহাতে তখন কোন শক্তি নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, এবার ঘরে যাই, অনেক রাত হয়েছে।

আমি তখন আর কিছু করতে পারছি না। আমার রক্তের ভেতরকার এতো জ্বালা, বুকভরা এতো পিপাসা—এখন সেসব কিচ্ছু নেই। বেকুবের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি। মেয়েটা টলমল অঙ্গ কাঁপিয়ে হাসলো। আমারই সামনে দাঁড়িয়ে কাপড়টা ঝেড়ে ঝুড়ে গুছিয়ে পরলো। গাঢ় ছায়ার মত ওর শরীরের নিখুঁত ভাঁজ রেখায় রেখায় অন্ধকারের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখলাম। কিন্তু হাতটা পর্যন্ত বাড়াতে পারলাম না।

রঙ্গিনী তখন দাঁড়িয়ে বললো, মিস্তিরি, মেয়েমানুষ চেনা বড় শক্ত। আমাকে দেখে এতো বড় ভুলটা যদি না করতে, তাহলে আমি বেঁচে যেতাম।

মন খারাপ করো না গো মিস্তিরি, মানুষ চেনা বড় দায়।

আরো কি সব কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে মেয়েটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। ওর সব কথা বুঝবার মত ক্ষমতা তখন আমার মাথায় নেই। বেকুব হয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সামনে আমার পক্ষীরাজ। মনের ভেতরে একটা আশঙ্কা কাঁপতে আরম্ভ করেছে তখন। নটবর যদি মনে করে আমিই ওকে মেরে ফ্ল্যাট করে মালপত্র নিয়ে ভেগেছি। আর যদি সেই কথা মালিকের কানে তোলে তাহলে তো কোন মালিকই আমায় আর বিশ্বাস করবে না। তখন, তখন কি করবো।

কিন্তু এখনই বা কী করতে পারি, এই মুহূর্তে! পালাবো, না থেকে যাবে।

বৃষ্টি নামলো আদিগন্ত আয়োজন করে। ইঞ্জিনের ওপর তিরপল টেনে দিয়ে আবার ছুটলাম নটবরের দোকানে। বোঝাতে হবে কী সর্বনাশা মেয়ের পাল্লায় পড়েছে ও।

বৃষ্টি, বৃষ্টি। তখন চারদিক থেকে তীরের মতো বৃষ্টির ফোঁটা এসে গায়ে বিঁধছে। আমি ছুটছি প্রাণপণে, একখানা খড়ো চালার নীচে মাথা গুঁজবার জন্যে। চারপাশে শুধু শোঁ শোঁ শন শন শব্দ। সেই হাওয়া আর বৃষ্টির শব্দ চাপিয়েও বহুদূর থেকে একটা মেয়ের তীক্ষ্ণ হাসি আমার কানে বাজতে লাগলো।

নবনীতা দেবসেন

পরভৃৎ

—না বাপু, তোমার মাথার যন্ত্রণা সারাতে আমি এক্ষুনি বাবা হতে পারবো না। আগে রজনী আর রমেন পাশ করে বেরুক। ততদিনে স্কেলটাও বেড়ে যাবে। ছেলেপুলে হয়নি বলে মাথার যন্ত্রণা হয়, একথা বাপের জন্মে শুনিনি। চটে মটে সৌমেন বেরিয়ে এসেছিল ডাক্তারখানা থেকে। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সরমা। নানা রকম চিকিৎসা হয়েছে, ব্রেনের ডাক্তারের ধারণা ছেলেপুলে না হলে ও মাথাব্যথা যাবে না।

মেঘে মেঘে বেলা হয়েছে সরমার। বিয়ে হয়েছে কি আজ? সেই বাইশ বছর বয়েসে এম এ পাশ করেই। সেই থেকেই চলেছে ইস্কুলে চাকরি। দুজনের রোজগার না হলে সংসার চলবে না। শাশুড়ি নেই, শ্বশুরের পেনশন পঞ্চাশ টাকা। দুই কচি দেওর, দুই ননদ ইস্কুল-কলেজে। দিনরাত পরিশ্রম করে সংসার টেনেছে সরমা আর সৌমেন। বাচ্চা-কাচ্চা হবার কথাই ছিল না। ছোট দেওর রমেন তখন মাত্র সাত বছরেরটি।

সারাদিন বাচ্চা ঠেঙিয়ে বাড়ি এসে একদম ভাল লাগার কথা নয় আবারও বাচ্চাকাচ্চার কথা ভাবতে। কিন্তু সরমার কী যে স্বভাব। নিজের একটি বাচ্চার সখ তার প্রচণ্ড। সৌমেন ধমক দিত, ঘাড়ে দু'দুটো অবিবাহিত বোন, দু'দুটো ইস্কুলে পড়া ভাই, তুমি কি পাগল হলে? ওদেরকেই মানুষ করো না নিজের ছেলেমেয়ের মতন করে?

তাই করেছে সরমা। পনের বছর ধরে। ইতিমধ্যে শ্বশুরের পাট চুকেছে। তার পেনশান খতম, তাঁর র‍্যাশনকার্ড বাতিল। তাঁর নাতির মুখ দেখে যাওয়া হয়নি।

ইস্কুলে যেতে হবে ভাবলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আজকাল বাড়ি থেকে বেরুতেই ইচ্ছে করে না সরমার। নাকে-মুখে দুটি গরম ভাত গুঁজে ছাতি বগলে ছোটা। ইচ্ছে করে পান মুখে দিয়ে দুপুরবেলায় পাখা খুলে, মাদুরে শুয়ে শুয়ে সিনেমার বই পড়তে। আর থাবড়ে থাবড়ে একটা বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে।

স্বামী স্ত্রী আর রমেন বাদে বাড়ি খালি হয়ে গেছে রজনী সজনীর বিয়ে হয়ে গেছে, শোভনের দুর্গাপুরে চাকরি হয়ে গেছে, সৌমেনের স্কেলও বেড়েছে। হয়নি কেবল সরমার ইস্কুল ছাড়া। মাস গেলেই সাড়ে চারশো টাকা বন্ধ হয়ে যাবে। অতটা সাহস হয় না। সারাদিন একশো গণ্ডা অন্যের বাচ্চা চরানো। আর মা গুলো কী ন্যাকা। উঃ! ছুটির ঢের আগে থেকে গেটে এসে ভিড় করবে, হাহা হিহি গুলতানি আড্ডা, দেখলে গা জ্বলে যায় সরমার। কোনো কাজ নেই, কেবল বাচ্চা পৌঁছনোর নাম করে পথে পথে ঘোরা। অথচ সরমার তো ইচ্ছে করে, সারাদিন ধরে কেবল একটাই বাচ্চা নিয়ে ঘরের মধ্যে বসে থাকতে।

বাড়ির ঠিকে ঝিটা পর্যন্ত জানত, এতগুলো দেওর ননদের একটা গতি হয়ে গেলেই বৌদিদির বাচ্চা হবে। তার ছেলেপুলেদের মানুষ করতে হচ্ছে বলেই যে বৌমার ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ এটা শ্বশুরমশাইও জানতেন। এবং জানতেন বলে মনে মনে বৌমার কাছে 'চোর' হয়ে থাকতেন। থাকতে থাকতে একদিন তার খালাসের হুকুম এসে গেল।

সজনীর বিয়ে শোভনের চাকরির পরেও সৌমেন রাজি হয়নি। [illegible] বছর তিনেক হল রজনীরও বিয়ে হয়ে গেছে। অবশেষে সৌমেনের কোনো যুক্তিই আর খাটল না।

রমেন সদ্য কলেজে ঢুকেছে। তার বেরনোর জন্য অপেক্ষা করতে হলে সরমার আর ছেলেপুলে হবে না। সাফ কথা বলে দিল সরমা প্রাণের ভয় বলেও তো একটা জিনিস আছে? বুড়ি হয়ে মা হওয়া প্রাণের বেশি রিস্কি। এখনই তো সে বুড়ি হয়ে গেছে। সৌমেন অনেক তর্ক করল। তেত্রিশে আবার

বুড়ি হয় কেউ? আঠাশে বিয়ে হল তো সজনীরই।—কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল। একটা শর্তে। চাকরি কিন্তু ছাড়া চলবে না। দুঃখিত হলেও সেটা মেনে নিয়েছে সরমা। দেখা যাবে পরে। বাচ্চাটা হোক তো আগে।

সেও হয়ে গেল দু' বছর। এখনও তো কই সরমার বাচ্চা এল না। চেষ্টার কোনোই ত্রুটি করে না তারা। ব্রজেনডাক্তার সবরকম পরীক্ষা করিয়ে বলেছেন কারুর কোনো দোষত্রুটি নেই শরীরে। দুজনেই সমর্থ, সক্ষম, নির্দোষ। চিকিৎসার কিছু নেই। তবে? তবে কেন হচ্ছে না?

তাবিজ, মাদুলি, শেকড়বাকড়, এমন-কি তুকতাকও করে দেখেছে সরমা। সৌমেনেরও মনে একটা চাপা উদ্বেগ হয়েছে এতদিনে। 'পুরনো-বাসি-বরকে নিয়ে তোমার আর মন উঠছে না—' এসব কথা বলে হালকা করলেও, বেশ বোঝা যাচ্ছে সরমার চেয়েও বেশি টেনশন হচ্ছে সৌমেনের মধ্যে।

কিরকম যেন দোষী-দোষী ভাব করে থাকে। মুখে যদিও চোটপাট করে—'এত মন দিয়ে ভগবানকে ভজনা করলে তিনিও সশরীরে এসে পড়তেন, তোমার সন্তানের ভজনা করা অতি কঠোর তপস্যার ব্যাপার!' ক্রমশ সৌমেন কিন্তু পালটে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ চটে যায়। মেজাজটা খারাপের দিকে যাচ্ছে। আবার একসঙ্গে দু'ডজন রজনীগন্ধা নিয়ে হঠাৎ অপিস থেকে ফেরে। কেমন একটা 'ঘুষ' দেবার মতন ভাব যেন। আজকাল নিজেকে খুব খারাপ লোক বলে মনে হয় সরমার। বর ফুল এনে দিচ্ছে ভালোবেসে, সেটাকে 'ঘুষ' বলে মনে হবে কেন সরমার? আগে দেয়নি বলে? আগে দেয়নি কেন না, তখন শ্বশুর ছিলেন, ভাইবোনেরা চিল, লজ্জাটজ্জা করত। এখন দিচ্ছে, সে তো ভালো কথা। খুশির কথা। সরমার এত অস্বস্তি কেন হচ্ছে তাতে? সরমা নিজেই নিজেকে চোখ রাঙায়।

তবু, কেবলই ওর মনে হয়, সৌমেন ইদানীং বদলে যাচ্ছে। অথচ বদলটা কিছু মন্দ নয় সরমার পক্ষে। যেমন, সেদিন মাসপয়লায় হঠাৎ একটা সবুজ-সাদা ডুবে ধনেখালি এনে হাজির। সুন্দর শাড়িটা দেখে কোথায় আহ্লাদ করবে, তা না, সরমার মনটা দপ করে খারাপ হয়ে গেল। জোর করে মুখে হাসি এনে বললে, 'বাঃ! কী সুন্দর। কিন্তু কেন বলতো? হঠাৎ কী মনে করে?' কথাটা নিজের কানেই কুশ্রী শোনাল সরমার।—'কী আবার? সেলে দিচ্ছিল, ফুটপাথে ঢেলে শাড়ি বেচছে। তাই ভাবলুম, কোনদিন তো কিছু দেওয়া হয় না তোমাকে—' সৌমেনের কথায় লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল তার। সত্যিই তো, সজনী-রজনীকে বাদ দিয়ে হঠাৎ বৌয়ের জন্যে কাপড় আনলে বড্ড খারাপ দেখায়। এইজন্যেই জীবনেও তার জন্যে আলাদা করে কাপড় আনা হয়নি সৌমেনের। এখন বাড়িতে কেবল ও একা, তাই শখটা মিটিয়েছে। এতে সন্দেহের কী আছে? নাঃ, সরমার সত্যি বয়েস হয়ে যাচ্ছে। সব কিছুতেই মন্দ দেখছে সে। স্বামীর মনোযোগ পেয়ে কোথায় আনন্দ হবে, তা না, ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে ভেতরে সব সময়েই কেমন একটা প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার চলছে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পালা চলছে। বাচ্চা নেই বলেই নিশ্চয় এইসব খুঁতখুঁতুনি। আসলে, সৌমেনকে মাঝে মাঝে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে তার। মাইনের স্কেল বেড়েছে, ছোট সংসারে খরচাও কমেছে, তবু, এতটা দরাজ হাতের লোক সৌমেন নয়।

বিছানাতেও তার ধরনধারণ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। বাচ্চা জন্ম দেবাব চেষ্টায় কি এতদূর চারিত্রিক বদল হয়?

যে সৌমেন অনেক বড় লেখকের লেখাকেও 'অশ্লীল' বলে বাড়িতে ঢুকতে দিত না, সেই সৌমেন আজকাল কোত্থেকে সব নোংরা ছবির বই বাড়িতে নিয়ে আসছে। অবশ্য সরমাকে দেখাবে বলেই আনে, কিন্তু সরমা ওদিকে চাইতে পর্যন্ত পারে না। খারাপ খারাপ ছাইপাঁশ ছবি দেখে দেখে সন্তানধারণের আইডিয়াটাই খুব বাজে লাগে সরমার। অতি কষ্টে সে-বই বাড়িতে আনা বন্ধ করেছে সে, 'রমু দেখতে পেলে আমি গলায় দড়ি দোব' বলায় কাজ হয়েছে।

আর বিছানায় এসেও সৌমেন কেমন পাগলামি করে ইদানীং। বাচ্চার জন্যে কি পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা? ঝোঁক তো বেশি ছিল সরমারই—সৌমেনের কোনোদিন বাচ্চার সখ নেই, অতিকষ্টে রাজি করিয়েছে তাকে। কিন্তু এ কী হলো? বেশি বেশি উগ্র, নির্লজ্জ আদরে আদরে যেন বিপর্যস্ত করে ফেলেছে সরমাকে। নতুন বিয়ের ঠিক পরে-পরেও এতটা উদগ্র লোভ তার দেখেনি সরমা।

অথচ সরমার শরীরটা তো তখনই ঢের বেশি লোভনীয় ছিল। এত আগুন ছিল কোথায় অ্যাদ্দিন? এ কি কেবল বাড়িতে লোকজন কমে যাবার ফল? কী একটা অচেনা ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে সৌমেন আর সরমার মধ্যে। সরমা ধরতে পারছে না। সবই ভালো, অথচ। স্বামী বেশি বেশি আদর করছে এতেও যদি স্ত্রী ভুরু কোঁচকায়, তবে দোষটা কার?

সরমা মাথার যন্ত্রণার রোগটা ইতিমধ্যে কখন যেন উধাও হয়েছে। নতুন একটা রোগ হয়েছে এখন। মনে হয় বুকের মধ্যে গলার নলিতে একটা ব্যথা আছে, খুব আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে, বুকের মধ্যে থেমে থেমে, ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নামছে তো নামছেই। গলার নিচে বুকের কাছে এই নতুন ব্যথাটা মাঝে মাঝেই হচ্ছে সরমার।

অবশেষে গেল মাসে অঘটনটি ঘটেছে। ব্রজেন ডাক্তার কালই সেই বহু প্রত্যাশিত খবরটি দিলেন—'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন বৌমা, এখন ভালোয় ভালোয় কটা মাস কেটে গেলেই হয়!' কালীবাড়িতে পুজো দেবে ঠিক করেছিল সরমা। কিন্তু শনিবারে সৌমেনের অফিসের থিয়েটারের রিহার্সাল। সে যেতে পারবে না কালীঘাটে। রমেন বলেছে নিয়ে যাবে বৌদিকে। কালীঘাটের শনিবারের ভীড় কি সোজা ব্যাপার?

সরমার সমস্ত শরীর-মন একটা অদ্ভুত শান্তিতে ভিজে রয়েছে। অবশেষে। পনেরো বছর বাদে তিনি আসছেন।

কালীঘাটের দিকে যেতে-যেতেই খবরটা দিল রমেন। বেচারা খুবই বিচলিত, বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে।

—'এইবেলা ঠেকাতেই হবে ব্যাপারটা বৌদি। যত অফিস ক্লাবের থিয়েটারে পার্ট করে, আর স্রেফ বদমাইসি করে বেড়ায়। অতি পাজী মেয়ে বৌদি—রুণ্টু, দুলাল ওদেরই পাড়ার মেয়ে। হালতুর দিকে থাকে। ওরা ভালোমতই চেনে ওকে। তুমি দাদাকে বারণ কর বৌদি।'

শুনেও না শোনার মতো চুপ করে থাকে সরমা। উদ্বেগের চেয়ে যেন নিশ্চিন্তই হয় বেশি। ভীষণ জটপাকান একটা গেরো যেন এইমাত্র খুলে দিল রমেন।

এতদিনকার সব কিছু অস্বস্তি, যা কিছু খাপছাড়া ব্যাপার, সৌমেনের সব অচেনা, বেখাপ্পা আচরণগুলো এবারে সুন্দর ভাবে খাপে খাপে বসে যাচ্ছে।

কঠিন একটা ধাঁধার সরল সমাধান হয়ে গেল এইমাত্র।

তারপরেই যেন বজ্রপাত হয়। সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে যায় সরমার। এই সন্তান তাহলে কার?

ওই যে নতুন সৌমেন, নির্লজ্জ, কামুক, লোভে অধীর, চোরের মতো, অপরাধীর মতো। স্ত্রীকে ঘুষ এনে দেওয়া যে সৌমেন সেই কি সরমার স্বামী? শয্যায় ওই উন্মত্ত উদগ্র যে কামনার প্রকাশ হচ্ছে ইদানীং তার লক্ষ্য সরমা নয়। অন্য কেউ। যার রুচিপ্রকৃতির সঙ্গে এই উগ্রতা, নগ্নতা, জান্তবতা মিলে যায়, অথচ যাকে শয্যায় পায় না সৌমেন। এই শিশুটি যখন জন্ম নিচ্ছিল সরমার জরায়ুতে, তখন সৌমেনের চোখে ছিল কার স্বপ্ন? কার প্রাপ্য বীজ সৌমেন নিরুপায় হয়ে গুঁজে দিয়েছে সরমার রক্তকণিকায়? কাদের স্বপ্নের শিশু এখন বাড়ছে সরমার জরায়ুতে? কাদের সন্তান এখন লালনপালন করবে সরমা তার রক্তে-মাংসে?

গলার মধ্যে অদৃশ্য সুপুরিটা আবার বুক চিরে চিরে নামতে থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে। ব্যথা দিয়ে দিয়ে, সময় নিয়ে নিয়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো নামতে থাকে সরমার ভিতরটা পুড়িয়ে দিতে দিতে।

পুজো দিয়ে ফেরার পথেই মন ঠিক করে ফেলে সরমা।

আজই কাগজে দেখেছে বিজ্ঞাপন। 'সাকশন পদ্ধতিতে বিনা যন্ত্রণায় মাত্র দু মিনিটে—' সেটাই ঠিক হবে। এসব তো আজকাল আইনসিদ্ধ হয়ে গেছে।

ভগবান জানেন, ভগবানের চোখে সেটাই ঠিক হবে। পনেরো বছর ধরে অন্যের বাচ্চাদের প্রাণ

ছেলে মানুষ করেছে সরমা ; ঘরে বাইরে। তাই বলে সারা জীবন করবে না। সংসারে পরের বাচ্চা মানুষ করা, ইস্কুলে পরের বাচ্চা মানুষ করা, আর আপন রক্ত-মাংসের ভেতরে পরের বাচ্চা মানুষ করা এক নয়।

চিনতে পারার পরেও আর নিজের বাসায় কোকিলের ছানাকে পোষে না, এমন কি কাকপক্ষীও। সরমা মন ঠিক করে নেয়।

দিব্যেন্দু পালিত

তিনকড়ির মা ও বোন

মালপত্তর রেডি করে তিনকড়ি গিয়েছিল লরি ডাকতে। আধঘণ্টা হয়ে গেছে, এতক্ষণে তার ফিরে আসা উচিত।

মোড় ছাড়িয়ে ডানদিকে কয়েক পা এগোলেই বকেয়া রাস্তার ওপর কাঠের গোলা, সারাক্ষণ করাতকলে কাঠ চেরার শব্দ। তার পাশেই ভুজাঅলার দোকান পেরোলে নন্দীবাবুর আড্ডা। এখান থেকে যেতে আসতে বড়জোর মিনিট পনের। আগে থেকে বলা আছে, ঘণ্টাখানেকের জন্যে ড্রাইভার সমেত লরি ধার দেবে নন্দীবাবু। কর্তা বেঁচে থাকতে চিঠিপত্র বুঝতে, মুসাবিদা করিয়ে নিতে প্রায়ই আসত এখানে। কৃতজ্ঞতা ভোলে নি। তিনুকে বলেছিল লরি রেডিই থাকবে।

তাহলে এত দেরি করছে কেন।

ছাদ থেকে নেমে এল তৃপ্তিবালা। লরি এলে ঝটপট তুলে দেবে ভেবে জিনিসপত্র দরজার গোড়া পর্যন্ত টেনে রেখেছিল তিনকড়ি। মা ছাদে, তিনু গেছে লরি ডাকতে। মাল পাহারা দেবার জন্যে সুধা ছাড়া আর কে থাকবে।

'তিনু আসে নি?' কড়া চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তিবালা বলল, হাঁ করে দাড়িয়ে আছিস কেন? কোথায় সে?'

'দেখছই তো আসে নি। শুধু শুধু আমাকে হাটের মাঝে দাঁড় করিয়ে রাখা।'

'তুই আমাকে হাট-বাজার শেখাবি নাকি?'

তৃপ্তিবালা চোখ রাস্তায়। লাইটপোস্টের বাদিকে রমেশের পানের দোকান লোকটা তাকিয়ে আছে এদিকে। দৃষ্টিটা খেকো। বুকের কাপড় সামলে মেয়ের দিকে তাকাল তৃপ্তিবালা। রাস্তার দিকে পিছন ফিরে পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষে মেঝেয় আঁকিবুকি কাটছে সুধা। লোকটার তাকানোর দুটো কারণ থাকতে পারে ভাবল তৃপ্তিবালা। এক, সুধা। দুই, তাহলে সত্যি সত্যিই এরা পাড়া ছেড়ে চলল।

সমস্যা দ্বিতীয়টি নিয়ে। খুব তাড়া না করলেও লোক জানাজানির ভয়ে গতকাল থেকেই গোছগাছ শুরু করেছিল সে। সম্ভব হলে রাত্রেই চলে যেত। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। নন্দীবাবুর লরি আসবে ধানবাদ থেকে পৌঁছতে পৌঁছতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। তখন যাওয়া যায় না।

গাড়ি দেখার জন্যে অগত্যা রমেশের দোকানেই তাকাতে হল। তিনু গেছে ঠিক নটায়। তার মানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। এত দেরি করার কী মানে হয়।

তৃপ্তিবালার অপমানবোধ প্রখর। তিনুর বাবা ছিল সংস্কৃতের মাস্টার। দু বেলা গীতা পড়ত ইংরিজিও জানত। কম করেও কুড়ি বছর ঘর করেছে লোকটার সঙ্গে। এসব ভাবলে দুঃখে হাঁইফাঁই করে বুকে। ওই লোকটা বেঁচে থাকলে কি বারো বছরের পুরনো পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হত এইভাবে।

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ভারী ট্রাঙ্কটা আবার ঘরের ভিতরে টানবার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াল তৃপ্তিবালা।

'আবার টানাটানি করছ কেন!'

'না, টানবে না!' মুখ ঝামটা দিয়ে বলল তৃপ্তিবালা, 'আমি আড়ালে যাই আর তুমি মনের সুখে হাট-বাজার করো!'

'সকাল থেকে মুখ খারাপ কোরো না বলছি!'

সুধার গলার স্বর চড়তে উলটোদিক থেকে রমেশ হাসল। খদ্দের এসেছে। এখন তারিয়ে তারিয়ে ঘটনাটা বলবে। মোটামুটি সব ব্যাপারই ও জানে।

ট্রাঙ্কটা এতক্ষণে টেনে এনেছে ভিতরে। তৃপ্তিবালা ভাবল আরো একটু টানলে দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করা যাবে।

অনটনের মধ্যে থেকে গত দু-বছরে নানারকম শারীরিক উপসর্গ দেখা দিয়েছে তৃপ্তিবালার। তার একটি মোটা হওয়া। এখন অল্পেই হাঁপায়। একটু পরিশ্রম করলেই মনে হয় পেটের খোল বুকের দপদপানি এক হয়ে উঠে আসছে গলায়। শ্বাসকষ্টে হিমসিম হতে হয়। আপাতত দরজাটা কোনোরকমে ভেজিয়ে ট্রাঙ্কের ওপরেই বসে পড়ল।

'শুধু শুধু আমাকে গাল দেওয়া। তিনু দেরি করছে আমি তার কী করব!'

'থাম!' গলার মধ্যেই একটা ঢেকুর চাপা দিল তৃপ্তিবালা, 'এখন আর চেঁচিয়ে নাটক করতে হবে না।'

'আমি নাটক করছি!' তিরিক্ষি হয়ে সুধা বলল, 'তুমি মরতে ছাদে গিয়েছিলে কেন? এখানে এসে ছেলের জন্যে দরজায় ধরনা দিলেই তো পারতে! যত দোষ আমার!'

একটা কড়া কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল তৃপ্তিবালা। হঠাৎ মনে পড়ল ছাদ থেকে নেমেছিল আবার ছাদে ফিরে যাবার জন্যে। তিনুর ফিরে আসার ব্যাপারে যতটা না তার চেয়ে বেশি সুধা ঠিক আছে কি না দেখা। যত দেরিই করুক, তৃপ্তিবালা জানে তিনু ফিরবেই। পালাবার হলে কবে চলে যেত। ওর ধরণটাই আলাদা। মাঝখান থেকে সুধার সঙ্গে ঝগড়া করে মেজাজ নষ্ট হল, সময়ও গেল।

সুধার নজর তখনো তার ওপর। আড়ে মেয়েকে দেখতে দেখতে তৃপ্তিবালা ভাবল, আবার ছাদে যাবে, নাকি এখানে বসেই অপেক্ষা করবে তিনুর জন্যে? ছাদ থেকে যেটুকু দেখেছে তাতে ওরা বাড়ি আছে বলে মনে হয় না। আজ ছুটির দিন, কর্তাকে নিয়ে বোসগিন্নী সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া, বাড়ি যে ওরা আজই ছেড়ে দিচ্ছে সে-কথা তো কালই শুনেছে। আজ নিশ্চয়ই পুজো দেবে!

উঠে জল খেতে গেল তৃপ্তিবালা। আপমান বোধটা এই সময় শরীর বেয়ে তিরতির করে মাথায় ওঠে। জল খেয়ে কলসি থেকে আরো খানিকটা জল হাতের তেলোয় নিয়ে মাথায় চাপড়াল সে।

'কী হল!' মাকে অসহায়ভাবে ফিরে আসতে দেখে সুধা বলল 'হঠাৎ ঝিম্ মেরে গেলে যে!'

'এমনি। তোকে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?'

'ইস্, এমনি! তোমার মুরোদ ঢের জানি। কিন্তু বলতে পার নি তাই বলো না!'

তৃপ্তিবালার মুখে কথা জোগাল না। ভারী চোখ তুলে ঘুরিয়েফিরিয়ে ঘরের জিনিসপত্রের ওপর রাখল। যা আছে তাতে লরির একটা ট্রিপই ঢের। তিনুটা সময়মত ফিরলে এতক্ষণে সব লরিতে উঠে যেত। সে আর সুধা যাবে রিকশায়। তিনু ড্রাইভারের পাশে বসে, লরিতে।

মনে মনে হিশেব করে দেখল পুরনো তক্তপোশটা ছাড়া আর কিছুই ফেলে যেতে হচ্ছে না। সেজন্যে মায়া নেই। একটা পা ঘুণ ধরে ভেঙে যাবার পর ছখানা থান ইট বসিয়ে কাজ চলত কোনোরকমে। তিনু বলেছিল ওভারটাইমের টাকাটা পেলে নতুন একটা কিনে নেওয়া যাবে। যে পাড়ায় যাচ্ছে তার কাছাকাছি রথের মেলা বসে।

আক্ষেপ ফেলে যাবার জন্যে নয়। ভেবেছিল ওটাকেই তুরুপের তাস করে দুকথা শুনিয়ে দেবে বোসগিন্নীকে—খাটটা রেখে গেলুম, মরে গেলে যেন ওর সঙ্গেই চিতেয় তুলে দেয়। শুনে দাপাতো হাত পা কামড়ে মরত অপমানে। তৃপ্তিবালাকে তো আর পাচ্ছে না!

সুযোগ ফসকে গেল। মনে হচ্ছে মতলব টের পেয়ে আগেভাবেই সরে পড়েছে। আবার ছাদে ওঠার কথা ভাবতে পারল না তৃপ্তিবালা।

'ছেলেটা গেল কোথায় বল তো?'

'আমি কি জানি! তোমার অপমান করা শুনতে বসে থাকবে নাকি!'

'ফের চোপা করছিস!'

তৃপ্তিবালার যত রাগ সব মেয়ের ওপর গিয়ে পড়ে। অসুবিধে যেন তার একার ; কিংবা, তার আর তনুর! ধিঙ্গির দায় নেই কোনো!

'যত নষ্টের গোড়া তুই! তোর জন্যেই বার বছরের পুরনো বাড়ি ছাড়তে হল!'

'চার বছর ভাড়া দিতে পারো নি, কেসে হেরে গেছ, এসব বলছ না কেন মুখ ফুটে!' বেগতিক দেখে জানলার একটা কপাট বন্ধ করে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল সুধা।

'ভাড়া তো কত লোকে দেয় না। সবাই কি বাড়ি ছাড়ে, না কেস করে উঠিয়ে দেয়!'

তৃপ্তিবালার গলা কাঁপল, তবু বলল। এটা তার দুর্বলতার জায়গা। সুধা অমন সরাসরি আক্রমণ করবে ভাবে নি। খানিক দম নিয়ে বলল, 'এমনই কপাল, বোসগিন্নীর পায়ে ধরে যে আরো দু-দশদিন থাকব, সে উপায়ও নেই। কী দরকার ছিল তোর ছোঁড়াটার সঙ্গে অত মাখামাখি করার! ছেলে নিয়ে ঢি-ঢি না পড়লে বোসগিন্নী তাড়া করত না কি!'

'এখন আমার দোষ!' সুধা ভাঙল না। আঁচলটা বুকের ওপর ভালোভাবে ঢেকে, একটু-বা ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি বলো নি বিশুদাকে জপাতে!'

'বলেছিলি বিয়ে করবে—'

'না করলে কী করব! এখনো বলছে—'

'হ্যাঁ! বলছে!' বুকে হাঁপ ধরায় দুহাতে বুক চেপে খুকখুক করে কাশল তৃপ্তিবালা। কাশি থামতে বলল, 'বয়সের ছোকরাকে বাগে আনতে দু-বছর লাগে নাকি! মাখামাখি তো কম হল না! এখন কী হবে! বোসগিন্নী তো তুলে দিয়েই খালাস। তুমি সারা জীবন আমার গলায় ঝুলে থাকো!'

'আর থাকব না। একদিন দেখবে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়েছি।'

রাগ, না অভিমান, মেয়ের স্বর শুনে কিছুই বুঝল না তৃপ্তিবালা। সুধা বসে পড়েছে মেঝেয়। হাঁটুতে মাথা গুঁজে নিজেকে গুটিয়ে নিল হঠাৎ। সম্ভবত এখন ও কাঁদবে। এখন ওর সামনে থাকা ঠিক হবে না। তিনু এলে আবার যেমন তেমন করে সামলে নেবে।

তিনু এখনো ফিরছে না কেন! যেত আসতে মিনিট পনের। তাহলে এত দেরি কেন!

সময় দেখার জন্যে দরজা খুলে বাইরে মুখ বাড়াল তৃপ্তিবালা। দাঁড়িয়ে উঠে তাক থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল পাড়ছে রমেশ। আড়াল পড়ায় ঘড়ির কাঁটা দেখা যায় না। ছুটির রাস্তা মোড় পর্যন্ত পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই হারিয়ে গেছে আড়ালে। তিনুকে দেখতে পেল না।

'বাপ-মা না হয় পাজি। বিশু একবার খোঁজ নিলে পারত তো!'

দরজা বন্ধ করার শব্দে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুধা। আঁচলে চাপ দিয়ে মুখ মুছে নিল।

'কেন নেবে! তোমার খায় নাকি।'

'খাওয়ার কথা নয়।' যতটা সম্ভব মোলায়েম করে তৃপ্তিবালা বলল, 'ওকে কোনোদিন হেনস্থা করেছি! বিয়ে করবে শুনে একদিন হাত পুড়িয়ে খাইয়েছিলাম, মনে আছে তোর?'

'এখনো তার ঢেকুর উঠছে! তোমার বাড়াভাত হজম হবে না।' বলতে বলতে বাথরুমে গেল সুধা।

তৃপ্তিবালা বুঝল সুধার রাগ পড়ে গেছে। এখন আস্তে আস্তে সুতো গুটোনো দরকার। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার দেমাক যতটা বেড়েছে মগজ ততটা পাকে নি। বার বছর আগে এ বাড়িতে আসার সময় সুধার বয়স ছিল এগার। ফ্রকের নীচে ইজের পরত। তখনই বাড়ন্ত চেহারা। আরো বছর তিনেক পর বিশু চাকরিতে ঢুকলে মেয়েকে শাড়ি ধরাল তৃপ্তিবালা।

অতীত ভাবলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। ওসব ভেবে দিন চলে না। সুধাকে ফিরতে দেখে নিজেকে সামলে নিল তৃপ্তিবালা।

'যা না, একবারটি ঘুরে আয়—'

গলায় নিশ্বাস আটকে কথা বললে অনুনয় ফোটে। তৃপ্তিবালা তাই করল।

সুধা বলল, 'কেন? তাড়িয়ে তো দিয়েইছে—'

'ওর সঙ্গে কী! তাড়িয়েছে বোসগিন্নী। এতকাল মেলামেশা করলি—এখন গেলে কে আর দেখছে!'

'তিনু এসে পড়বে—'

'আমি দেখছি।' দরজাটা হাট করে সামনে দাঁড়াল তৃপ্তিবালা, 'পারলে বিশ-পঁচিশ টাকা চেয়ে নিস। যা দেয়। কবে তিনু টাকা পাবে সে-ভরসায় আমাদের চলে না কি! দু-বছর ধরে অ্যাপ্রেনটিসই থেকে গেল!'

সুধা বেরিয়ে যেতে পাঁজরে হাওয়া খেলল তৃপ্তিবালার। ফাঁকা বাড়ি তো কি, বয়স হয়েছে, এখন ও নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে। মুখ দেখেই বুঝত আগেও শুয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা রাখা-ঢাকা চেনে। বিশুও কম সেয়ানা নাকি! তাছাড়া, আজই তো শেষ! কাল থেকে আর চট করে পাচ্ছে না বিশুকে। আ-হা, যদি সত্যি-সত্যিই মেয়েটা ফেঁসে যেত এতদিনে, তাহলে চাপ দিয়েই কাত করতে পারত বোসগিন্নীকে। সংসারে যার যার নিজেরটা বুঝে নিতে হয়। এসব ভাবতে ভাবতে রাস্তামুখো হয়ে দাড়াল তৃপ্তিবালা।

ইতিমধ্যে তিনকড়ি যদি এসে পড়ে, সুধা ভাবল, তাহলে কেলেঙ্কারির এক শেষ হবে। যা গোঁয়ার! বেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ভাবতে ভাবতে বিশুর দোতলার দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল ও।

'আমরা চলে যাচ্ছি।' আশপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'মাসীমারা কোথায়?'

'দক্ষিণেশ্বর গেল, পুজো দিতে।'

'চলে যাচ্ছি বলে!'

'তা কেন! প্রাযই তো যায়—'

রেজরে ব্লেড ভরছিল বিশু। রেখে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। দুটো হাত তুলে দিল সুধার কাঁধে।

'গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেবে?' নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সুধা বলল, 'দাও না! আর তো আসছি না—'

'কবে না বলেছি?'

বিশু ওর হাত ধরে বিছানায় বসিয়ে জানলা বন্ধ করতে গেল। তৃপ্তিবালাকে বিশ্বাস নেই, যখন তখন ছাদে ওঠে। ফিরে এসে ব্লাউজের প্রথম বোতামটা চটপটে হাতে খুলে দ্বিতীয় বোতামে হাত দেবে, সুধা ওর হাত চেপে ধরল।

'টাকা চাইতে লজ্জা লাগে—'

'আমার কাছেও?'

মুখের ওপর বিশুর খ্যাপা নিশ্বাস আছড়ে পড়তে শরীর চিনল সুধা। চোখ বন্ধ করে ভাবল, তিনুর চোখ নেই। থাকলে ও মানুষ খুন করত। ছোটবেলা থেকেই ওর কান বড়, চোখের কোণ লাল। বাবা বলত, ছেলেটা সৎ হবে।

'এসব তো করছ! বিয়ের কী হবে?'

'বলেছি তো করব। দরকার হলে আলাদা থাকব।'

'ছাই! ও-কথা অনেকবার শুনেছি।'

জবাব না দিয়ে আরো বেশি সতর্কতার জন্যে দরজায় খিল দিতে গেল বিশু।

অন্ধকার ঘরে হাই তুলল সুধা। একে কি ঝুলে থাকা বলে? শরীরের চাপে নিশ্বাস তপ্ত হবার মুখে অন্যমনস্কতার ভিতরও ভাবল, আজ পর্যন্ত বিশ্বনাথের কাছে যা নিয়েছে সেই টাকায় বাড়িভাড়া গুনে দিলে পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হত না।

তৃপ্তিবালা চোখের সামনে রাস্তাটা দীর্ঘতর হল ক্রমশ। ওই রাস্তা পেরিয়ে তিনু আসবে। তুব এত দেরি করার কোনো মানে হয় না। প্রকৃত উদ্বেগ বোধ করার আগে ও ভাবল, অন্তত সুধা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনুর জন্যে চিন্তিত হবার কারণ নেই।

এই সময সুধাকে দ্রুতগতিতে ঘবে ঢুকতে দেখে স্বগতোক্তিব গলায তৃপ্তিবালা উচ্চাবণ কবল, 'দিযেছে?'

সুধা হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'এভাবে পাবব না।'

মেযেকে দেখতে দেখতেই পিছন ফিবে দবজাটা বন্ধ কবে দিল তৃপ্তিবালা।

'দিযেছে কি না বল আগে।'

ট্রাঙ্কেব ওপব বসে দেযালে পিঠ দিল সুধা। পা দুটো ছডিযে দিল সামনে। জিব বুলিযে ঠোঁট চাটল।

'আজ পর্যন্ত কত টাকা নিযেছ বলো। সব বলে দেব তিনুকে—'

এগিযে এসে মেযেব ঘাড ধবে ঝাঁকুনি দিল তৃপ্তিবালা।

'টাকাটা কোথায?'

'আমি দেব না। ও আমাব টাকা।'

সুধাব হাত ওব গলাব ওপব চেপে বসতে গাযেব সবটুকু জোব দিযে ঝটকা দিল তৃপ্তিবালা মেঝেয পডে লাথি ছোডবাব চেষ্টা কবল সুধা। সবে গিযে মেযেব হাত মুচডে ধবল তৃপ্তিবালা। সুধা পাশ ফিবতে বুকেব ভাঁজ থেকে একটা বড নোট উঁকি দিল পুবষ্কাব। একশ নাকি।

'দিযে দে। না হলে মেবে ফেলব—'

হাতেব যন্ত্রণায অস্ফুট শব্দ কবল সুধা। আব তখনই কডা নডে উঠল দবজায।

'তিনু ফিবেছে--'। সবে গিযে অভ্যস্ত গলায বলল তৃপ্তিবালা, 'চেঁচাবি না। উঠে পড'।

তাবপব আঁচল গুছিযে দবজা খুলল।

'দেবি কেন?'

'লবি পাওযা যাবে না।' মুখ ব্যাজাব কবল তিনকডি 'মাঝখান থেকে একগাদা ঝামেলায পডতে হল।

তৃপ্তিবালা দেখল, তিনুব শার্টটা ফালাফালা হযে গলাব কাছে ঝুলছে, চুল এলোমেলো কপাল [illegible] ডানদিকে ছডে যাওযাব মতো একটু দাগ। যেন কাবব সঙ্গে এইমাত্র মাবামাবি কবে এল।

'ঝোলা ঠোঁটে বিবক্তি মিশিযে গোঁজ হযে বইল তিনকডি। তৃপ্তিবালা চোখে চোখ পডায ব[illegible]।

'নন্দী শালা বদনাম কবছিল। আমিও দুঘা দিযে এসেছি। পুলিশেব ভয দেখাল।

'কী হযেছিল।'

মা ও মেযে একসঙ্গে চেঁচিযে উঠল।

'কী আব। যা বলে '

তিনকডি অস্বস্তি বোধ কবছিল। কথাটা বলা ঠিক হবে কি না ভাবল। পলকে দেখে নিল সুধাকে।

'দবদ দেখাচ্ছিল। বডলোকেব সঙ্গে মাখামাখি কবে কী হবে। বোনটাকে নাকি লাইনে নামিযেছি সেই থেকে কথা কাটাকাটি। একটু থেমে ঢোক গিলে বলল, 'বাডাবাডি কবতে নাবে মাবলাম। তখন [illegible] দু চাবটে লাশ নামাতে আমাব হাত কাঁপে না। জামা টেনে ধবেছিল। বেবিযে দেখলাম ছিঁডে গেছে

বৃত্তান্ত শুনে হাঁফ ছাডল তৃপ্তিবালা কী না কী ভেবেছিল গোডায। তিনুব আঘাত নিশ্চযই তেমন গুকুতব নয। গোযার্তুমি কবতে গিযে বিনে পযসাব লবিটাই হাতছাডা কবল শুধু।

সুধা বোধহয তৃপ্তিবালাব মনেব কথা আঁচ কবতে পাবল। বিব্রত তিনুব পাশে দাডিযে উদাস [illegible]। বলল, 'ঠেলা গাডিতেও তো যেতে পাবে মা। কটা আব টাকা লাগবে। তিন সঙ্গে যাক। আমবা [illegible] পবে যাবো-

রিজিয়া রহমান

কাছেই সাগর

ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে পোটলায় বাঁধা নোটগুলো আর বাবলুর পুরনো মোজায় জমে ওঠা খুচরো মোজায় জমে ওঠা খুচরো পয়সাগুলো প্রায়ই অবসর পেলেই গুণে দেখত বেণু। আধুলি সিকি একটাকা পাঁচটাকা দশটাকার নোটগুলোতে আদর করে পরম যত্নে হাত বুলিয়ে বেণু ভাবত কত দিন লাগতে পারে একবার সমুদ্রের কাছে যাবার টাকা জমতে।

জমা টাকা তো অনেকবার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বুড়ি চুয়েও বানের পানির মত ভেসে বেরিয়ে গেছে হঠাৎ আসা প্রয়োজনের দুর্যোগের ঝাপটায়।

সমুদ্রের সাধ যে তার অনেক দিনের। সমুদ্র দেখতে যেতে হলে টাকার দরকার। আর কোথায় পাবে সে টাকা বেণু সাধারণ দিন-এনে দিন-খাওয়া কেরানি গৃহিণী হয়ে। শুধু কি সে স্বপ্নই দেখবে? শুধু কি ব্যর্থই হবে? তাই তো জেদ ধরে বেণু। সমুদ্রে সে যাবেই। টাকা নেই তাতে কি! না হয় তার একমাত্র স্বর্ণালঙ্কার, বিয়ের সময়কার বালা জোড়াই বেচে দেবে। বেঁচে থাকলে সোনার গয়না আবার হতে কতক্ষণ। কিন্তু এমন উদারতাকেও হেসে উড়িয়েছে আলতাফ।

—সমুদ্রে বেড়াতে যাবার জন্য কি শেষ অবধি গায়ের গয়না বেচবে? একেই বলে ঘোড়ারোগ। বাদ দাও ওসব।

গয়না বেচার কথা অবশ্য আর তোলে নি বেণু। তবে তার সমুদ্রে যাবার সখটাকে না দমিয়ে আরও জোরাল করেছে বেণু।

তিন তলার ফ্ল্যাটের ভাবীর ছোট বোনের কাছে থেকে সমুদ্রে বেড়াতে যাবার মোটামুটি খরচের একটা হিসাব লিখে নিয়েছে। তিনতলার ভাবীর কলেজে পড়া ছোটবোনের নতুন বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর বরের সঙ্গে সাগরের ধারে গিয়েছিল, আজকাল ওই হানিমুন না কি বলে, তাই করতে। ফিরে এসে দশমুখে সবাইকে সমুদ্রের গল্প শোনাচ্ছে। শুনে শুনে বেণুর মনেও কেমন করে কৌতূহলী নেশা ঘনিয়ে আসে। নব-দম্পতির মধুচন্দ্রিমা যাপনের সৌরভে নয়। সাগরে দেখার সাধে।

আলতাফকে এসে দ্বিধান্বিত অনুরোধও করে বসেছিল বেণু—ওগো চল না, আমরা একবার সমুদ্রে বেড়িয়ে আসি।

এমন অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে সাত বছরের বিবাহিত স্ত্রীর মুখটাতে নতুন অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলেছিল আলতাফ—আজকাল বুঝি ফ্ল্যাটের মেয়েদের সঙ্গে ভাগের পয়সায় সিনেমা খুব দেখছ?

বেণু মুখভার করেছে- কি যে তুমি বল। কেন সমুদ্র দেখতে কি মানুষ যায় না। আজকাল তো সবাই যাচ্ছে। ওই তো বি টাইপ ফ্ল্যাটের ভাবীরা, 'ই' টাইপের বেবীর আম্মা সবাই গত শীতে কক্সবাজারে বেড়িয়ে এল।

—তা যে খুশি যাক। কিন্তু দেড়'শ টাকা মাইনের টি এন্ড টি ক্লার্কের বউয়ের সমুদ্রে বেড়াতে যাবার সাধের কথা শুনলে পথের কুকুরটাও হাসবে যে!

টি এন্ড টি ক্লার্কের বউ বেণুর মুখ মলিন—চোখ সজল হয়। কিন্তু ভাব-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেবার লোক আলতাফ নয়। ধুলো ঝাড়ার মত বেণুর আজগুবী সখটাকেই যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় সে—ওসব অদ্ভুত সখ বাদ দাও। আর তিনতলার ভাবীর বোনের কথায় নেচ না। জান ওর স্বামী ইঞ্জিনিয়ার। ওরা শুধু কক্সবাজারের সমুদ্রে কেন ইচ্ছে করলে বিলেতেও যেতে পারে সমুদ্র দেখতে।

বেণু নীরব থাকে। আলতাফ তো জানে না যে বেণুর মনে সাগরের নেশা যারা এনেছে তারা কলোনির ফ্ল্যাটের সাগর ফেরা কোন বৌ ঝি নয়। তিন তলার ভাবীর বোনও নয়। এনেছে আলতাফ নিজেই।

ক্যালেন্ডারটা এনে যখন বেণুর হাতে দিয়েছিল আলতাফ, তখন বেণুও কি জানত তার জীবনের এতবড় একটা সখের ওই কাগজ মোড়া ক্যালেন্ডারের পাতায় আঁকা হয়ে আছে।

শুক্রবার দিন ছেলের স্কুল নেই। বাবলু-লাবলুকে খাইয়ে একগাদা কাপড় কেচে উঠেছে বেণু। তখনি আবার বসেছে একরাশ থালা হাঁড়ি এটো বাসন নিয়ে রান্নাঘরের কলের তলায় মাজতে। বাসন মাজা শেষ না হতেই আলতাফ অফিস থেকে ফিরল। বেণুর হাতে কাগজমোড়া প্যাকেটটা দিয়ে বলল— নাও কি সুন্দর একখানা ক্যালেন্ডার এনেছি তোমার জন্য।

ছাইমাখা হাতেই প্যাকেটটা নিল বেণু। আর তখুনি খুলে ফেলল।

দেওয়ালের কোণে ছাতাটা রেখে সার্ট খুলতে আলতাফ হুঁশিয়ার করল—অনেক চেয়ে চিন্তে ওখানা যোগাড় করতে হয়েছে। দেখো আবার ছাই মাখিও না। যেমন বাসন মাজুনী হয়ে রয়েছো।

বেণু মুখিয়ে উঠে চোখে তাকিয়ে জবাব দিতে যাচ্ছিল, বাসন মাজা ঝি ছাড়া বেশি কি আর আমি। তোমার সংসারে বাসন মেজে কাগড় কেচে মশলা করেই তো দিন যায়। ঝিয়ের তবু মায়না আছে। আর আমি কি পাই। না পারলাম ভাল শাড়ী না গয়না ....।

অনেক পুরনো এবং বহু প্রচলিত খোঁটা এটি বেণুর। দুই ছেলের বাপ স্বল্প মায়নার কেরানি আলতাফের যে একটি ঝি রাখবার ক্ষমতাও নেই এবং বেণুর জীবন যে সেই অভাব পূরণেই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে সুযোগ পাওয়া মাত্র বেণু তা আলতাফকে অন্তত হাজার বার শোনায়। কিন্তু আর তার ব্যতিক্রম ঘটল। ক্যালেন্ডারটার মোড়ক খুলেই মুগ্ধ হল বেণু।

—ওমা! কি সুন্দর। কি চমৎকার নীল। বিস্ময়াভিভুত কণ্ঠে বলল, —ওগো কিসের ছবি এটা।

আলতাফ অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে স্ত্রীকে চমক দিল,—ওটা সমুদ্র! দেখো কেমন নীল?

—সমুদ্র! কি আশ্চর্য সুন্দর। না কি ছবির সমুদ্র বলে এমন সুন্দর বেণুর ভাবনাও থমকালো। হতবাক হল।

সেই থেকেই বেণুর পেয়ে বসল সমুদ্রের নেশা। সমুদ্র দেখার নেশা। এসব হল গোড়ার কথা। তারপর সমুদ্রে যেতে চাওয়া। নানা প্রত্যক্ষদর্শীর সমুদ্র সন্দর্শনের কাহিনী আলতাফকে শোনান, এসবও অনেকদিন ধরে চলছে। বেণু এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সমুদ্র দেখতে সে যাবেই। প্রতিটি দিনের শুরুতে ঘুম ভাঙে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের ছবির পাতায় চোখ দিয়ে। সকাল সকাল উঠে অফিসের ভাত দেওয়া। ঘরদোর ঝাট পাট দিয়ে ধোয়াধুয়ি করা। বিছানা ঝাড়া, তোষক কাঁথা রোদ্রে দেওয়া, বাবলুকে স্কুলে পাঠানো এরি মধ্যে বারে বারে নানা ঝলকের আলো দিয়ে বেণুর চোখে জ্বলে উঠে একরাশ কাশফুলের মত সাদা ফেনার ঝিলিক দেওয়া নীল ঢেউয়ের এক সাগরের ছবি। বেণু সারাটা দিন যেন বিভোর হয়ে থাকে নেশায়। সাবাদিন সংসারের টুকিটাকি কাজের মাঝে ক্যালেন্ডারের ছবিটাকে অনেকবার ঝাড়ে কারণে-অকারণে। সময় পেলেই এসে একটি অলস ইচ্ছার রোমন্থনের মত স্বপ্নিল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে ছবির দিকে। মতিঝিল কলোনির ধোঁয়াটে আকাশ, রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যাওয়া বড় বড় ট্রাক, অন্তহীন জনস্রোত, তার কর্মকোলাহল নিয়ে দূরে চলে যায় যেন। বেণুর দু'কামরার ফ্ল্যাটবাড়িতে শুধু দক্ষিণ সাগরের অবসর যাপন ঘনিয়ে থাকে।

অনেক সময় কাজ সেরে ফেলা হঠাৎ পাওয়া অবসরে শীতের দুপুরে তক্তপোষের ওপর বসে যখন পুরনো খোলা উল দিয়ে লাবলু কিম্বা বাবলুর জন্য সোয়েটার বুনতে বসে। নয়ত আলতাফের সার্ট রিপু করে কিংবা পুরনো কাপড় দিয়ে কাঁথার তালি দেয়, তখন কিন্তু দেওয়ালের ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটা অসম্ভব স্বপ্ন বেণুর মতে দোলা দেয়। যেমন দিয়েছিল আলতাফের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে। দু'জন বন্ধু নিয়ে আলতাফ নিজেই গিয়েছিল বেণুকে দেখতে।

তখনও ঢাকা শহর চোখে দেখেনি বেণু। পদ্মার ধারে ছোট্ট একটা গ্রামে তার পনেরটা বছর পার হয়েছে। আর সেই পনের বছরের প্রথম বসন্তে একডালা স্বপ্নের সম্ভার নিয়ে পৌঁছেছিল, চশমা পর পাতলা শ্যামলা টি এন্ড টি'র কেরানি আলতাফ। মেয়ে দেখে পছন্দ করে ফিরে গিয়েছিল সে। সবাই একবাক্যে সুখ্যাতি করেছিল আলতাফের। কি সুন্দর ছেলে, যেন রাজপুত্র। সে সুখ্যাতি শোনার আগেই

বেণুর হৃদয় ভেসে গিয়েছিস। আলতাফের চশমা পরা সুন্দর দৃষ্টিতে সে অনেক সম্ভাবনার ছবি দেখেছিল। এরপর বিয়ে হয়ে ঢাকায় চলে আসবার আগে পর্যন্ত সে কেবল স্বপ্নে বিভোর হয়ে থেকেছে। সুন্দর একটি ঘর, সুন্দর একটি রাত তাকে সর্বক্ষণ উন্মনা করে রেখেছে। এই সুন্দরের কল্পনাকে সে নানাভাবে ভেঙে গড়ে সাজিয়েছে।

তারপর বিয়ে হয়ে চলে আসার দু'বছের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল সে স্বপ্ন। স্বপ্নের নায়ক আলতাফ হল নেহাতই গদ্যময় হিসেবী লোক, একজন—অল্প মায়নার কেরানি মাত্র। অভাবের বোঝা ভর্তি সংসারের ডুবু ডুবু নৌকাটাকে কম টাকার কমজোর রশি দিয়ে সে স্বপ্নের উজানে টেনে টেনে সদা ক্লান্ত। আর বেণু দু'বছরেই হল সে কলোনির কলহপটু কেরানি গৃহিণীদের অন্যতমা। কোন অতীত স্বপ্নের নায়িকা নয়। বাসন মেজে আঙ্গুলের নখ ক্ষয়ে যাওয়া পায়ের গোড়ালিতে ফাটল ধরা সিঁথিতে চুল ওঠে যাওয়া আধ ময়লা কাপড় পরা বাবলুর মার। স্বপ্ন সেখানেই থেমে গেছে। কিন্তু এই সমুদ্রে ছবিতে তাকিয়ে নির্জন শীতের দুপুরে বেণু আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে! আলতাফ যেন সংসারের ঘানি টানা সদা ক্লান্ত কেরানি নয়। সেও নয় ঝগড়াটে বাবলুর মা। স্কুল ছুটির পর নোংরা ছেঁড়া কাপড় প'রে সারা সন্ধ্যা কলোনির মাঠে খেলে বেড়ান লাবলু-বাবলুও যেন বদলেছে।

বেণু স্বপ্ন বোনে সুন্দর পাজামা পাঞ্জাবি পরা আলতাফ, যেন প'রে বিয়ের আগে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল তেমনি। তার সঙ্গে চমৎকার দামী শাড়ি পরে এলো খোঁপা করে বেণু দুই ছেলের হাত ধরে সমুদ্রে ধারে ঘু'রে বেড়াচ্ছে। বাবলু লাবলুরাও ভাল দামী কাপড় পরেছে। যেমন কাপড় পরে তিন তলার ফ্ল্যাটের ভাবীর ভাইয়ের ছেলেরা ঈদে বেড়াতে আসে। আহ্ কি সুখ, কি তৃপ্তি ছোট্ট এইটুকু কল্পনায়। হিসেব নেই, পয়সার টানাটানি নেই; ঝগড়ার খিটমিটি নেই। বড়লোকদের মত হেসে খেলে তারাও সমুদ্র দেখে বেড়াচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে ভাবে কি মায়াবী সমুদ্রটা। কেমন আশ্চর্য ভাবে বেণুর দিন রাতকে একটা অসম্ভব কল্পনায় ভরিয়ে দিল। আর সেই কল্পনাটার কাছে যাবার জন্য নিয়ত বেণুর মনকে নীল রঙের যাদু দিয়ে ডেকে ডেকে পাগল করল। তাই ত এমন উঠে পড়ে লেগেছে সে। স্বপ্ন চিরদিন শুধু কল্পনায় কেন থাকবে। একদিনের জন্য হলেও কি তা সত্যি হতে পারে না!

প্রথমে দুধওয়ালাকে জবাব দিল বেণু। এ টাকাটা একটা বাজে খরচ ছাড়া কি। দুধের নামে কতকগুলো সাদা পানি কিনে পয়সা ফেলার কি মানে থাকতে পারে। এরপর মাসের বাজারও সংক্ষিপ্ত হল। অত সাবান না কিনলে কি হয় না। না হয় বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, কাপড়, লুঙ্গি একটু ময়লাই থাকল। চা খাওয়াও বন্ধ করতে হয়। সখের মধ্যে আলতাফের এই একটিই ছিল। আর ছিল সিগারেট খাওয়া। নির্মম হাতে সেগুলোও ছেঁটে ফেলল বেণু। সত্যিই তো চা সিগারেটে কি উপকারটা হয় শরীরের। বরং এই কুপথ্য খেয়ে কোন কঠিন অসুখে পড়বে একদিন। দৈনিক কাঁচা বাজারের খরচও নেমে গেল। একদিনের বাজারকে টেনে তিনদিন চালাতে শুরু করল বেণু।

আলতাফ মাঝে মধ্যে অনুযোগ করত—অত কিপ্টেমি করে পয়সা জমিয়ে সাগর না দেখলে কি হয়। যত তোমার আদিখ্যেতা!

বেণু গম্ভীর হয়ে থাকে। কিন্তু মাসের প্রথম দিকে দু'একদিন বাসে চড়বার যে পয়সাটা পেত আলতাফ, তাও বন্ধ করে দেয় বেণু। কোন মাসে আলতাফ হয় তো বলে—বেণু! তোমার এক জোড়া কাপড় কেনা দরকার। সর্বক্ষণ এমন ছেঁড়া তালি দেওয়া নোংরা কাপড় পরে থাক। কলোনিতে থাকি, আশেপাশের লোকই বা বলবে কি।

প্রতিবাদে মুখর হয় বেণু—রাখ তোমার আশপাশের লোক, আমার যেমন আয় তেমনি তো চলব। আমার যখন টাকায় টান পড়বে তখন কি আশেপাশের লোক দিতে আসবে?

তবু আলতাফ ছাড়ে না—বাবলুদেরও তো একেবারে কাপড় নেই। সামনে শীত আসছে।

আলতাফকে নয় যেন নিজের মনের দুর্বলতাকে ধমক দেয় বেণু—শীত আসছে তাই কি। কটা শীত না হয় একটু কষ্টই হল। ছেলেপুলেকে অত বাবুয়ানা শিখিয়ে পরকাল ঝরঝরে করি আর কি!

বেণুর নিজেকেও কি কম সংকুচিত করতে হল। অন্যান্য ফ্ল্যাটের বউ মেয়েদের সঙ্গে সিনেমা দেখা বন্ধ করল সে। মাসের প্রথম সপ্তাহে রিকসা চড়ে এদিক ওদিকে দু-পাঁচ জন আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যেত আগে, সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। বছরে একবার বাপের বাড়ি যাওয়া নিয়ম ছিল। কোনবার অনিবার্য কারণে না যাওয়া হলে বেণু আলতাফকে খোঁটা দিয়ে কথা শুনিয়ে কেঁদে কেটে একাকার করত। এখন নিজেই বলতে শুরু করল—ফি বছব এত পয়সা খরচ আর টানা হেঁচড়া ভাল লাগে না। বিয়ের পর বেশি বাপের বাড়ি গেলে মেয়েদের কদর থাকে না।

বেণুর এই কঠিন মিতব্যয়িতার ফল ফলতে লাগল। ট্রাঙ্কের কাপড় চোপড়ের নিচে ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটুলীতে নোট বাবলুর মোজার মধ্যে খুচরো রেজকী আর পাউডারের টিনের মধ্যে জমতে থাকল। টাকা যত জমছে বেণুর মনে হয়, ক্যালেন্ডাবের ছবিটা যেন তত সুন্দর আর প্রাণবন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দুটো শীত কাটতেই বেণু হিসেব করে দেখল যা তার জমেছে, তাতে আসছে শীতেই তারা সমুদ্রে বেড়াতে যেতে পারবে। আলতাফকে আগে থেকেই বলে রেখেছে বেণু—দেখ বাপু বেড়াতে যাবার সময় কিন্তু ট্রেনেব থার্ড ক্লাসে যেতে পাবব না বলে রাখছি। এমন ভাবে ঘুরব ফিবব যেন দেখে কেউ গরিব না ভাবে।

আলতাফ নিরাসক্ত জবাব দেয—ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটলেই কি আর বড়লোক দেখাবে। চেকার ব্যাটা আমাদের এই ভাতে মবা চেহারা দেখে ঠিক বুঝে ফেলবে আমরা কোন ক্লাসেব লোক।

শঙ্কা ফোটে বেণুর প্রশ্নে-–তার মানে?

—মানে সোজা। ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে কি আব ঢাকতে পাবব যে, আমবা আসলে থার্ড ক্লাসের লোক।

বেণু বিরক্ত হয়—তোমার আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। ফার্স্ট ক্লাসে কেন চড়ে ফজুল খবচ করব সেকেন্ড ক্লাসেব টিকিটে আজকাল সবাই চলে। ওই তো বি টাইপেব ভাবীরা কক্সবাজাবেব যাবাব সময় চাটগাঁ পর্যন্ত তো . .

কথা অসমাপ্ত রেখে বেণু ক্যালেন্ডারের ছবিতে দৃষ্টি বাখে।

সামনের শীতেব আগেই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দুর্ঘটনাই তো! তাছাড়া কি। এত সংযমী এত সঞ্চয়ী হযেও তাকে ঠেকাতে পারল না বেণু। প্রথম দিকে একটু সন্দেহ হচ্ছিল। নিছক সন্দেহ বলেই তাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরে লক্ষণগুলো পুরোপুবি সব প্রকাশ পেল। ঘুম ভেঙেই গা ঘুলিযে বমি আসে। কাজ কবতে করতে মাথাটা ঘুরে ওঠে। আর খেতে বসে তরকারি থেকে উদ্ভট গন্ধ পেটের মধ্যে পাক দিয়ে তোলে। খাওয়া ঘুম কমল। শরীরেবও পরিবর্তন দেখা দিল। শেযপর্যন্ত নিদারুণ ভয়ের মধ্যে দিযে বেণু বুঝতে পাবল সে আবাব মা হতে চলেছে। এমন নিরানন্দের অনুভূতি কোনবারে হয়নি। প্রথম অনেকদিন কেঁদে কেটে মুখ ভাব করে বইল। সংসাব চেয়ে দেখল না। নিরুপায আলতাফ বেণুকে প্রবোধ দিল—কি আব করে বেণু। এমন তো আর উপায় নেই।

বেণু জবাব না দিয়ে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকতায় সংসারেব কাজ করে যেতে লাগল। শীতের মধ্যেই বেণু একটি কন্যা সন্তানের জননী হযে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিবল। শবীরে রক্ত ছিল না—কযেক বোতল রক্ত দিতে হয়েছে বেণুব শবীরে। তবু ফ্যাকাশে চেহাবাব বেণু ছাড়া পেযে বাড়ি আসবার সময় ডাক্তাব ভাল ভাল খাবার আর টনিকের উপদেশ লিখে দিলেন আলতাফের হাতে।

আলতাফ যখন এক পোটলা ওষুধ আব আঙ্গুর মাখন কিনে বাড়ি ফিরল তখন বেণু তার গোপন সঞ্চয়ের স্থানগুলির শূন্যতা দেখে বোবা হযে ঘরে বসে আছে। আলতাফ অপরাধীর মত মাথা চুলকায়— কি করি বেণু। তোমাব টাকাটা খবচ না কবে উপায ছিল না। নর্মাল ডেলিভারী তো হল না। তাছাড়া এত টাকার রক্ত কিনতে হল।

বেণু নিশ্চুপ। কোলে কাঁথায় জড়ান নতুন শিশুটির দিকে তাকিয়ে তার মনে হল এখানেই শূন্যতার শেষ কই। এই তো হাসপাতাল থেকে আর একটি খবচে বাহন নিয়ে এল সে। টাকা আব জমবে না। দেওয়ালে ক্যালেন্ডাবটা হাওযায অল্প দুলছিল। সেদিকে তাকিয়ে বেণুব মনে হল সাগরটা যেন সরে গেছে অনেক দূর।

বেণুর শরীরটা আর কিছুতেই যেন সারছে না, আলতাফ দুপুরের রোদে হেঁটে হেঁটে বাড়ি দেখে বেণু না খেয়ে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। তার অভুক্ত আশাহত রক্তহীন মুখটাকে তাকিয়ে আলতাফের মনটা করুণাসিক্ত হয়। ভাবে আরও খেটে ওভারটাইম করে যদি কিছু টাকা জমিয়ে বেণুর মনের সাধটা পূর্ণ করতে পারে! একবার নিয়ে যেতে পারে সাগরের ধারে! হয়ত শরীর ভাল হয়ে যাবে বেণু। আগের মত উদ্যম ফিরে পাবে।

বেণু ঘুম ভেঙে উঠে বসে। বলে—ওমা কখন এলে? বাবলুটা বুঝি দরজা খুলে খেলতে চলে গেছে। একটু থেমে বলে--যাই তোমার ভাত বেড়ে দিই।

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে আলতাফের ওপরেই এসে পড়ে বেণু, দু'হাতে বেণুর দেহটা ধরে ফেলে আলতাফ—ইস এখুনি তো পড়ে মাথাটা ফাটত।

বেণু আলতাফের কাঁধের ওপর মাথা দিয়ে রাখে। বেণুর শীর্ণ গালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে আলতাফ বলে—-এবার আমার কথা একটু শুনবে? একটা ঝি রাখ, তোমার এ শরীরে খাটাখাটনি একটুও উচিত নয়। একটু থেমে আবার বলে--ভাবছি এবার থেকে আমিও ওভারটাইম করে বাড়তি কিছু টাকা আনব। আসছে শীতের আগেই সমুদ্র দেখতে নিয়ে যাব তোমাকে কক্সবাজারে।

ঝি কিন্তু রাখে না বেণু। তবে নতুন উৎসাহে আবার সঞ্চয়ে উঠে পড়ে লাগে। আবার বাড়তি খরচের ওপর নতুন কাটা ছাঁটা চলে। ছোট খুকির প্রস্টার মিল্ক গ্রাইপওয়াটার কমিয়ে দেওয়া হয়। গ্রামের ছেলেমেয়েরা আবার অস্টার মিল্ক গ্রাইপওয়াটার কোথায় পায়? গরুর দুধ না পেলে মায়ের দুধের পরিবর্তে তারা তো আলোচাল বাটা নয় তো সুজি গোলা খায়। তাই বলে তারা কি বড় হয় না। আবার হিসেব, আবার সঞ্চয়, আর সংসারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া, কোথায়ও অপচয় ঘটতে দেওয়া হবে না।

টাকা জমল। মাস ছয়েকের মধ্যে একা আলতাফের অতিরিক্ত খাটুনিতেই বেশ কিছু জমে গেল। দুপুরে বাবলু স্কুলে গেলে লাবলু আর খুকুকে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আবার পুরনো ক্যালেন্ডারের সমুদ্রে তাকায় বেণু। কল্পনায় ছবিটাকে আবার নতুন করে দেখতে থাকে সেখানে। সুন্দর জামা কাপড় পরে হেসে হেসে গল্প করতে করতে সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াচ্ছে তারা। যেন আলতাফ বেণু নয়। বেণুর স্বপ্ন জগতের দুটি নায়ক নায়িকা।

আবার এল প্রয়োজনের দুর্যোগের ঝাপটা। বেণুর শাশুড়ি এলেন দেশ থেকে। চোখে তার ছানি পড়েছে। অন্ধ হতে চলেছেন, অপারেশন করা ছাড়া উপায় নেই। এমন অবস্থা আর কি গতি। শাশুড়ির চোখ অপারেশনের চাইতে বেণুর সমুদ্র যাওয়া বড় হতে পারে না কিছুতেই। শাশুড়ির চোখ ভাল হতে অনেক খরচ হল। তিন মাস থাকার পর শাশুড়ি যখন দেশে গেলেন তখন পুরো জমা টাকাটাই শেষ। এবার উদ্যমের পালা যেন আলতাফের। ওভারটাইম ছাড়াও কোথায় সপ্তাহে তিন দিনের একটা টিউশনি জুটিয়ে ফেলল সে। দু'জনের এত অক্লান্ত চেষ্টাও কিন্তু সাগর তাদের কাছে এসে এসে ফিরে যেত লাগল। ভাগ্নীর বিয়েতে গচ্ছা গেল টাকা। দু'মাস না যেতেই ছোট ভাইর চাকরির সিকউরিটি মানির জন্য কিছু টাকা দিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করতে হল। এ ধাক্কাটা পূরণ করতে না করতেই হল লাবলু-বাবলুর টাইফয়েড। আবার খরচ আবার নিঃসম্বলতা। এমনি ওঠা নামার মধ্যে দিয়ে বেণু সহসা একদিন, দেখে চমকে উঠল আলতাফের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। চোখের নিচে কালি পড়ে কেবল বিষণ্ণ ক্লান্তিতে সারাটা অবয়ব ছেয়ে আছে।

বেণু অপরাধীর মত অনুরোধ করে--কিছু কাজ কমাও। দরকার নেই অত ওভারটাইমে। যা তোমার স্বাস্থ্যের হাল হচ্ছে দিন দিন।

আলতাফ হাল্কা হাসে—ওভারটাইম বন্ধ করলে সমুদ্রে যাবার টাকা জমবে কেমন করে?

--সে তোমায় করতে হবে না। আমি একাই করে ফেলব টাকার ব্যবস্থা।

আলতাফ আমল দেয় না---দেখো না সমুদ্রে গেলে স্বাস্থ্য আমার দু'দিনে কেমন ফিরে যায়।

পর পর দুটো শীত কেটে গেল। খুকু টুকটুক করে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়ায়। লাবলুও স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সংসারে খরচ বেড়েছে। তবুও টাকা আবার কিছু জমে গেছে। টাকার সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেণুর দৃষ্টিতে ক্যালেন্ডারের পুরনো ছবিটা দিন দিন নতুন হয়ে উঠতে থাকে। সাগরটা বুঝি আর দূরে নেই। আলোর সঞ্চার হয় বেণুর দৃষ্টিতে—রঙ ছড়ায় কপালে চিবুকে। বেণু নতুন আশার মত স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করে। কিন্তু আলতাফের স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে না। বেণু একদিন জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার বলেছে অতিরিক্ত খাটনিতে শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। যে পরিমাণে ক্ষয় হচ্ছে সে পরিমাণে পূরণ হচ্ছে না। ভালো খাওয়া দরকার। ফ্যাট, প্রোটিন, সুগার, ভিটামিন আয়রনের জন্য চাই পুষ্টিকর খাওয়া। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনীর, ছানা—।

বাড়ি ফিরে জোর করে আলতাফের ওভারটাইম বন্ধ করল বেণু দু'দিন। পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেকে দিয়ে ডাক্তারের ফর্দ মত বাজারও করালো ক'দিন। কিন্তু তারপর মুখ শুকালো বেণুর। ইস কি আগুন-দর খাবার জিনিসের। ডাক্তারের কথা মত পথ্যি করতে গেলে তাদের পুরো মাসের বাজার খরচা যে দু'দিনেই শেষ হবে।

আলতাফই বাধা দিল—বাদ দাও দেখি ওসব সাহেবীআনা। তার চাইতে ভাতে ভাত আলু সেদ্ধ যেমন চলছিল তেমনিই কর। তা নইলে ডাক্তারের কথা মত চারদিন খেয়ে পাঁচদিন থেকে বিনা বাজারে উপোস করতে হবে ছেলেপুলে নিয়ে। বরং কিছু টাকা পয়সা জমতে দাও একবার সাগরে ঘুরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেন সাগরের নেশায় হিসেবী লোক আলতাফ নিজের স্বাস্থ্যকে বেহিসাবী করে দেখছে।

যেমন চলছিল আবার তেমনি চলল। কয়েক মাস পরে আলতাফ অফিস থেকে ফিরে বেণুকে জানাল—ছুটির দরখাস্ত করে দিলাম বেণু। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই চল।

আনন্দে বেণুর বুক দুলে উঠল। দূরে নয়। আর দূরে নয। কাছেই সাগর। বেণু হঠাৎ উঠে গিয়ে দেওয়ালের ক্যালেন্ডার কাটা কয়েক বছরের পুরনো ছবিটার ওপর আলতো হাত বুলাল। আলতাফ পেছন থেকে ঠাট্টা করল—কি হল এখনি যে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে!

তিন দিনেই গুছিয়ে বেঁধে ছেঁদে নিল বেণু। কেনাকাটাও করল দরাজ হাতে। আলতাফের জন্য সুন্দর সাদা সুতোর নক্সা তোলা পাজামা পাঞ্জাবি নিল। পুরো হাতরে ওয়াশ'এন ওয়ার সার্টও নিল দুটো। আলতাফ বেণুকে জরিপাড়া নীল শাড়ি পছন্দ করে দিল। বাবলু-লাবলু-খুকুর ভাল জামা-কাপড় কেনা হল। ফ্লাস্ক, ব্যাগ, প্লাস্টিকের ওয়াটার বটল, টর্চ, টুকিটাকি দবকারি, অদরকারি অনেক কিছুই কেনা হল। যেন সাগরের দিকে এক কদম বাড়িয়ে উচ্ছল হয়ে উঠেছে দু'জনেই। আর দক্ষিণের উত্তাল বাতাসে এক কল্পনার ছবিকে রূপ দিতে নেশায় মাতাল বেণু আলতাফকে মাতিয়ে তুলেছে।

সারাটা কলোনির লোকেই প্রায় জানল বেণুরা সাগরে বেড়াতে চলেছে। বি টাইপের ভাবী সাবধান করে দিল— দেখিস বাবলুর মা, সমুদ্দুরে নাইবার সময় তিন ঢেউ পেরিয়ে যাবি না।

বেণুর যেন ক'টা দিন রাঁধা খাওয়া তুচ্ছ মনে হল। আর দু'দিন পরে তারা রওয়ানা হচ্ছে, দু'টো দিনে কতবার ক্যালেন্ডারের ছবিটায় তাকিয়ে আত্মবিস্মৃত হল বেণু তার ঠিক নেই।

বিকেলে আলতাফের অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে একবার তিনতলার ভাবীর কাছে যাবে কিনা ভাবছিল, যাবার আগে কি মনে করে কেনাকাটার পর ট্রাঙ্কের ভেতর কাপড়ের পোঁটলায় যে টাকা রয়ে গিয়েছিল বেড়াতে যাবার খরচ হিসেবে সেটা বের করে গুনতে বসল বেণু। দশ টাকা, পাঁচ টাকার নোটগুলো এক একটা করে ছুঁয়ে দেখতে দেখতে বেণু ভাবল নোট নয় এগুলো এক একটা যেন তাব স্বপ্নকে সত্য করার রূপকাঠি।

দরজার কড়া নড়ে উঠল। ট্রাঙ্কের ডালা বন্ধ করে বেণু ডাকল—এসো। দরজা খোলাই আছে। ছেলেরা বাইরে খেলতে গেছে। কিন্তু আলতাফ ঢুকল না। এলো তিন তলাব ভাবী, তার দেওর আর বড় ছেলে।

—বাবলুর মা।

তিনতলার ভাবীর অদ্ভুত ডাকে চমকে ফিরে তাকাল বেণু। কি হয়েছে ওরা সবাই অমন করে কেন তাকিয়ে? কেন দাঁড়িয়ে?

—কি হয়েছে? উদ্‌ভ্রান্ত বেণুর কণ্ঠে উৎকণ্টা ঝরে পড়ল।

—ভাবী একবার হাসপাতালে যেতে হবে। আলতাফ ভাই অজ্ঞান হয়ে .... ইতস্তত করে থেমে গেল তিনতলার ভাবীর দেওর। মুখ ফিরিয়ে নিল।

বেণুর আঁচল খসে পড়ল উৎকণ্ঠায়। বলল—কি হয়েছে? সত্যি কথা বল। হাসপাতালে কেন?

কেউ জবাব দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। বেণু ছুটে এসে তিন তলার ভাবীর হাত ধরল—বল ভাবী, তোমাদের পায়ে পড়ি সত্যি কথা বল? সে কি আছে?

—না নেই। শেষ হয়ে গেছে। তিনঘন্টা আগেই শেষ হয়ে গেছে। হার্টফেল। অফিস থেকে হাসপাতালে নিতেই ....।

—ভাবী ...।

বেণুর প্রবল চিৎকারে থমকে থেমে গেল তিন তলার ভাবী। ধরবার আগেই টলে দেওয়ালের ওপর পড়ে গেল বেণু। বেণুর মাথার ধাক্কায় দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডারের কাটা ছবিটা ছিড়ে পড়ে গেল।

চেতনা লোপ পেতে পেতে বেণু দেখলো সমুদ্রে ছবিটা ছিঁড়ে উড়ে এসে পড়ছে। আর তাতে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আলতাফের ঝাপসা মুখ। মতিঝিল কলোনির এই ঘর। আর কয়েকজন হিতৈষী পড়শীর চেহারা। সেই সঙ্গে তার সেই স্বপ্ন সম্ভবের কল্পনাটা।

হতচেতন হতে হতে বেণু অনুভব করল আর এক সাগর তার সামনে। তার ঢেউ প্রচণ্ড উত্তাল। অনিশ্চয়তা, নিঃসহায়তা একাকিত্বে ডুবিয়ে দেওয়ার ঢেউ। সেই ভয়াবহতার সাগর আসছে কাছে। আসছে গ্রাস করতে। এগিয়ে আসছে। তাকে বাধা দিতে অসহায় ভাবে হাত তুলে ক্যালেন্ডার কাটা ছবির সাগরটাকেই দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে জ্ঞান হারাল বেণু।

হাশান আজিজুল হক

সারাদুপুর

কাঁকন ছেলেটা বেড়াতে বেরুল। শুকনো মুখে খালি পায়ে বেরিয়ে এল। মা বলল না, কাঁকন কোথায় যাস? ওকেও বলতে হলো না, কোথাও না, এমনি। কাঁকন জানে মা কিছুই জিজ্ঞেস করবে না, কারণ ডাক্তার এসেছিল, বলে গেছে, দাদু মারা যাবে আজ। না হয় কাল। না হয় পরশু। কিন্তু মারা যাবেই। তাই মা জানে দাদু মারা যাচ্ছে। কাঁকনও জানে। এখন ভীষণ শীত পড়ে গেছে। গরম কাপড়চোপড় বের করতে হয়েছে। লেপ রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এই শীতে ঠাণ্ডায় দাদুর মরতে কষ্ট হবে। দাদু বোধহয় রোদে মরতে চাইবে। মাকে বলবে, আমি রোদে মরব।

শীতের গাছের পাতাগুলোকে বিশ্রী দেখাচ্ছে, পথের ওপর ছায়া ভয়ানক ঠাণ্ডা আর ঘাসের ভেতর রাস্তার রঙ দুধের মত সাদা। ঘাস এখনো হলদে হয়নি—হবে হবে করছে। এইসব আধ-মরা ঘাসের ওপর শিশির আধাআধি শুকিয়েছে এতটা বেলা হয়েছে। রোদ কেবল এই সময়টায় একবার চড়াৎ করে উঠেছে, খেজুর গাছে ঘুঘু ডাকছে। অমনি মন কেমন করে উঠল কাঁকনের। সব মরে যাচ্ছে না — কাঁকন এই কথাটা শোনবার মত লোক খুঁজে পেল না। দ্যাখো না, পাতা মরে যাচ্ছে, ঘাস মরে যাচ্ছে.

বাগানগোল ফাঁক ফাঁক, ফ্যাকাশে হলদে হলদে ভিজে ভিজে। মরে যাচ্ছে আর কী! দাদুও মরে যাচ্ছে এইসঙ্গে। এদের সকলে সঙ্গে একবার আলাপ করে নেওয়া দরকার। ঘাস, পাতা, আকাশ ইত্যাদির সঙ্গে। বাতাসের মধ্যে খালি গায়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঁকন বেরিয়ে এল। প্যান্টটা কষে এটে পরল। পাছায় হাত ঘসে সর্দি মুছল। পকেটের মার্বেলগুলো গুনলো একবার, আপন মনে বলল, শালারা জিতে নিয়েছে দশটা। হেরে যাওয়ার স্মৃতিটা আসতেই লোকসানের কথা ভেবে পথের মাঝখানে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু মার্বেলের শোক ভুলল সঙ্গে সঙ্গেই, কী ছাই মার্বেল, দাদু মরে যাচ্ছে সে কথাটা ভাবা-নেই—কী যে তোমার মার্বেল হয়েছে কাঁকন? মা যা বলে সেটাই নিজের করে নিয়ে কাঁকন ভাবল আর ভারিক্কি চালে দু'পকেট হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, এখন বাইরে যাচ্ছি, মা কিন্তু বলছে না, তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না? কাঁকন, স্কুলে যাবে না তুমি? মা বলবেই না কেন? স্কুলে যেতে তো হবেই না। আজ কাল পরশু। আজ কাল পরশুর মধ্যে দাদু মারা যাচ্ছে। মরব মরব করে দাদু যতদিন না মরছে স্কুলে যেতে হবে না। কেউ মরলে কী স্কুলে যাওয়া চলে? ছিঃ, লোকে কী বলবে? অবশ্য মার্বেল খেলাও উচিত না। যে মরছে তার কাছে কাছে থাকা উচিত। এইকথা মনে হতেই কাঁকন আর একটুও দাড়ায় না। হন হন করে হাঁটতে শুরু করে। পায়ের নিচে মাটি ভিজে ঠাণ্ডা। বরফের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা করকরে। মরা লতাপাতা জঙ্গল পেছনে সরে যায়, শুকনো পানি কাতর চোখে কাঁকনের পেছন দিকে চেয়ে থাকে। ফাঁকা চষা জমিটায় হোঁচট খেয়ে পায়ের আঙুলের মাথা ছিঁড়ে রক্ত পড়ে কাঁকন হাঁপায়। দাদুর কাছে যাওয়া যায় নাকি? ওরে বাপরে কী ভীষণ ঠাণ্ডা দাদুর ঘর আর কী ভীষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর একদম চুপ। চেয়ার টেবিল, জানলার কপাট, খাট, বিছানা, পানির জগ, দাদু সব চুপ। আর আমাদের ঘর দেখুন না—অদৃশ্য শ্রোতাকে কাঁকন বুঝায়—আমাদের ঘর হচ্ছে নোংরা, আমি সেখানে পড়ি, কাগজ ছিঁড়ি, ফেলি, নোংরা আমাদের ঘর। বাতাস ঢোকে আর জানলা খটখট করে ওঠে। যাচ্ছেতাই নোংরা আমাদের ঘর। মা আর আমি ঘুমোই সেই ঘরে। আমি চেঁচাই। মা বকে, কাঁকন চেঁচিও না। মায়ের মুখভঙ্গি নকল করে কাঁকন বলে, চেঁচিও না। আমাদের ঘরে খালি মা-টাই চুপ—আর সব ঠিক আছে।

দাদুর ঘরটা অবিশ্যি সবচাইতে ভাল। বাড়ির মাঝখানে ঘরটা। দরজা জানলায় পরদা দেওয়া আছে। অন্য কোনো ঘরে নেই। খাটের ওপর ধপধপে বিছানা, টেবিলে সাদা চাদর পাতা। চেয়ারে তুলোর গদি। টেবিলের ওপর পানির জগ, গ্লাস, ওষুধের শিশি। একটা শুকনো পাতা এসে পড়লেও মা হাতে করে তুলে বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। তিনবার করে ঘরটা ঝাড়া হয় আর ঝি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে মেঝেটা আয়নার মত চটচকে করে। দাদুই সেই কবে থেকে পড়ে আছে, বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না। কেউ ঘরে ঢুকলে দাদু খ্যাপার মত চেঁচায়। বাজারের জটাই পাগলের মতো। বেশি রেগে গেলে বালিশের মাথা ঠোকে। বুড়োটা আচ্ছা চেঁচাতে পারে। খালি ঘ্যান ঘ্যান করে আর চেঁচায় —খেতে দে—খেতে দে—ক্ষিদে লেগেছে, বিরক্ত করে মারল আমার মা-টাকে। কাঁকন একটা গাছকে শুনিয়ে বলল। ওর দাদু লোকটা প্যারালিসিসে পড়ে আছে। মেজাজটা তিরিক্ষে থাকে এজন্যেই। বুড়োর বেশি দোষ নেই। মরতে এত দেরি কারই বা সহ্য হয়? সে বুড়ো ভাবে, যতদিন না মরা যাচ্ছে, দিনে চার বার খেতে হবে, মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কাঁকন তাঁকে বিনা কারণে ভ্যাঙাল।

কাঁকন ঘরে ঢুকলে তো বুড়ো বেশি খুশি হয়। বলে, এই যে ভাই--কী খবর?

হয়তো কাঁকন বলল, স্কুল থেকে এলাম

তা আয়, বোস আমার কাছে।

আমি হাতমুখ ধুইনি এখনো।

তা হোক, বোস।

বাঃ, আমি বুঝি খাব না?

যা তাহলে, বেরো।

তখন কাঁকন হয়ত বসল।

ঘরে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে ফিশফিশ করে দাদু বলল, আজ কী দিয়ে ভাত খেয়ে স্কুলে গেলি বল্‌তো?

ইলিশ মাছ ভাজা, ডাল আর আলুর তরকারি দিয়ে। কাঁকন উৎসাহের সঙ্গে বলে, বুঝলে দাদু—তরকারিটা এত ভালো হয়েছিল না!

ভাই, আমাকে দুটো ইলিশ মাছ এনে দিবি। চুপি চুপি রান্নাঘর থেকে এনে দে।

মা দেখলে পিটিয়ে আমার ছাল তুলবে।

তোর মা দেখতে পাবে না—যা।

আমি পারব না দাদু।

যা না ভাই—লক্ষ্মী—ভীষণ খিদে পেয়েছে আমার।

দাদু তুমি কী? ছেলেমানুষের মতো কেবল খাওয়াব বায়না! ও তো আমরা করব। ত আমি কোনদিন করি না। মা যা দেয় তাই খাই। কেন, দুপুরে তুমি খাওনি? মা দেয়নি খেতে? অত খাইখাই কর কেন? উঠতে পারলে তুমি ঠিক হাঁড়ি থেকে দাদু।

দাদু কথা কানে তোলে না, দুটো ইলিশ ভাজা এনে দে দাদু—তোকে একটা দেব। কাঁকন মুখ গম্ভীর করে বলে, ও! আবার লোভ দেখানো হচ্ছে? তুমি যাচ্ছেতাই হয়ে গেছ। খেলার সাথীদের কাছ থেকে শেখা কথাটা বলে কাঁকন, এবার তুমি টেঁসে যাও দাদু।

এইবার চটে বুড়ো, তাই তো তোরা চাস - তোব মা রাক্ষুসী তাই চায় বলেই তো খেতে দেয় না।

এখন যেই মা ঘরে ঢুকে বলল কী বলছেন, দাদু ভিজে বেড়াল হয়ে গিয়ে বললে, এই কাঁকনমণির সঙ্গে একটু গল্প কবছিলাম আর কী?

দাদুটা এত পারে—ন্যাকা— কাঁকন নাক সিঁটকোয়।

ফাটা আঙুলটায় হাত বুলোতে বুলোতে আব একটা হাত গালে রেখে কাঁকন ভাবতে লাগল, কিন্তু দ্যাখো, সেই দাদু আজ মবে যাচ্ছে। হয় আজ, না হয় কাল, না হয় পরশু। মতি ডাক্তার এসে বলে গেল। দাদু না মরা পর্যন্ত আমাকে আর স্কুলেও যেতে হচ্ছে না। আহা রে—দাদুটা মরে যাচ্ছে —লতাপাতা, ঘাস, আকাশ সব কীরকম মরে যাচ্ছে! দাদু আমার লোক খুব ভালো। মায়া লাগে বুড়োর জন্য। আমি বড়ো হতে হতে দাদু বেঁচে থাকলে দাদুকে রাজা করে দিতাম। কাঁকনের হাসি পেল, দাদু সেদিন দুপুরবেলায় আমাকে ডেকে চুপি চুপি বলল কিনা—কাঁকন আজকাল বাজার যাস না?

কেন দাদু?

বালিহাঁস বিক্রি হচ্ছে না বাজারে? আনিস তো ভাই একটা! বলেই দাদু তেমন ঝিমুতে লাগল।

দাদু মাত্তর একটা বালিহাঁস চায়। কি ওড়ে বালিহাঁসগুলো! শোঁ শোঁ করে শব্দ হয়। কাঁকন আকাশের দিকে চাইল। ম্যাটমেটে রঙ আকাশটার। একটুও ভালো লাগে না। হাঁসগুলো ঐ আকাশ দিয়ে উড়ে আসে—কোথা থেকে কে জানে! কেমন হু হু করে উড়ে আসে। আমি যদি উড়তে পারতাম ওদের মতো! কী মজাই না হতো। এক-একদিন আমাব কী খারাপ লাগে! দাদু মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে—মা কথা বলে না। আমার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। আর না হয় মরে যেতে। কবে মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল কাঁকন সেইকথা মনে করার চেষ্টা করল। পনেরোটা মার্বেল হেরে খেপে গিয়ে একদিন ন্যাজা বলল, ভারী তেজ দেখি যে। তোর বাপ কোথায় জানিস?

মা যেমন বলেছিল তেমনি জবাব দিল কাঁকন, ঢাকায়।

এঃ ঢাকায়! ঢাকায় তো আসে না কেন শুনি?

গর্বের সঙ্গে কাঁকন বলে, আসবে।

তোর বাপকে আর আসতে হচ্ছে না।

কেন?

লোকে ধরে ঠ্যাঙাবে।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কাঁকন, কেন?

তোর বাবা একটা মাগীকে নিয়ে ভেগেছে।

মাগী কী?

মাগী জানিস না? আরে ছ্যা ছ্যা—মাগী জানিস না? এবার আর একা ন্যাজা নয়, সবাই ওকে ঘিরে ধরে হাসল, ভ্যাংচাল, চিমটি কাটল, ছোঁড়া মাগী জানে না— হো হো!

ওদের সঙ্গে খুনোখুনি করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মাকে খুঁজল কাঁকন। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। হাত মুখ না ধুয়েই পড়তে বসল কাঁকন। একটা অক্ষরও পড়তে পারল না, বই খুলে ঘরের ছায়ার দিকে চেয়ে রইল। তারপর ঢুলতে শুরু করল। মা খেতে ডাকলে গেল না। রাত একটু বেশি হলে সব কাজ শেষ করে মা ঘরে এসে শুয়ে পড়তে যাবে, কাঁকন জিজ্ঞেস করে, আব্বা কোথায়?

ঢাকায়।

আসে না কেন?

আসবে। শুয়ে পড়ো কাঁকন। কিছু খেলো না কেন?

আব্বা একটা মাগীর সঙ্গে চলে গেছে?

মা একটু থমকাল, কে বলল?

ঐ ছেলেরা।

নিরুত্তাপ কণ্ঠে মা জবাব দেয়, হ্যাঁ।

মাগী কী?

প্রচণ্ড একটা চড় কষে ওর মা ফেটে পড়ে, রাতুদুপুরে শয়তানি। পাজী কোথাকার। হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি তোমার। মাগী কাকে বলে জানিস না—আমি একটা মাগী।

পাশের ঘর থেকে দাদু বলে, কী হলো?

কাঁকনের মা রাগে ফুলতে ফুলতে ছুটে যায় ও ঘরে। দড়াম করে দরজা খুলে বলে, খবরদার, একটা কথা নয়, একদম চুপ। কুচুটে বুড়ো, কিছু জানে না!

অ, আচ্ছা—দাদু আর কথা বলে না। ঘুমোয়, না জেগে থাকে কে জানে? মা ফিরে আসে, দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দেয়। তারপর শুয়ে পড়ে। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে কাঁকনের ইচ্ছে হয়ে মরে যেতে। মাগী খুব খারাপ কথা, ছি ছি করার মতো কথা? নাকি খারাপ জিনিস? কেমন জিনিস? জিনিসটা ঠিক কিরকম জানবার ইচ্ছা নিয়ে কাঁকনের মরে যেতে মন করে।

সেই একবার। আরো একবার ইচ্ছে হয়েছিল। এই তো কদিন আগে। কাঁকন মনে করল ঘটনাটা। স্কুল থেকে দুপুরে হঠাৎ বাড়ি চলে এল। খুব রোদ ছিল। গাছপালা পুড়ছিল। মাটি পুড়ছিল। এইসব পোড়ার পটপট শব্দ হচ্ছিল। কাঁকন গন্ধ পাচ্ছিল। এইসব পুড়ছিল আর ঝিমুচ্ছিল। ওদের বাড়িটাও রোদে থিরথির করে কাঁপছিল। দাদুর ঘরে কেবল ঠাণ্ডা ছায়া, ওষুধের মিষ্টি একটা গন্ধ, টেবিলে পানির জগ, গ্লাস। দাদু ছায়ায় শুয়ে। কাঁকনের ইচ্ছে হলো একবার দাদুর ঘরে যেতে। দাদু হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। কলতলায় একটা কাক খানিকটা রোদ আর খানিকটা ছায়ায় থেকে একটা হাড় আছড়াচ্ছে। হঠাৎ হাফ ছেড়ে লাফিয়ে একটা মরা ইঁদুর তুলে নিয়ে এল, উড়ে গেল, সজনে গাছে বসল। একটা সাদা লম্বা-ঠ্যাং ফড়িং ঘাসে তিরিং করে লাফ দিল। কাঁকন নিজেদের ঘরে এল, ঘরের ছায়ায় বিছানায় ফরশা একটা মানুষ শুয়ে, মায়ের কোলে তার মাথা, মা ওর চুলের ভেতর আঙুল চালাচ্ছে, তারপর মা তারা মাথা নামিয়ে আনে, কাকটা চিৎকার করে ওঠে কা কা করে, কাঁকন ইঁদুরটা রেখেছে কার্নিশে, আবার তুলে নিল ঠোঁটে।

মা বিষণ্ণ চোখে কাঁকনকে দেখল, বলল আয়।

লোকটা উঠে দাঁড়াল, চুল ঠিক করল, একটা হাইও তুলল, মা বলল, আমার ছেলে কাঁকন।

আচ্ছা—কাঁকনের থুতনিতে একটা টোকা দিয়ে মায়ের দিকে ফিরে লোকটা বলল, চলি। তারপর

চটপট রোদের রাস্তায় বেরিয়ে গেল। রোদে-পোড়া গাসের গন্ধ ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল আর পটপট শব্দ হলো। কাকটার পাত্তা নেই, তার বদলে সজনে গাছে সবুজ রঙের একটা পাখি লেজ নাচাচ্ছে, কলতলায় এঁটো বাসনকোশনের ডাঁই পড়ে আছে। সেদিকে চেয়ে মা বললে, কাঁকন কাউকে কিছু বলবে না।

লোকটা কে?

কাউকে কিছু বলবে না তুমি।

রাগে কাঁকন চোখে কিছু দেখতে পেল না। মায়ের মুখটা কলতলার দিকে ফেরানো।

সে বলল, বলব।

না, বলবে না।

হ্যাঁ বলব, সবাইকে বলব।

কাঁকন।

হ্যাঁ বলব, সবাইকে বলব—রাগ নয়, চোখের পানিতে এখন কাঁকন কিছু দেখতে পাচ্ছিল না, বলব, যাকে খুশি তাকে বলব—জবাই করা মুরগির মতো সে আছাড় খেল, লাফাল, ধেই ধেই করে নাচল, বলব, বলব, সবাইকে বলব।

মা চুপ করে চেয়ে চেয়ে দেখল ওকে, দেখতে দেখতে রোদ ঝিমিয়ে এল, কাঁকন ঘুমিয়ে পড়ল। পড়ন্ত রোদে অনেকগুলো কাক কলতলায় জমে চেঁচাতে শুরু করল। কাঁকন সেদন ঘুম থেকে উঠেছিল সন্ধ্যাবেলায়। চোখ কচলে তার মনে হলো সকাল হয়েছে আর মনে হলো মরে গেলে বেশ হয়। নিজেকে শুনিয়ে সে বলল, কাঁকন তুমি মরে যাও। মায়ের সঙ্গে লোকটাকে দেখে তার কেন যে মরে যেতে ইচ্ছে করল কে জানে। লোকটা কী খুব খারাপ? কয়েকবার দেখেছে তাকে, পাকা রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে মোটর সাইকেলে যায় ঝকঝক করে। একবার এসেছিল দাদুকে দেখতে। খুব খারাপ নাকি লোকটা? কিন্তু মায়ের সঙ্গে লোকটা ঐভাবে থাকলে কাঁকনের মনে হয়, তার, না হয় তার মার মরে যাওয়া উচিত।

এই নিয়ে কাঁকন যখন গালে হাত দিয়ে ভাবছিল, ওর পকেট থেকে একটা মার্বেল গড়িয়ে পড়ল। চমকে উঠে দাঁড়ায় কাঁকন। মনটা তখন ওর ভারী খারাপ। বোকার মতো সে গড়িয়ে-চলা, মার্বেলটার দিকে চেয়ে দেখল। একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে মায়ের সকালবেলার কথা মনে পড়ল, কাঁকন আজ বিকেলে বাড়িতে থাকবে।

কেন?

না, বাড়ির বাইরে যাবে না বিকেলে।

তখুনি বুঝতে পারল কাঁকন, দাদুর কথা বলছে মা? ডাক্তার যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিল আমি শুনেছি জানো?

বেশ করেছ। বাইরে যেও না আর, মায়ের গলা একটু কাঁপল—কাঁকন মায়ের দিকে চেয়ে, আর—বিকেলে তোমার আব্বা আসবেন।

সত্যি? কখন?

বললাম তো বিকেলে।

ভারী মজা হবে।

বাড়িতে থেকো আজ। মা আর কথা বাড়াল না।

সকালবেলার কথা মনে পড়ে এখন কাঁকনের মন কিন্তু আরো মুষড়ে পড়ল। মজা হবে না ছাই। সেই লোকটা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। ওর মনে হয়, লোকটা সবসময় ঘরে রয়েছে, আর মায়ের কোলে তার মাথা। মায়ের কোলে কতদিন যাই না—ছিঃ, বড় হলে আবার কেউ মায়ের কোলে যায় নাকি। কিন্তু মা তো ইচ্ছে করলে কোলে টানতে পাবে—আমি নাইবা গেলাম! মা টানে না। আব্বা কোন ঘরে থাকবে? আর সেই মাগী কথাটা পরে জেনেছে, একটা যাচ্ছেতাই। মা বলল কথাটা সত্যি। তাহলে

মায়ের ছেলে কাঁকন তোমার আব্বার মুখ দেখা উচিত কী? পাকা ঝুনো ছেলে কাঁকন ঝাঁকি দিয়ে চুল সরাল কপাল থেকে।

একটা শব্দ হলো শোঁ শোঁ করে মাথরা ওপর। কাঁকন রোদ থেকে চোখ আড়াল করে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল। বালিহাঁসের বিরাট একটা দল উড়ে যাচ্ছে। ওদের পা পেছনে ফেরানো, গলা এগিয়ে দেওয়া সামনের দিকে। রোদে ঝলকাচ্ছে ওদের কালচে ডানা, গলার কাছে ফিকে নস্যি রঙ যেন সোনালি। হঠাৎ সাঁ করে ঘুরে একটা বড় ত্রিভুজের আকার নিয়ে দলটা বিলের দিকে ফিরল।

সব কষ্ট-দুঃখ ভুলে কাঁকন হাততালি দিয়ে বলল, এতদিন কোথা ছিল তোরা? একটা নেমে আয় না! ভয় নেই। দাদু একটা খেতে চেয়েছিল—তা দাদু আজ না হয় কাল, না হয় পরশু মরে যাচ্ছে, খেতে পারবে না। পুষব আয়।

হাঁসগুলো আমন্ত্রণে কান দেয় না। রেলগাড়ির মতো হু হু করে বাতাস কেটে বিলের দিকে এগোয়। মার্বেলটা কুড়িয়ে পকেটে পুরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করল কাঁকন। তারপর পাছায় সর্দি মুছে দৌড়ুল চযা জমির ছোট মাঠ, আগাছার পোড়ো জমি, বুক পর্যন্ত উঁচু আধমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ভাঙা দালানবাড়ির ভিটে থেকে একটা ঘুঘু আড়চোখে কাঁকনের মারমূর্তি দেখে নিয়ে পিরিং করে ডানার শব্দ তুলে উড়ে গেল। ঝোপের পাশে একটা শেয়াল বিশ্রাম নিচ্ছিল চোখ বন্ধ করে। কাঁকন হুড়মুড় করে প্রায় তার ওপরে পড়ল। ভীষণ বিরক্ত হয়ে শেয়ালটা সরে গেল। কাঁকন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল একটুক্ষণ। তারপরেই আবার ছুটতে শুরু করল।

এখন হাঁসগুলোকে আর দেখা যায় না। রোদটাও মিইয়ে লালচে হয়ে এসেছে। কাঁকন সামনে রেললাইন দেখতে পেল। পেছনে ঝাপসা মাঠ আর রেললাইনের ওপারে বিরাট বিলটা। এতবড় বিলটা যে ভয় পেল কাঁকন। এর মধ্যে কোথায় হাঁসগুলো বসেছে দেখতে পেল না সে। এতদূর দৌড়ে এসে ক্লান্ত অবসন্ন কাঁকন রেললাইনের নিচে জমির আলে বসে পড়ে। কোনদিকে ওদের বাড়ি বুঝতে পারে না। আর হাঁসগুলোকে দেখতে না পেয়ে দুঃখে কষ্টে ও আবার ভেঙে পড়ে। ভারী দুঃখী হয়ে যায় কাঁকন। সেই মনের যাওয়ার ইচ্ছাটা ফিরে আসে। আহা রে যদি মরে যেতাম- -কত ভালো হতো —হাঁসগুলোর মতো উড়তে পারতাম। তার বদলে দাদুটা মরে যাচ্ছে। হয়তো এখুনি দাদু মরেছে। একটা বালিহাঁস খেতে চেয়েছিল দাদু। দাদু মরে গেলে চেয়েচিন্তে একটা বালিহাঁস খেলেও খেতে পারবে। এই সঙ্গে মায়ের কথা মনে পড়ল কাঁকনের আর ওর বুকটা যেন ফেটে যেতে চাইল! মা-টাও মরে গেছে। মা-টাও মরে গেছে বলে মনে হয় আমার! আব্বার সঙ্গে বিকেলে কী আজ দেখা হবে? সেই মেয়েলোকটা কী আসবে?

কাঁকন ছেলেটার মনে কীরকম মনের যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়। দারুণ শীতের জন্য সেইসময় ঘাস, পাতা, আকাশ, রোদ সবকিছু মরছিল বা মরণাপন্ন ছিল।

'হাঁসগুলো ঠিক এই সময়েই বিল ছেড়ে আকাশে উঠল আর কাঁকন দেখল ওদের। আস্তে আস্তে উঠে এল সে রেললাইনের ওপর। চারদিকে চেয়ে দেখল। আকাশের রোদ কমে এসেছে, কিন্তু রেললাইনটা ঝকঝক করছে।

বেলা তিনটের ট্রেন ক্রূর আনন্দে ঝকঝক গুমগুম শব্দ তুলে দৈত্যের মতো চলে গেল। তারপর কী নিদারুণ স্তব্ধ প্রশান্তি!

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

তারাবিবির মরদপোলা

ভেতর থেকে তারাবিবির একটানা সংলাপ কানের ফুটো দিয়ে মাথায় ঢুকে এলোমেলোভাবে আঁচড়াতে শুরু করলে গোলজার আলীর সাজানো গোছানো বাত্রিবেলাটা একেবারে তছনছ হয়ে গেলো।

অথচ সন্ধ্যা থেকেই চারিদিকে সব ভালোই ঠেকছিল। আজ তার দোকান বন্ধ। মাইক-টাইক যা আছে এক কলেজের কি একটা ফাংশনে সব ভাড়া করে নিয়ে গেছে। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর পর লম্বা একটা ঘুম দিয়ে ও গেলো ফকিরচাঁদের আজাদ রেস্টুরেন্টে। শীতের সন্ধ্যায় ঘুম-দিয়ে-ওঠা টাটকা চোখ-মুখ আবার কবে পাওয়া যায় কে জানে! ঘুমভাঙা মুখে কড়া-সেঁকা দুটো শিককাবার খেয়ে বেশ আয়েস করে চা খাচ্ছে, দোকানে ঢুকলো আসাদুল্লা। পিরিচে চা ঢেলে ঠোঁটের কাছে পিরিচ তুলে আসাদুল্লা বলে, 'জলদি খা, তরে আমি বিচরাইয়া মরি। চল মুন সিনেমায় যাই'।

মুন সিনেমা থেকে বেরোবার সময় গোলজার আলী একেবারে পূর্ণ শরীর নিয়ে পা ফেললো। এরকম ছবি অনেক দিন দ্যাখেনি। ইংরেজি ছবি—কথাবার্তা কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু মুখের ভাষায় কী এসে যায়? কথা যা হলো সব হাত দিয়ে। খালি ঘুষি আর হাতাহাতি। একেকটা ব্লো দ্যাখো, হাজার টাকা, লক্ষ টাকা দাম। নিজে সে মারামারিতে পটু নয়, কিন্তু যাদের সঙ্গে দিন-রাত ওঠা-বসা তারা প্রায় সবাই ঐ লাইনের। আজকাল রিভলভার আর স্টেনগানের যুগে তাদের সেইদিনও নেই, সেই হাতও আছে কি-না সন্দেহ। কিন্তু এই ছবিতে মানুষের হাতের যে ওস্তাদি দ্যাখা গেলো তাতে সে একেবারে অভিভূত। হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তায় পা দিয়ে আসাদুল্লা বলে, 'ল, গঙ্গাজলিটার মইদ্যে একটা পাক দিয়া যাই। আউজকা তরে বউনি করাইয়া দেই'।

'না ওস্তাদ।'

'তে চল, এ্যাম্বে বইয়া থাকবি, এক বোতল মাল টানবি। আমি কাম সাইরা বারাইয়া আহুম চল।'

'যা, ঘরে গিয়া বৌয়ের বুনি চোষ গিয়া।' আসাদুল্লা চটে যায়, 'তরে মানুষ করতে পারলাম না গোলজার।'

মানুষ হওয়ার তেমন ইচ্ছাও গোলজারের আছে কি-না সন্দেহ। আসাদুল্লা চলে গেলে সে সোজা পথ ধরে হাঁটতে লাগলো। সত্যি, এরকম ঘুষির দৃশ্য,—সে এতো ভাল ছবি দেখে আসছে তার বেশির ভাগই তো ফাইটিং খেল – কিন্তু না, এরকম কোনদিন দ্যাখেনি। একটা ব্লো আরেকটার সঙ্গে ধাক্কা খায়, ঘন ঘন সংঘর্ষ হচ্ছে, কেবল টক টক টক টক আওয়াজ। ঘরে গিয়ে সখিনার সামনে কি করে এই ঘুষিসমূহের একটা বায়বীয় প্রদর্শনী দ্যাখাবে সেই নিয়ে সে নানারকম ফন্দি আঁটে আর যতোবার একটু ওপরে তাকায় দ্যাখে সমস্ত আকাশ জুড়ে সিনেমাস্কোপের পর্দা টাঙানো, সেখানে শক্ত সমর্থ সব জোড়া জোড় হাত ঘুষির মুদ্রা করে নাচন দ্যাখায়। এমনি করে ঘুষির নৃত্য ও টকটকাটকটক সঙ্গীতে আপ্লুত হয়ে গোলজার তার বাড়ির সামনে চলে আসে। তাদের বাড়ির সামনে খসেখসে পড়া পাতলা ইঁটের ফ্রেমে মস্ত বড়ো কাঠের দরজা। এই দরটা খুব মোটা, খুব পুরনো ও ছিদ্রসমৃদ্ধ। একটি অন্যতম ছিদ্রে মুখ লাগিয়ে সে তার স্ত্রীকে ডাকতে যাবে, এমন সময় তার কানে আসে তারাবিবির দীর্ঘ ক্ষোভধ্বনি, 'তুমি একখানা মরা মানুষ! তামামটা জিন্দেগী ভইরা খালি বিছানায় মইদ্দোই পইড়া রইছো, একটা দিন বুঝবার পারলা না আমি ক্যামনে কি পেরেশানির মইদ্দো ঘরবাড়ি চাই। কি একখানা পোলারে প্যাটে ধরছিলাম, হায় রে আল্লা, হাসরের দিন আমি আল্লারে কি জবাব দিমু? রাইতে হইছে বারোটা না একটা, ঘরের মইদ্যে অরে পাইবা না। কৈ কৈ কার লগে রঙ কইরা বেড়ায়, আমি জানি না, না?' এই সংলাপে গোললজার আলীর সারাটা সন্ধ্যা, ব্লো-ফোটানো রঙিন চলচ্চিত্র, রাস্তায় নিয়নের আলোতে ঘুষির নাচন—সব একেবারে ঘোলা হয়ে যায়। নিজেকে আর নিজের দখলে রাখতে ইচ্ছা করে না। নিজের বিবেচনা ও সুখ-দুঃখের সমস্ত দায়িত্ব অন্ধকার ল্যাম্পোস্টের নিচে হলদে কালো নালায় গড়িয়ে দেওয়ার জন্য সে আঁকুপাকু করে।

'আলী হোসেনের বৌ—এক্কেরে বেশরম মাগীটা—অর লগে কিয়ের গুজুরগাজুর, ফুসুরফাসুর, আমি বুঝি না, না?' অপরিসর উঁচু বারান্দায় বসে মা জননী তার ফের নতুন বাক্য গঠন করে, একেকটা বাক্য আরেকটার চেয়ে তীক্ষ্ণ, প্রত্যেকটি পরবর্তী বাক্যে মায়ের সন্দেহপ্রবণতা প্রায় প্রমাণে পরিণত হয়।

'কামের মাতারি রাখবা তো দিনরাইত খালি তার লগেই রঙ, তার লগেই কথা। সুরুজের মাও, পানি লও; সুরুজের মাও, আমার গাঞ্জি কই? সুরুজের মাও, নাশতা দাও। ক্যান?—অর বৌ আছে না?'

আর কতো? বুকে হাত দিয়ে দরজার একটা ফুটোয় মুখ রেখে গোলজার তার স্ত্রীকে ডাকে, 'সখিনা।' একটু পরে 'কে?' বলে উত্তরে অপেক্ষা না করে সখিনা এসে দরজা খুলে দেয়। দরজা খুলে সে একটুও দাঁড়ায় না। এই দরজার পর কয়েক হাত ঘাসগজানো কাঁচাপাকা জায়গা, তারপর উঁচু বারান্দা। বারান্দা একেবারে স্তব্ধ। গোলজার আলী এখন দরজা বন্ধ করছে বলে তার পিঠ বারান্দার দিকে ফেরানো। দরজা বন্ধ করতে যতোটা সময় নেওয়া যায় ততোটাই ভালো। খিল লাগিয়ে একবার খুলে ফের লাগাচ্ছে। সমস্ত বাড়িতে এখন কেবল দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। এই কাজ শেষ হলে মুখ ঘুরিয়ে গোলজার দেখলো বারান্দা জনশূন্য। ভালোই। মায়ের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার সময় আরো খানিকটা পিছিয়ে গেলো। কিন্তু বারান্দায় ওঠবার পাঁচটা ধাপ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। এরপর একটা উঁচু দরজা দিয়ে ঘরটায় ঢুকে তারাবিবিকে অতিক্রম করে তাকে নিজের ঘরে যেতে হবে। তারাবিবির ঘর বেশ লম্বা। অন্ধকার বারান্দা থেকেও তার আলোকিত ঘর ঘোলাটে হলুদ মনে হয়। ঘরে ঢুকে প্রথমে চোখে পড়ে উঁচু ছাদের অনেক নিচে অন্ধকার বলে যে জায়গাটাকে বস্তুহীন খাদ বলে ভুল হয় সেখানে কাঠের ল্যাম্পোষ্টের মতো এবড়োথেবড়ো ও বাঁকাচোরা শরীর কাঁপাতে কাঁপাতে পাশ ফিরছে রমজান আলী। পাশ ফিরতে তার আশি কি বিরাশি বছরের ঝরঝরে কাঠামোর ভেতর থেকে অপরিশোধিত কাশির একটা দমক বয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেরকম কিছু হয় না। আলো তার সহ্য হয় না, তাই পান সাজছে তারাবিবি। তার গা ঘেঁষেই গোলজার নিজের ঘরে যায়। ঘরের বিপরীত প্রান্তের তক্তপোষ থেকে রমজান আলীর শ্লেষ্মার পরতে জড়ানো কণ্ঠস্বর সমস্ত ঘর জুড়ে ঘর্ঘর করে ওঠে, 'খিড়কি-উড়কি লাগাইছো?'

'তোমার কইতে হইবো?' তারাবিবির এই জবাব শেষ হতে না হতে গোলজার নিজের ঘরে পৌঁছে যায়।

'পালঙের তলা দেখছো?' রমজান আলীর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব শোনবার আগেই গোলজার আস্তে করে দরজা বন্ধ করে দিলো।

গোলজারের ঘরের মেঝেতে লাল শালুর বর্ডার দেওয়া ছেঁড়া শীতলপাটিতে ভাতের গামলা, তরকারির বাটি ও একটি পিরিচে আলুভর্তা কাঁচামরিচ ও নুন। শীতলপাটিতে বসে ভাত-তরকারি খেতে খেতে গোলজার বলে, 'মায়ে খুব চালাইলো, না?' জবাব না দিয়ে সখিনা বিছানার মশারি টাঙায়, বালিশ সাজায় এবং একই চাদর শতবার সোজা করে। সখিনার প্রায়-ফর্সা ও গোল মুখ বড়ো থমথমে। সেই মুখে যদি একটু রোদ খেলানো যায় এই আশায় গোলজার আলী বলে, 'তুমি আমার লগে একটু খাইবা?' জবাবের আশা না করেই সে খলসে মাছের কাঁটা বাছে। বাছতে বাছতে বলে 'মাছটা নরম হইয়া গেছিলো, না?' কিন্তু নরম মাছে তার অরুচি দ্যাখা যায় না। সে অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছে। মাথা নিচু হতে হতে বুকের ওপর এসে ঠেকেছে, খাটের স্ট্যান্ড ধরে দাঁড়িয়ে সখিনা আড়চোখে তাকায়, গোলজার কি ঘুমিয়েই পড়লো নাকি? মাগরেবের নামাজ পড়ে জায়নামাজ ভাঁজ করতে করতে তারাবিবি সেই যে শুরু করেছিলো, আল্লারে চলার ধ্বনি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মোড়ের রেস্টুরেন্টে বাজতে-থাকা গান আরো বিকট হয়, এগারো নম্বর বাড়ির খাদেম পাগলার বিরতিহীন চিৎকার এবং সর্বোপরি এই অঞ্চলের হৃৎস্পন্দন—কোন কিছুই আর স্পষ্ট ও আলাদা করে ঠাহর করা যায় না।

গোলজার বলে, 'মায়ে খুব প্যাচাল পাড়ছে না?'

গোলজার আলী ফের বলে, 'মায়ে তোমারেও কিছু কইছে?'

'আমারে তুমি মীরকাদিম রাইখা আহো। নাইলে মিয়াভাইরে সোম্বাদ দাও, আইসা লইয়া যাইবো।'

খাওয়া হয়ে গেলেও ভাতের কয়েকটা দানা নিয়ে গোলজার আঙুলে আঙুলে নাড়াচাড়া করে। সখিনা বলে, 'আমার আর ভালো লাগে না। আর কতো সইজ্য করুম?'

সখিনার এই কথায় এক ধরনের অভিমান গোলজারের বুকে পাতলা শ্লেষ্মার মতো জমে : তার মায়ের এই ব্যবহারে সবচেয়ে ভোগান্তি হওয়ার কথা তো তার নিজের, গোলজার আলীর। তার নিজের বৌও তার কষ্টের ভাগ নিতে স্বীকার করে। এই নতুন প্রতিক্রিয়ায় তার আড়ষ্টতা কাটে। খাটের তলা থেকে চিলমচি টেনে হাত-মুখ ধোয়, খক খক করে গলা পরিষ্কার করে, তারপর পা ঝুলিয়ে বিছানায় বসে সখিনার হাত থেকে পান নেয়। সখিনা এঁটো থালা-বাসন নিয়ে জমা করছে ঘরের এককোণে। এই কাজের মধ্যে নীচু ও তীব্র খাদে তার মুখ চলে, 'আমরা গেরাইম্যা মাইয়্যা, ছোটোলোকগো ঘর থন আইছি, তোমাগো খান্দানী ঘরের জামাইরে বাইন্দা রাখি ক্যামনে?'

তার স্ত্রী গ্রামের মেয়ে এ জন্য গোলজার আলীর কোন দুঃখ নেই, কিন্তু তার মায়ের এই কথাটা বলার মধ্যেও সে আপত্তির কোনো কারণ দেখতে পায় না। তবে তার স্ত্রীকে বিদ্রূপ করার একটু ইচ্ছাও তার কোনোদিন হয় না। চেষ্টাচরিত্র করলে সন্ধ্যাবেলাটা এখনো জোড়াতালি দিয়ে নিয়ে আসা যায়।

'তোমার জামাইরে বান্দবা কেমুন? আমি কি তোমারে ছাইড়া দিছি? তুমি কইতে পারলা না?'

'কি কই?'

সখিনা তার শাশুড়িকে কি বলতে পারে? গোলজার আলী সখিনাকে বহুদিন আগেই জানিয়ে দিয়েছে যে সন্দেহপ্রবণতা তার মায়ের অনেকদিনের অভ্যাস। সখিনার এই অভিজ্ঞতা প্রথম হয় বিয়ের মাস তিনেক পরই। একদিন এই ঘরে গোলজার, সখিনা এবং গোলজারের বন্ধু আলী হোসেন ও আলী হোসেনের বৌ রাবেয়া সারাটা বিকাল জুড়ে খুব গল্পগুজব করে। যেমন আলী হোসেন, তেমনি তার বৌ—দু'জনেই খুব জমাতে পারে। আলী হোসেন মানুষের চরিত্র অঙ্গভঙ্গি করতে ওস্তাদ,—তোতলা মানুষের কথা, শিশুর কান্না, কুকুর-বিড়ালের ডাক, এমন-কি বোতলের ছিপি খোলার শব্দ, ঘড়া থেকে জল গড়াবার আওয়াজ—সব দ্যাখাতে পারে। রাবেয়াও খুব সপ্রতিভ মেয়ে, একবার আলী হোসেনকে থামিয়ে সে গোলজারকে বলে, 'অ গোলজার ভাই, অহন আপনের দোস্তের নাক ডাকাটা দ্যাখাইয়া দেন তো!' তারপর সে নিজেই তার স্বামীর নাক ডাকা থেকে শুরু করে কলা খাওয়ার ভঙ্গি পর্যন্ত দেখিয়ে দিলো। সখিনা তার জীবনে এই প্রথম একনাগাড়ে এতক্ষণ ধরে হাসে। হাসতে হাসতেই সন্ধ্যা হয়, সন্ধ্যার পর রাবেয়া বোরখা পরে আলী হোসেনের সঙ্গে বাড়ি চলে গেলো। গোলজারও ওদের সঙ্গে বাইরে যায়। ওদের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাবিবি সখিনাকে ডাকে,

'অ বৌ। এতো হাসির কিয়ের?'

আলী হোসেন ও রাবেয়ার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি মনে করে সখিনা মুখে আঁচল দিয়ে ফের হেসে ফেলে, 'আম্মা ঐ বৌটায় যে কেমুন করে না! দেইখা হাইসা বাঁচি না!'

কিন্তু তারাবিবির মুখ খুব গম্ভীর। সে বেশ কালো, বেশ লম্বা ও মোটা। তার পরনে তখন কোনো জামা নেই, শাড়িটা বুকে পেঁচিয়ে দেওয়া। গরমে সে হাঁসফাঁস করে। একটু পর সখিনা টের পায়, এই হাঁসফাঁসটা সম্পূর্ণ গরমের জন্য নয়, তারাবিবি খুব রেগে গেছে।

'বৌ, খাল কাইটা কুমীর ডাইকা আইনো না, বুঝলা?'

'জী?'

'খাল চিনো না?' তারাবিবি অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে, 'গেরাইম্যা মাইয়া তুমি খাল চিনো না? খালের ধারে হাগামোতা কইরা মানুষ হইছো আইজকা খাল চিনবার পারো না?

এরকম অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাকে ছোটো করার পর তারাবিবি আসল কথা পাড়ে 'ঐ বেশরম মাইয়াটারে চিনো?'

'আলী হোসেন ভায়ের বৌ?'

'আরে আমারে চিনাইতে চাও? খাদেম পাগলার মাইয়ারে আমি চিনি না, না? আমার গোলজারের লগে লাগাইয়া দিবার লাইগা খাদেম ভাই কতো তদবির করছে। গোলজারের নজরখানও তো আছিলো

ঐদিকেই। দেইখো বৌ, নিজের লোকসান কইরো না। দেখলা না, বেগানা মরদের লগে কেমন হাইসা হাইসা কথা কইলো, দেখলা না?'

সেই রাত্রি গোলজারের জন্য খুব খারাপ। সখিনা কোনো কথা বলে না, কোনো কথাতে তার কোনো সাড়া নেই। বিছানায় ফেলে অনেক কষ্টে গোলজার তাকে চুমুটুমু খাওয়ার পর সে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে ছিঁড়ে সখিনা তার বিবাহিত জীবনের প্রথম আঘাতের কথা বললো।

'তুমি আমার কপালডা জড়াইবা? আমার বাপজানে বহুত হাউস কইরা বিয়া দিছে, তুমি এইগুলি কি করো, এ্যাঁ?'

সখিনার কথার ফাঁকে ফাঁকে জিগ্যেস করে, 'তোমারে আম্মায় কইছে?'

'হ।'

'আম্মায় কি কইতে কি কইছে! তুমিও একটা পাগলি কি বুঝছো।' কিন্তু এতে কোনো কাজ হয় না। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে গোলজার দ্যাখে, বালিশে মুখ গুঁজে, কখনো খাটে বসে দুই হাঁটুতে মুখ ঢেকে সখিনা ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তাকে জেগে উঠতে দেখে সখিনা অন্যদিকে মুখ করে শোয়। তার পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে, তার পিঠে শাড়ি নেই, ঘামে ব্লাউজ ভিজে চপচপে। সেদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ অবিরাম একটা আওয়াজ কানে এলে সমস্ত শরীরকে একটিমাত্র অবিভাজ্য অঙ্গে পরিণত করে গোলজার লাফ দিয়ে উঠলো। তারাবিবির কান্নায় শব্দ দেওয়াল ও দরজা চুঁয়ে এই ঘরে এসে পড়ছে। পা টিপে টিপে গোলজার ঘরের আরেক মাথায় গিয়ে আস্তে আস্তে দরজা খুললে সেই শব্দ গলগল করে ঘরে ঢোকে। তারাবিবি গভীর মুখে অচেতন, তার নাক ডাকার শব্দ একটি নিয়মিত ধ্বনিপ্রবাহ হয়ে এই ঘরে আসতে আসতে একটি অবিচ্ছিন্ন বিলাপে পরিণত হয়েছে। দরজা বন্ধ করে গোলজার ফের শুয়ে পড়ে। তারাবিবির কান্নায় সমস্ত ঘরে শূন্যতা ফের লবণাক্ত হয়। গোলজারের একঘেয়ে জীবনের শৈশবের শেষভাগ, কৈশোরের পুরোটা, এমন কি যৌবনকালের প্রথম অংশ তো তারাবিবির কান্না দিয়েই বিরক্তিময় ছিলো। বাকিটা? পাশ-শোয়া সখিনার ফোঁপানি কমে এসেছে। গোলজারের ভয় করে, তার জীবনের বাকিটাও কি কান্নাকাটি দিয়েই চিহ্নিত হবে? সখিনার ভিজে পিঠে হাত রাখলে গোলজারের ভয় খানিকটা কমে। তার পাশে সুখদুঃখ-সমৃদ্ধ রক্ত মাংসের একটা মেয়েমানুষ। এখানে আগে ছিলো পাতলা তোষকের ওপর ময়লা সবুজ চাদর। ওপরে মস্ত উঁচু ছাদ, ছাদের নিচে গভীর খাদের মতো বেঢপ আকারের বড়ো এই ঘর। ঐ ছাদের ওপর আগে আরো ঘর ছিলো। গোলজার আলী খুব ছেলেবেলায় সেখানে গেছে বলে আবছা আবছা মনে পড়ে। কিন্তু ওপরতলায় হাঁটলে মেঝে কাঁপে বলে গোলজার আলীর জন্মের আগে থেকেই সেখানে কারো বসবাস নেই। দোতালায় ওঠবার সিঁড়ির ওপরকার কয়েকটা ধাপ খসে পড়ায় ওপরে ওঠার পথও বন্ধ। ওপরতলায় এখন পোকামাকড় ও ইঁদুর-ছুঁচোর একচ্ছত্র অধিকার। কোনো কোনো রাতে এইসব জীবজন্তুর ব্যস্ত ও দ্রুত চলাচলের সরসর শব্দ ছাদ বেয়ে বৃষ্টির ধারার মতো পড়তে থাকে। এই নির্জলা বৃষ্টিধারার সঙ্গে পাশের ঘরের তারাবিবির বিলাপ, কিছুক্ষণের জন্য রমজান আলীর ধমক ও তারাবিবির গোঙানি একাকার হয়ে রূপলাভ করতো একটি অখণ্ড বস্তুতে এবং তার ধাক্কায় গোলজারের শরীরের নিজেকার খাট, তার চারপাশের দেওয়াল, শরীরের ওপরকার মশারি ও ছাদ কোথাও সরে গিয়ে গোলজারকে একেবারে নিরাশ্রয় করে দিতো। গোলজারের রক্ত ও মেদ শুকিয়ে তার শরীরটা পড়ে থাকতো একটি ছায়ার মতো। তার চারপাশে কোনো বস্তু নেই, ছায়া-শরীরের কেবল ছায়া। ওপরে মশারি, মশারির ওপরে ছাদের ছায়া, পাশে দেওয়া ও শূন্যতার ছায়া, রাত্রিকাল ও অন্ধকারের ছায়া —এই সমস্ত ছায়া তাকে সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেললে গোলজার আলী ফের ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার কোনো কোনো রাত্রে তারাবিবির বিছুটি পাতার মতো খসখসে কণ্ঠস্বরে তার ঘুম ভেঙে গেছে, অনেকক্ষণ জেগে থেকে সে বুঝতে পারে, তারাবিবি রমজান আলীকে জাগাবার চেষ্টা করছে 'অ গোলজারের বাপ। একেবারে লাশটা হইয়া রইছো, না? আরে বুইড়া মরদ, খাটিয়ার লাশটারভি লড়েচড়ে, তোমার লড়ন নাই?' বিছানা জুইড়া ভ্যাটকাইয়া রইছো, অ গোলজারের বাপ!' এরপর রমজান আলী হয় চুপ করে থাকবে, নইলে উঠে তার বালিশের কাছ থেকে হাতপাখাটা নিয়ে বৌকে পেটাতে শুরু করবে, 'খানকি মাগী, তর মরদানি

দ্যাখনের খাউজানি উঠছে না? র। তরে মরদ দ্যাখাই। তর হাউস মিটাইয়া দেই, আয়।' রমজানের দাঁত-পড়া, ঘুম-ভাঙা মুখের বাক্য ভালো করে তেতে ওঠবার আগেই মিইয়ে পড়ে, তার হাড্ডিসার হাত দেখতে দেখতে ক্লান্তিতে নুয়ে আসে। তখনি তার বয়স পঁয়ষট্টির ওপর। সারাটা দিন তার অনেক খাটাখাটনি। তাদের ওপরতলায় আর ভাড়াটে বসানো যায় না; মেরামত করবে, সে পয়সাও নেই। তার একমাত্র ভাই মহরম আলী তাদের পৈতৃক আরজু ডেকোরেটার্স দখল করে বসেছে, একমাত্র সম্বল তার মাইকের দোকান,—মাইক, রেকর্ড ভাড়া দিয়ে ভালোই চলছিলো, কিন্তু আজকাল এসবের দোকানের লেখজোকা নেই, ঘোরাঘুরি না করলে খদ্দের পাওয়া যায় না। রমজান আলীর শরীর টেকে কি করে? কখনো কখনো গোলজারের রাগ হতো, বুড়ো বয়সে বৌ মরলে রমজান ফের বিয়েটা না করলেই পারতো। তারাবিবি রমজান আলীর দ্বিতীয় স্ত্রী, আগে তার কি ধরনের শালী হতো। আগের পক্ষের মেয়েরা তারাবিবিকে এখনো খালা বলে ডাকে। গোলজারের ঐসব সৎ বোনদের ছেলেরা গোলজারের সামনে ঠাট্টা করে, 'অ মামু', তাদের তিনজনই গোলজারের বড়ো, দুজনের জন্ম তারাবিবির বিয়ের আগে, 'মামুজান, নানায় হালায় এই বিয়া যহন করছে তহনই তো ষাইট বছইরা বুইড়া। পঁচিশ বছরের ছেমরিটারে লইয়া বুইড়ার বহুত মুসিবত, না মামু? বহুত মেহনত হয়, না?' এই বিয়েটা না করলে রমজানের এই রাত্রিবেলার ভোগান্তিটা হতো না। অনেক রাত্রে তারাবিবি যখন মাঝখান-দিয়ে চেরা গলা একাই কোবাস-স্বরে চিৎকার করতো, 'আরে বুইড়া, মড়াটা! এক্কেরে কবুরে যাইবা, আজাব হইবো না?'— গোলজারের হৃদপিণ্ডটা তখন ছিটকে পড়তো চারদিকে : বাপে হালায় বুইড়া হইয়া বিয়াটা না করতো তো জিন্দেগীতে দুনিয়ার মইদ্যে পয়দাই হইতাম না!—পৃথিবীতে কোনোদিন না আসবার সেই সুখ থেকে বঞ্চিত করাটাও বাপের পক্ষে খুব অন্যায় কাজ হয়েছে। সেই অজ্ঞাত অবস্থা সে কোনোদিন কল্পনাও করে দ্যাখেনি। কিন্তু তারই জন্য তার আক্ষেপ : হায়রে সেই কপাল কি আর আমাগো হইবো? কিন্তু এখন স্ত্রী পাশে শুয়ে কোনোদিন-না-জন্মাবার কপাল পাওয়ার জন্য গোলজার আলীর কোনো আগ্রহ হয় না। বরং সখিনার ভিজে পিঠে হাত রাখলে তার হাতের রেখায় রেখায় মেয়েলি ঘাম বয়ে যাওয়ার কুলুকুল ধ্বনি শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে দোকানে যাওয়ার আগে গোলজার তার মাকে বলে, 'আম্মা, তুমি তোমার বৌরে কি কইছো, আব উ কি বুঝছে, রাইত ভইরা কাইন্দা মরে।'

'কি কইছি?' তারাবিবি বারান্দায় ঝোলানো দড়িতে কাচা-কাপড় মেলে দিচ্ছিলো, কাজে একটুও বিরতি না দিয়ে বলে, 'কান্দনের কি হইছে?'

'আলী হোসেনের বৌ এর লগে' বলে গোলজার কি বলবে কি বলবে করতে করতে তারাবিবি একটা চাদর মেলে দিলো, তারপর নিজেই ছেলেকে উদ্ধার করে 'কইছি, বৌটা এক্কেরে বেশরম। বেগানা মরদের লগে কেমুন ছিনালী করে দ্যাহস না? এর লগে তর শাদীর কথা ভি কইছিলো।'

'কৈ, আমারে কও নাই তো!'

'ক্যান? তুই জানস না। খাদেম পাগলার ভাইয়ে তর বাপেরে বহুত ধরছিলো। পয়গাম পাঠাইবার কথা ভি হইছিলো।'

'আমি জানি না তো!'

'ক্যান? খাদেম পাগলার বাড়িব মইদ্যে, না ওর যাওয়া-আসা আছিলো?' মায়ের মুখে এই কথাটা শুনে গোলজার লজ্জা পাবে কি, দরজার কপাট-ধরে-দাঁড়ানো সখিনাকে দেখে তার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। একই গলিতে বাড়ি, ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলাধুলা করেছে-- এ সবই সত্যি। কিন্তু একটু বড়ো হয়ে যাওয়ার পর ছ'মাসে দ্যাখা হতো কি না সন্দেহ। বরং সেলাই করাবার জন্য কি আচার দেওয়ার জন্য তারাবিবিই বাবেয়াকে ডেকে পাঠাতো এই গোলজার দিয়েই। বড়ো হবার পর গোলজারের একটু লজ্জাই করতো, নিজে ওদের বাড়ির ভেতরে না গিয়ে ওর ভাইকে দিয়ে মায়ের কথাটা জানিয়ে দিতো। কিন্তু গোলজারের এই মেয়েসুলভ লজ্জা নিয়ে তারাবিবি কতোদিন রাগারাগি করেছে। আর এখন তারাবিবি বলে, 'আমরা কই, তুই অর চাচারে দিয়ে তর বাপেরে কওয়াইছস।'

'না আম্মা আমি কিছুই জানি না।'

'অ।' বলে তারাবিবি কলপাড়ে চলে যায়।

তবে সখিনাকে মেরামত করে নিতে গোলজারের খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। মেয়েটা তারাবিবির কথা যেমন অবলীলাক্রমে বিশ্বাস করে স্বামীর ওপর আস্থা স্থাপনেও তেমনি তার দেরি হয় না। সখিনা প্রায় সর্বদাই হাসিখুশি, বাইরে বেরুলে তার কৌতূহলের সীমা নেই, সমস্ত শহরটাকে একদিনে চিনে নেওয়ার জন্য সে অস্থির।

কিন্তু মুখ ভার করতেও সময় লাগে না। এরপর দেড়মাসও যায়নি, একদিন বেলা আড়াইটে-তিনটের দিকে গোলজার ঘরে ফিরতেই সখিনা জিগ্যেস করে, 'এতো বেলা করলা? রথখোলা গেছিলা, না?'

'হু, তোমারে কইলাম না? এ পার্টি হালায় আউজকাও টাকা দিলো না। চুতমারানি বহুত খাচরামি করতাছে।'

কিন্তু সখিনা ফেল বলে, 'রথখোলা কৈ গেছিলা? বিনয়গো বাড়ি?'

'কৈ?'

'বিনয়গো বাড়ি। হ্যার বইনের লগে গল্প গইরা আইলা, না? হিন্দুগো বাড়ি তোমার এতো যাওয়া-আসা কিয়ের লাইগা আমি বুঝি না, না?'

গোলজার খুব বিরক্ত হয়। রথখোলায় ঘণ্টা দু'য়েক ঘুরেও তার বহুদিনের প্রাপ্য টাকাটা পাওয়া যায়নি। আর বিনয়দের বাড়ি সে যায় না সে বোধহয় আড়াই বছরেরও ওপর।

'ছোটোলোকের লাহান কথা কইও না।'

এইবার সখিনার কান্না শুরু হলো। কাঁদতে কাঁদতেই সে বলে, আমি তো ছোটোলোকগো ঘরের মাইয়া। তোমার মায়েই না কইলো, 'রথখোলা গেছে? বিনযেব বইনের লগে বইছে, রাইত না কইরা উই আইবো না।'—'আমি কি করুম?'

গোলজার সেদিনই একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতে চায। সোজা চলে গেলো তারাবিবির ঘরে। রমজান আলী তার বিছানায় বসে হাঁটু পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে তার হাড্ডিসার পাযে হাত বুলাচ্ছে। মেঝেতে বসে স্বামীর জন্য পান ছেঁচছে তারাবিবি।

গোলজার বলে, 'আম্মা, বিনয়ের বইনরে লইয়া তুমি অরে কি কইছো?'

'কি কইছি?'

'কি কইছ, তুমিই জানো!'

'বৌরে কি কইছি, বৌ তরে গিয়া কি লাগাইছে, ক্যামনে জানুম?' বলে হামান দিস্তা থেকে হাত উঠিয়ে নিলো তারাবিবি। রামজান আলী তার পোড়া বাঁশের মতো হাতটা সেই দিকে বাড়াতেই তারাবিদি হামান দিস্তা সরিয়ে রাখলো, 'দেরি আছে!' মনে হয তারাবিবি গোলজারকেও ধমক দিলো। গোলজার তবুও দমে না, 'তুমি ঝুটামুটা কি কি বানাইয়া কইবা আর আমার জিন্দেগীটা এক্কেরে জ্বালাইয়া খাইবা, না?'

'আমি কই ঝুটামুটা?' তারাবিবি সোজা হয়ে বসে, 'বিনযের বইনের লগে তর কিয়ের খাতির?'

গ্র্যাজুয়েট স্কুলে গোলজারের সহপাঠী ছিলো বিনয়। বারদুয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে গোলজার লেখাপড়া ছেড়ে দেয় আর দ্বিতীয়বার কোনমতে পাস করে বিনয় চলে যায় কোলকাতা। আগে বছর বছর ঢাকায় এলে গোলজারের সঙ্গে ওর দেখা হতো। গোলজার ওদেব বাসায় যেত কেবল সেই সময়েই। কয়েক বছর থেকে বিনয়ের এদিকে আসা একরমই বন্ধই, গোলজারও আর ওদিকে যায না। তবে বিনয়ের বাবা রাধাকৃষ্ণ বসাক লোকটা বেশ ভীতু, কোনোরকম গোলমালের আভাস পেলেই কাউকে দিয়ে গোলজারকে ডেকে পাঠায়, মিষ্টিটিষ্টি খাইযে বলে, 'বাবা, তোমাগো মায়ায় পইড়া মাতৃভূমি ত্যাগ করতে পারি নাই। এট্টু দৃষ্টি রাইখো।' কিন্তু আড়াই বছর, তিন বছর হতে চললো রাধাকৃষ্ণ বসাক ওকে ডেকে পাঠায় না। ওরও আর যাওয়া হয়নি।

তারাবিবির গোটা মনোযোগই এখন গোলজারের দিকে ন্যস্ত। মেঝেতে সে বসেছে পা ছড়িয়ে। তার দুই পায়ের পাতাই এপিঠ-ওপিঠ সম্পূর্ণ দ্যাখা যাচ্ছে। ডান পায়েব ওপরের পাতায় এগজিমার ঘা; এগজিমাটা মনে হয় তার পোষা, অবসর মতো চুলকায়. সেটা কখনো বাড়ে; কখনো কমে। এখন

তার বাড়ার ঋতু। ছড়ানো পায়ের পাতা থেকে মায়ের প্রিয় ঘায়ের একটি কি দু'টি পুঁজের বিন্দু গোলজারের দিকে তাকিয়ে আছে। তারাবিবির মাথার কাপড় খোঁপার সঙ্গে আটকে গেছে। তার ছোটখাটো গর্তে উঁচু-নিঁচু ভরাট লম্বা কালো মুখ, চওড়া ও রেখাহীন নির্বিকার কপালের ওপর সাদা কয়েক গোছা চুলের নিচে কালো চুলের রাশি এবং তার ছোটো আকারের চোখ জোড়া গোলজারের চোখের সামনে ঝলক দিয়ে উঠলে সে একেবারে নিভে গেলো। তার দোকানের পিচ্চি মেকানিকটা কোথায় কোন সুইচে হাতদিয়েছে, অ্যামপ্লিফায়ারের কোন পজিটিভ-নিগেটিভ গোলমাল হয়েছে যে মনে হয়, কথা বলেও কোনো ভাল নেই, কিছুই শোনা যাবে না। তবে রমজান আলীর শরীরটা আজ একটু ভালো, বহুদিন পর শুক্কুর মাহমুদের দোকানের তেহারি দিয়ে সকালবেলায় নাশতা হয়েছে, গোলজারের ওপর আজ সে বেশ প্রসন্ন, তারাবিবিকে আস্তে আস্তে বলে, 'পোলায় বিয়াশাদ করছে, তোমার মুখ অহন ভি দুস্তুর হইলো না। কহন কি কও, কথাবার্তা—।

বাক্য অসম্পূর্ণ থাকতেই তার বুক থেকে ঘর্ঘর শব্দ বেরিয়ে আসে এবং পেটে হাত দিয়ে সে কাশতে শুরু করে।

'তুমি কব্বরের মড়া পইড়া রইছো, কব্বরের মইদ্যেই থাকো। তুমি কি বুঝবা? তিরিশ বচ্ছর হইলো ঘর করি, একদিন তোমারে সিধা হইয়া হাঁটবার ভি দ্যাখলাম না। আর এই জামানার জুয়ান পোলাগো বদ খাসলৎ তুমি কি বুঝো? রমজান আলীর কাশির সঙ্গতে তারাবিবির সংলাপ বাপ ও ছেলের জন্য ধিক্কার বাজাতে থাকে। তারাবিবি তার অনেক-দেখে-পাকা চোখজোড়া দিয়ে গোলজারকে বিঁধে ফেলতে চায়, 'আমি কই ঝুটা কথা? তরে জিগাই, বিনয়েব বইনের বিয়া হইছে হিন্দুস্তান, আর বচ্ছরের আষ্টটা মাস উই পইড়া থাকে বাপের বাড়ি, ক্যালায়? তবে জিগাই ক্যালায়?

কয়েকবার ঢোক গিলে গলার তারটার পজিটিভ-নিগেটিভ সব ঠিক করে গোলজার বলে, 'তুমি কার লগে কি লাগাও? হেইটা তো তিন-চাইর বচ্ছর পার হইয়া গেছে। পাসপোট-উসপোটের কি ঘাপলা আছিলো, বহুত দিন যাইতে পারে নাই।'

'পাচকোট'! দীপালীর পাসপোর্টের ব্যাপারটা তারাবিবি লুফে নেয়, 'আরে পাচকোট তো আছিলা! পাচকোটের নাম কইরা তর এই ঘরের মইদ্যে দুইটা ঘণ্টা বইসা গেছে না? এগুলি বুঝি না, না?'

এই বাড়িতে দীপালী এসেছিলো একবারই। পাসপোর্টের ঝামেলা মেটাতে কার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য গোলজারকে তার দরকার হয়। সে তো চার বৎসর হতে চললো। দীপালী এখানে এলে তারাবিবিই তাকে সঙ্গে করে গোলজারের ঘরে পৌঁছে দেয়, 'অ গোলজার, দ্যাখ বিনয়ের বইনে আইছে।' নিজের ঘরে থেকে সে একটা চেয়ার এনে দিলো। তারপর 'তোমার কথা কও, আমি আহি।' এই বলে সেই যে রান্নারে ঢুকলো আর বেরোয় না। পনেরো-বিশ মিনিট পর চলে যাওয়ার জন্য দীপালী বারান্দায় পা দিয়েছে, রান্নাঘর থেকে দেখতে পেয়ে তারাবিবি বলে, 'এট্টু বইসা যাও। আমি চা বানাই।' গোলজারের ঘরে দীপালী আরো প্রায় আধঘণ্টা বসার পর গোলজারকে ডেকে তারাবিবি চার পাঠিয়ে দেয়। গোলজার একঘণ্টা ধরে দীপালীর সঙ্গে গল্প করে। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল দীপালীর স্বামী, বিনয় এবং বিনয় ও গোলজারের শৈশবকাল। তার নির্জন ঘরে দীপালীর সঙ্গে একঘণ্টা কাটাবার এই স্মৃতি মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতে গোলজারের ভালোই লাগতো, কিন্তু এর ফলে তাকে কখনো বিনিদ্র রজনী কাটাতে হয়নি।

নিজের রাগ দমাবার জন্য কিম্বা বেছে বেছে ঠিক কথাটি প্রয়োগ করবে বলে তারাবিবি কিছুক্ষণ চুপ করে আস্তে আস্তে বলে, 'এই যে বেলা তিনটা পর্যন্ত বেজাত মাগীটার লগে বইয়া রইছস, তর বৌ আছে না? দুই দিন বাদে তর পোলা হইবো না? তর শরম নাই? তর শয়তানীব চোট এমুন—আমার ঘরে ফেরেস্তা আইবো কুনোদিন? পোলায় গুণা করলে বাপ-মায়ের এবাদত বন্দেগী আল্লায় কবুল করে?'

তারাবিবি এই আপোস-আপোস স্বর গোলজারকে স্তিমিত করতে পারে না। বরং মায়ের শিথিল কণ্ঠ তাকে আরো বল দেয়। কিছুক্ষণ রমজানের মরচে-পড়া চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে সে সেই মাথানোয়ানো বুড়ো নিঃশেষিত শরীরের ভিতরবাড়ি থেকে ভিটামিন শুষে নেয়। এইভাবে বাপের পুষ্টি ও মায়ের শিথিলতা থেকে শক্তি অর্জন করে গোলজার বলে, 'আম্মা এই কথাগুলি কুনো মায়ে তার

পোলারে কইতে পারে না। তোমরা আমার বিয়াশাদী দিছো, আমার খাসলতের মইদ্যে বুরাথুরা কিছু থাকলে উই দ্যাখবো। উই কিছু জানলো না, আর তুমি কৈ একটা রাডার ফিট কইরা রাখছো, মিনিটে মিনিটে তোমার রাডার কাঁইপা উঠবো আর তুমি খালি ফাল পাইড়া উঠবো!'

'আল্লা রে আল্লা! আমার নসিব! পোলারে বিয়া করাইয়া আনছি, গেরাইম্যা মাইয়া, হাবাগোবা একখান, উই যুদিল বুঝবো তয় আমার এই হাল হইতে পারে?' তারাবিবি ক্রমেই থিতিয়ে আসছিলো। একটু থেকে সে ফের নতুন উদ্যমে শুরু করে, 'বৌয়ের যুদিল অতই বোধশোধ থাকবো তয় এই কামের মাতারি লগে তোমার রঙ করা উই বহুত আগেই ধইরা ফালাইতো। পারতো না?'

এই কথার আর কি জবাব দেওয়া যায়?

সেদিন থেকে বাড়ির ঠিকা ঝিই হলো তারাবিবির মতে গোলজারের প্রধান আকর্ষণ। অথচ এই সুরুজের মায়ের সঙ্গে সারাদিন কতক্ষণের জন্যেই বা দ্যাখা হয়? সে আসে ভোর ছ'টার আগে, সকাল ন'টা-সাড়ে ন'টায় চলে যায়। বেলা একটায় এসে ফের আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত কাজ করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে গোলজার তাকে ঘণ্টাখানেক দেখতে পায়ে এবং বিকেলে আরেক ঘণ্টা। সারাটা দিন খাটনির ওপর আছে বলে মেয়েটার শরীর বেশ আঁটোসাঁটো। তা, এরকম ভালো শরীরের মেয়ে না রাখলেই হয়। রমজান একদিন এই প্রসঙ্গ তুলেছিলো, 'যদি সন্দ করো তো মাতারিরে বিদায় করলেই হয়।'

'ক্যান? মাতারিরে বিদায় করুম ক্যান? আরেকটা বাখতে হইবো না? তোমার পোলায় কেউরে ছাড়বো?'

তবে আজকাল তারাবিদি গোলজারের সামনে এইসব কথা সচরাচল পাড়ে না। কিন্তু গোলজার বাইরে গেলেই শুরু করবে। এই আজ ছবি দেখে ফিরতে একটু রাত হয়েছে, চান্স পেয়ে অমনি ধোলাই দিলো।

সখিনা এখন চুপচাপ বসে আছে। একটু আগে তারাবিবির কল্যাণে গোলজারের বুকে যে কাঁটাগুলো বিঁধেছিলো, ভাত-তরকারি খাওযার পর সেগুলো পেটের কোথাও চাপা পড়ে গেছে, তার খুব ঘুম পায়। কিন্তু এখন ঘুমিয়ে পড়লে সখিনার অপমানের ভাগ নেওয়া হয় না। গোলজার আলী সুতরাং সখিনার পাশে বসে বলে, 'তোমার' মিয়াভাইরে একটা চিঠি লেইখা দেই, মিয়াভাই আইলে তুমি মীরকাদিম যাও গিয়া, আমিও দেখি, একটা ঘর বিচরাইয়া লই। ভাড়া-উড়া ঠিক হইলে আমি গিয়া তোমাকে লইয়া আসুম!'

এরকম প্রস্তাবে বরাবরই কাজ হয়।

বিছানায় শুয়ে গোলজারের ইচ্ছা হয় সমস্ত খাট জুড়ে শরীর বিছিয়ে শুয়ে থাকে। কিন্তু এই বিছানা তাকে আরেকজনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়।

পরদিন বেলা আড়াইটের দিকে বাড়ি ফিরে নিজেব ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গোলজার শোনে তারাবিবি ও সখিনা দু'জনেই বাইরে। তাব ফুফাতো ভাই বাদশার গায়ে-হলুদ আজ দুপুরে, তার ফুপা নিজেই এসে দু'জনকে নিয়ে গেছে। রমজান বলে, 'মাগরেবেব বাদে তুই গিযা লইয়া আহিস।'

রান্নাঘরে তারাবিবি নেই, তা নিজের ঘরে নেই সখিনা।—'হ্যায় আপনা দিল' গানটা পরিবর্তিত সুরে গুনগুন করতে করতে জামাকাপড় না খুলেই গোলজার হাত-পা বেশ করে ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

ঘরে এসে ঢোকে সুরুজেব মা, 'অহন শুইলেন? ভাত দেই?'

'ভাত দিবা?' গুনগুন করাটা থেমে গেলেও তার চোখে-মুখে গানের সুর সাঁটা।

'এট্টু গড়াইয়া লই।'

'না ওঠেন, আপনেব খাওয়া হইলে আমারে বাসন মাইঞ্জা খাইতে হইবো না?'

কথা বলতে বলতে সুরুজের মা বুকের ওপর শাড়ির আঁচল গুছিয়ে রাখে। সেদিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ কি হয়, গোলজারের চোখ, মুখ ও গলার হাল্কা সুর ভাঁজা একেবারে উবে যায়। সেই সুরের জায়গায় তার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ বোঁবোঁবোঁ ধ্বনির এলোমেলো চলাচলে ওর করোটির ভেতরটা একেবারে ঠাসা হয়ে যায় এবং সমস্ত শরীরের রক্ত সেদিকেই উজান বইতে বইতে বিপদসীমা অতিক্রম করে।

খাটের স্ট্যান্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুরুজের মা। নিজের মাঝারি দৈর্ঘ্যের শ্যামবর্ণের শরীরটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে গোলজার প্রায় একটি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় মেঝের ওপর। সুরুজের মা কপালের একটুখানি ও ভ্রূর সবটা কুঁচকে তাকে দেখছে। তার কপাল ও ভ্রূ ফের সম্প্রসারিত হতে হতে গোলজার তার ডান হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে সামনে নিয়ে আসে। তার বুকের সঙ্গে লাগানো সুরুজের মার মাথা, মাথার লালচে-কালো চুলে পুরনো পচা নারকেল তেলের গন্ধ। সুরুজের মা ফিস ফিস করে বলে, 'হাত ছাড়েন।'

সঙ্গে সঙ্গে গোলজার তার হাত ছেড়ে পেছনে সরে আসে। আরো এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে সুরুজের মা হঠাৎ ভেতরের বাবান্দা দিয়ে দ্রুত চলে যায় রান্নাঘরের দিকে। বারান্দা থেকে অ্যালুমিনিয়মের বদনা গড়িয়ে পড়ার টং আওয়াজে গোলজার আলীর মাথায় বেলা তিনটে হওয়ার সময় সঙ্কেত বাজে, সে ফের তার ঘরের আরেক কোণে গিয়ে তার গামছা, লুঙ্গি এই সব সংগ্রহ করে।

গোসল করে ফিরে এসে গোলজার দ্যাকে মেঝেতে ছেঁড়া শীতলপাটি পাতা, তার ওপর সরপোষ ঢাকা ভাত-তরকারি। খাওয়ার পব আলনা থেকে আন্ডারওয়্যার ও প্যান্ট নিয়ে ফের রেখে দেয়।

প্রায় পনেরো মিনিট পর সুরুজের মা ঘরে ঢুকে বলে, 'আমি যাই, দোকানে যাইবেন না?'

শুয়ে-শুযেই গোলজার জবাব দেয়, 'তুমি যাও। আমি এট্টু পরে যাই।' সুরুজের মায়ের হাত ধরে ফেলার ব্যাপারটা ঝেড়ে ফেলার জন্য সে সপ্রতিভ হতে চায়, 'এট্টু পরে গিয়া আম্মাগো লইয়া আসুম!'

'তাগো আইতে দেরি আছে।'

'অ!'

সুরুজের মা তার খাটের স্ট্যান্ড ধরে ফের দাঁড়িয়ে থাকে। পাশের ঘরে রমজান আলীর ধীর লয়ে নাক ডাকার শব্দে গোলজার তার শরীরের দখল ফের হারাতে আরম্ভ করে।

'আমারে দশটা টাকা দিবেন?' আম্মারে কইয়েন না, আমার পোলারে ডাক্তার দ্যাখাইতে হইবো, দিবেন?'

গোলজার আলী নিঃশব্দ বালিশের নিচে রাখা পার্স থেকে পাঁচ টাকার দুটে নোট নিয়ে ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলো। সুরুজের মা এসে দাঁড়িয়েছে তার বিছানার ঠিক পাশেই। এখন এই টাকা-ধরা হাত দিয়েই মেয়েটাকে টেনে একেবারে বিছানায় ফেলা যায়। ঘরের আরেক প্রান্তে পাশের ঘরে যাবার দরজা। একবার সেদিকটা দ্যাখা দরকার। কিন্তু সুরুজের মা দরজা বন্ধ করেছে কখন? দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। গোলজার একেবারে নিভে গেলো। তার বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে সুরুজের মা, গোলজার সোজা তাকিয়ে রইলো নিজের পায়ের দিকে। তার নখগুলো কাটা দরকার। অনেকদিন তার নখ কাটা হয়নি। তার পায়ের পাতায় স্যান্ডেল পরার দাগ। আঙুলের ভাঁজে ভাঁজে কালচে পুরু ময়লা। গোসল কবার সময় কতদিন সে পায়ের আঙুল ঘষে ঘষে ময়লা তোলেনি। তার পায়ের পাতার নিচেও ময়লা, হঠাৎ কিসের শব্দে সেই ময়লা ধুলো-বালি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়তে শুরু করে। পাশের ঘরে রমজান আলী কেশে উঠলো। কাশির ফাঁকে ফাঁকে সে যেন কাকে ডাকছে। গোলজারের উঁচু-করে-ধরা ডান হাতের বোঁটা থেকে পাঁচ টাকার নোট দুটো নিচে পড়ে গেলো। হাত-জোড়া এখন তার দু'দিকে দু'টো মরা লতার মতো নেতানো।

'আব্বায় ডাকে না?' গোলজার আলী অনেকক্ষণ পর স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেললো।

'না, ঘুমায়।' সুরুজের মার এই জবাব শেষ হতে না হতে বাইরে সদর দরজায় খুব জোরে কড়া ও পাশের ঘরে রমজান আলীর তীব্র চিৎকারে গোটা বাড়ি দুলে ওঠে। সেই দুলুনিতে সোজা-দাঁড়িয়ে-থাকা সুরুজের মাও ঝুঁকে পড়ে মেঝের ওপর। বিছানা থেকে একটা ও মেঝে থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে নিয়ে সে একটু দাঁড়ালো। তারপর গোলজারের মণিছেঁড়া চোখের দিকে তার চোখ সঙ্কুচিত করে তাকালো এবং 'হুঃ'—এইরকম ধ্বনিতে হাসির খুব ছুঁচলো একটি খুচরাংশ ছুড়ে ফেলে দরজা খুললো। দরজার মস্ত ফোকর দিয়ে ঘোলাকণ্ঠের চিৎকার ছলকে ছলকে এসে গোলজারের ঘর থিকথিক করতে থাকে, 'কতোক্ষণ হয় তরে ডাইকা মরি। খানকি মাগী তুই ঘরের মইদ্যে খিল লাগাইয়া ঠাপ লাগাস?'

সুরুজের মার সদর দরজা খোলার শব্দ ও তারাবিবির আবির্ভাব টের পাওয়া যায়। তারাবিবি বলছে, 'তরা ব্যাবাকটি মরছস? আমি চিল্লাইয়া মরি। হারামজাদী!' তারপর সদর দরজা দিয়েই বন্ধ করে সে বলে, 'তুই যাস নাই অহনো? গোলজারে খাইয়া গেছে?'

'তুই যাস নাই ক্যান? চাইরটা বাইজা গেছে না? কি করস?'

'যাই' বলে সুরুজের মা চলে যেতে উদ্যত হলে তারাবিবি বলে, 'ভাত লইয়া গেলি না?'

রমজান আলীর উদ্দেশে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে তারাবিবি ঘরে ঢোকে, 'তুমি মরছো তো এক্কেরে মইরাই রইছো? আমি তোমাকে ডাইকা মরি, মহল্লায় ব্যাবাকটি মাইনষে জড় হইল, তোমার হুঁস নাই।'

রমজান কেবল বলে, 'বৌ কৈ?'

'বৌ আইবো রাইতে। দোকান থাইকা গোলজারে গিয়া লইয়া আইবো। গোলজাররে কও নাই?'

রমজান আলী বিছানার ওপরে উঠে বসে, পাশের ঘরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'গোলজার ঘরে।'

'দোকানে যায় নাই? ক্যান? আমি এতো চিল্লাই, উই ভি হুনবার পারে না?' রমজান আস্তে আস্তে জবাব দেয়, 'ক্যামনে হোনে? উই তো এই দরজা বন্ধ কইরা খান্‌কিটারে লইয়া বইয়া আছিলো, উই হোনে ক্যামনে?'

তারাবিবি তার লম্বা-চওড়া কালো শরীরটা নিয়ে রমজান আলীর বিছানার এক প্রান্তে বসে পড়ে।

'আমি তো মইরাই রইছি। তোমরা তো আর আমারে জিন্দা দ্যাখবার চাওনা!' রমজান আলীর ঘিঞ্জি চোখ দিয়ে ঘন অশ্রু বেরিয়ে আসে, মনে হয়ে ঘায়ের ওপর রস জমছে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'নিজের বাপেরে বগলের কামরায় রাইখা দুয়ার লাগাইয়া খান্‌কি লইয়া বইয়া থাকে আমাব নিজের পোলায়। আমারে তোমরা মাইরা ফালাও!'

তারাবিবি তার মস্ত কালো মুখে অজস্র রেখা-উপরেখা তৈরি করে বুইড়া মরদার কান্না দ্যাখে। রমজান আলীর চিমসে মুকে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তার মুখের চামড়া বোধহয় শুকনো ঘায়ের ওপরকার চটা, এককোণ ধরে একটু খুলে ফেললে গোটাটাই আপনি খসে পড়ে। উত্তেজনায় বমজানেব মাথা ঘামে ভিজে গেছে। তার স্যাঁতসেতে মাথার ওপরকার লালচে সাদা কয়েক গাছা চুল আমের শুকনো আঁটির আঁশের মতো লেপ্টে আছে।

'আমি যাই।' মায়ের দিকেও না, বাপের দিকেও না, কোনদিকে না তাকিয়ে গোলজার বলে, 'আমি যাই, দরজা বন্ধ কইরা দাও।'

স্বামীর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে তারাবিবি ছেলেকে দ্যাখে। গোলজারের চুল আঁচড়ানো নেই, মাথাটা নোয়ানো বলে তার কপাল বেয়ে, কানের ওপর দিয়ে চুলের গোছা ছড়ানো। তারাবিবি বলে, 'লালবাগে তর ফুফুর বাড়ি গিযা মাগরেবের বাদ বৌরে লইয়া আহিস।'

জবাব না দিয়ে বারান্দা পার হয়ে গোলজার সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। সিঁড়ির একধাপ থেকে আরেক ধাপ নামবার সময় তার ঝাঁকড়া চুল বাতাসে—উতলা মগডালের পাতার স্তূপের মতো কাঁপে। কিন্তু সিঁড়ির পাঁচটা মোটে ধাপ। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়।

ছেলে কাঁপানো কেশরাশি দ্যাখার জন্য তারাবিবি তার মুখেব সমস্ত রেখা কুঁচকে মাথা উঁচু করলো।

'ঘরের মইদ্যে গুণা, ঘরের মইদ্যে শয়তানী। নামাজ-বন্দেগী আমাগো ক্যামনে কবুল হয়?' চোপসানো গলায় বমজান আলী ফ্যাসফ্যাসে শব্দ করে, 'আমাগো কুনো উন্নতি নাই, ক্যান?' ঘরের মইদ্যে আমাগো শয়তানেব কারখানা। বারোটা মাস আমি বিছানের উপরে পইড়া থাকি ক্যান? হারামজাদা আহুক, আউজকা রাইতেই অর পাছার মইদ্যে লাথ মাইরা যুদিল খ্যাদাইয়া না দেই!'

'হয়েছে।' তারাবিবি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে স্বামীকে থামিয়ে দেয়, 'এমুন চিল্লাচিল্লি করো ক্যালায়? গোলজারে কি করছে? পোলায় আমার জুয়ান মবদ না একখানা? তুমি বুইড়া মড়াটা, হান্দাইছ। গোছো কবুরের মইদ্যে, জুয়ান মরদের কাম তুমি বুঝবা ক্যামনে?'

ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষ

এখনও শুয়ে আছেন নলিনীবালা।

শীতের একটুকরো রোদ্দুর তার প্রাচীন দেহটার উপর আলতো করে পড়েছে। শীত। বড় শীত—এখন। বুড়ো হাড়ের ওপর সাদা চামড়াটা এই একফালি রোদেই যেন আরাম পায়। বয়স কত হল? এটা নলিনীবালা এখন নিজেই আর জানেন না। আর, কেই বা খোঁজ রাখে। নলিনীবালার বয়স কত হল, নলিনীবালা কেমন আছেন এইসব নিয়ে কারই আর মাথা ব্যথা। লম্বা টানা বারান্দায় কালো সাদা বরফি কাটা মেঝেতে নলিনীবালা শুয়ে থাকেন। গাছের ডালপালা ভেঙ্গে রোদ আসে—এই পুরানো বাড়ীটার এখানে ওখানে, তারই এক চিলতে গায়ে মেখে নলিনীবালা জীবনটাকে একটু গরম রাখেন। যদি খুঁটিয়ে দেখা যায়—তবে বোঝা যাবে একদা রূপবতী ছিলেন, কুচকে আসা চামড়ায় খড়ির মত সাদা দাগ এখন থাকলেও একটু ভালো করে তাকালেই মনে হয় এখন একটা স্তিমিত আলোর রেখা।

টানা রোদের ফালি ফালি কারুকাজ। সকাল থেকে এখানেই শুয়ে থাকেন। সাত পাঁচ এখন আর নেই। নিজের ঘরের ভেতর যখন থাকেন—তখন ঘুমহীন সকালেই টের পান বাইরে কেমন নীলচে আভার কুয়াশার চাদর। আর আস্তে আস্তে সেই কুয়াশার চাদরটাকে গুটিয়ে সূর্যি ঠাকুর আসছেন। সেই ছোট বেলা থেকে অভ্যেস ছিল ঘুম ভাঙ্গা চোখে এসে লালচে সূর্যটার দিকে হাত জোড় করে প্রণাম করা। সূর্যি প্রণাম করে দিন আরম্ভ। এখন আর তাও করেন না। সূর্য ওঠে, কুয়াশাও থাকে, শীত, মাঘ সবই আছে—তবু এখন আর হাত তুলে প্রণাম করে দিন আরম্ভ হয় না। দিন-রাত একাকার। নলিনীবালার সব কিছু এখন তার বুকের ভেতরে। তিনি শুয়েই থাকেন। শীত, বড় শীত। গায়ের লেপ কাঁথা ভেদ করে শীত এখন অনেক ভেতরে।

তা শীত বা গ্রীষ্মে—নলিনীবালার এখন আর কোন অনুযোগ অভিযোগ নেই। চাপতে চাপতে এখন চাপাটাই অভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে। এই পৃথিবী থেকে আর একটা পৃথিবী ভেতরে বানিয়ে নিয়েছেন। সেটাই হয়ত সত্য। অন্ততঃ নলিনীবালার কাছে। তিনি যেমন চোখ খোলা রেখেও এখন সব কিছু দেখেন না—এক পাতলা পর্দা যাকে বলে ছানি—তা ঢেকে রাখে, অথচ বোজা চোখে ভেতরে সব কেমন পরিষ্কার। কানে যা শোনেন তা তিনি ভুলে যেতে চান—ভুলে যানও। এটাও অভ্যাস করে নিয়েছেন। শুয়ে শুয়ে তিনি টুপটাপ এটা ওটার শব্দ শুনেন, দু'একটা কাক শালিকের ডাক। ঘরের ভেতরে যখন থাকেন তখন ভেতরেই টের পান পৃথিবীটা জাগছে। জাগছে পৃথিবীটা—কথাটা মনে হতেই কাঁপা কাঁপা হাত দুটো কপালের দিকে উঠে আসতে চায়। অথচ কি আশ্চর্য সূর্যের আলো এখন আর এ ঘরে আসে না। তবে কাকে প্রণামের জন্য কাঁপা হাত নড়ে? কিইবা চাওয়ার আছে আর? প্রার্থনা? কার কল্যাণে? সেই তখন নলিনীবালার সব সাধ আহ্লাদ, চাওয়া থাকত—দিন শুরুর সাথে সাথে একটা বড় লোভ থাকত—দিন ভাল হোক।

এখন মাঝে মধ্যে সূর্যের আভাস আসে নলিনীবালার ঘরের ভেতর—যখন হেলে যায় পশ্চিমে। বড় বিষণ্ণ বিকেলের হেলে থাকা রোদ। এই বিরাট বাড়ীটায় বড় একা এখন নলিনীবালা। বহু মানুষ। সব রক্তের বীজে বেড়ে ওঠা। সব নিজের রক্তের ফোঁটায় ফোটায় জন্ম নেওয়া—তবু নলিনীবালা এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

তাই নলিনীবালা চোখ বুজে ছবির মিছিল দেখেন। রোদের এক চিনতে গায়ে নিয়ে দীর্ঘ এই বারান্দার এক কোণে নলিনীবালা শুয়ে থাকেন। ছবি আর ছবি। বিরাট বাড়ী, ভর ভরন্ত সংসার। একে একে নতুন সন্তান। নলিনীবালার এখনও মনে মনে হাসি আসে--ঠেস্ দিয়ে কেউ কেউ বলত গান্ধারী। আবার কেউবা বলত স্বর্ণগর্ভা। তখন এই কথাটা কেমন মায়ায় আচ্ছন্ন করে দিত নলিনীবালাকে। এত বড় প্রাসাদ তখনও হয়নি– বিরাট জায়গাটা শুধু সম্বল—হেসে খেলে দৌড় ঝাঁপ করে যখন

ছেলেমেয়েরা ফিরত তখন নলিনীবালার সুখ যেন কড়াই এর বুকে উথলে ওঠা দুধের মত। চার পাশে ওরা কে মাকে ঘিরে থাকবে, কে ছোঁবে আঁচলের কোণটা—তাই নিয়ে খুনসুটি। স্বর্ণগর্ভা! না, নলিনীবালা কিছু বলেন না। এখনও তো নলিনীবালার বুকের ভেতরের জমানো পাথর গলে জল হয়ে যায় একটি কথায়। মা, তুমি কেমন আছ—যদি সাঁঝ বিকেলে বা সকালে কেউ এসে একবার জানতে চায় তখন নলিনীবালা বড় উতলা হয়ে যান। ফিরে যান সেই সব দিনে। ভুলে যান জমানো ক্ষোভ, অনেক অভিমানের কথা। প্রতিবার ভাবেন একটার সাথেও আর কথা বলবেন না। সব স্বার্থপর। কুড়ের বাদ্‌শা। কেবল নিজেকে নিয়েই সব ব্যস্ত—কারো সাথে আর কথা বলবেন না—কারো সাথেই নয়—তাকাবেন না—মরুক—তবু একবার একটি ডাক শুনলেই নলিনীবালা যেন কেমন হয়ে যান। চাপা সব কথা কেমন বোবা হয়ে যায়। বুকের ভেতর ভালবাসার মেঘ গুরু গুরু ডাকে। আবার বর্ষায় ভাসায়। ঝিলিক দিয়ে উঠে, এইতো আমার সব আছে। না আমি গান্ধারী। সমস্ত দিনটাই কেমন বদলে যায়। সব কিছু চেনা চেনা লাগে। চোখের ছানিটা যেন নেই। সব পরিষ্কার তকতকে। কেবল ভাবতে ভাল লাগে—আমি গান্ধারী নই—দুর্যোধন, দুঃশাসন নয়।

নলিনীবালা তার অভ্যেস মত একটা কথাই বলেন, আমি তো ভালই আছি। তোরা ভাল থাকলেই তো আমার তো আমার ভালোরে—বাপ। গলাটা কেঁপে যায়। তোরা ভাল থাকলেই তো আমার ভাল। নিজের অস্তিত্ব আর কি? কোন দিন তো পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই—ছিল না।

বলতে ইচ্ছে করে—তা তোরা কোথায় থাকিস বল তো? এই শীতে আমার যে বড় কষ্ট হয়। তোরা কথা বলিস না, আমায় ছুঁয়ে থাকিস না—কেবল উড়ু ভাব। দু' একটা লেপ—কাঁথায় কি শীত যায়। তোরা আমায় ছুঁয়ে থাক্—দেখ আমি কেমন দাঁড়াতে পারি। নলিনীবালা বলেন না—এসব মনের তলায় পাতানো কথা। নলিনীবালার ভেতরের ঘরের। যে ঘরের দ্বারে পুত্ররা একদিনও আলতো হাতে ধাক্কা দেয়নি—নলিনীবালার মনের সেই ঘরে এ সব কথা অভিমানে সাজানো। এখন শুয়ে শুয়েই নলিনীবালা মনের মধ্যে ফুল তোলেন। মনে মনে। সেই পুরানো দিনে যেমন রঙিন সূতোয় সূচঁ দিয়ে কাপড়ে নানা ছবি আঁকতেন। রাত দিন। বাইরে গুটি গুটি সূর্যটা একটু বড় হলে বারান্দায় আসেন; কোণায় জজিমটায় বসে এদিক ওদিক দেখেন, তার পর গায়ের চাদরটা টেনে শুয়ে থাকেন। এই বিরাট বাড়ীটায় তিনি যে আছেন তা কেমন আর বোধই থাকে না। অথচ বাড়ীটার সামনে কি সুন্দরভাবে এখনও শ্বেত পাথরে লেখা 'নলিনীভিলা'—সেই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর হল তো! ছেলেপুলেরা তখন রীতিমত বড় হয়েছে। এই বিরাট পড়ে থাকা জমিটাকে সাফ সুতরো করবে—বাড়ী তুলবে। একদিন সাত ভুতে লুটে পুটে খেয়েছে—নলিনীবালা কিছু বলতে পারেন নি—দীঘির মাছ ধরে নিয়ে গেছে কেউ—ফলন্ত বাগান থেকে সব ফল নিয়ে গেছে। ছেলে-পুলেগুলো বলেছে মা দেখে যাও সব নিয়ে গেল। কিন্তু যারা দিন দুপুরে নিতেই এসেছে তারা কি এ ডাকে ফেরে? অসহায়ভাবে দেখেছেন নলিনীবালা। পাড়া পরশিকে বলেছেন—কে কার জন্য আর মাথা ঘামায়।

তা মাঝে মধ্যে তো ধুন্দুমার লেগেই যেত। নলিনীবালা দুরু দুরু বুকে ভগবানকে ডাকতেন। বড় ছেলেটা ঠাণ্ডা ধরণের সেই ছোট বয়স থেকেই। একদল লুঠেরার মধ্যে যেতেও ভয় পেত না—

সব বলে কয়ে নাকি থামাবে। বল্লে নাকি চোর-ডাকাতও বদলে যায়। সব কয়টা তো সমান নয়। নলিনীবালা দেখতেন—বড়র এইসব কথাবার্তা শুনে রাগে গজ গজ করতে মেজ-সেজ। যাওনা দাদা—বাঘের সামনে গিয়ে তুমি গীতা পড়—, ও সব নয়—যেমন কুকুর তেমন মুগুর। ভেবেছে কি ব্যাটারা। ধরে চল সবাই মিলে প্যাদানী দিই—দেখবে সুর সুর করে সরে গেছে—। তা, প্যাদানীও মাঝে মধ্যে দিয়েছে নলিনীবালা দেখেছেন—বেশ কিছুদিন সব ভাল।

সেই ছেলেপুলেরা এখন বড়। আর বড় মানেই কি যন্ত্রণা? শুয়ে শুয়ে ভাবেন নলিনীবালা। এই টানা বারান্দার এক কোণে গুটিসুটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করেন তিনি। সমস্ত সংসারটাকে তিনি পরিষ্কার দেখেন। বড় ছোট মেজ সেজ। তার রক্ত থেকেই এসেছে। এক একটা নাড়ী ছেঁড়া। প্রতিটির জন্ম যন্ত্রণা হাসি মুখে সয়েছেন। সে যন্ত্রণায় কেমন এক সুখ ছিল—এখন ভর ভরন্ত সংসারে যন্ত্রণা—যা বুকের ভেতর কুড়ে কুড়ে খেয়ে যায়। সেদিনের যন্ত্রণার অজস্র আকন্দ ফুল যেন ফুটত—আর আজ? এই বিরাট ঝকঝকে বাড়ীটার ভর ভরন্ত সংসারে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান

নলিনীবালা। গান্ধারী? নলিনীবালা কি ক্রমে ক্রমে গান্ধারী হয়ে গেলেন? হয়ে যাচ্ছেন? নিজের বাগানের সব ফুল শুকিয়ে পোকায় কেমন হয়ে যায়, দেখতে আর পারেন না বলেই কি গান্ধারী নিজের চোখ বেঁধে রাখতেন? শুয়ে শুয়ে এইসব আকাশ পাতাল, ছাইপাঁশ ভাবেন নলিনীবালা।

বিরাট বাড়ীটায় এখন সব খোপ খোপ। এ ঘরের ভেতর থেকে ও ঘরে যাবার পথও কি যে যার দিক থেকে ছিটকানি আটকে দিয়েছে? নলিনীবালা জানেন না—তিনি আর কারো ঘরেই যান না—বুঝতে পারেন—। সব বাবু হয়েছে। একজন আর একজনের সাথে বারান্দায় বসেও কথা বলে না—বারান্দায় শুয়ে শুয়েই নলিনীবালা জেগে উঠা সংসারটা দেখেন। কোন ঘরে রেডিও বেজে উঠল, কোন ঘরে ঝি-এর সঙ্গে কি নিয়ে যেন লেগে গেছে, কোনটার কাচ্চা বাচ্চাগুলো হৈ চৈ করছে। যার যার তার তার। এক কোণে শুয়ে থাকেন নলিনীবালা। হঠাৎ হয়ত কারো মনে পড়বে—আরে যাঃ মাকে তো সকাল থেকে এক কাপ চাও দেয়া হল না। হয়তবা এটা নিয়েই লেগে যাবে। আমি না দিলে কি আর কারো মনে হয়? ব্যস এই একটা কথা ঢেউ তুলতে তুলতে নানাভাবে যাবে। এক কাপ চা দিযেই এই এত সাতকাহন—বলে হয়ত সেজ বৌ একটু বাঁকাভাবে তার ঘরের ভেতরে, দাঁড়িয়ে সাবান মাখাতে মাখাতে হয়ত বলবে মেজ ছেলে, এ জন্যই এখনকার দিনে আর এত বড় পরিবার মানায় না। এইভাবে সকালের এক কাপ চা ঢেউ তুলতে তুলতে কোথায় নিয়ে মেলাবে কে জানে? নলিনীবালা কিছু বলেন না। কোন দিন খান কোন দিন হয়ত ধারে চাটা ঠাণ্ডা হয়ে থাকে—উপরে একটা সর ভাসিয়ে—নিস্তরঙ্গ। এ তো এখন নিত্যদিনের রুটিন। মেজ ছেলের ঘরটায় নাকি রোদ ঢোকে না। এতদিন পরে এসে মনে পড়ল। এ ঘরেই ও রয়েছে সেই কবে থেকে। তা এতদিনে মনে হল ঠিক মত রোদ বাতাস খেলে না। আর খেলে না সেজ ভাই-এর ঘরের সামনের বারান্দাটার জন্যই। মেজ একদিন বারান্দার ঘুপচিটা ভেঙ্গে ফেলতে চাইল। ব্যস। সাজানো সম্পর্ক মাটির হাঁড়ির মত চৌচির। নলিনীবালা নিজের ঘরের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে থাকেন। দু'জনেব প্রত্যেকটা কথা কেমনভাবে ভেসে আসছে। দরজা জানালার সব ফাঁক ফোকর বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কান দুটো দুই শীর্ণ হাতে চেপে ধরেছিলেন—এ যেন তার না শুনতে হয়। এ যেন কোন বিড়ম্বনা। অথচ এরা তো কেমন পিঠাপিঠি। মেজকে একদিন কে যেন কি বলেছিল রাস্তায়—বাপরে সেজর সে কি রণং দেহি মূর্তি। ফুঁসছিল—আর বার বার বলছিল তুমি ছেড়ে দাও মা—ব্যাটাকে আমি বুঝিয়ে দেব—কার সাথে লাগতে এসেছে। সে ফোঁসানি দেখে নলিনীবালা হাসবেন না কাঁদবেন নিজেই বুঝতে পারছিলেন না, বলেছিলেন, তুই পারবি? একটা চড় দিলেই তো সব বীরত্ব—যাবে! প্যাকাটির মত যা চেহারা!

ইস্! তাই বলে ভাইকে মারবে! বলে মেজকে ধরে চোখ ছল ছল করে বলেছিল তাই গাধা, আমাকে আগে বল্লি না। ব্যাটা তোকে হাত দেয়! দেখিস আমি ওর ঠ্যাং ভেঙে দেব ; তুই কাঁদিস না।

নলিনীবালার দুগাল বেয়ে শুকিয়ে আসা ঝর্ণার মত বেয়ে বেয়ে জল নামে। স্মৃতি তুমি বড় প্রতারক। বড় বেশি মিথ্যা বলে। না হলে কিভাবে এত বদলে যায়? নলিনীবালা তার ভেতরে কম্পন অনুভব করেন। এ বড় বেশি যন্ত্রণার—সেই মেজ-সেজ বারান্দার এক টুকবো জায়গা নিয়ে এখন কি বলছে? এ ভাষা ওরা কখন শিখল? এ ভাষা ওরা কোথায় পেল? নলিনীবালা পাশ ফিরে শোন। পা দুটো একটু টান টান করে দিতে ইচ্ছে হয় ; হাঁটু ভেঙ্গে শুয়ে থাকতে থাকতে একটু ব্যথা ব্যথা ভাব। গায়ের উপর চাদরটাকে তিনি টেনে টুনে নেন। ঢাকা হয়ে থাকেন। রোদ এখন একটু একটু করে বাড়ে। মুখের' পর কাপড়টাকে টেনে নেন—রোদের তাপটাকে একটু কমাতে।

একে একে থলি হাতে এখন সব ফিরবে। এই ঘর থেকে ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ উঠবে তো আর একটা ঘর থেকে কিছু ভাজা ভুজির। বড়র ঘরে মাংস বসলে ছোটর ঘরের বৌ কেমন মুখ গোমড়া হয়ে থাকেন। চাদরের তলায় মুখ ঢাকা থাকলেও নলিনীবালা সব যেন দেখতে পারেন। কচি কচি মুখগুলো সবতো তিনি দেখে শুনে আনলেন—ক্রমে ক্রমে কেমন বেঁকে যায়। দূর থেকে তিনি নাতি নাতনীগুলোকে দেখেন। কখনও দুপুরে কখনও বৃষ্টি ঝরা বিকেলে ছুট ছাট দু' একটা আসে। যেন এক শতাব্দী প্রাচীন মন্দির গুহায় শিশু এলো। ঠাকুরমার কাছে গপ্প শুনতে চায়। খুব আস্তে। নলিনীবালা মাথায়, মুখে কাঁপা কাঁপা হাত বোলান। তিনি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে নেন। কারো নাকের ডগাটা, কারো

কানের লতিটা—ওমা, ঠিক তোর বাপের মত নাকটা হয়েছে রে। হলে ফিক্ করে হেসে দেন। হারানো স্মৃতির ঢেউ খেলে যায়। কথা বলেন না—আর শুধু ছুঁয়ে থাকেন।

এতগুলো বাচ্চা কাচ্চা বাড়ীটায়। একটা আর একটার সাথে কথা বলতে শিখল না। মেজর ছেলেটা যখন বারান্দায় একটা গাড়ীর ভোঁ শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছিল, দূর থেকে শুয়ে শুয়ে নলিনীবালা দেখছিলেন—ঠিক ওর বাপের মত—এভাবেই তো খেলত—তখন বড়র বৌ বাইরে এসে বল্লো—এই, এখন এভাবে খেলছ কেন? নস্তু স্কুলের টাস্ক করতে পারছে না ; যাও ঘরে যাও। কেমন নীলচে হয়ে যায় ঠোঁট দুটো। নলিনীবালা নিজের মুখটা ঢেকে ফেলেন। এ দেখার কি দরকার। চোখের ছানিটা কেন আরো গাঢ় হয় না! কেন সব ঢেকে যায় না! নলিনীবালা জানেন এরপর কি হবে! কি হয়ে যায়! তিনি এর প্রতিবিধান জানেন না। আর কিইবা তার শক্তি। নিজেকে নিঃস্ব করে গড়েছেন—ঐ এক একজনকে। ওদের থাকাটাই নলিনীবালার থাকা। না হলে এই বিরাট বাড়ীটার সামনের শ্বেত পাথরে লেখা 'নলিনী ভিলা! কথাটা আর অর্থ কী থাকে! কে আর খোঁজ খবর নেবে? কেন নেবে? মানুষ তো বাড়ীঘরের প্রাণ! মানুষহীন বাড়ীঘর, পাড়া, দেশ—দূর! এ সব কি ভাবেন নলিনীবালা। এ সব তো তার ভাববার কথা নয়। সব ভাঙ্গছে। চোখের সামনে সব ভেঙ্গে যাচ্ছে। তারপর কি এক সময় ধসে পড়বে? বিরাট ভূমিকম্পে ডুবে যাবে।

তিনি ফিস ফাস শোনেন—ভাগাভাগি করে বিক্রিবাটা করে দেবে নাকি? আপনার চেয়ে পর ভাল! কিন্তু তারপর? সেই শৈশব থেকে শুনে আসা কথাটার শেষে তো আছে পরের চেয়ে জংলা ভাল! তা হলে আবার ফিরে যাবে জংলায়। ভরে যাবে অগুণতি আগাছায়? এই বিরাট বাড়ীটা যার প্রতিটি ঘাস দুর্বায় নলিনীবালার বুকের ভালবাসা, যার প্রতিটি গাছের গুড়িতে গুড়িতে ছেলেপুলের অনেক দিনের খেলার স্মৃতি তা বেচে দেবে? কেন? নলিনীবালা ভাবেন ওরা হয়ত এখন তাঁকে বেঁচে দিতে পারে। এখন আর ওদের ভাষা তিনিও বোঝেন না। কি যে সব বলে টলে। তিনি তাকান—তাকিয়ে থাকেন বোবা হয়ে।

যে যার ভাগটুকু নাকি নিয়ে নেবে! একবার বলতে ইচ্ছে করে কিসের ভাগ? কার ভাগ? আমার ধড় মুণ্ডু কেটে ভাগ কর। আমার হাত পা কেটে ভাগ কর। আমার বুকের ভেতরটা কেটে ভাগ কর। ভাগ করে নে। নিয়ে বেচে দে। অনেক পাবি। সুখ পাবি, শান্তি পাবি, অনেক অনেক পাবি। গাড়ী বাড়ী, সব পাবি।

চাদরের তলায় নলিনীবালা অসহায়ভাবে হাসফাস করে। তাঁর যেন কেমন কষ্ট হয়। বুকের ভেতর। বাতাস চান তিনি। ফুস ফুস ভরে বাতাস। বাতাস নিয়ে যদি একবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে পারতেন—তবে হয়ত বুকের উপরের বোঝাটা এভাবে চেপে ধরে থাকত না।

এক ভাই আর ভাইকে জানে না, কথা বলে না, হিংসায় নীল হয়ে থাকে গান্ধাবী। নলিনীবালা গান্ধারী। ছানিপড়া চোখ দুটোকে তিনি আরো জোরে চেপে রাখেন। কোনদিন কেউ কেউ তাকে স্বর্ণগর্ভা নাকি বলত। হায়—সব গিল্টি সোনার টুকরো। রং চটে যাচ্ছে। নলিনীবালা এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পের জন্য এই প্রাচীন প্রসাদের দীর্ঘ টানা বারান্দায় শুয়ে থাকেন।

সকালের রোদ এখন বারান্দায় জাফরির ফাঁক দিয়ে বরফির মত। টানা বারান্দায় কালো সাদা চৌকো ছকগুলো চক্ চক্ করে। এক কোনায় নলিনীবালা শুয়ে থাকেন। আপাদমস্তক সাদা কাপড়টা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছেন। উত্তর শিয়রী। পা দুটো লম্বা করে একটার' পর আর একটা দিয়ে তুলে শুয়ে আছেন। ডান হাতটা একটু ছড়ানো, বাঁ হাতটা বুকের কাছে আলতো করে গুটানো। দূর থেকে তাকালে ভারতবর্ষেব এক শায়িত মানচিত্র। বা হাতের কুনুইয়ের পাশে প্রভাতী সূর্যের আলো। এই আলো তার সমস্ত দেহের' পর কখন ছড়িয়ে যাবে? কখন?

ভারতবর্ষের মত নলিনীবালা শুয়ে আছেন উত্তর শিয়রী হয়ে।

সেলিনা হোসেন

বৈধব্য

নুরু মুন্সির সংসারে তেমন অভাব নেই। মোটামুটি সচ্ছলই বলা যায়। জমিজমার চাইতেও আছে বিশাল বাঁশ বাগান। বছরের বড়ো টানের খরচগুলো এই বাঁশ বিক্রির টাকা থেকে হয়ে যায়। নুরু মুন্সি সুখী লোক। হাসিখুশি দিলখোলা। কারণে অকারণে তার মতো প্রাণ খুলে হাসতে এ গাঁয়ে আর কেউ পারে না। সাত ছেলেমেয়ের মধ্যে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব নুরু মুন্সির নেই। শুধু আছিয়ার জন্যে একটা বুক পোড়ানো যন্ত্রণা খচ খচ গত আশ্বিনে ভোম্বল ওকে বলেছিলো, তোর এই মেয়ের হাতে বৈধব্য আছে। বলার সময়ে ভোম্বল দাসের মোটা ঘনকালো চকচকে ভুরুর নীচের ফ্যাকাসে চোখের দৃষ্টি ধূসর হয়ে উঠেছিল। নুরু মুন্সি হাত জড়িয়ে ধরেছিলো। ভোম্বল ওর দিকে না তাকিয়ে বলেছিলো, একটা গোমেদ পাথরের আংটি রূপা দিয়ে বানিয়ে মেয়ের অনামিকায় পরিয়ে রাখিস। শনি কেটে যাবে।

ভোম্বল নুরু মুন্সির প্রিয় বন্ধু। দীর্ঘদিনের সখ্য। বন্ধুর জ্যোতিষ বিদ্যায় গভীর আস্থা। বিষণ্ন করে রাখে। মাস দুয়েক পর একঝাড় বাঁশ বিক্রি করে গঞ্জ থেকে একটা আংটি বানিয়ে নিয়ে আসে আছিয়ার জন্য।

ভোম্বল কাকার ভবিষ্যৎ-বাণী আছিয়াকে তেমন আলোড়িত করেনি, বরং নতুন আংটিটায় ওর দারুণ আনন্দ। চিকন লম্বা আঙুলে চমৎকার মানিয়েছে। ও বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। এই আংটিটার আগে ওর কোনো গয়না পরার সুযোগ হয়নি, শুধু দুহাত ভরা কাঁচের চুড়ি ছাড়া। মীরা ওর ভাগ্যে ঈর্ষা প্রকাশ করলে আছিয়ার বুক ভরে যায়। ও চায় গাঁয়ের সব মেয়ে ওকে ঈর্ষা করুক। মীরার মতো বলুক, তোর ভাগ্য কতো ভালো রে আছিয়া। কি সুন্দর আংটিটা। আমাদের ভাগ্যে কখনো হবে না।

হবেই নাতো। সবার ভাগ্যে কি সব হয়। সোনালি বাঁশ ঝাড়ের নীচে ছাগলের খুঁটি পুঁততে পুঁততে আছিয়া মাথা ঝাঁকায়। ভোম্বল কাকার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে ওঠে। কেমন সুন্দর আংটি পরা হলো এবং এই আংটির জোরে ওর বৈধব্যও কেটে যাবে! কী যে মজা। ও আঁচলের কোনা থেকে তেঁতুলের পোঁটলাটা খুলে নিয়ে পা ছড়িয়ে বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায় বসে। মা বলেছে, এই পৌষে ওর বয়স উনিশ হবে। বাবা বলে, মেয়েটার বয়সই বাড়ছে। বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন হলো না।

আছিয়া হি-হি করে হাসে। প্রাণভরে তেঁতুল চাটে। ওর ধারণা, মেয়েমানুষের বেশি বুদ্ধি না থাকাই ভালো। মা তো কেবল সারা দিন রাঁধে। রাঁধার জন্য কি বুদ্ধি লাগে? ভোম্বল কাকাও বলে, মেয়েদের বেশি বুদ্ধি হলে সংসার নষ্ট হয়। কেমন করে, তা আছিয়া ভেবে পায় না। তবে বুদ্ধি থাকলে সংসার নষ্ট হবে এমন ধারণাও ও মানতে পারে না। ওর অনেক কিছুই অনেকের ভালো লাগে না, তাতে ওর কিছু এসে যায় না। ও দিনগুলো হেসে খেলে উড়িয়েই দিতে চায়। এই যেমন, এই সোনালি বাঁশ ঝাড়টা ওর প্রিয় জায়গা। এই গ্রামে এমন একটা ঝাড় আর কারো নেই. পাতাগুলোও সোনা রঙের। এমন পাতার মাথায় কাঠঠোকরা বসে থাকলে ওর দৃষ্টি সরে না। মীরা বলে, আদেখলেপনা। আছিয়ার দুঃখ হয় না। মীরা ভেংচি কেটে ঠোঁট ওলটালে ওর কিছু এসে যায় না। ও নিজে যেটা ভালো বোঝে সেটাই ওর বেশি প্রিয়।

ওর বৈধব্য নিয়ে বাবা খুব চিন্তিত। ও বাবার মুখ দেখলে সব আঁচ করতে পারে। মা বিশ্বাস করে না। রাগে গজ গজ করে বলে, ভোম্বলটা চিরকালই বাউণ্ডুলে। হুট করে একটা কথা বলে গেলেই হলো আর কি? কিন্তু নুরু মুন্সি স্ত্রীর সঙ্গে একমত হতে পারে না। ভোম্বল দাস কি করে এই বিদ্যা আয়ত্ত করলো তাও জানে না। কিন্তু বন্ধুকে গভীরভাবে বিশ্বাস করে। ও ভবঘুরে মানুষ। ঘরে থাকতে ভালোবাসে না। এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে হাত দেখে, কোষ্ঠী বানায়। এ ওর এক নেশা। কেমন এক আচ্ছন্নের মধ্যে থাকে। মাঝে মাঝে কোথাও উধাও হয়ে যায় যে দীর্ঘদিন খোঁজ থাকে না। জিজ্ঞেস করলে হাসে।

বলে, রাতে মানুষ ঘুমোয় চেতনহীন ঘুম। আমি যখন উধাও হই তখন তেমন চেতনহীন ঘুমে আমাকে পেয়ে বসে। আমি রাতদিন বুঝি না রে। ভোম্বল জাতধর্ম মানে না। এ গাঁয়ে এলে নুরু মুন্সির ঘরে দুচার দিন কাটিয়ে যায়। তখন ওর দিনগুলো অন্য রকম হয়ে যায়। এক মুহূর্তে ভোম্বলের সঙ্গ ছাড়ে না। আছিয়ার মা বলে, ভোম্বল তোমাকে যাদু করেছে। নুরু মুন্সি স্ত্রীর উচু চোয়ালের পাশে কোটরগত চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করে, ভোম্বলের ভেতর একটা জ্যোতি আছে। সে আলো সবাই দেখতে পায় না। পায়না বলেই বুঝতে পারে না ওকে। আসলে পারাটাও তেমন সহজ নয়। বাঁশ ঝাড়ের মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওর মগজে ভোম্বল আটকে থাকে। ওর মনে হয় একজন মানুষ অন্য কাউকে ভালোবাসলে সে মানুষটির মধ্যে প্রবেশ করে। সে মানুষটি তার অন্তরঙ্গ ভালোলাগায় এমনভাবে মিশে থাকে যে তখন তার জ্যোতি বুক জুড়ে আলো হয়ে ওঠে। ভোম্বলকে ও তেমন ভালোবাসে। এ ভালাবাসা স্বর্গীয়। হাঁটতে হাঁটতে বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায় থমকে দাঁড়ায় মুন্সি। জ্যোতি কী? ভোম্বলকে কি ও কোনোদিন চিনতে পেরেছে? কেবলই তো ওর আপনভোলা স্বভাব ওকে টেনে রেখেছে। ওর কোন চাহিদা নেই। এতো কম প্রয়োজন নিয়ে যে বেঁচে থাকা যায় এটা ওর বিস্ময়। ভোম্বলের দরকার একমুঠো ভাত, তাও কোনো আমিষ নয়। বছরে এক জোড়া ধুতি, একটা ফতুয়া। অথচ ওর নিজের এতো এতো ধানের জমি, এতো বিশাল বাঁশবাগান থাকার পরও মনে হয় আরো চাই, আরো। তাহলে না চাইতে পারার ক্ষমতাটা কি জ্যোতি? মুন্সি মুলি বাঁশের মাথায় আসা ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভোম্বল যা পারে ও তা পারে না, সে জন্য ভোম্বল ওর এতো প্রিয়। নিজের আকাঙক্ষার প্রতিফলন ও ভোম্বলে দেখতে পায়। মানুষের মধ্যে মানুষের প্রবেশ ঘটলে সে মানুষটি নিজেকে অন্যের অস্তিত্বে দেখে। বিলুপ্ত হয়ে যায় তার নিজের অনেকখানি। এই দেখা আনন্দের, বেদনার। আবেগের তীব্রতার দংশন প্রবল হয়ে অস্থির করে রাখে। নুরু মুন্সির এখন তেমন সময়। এই বাগানের ছায়ায় ও অনেক সময় কাটিয়েছে, কখনো এমন করে কাটায়নি। মুলি বাঁশের ফুল ও হাজার বার দেখেছে, এই দেখা তার চাইতে ভিন্ন। এই ফুলের আদলে একটা গোমেদ পাথরের আংটি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, কখনো এমন আংটি মুছে গিয়ে ভেসে ওঠে ভোম্বলের গভীর কালো, চোখ, আছিয়ার মুখ, বৈধব্যের নিরাভরণ সাদা ছায়া। নুরু মুন্সি হাঁটতে হাঁটতে বাগানের শেষ মাথায় আসে।

বাঁশের অন্য কোনো ঝাড়ে আর ফুল নেই। ফাল্গুন থেকে আষাঢ় পর্যন্ত মুলি বাঁশের ফুল ফোটাব সময়কাল। সময়কাল? নুরু মুন্সি শব্দটা মাথায় নিয়ে বাগানের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। মানুষের জীবনেও ফুল ফোটার সময়কাল থাকে। কিন্তু এর চরিত্র ভিন্ন। বাঁশঝাড়ের মতো ঘোষণা দিয়ে মানুষের জীবনে ফুল ফোটে না। ফুল ফোটার বছর দুয়েক আগে থেকেই ঝাড়ে নতুন কঞ্চি গজানো কমে যায় কিংবা বন্ধ হয়ে যায়। না, এমন হয় না মানুষের জীবনে। এমন হলে ফুরিয়ে যেতো বেঁচে থাকার সব আয়োজন। মানুষের জীবনে ফুল ফোটার সময়কাল কখন এসে দাঁড়াবে কেউ বলতে পারে না। কখন ফুরোবে কেউ জানে না। ভোম্বলের মতো লোকেরা, সংখ্যায় খুব কম তারা, জানে। এবং সেটা জানিয়ে দিয়ে ঝরা পাতায় আগুন লাগায়।

কারো কারো বুকে সে আগুন দাউদাউ জ্বলে। তাই নুরু মুন্সি এখন পুড়ছে। হাত দুটো শিথিলভাবে ঝুলিয়ে ও বাঁশ বনের সরু পথে বাড়িমুখো হয়। মাথার ওপর বাঁশ পাতার শনশন শব্দ। দূরে কোথাও ঘুঘু ডাকছে একটা। আজ নুরু মুন্সির কতোগুলো জরুরি কাজ ছিলো। গঞ্জেও যাওয়া দরকার ছিলো। কিছুই করার মন নেই। মাথা একবার বিগড়ে গেলে সুস্থির হতে সময় লাগে। তখন আর নিজের নাগালের মধ্যে কিছুই থাকে ন। না ইচ্ছাশক্তি, না কর্মস্পৃহা। এ সময়ে আছিয়ার মা খুব রাগারাগি করে। পরিষ্কার বলে, ঐ ভোম্বলটা আমার সংসারের শত্তুর। সবকিছু গিলে খায়। এমনিভাবে নুরু মুন্সি ঔদাসীন্য ভোম্বলের ওপর গিয়ে বর্তায়। কিন্তু কিছু করার থাকে না। ঐ ঘুঘুর ডাকটা ওর ভীষণ খাবাপ লাগছে। হাতের কাছে পেলে পাখিটাকে মেরেই ফেলতো। অথচ কতোদিন গেছে নির্জন দুপুরে ঐ ঘুঘুর ডাক শোনার জন্য নুরু মুন্সি বাঁশ বাগানের ছায়ায় শুয়ে থেকেছে। ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে গেছে। নুরু মুন্সি আনমনা হাঁটতে হাঁটতে সোনালি বাঁশঝাড়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। অনেক কষ্টের ঝাড়

এটা। যত্ন নিতে হয়। ওর বাবা কোথা থেকে এনে লাগিয়েছে, ও জানে না। চল্লিশ বছর আগের কথা। এখনো ফুল আসেনি। কবে এই ঝাড়ে ফুল আসবে কে জানে। আছিয়ার মা বলে, ফুল না আসাই ভালো। বাঁশঝাড়ে ফুল এলে সংসারে বিপদ আসে। না, নুরু মুন্সির জীবনে সেই ধরনের কোনো বিপদই হয়নি। বিশ বাইশ বছর ধরে তো নির্ঝঞ্ঝাট সংসার করে যাচ্ছে। তবু আছিয়ার মা সামান্য কারণে ভোম্বলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেন, নুরু মুন্সি বুঝতে পারে না। ওর বুক ভেঙ্গে দীর্ঘশ্বাস আসে। সংসার বুঝি এমনই। মুন্সি যখন ওর মধ্যে প্রবেশ করে আর একজন তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। আজ ওর মন খারাপ, আজ ও ভালোমন্দ বোধের বাইরে, তবু কি সংসার থেকে রেহাই আছে? ভোম্বল সংসার থেকে পালাতে পেরেছে। ও পালাতে চায় না। মাঝে মাঝে বিশ্রাম চায়। অসম্ভব জরুরি হয়ে ওঠে বিশ্রাম। এই বিশ্রাম পেলেই ওর মনে হয় এখনই ফুলফোটার সময়কাল। চারদিকে সুবাতাস। জীবনে ঋতু বসন্ত। নুরু মুন্সি এই উপভোগটুকুকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় মনে করে। এমন ছোট্ট ছোট্ট সময়কাল ওর জীবনে বেশ কিছু জমেছে। জোড়া দিলে হয়তো খুব বেশি হবে না, তবুও এটাই ওর সম্পদ, কখনো নির্জনে, অবসরে নেড়েচেড়ে সুখ পায়। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস শরীর স্পর্শ করে যায়। ওর মনে হয় দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে। এভাবেই ও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে দীর্ঘকাল। সোনালি বাঁশ ঝাড়ের নীচে নুরু মুন্সির সময় বয়ে যায়। যে সময়ের হিসেব ওর কাছে নেই। হিসেব ও রাখতে চায় না। ভোম্বল যাকে বলে, নিমিত্ত। নিমিত্ত মানে ভাগ্যের ফের। মানুষের সাধ্য নেই এই নিমিত্তকে খণ্ডানোর। ভোম্বলের ধারণা অনুযায়ী এখন এই এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মুন্সির নিমিত্ত। এর বাইরে একচুল এদিক-ওদিক করার ক্ষমতা ওর নেই। মুন্সির বুক ধড়ফড় করে। নেই কেন? ওতো ইচ্ছে করলেই বাঁশ বাগানের এমাথা-ওমাথা পাগলের মতো দৌড়ে বেড়াতে পারে। শুনলে ভোম্বল হো হো করে হাসবে। হাসতে হাসতে ওর ধূসর দৃষ্টি রক্তাক্ত হয়ে ওঠবে। তখন ভয় করবে মুন্সির। ভোম্বল এক সময়ে হাসি থামিয়ে বলবে, ওটাও নিমিত্ত। এই নিমিত্তের বেড়াজালে মানুষের জীবন বাঁধা। মুন্সি হাত দুটো ওপরে উঠায়। গাছের পাতা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। অস্থিরতা কাটতে চায় না। এই সময়টা বড়ো কষ্টের। মুন্সি দুহাতে বুক চেপে ধরে।

তখম দুহাতে দড়ি ধরে ছাগল নিয়ে হাজির হয় আছিয়া। মাস দুয়ের আগে চারটা বাচ্চা দিয়েছে ছাগলটা। ফুটফুটে বাচ্চাগুলো লাফাতে লাফাতে পায়ের গাছে এসে দাঁড়ায়।

বাবা?

নুরু মুন্সি মায়ের মুখের দিকে তাকায়। চঞ্চল, অস্থির মেয়েটি ছাগল নিয়ে সুখে আছে। ওর কোনো ভাবনা-চিন্তা নেই। ঐ সবের ও ধার ধারে না।

বাবা তুমি এখানে কী করছো?

কিছু না।

তোমার কি মন খারাপ?

কেন রে?

এই যে আমার আংটির জন্যে ঝাড় বিক্রি করলে, ওরা তো কাল কাটতে আসবে। মাকে বলে গেছে।

নুরু মুন্সি চুপ করে থাকে। ওর কি মন খারাপ? না, একটুও না। ঝাড়ের বিনিময়ে ওতো আছিয়ার বৈধব্য ঠেকাচ্ছে। বরং আংটিটা না বানাতে পারলেই ওর মন খারাপ হতো। আছিয়া উবু হয়ে বসে ছাগলের খুঁটি পুঁতছে। খুটখুট শব্দ হচ্ছে। শব্দ নুরু মুন্সির মাথার মধ্যে হাতুড়ি পেটায়। না ঠিক তা নয়। যেন আছিয়ার বিলাপ ধ্বনি। কান্না থেমে গিয়ে ওর বুক থেকে এখন হেঁচকি উঠে আসছে। আছিয়া হাত উঁচু করে জিজ্ঞেস করে, বাবা ভোম্বাল কাকা আবার কবে আসবে?

কেন? নুরু মুন্সির চমকে উঠে। আছিয়ার কি খুব দুঃখ হচ্ছে? ও কি ভোম্বলের ওপর রেগে আছে?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম বাবা। ভোম্বল কাকাকে আমার খুব ভালো লাগে। এমন মানুষ হয় না।

মুন্সি আছিয়ার দৃষ্টি দেখতে চায়, পারে না। ও আবার চোখ নামিয়ে নিয়েছে। ওর পিঠ দেখা যাচ্ছে।

পিঠের ওপর শাড়ির আঁচল। মাথায় খোঁপা। ঘন কালো চুলের বড়ো খোঁপা। নুরু মুন্সির দৃষ্টি আটকে থাকে। কালো রঙে ওর বিবমিষা। কখনো হঠাৎ করে শরীর খারাপ লাগে। অমন কারোর বেষ্টনী আছিয়ার চারদিকে ঘনিয়ে আসছে। ও আঁচলের খুট থেকে তেঁতুলের পোটলা বের করে। বাঁশের গায়ে হেলান দিয়ে বসে।

ঘরে যাবি না?

ছাগলগুলোর ঘাস খাওয়া হোক। এখন গেলোতো বাচ্চাগুলোর সব শেয়ালে নিয়ে যাবে।

শেয়ালে?

হ্যাঁ, বাবা জানো না ভীষণ উৎপাত করে।

নুরু মুন্সি বলতে পারে না, তোর ভাগ্যটা কি শেয়াল মা? তোকে খাবার জন্য ওঁত পেতে আছে।

ভোম্বল তোর নিমিত্ত কি শেয়াল? তুই তো কখনো বলিস নি যে তোর নিমিত্ত কখনো শেয়াল, কখনো পুষ্প!

তোমার যেন কী হয়েছে বাবা

কিছু না।

বাড়ি যাবে না?

যাচ্ছি।

নুরু মুন্সি পাশ কাটিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। ভঙ্গিটা এমন যেন ইচ্ছে নেই তবু হাঁটছে। হাঁটাটা প্রয়োজন নয়, তবু হাঁটতে হয়। ও ভাবতে চায় এই মুহূর্তে এমন কিছু ঘটলে খুশি হবে যেটা ওব সবচেয়ে আনন্দের। অল্প একটু গিয়ে ও আবার ফিরে আসে।

বাবা, ফিরলে যে?

কিছু ভালো লাগছে না।

বাবাব জন্য আছিয়ার বুক কেমন করে। বাবার আজ কিছু হয়েছে যেটা কাউকে বলতে পারছে না। পাবলেও বলবে না। এই অপরিচিত বাবাকে ওর ভালোই লাগছে।

বাবা তেঁতুল খাবে?

দে একটু।

নুরু মুন্সি হাত বাড়িয়ে তেঁতুল নেয়। সামান্য একটু জিভের ডগায় লাগিয়ে চোখমুখ কুঁচকে ফেলে।

কী করে খাস এগুলো। মাগো—

আছিয়া হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আজ তোমার কী যে হয়েছ। তুমি এমন করলে মা একদম বেগে যায়।

এ জন্যই তো ঘরে ফিরতে মন চাইছে না।

আচ্ছা বাবা এখন কী হলে তুমি সবচেয়ে খুশি হও?

ভোম্বলকে যদি পেতাম।

হ্যাঁ ঠিক। ভোম্বল কাকা খুব ভালো মানুষ। দেখো দেখো দুষ্টু বাচ্চাগুলো কেমন এদিকে-ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে।

আছিয়া ওগুলোকে ধরার জন্য পিছু ছোটে। ওর পিঠের ওপর চুলের গুচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে। সবুজ আর লাল মেশনো ডুরে শাড়ি কাশ বনে মিশেমিশে যায় ও এখন একটা পুষ্প। হাজার হাজাব প্রজাপতি বুঝি চারদিক থেকে ওর কাছে ছুটে আসছে। মুন্সি ব্যাকুল দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ও একটা বাচ্চা কোলে তুলে নিয়েছে। আর একটা ধরার চেষ্টা করছে। ওকে দারুণ লাগছে। ওব চারদিকে নীলপদ্মেব ঘ্রাণ। আছিয়া নীলপদ্ম হয়ে ফুটে উঠেছে। নুরু মুন্সি মনে মনে মেয়ের জন্য জামাই খোঁজে। কাউকে তেমন পছন্দ হয় না। অথচ কাউকে পছন্দ করা দরকার। আছিয়ার এখন সময়কাল। ওর নিমিত্ত যে পুষ্পেব সৌরভ। ওকে কখনো দেখা যাচ্ছে, ও কখনো ঝোপের আড়ালে চলে যাচ্ছে। ওর মুখ জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এলোচুলে ও এখন বয়স্ক নারী। ওর চারিদিকে দারুণ দুর্দিন। একটাও প্রজাপতি

নেই। নুরু মুন্সির চোখের সামনে এখন ওর চুলের মতো ঘনোকালো অন্ধকার। মুহূর্তে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। চিৎকার করে আছিয়াকে ডাকে।

ও পরিশ্রান্ত হয়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়ায়। কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। চারটে ছাগলের বাচ্চা ওর বুকের মধ্যে। যেন চারটে সন্তান নিয়ে বাবার সংসারে ফিরে এসেচে।

বাবা?

নুরু মুন্সির প্রচণ্ড রাগ হয়। আচিয়ার চোখের বয়স্ক দৃষ্টি ও উপেক্ষা করে।

ধিঙি মেয়ে সারাদিন বাঁশবনে ছুটাছুটি। যা বাড়ি যা।

নুরু মুন্সির মাথায় প্রচণ্ড ঘূর্ণি।

বাবা?

আছিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠে ফুকের সৌরভ উঠে যায়। ও কেমন করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাস করতে পারছে না যে বাবা ওকে বকছে।

আমি তোকে বাড়ি যেতে বলছি।

নুরু মুন্সির শক্ত কঠিন কণ্ঠে আছিয়া আর কথা না বলে বাড়ির পথ ধরে। বাচ্চাগুলো বুকে নিয়ে ও চলে যাচ্ছে। কোথায়? কতদূর? এই বাঁশ বনের সীমানা ছাড়িয়ে ওর কি কোথাও যাবার জায়গা আছে? ওর নিমিত্ত এখন শেয়াল। ওকে আর দেখা যাচ্ছে না। নুরু মুন্সির বুকে ব্যথা হয়। আছিয়ার মা থাকলে গালি দিতো. সব কিছুতে তোমার বাড়াবাড়ি। কে কী বললো তাই নিয়ে তোমার রাতদিনের ঘুম হারাম।

কী করবো আমার স্বভাবটাই এমন। কোনো কিছু মাথায় প্রবেশ করলে আর কিছুই নামাতে পারি না। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে আছিয়ার মা।

কথাগুলো বাঁশবনে হা হা ফেরে। নুরু মুন্সির চোখে জল আসে। খিদের কথা শুনলে আছিয়ার মা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই একটা ব্যাপারে তার মমতার শেষ নেই। ভোম্বল এভাবে তাকে কাবু করে। বসেই বলবে, ঘরে কিছু খাবার আছে বৌদি? ভীষণ খিদে পেয়েছে। এতোটা পথ হেঁটে এসেছি, কোথাও বসিনি। আপনার হাতের এক গ্লাস জলও খুব শীতল। বুক জড়িয়ে দেয়।

এরপরে আছিয়ার মা আর কথা বলতে পারে না। তৃপ্তিতে খুশিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ছুটোছুটি করে খাবারের ব্যবস্থা করে। ভোম্বলের ওপর যতো রাগই থাকুক নিমেষে উবে যায়। মানুষকে মানুষ কতো সহজে জয় করতে পারে। নুরু মুন্সি দুপুরের রোদ মাথায় করে আছিয়ার ছাগলের দড়ি হাতে ধরে ঘরে ফেরে। মাচানের নীচে ছাগল দুটো বাঁধতে বাঁধতে শুনতে পায় আছিয়ার মা-র গলা। আছিয়া বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে। বাবাকে দেখে কোনো ভাবান্তর হয় না। অসীম আকাশের শূন্যতা ওর চেহারায়। নুরু মুন্সি বারান্দায় এসে বসলে হাসিনা তাল পাখাটা নিয়ে দৌড়ে আসে। বাতাস করে।

তোমার কী হয়েছে বাবা?

নুরু মুন্সি কিছু বলে না। হাতদুটো পেছনে ঠেস দিয়ে শরীর ছেড়ে দেয়। যেন ক্লান্তি আর ধরে রাখতে পারছে না। যেন পরিশ্রমে বিপর্যস্ত। কেউ তো জানবে না ওর এখন মানসিক শ্রম আছে। নুরু মুন্সি বোঝে শারীরিক শ্রমের চাইতে মানসিক শ্রম ভয়াবহ। এই শ্রম কুরে খায় হৃৎপিণ্ড, কুরে খায় ধমনী। বন্ধ করে দেয় রক্ত চলাচল। রান্নাঘর থেকে আছিয়ার মা এসে দাঁড়ায়। কিছুটা পরিশ্রান্ত, কিছুটা বিধ্বস্ত। সাংসারিক ঝামেলা তাকেই পোহাতে হয় বেশি। আংটির ব্যাপারে বাঁশঝাড় বিক্রি করেছে বলে আছিয়ার মা বিরক্ত। জিনিসটা তার একদম পছন্দ হয়নি। তার মতে, মেয়ের ভাগ্যে যদি বৈধব্য থাকে তবে ঐ আংটি কি ঠেকাতে পারবে? কিন্তু নুরু মুন্সি আছিয়ার মা-র কথা অগ্রাহ্য করেছে। আজ সকালে ওরা এসে জানিয়ে গেছে বাঁশ কাটবে। কাজেই নুরু মুন্সি ধরে নিয়েছে আছিয়ার মা-র মেজাজ ঠিক নেই। ওকে কাছে আসতে দেখেই শঙ্কিত বোধ করে। তাই কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার অবকাশ না রেখেই বলে, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

ভাত রাঁধাতো হয়েই গেছে। গোসল করো। আছিয়ার মা অন্য কাজে চলে যেতে যেতে বলে, ভাবলাম বুঝি শরীর খারাপ। কী আবার বাধিয়ে বসলে।

নুরু মুন্সি উঠোন পেরিয়ে পুকুর পাড়ে আসে। মনে মনে বলে, যা বাধিয়েছি সে তুমি বুঝবে না। আসিনা লুঙ্গি গামছা নিয়ে এসেছে। মুন্সি ঘাটে দাঁড়ায়। আছিয়ার মা ঘুঁটে দিয়েচে। কাঁচা গোবরের গন্ধ আসছে। ঝাঁঝালো গন্ধ শরীরের ঢুকে যাচ্ছে।

বাবা?

হাসিনার মৃদু কণ্ঠ মুন্সির কানে প্রবেশ করে না। তরতরিয়ে জলে নামে।

বাবা?

চমকে ওঠে নুরু মুন্সি। কিছুটা ক্ষোভমিশ্রিত কণ্ঠ হাসিনার। মেয়েটা কেনো অমন করে ডাকে? ও কী শেয়ালের সামনে পড়েছে? বাঁচার জন্য আকুল প্রার্থনা ওর কণ্ঠে। ও সন্দেহের চোখে হাসিনার মুখের দিকে তাকায়। ও এখনো বালিকা। ওর জীবনে পুষ্প ফোটার কাল এখন। ওর কণ্ঠে আর্তনাদ থাকবে কেনো?

তবু জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবি?

আমাকে বুজির মতো একটা আংটি বানিয়ে দিতে হবে।

কেন?

নুরু মুন্সি বোকার মতো প্রশ্ন করে।

আমি পরবো। আমার শখ হয় না বুঝি?

হাসিনার অভিমান ভরা দৃষ্টি, মাথার রুক্ষ চুল শনের মতো লালচে। ওকে বেশ দেখাচ্ছে। ঐটাতো শখের আংটি নয়?

তা হোক আমিও চাই।

কেন?

নুরু মুন্সি আবার বোকার মতো প্রশ্ন করে। ওর হাত তো বৈধব্য নেই, তবে কেন ঐ আংটি পরবে? হাসিনার চোখ ছল ছল করে। ও আর কথা বলে না। বাবার ওপর অভিমানে, দুঃখে মুখ ফিরিয়ে রাখে। নুরু মুন্সি জলে নামে। হাসিনার দুঃখ ওকে স্পর্শ করে না। ওর বুক জুড়ে আছিয়ার মুখ লেপটে থাকে। ও এখন আর কারো কথা ভাবতে চায় না। আছিয়ার মুখের দিকে তাকালে নুরু মুন্সির বুকের মধ্যে চৈত্র মাসের ঘূর্ণির মতো হাহাকার ওঠে।

ভাত খেতে বসলে আছিয়ার মা বাঁশের কথা তোলে।

ওরা কাল বাঁশ কাটবে।

হুঁ।

নুরু মুন্সি মুখ তোলে না। মাথা নিচু করে খায়।

ঐ ভোম্বলকে যদি এই বাড়িতে আর ঢুকতে দেই। আছিয়াব মা-র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ।

মানুষের সর্বনাশ করাই ওর ব্যবসা।

একটা আগুনের ফুলকি ধাঁই করে মুন্সির কানে প্রবেশ করে। ওর রাগ হয়। ও ভাতের থালা ঠেলে রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর একটা লাথি দিয়ে উল্টে দেয় ভাতের গামলা, তরকারির বাটি, জলের গ্লাস। ছেলেমেয়েরা বাবার আচরণে বিমূঢ় হয়ে যায়। নুরু মুন্সি ঘোষণা দেয় যে ভোম্বল সম্পর্কে এ বাড়িতে একটা শব্দ উচ্চারিত হলে ও ঘরদোরে আগুন দিয়ে সংসার ত্যাগ করবে।

খাওয়া হয় না কারো। আছিয়ার মা গুনগুন করে কাঁদে। আছিয়া নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে। দুঃখ না, রাগ না, এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ওর ইচ্ছে করে বাঁশবন পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, খাল পেরিয়ে চলে যায় কোথাও। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই জীবন বোঝার মতো হয়ে যাচ্ছে। এই আংটিটা হাতের ওপর যেন দশ মন ওজনের। ও কী করবে? কোথাও গেলে স্বস্তি হবে? বাবা ফিরে পাবে শান্তি এবং মা-ও? আছিয়া হাঁটতে হাঁটতে জলপাই গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়। বিশাল গাছ, গালপালা ছড়িয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। ছাগলের বাচ্চাগুলো ওর পিছু পিছু আসে। আছিয়ার ইচ্ছে হয় কিছুক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে। কিন্তু এই দুপুরে এই নির্জন গাছতলায় এটা শোভন নয়। আসলে ওর বুক উজাড় করে কাঁদার কোনো জায়গা নেই। ও শুকনো পাতা হাতের মুঠোয় কুচি কুচি

করে বাতাসে উড়িয়ে দেয়। ওর হাতের তালুতে শুকনো পাতা অনবরত গুড়ো হতে থাকে। আছিয়ার মনে হয় এই পেষণে ওর ভেতরে এক নষ্ট আনন্দ জন্মাচ্ছে। ও বিষণ্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারছে। ও যদি পারতো এখন ঐ মুহূর্তে ভিন্নরকম কিছু করতো, যেটা কেউ করেনি, যেটা কেউ করে না। যেটা করলে মানুষ বিস্ময়ে থ হয়ে থাকে। এক তীব্র অবদমিত আকাঙ্ক্ষায় ও ছটফটিয়ে উঠে।

হাসিনা এসে পেছনে দাঁড়ায়।

বুজি?

কিরে?

ভাত খাবি না?

না।

আমারও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। বাবা যে কী?

ভোম্বল কাকাকে নিয়ে কথা বললে বাবা কষ্ট পায়।

আছিয়ার গম্ভীর কণ্ঠে চুপ করে যায় হাসিনা। কী বলবে ভেবে পায় না। দুজনেই তাকিয়ে দেখে হাতে একজোড়া হাঁস নিয়ে আবদেল আসছে। ওদের গাঁয়ের মানুষ। বছর খানেক আগে বউ মারা গেছে। ওর বড়ো মেয়ে হাসিনার কিছু বড়ো।

আবদেল ওদের দেখে জলপাই গাছের নীচে দাঁড়ায়।

এই দুপুরে তোমরা কী করছো এখানে?

ওরা উত্তর দেয় না। হাসিনা অন্য প্রসঙ্গে যায়।

হাঁসগুলো কী সুন্দর। চীনা হাঁস বুঝি?

হ্যাঁ। বাজারে পেলাম। কিনে ফেললাম।

আছিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আবদেল।

তোমার কী হয়েছে? মুখটা অমন থমথমে যে?

আছিয়া বলতে পারে না যে ওকে নিয়েই ঘরে আগুন। জ্বলে যাচ্চে বাবা মা-র সৌহার্দ্য।

কি গো তোমার মন খারাপ?

লোকটার ঠাণ্ডা মিষ্টি গলায় আছিয়ার চোখে জল আসে। ও মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

যাও ঘরে যাও। দুপুর বেলা বাইরে থাকতে নেই।

আবদেল চলে যায়, এক সময়ে হাসিনাও। আছিয়া বসেই থাকে. ও ঘরে ফেরে না, ভাতও খায় না। চকচকে রূপোর আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ইচ্ছে হয় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু ভয় হয়। এক অজানা ভয় ওকে জাপটে ধরে রাখে। ও বুঝতে পারে না কেনো এমন হচ্ছে। বুক ধড়ফড় করে, গলার কাছে ভীষণ জ্বালা। ভোম্বল যাওয়ার পর এই প্রথম আছিয়ার অস্বস্তি হতে থাকে। আংটিটা আনন্দের বদলে কষ্ট। নিজের ওপর এক বিশাল ক্রোধ ওকে ছিন্নভিন্ন করে। আছিয়া হাতের তালুতে চোখের জল মোছে। পরদিন আবদেলের সঙ্গে আবার দেখা হয়। আছিয়া তুলাউড়ি ঝোপের পাশে ছাগল নিয়ে ব্যস্ত। আবদেল ওকে দেখে দাঁড়ায়, অকারণে হাসে। আছিয়ার মনে হয় মানুষটিকে ওর ভালো লাগে। মানুষটির চোখে মায়া আছে, যখন তাকায় যেন বুকের তল পর্যন্ত শ্যামল হয়ে যায়। মাইল মাইল পথ সবুজ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। যেন পথের দুপাশে লক্ষকোটি লজ্জাবতী ফুল ফুটে আছে। আবদেলকে অমন তাকিয়ে থাকতে দেখে ওর লজ্জা হয়।

তুমি এখানে ছাগল বাঁধতে আসো কেন আছিয়া?

কি হয়?

এখন বড়ো হয়েছো।

আমি না বাঁধলে ওরা ঘাস খায় না যে? ও ফিক করে হেসে ফেলে।

আসলে তোমার খুব ভালো লাগে না?

আছিয়া ঘাড় কাত করে, আবদেল দাঁড়িয়েও থাকে। আছিয়া কী করবে বুঝতে পারে না। ওর বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যায়। আবদেল অমন এক দৃষ্টিতে দেখে কেনো ওকে? লোকটার বয়স ওর চাইতে

অনেক বেশি। ওর বয়সের দ্বিগুণ। বয়সের কথা মনে হচ্ছে কেন আমার? আমি কি অন্য কিছু ভাবছি? হ্যাঁ আমার ভালো লাগে তাকে। তাই বলে অন্য কিছু ভাবার মতো ভালো লাগে নয়।

আপনি এখন কোথায় যাবেন?

বাজারে। যাই।

আবদেল চলে গেল ও তুলাউড়িয়ে ঝোপের পাশে বসে মুখ মোছে। ঘামে মাথা মুখ ভিজে জবজবে। আছিয়ার মনে হয় এখন নিজেকে আবিষ্কারের সময়। বাতাসে তুলাউড়িয়ে পাপড়ি ওড়ে। ওর মনে হয় ওর চাইতে দ্বিগুণ বয়সী একটা লোক ওর দিকে চেয়ে থাকলে এবং সে দৃষ্টির নিবেদন হৃদয়ের গোপনতম স্থানের কাছে হলে একটি মেয়ের জীবনে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এই হয়ে যাওয়াটা কাটিয়ে ওঠা কঠিন। আছিয়া নিজের মধ্যে নিমগ্ন থাকে। সে জোর করে না, মুখে কিছু বলে না, শুধু চোখের ভাষায় অনেক কিছু বলে যায়, সে ভাষাটা যদি তুলাউড়িয়ে পাপড়ির মতো উড়তে থাকে, উড়তে উড়তে ছড়িয়ে পড়ে হৃদয় জনপদে, ভরিয়ে রাখে সারাক্ষণ, তবে সে মানুষটি কতোক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারে? আছিয়ার দিনরাত অন্যরকম হয়ে যায়। ওর মনে হয় আবদেল এখন কেবল এ পথে কাজে যায় না, শুধু মিনতিভরা ব্যাকুলতা ফেলে যায় পেছনে। ও কেটে নেওয়া বাঁশের মুথার ওপর পা রেখে হাতের আংটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ঘরে মা ওর সঙ্গে প্রায় খিটিমিটি করে। বাঁশঝাড় কাটার পর থেকে মেজাজ আরো খারাপ। ঘরে থাকতে আছিয়ার ভালো লাগে না। ওর বাবাও বেশির ভাগ সময়ে বাইরে বাইরে কাটিয়ে আসে। ঘরে ফিরলে চুপচাপ থাকে। সেই দিলখোলা হাসি আর নেই। এই নিস্তব্ধ পরিবেশ আছিয়ার বুকের ওপর এখন বিশাল পাথর।

লোকটা বোধহয় তোকে বিয়ে করতে চায় বুজি?

আছিয়া কথা বলে না। ওর বুকের কাঁপুনি থামে না। গতকালও আবদেল বাঁশবনে এসেছিলো। বলেছিলো, তোমার মতো মেয়ে হয় না আছিয়া। ওর মতো মেয়ে হয না কোনো। ভেবে পায় না আছিয়া যে ও কি এমন অসাধারণ? ছাগল চরিয়ে আর মা-র সঙ্গে কাজ করে যার দিন কাটে তার আবার ভালোমন্দ কী?

হাসিনা আবার খুক খুক করে হাসে।

তুই কিছু বলছিস না যে। মাগো! আম্মাদের বড়ো মামার বয়সী একটা লোক।

হাসিনা হেসে গড়িয়ে পড়ে। আছিয়ার ভাবান্তর হয় না। বয়স দিয়ে কী হয়? বয়সের হেরফেরে কী আসে যায়? মানুষের হৃদয়ই সব। এই এক জায়গা সমান্তরাল হয়ে গেলেই তো বন্ধন নিবিড় হয়ে ওঠে, আর অন্য কিছু চাই না, অন্য কিছু না। আছিয়া নিজের ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করে, এই প্রবেশ স্থির বিশ্বাসের। কতোটা ভালোবাসার ও নিজেও জানে না। শুধু মনে হয় আবদেলের সঙ্গে বিয়ে হলে ওর জীবন স্বাচ্ছন্দেই কেটে যাবে। তাছাড়া বিয়ে নিয়ে এতো ভাবাভাবির কী আছে? বরং চোখের সামনে থেকে সরে গেলে বাবা মা-র মন কষাকষির থেকে যাবে। মাথাব ওপর প্রচণ্ড অভিমান ওকে 'অবুঝ করে তোলে।

বুজি কথা বলছিস না যে? ঘুমিয়ে গেলি?

না। ঘুমো হাসিনা।

দুজনের চোখের সামনে জমাট অন্ধকার। ছোটো খুপরিব মতো ঘর। বাতাস আসে না। গরম লাগছে আছিয়ার। উঠে বাইরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয় না। হয়তো বাবা জেগে আছে বকা দিতে পারে। মা যদি জেগে থাকে তাহলে একটা কটু কথা বলবে, সারাক্ষণ মন খারাপ থাকবে ওর।

বুজি?

কী? ঐ লোকটাকে কি তুই বিয়ে করবি?

হ্যাঁ।

বুজি?

আহ্ চুপ কর হাসিনা।

তুই প্রেমে পড়েছিস?

প্রেম কিনা জানি না। ভালোই তো লাগে।

বয়স? বয়স দিয়ে কী হবে? লোকটা খুব ভালো মানুষ। এমন লোক নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট ঘর করা যায়।

মাগো অ্যাতো।

হাসিনার হাসি থামে না। বালিশে মুখ গুঁজে হাসতেই থাকে। আছিয়া ওকে বাধা দেয় না। পাশ ফিরে শোয়। জোর করে চোখ বোঁজে। কেবলই আবদেলের মুখ ভেসে ওঠে। তোমাকে আমার ভালো লাগে আছিয়া? কেন ভালো লাগে? আছিয়া ভেবে পায় না। ওর নিজের মনও তো ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতাই কি প্রেম? হবে হয়তো। যদি তাই হয় তাহলে ও প্রেমে পড়েছে। অন্ধকারেও বালি মুঠি করে ধরে। শরীরে আশ্চর্য অনুভূতি। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় স্নায়ু। আছিয়া কিছুতেই দুচোখের পাতা এক করতে পারে না।

আবদেলের কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়ে নুরু মুন্সির মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এ ধরনের একটা প্রস্তাব ভাবতেই পারে না। যে লোক প্রস্তাব নিয়ে এসেছে তাকে দুচারটে কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। লোকটি মিটি হাসে, আপনার মেয়ে তো রাজি? হাঁ করে থাকে মুন্সি। আছিয়া রাজি? কখন এতো কিছু হলো? লোকটি আবার আসবে বলে চলে গেলে নুরু মুন্সি একদম মিইয়ে যায়। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে আছিয়া রাজি?

ও বাঁশবাগানে আসে। কেটে নেওয়া ঝাড়ের গোড়ায় কঞ্চি গজাতে শুরু করেছে। তাজা সতেজ কঞ্চির মাথা বাতাসে কাঁপে। দেখতে ভালোই লাগে। নুরু মুন্সি দাঁড়িয়ে থাকে। ও চেয়ে ছিলো আছিয়ার জীবন এমন হবে, এমন স্নিগ্ধ, মায়াময় দিন বয়ে যাবে ওর সংসারে। পরক্ষণে ক্রোধ ওকে গ্রাস করে। এক তেতো অনুভূতি নিয়ে এগোতেই দেখে সোনালি বাঁশ ঝাড়ের নীচে আছিয়া বসে আছে। নুরু মুন্সি চমকে ওঠে। মেয়েটিকে যেন ও বহুকাল দেখেনি। আছিয়া এমন ছিলো না। ওর মুখের রেখায় ভিন্ন আছিয়ার আদল। ও কিছুটা আত্মমগ্ন, স্থির। ছাগলের বাচ্চাগুলো এখন আর ওর কোলে ওঠে না। ওগুলো বড়ো হয়ে গেছে। ওর তেঁতুলের পোটলা নেই। ও এক বয়স্ক নারী, চেতনায় সোনালি বাঁশঝাড়ের সন্ধ্যাকালীন ছায়া। যে ছায়ায় জীবনের পূর্ণতা প্রবল। মুন্সির প্রচণ্ড কষ্ট হয়। বুক জুড়ে ভোম্বলের মুখটা বিশাল হয়ে ওঠে। আছিয়া বাবাকে দেখে চমকে ওঠে।

বাবা।

তুই এখানে কী করছিস?

এই ছাগল—

আছিয়া মুখ নামায়। বাবাকে দেখে ও কখনো চমকায়নি। চোখ নামায়নি। স্বচ্ছন্দ, অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো এতোকাল। ওর মুখ জুড়ো বিষণ্ণতা, চোখের পাতা কাঁপে। নুরু মুন্সির ক্রোধ উবে যায়। খুব অসহায় মনে হয় নিজেকে। প্রায় বিড় বিড় করে বলে, আছিয়া আবদেল তোর জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছে। আছিয়া হাঁটু জড়ো করে তার ওপর থুতনি রেখে জড়সড় হয়ে বসে। আঁচলটা পিঠের ওপর টেনে দেয়। ওরা বাবা সামনে দাঁড়িয়ে। আছিয়া।

বাবা।

তুই কি রাজি?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ?

নুরু মুন্সি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। বৈশাখী ঝড়ে বাঁশবনের মাথা যেমন আন্দোলিত হয় সে আন্দোলন বুকের ভেতর। নুরু মুন্সি শব্দ করে কেঁদে ফেলে। তারপর হনহন করে হেঁটে যায়। আছিয়া বিস্মিত হয়। বলতে চায়, বাবা তোমার দুঃখ কেন?

বলা হয় না। নুরু মুন্সি অনেকটা চলে গেছে। আছিয়া সে যাওয়া দেখে। বাবার চেক লুঙ্গি হাঁটুর ওপর ওঠানো, গায়ে রঙ ওঠা শার্ট। ঘাড়ের চারপাশে জড়ানো গামছা। বাবা কেন আজ এতো অস্থির। আছিয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। ভাবেনি ওর বাবা এ বিয়েটাকে এতো বিরূপভাবে নেবে। নুরু মুন্সি ঘরে ফেরে

না। হাঁটতে হাঁটতে গঞ্জের দিকে যায়। মেঠো পথ পেরুলে কাঁচা রাস্তা ধরে ভোম্বল আসে। নুরু মুন্সি রাস্তায় উঠে বাবলা গাছের নীচে দাঁড়ায়। যতোদূর চোখ যায় ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অবাধ্য চোখে ছাপিয়ে জল আসে বারবার। ও বড়ো একা, ওর এখন ভোম্বলকে বড়ো প্রয়োজন। ভোম্বল যদি বলে দিতো এই বিয়েই আছিয়ার জন্য শুভ, তাহলে বুঝি ওর বুকের ভার নেমে যেতো। নুরু মুন্সি বুঝতে পারে না গোমেদ পাথরের আংটিতে আছিয়ার শনি কি সত্যি কেটেছে?

একরকম আছিয়ার ইচ্ছেতেই আবদেলের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যায়। অবশ্য এই ব্যাপারে আছিয়ার মার যুক্তি একটা, আবদেলের ঘরে প্রাচুর্য আছে, মেয়ে সুখে থাকবে। সুখ? নুরু মুন্সির কষ্ট হয়। ও বুঝতে পারে না এই শব্দটা নিয়ে মানুষের এতো আকাঙক্ষা কেন? নিজেও তো আছিয়ার বৈধব্য ঠেকাতে চাচ্ছে শুধুমাত্র সুখের আশায়। মুন্সির মনের ভার কাটে না। বিমর্ষ হয়েই থাকে। দুদিন পর মেয়ে বাপের বাড়ি এলে ওর মুখেব দিকে তাকিয়ে মুন্সির মনে হয় মেয়ে সুখে নেই। ভোম্বলকে কাছে পাওয়ার তীব্র এক ব্যাকুলতায় ও রাস্তার ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। ভোম্বল সেই যে কবে উধাও হয়ে গেলো তার আর দেখা নেই। যতো দিন যায় আছিয়া উপলব্ধি করে ব্যাকুলতাই প্রেম নয। প্রেমের জন্য আরো বাড়তি কিছু চাই। এই বোধ ওকে তাড়িত করলে ও নিজের সঙ্গে যুঝে উঠতে পাবে না। আবদেল ওকে যত্ন করে। হাট থেকে ভালো মাছ তরকারি কিনে আনে। তেল, সাবান, ডুরে শাড়ি এনে দেয়। আছিয়ার ভালো লাগে না। ও আবদেলের কাছে আরো আবেগ চায়। যে আবেগ ওর নতুন যৌবনের জন্যে প্রয়োজন। কিন্তু আবদেল এসব বোঝে না। বোঝে পাঙ্গাস মাছ আর সুবাসিত তেলই বুঝি আছিয়ার জন্য জরুরি। ও একা একা সময় কাটায়। আবদেলের ছেলেমেয়েরা ওকে করুণা কবে। ওকে মায়ের আসনে বসিয়ে ওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো মানসিকতা ওদের নেই। যেন এই সংসারে আছিয়া বাড়তি মানুষ। ওর সামনে বিবাহিত জীবনের চমকটা মুহূর্তেই ফিকে হয়ে যায়। ও চুপি চুপি কাঁদে।

একদিন মাঝরাতে কেঁদে ফেললে বিস্মিত হয়।

কাঁদো কেন আছিয়া? তোমার কষ্ট কী?

কষ্ট কী?

এই কষ্ট কাউকে বোঝানো যায় না। আছিয়া কাঁদতে কাঁদতেই আবার ঘুমিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড এক শূন্যতা কুবে খায় ওকে। ওর ইচ্ছে করে এই সংসার থেকে পালিয়ে যেতে। ছোটোবেলায় একবাব ছাগলের বাচ্চা খুঁজতে গিয়ে শেয়ালের মুখোমুখি হয়েছিলো ও। শেয়ালদুটো বাচ্চা খেয়ে তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়েছিলো। এখনো মনে পড়লে ভয়ে গা শিউরে ওঠে ওর।

ঢেঁকিঘরের বারান্দায় বসে নির্নিমেষ আকাশ দেখে আছিয়া। বারবার মনে হয় ও এক অদৃশ্য জোড়া শেয়ালের জ্বলজ্বলে দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে। ওর সমস্ত স্বস্তি এবং আনন্দ ঐ শেয়ালেব পেটে।

আবদেলের বড়ো মেয়ে রেহানা এসে কাছে দাঁড়ায়। প্রায় কাছাকাছি বয়সের বলে ও কিছুটা বন্ধুর মতো। সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করে, তুমি সব সময়ে মনমরা থাকো কেন? আছিযা উত্তর দেয না। রেহানা মৃদু হাসে।

আমি সব বুঝি। তুমি মরতে এই সংসারে এসেছো। আমি হলে এমন বিয়ে করতাম না।

রেহানা দ্রুত চলে যায়। ও না গেলেও আছিয়া ওকে কিছুই বলতো না। রেহানা প্রায়ই এমন খোঁচা দেয়। ও গায়ে মাখে না। আছিয়ার মনে হয় ও বড়ো বেশি নির্বোধ। নিজেব কোনো কিছুই গুছিয়ে ভেবে নিতে পারে না। রেহানা এই বয়সে যা বোঝে, তা ও বোঝে অনেক দেরিতে। যখন বোঝে তখন আর পিছু ফেরার সময় থাকে না।

বছর গড়াতেই আছিয়া বোঝে ওর দিনগুলো সব শেয়ালের গর্তে চলে গেছে। আবদেলের সাহচর্যে ওর জন্য কোনো উত্তাপ নেই। যে আবেগ নিয়ে মানুষটি ওর সঙ্গে বাঁশবনে কথা বলতো, যে ব্যাকুলতা নিয়ে মানুষটি জলপাই গাছের নীচে এসে দাঁড়াতো, যে তীব্রতায় ওর হাত ছোঁয়ার জন্যে অস্থিব হয়ে উঠতো, সেই ব্যাকুলতা এখন শুধু আছিয়াব বুকে। আবদেল এর থেকে অনেক দূরে। সকালে বেরিয়ে

গেলে সারাদিন খোঁজ থাকে না। যখন ফিরে তখন থাকে ক্লান্ত। আছিয়ার সেবা করতে হয়, যত্ন নিতে হয়। এতে মন ভরে না, পিপাসা মেটে না। এক অস্থির তাড়না আছিয়াকে মরমে মারে। চুলোয় ভাত বসিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলে ওর বুক ভেঙে কান্না আসে।

বিয়ের বছর দেড়েকের মাথায় গভীর রাতে কলেরায় মরে যায় আবদেল। লোকটা বার বার আছিয়ার হাত আঁকড়ে ধরছিলো, দিশেহারা, বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো ও। কিন্তু আছিয়ার সঙ্গে কোনো শেষ কথা হয়নি। আবদেলের ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছিলো। স্থানুর মতো বসেছিলো আছিয়া। মনে হচ্ছিলো ওর সামনে আবদেলের কোনো অবয়ব নেই, কেবল গোমেদ পাথর জ্বলছে, সেই জ্যোতি ভরিয়ে দিচ্ছে সব শূন্যতা।

মাস দেড়েক পরে সোনালি বাঁশ ঝাড়ের নীচে নুরু মুন্সির মুখোমুখি হয় আছিয়া। আংটিটা ওর অনামিকায় নেই, হাতের তালুতে। আছিয়ার মাথায় ঘোমটা নেই, পিঠের ওপর চুল ছাড়ানো। বাবাকে দেখে বিব্রত হয়ে যায়। এতোদিন বাবার সঙ্গে একবারও কথা হয়নি। সব সময়ে আড়ালে থেকেছে। নুরু মুন্সি নিজেও মেয়েকে কখনো কাছে ডাকেনি।

মা?

বাবা?

নুরু মুন্সির গলায় কথা আটকে যায়। কী বলবে, কী বলার আছে? আছিয়ার মুখতো বার বার ভোম্বলের মুখ হয়ে যায়। মেয়েকে বুঝতে পারে না নুরু মুন্সি। ওকে অন্য রকম লাগছে, একদম এক অচেনা নারী।

এখানে কী করছিস? ঘরে চল।

আছিয়া মুখ নিচু করে আংটিটা নাড়াচাড়া করে।

বাবা?

বল মা?

নুরু মুন্সি উন্মুখ হয়ে মুখের দিকে তাকায়। যেন ওর সব দুঃখ নিজের বুকে তুলে নিতে চায়।

তখুনি ওর সামনে দিয়ে আছিয়ার হাতের তালু থেকে আংটিটা দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ে। নুরু মুন্সি কেঁপে ওঠে।

ফেলে দিলি?

তুই কি এমন চেয়েছিলি?

আছিয়া নুরু মুন্সির চোখে চোখ রাখে।

হ্যাঁ বাবা।

নুরু মুন্সি চোখ নামিয়ে নেয়। সোনালি বাঁশঝাড়ের মাথায় দুপুরের রোদ জেঁকে আছে। আছিয়া চলে যাচ্ছে। নুরু মুন্সির অস্থির আবেগ শরীর জুড়ে দৌড়চ্ছে। বিশ্বাস করতে কষ্ট যে এই বৈধব্যের জন্য আছিয়ার কোনো দুঃখ নেই।

ও হাঁটতে হাঁটতে বড়ো রাস্তায় আসে। অকস্মাৎ নিজেকে ভীষণ নির্ভার মনে হয়। এই প্রথম ভোম্বলের অস্তিত্ব ওর কাছে কেমন ফিকে হয়ে যায়।

হুমায়ূন আহমেদ

দ্বিতীয় জন

প্রিয়াংকার খুব খারাপ ধরনের একটা অসুখ হয়েছে।

অসুখটা এমন যে কাউকে বলা যাচ্ছে না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, কিংবা বিশ্বাস করার ভাণ করে আড়ালে হাসাহাসি করবে। একজনকে অবিশ্যি বলা যায়—জাভেদকে। জাভেদ তার স্বামী। স্বামীর কাছে কিছুই গোপন থাকা উচিত নয়। অসুখ-বিসুখের খবর সবাব আগে স্বামীকেই বলা দরকার।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে জাভেদের সঙ্গে প্রিয়াংকার পরিচয় এখনো তেমন গাঢ় হযনি। হবার কথাও নয়। তাদের বিয়ে হয়েছে একুশ দিন আগে। এখনো প্রিয়াংকার 'তুমি' বলা রপ্ত হয়নি। মুখ ফসকে 'আপনি' বলে ফেলে। এরকম গম্ভীর, বয়স্ক একজন মানুষকে 'তুমি' বলাও অবশ্যি খুব সহজ নয়। মুখে কেমন বাধো বাধো ঠেকে। প্রিয়াংকা চেষ্টা করে 'আপনি' 'তুমি' কোনটাই না বলে চালাতে; যেমন—'তুমি চা খাবে? না বলে সে বলে—চা দেব?' এইভাবে দীর্ঘ আলাপ চালান যায় না, তার চেয়েও বড় কথা—মানুষটা খুব বুদ্ধিমান ভাববাচ্যে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই সে হাসিমুখে বলে, তুমি বলতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

তুমি বলতে কষ্ট হওয়াটা দোষের কিছু না। প্রিয়াংকার বয়স মাত্র সতেরো। তাও পুরোপুরি সতেরো হয়নি। জুন মাসে হবে। এখনো দু'মাস বাকি। আর ঐ মানুষটার বয়স খুব কম ধরলেও ত্রিশ। তার বয়সের প্রায় দ্বিগুণ। সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে বলে বয়স আরো বেশি দেখায়। বরের বযস বেশি বলে প্রিয়াংকার মনে ক্ষোভ নেই। বরদের চেংড়া দেখানে ভাল লাগে না। তাছাড়া মানুযটা অত্যন্ত ভাল। ভাল এবং বুদ্ধিমান, কম বয়েসী বোকা বরের চেয়ে বুদ্ধিমান বযস্ক বর ভাল।

বিয়ের রাতে নানা কিছু ভেবে প্রিয়াংকা আতংকে অস্থিব হয়েছিল। ধ্বকধ্বক করে বুক কাঁপছিল। কপাল রীতিমত ঘামছিল। মানুষটা সঙ্গে সঙ্গে তা বুঝে ফেলেছিল। কাছে এসে ভাবী গলায় বলল, ভয় করছে? ভয়ের কি আছে বল তো?

প্রিয়াংকার বুকের ধ্বকধ্বকানি আরো বেড়ে গেল। সে 'হাঁ' 'না' কিছুই বলল না। একবার মনে হল সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মানুষটা তখন নরম গলায় বলল, ভয়ের কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়। বলেই প্রিয়াংকার গায়ে চাদব টেনে দিল। তাঁর গলার স্ববে কিছু একটা ছিল। প্রিয়াংকার ভয় পুরোপুরি কেটে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। অনেক রাতে একবাব ঘুম ভেঙে দেখে লোকটি অন্যপাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। খানিকক্ষণ জেগে থেকে প্রিয়াংকা আবার ঘুমিযে পড়ল। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। লোকটি তখন পাশে নেই।

একটা মানুষকে চেনার জন্যে একুশ দিন খুব দীর্ঘ সময় নয। তবু প্রিয়াংকার ধারণা মানুষটা ভাল, বেশ ভাল। এরকম একজন মানুষকে তার অসুখের কথাটা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অসুখটার সঙ্গে এই মানুষটার সম্পর্ক আছে। এই কারণেই তাঁকে বলা যাবে না। কিন্তু কাউকে বলা দরকার। খুব তাড়াতাড়ি বলা দরকার। নয়ত সে পাগল হয়ে যাবে। কিছুটা পাগল সে বোধ হয় হয়েই গেছে। সারাক্ষণ অস্থির লাগে। সন্ধ্যা মেলাবার পর শরীর কাঁপতে থাকে। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। গ্লাসের পর গ্লাস পানি খেলেও তৃষ্ণা মেটে না। সামান্য শব্দে ভয়ংকর চমকে উঠে। সেদিন বাতাসে জানালার কপাট নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে অস্থির হযে গোঙানির মত শব্দ করল প্রিয়াংকা। হাতের চায়ের কাপ থেকে সবটা চা ছলকে পড়ল শাড়িতে। ভাগ্যিস আশেপাশে কেউ ছিল না। কেউ থাকলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হত। প্রিয়াংকার ছোট মামা যেমন অবাক হলেন।

তিনি প্রিয়াংকাকে দেখতে এসেছিলেন। তার দিকে তাকিয়েই বিস্মিত গলায় বললেন, তোর কি হয়েছে রে? প্রিয়াংকা হালকা গলায় বলল, কিছু হয়নি তো। তুমি কেমন আছ মামা?

'আমার কথা বাদ দে। তোকে এমন লাগছে কেন?'

'কেমন লাগছে?'

'চোখের নিচে কালি পড়েছে। মুখ শুকনো। কি ব্যাপার?'

'কোন ব্যাপার না মামা।'

'গালটাল ভেঙে কি অবস্থা। তুই কথাও তো কেমন অন্য রকমভাবে বলছিস।'

'কি রকম ভাবে বলছি?'

'মনে হচ্ছে তোর গলাটা ভাঙা।'

'ঠাণ্ডা লেগেছে মামা।'

প্রিয়াংকা কয়েকবার কাশল। মামাকে বুঝাতে চাইল যে তার সত্যি সত্যি কাশি হয়েছে, অন্য কিছু না। মামা আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। শীতল গলায় বললেন,

'আর কিছু না তো?'

'না।'

'ঠিক করে বল।'

'ঠিক করেই বলছি।'

প্রিয়াংকার কথায় তার মামা খুব আশ্বস্ত হলেন বলে মনে হল না। সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলে। চায়ের কাপে দুটা চুমুক দিয়েই রেখে দিলেন। 'যাইরে মা।' বলেই কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলে গেলেন। মামা চলে যাবার এক ঘণ্টার ভেতরই মামী এসে হাজির। বোঝাই যাচ্ছে মামা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মামী প্রিয়াংকাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রায় চেঁচিয়েই বললেন, এক সপ্তাহ আগে তোকে কি দেখেছি আর এখন কি দেখছি? কি ব্যাপার তুই খোলাখুলি বল তো? কি সমস্যা?

প্রিয়াংকা শুকনো হাসি হেসে বলল, কোন সমস্যা না। মামী কঠিন গলায় বললেন,

তুই বলতে না চাইলে আমি কিন্তু জামাইকে জিজ্ঞেস করব। জামাই আসবে কখন?

'ও আসবে রাত আটটার দিকে। ওকি কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না মামী। আমি বলছি।'

'বল। কিছু লুকুবি না।'

প্রিয়াংকা প্রায় ফিসফিস করে বলল, আমি ভয় পাই, মামী।

'কিসের ভয়?'

'কি যেন দেখি।'

'কি দেখিস?'

'নিজেও ঠিক জানি না কি দেখি।'

'ভাসা ভাসা কথা বলবি না। পরিষ্কার করে বল কি দেখিস।'

প্রিয়াংকা এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, মামী আমি বোধহয় পাগল হয়ে গেছি। আমি কি সব যেন দেখি।

সে কি দেখে তা তিনি অনেক প্রশ্ন করেও বের করতে পারলেন না। প্রিয়াংকা অন্য সব প্রশ্নের জবাব দেয় কিন্তু কি দেখে তা বলে না। এড়িয়ে যায় বা কাঁদতে শুরু করে।

'তোর কি বর পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কি তোকে ভয়-টয় দেখায়?'

'কি যে তুমি বল মামী, আমাকে ভয় দেখাবে কেন?'

'রাতে কি তোরা এক সঙ্গে ঘুমাস?'

প্রিয়াংকা লজ্জায় বেগুনী হয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ।

'সে কি তোকে অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়ে রাখে?'

'কি সব প্রশ্ন তুমি কর মামী?'

'আমি যা বলছি তার জবাব দে।'

'না, জাগিয়ে রাখে না।'

মামী অনেকক্ষণ থাকলেন। প্রিয়াংকাদের ফ্ল্যাট ঘুরে ঘুরে দেখলেন। কাজের মেয়ে এবং কাজের ছেলেটির সঙ্গে কথা বললেন। কাজের মেয়েটির নাম মরিয়ম। দেশ খুলনা। ঘরের যাবতীয় কাজ সে-ই করে। কাজের ছেলেটির নাম জীতু মিয়া। তার বয়স নয়-দশ। এদের দু'জনের কাছ থেকে খবর বার করার চেষ্টা করা হল।

'আচ্ছা মরিয়ম তুমি কি ভয়-টয় পাও?'

'না। ভয় পামু ক্যা?'

'রাতে কিছু দেখ-টেখ না?'

'কি দেখমু?'

'আচ্ছা ঠিক আছে—যাও।'

প্রিয়াংকার মামী কোন রহস্য ভেদ করতে পারলেন না। তার খুব ইচ্ছা ছিল জাভেদের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করবেন, পরামর্শ করবেন। প্রিয়াংকাব জন্যে পারা গেল না। সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মামী তুমি যদি তাকে কিছু বল তাহলে আমি কিন্তু বিষ খাব। আল্লাহ্‌র কসম বিষ খাব। নয়ত ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

তিনি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ, প্রিয়াংকা সত্যি বিষ-টিষ খেয়ে ফেলতে পাবে। "আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়"—এই কথা লিখে একবার সে এক বোতল ডেটল খেয়ে ফেলেছিল। অনেক ডাক্তার-হাসপাতাল করতে হয়েছে। এই কাণ্ড সে করেছিল অতি তুচ্ছ কারণে। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে ঝগড়া করে। এই মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব। তাকে কিছুতেই ঘাটান উচিত নয়।

জাভেদ এল রাত সাড়ে আটটার দিকে। জাভেদের সঙ্গে খানিকক্ষণ টুকটাক গল্প কবে প্রিযাংকাব মামী ফিরে গেলেন। তাঁর মনের মেঘ কাটল না। হল কি প্রিয়াংকাব? সে কি দেখে?

প্রিয়াংকা নিজেও জানে না তার কি হয়েছে। মামী চলে যাবার পর তাব বুক ধ্বক-ধ্বক কবা শুরু হয়েছে। অল্প অল্প ঘাম হচ্ছে। অসম্ভব গরম লাগছে। কিছুক্ষণ পর পর মনে হচ্ছে বোধহয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তারা খাওয়া-দাওয়া করে রাত সাড়ে দশটার দিকে ঘুমুতে গেল। জাভেদ বিছানায় শোযামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। আজো তাই হল। জাভেদ ঘুমুচ্ছে। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। জেগে আছে প্রিয়াংকা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পানির পিপাসা পেল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা। পানি খাবার জন্যে বিছানা ছেড়ে নামতে হবে। যেতে হবে পাশের ঘরে কিন্তু তা সে করবে না। অসম্ভব। কিছুতেই না। পানির তৃষ্ণায় মরে গেলেও না। এই পানি খেতে গিয়েই প্রথমবার তার অসুখ ধরা পড়েছিল। ভয়ে ঐদিনই সে মরে যেত। কেন মরল না? মরে গেলেই ভাল হত। তার মত ভীত মেয়ের মবে যাওয়াই উচিত।

ঐ রাতে সে বেশ আরাম করে ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ বৃষ্টি হবার জন্যে চারদিকে বেশ ঠাণ্ডা। জানালা দিয়ে ফুরফুরে বাতাস আসছে। ঘুমুবার জন্যে চমৎকার রাত। এক ঘুমে সে কখনো রাত পার কবতে পারে না। মাঝখানে একবার তাকে উঠে পানি খেতে হয় কিংবা বাথরুমে যেতে হয়। সেই রাতেও পানি খাবার জন্যে উঠল। জাভেদ কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। গায়ে পাতলা চাদর দিয়ে রেখেছে। অদ্ভুত অভ্যাস মানুষটার। যত গরমই পড়ুক গায়ে চাদর দিয়ে রাখবে। প্রিয়াংকা খুব সাবধানে গায়ের চাদর সরিয়ে দিল। আহা আরাম করে ঘুমুক। কেমন ঘেমে গেছে।

স্বামীকে ডিঙিয়ে বিছানা থেকে নামল। স্বামী ডিঙিয়ে ওঠানামা করা ঠিক হচ্ছে না-হয়ত পাপ হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি। প্রিয়াংকা ঘুমায় দেয়ালের দিকে। খাট থেকে নামতে হলে স্বামীকে ডিঙাতেই হবে।

তাদের শোবার ঘর অন্ধকার, তবে পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। এই একটা বাতি সাবারাতই জ্বলে। ঘরটা জাভেদের লাইব্রেরী ঘর। এই ঘরেই জাভেদ পরীক্ষার খাতা দেখে, পড়াশোনা করে। ঘরে আসবাবপত্র তেমন কিছু নেই। একটা বুক শেলফে কিছু বই, পুরানো ম্যাগাজিন। একটা ঘর টেবিলের উপর রাজ্যের পরীক্ষার খাতা। একটা ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারেব পাশে সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প।

দরজার ফাঁক দিয়ে স্টাডি রুমের আলোর কিছুটা প্রিয়াংকাদের শোবার ঘরেও আসছে। তবুও ঘরটা অন্ধকার — স্যান্ডেল খুঁজে বের করতে অনেকক্ষণ মেঝে হাতড়াতে হল। স্যান্ডেল পায়ে পরামাত্র পাশের ঘরে কিসের যেন একটা শব্দ হল।

ভারী অথচ মৃদু গলায় কেউ-একজন কাশল, ইজিচেয়ার টেনে সরাল। নিশ্চয়ই মনের ভুল। তবু প্রিয়াংকা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না—আর কোন শব্দ নেই। শুধু সদর রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ট্রাক যাওয়া-আসা করছে। তাহলে একটু আগে পাশের ঘরে কে শব্দ করছিল? অবিকল নিঃশ্বাস নেবার শব্দ। প্রিয়াংকা দরজা ঠেলে পাসের ঘরে ঢুকেই জমে পাথর হয়ে গেল। ইজিচেয়ারে জাভেদ বসে আছে। হাতে বই। জাভেদ বই থেকে মুখ তুলে তাকাল। নরম গলায় বলল, কিছু বলবে?

কতটা সময় পার হয়েছে? এক সেকেন্ডের একশ' ভাগের এক ভাগ না অনন্তকাল? প্রিয়াংকা জানে না। সে শুধু জানে সে ছুটে চলে এসেছে শোবার ঘরে — ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিছানায়। তার সমস্ত শরীর কাঁপছে—সে কি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে? নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। ঘর দুলছে। চারদিকে বাতাস অসম্ভব ভারী ও উষ্ণ। জাভেদ জেগে উঠেছে। সে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, কি?

প্রিয়াংকা বলল, কিছু না। জাভেদ ঘুম জড়ান স্বরে বলল, ঘুমাও। জেগে আছ কেন? বলতে বলতেই জাভেদ এলিয়ে পড়ল। জাভেদকে জড়িয়ে ধরে সারারাত জেগে রইল প্রিয়াংকা। একটি দীর্ঘ ও ভয়াবহ রাত। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রিয়াংকা শুয়ে আছে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় পাশের ঘরে। সে স্পষ্টই শুনছে ছোটখাট শব্দ আসছে পাশের ঘর থেকে। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, বইয়ের পাতা উল্টাবার শব্দ, ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে যেমন ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয় সে রকম শব্দ, গলার শ্লেষ্মা পরিষ্কার করার শব্দ। শেষ রাতের দিকে শোনা গেল বারান্দায় পায়চারির শব্দ। কেউ-একজন বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথায় যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। এই সব কি কল্পনা? নিশ্চয়ই কল্পনা। রাস্তা দিয়ে ট্রাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ আসছে না।

ফজরের আজানের পর প্রিয়াংকার চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল বেলা সাড়ে ন'টায়। ঘরের ভেতর রোদ ঝলমল করছে। প্রিয়াংকার সব ভয় কর্পূরের মত উড়ে গেল। রাতে সে যে অসম্ভব ভয় পেয়েছিল এটা ভেবে এখন নিজেরই কেমন হাসি পাচ্ছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। মানুষ কত রকম দুঃস্বপ্ন দেখে। এও একটা দুঃস্বপ্ন। এর বেশি কিছু না। মানুষ তো এরচেয়েও ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে। সে নিজেই কতবার দেখেছে। একবার স্বপ্নে দেখেছিল— সম্পূর্ণ নগ্ন গায়ে বসে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। ছিঃ ছিঃ কি ভয়ংকর স্বপ্ন।

প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামতে নামতে ডাকল, মরিয়ম।

'জ্বে আম্মা।'

'ঝগড়া করছ কেন মরিয়ম?'

'জীতু কাচের জগটা ভাইঙ্গা ফেলছে আম্মা।'

'চিৎকার করলে তো জগ ঠিক হবে না। চিৎকার করবে না।'

'জিনিসের উপর কোন মায়া নাই .... মহব্বত নাই ....'

'ঠিক আছে, তুমি চুপ কর। তোমার স্যার কি চলে গেছেন?'

'জ্বে।'

'বাজার করে দিয়ে গেছেন?'

'জ্বে।'

'কখন আসবেন কিছু বলেন গেছেন?'

'দুপুরে খাইতে আসবেন।'

'আচ্ছা যাও। তুমি আমার জন্যে খুব ভাল করে এক কাপ চা বানিয়ে আন।'

'নাশতা খাইবেন না আম্মা?'

'না। তোমার স্যার নাশতা করেছে?'

'জ্বে।'

মরিয়ম চা আনতে গেল। প্রিয়াংকা মুখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসল। এখন তার করার কিছুই

নেই। দুজন মানুষের সংসার। কাজ তেমন কিছু থাকে না। এ সংসারে কাজকর্ম যা আছে সবই মরিয়ম দেখে এবং খুব ভালমতই দেখে। চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া প্রিয়াংকার কোন কাজ নেই। এই ফ্ল্যাটে অনেক গল্পের বই আছে—গল্পের বই পড়তে প্রিয়াংসার ভাল লাগে না। ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করা দরকার। পড়তে লাগে না। কারণ প্রিয়াংকা জানে পড়ে লাভ হবে না। সে পাস করতে পারবে না। কোন-একটা কলেজেই তাকে বি.এ. পড়তে হবে। কে জানে হয়ত জাভেদেরই কলেজেই। যদি তাই হয় তাহলে জাভেদ কি তাকে পড়াবে? ক্লাসে তাকে কি ডাকবে—স্যার?'

চায়ের কাপ নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মরিয়ম তাকে একটা চিঠি দিল।

'কিসের চিঠি মরিয়ম?'

'স্যার দিয়ে গেছে।'

চিঠি না—চিরকুট। জাভেদ লিখেছে—প্রিয়াংকা, তোমার গা-টা গরম মনে হল। তৈরি হয়ে থেকো। আমি দুপুরে তোমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

প্রিয়াংকার মনটা হঠাৎ ভাল হয়ে গেল। মানুষটা ভাল। হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান। স্বামীদের কত রকম অন্যায় দাবী থাকে—তার তেমন কিছু নেই। অন্যদের দিকেও খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রিয়াংকা কেন, আজ যদি জীতু মিয়ার জ্বর হয় তাকেও সে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। জাভেদ এমন একজন স্বামী যার উপর ভরসা করা যায়।

যে যাই বলুক, এই মানুষটাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে তার খুব লাভ হয়েছে। জাভেদের আগে একবার বিয়ে হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে বিয়ের আট মাসের মাথায়। স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে বিয়ে করার জন্যেও অস্থির হয়ে পড়েনি। দু'বছর অপেক্ষা করেছে। মামা-মামী যে তাকে দোজবর একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন এই নিয়েও প্রিয়াংকার মনে কোন ক্ষোভ নেই। মামা দরিদ্র মানুষ। তিনি আর কত করবেন। যথেষ্টই তো করছেন। মামী নিজের গয়না ভেঙে তাকে গয়না করে দিয়েছেন। ক'জন মানুষ এরকম করে? আট ন'টা নতুন শাড়ি কিনে দিয়েছেন। এর মধ্যে একটা শাড়ি আছে বারশ' টাকা দামের।

জাভেদের আগের স্ত্রীর অনেক শাড়ি এই ঘরে রয়ে গেছে। ঐ মেয়েটির শাড়ির দিকে তাকালেই মনে হয় খুব শৌখিন মেয়ে ছিল। ড্রেসিং টেবিল ভর্তি সাজগোজের জিনিস। কিছুই ফেলে দেয়া হয়নি। বসার ঘরে মেয়েটির বড় একটি বাঁধান ছবি আছে। খুব সুন্দর মুখ। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে।

এই ডাক্তার জাভেদের বন্ধু।

কাজেই ডাক্তার অনেক আজেবাজে রসিকতা করল—যেমন হাসি মুখে বলল, ভাবীকে এখন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সংসারে নতুন কেউ আসছে নাকি? হা-হা-হা। বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কাজটি করে ফেলেননি তো?

দু'সপ্তাহও হয়নি যার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে কি এরকম রসিকতা করা যায়? রাগে প্রিয়াংকার গা জ্বলতে লাগল।

ডাক্তার তাকে একগাদা ভিটামিন দিলেন এবং বললেন, ভাবীকে মনে হচ্ছে রাতে ঘুমুতে-টুমুতে দেয় না? দুপুরে ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেবেন। নয়ত শরীর খারাপ করবে—হা-হা-হা।

প্রিয়াংকা বাড়ি ফিরল রাগ করে। সন্ধ্যা মেলাবার পর সেই রাগ ভয়ে রূপান্তরিত হল। সীমাহীন ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যেতে ভয়। বারান্দা যেতে ভয়। হাতমুখ ধুতে বাথরুমে গিয়েছে—বাথরুমের দরজা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আর সে দরজা খুলতে পারবে না। দরজা আপনা-আপনি আটকে গেছে। সে দরজা খোলার চেষ্টা না করেই কাঁপা গলায় ডাকতে লাগল—মরিয়ম, ও মরিয়ম। মরিয়ম।

রাতে আবার ঐ দিনের মত হল। জাভেদ পাশেই প্রায় নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। আর প্রিয়াংকা স্পষ্টই শুনছে স্যান্ডেল পরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। প্রিয়াংকা নিজে বুঝল—ও কেউ না, ও হচ্ছে মরিয়ম। মরিয়ম হাঁটছে। ছোট ছোট পা ফেলছে। মরিয়ম ছাড়া আর কে হবে? নিশ্চয়ই মরিয়ম। স্যাণ্ডেলে কেমন ফটফট শব্দ হচ্ছে। জাভেদ যখন স্যান্ডেল পরে হাঁটে তখন এরকম শব্দ হয় না। একবার কি বারান্দায় উঁকি দিয়ে দেখবে? কি হবে উঁকি দিলে? কিছুই হবে না। ভয়টা কেটে যাবে।

রাত একটা বাজে—এমন কিছু রাত হয়নি। রাত একটায় ঢাকা শহরের অনেক দোকান-পাট খোলা থাকে। এই তো পাশের ফ্ল্যাটের বাচ্চাটা কাঁদছে। এখন নিশ্চয়ই বারান্দায় যাওয়া যায়।

খুব সাবধানে জাভেদকে ডিঙিয়ে প্রিয়াংকা বিছানা থেকে নামল। তার হাত-পা কাঁপছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হচ্ছে। সব অগ্রাহ্য করে বারান্দায় চলে এল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়ান মানুষটা বলল, প্রিয়াংকা এক গ্লাস পানি দাও তো।

বিছানায় যে মানুষটা শুয়ে আছে এই মানুষটাই সেই জাভেদ। তার পরনে জাভেদের মতই লুঙ্গি, হাতকাটা গেঞ্জী। মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ন।

প্রিয়াংকা ছুটে শোবার ঘরে চলে এল। কোনমতে বিছানায় উঠল—ঐ তো জাভেদ ঘুমুচ্ছে। গায়ে চাদর টানা—এতক্ষণ যা দেখেছি ভুল দেখেছি। যা শুনেছি তাও ভুল। কিছু-একটা আমার হয়েছে। ভয়ংকর কোন অসুখ। সকাল হলে আমার এই অসুখ থাকবে না। আল্লাহ, তুমি সকাল করে দাও। খুব তাড়াতাড়ি সকাল করে দাও। সব মানুষ জেগে উঠুক। সূর্যের আলোয় চারদিক ভরে যাক। সে জাভেদকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। জাভেদ ঘুমঘুম গলায় বলল, কি হয়েছে?

সকালবেলা সত্যি সত্যি স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাতে এরকম ভয় পাওয়ার জন্যে লজ্জা লাগতে লাগল। জাভেদ কলেজে চলে যাবার পর সে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মরিয়মকে তরকারি কাটার সাহায্য করতে গেল। মরিয়ম বলল,

'আফাব শইল কি খারাপ?'

'না।'

'আফনের কিছু করন লাগত না আফা। আফনে গিয়া শুইয়া থাকেন।'

'এইমাত্র তো ঘুম থেকে উঠলাম এখন আবার কি শুয়ে থাকব?'

'চা বানায়া দেই।'

'দাও। আচ্ছা মরিয়ম, তোমার আগের আপাও কি আমার মত চা খেত?'

'হ। তয় আফনের মত চুপচাপ থাকত না। সারাদিন হৈচৈ করত। গান-বাজনা করত।'

'মারা গেলেন কিভাবে?'

'হঠাৎ মাথাডা খারাপ হইয়া গেল। উল্টা-পাল্টা কথা কওয়া শুরু করল—কি জানি দেখে।'

প্রিয়াংকা শংকিত গলায় বলল, কি দেখে?

'দুইটা মানুষ না-কি দেখে। একটা আসল একটা নকল। কোনটা আসল কোনটা নকল বুঝতে পারে না।'

'তুমি কি বলছ তাও তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'পাগল মাইনষের কথার কি ঠিক আছে আফা? নেন চা নেন।'

প্রিয়াংকা মাথা নিচু করে চায়ের কাপে ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছে। একবারও মরিয়মের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে না। তার ধারণা, তাকালেই মরিয়ম অনেক কিছু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেলবে যে প্রিয়াংকারও একই অসুখ হয়েছে। সে চায় না মরিয়ম কিছু বুঝুক' কারণ তার কিছুই হয়নি। অসুখ করেছে। অসুখ কি মানুষের করে না? করে। আবার সেরেও যায়। তারটাও সারবে।

রাত গভীর হচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। খোলা জানালায় হাওয়া আসছে। প্রিয়াংকা জাভেদকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে। তার চোখে ঘুম নেই।

পাশের ঘরে বইয়ের পাতা ওল্টানোর শব্দ হচ্ছে। এই যে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে আসছে। ইজিচেয়ার থেকে উঠল—ক্যাঁটক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে ইজিচেয়ারে।

প্রিয়াংকা স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় ডাকল—এই—এই।

ঘুম ভেঙে জাভেদ বলল, কি?

প্রিয়াংকা ফিসফিস করে বলল, না কিছু না। তুমি ঘুমাও।

সুজয় রায়

শরীর-জমিন

মণিভূষণের চেহারায় একধরনের সারল্য আছে। এ বয়সেও যার শরীর জীবনের নিগূঢ় সমস্যার জটিলতা এবং দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েনের আঁচ লাগেনি, সে শুধু সরল নয়—নির্বোধও। এটা মণিভূষণের ধারণা। এই শহরের একটা জীবন ছিল খুব সহজ এবং নিস্তরঙ্গ। কিন্তু হঠাৎ একদিন শহরটা বড় ও জটিল হয়ে উঠল। অথচ মনিভূষণ তার ধাঁচে মাপা জীবনটাকে গতি ও জটিলতার পাঁকে হারিয়ে পেলে যুদ্ধ করে পিটানো শরীর নিয়ে ফিরে আসেনি। মণিভূষণ পিছিয়ে যায়। আড়াল নেয়। এবং তখন একটা যুক্তি খাড়া করে, সে নীতিবান, আদর্শ-নির্ভর পুরুষ। ঢাল-নেই, তরোয়াল নেই কেবল নিধিরাম সর্দার। সে সর্দারই তো! তার মনোজগতের সর্দার সে নিজে। কিন্তু জীবন তো একসাথে, একস্রোতে তার মাপে চলে না? আরো প্রাচুর্য, আরো বিলাস সামগ্রী নিয়ে শহরের প্রায় সব মানুষ আধুনিক হয়ে দাঁড়ায়। মণিভূষণ নির্বোধ দৃষ্টি দিয়ে সব লক্ষ্য করে। অবশ্য তখন একটা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে ফেলে মণিভূষণ যাতে কেউ না দেখে তার হতাশা ও পরাজয়ের গ্লানি। তবুও মণিভূষণ সবার সামনে দিয়ে এই বিধ্বস্ত শরীর দিয়ে সোজা হয়ে হাঁটতে চায় প্রতিদিন। মণিভূষণ আবার টের পায় তার এই হাঁটা সবার সাথে মেলে না। এ যেন একক, বিচ্ছিন্ন এবং হাস্যাস্পদ। শুধু সবার সঙ্গে নয়, সে যেন তার পরিবার ও সন্তান থেকে পৃথক এবং অতি দূরবর্তী স্থানের বাসিন্দা। এই পার্থিব জগতের বাইরে নিজস্ব কক্ষপথে চলতে থাকা সে যেন এক আজব জীব।

দুটো স্কুটার চারজন আরোহী নিয়ে আচমকাই মণিভূষণের সামনে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল। একজন স্কুটার থেকে নেমে মণিভূষণের সামনে দাঁড়ায়। কে একজন বলে উঠল : আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন মণিদা? আপনি বাড়ি থাকলে ভাল হতো। বউদি ঘরে আছেন তো? হ্যাঁ? কিন্তু কেন বল তো? অন্য একটি ছেলে হেসে বলল : সে কি মণিদা, আপনি জানেন না? কিছুই জানেন না? বউদি আপনাকে কিচ্ছু বলেননি? মণিভূষণ বলল : হয়ত বলেছিল, আমার একদম মনে নেই কি বলতো? তোমাদের খাওয়াবে বলেছিল? —না না,। আপনাদেরই নাকি একটা সমস্যা আছে। জায়গা জমি সংক্রান্ত। ঐ পাশের বাড়ির দেশওয়ালিদের সাথে? আপনাদের জায়গা নাকি অল্প অল্প করে দখল করার চেষ্টা করছে? মণিভূষণ একটু আড়ষ্ট হয়। খানিকটা চিন্তার রেখা কপালের ভাঁজে ফুটিয়ে বলে : সেখানে তোমরা কি করবে? মারপিট করবে নাকি? আর একটি ছেলে বলল : না, না। মারপিটের কি আছে? মারপিট এত সস্তা নাকি মণিদা? ওদেরকে একটু ফোঁস করেই বসিয়ে দেবো। মণিভূষণ বলল : আরে! বলো কি? ওরা যে হরিজন, ওদের জন্য মন্ত্রী আছে যে? সংখ্যালঘু হরিজন বলেই ওদের সাতখুন মাপ। মন্ত্রীরা যে ভোটের রাজনীতি করেন ওদের নিয়ে? ওদের শেল্টার দিলে মন্ত্রীদের নাকি ইমেজ বাড়ে? সুতরাং কিচ্ছু হবে না। তোমাদের ফোঁসে ওরা থোরাই কেয়ার করবে? আর একটি ছেলে যেন একটু রেগে যায়। চোখে মুখে এবং গলার স্বরে দাপট এনে বলে আপনি ভুল করছেন মণিদা? এরাজ্যের ক'জন মন্ত্রী আমাদের ক্লাবকে ব্যবহার করে জানেন? আমরা না থাকলে যে ওদের ইলেক্‌শন জেতা মাটি হয়ে যাবে, সেটা ভেবেছেন কি? থাক্‌গে আগে বলুন আমাদের কোন প্রয়োজন আছে কিনা? বউদি যখন ডেকেছেন, তার কাছে যাব কিনা? মণিভূষণ বলল : যাও, যাও, অবশ্যই যাও। তা না হলে যে আমারও ঘরে থাকা দায় হবে। আর একটি ছেলে বলল : চল্ চল চল্‌তো। মণিদার সাথে কথা বলে লাভ নেই। উনি কোন ঝামেলায় থাকতে চান না। বরং বউদির কাছে চলে যাই। ফয়সালাও হবে। ভালমন্দ খাবারও মিলবে। আপনি আপনার কাজে যান মণিদা। আমরা আপনার বাড়ি যাচ্ছি।

মণিভূষণের সাথে দীপার কোন মিল নেই। দু'জন দু'প্রান্তের মানুষ। দীপা চেয়েছিল একটা ভাল মানুষ। ঠিক সেটাই পেয়েছে সে। আর বাস্তবজীবনেব কোন অবস্থাতেই তারা দু'জন একসাথে সহাবস্থান করে না। এটা তো সত্যি দীপার চাপে মণিভূষণকে এ জায়গায় বাড়িটা বানাতে হয়েছিল।

নইলে মণিভূষণের জন্য পৈত্রিক সূত্রে যে চিলে ঘরটি বরাদ্দ ছিল সেখানেই অপমানে মাথা গুঁজে আড়ষ্ট হয়ে দিনযাপন করতে হতো। দীপা বউ হয়ে আসার পরই ঘোমটা ফেলে দিয়েছিল। গায়ের সব গয়না খুলে ফেলেছিল। মণিভূষণের সরকারী চাকুরীর নির্ধারিত আয়ে কি ঘর হয়? দীপা চাপ সৃষ্টি করে বলেছিল : লোন নাও। আর আমার ঐ গয়নার বাধা রাখ। বাড়ি হয়ে গেলে সময় মতো ছাড়িয়ে নেবে। সত্যি এ বাড়ির এক প্রান্তে নিজস্ব দলিলের জমিতে ঘর উঠল একদিন। এই বাড়ি সাজানো নিয়ে দীপার কী অক্লান্ত প্রয়াস। মণিভূষণ দীপার কাণ্ডকারখানা দেখে হাসত। বলত : করছ কি এতসব? পাগল হয়ে যাবে না তো?

দীপা একটু কৃত্রিম রাগ এনে উত্তর দিতো : তোমার পাল্লায় থাকলে আর তোমার কথা শুনলে আমি ঠিকই পাগল হয়ে যেতাম। এখনও আমার প্ল্যান অনুযায়ী অনেক কাজ বাকী। আচ্ছা উত্তর দিকের প্লটের লোকগুলো এত বেয়াদপ কেন বলতে পার? আমি প্রতিদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ওরা একটু একটু করে বেড়া ধাক্কাচ্ছে। জায়গা দখল করার ধান্দা। ওরা কেমন ধড়িবাজ দেখেছ? চুরিও করবে। আর কিছু বললে পর চীৎকার করবে? সারা পাড়া হৈ চৈ করে ছাড়বে। মণিভূষণ নির্বিকার ও নিস্তেজ গলায় বলেছিল : তুমি ওদের কিছু বলেছিলে নাকি? দীপার দাপটে উত্তর ঃ বলব না মানে? দাঁড়াও না, ওদের আমি এমন শিক্ষা দেব, যাতে জন্মেও আমাদের সাথে ঝগড়ার ধান্দা না করতে পারে? মণিভূষণ অবাক হয়ে বলেছিল : কী করবে তুমি? দীপার গম্ভীর উত্তর : আমি পাড়ার ক্লাবের ছেলেদের খবর দেব? মণিভূষণ আরো বিস্মিত হয়ে বলেছি : আবার ঝগড়াঝাটি, মারপিট, খুনোখুনি হবে নাকি? দীপার আরো দাপট এনে বলেছিল : হলেও আপত্তি নেই। তুমি শুধু কোন কথা বলবে না। যা করার আমি করব।

মণিভূষণ আগরতলার বাসিন্দা, খুব ছোট বয়েস থেকে। জন্মটা শুধু হয়েছিল সেসময়কার পূর্ব পাকিস্তানের এক অখ্যাত গ্রামে। এরপর মা-বাবাসহ এবং ভাইবোন তল্পিতল্পা নিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এপার, আগরতলা। তখন স্বাধীন ত্রিপুরা। ভারত ভুক্তি হবে হবে করছে। শৈশবের মণিভূষণের এই শহরটাকে তখন ভাল লেগে গিয়েছিল। মানুষ কম, ফাঁকা ফাঁকা। শুধু রিকসার পথ চলতি চাকার সর্‌সর্‌ শব্দ। মোরামের লাল কুচি কুচি পথ। ধীরে ধীরে কোন একসময়ে পড়া শেষ করে চাকুরী পাবার সময় হয়েছে, তখন অপেক্ষা পাঁচ বছর। কারণ ভেকেন্সি নেই। হঠাৎ একদিন চাকুরী হয়ে গেল মণিভূষণের। আগরতলা শহরে তখন দালান কোঠা বাড়ছে। রাস্তাঘাটের চেহারা পাল্টাচ্ছে। মোরামের রাস্তা ঢাকা পড়ে কবে যে প্রশস্ত পীচের রাস্তায় পরিণত হয়েছে মণিভূষণ বলতেই পারে না। তাছাড়া এই শহরে লোক বেড়েছে আকস্মিকভাবে প্রচুর। আগরতলায় কোন জায়গা খালি থাকে না। মণিভূষণ এই দৃশ্য অবাক হয়ে দেখতে দেখতে বদলী হয়ে চলে যায় আরো নির্জন স্থানে। পাহাড় বেষ্টিত মফঃস্বল শহরে। নিয়ম অনুযায়ী একসময় মণিভূষণকে বিয়ে করতে হয়। দীপার এই শহরের কলেজের হোস্টেলে থেকে পড়াশুনো করা মফঃস্বলের মেয়ে। মণিভূষণ যখন চাকুরীসূত্রে মফঃস্বলের বাসিন্দা তখন দীপার এই শহরের আধুনিকতা ও বাস্তবতার সাথে যুদ্ধ করে বিজয়িনীর বেশে ফিরে গেছে তার শহরে।

—শোনো, আমার ধারণাটা একটু অন্যরকম ছিল তোমার সম্পর্কে। ভালোমানুষের সব গুণই তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু বাস্তবজ্ঞানের অভাব অনেক। জীবন এখন ঠিক এভাবে চলে না যে।

– মানে? এখন পর্যন্ত তো সব ঠিকঠাকই আছে।

—না, নেই। তুমি যে এখনই সন্তান চাইছ, তোমার ঘর কোথায়?

—ঘর কি? এটাই তো ঘর।

—এটা তোমার না। তোমাদের বলো।

—হ্যাঁ, আমাদের? আমরা তো সবাই একসাথেই আছি?

– সেটা তুমি মনে করছ। সবাই তা ভাবে না। আর তাছাড়া এখন তুমি বিয়ে করেছ। তোমার বউ আছে। আলাদা সংসার হয়েছে। এরপরও পৃথক বাড়ি বা ঘরের কোন প্রয়োজন নেই? কেউ কি মুখ ফুটে বলবে যে তুমি নিজের ঘর বানাও। পৃথক সংসার কর? এভাবে থাকলে তোমার ব্যক্তিত্বই তো প্রকাশ পাবে না। ঠিক বলেছি কিনা বলো?

—অবশ্য ব্যাপারটা আমি ওরকম করে তলিয়ে দেখিনি। এ নিয়ে তো ভাবা দরকার ঠিকই। কিন্তু বাচ্চা আমার চাই-ই। আমার উত্তরাধিকার তাড়াতাড়ি আসুক, এটা আমার আকাঙ্ক্ষা। এ ব্যাপারে আর আপোষ নয়।

দীপা মুচকি হাসে। মণিভূষণ দীপার এ হাসির মর্ম বুঝতে পারে না। মূলতঃ মণিভূষণ বিয়ের দিন থেকে এখন পর্যনত দীপাকে বুঝে উঠে পারেনি। মণিভূষণের জীবনের সরল রেখায় অনেক জটিল জীবন এসেছিল। কিন্তু বুঝে উঠতে পারার আগেই ওরা সরে যায়। মণিভূষণ একটা জিনিস টের পায়, সে কোন মানুষের সাথেই একাত্ম হতে পারে না। ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা যতক্ষণ, ততক্ষণ বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর আকস্মিক ভাবে হাল ছেড়ে দেয়। ঠিক দেয় না, মণিভূষণের মনে হয়ে অধিক তীব্রতা বা চাহিদা লিপ্সারই নামান্তব। এতে লোভ এবং মোহ বাড়ে। নিজেকে অমানবিক মনে হয়। হ্যাংলা মনে হয়। তখন লজ্জা এবং অপমান পাশাপাশি মনের মধ্যে ঘর বাঁধে। এবং দংশন করতে থাকে প্রতিনিয়ত।

রিকসাটা হঠাৎ এসে তার পেছনে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। হুডতোলা রিকসার ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে সুবেশা সুন্দরী মেয়েটিকে বলতে শোনা গেল : তোমার যদি কোন অসুবিধা না হয়, আমার সঙ্গে যেতে পার? আমি কলেজেই যাচ্ছি।

মণিভূষণের পরনে পা-জামা, আর সার্ট। হেঁটেই সাড়ে দশটায় ক্লাস ধরতে এম. বি. বি. কলেজে যাচ্ছিল। মণিভূষণ এতটা পেয়ে যাবে ভাবেনি। তার পাওনার মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। অতিরিক্ত হলেই তা হজম করতে মণিভূষণের কষ্ট হয়। মুখে বিহ্বলতা ও হাসির ছাপ রেখে উত্তর দিয়েছিল না কি অসুবিধে? কিন্তু তুমি? তোমার ক্লাশ তো সেই পৌনে বারটা? এত আগে চলছ কোথায়?

—আমার অনেক কাজ। ইলেকশন নিয়ে মেতেছি যে?

—তুমি দাঁড়াবে নাকি?

—কেন আমি কি দাঁড়াতে পারি না? বলো তো কোন পোস্টে দাঁড়ালে আমাব জেতা সুবিধে হবে?

—কালচারাল? তুমি তো নাচ এবং গানে দুটোতেই ওস্তাদ। এটাই হবে তোমার যোগ্য স্থান। ঠিক কিনা তুমিই বলো?

—ওসব কবে ছেড়ে এসেছি? এখন ভাবছি রাজনীতি করব। জান তো রাজনীতি আমার প্রিয় সাবজেক্ট? আমি আপাতত কলেজের অ্যাসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী হতে চাই। কী পারব না?

মণিভূষণ এক রিকশায় পাশে বসে থাকা শ্রাবণীর দিকে তাকায়। শ্রাবণীর চোখে মুখে প্রত্যয়। মুখে হাসি। অনায়াসে হাসি যেখানে লজ্জা, অপমান, সংকোচ কোনটাই বাসা বাঁধেনি। মণিভূষণ অবাক হয়। শ্রাবণীর সাহস, মানসিক জোর দেখে। নিতান্ত প্রভাব তাড়িত হয়ে মণিভূষণ বলে ফেলে : অবশ্যই পারবে। তবে খাটতে হবে প্রচণ্ড। এ জি এস নতুন ছেলেদেরই পেতে হিমশিম খেতে হয়?

—আমার হবে না। প্রায় সব ছেলেদের হাত করে ফেলেছি। কয়েকটা মস্তান বাকী আছে। আচ্ছা তুমি আমাকে ভোট দেবে তো?

—অবশ্যই দেব। পরের বছর কি এসের জন্যও তোমাকে আগাম ভোট দেয়া রইল।

—ঠাট্টা নয়। সিরিয়াসলি বলছি?

—ও ভাল কথা মাকে তোমার কথা বলেছি। কাল যেতে বলেছে সকালে আমাদের বাড়ি।

—আমার ভয় করে? যদি কিছু বলেন? মাসীমা খুব সিম্পল এবং স্টেডি। কি বলবেন কে জানে?

—কার কথা? ধ্যার, মা জিজ্ঞেস করবে আমার কথা। আমি ঠিকভাবে চলাফেরা করি কিনা। তোমার থেকে আমার ভালমন্দের সার্টিফিকেট নেবে। মাকে সার্টিফিকেটটা ভালই দিও। নইলে আমার ইলেকশনে দাঁড়ানো হবে না যে?

—আচ্ছা শ্রাবণী, তোমার এইসব ভাল লাগে? এই, ছেলেদের টিজ করা, কথায় কথায় তাদের বোকা বানানো, ফলস্ পজিশনে ফেলা? আর অঢেল ছেলে বন্ধু রাখা?

—না তো? আমি তো অন্যায় করি না। কারো ক্ষতিও করি না। তবে অনুশোচনা বা ভয় থাকবে

কেন? তুমিই বরং ভীতু। এই জীবন থেকে পালিয়ে থাকতে চাও। অথচ আমার ভাল লাগে। দাঁড়াও না, আমি তোমাকেও তৈরি করে ছাড়ব।

মণিভূষণের শ্রাবণীকে এই জন্য ভয় হতো। কখন কিভাবে তাকে 'তৈরি' হবার পরিস্থিতিতে পড়তে হবে মণিভূষণ জানে না। তবে শ্রাবণীর কাছাকাছি যেতে তার একধরনের ভীতি জাগত। যার ফলে সে নিজেকে শ্রাবণীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখত দিনদিন। আর শ্রাবণীর ঐ কথাটাও গেঁথে গেল মণিভূষণের বুকে। 'তুমিই বরং ভীতু। জীবন থেকে পালিয়ে থাকতে চাও!' মণিভূষণ ঠিকই বোঝে সে জীবনের মুখোমুখি হতে শেখেনি। শ্রাবণীর দ্রুত ও ব্যস্ত জীবনটাকে ও হজম করতে পারেনি। মণিভূষণ যাদের জীবনেরই সামনাসামনি হয়, অতিরিক্ত ঘটনাবহুল ও সংঘাত দেখলে পিছিয়ে আসে। নিজের মধ্যেই বর্ম তৈরি করে আত্মবন্দী হয়। পৃথক কক্ষপথে নিজেকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু মণিভূষণের আত্মসুখ নেই। অতৃপ্তির বেড়াজাল তাকেও হতাশ করে। অসহায়ত্ব জাগায়। সে যখন দেখেছে শ্রাবণী কলেজের ইউনিয়নের দামী পদ নিয়ে ছেলে বেষ্টিত হয়ে ঘুরছে তখন কিন্তু মণিভূষণের ঠিকই মনে হয়েছিল, এই তো সেদিন এক রিকসায়, এক হুডের নীচে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গভীর কথা বলতে বলতে কলেজ যাচ্ছে তারা দু'জন। শরীরের গন্ধ, নির্যাসের মাতাল সুবাস মিলেমেশে এক তৃপ্তির সুখ এনে দিচ্ছে মণিভূষণের চারপাশ।

একটা ধাক্কায় মণিভূষণের সম্বিত ফিরে আসে। এবং এবার সে শুনতে পায় দীপার কণ্ঠস্বর। সে যেন একটু উত্তপ্ত এবং কর্কশ।

—কী দার্শনিক হয়ে গেলে? কোথায় মাঝে মাঝে চলে যাও, বলতো? এদিকের কোন খেয়াল আছে? ছেলে তো পেয়েছে, তাকে মানুষ করতে হবে না? ওকে এমনি ছেড়ে দিলেই চলবে?

—ছেড়ে দিলাম কৈ। ও তো তোমার কথা অনুযায়ী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই পড়ছে?

—সে তো বুঝলাম, কিন্তু সেখানেও তো তুমি 'ভেটো' মেরে বসেছিল, ওকে সাধারণ স্কুলেই দিয়ে দেবার জন্যে। সে যাক্, ছেলের অন্ততঃ এখন দু'জন টিচার চাই। আমি ঠিক করে ফেলেছি। মাসে চার'শ টাকার ধাক্কা।

—টিচার? এখনই টিচার কী? আমরাই তো আছি?

—ছাই আছি। যে এখানে বছরে অধিকাংশ দিনগুলিই বাইরে কাটায়, সে আবার ছেলে পড়াবে? তবেই হয়েছে। আমারও সংসার বাড়ি স্কুল নিয়ে ব্যস্ততা, প্রচুর ঝক্কি। তার উপর ছেলে হয়েছে দুরন্ত অবাধ্য। ঐ যা করেছি ঠিক করেছি। এক বেলা না হয় কম খাব। কিন্তু টিউটর দু'জন রাখতেই হবে।

মণিভূষণ কিছু বলে না। এখানে বলার কিছু নেই। কারণ সে বুঝতে চেষ্টা করছে এই যুগটাই আলাদা। এখানে প্রতিযোগিতাই জীবনে প্রতিষ্ঠা আনার মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এটা কি শিশুমনের পরিপন্থী নয়? এই প্রশ্নটা উঁকি দিলেও মণিভূষণ উত্তর খোঁজে না তার আগেই যে দীপা ছেলেকে 'দাঁড়' করিয়ে দেবার সংকল্পে অটল হয়ে পড়েছে। এখানে কি সহধর্মিনীরা সাথে হাত বাড়িয়ে না দেয়া চলে? আজকাল বোধ হয় ছেলেমেয়েদের এভাবেই বড় হতে হয়। এখানে দীপার কী দোষ? কিন্তু মাঝে মাঝে মণিভূষণের মনে হয় দীপা একটা অদৃশ্য লড়াই এবং সে লড়াইয়ের জয় পাবার জেদ নিয়ে এগুচ্ছে। দীপা যেন ছেলের জন্মের পর থেকেই তাকে এ যুগের বিষয় আশয় সর্বস্ব, আত্মচিন্তা-নির্ভর এক সময়োপযোগী পুরুষ তৈরি করার সংকল্প নিয়েছে। সে দিনের দীপার হাসিটা মণিভূষণের মনে এখন মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। যখন মণিভূষণ বলেছিল বাচ্চা আমার চাই-ই, তখনই রহস্যময় হাসিটা প্রকাশ পেয়েছিল। এখন সে বোঝে সে হাসিটার অর্থ কী? যেন দীপা বলতে চেয়েছিল-ছেলে তোমাকে দেবই। কিন্তু তোমার মতো করে নয়, আমার মতো করে। এখন কি দীপা ছেলেকে তার ছত্রছায়া রেখে সেভাবেই তৈরি করছে না? মণিভূষণের মাঝে মাঝে দীপার উপর রাগ হয়। ছেলের মধ্যে আবেগ, কল্পনাপ্রবণতা, স্বপ্ন দেখা—এ নিয়ে মাঝে মাঝে অতি সূক্ষ্মভাবে তার মা'র উপস্থিতিতে ছেলে বাবাকে জানিয়ে দেয়। মণিভূষণ তাই চলতে চলতে স্থির টের পায় এই বাড়িতে এখন যেন দুটো শিবির। একদিকে দীপা ও ছেলে। অন্যদিকে সে একা। কোন কোন ধারণা হয় এই শিবির সৃষ্টিতে দীপার প্রচ্ছন্ন ও কুশলী হাত আছে। মণিভূষণের জীবন তো এক নির্দিষ্ট ছকে চলতে থাকা নিরোপদ্রব

—ন্যায়নীতি, আদর্শ প্রবৃষ্ট এক মসৃন জীবন। বেঁছে থাকতে গেলে এই নিস্তরঙ্গ জীবনের গভীরে প্রবেশ করে এক অন্তলীন জীবনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। যা দিয়ে এই অপার্থিব জগতের বিশাল রহস্যময় বিস্তৃতির সুখসমুদ্রে অবগাহন করা সম্ভব হয়। মণিভূষণ পারছে এইভাবে নিজেকে অর্ন্তমুখী করে বিছিয়ে দিয়ে তৃপ্তির সুখ তুলে নিতে। কিন্তু তার ছলে কোথায় পৌঁছুবে—এইভাবে প্রতিযোগিতা ও প্রতিষ্ঠার সিঁড়ি বেয়ে? দীপা তাকে কোথায় নিয়ে যাবে। দীপার জীবনে যাকে যেভাবে পাবার কথা ছিল, তাকে ঠিক সেভাবে পায়নি বলেই কি এই জেহাদ? তার সন্তানের ভেতর দিয়ে দেখতে চায় তার আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের ছবি?

না, ঠিক এভাবে নয়, বহুকর্ষিত জীবনের জমিতে ঠিক এভাবে মণিভূষণ তার সন্তানকে অঙ্কুরিত হতে দেবে না। ছেলে যদি হারিয়ে যায়? তাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায়? তখন দীপা কী করবে? মণিভূষণই বা মেনে নেবে কি করে এক উত্তরপুরুষের অদ্ভুত এক আত্মহননকে? কিন্তু মণিভূষণের এই ভাবনা একতরফা হয়ে যাচ্ছে না? সব যুগই তো সমান নয়। মণিভূষণের যুগ পাল্টেছে। এখন কেড়ে আদায় করার যুগ। আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। কেউ যখন কারোর জন্য জমি ছেড়ে দেয না, তখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই কৃত্রিম জগৎ থেকেই সব পার্থিব সুখকে হরণ করে নিতে হবে। দীপা তো ঠিক পথই ধরেছে। এইখানে মণিভূষণের সাথে দীপার সূক্ষ্ম সংঘর্ষ। আবার তবুও, এইসব ভাবনার পরও মণিভূষণের আত্মভিমান ও আত্ম গৌরব হারাতে পারে না। সে বুঝতে পারে একই ধাঁচে চলতে থাকা তার অতীত ও বর্তমান জীবনপ্রবাহ ভবিষ্যতের কাছে থেমে যাচ্ছে। সে পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও বেঁচে থাকতে চায়। এই তাগিদ ও আগ্রহ তাকে কোন কোন সময় মরিয়া করে তোলে। নিষ্ফল জেহাদ সৃষ্টি করে মনের মধ্যে কোন কোন সময়।

মণিভূষণ এখন টের পায় তার অন্তরের জমির উপব এক অদৃশ্য বেড়া ধাক্কা দিচ্ছে যেন প্রতিদিন। একটু একটু করে দখলও হয়ে যাচ্ছে দিনদিন। এই একটু আগে ছেলেগুলোকে বাড়িতে পাঠাবাব পব মণিভূষণের হঠাৎ-ই যেন মনে হল সেই দেশোয়ালীর সাথে দীপার কোন অমিল নেই। ওরা যেন ওদের পৃথক পৃথক স্থানের দোসর কিংবা সহোদরা। ওদেরকে বলে দেয়া কি উচিত ছিল না? যে তোমরা শুধু একটা জমিরই ফয়সলা করবে না, একই সাথে আছে আর একটি জমি, যে জমিব সীমারেখাটি ক্রমশ ধাক্কা মেরে মেরে উঠিয়ে দেবার উপক্রম করছে অন্য এক কারিগব, আর যে বসতির স্থপতি সে নিজে, সেটিরই ফয়সলা করতে হবে। কিন্তু এ কথাটি বললে কি তাবা বুঝবে? এবা হয়তো একজনের মুখ অন্যজন দেখবে। বলবে মনে মনে, 'মণিদা একটা আস্ত পাগল। ওব মাথাব ঠিক নেই।' মণিভূষণ বুঝতে পারে এক এক কাজটা তার নিজস্ব, তার একারই কবা উচিত। সে মনে মনে স্থির করে, বাড়ি ফিরে সে আজই ফয়সলা করবে। এর জন্য যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায়, সে যাবে। দীপাব সাথে এক অদ্ভুত জীবন যন্ত্রণার মুখোমুখি হবে সে।

মণিভূষণ যখন বাড়ি ফিরল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। দেখল ছেলে টেবিল লাইট জ্বালিয়ে নিঃশব্দে অঙ্ক কষছে। টি-টেবিলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেকগুলো প্লেট, তাতে পরিত্যক্ত খাবাবেব টুকরো। দীপা একা বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার চোখে যেন অনেক ধকল ও বহু পরিশ্রমের পর এক স্থির, নিশ্চিত ঘুম।

লেখক পরিচিতি

● রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

জন্মস্থান - কলকাতার জোড়াসাঁকো। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা। সাহিত্যের সকল শাখায় অবাধ বিচরণ। ১৯১৩খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অজস্র সম্মান লাভ করেন। অসংখ্য সাহিত্যকীর্তির মধ্যে আছে 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটক, 'গল্পগুচ্ছ' নামক গল্পগ্রন্থ, 'চোখের বালি', 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাস, বহু কবিতা, গান এবং প্রবন্ধ। ছদ্মনাম - ভানুসিংহ।

● কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯৪১)

জন্মস্থান - চব্বিশ পরগনার দক্ষিণেশ্বর। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। নন্দিশর্মা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি ছদ্মনাম ব্যবহার করলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি সমধিক পরিচিত 'দাদামশাই' নামে। হাস্যরসের আবরণে দৈনন্দিন জীবনের বেদনার প্রকাশ তাঁর গল্পগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'চীনযাত্রী' (ভ্রমণকাহিনী), 'শেষ খেয়া', 'ভাদুড়ী মশাই', 'আই হ্যাজ', 'স্মৃতিকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

● প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

জন্মস্থান - যশোহর। পেশায় প্রথম জীবনে ব্যারিস্টার পরে আইন কলেজের অধ্যাপক। প্রবন্ধকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও গল্প ও কবিতাও রচনা করেছেন। কাব্যগ্রন্থ - 'সনেট পঞ্চাশৎ', 'পদচারণ', 'চারইয়ারি কথা', 'আহুতি', 'নীললোহিত' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। ছদ্মনাম - বীরবল। 'সবুজপত্র' নামক বিশিষ্ট মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা - সম্পাদক।

● প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

জন্মস্থান - বর্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রাম। পেশা - প্রথম জীবনে গয়ায় আইন ব্যবসায়, পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপনা। কবিতা রচনার মাধ্যমে সাহিত্য জীবন আরম্ভ। অজস্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং পঞ্চাঙ্ক নাটকও রচনা করেছেন। ছদ্মনাম - শ্রীমতী রাধামণি দেবী, শ্রী জানোয়ারচন্দ্র শর্মা। 'অভিশাপ' (ব্যঙ্গকাব্য), 'রত্নদীপ' (উপন্যাস), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (গল্পগ্রন্থ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। সরল, অনাবিল হাস্যরস তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

● শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

জন্মস্থান - হুগলী জেলার দেবানন্দপুর। প্রখ্যাত বাংলা কথাশিল্পী। বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। বহু উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধের রচয়িতা। বড়দিদি অনিলাদেবীর ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, পল্লীসমাজ, পথেব দাবী, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, নারীর মূল্য প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম।

● পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০)

জন্মস্থান - নদীয়া জেলার বীরনগর (উলা)। আসল নাম রাজশেখর বসু। অধ্যয়নের বিষয় রসায়ন হলেও কিছুদিন আইন ব্যবসায়েও রত ছিলেন। একদিকে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ব্যবসা পরিচালনা অন্যদিকে গবেষণার কাজ - উভয়ক্ষেত্রেই অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন। চল্লিশ বছর বয়সে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন কবেন। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ বাঙালি রসিক মহলে যেমন সাড়া জাগিয়েছিল 'লঘুগুরু', 'বিচিন্তা' প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থও যথেষ্ট সমাদৃত হয়। বাংলা অভিধান 'চলন্তিকা'ব প্রকাশ এবং বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থও এইসঙ্গে তাঁকে অবিস্মরণীয় করেছে। ছদ্মনাম - পরশুরাম।

● উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮১-১৯৬০)

জন্মস্থান - ভাগলপুর। সম্পর্কে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের তিনি মাতুল। প্রথম জীবনের পেশা ওকালতি ত্যাগ করে তিনি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সপ্তক' প্রকাশিত হয় ১৯১২ সনে। প্রথমে 'বিচিত্রা' এবং পরে 'গল্পভারতী'র সম্পাদক। 'দিকশূল', 'অন্তরাগ', 'রাজপথ', 'স্মৃতিকথা' (চারখণ্ড) প্রভৃতি তাঁব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

● **জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)**

জন্মস্থান - কুষ্টিয়া। সিউড়ি ও বোলপুর আদালতে কর্মজীবন অতিবাহিত হয়। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস মিলিয়ে তাঁর রচনার সংখ্যা কম নয়। স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান দিয়েছে। 'অক্ষরা' (কবিতা-সংকলন), 'বিনোদিনী', উদয়লেখা প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ এবং 'লঘুগুরু', 'দুলালের দোলা' প্রভৃতি উপন্যাস তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

● **প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪)**

জন্মস্থান - কলকাতা। প্রথাগত উচ্চশিক্ষা লাভ না করলে নিজ প্রচেষ্টায় নানাদেশের সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্রকার হিসেবে তিনি সুপরিচিত। 'হিন্দুস্থান', 'বৈকালী', 'যাদুঘর', 'জাহ্নবী', 'বেতারজগৎ', প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। 'দেনাপাওনা', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি চলচ্চিত্রের তিনি পরিচালক। রম্যরস ঘটনাবৈচিত্র ও রোমাঞ্চের সমাবেশ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। 'মহাস্থবির জাতক', 'চাষার মেয়ে', 'বাজীকর' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

● **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)**

জন্মস্থান - উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মুরাতিপুর। প্রধানত শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত থাকলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। মাত্র একুশ বছরেব সাহিত্য জীবনে রচনার সংখ্যা কম নয়। ছোটগল্প, উপন্যাস, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনী — সর্বত্রই তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। প্রকৃতির বিভিন্নরূপে ধরা দিয়েছে তার রচনায়। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'চাঁদের পাহাড়', 'পুঁইমাচা', 'তালনবমী' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা সমষ্টির কয়েকটি। মৃত্যুর পর ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

● **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭)**

জন্মস্থান - বিহারের দ্বারভাঙ্গা। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। অজস্র উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর বহুপঠিত উপন্যাস 'নীলাঙ্গুরীয়', কৌতুক গল্পগ্রন্থ 'বরযাত্রী' এবং 'রানু' সংক্রান্ত গল্পমালায়। 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি', 'অযাত্রার জয়যাত্রা' প্রভৃতি রম্যভ্রমণধর্মী রচনা এবং ছোটদের জন্য 'পোনুর চিঠি', 'কৈলাসের পাটরাণী' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। শরৎস্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

● **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)**

জন্মস্থান - বীরভূমের লাভপুর। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। 'ত্রিপত্র' কবিতা সঙ্কলনের মাধ্যমে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ। রাঢ় বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির এক সামগ্রিক চেহারা পাওয়া যায় তার রচনায়। আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। দক্ষ ছোট গল্পকার। জ্ঞানপীঠ, অকাদেমি সহ নানা পুরস্কারে ভূষিত। 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'ধাত্রীদেবতা', 'আরোগ্যনিকেতন', 'কবি', হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'বেদেনী', 'ডাকহরকরা', 'রসকলি', 'বিচারক', 'অগ্রদানী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্প।

● **শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০)**

জন্মস্থান - বিহারের পূর্ণিয়া। প্রথম জীবনে আইন ব্যবসায়ী হলেও, পরবর্তীকালে কিছুদিন বোম্বাই শহরে চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। মহারাষ্ট্রে জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত করেছেন। ছোট-বড় গল্প, উপন্যাস ছাড়া গোয়েন্দাকাহিনী ও রহস্যগল্প রচনাতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। 'তুঙ্গভর তীরে' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। 'ব্যোমকেশের কাহিনীসমূহ', 'গৌড়মল্লার', 'কালের মন্দিরা', 'চিড়িয়াখানা', 'চুয়াচন্দন', 'বিষকন্যা', 'গোপন কথা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের কয়েকটি।

● **বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯)**

জন্মস্থান - বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রাম। প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। পেশায় মূলত চিকিৎসক হলেও সমান্তরালভাবে করে গেছেন সাহিত্য সাধনা। বাংলা সাহিত্যে ক্ষুদ্রতম ছোটগল্পের প্রধান রূপকার তিনি। এছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য ধাবায় তাঁর রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু সংক্রান্ত বহু সফল পরীক্ষামূলক প্রয়াস লক্ষণীয়। তাঁর ক্ষুরধার ব্যঙ্গকবিতা সংকলন স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। 'স্থাবর', 'জঙ্গম', 'কিছুক্ষণ', 'ডানা', 'ভুবন সোম', 'ভীমপলশ্রী', 'লক্ষ্মীর আগমন' প্রভৃতি উপন্যাস, 'নিমগাছ', 'তাজমহল', 'ভিতর ও বাহির' ইত্যাদি অসংখ্য গল্প; 'শিককাবাব', 'অন্তরীক্ষে' প্রভৃতি নাটক তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার কয়েকটি।

● মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭)

জন্মস্থান - ডোঙ্গাঘাট, যশোহর জেলা। বিশিষ্ট সাহিত্যিক। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদের ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে রচিত 'ভুলি নাই' তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় গ্রন্থ। বিখ্যাত উপন্যাস 'নিশিকুটুম্ব' ১৯৬৬খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে আছে - 'মানুষ গড়ার কারিগর', 'জলজঙ্গল', 'নরবাঁধ' প্রভৃতি। 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' নামক প্রকাশনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা।

● অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬)

জন্মস্থান - নোয়াখালি। 'কল্লোল যুগ' এর বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। ছদ্মনাম - নীহারিকা দেবী। চাকরির সূত্রে বাংলার বিভিন্নস্থানে ঘুরে বহু অভিজ্ঞতার অধিকারী হয়েছিলেন যার প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্ন রচনায়। অজস্র বচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ', 'কাকজ্যোৎস্না', 'কল্লোলযুগ', 'মন্দাক্রান্তা', 'ইন্দ্রাণী' ইত্যাদি।

● শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০)

জন্মস্থান - মালদহ জেলার চাঁচল। শব্দকে রসাল করে তোলার অদ্ভুত মন্ত্রগুপ্তি জানা ছিল তাঁর। কবি হিসেবে সাহিত্য জীবন শুরু হলেও গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিছুদিন অধুনালুপ্ত বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' ও 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শিশুসাহিত্যিক হিসেবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। 'যখন তারা কথা বলবে' (নাটক), 'ঈশ্বর পৃথিবী ভালোবাসা' (আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ), 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী', 'অকথিত কাহিনী', এবং অবিস্মরণীয় হর্ষ... গোবর্ধন ভ্রাতৃদ্বয়ের অসংখ্য কাহিনী তাঁব উল্লেখযোগ্য রচনা।

● প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)

জন্মস্থান - বারানসী। প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকাব, প্রাবন্ধিক ও চলচ্চিত্রকার : 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুত্থান ঘটে তার অন্যতম। বাংলায় কল্পবিজ্ঞান মূলক রচনার পথিকৃত। 'বঙমশাল', 'নিরুক্ত', 'কবিতা', কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কাব এবং রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। 'পদ্মশ্রী' ও 'দেখিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত হন। 'পাঁক', 'সূর্য কাঁদালে সোনা', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'কবিতা সমগ্র' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

● সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪)

জন্মস্থান - শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ শহর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং বহুভাষাবিদ। বিশ্বভারতীর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন দেশে পরবর্তীকালে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা। অল ইন্ডিয়া রেডিও-তে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। দেশবিদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর সরস লেখনীতে এক অন্য মাত্রায় ধরা দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - 'দেশেবিদেশে', 'চাচাকাহিনী', 'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন', 'পঞ্চতন্ত্র', 'শবনম', 'তুলনাহীন', 'রাজা উজীর' ইত্যাদি।

● প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩)

জন্মস্থান - কলকাতা। 'কল্লোল' পত্রিকার নিয়মিত লেখকগোষ্ঠীর অন্যতম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করেছেন। ভ্রমণের সঙ্গে কাহিনীর সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে তাঁর রচনায়। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় আন্দোলন, দাঙ্গা দেশভাগ এবং স্বাধীনতার স্বপ্নভঙ্গ মধ্যবিত্ত জীবনের কাঠামোকে কিভাবে নাড়া দিয়ে গেছে সেই অভিজ্ঞতার ফসল তাঁর অজস্র ছোটগল্প। 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'প্রিয়বান্ধবী', 'আঁকাবাঁকা', 'অঙ্গার', 'দেবতাত্মা হিমালয়', 'জলকল্লোল' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের কয়েকটি।

● সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

জন্মস্থান - বিহারের পূর্ণিয়া। প্রথম জীবনে আইন ব্যবসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও পরে তা ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন সাধারণ কর্মী হিসেবে। ১৯৪২-৪৪খ্রিস্টাব্দে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে ভাগলপুর জেলে বন্দী ছিলেন। এইসময় রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিতে রচনা করেন বিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী'। প্রথম রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপক। নানা ভাষায় সুপণ্ডিত। অন্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', 'অপরিচিতা', 'গণনায়ক', দিগভ্রান্ত', 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' ইত্যাদি।

● মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬)

জন্মস্থান - ঢাকার বিক্রমপুর। প্রকৃত নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিক তাঁর ডাকনাম। প্রথম

জীবনে মাত্র দুই-তিন বছর চাকরি করেছিলেন। চরম দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে সাহিত্যকর্মকেই জীবন ও জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা ঔপন্যাসিক। 'জননী', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পদ্মানদীর মাঝি' বিখ্যাত উপন্যাসগুলির অন্যতম। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অতসী মাসী' সাহিত্য জগতে প্রবল সাড়া জাগিয়েছিল।

● বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)

জন্মস্থান - কুমিল্লা। একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সম্পাদক এবং সমালোচক। দীর্ঘকাল 'কবিতা' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। 'তিথিডোর', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী', 'প্রথম পার্থ', 'মহাভারতের কথা', 'সঙ্গ-নিঃসঙ্গতা-রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার অন্যতম। আকাদেমি ও রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক।

● আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)

জন্মস্থান - কলকাতা। প্রথানুসারী শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকলেও বাংলা সাহিত্যে অন্যতম প্রধান মহিলা কথাশিল্পীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রথমদিকে শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেও পরবর্তীকালে তাঁর রচনার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। জ্ঞানপীঠ এবং আকাদেমি, রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপক। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা', 'ছোট ঠাকুর্দার কাশী যাত্রা', 'ভাড়াটে বাড়ী', 'লোকসান', 'ফুটো পয়সার জের' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম।

● সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)

জন্মস্থান - হাজারিবাগ। জীবিকার এত বৈচিত্র খুব কম মানুষের জীবনে দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব এমনকী, সামরিক বিদ্যাতেও তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিরিশের দশকের শেষে আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। গল্প উপন্যাস ছাড়াও স্বনামে ও 'কালপুরুষ' ছদ্মনামে বহু বিষয়ের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'ফসিল', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', 'ভারত প্রেমকথা', 'কিংবদন্তীর দেশে', 'অযান্ত্রিক' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার অন্যতম।

● জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২)

জন্মস্থান - কুমিল্লা। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। 'বাংলার বাণী' পত্রিকার মোপাসাঁর একটি ছোটগল্পে অনুবাদ প্রথম মুদ্রিত রচনা। 'দৈনিক যুগান্তর', 'দৈনিক বার্তা', 'জনসেবক' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুরেশ স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক। 'নদী ও নারী', 'সূর্যমুখী', 'বারো ঘর এক উঠোন', 'প্রেমের চেয়ে বড়ো', 'শালিক কি চড়ুই', 'সমুদ্র' উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম।

● বিমল মিত্র (১৯১২-১৯৯১)

জন্মস্থান - কলকাতা। প্রথম জীবনে বি এন আর দপ্তরে কর্মরত থাকলেও ক্রমে সাহিত্য সাধনাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসটির জন্য ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে বৃহদায়তন উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। 'সাহেব বিবি গোলাম', 'বেগম মেরী বিশ্বাস', 'আসামী হাজির', 'একক দশক শতক', 'দিনের পরদিন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম।

● কমলকুমার মজুমদার (১৯১৫-১৯৯১)

জন্মস্থান - চব্বিশ পরগনার টাকী। বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং শিল্পী। ফরাসী সাহিত্যে বিদগ্ধ ছিলেন। 'এক্ষণ' ও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'আইকমবাইকম' ও 'পানকৌড়ি' নামক ছড়ার বই দুটির রচয়িতা। 'দানসা ফকির' তাঁর নাট্যগ্রন্থ। 'হরবোলা' নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক। 'অঙ্কভাবনা' নামে একটি গণিতের সাময়িক পত্রিকা কিছুদিন প্রকাশ করেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে 'সুহাসিনী পমেটম', 'গোলাপ সুন্দরী', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ', 'অন্তর্জলি যাত্রা' ইত্যাদি।

● প্রতিভা বসু (১৯১৫-)

জন্মস্থান - ঢাকা। বিশিষ্ট মহিলা কথা সাহিত্যিক। সঙ্গীতে পারদর্শিনী। প্রথম কাজী নজরুল ইসলামের গান রেকর্ড করেন। সাহিত্য রচনার প্রাথমিক বিকাশ কাব্যরচনার মাধ্যমে। অজস্র গল্প, কবিতা ও উপন্যাসের রচয়িতা। 'মাধবীর জন্য' প্রথম গল্পগ্রন্থ। 'জীবনের জলছবি', 'রাঙা ভাঙা চাঁদ', 'সকালের সুর সায়াহ্নে', 'বনের ময়ূর', 'স্বর্গের শেষ ধাপ', 'নিরুপমার চোখ', 'মহাভারতের মহারণ্যে' তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার কয়েকটি।

● নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-)

জন্মস্থান - প্রথম আবির্ভাবেই সাড়া জাগানো এ লেখক উপন্যাস ও গল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'ডাক দিয়ে যাই', 'আজব নগরের রূপকথা', 'ফিয়ার্স লেন' প্রভৃতি। ১৯৪৬এর দাঙ্গার পটভূমিকায় লেখা 'ফিয়ার্স লেন' একটি অসামান্য দলিলচিত্র। 'আজব নগরীর রূপকথা'-তে পুতুলদের চরিত্র সাজিয়ে একটি ব্যতিক্রমী রূপক উপন্যাস। ফিল্মের কাজে দীর্ঘকাল মুম্বাইতে বসবাস করেছেন। সম্প্রতি তাঁর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' প্রকাশিত হয়েছে।

● নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫)

জন্মস্থান - ফরিদপুর, প্রখ্যাত কথাশিল্পী, প্রথম জীবনে গৃহ-শিক্ষক ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কিছুদিন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চেকার হিসেবে উপার্জন করেন। জীবনের শেষ পঁচিশ বছর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, 'দৈনিক কৃষক', 'সত্যযুগ' প্রভৃতি কাগজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। চরিত্রগুলির প্রতি পরম মমতা তাঁর রচনায় সর্বত্রই প্রকাশ পায়। 'নিরিবিলি' একমাত্র কবিতার বই, উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে আছে 'রস', 'সূর্যসাক্ষী', 'চেনামহল', 'এ পোয়া দুধ', 'বিবাহবাসর, 'রত্নাবাই', 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' ইত্যাদি।

● নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০)

জন্মস্থান - দিনাজপুরের বালিয়াডাঙ্গি, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও খ্যাতনামা অধ্যাপক, বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প বিষয়ে গবেষণামুলক কাজের জন্যে ডি. ফিল উপাধি পান। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য-সাধনার শুরু। বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং গান এর রচয়িতা। বসুমতি পত্রিকা কর্তৃক সংবাদ-সাহিত্যে প্রথম পুরস্কার প্রাপক। 'শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত লেখক, ছদ্মনাম-সুনন্দ। কিশোর সাহিত্যে অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'উপনিবেশ', 'শিলালিপি', 'তিমির তীর্থ', 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'রামমোহন' 'সুনন্দর জার্নাল' প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা।

● মিরজা আবদুল হাই (১৯১৯-)

বাংলাদেশের প্রবীণ গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। রম্য রচনাতেও সমান দক্ষ। দীর্ঘকাল সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত থেকেছেন। বর্তমান অবসর জীবনে তাঁর মুখ্য অবলম্বন সাহিত্য সাধনা। ছোটদের জন্যও লিখেছেন। 'ছায়া প্রচ্ছায়া', 'বিস্ফোরণ', 'তিন বন্ধু', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। বাংলা আকাদেমি সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত।

● সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)

জন্মস্থান - ফরিদপুরের রাজবাড়ী, খ্যাতনামা সংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'যুগান্তর' এবং 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলা সাংবাদিকতার তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। 'নানারঙের দিন', 'কিনু গোয়ালার গলি', 'জল দাও', 'সময় আমার সময়', 'শেষ নমস্কার-শ্রীচরণেষু মাকে', 'মোমের পুতুল' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার কয়েকটি। বহু ছোটগল্পের রচয়িতা। আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।

● বিমল কর (১৯২১-)

জন্মস্থান - চব্বিশ পরগণা জেলার টাকির কাছে একটি গ্রাম। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। 'পরাগ', 'পশ্চিমবঙ্গ', 'সত্যযুগ', 'দেশ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আকাদেমি পুরস্কার এবং দুইবার আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত। 'অসময়', 'দেওয়াল', 'বরফ সাহেবের মেয়ে', 'সবস গল্প', 'খড়কুটো', 'পূর্ণ অপূর্ণ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা।

● রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-)

জন্মস্থান - খড়গপুর, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী। ভ্রমণের নেশা আছে। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার, জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত, 'প্রথম প্রহর', 'এখনই', 'লাল বাই', 'ভারতবর্ষ', 'অভিমন্যু', 'খারিজ' উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম।

● সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮)

জন্মস্থান - ঢাকার রাজনগর, খ্যাতনামা সাহিত্যিক, প্রথম জীবনে সরাসরিভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। 'বিবর' এবং 'প্রজাপতি' উপন্যাসদ্বয় তাঁকে

বহু বিতর্ক ও সমালোচনার সম্মুখীন করে। ছদ্মনাম-কালকূট, 'আদাব', 'শ্রীমতী কাফে', 'যুগযুগ জিয়ে', 'কোথায় পাবো তারে', 'বি. টি. রোডের ধারে', 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'অমবস্যায় চাঁদের উদয়', 'দেখি নাই ফিরে' (অসমাপ্ত) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম। 'শাম্ব' গ্রন্থের জন্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

● মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬)

জন্মস্থান - ঢাকা, পিতা সাহিত্যিক মনীশ ঘটক। তিনি সমাজের প্রান্তবাসী মানুষদের মধ্যে নানা কল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। তাদের চিঠি অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'অরণ্যের অধিকার', হাজার চুরাশির মা', 'শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা', 'তিতুমীর', 'কি বসন্তে কি শারদে', 'সপ্তপর্ণী', স্তন্যদায়িনী ও অন্যান্য গল্প, পঞ্চাশটি গল্প প্রভৃতি। সাহিত্যে একাডেমি ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন।

● সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-)

জন্মস্থান - মুর্শিদাবাদ জেলার খোশবাসপুর গ্রাম, প্রথম জীবনে দীর্ঘকাল রাঢ় বাংলার আলকাপ দলের 'মাস্টার' গীতকার ছিলেন। সাংবাদিকতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির মধ্যে আছে 'ভালবাসা ও ডাউন ট্রেন', 'অলীক মানুষ', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'তিন নক্ষত্র', 'হেমন্তের বর্ণমালা' ইত্যাদি। আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত, ছোটদের জন্যও লিখেছেন।

● আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-)

জন্মস্থান - ঢাকার রামনগর, অজস্র গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, কাব্যনাটক, এবং প্রবন্ধের রচয়িতা, ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য চর্চা আরম্ভ, পেশায় অধ্যাপক, মস্কো শহরের বাংলাদেশ দূতাবাসে শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে প্রায় চার বছরের কার্যক্রম শেষ করে দেশে ফিরেছেন, স্বাধীনতার পরে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন, 'কর্ণফুলী', 'তেইশ নম্বর তৈল চিত্র', 'মেঠোফুলের ঠিকানা', 'ইহুদীর মেয়ে', 'আমার রক্ত স্বপ্ন আমার', 'জোয়ার থেকে বলছি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম, বাংলা আকাদেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত।

● মতি নন্দী (১৯৩৩-)

জন্মস্থান - কলকাতা, আকৈশোর খেলাধুলোর প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী যার প্রতিফলন মেলে তাঁর সাহিত্য জগতে। তেইশ বছর বয়স থেকে সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত। শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায় 'বেহুলার ভেলা' গল্পের প্রকাশ সাহিত্যিক মহলে বিশেষ সাড়া জাগায়। 'নক্ষত্রের রাত' উপন্যাসের জন্য মানিক স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। 'কোণি', 'স্ট্রাইকার', 'দ্বাদশ ব্যক্তি', 'সাদা খাম' এবং 'কলাবতী'র অজস্র কীর্তিকাহিনী তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির অন্যতম।

● দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৭৯)

জন্মস্থান - কলকাতা। কৈশোর থেকে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগণ্য নেতা। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল আগামী, 'তৃতীয় ভুবন' প্রভৃতি উপন্যাস ও কাছের যারা, অশ্বমেধ ঘোড়া প্রভৃতি গ্রন্থ। বিবিধ বিষয়ে মননশীল প্রবন্ধও লিখতেন তিনি।

● শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০১)

জন্মস্থান - খুলনা। পেশায় সংবাদিক, প্রথম জীবনে 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় ও পরে 'অমৃত' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম : 'কুবেরের বিষয় আশয়', 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', 'চন্দনেশ্বর জংশন', হাওয়া গাড়ি (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), 'শাহজাদা দারাশুকো' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), গল্প সংগ্রহ, গল্পসমগ্র ইত্যাদি। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

● সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-)

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'ক্রিতদাস ক্রিতদাসী', 'এখন আমার কোনো অসুখ নেই', 'অতিথি তুমি', 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা' এবং সংকলন গ্রন্থ হল দশটি উপন্যাস ও পঞ্চাশটি গল্প। সাহিত্যে বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন।

● অতীন বন্দোপাধ্যায় (১৯৩৪-)

জন্মস্থান - ঢাকা জেলার রায়নাদি, বর্তমান পেশা সাংবাদিকতা, বড়দের সর্গ ছোটদের জন্য লেখার প্রতিও মনোযোগী। উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে - 'কার্তিকের রাজপথ', 'গুজে হাতের স্পর্শ', 'রাজা যায় বনবাসে', 'ফোটা পদ্মের গভীরে', 'নীল কণ্ঠ পাখির খোঁজে, 'অলৌকিক', 'ঈশ্বরের বাগান', 'মানুষের সত্যাসত্য', ইত্যাদি। ২০০১এ আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

● প্রফুল্ল রায় (১৯৩৪-)

জন্মস্থান - ঢাকা, বর্তমান কালের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার, 'পূর্বপার্বতী', 'ভাতের গন্ধ', 'কেয়াপাতার নৌকো', 'সিন্ধুপারের পাখি', রামচরিত্র', 'ধর্মান্তর আকাশের নীচে মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাস, গল্প অসংখ্য গল্পের তিনি লেখক। সারা ভারতের বিভিন্ন স্থান তিনি নিবিড় পরিক্রমা করেছেন যার ফসল ... গল্প ও উপন্যাস। তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'অনুপ্রবেশ', 'মন্দ মেঘের উপাখ্যান', এবং ...লিত গল্পগ্রন্থ হল শ্রেষ্ঠ গল্প, স্বনির্বাচিত গল্প, প্রিয় গল্প, সেরা বারো। কিশোরদের উপযোগী গল্প 'সে... ...ও নিরুদ্দেশ', 'তিন মূর্তির কীর্তি, আধ ডজন চোর ইত্যাদি। সাহিত্যে বঙ্কিম ও ভুয়ালকা পুরস্কার প্রাপ্ত।

● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-)

জন্মস্থান - ফরিদপুর, বিশিষ্ট বাংলা কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। গৃহশিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। বর্তমানে আনন্দবাজার সংস্থার 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কিশোর সাহিত্যেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ছদ্মনাম-নীললোহিত, সনাতন পাঠক, নীল উপাধ্যায়। আনন্দ পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার এবং সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত, 'এ... এবং কয়েকজন', 'সেই সময়', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'সুন্দরের মনখারাপ, 'মাধুর্যের জ্বর', 'হঠাৎ নীরাব ...ন্য', 'স্মৃতির শহর', 'প্রথম আলো' এবং সন্তু ও কাকাবাবুর অসংখ্য কাহিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা।

● শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-)

জন্মস্থান - ময়মনসিংহ, বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার। পিতার কর্মসূত্রে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে পূর্বভারতের বিভিন্ন স্থানে, কর্মজীবনের আরম্ভ শিক্ষকতা দিয়ে, বর্তমানে পেশায় সাংবাদিক। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কিশোর সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিরূপে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। দুইবার আনন্দ পুরস্কার এবং সাহিত্য 'অকাদেমি প্রাপ্ত। 'ঘুণপোকা', 'দিন যায়', 'যাও পাখি', 'মানবজমিন', 'পার্থিব', 'মনোজদের অদ্ভুতবাড়ি', 'দূরবীন', এবং 'গোয়েন্দা বরদাচরণে'র কীর্তিকাহিনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা।

● বুদ্ধদেব গুহ (১৯৩৬-)

জন্মস্থান - কলকাতা। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার হিসেবে জনপ্রিয় হলেও অন্য স্বাদের রচনার সংখ্যাও কম নয়। পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউট্যান্ট, সঙ্গীতানুরাগী। 'ঋজুদার কাহিনী', 'কোয়েলের কাছে', 'কোজাগর' খেলা যখন', 'মাধুকরী', 'একটু উষ্ণতার জন্য' প্রভৃতি ছাড়াও বেশ কিছু ছোটগল্পের রচয়িতা।

● দেবেশ রায় (১৯৩৬)

জন্মস্থান - জলপাইগুড়ি, বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। ষাটের দশকে বাংলা ছোট গল্প আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লেখক। ভাষা ব্যবহার ও উপস্থাপনার স্বকীয়তা লক্ষণীয়। 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত', 'যযাতি', 'হাড়কাটা', 'মানুষ খুন করে কেন', 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। আপাতত পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'গল্পসংগ্রহ' পাওয়া যায়। সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

● শওকত আলি (১৯৩৬-)

জন্মস্থান - দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, পেশায় ছিলেন বাংলার অধ্যাপক, বিশিষ্ট ছোটগল্পকার এবং ঔপন্যাসিক, শ্রেণীচেতনা ও সামাজিক অসংগতির প্রতি অধিকতর মনোযোগী। 'পিঙ্গল আকাশ', 'উন্মুখ বাসনা', 'লেলিহান সাধ', 'উন্মূল বাসনা', 'যাত্রা', 'নীল পাহাড়ের গান', 'টুনকু নামে হাতি' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। ছোটগল্পে বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার এবং অজিত গুহ সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত।

● নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-)

জন্মস্থান - কলকাতা। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, কিশোর সাহিত্য সবক্ষেত্রেই স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'শব্দ পড়ে টাপুর টাপুর', 'নটী

নবনীতা', 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে', 'সীতা থেকে শুধু', 'বামাবোধিনী', 'খগেন বাবুর পৃথিবী', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'আমি অনুপম', 'প্রথম অধ্যায়', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। সম্প্রতি আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

● দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯)

জন্মস্থান - বিহারের ভাগলপুর, অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ—সবই লিখছেন। কর্মজীবন আরম্ভ করেন এক ইংরাজি দৈনিকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে। পরে বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায় থাকলেও পরে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। আনন্দ পুরস্কার, ভুয়ালকা পুরস্কার এবং বঙ্কিম পুরস্কারে ভূষিত। 'সম্পর্ক', 'ঢেউ', 'উড়োচিঠি', 'অনুভব', 'ঘরবাড়ি', 'চিলেকোঠা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

● রাজিয়া রহমান (১৯৩৯-)

জন্মস্থান - কলকাতা, বাংলাদেশের খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার। লেখাই তাঁর পেশা, 'অগ্নিস্বাক্ষর', 'ঘর ভাঙা ঘর', 'উত্তর পুরুষ', 'রক্তের অক্ষর', 'ধবল জ্যোৎস্না', 'সূর্য সবুজ রক্ত', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। উপন্যাসে বাংলা আকাডেমি পুরস্কার এবং লেখিকা সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত।

● হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-)

জন্মস্থান - বর্ধমান জেলার যবগ্রাম। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ছোটগল্পকার। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক। প্রবন্ধও লেখেন। 'সমুদ্রের স্বপ্ন', 'শীতের অরণ্য', 'আত্মজা ও অকটি করবী গাছ', 'জীবনঘষে', 'আগুন', 'পাতালে হাসপাতালে', 'কথাসাহিত্যের কথকতা', 'নামহীন গোত্রহীন', 'লাল ঘোড়া আমি', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। আদমজী সাহিত্য পুরস্কার, ছোটগল্পে বাংলা আকাদেমি সাহিত্য পুরস্কার এবং লেখক শিবির পুরস্কারে সম্মানিত।

● আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭)

জন্মস্থান - বগুড়া। বাংলাদেশের অন্যতম শক্তিশালী কথাশিল্পী। মেদহীন সাবলীল গদ্য তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বেশি না হলেও বাংলাদেশের সাহিত্যে তাঁর স্থান স্বমহিমায় উজ্জ্বল। 'চিলেকোঠার সেপাই', 'খোয়াব নামা', 'অন্যঘরে অন্যস্বর', 'খোঁয়ারি', 'স্মৃতির ভাঙা সেতু' ইত্যাদি উল্লেকযোগ্য গ্রন্থ। ছোটগল্পে বাংলা আকাডেমি এবং উপন্যাসে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত। পেশায় ছিলেন বাংলার অধ্যাপক।

● ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য্য (১৯৪৫-)

জন্মস্থান - ত্রিপুরা। ত্রিপুরার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প লেখক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ বি. এড.। প্রথম জীবনে বেশ কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হল 'বুড়া দেবতার মাচাং ও 'সমিধ'। তাছাড়া তার বেশ কিছু গল্প নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'নির্বাচিত ভীষ্মদেব'।

● সেলিনা হোসেন (১৯৪৭-)

জন্মস্থান - রাজশাহী, বাংলা আকাদেমির উচ্চপদে কর্মরত। 'খোল করতাল', 'উৎস থেকে নিরন্তর', 'হাঙর নদী গ্রেনেড', 'যাপিত জীবন', 'নীল ময়ূরের যৌবন', 'পদ শব্দ', 'চাঁদবেনে' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। উপন্যাসে বাংলা আকাদেমি সাহিত্য পুরস্কার, আলাওল সাহিত্য পুরস্কার এবং ডঃ এনামুল হক সাহিত্য স্বর্ণপাদক প্রাপ্ত।

● হুমায়ুন আহমেদ (১৯৪৮-)

জন্মস্থান - ময়মনসিংহের কুতুবপুর। বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। কিশোর সাহিত্যে অবদান উল্লেখযোগ্য। 'নন্দিত নরকে', 'আগুনের পরশমণি', 'প্রিয়তমাসু', 'এ কী কাণ্ড', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'অচিনপুর', ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা। উপন্যাস রচনায় বাংলা আকাডেমি এবং লেখক শিবির পুরস্কারে সম্মানিত।

● সুজয় রায় (?)

চল্লিশের দশকে জন্ম। ত্রিপুরার লেখক। মূলত ছোট গল্প লিখে থাকেন। তাঁর গল্প গ্রন্থ হল 'এই জীবন এই দাহ' ও 'শরীর জমিন'।

[illegible]

[illegible] বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে [illegible]

থাকিয়া থাকিয়া —

এভাবেই একদিন বিচিত্র বেশে নারীদের কথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ সংকলনে স্বভাবই বেশ কিছু নারীর গল্প পরিবেশিত হল যারা সুখে দুঃখে, প্রণয়ে পরিণয়ে বিরহে বিষাদে [illegible] আমাদের জীবনে জড়িত রয়েছে আলোয় ছায়ায়। এ সংকলনে নারীবাদ নয়। নারীকে নারীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা। কল্পনায় বাস্তবে [illegible] প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত [illegible] বিচিত্রতার দিকে লক্ষ রাখা হয়েছে [illegible] নির্বাচনে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলা ভাষার প্রসিদ্ধতম লেখকদের আটটি গল্প রইল এ সংকলনে।

